একাদশ খণ্ড— প্রথম সংখ্যা।

বৈশাখ,—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত;
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৫ই বৈশাখ, ১৩০০।

বৈশাখ মাসের নব্যভারত প্রকাশিত হইল। যাঁহারা পূর্ণ মূল্য দেন, তাঁহারা ১৩০০ সালের মূল্য আষাঢ় মাসের মধ্যে অগ্রিম দিলে ২॥০ হিসাবে দিবেন। স্কুলাদি বন্ধ হইতে চলিল, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা আষাঢ় সংখ্যার সহিত একত্রে প্রকাশিত হইবে।

১২৯৯ সাল শেষ হইয়াছে,। আমরা সমস্ত গ্রাহকের নিকট স্বতন্ত্র পত্রে হিসাব পাঠাইয়াছি। অনেকে দয়া করিয়া টাকা দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন গ্রাহক পত্র refuse করিয়া ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন! যাঁহারা আজও আমাদের সকরুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই,তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা আর উপেক্ষা না করিয়া আমাদের সকরুণ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। মূল্য প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী নব্যভারতের উপর লাইসেন্স টেক্স ধার্য্য করিয়াছেন। অতঃপর সকল গ্রন্থকার ও সম্পাদকদিগকে এবং বেসরকারী স্কুলের অধ্যক্ষগণকে দোকানদারদের ন্যায় লাইসেন্স টেক্স দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমরা সমস্ত সম্পাদকগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। সকলে দয়া করিয়া আন্দোলন করিলে বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবে। আমরা আগামীবারে নব্যভারতে সবিশেষ লিখিব।

প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই।

নূতন পুস্তক।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত

১। **মুরলা,** উপন্যাস, মূল্য ১।০, মাশুল /০।

২। **সান্ত্বনা,** বিবিধ প্রবন্ধ, বিদ্যাসাগর-ছবি সহ মূল্য ৸০, মাশুল ৴১০।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে ও নব্যভারত কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা।

আগামী ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ উক্ত সভার নানা বিভাগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার্থীগণ অবিলম্বে নাম, ধাম, জাতি, বয়স, পরীক্ষার স্থান, তত্ত্বাবধায়কের নাম ইত্যাদি সহ ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সম্পাদকের নামে আবেদন করিবেন।

নূতন উপন্যাস—"দুলালী"।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। "দুলালী"র ভূমিকায় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন;—"দুলালী" বড় বিষম উপন্যাস,আর এই বিষম উপন্যাসে "ত্রিবক্র" বড় বিষম চরিত্র। ত্রিবক্র উৎকৃষ্ট নাটকের উপযোগী চরিত্র। এই চরিত্রের জন্য উপন্যাসখানির বড়ই গৌরব হইয়াছে। চরিত্রটী আগাগোড়া সুরক্ষিত এবং নাটকের প্রণালীতে চিত্রিত হইয়াছে। উপন্যাসের উপসংহার ভাগ বড়ই ভীষণ—স্বয়ং ত্রিবক্রের ন্যায় ভীষণ। এবং এই ভীষণতায় বড় ভীষণ সৌন্দর্য্য সংসাধিত হইয়াছে।"

"মায়া" উপন্যাস।০ আনা, "সংসারাশ্রম" উপন্যাস ॥০ আনা, "ফুল" কবিতা ও [illegible] ৵০ আনা, "শঙ্কর-বিজয়" শঙ্করাচার্য্যের জীবনী ॥০ আনা, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক" দৃশ্যকাব্য ৵০ আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অব্যর্থ ঔষধ।

সূতিকা, ডাইরিয়া, অম্ল, কুষ্ঠ, পারার দোষ, মেহ, মূত্র-মেহ, একশিরা, দাদ, বাত, বাতব্যাধি ও অর্শ এই সমস্ত রোগের ঔষধ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র রায়ের নিকট পাওয়া যায়। অবস্থা লিখিলেই ঔষধ পাঠাইয়া দেওয়া যায়। ১ মাসের ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ৭ দিন ব্যবহার করিলে ফল পাওয়া যাইবে। ৪৪নং চাউলপট্টি রোড ভবানীপুর,কলিকাতা।

নব্যভারত সম্পাদকের সুপরিচিত

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু, দয়াল বাবু এবং মিঃ ডি, এন রায়, এম, ডি, মহোদয়গণের বিশেষ অনুগৃহীত। মাদার টিং ড্রাম ।৵০, ডাঃ ১২ পর্য্যন্ত ।০; ৩০ ক্রম ।৵০; ১২ শিশির ঔষধপূর্ণ কলেরা বাক্স পুস্তকাদি সহ ৫৲ ঐ ২৪ শিশির ৮॥০, ৩০ শিশির ১০॥০ ইত্যাদি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স মায় পুস্তক, ফোঁটা ফেলার যন্ত্র ২৪ শিশির ৮/০; ৩০ শিশির ৯।৵০; ৩৬ শিশির ১২৲ ইত্যাদি থার্মমিটার ২/০; খুব ভাল "হিক্স" ৩৲, ৪॥০, ৬৲; রুবিনির ক্যাম্ফার ১ আউন্স ৸০, অর্দ্ধ আউন্স ॥০।

এমেরিকান ও জার্ম্মেন ফার্ম্মাকোপিয়ার বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংক্ষেপ সংস্করণ ২৲।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং,
[illegible] কলিকাতা।

একাদশ খণ্ড

সান্ত ও অনন্ত। *

"The world proceeds from the same spirit as the body of man. It is a remoter and inferior incarnation of God, a projection of God in the unconscious."

"If your eye is on the eternal, your intellect will grow, and your opinions and actions will have a beauty which no learning or combined advantages of other men can rival." —*Emerson.*

একদিন সায়ংকালে পুরুষোত্তমের সাগর কূলে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা নিরীক্ষণ এবং অনুধাবন করিতেছিলাম। অনন্ত-প্রসারিত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগকে এক অপরূপ সাত্ত্বিক জগতে উপনীত করিল। কত দেখিলাম, কত ভাবিলাম এবং কত মোহিত হইলাম! দেখিলাম, প্রকৃতি সীমা-বিশিষ্ট হইয়াও, স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, অনন্তের আভাস দিতেছে; অথবা যাহা অনন্ত, তাহাই সীমাবদ্ধ হইয়া, এই বিশাল বিস্তৃত সাগরেও যেরূপ সীমা দেখা যায়, তদ্রূপ আমার নয়নকে ধান্ধা দিতেছে। অনন্ত গগনের ন্যায় সাগর বিশাল বিস্তৃত হইলেও, আমি তাহার অল্পাংশই দেখিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম, ঐ সাগরের ন্যায়, আমার ক্ষুদ্র চেতনা-শক্তি এক মহাচৈতন্যের পরিচয় দিতেছে। মোহিত হইলাম—জড় এবং চৈতন্য, এই উভয়ের সংমিশ্রণে বিধাতার যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি রচিত, এই প্রকৃতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও মহান অপার অগম্য আদিশক্তি ব্রহ্মেরই সত্ত্বামাত্র। এইদিন জীবনের একটী বিশেষে দিন গিয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলাম এবং যাহা ভাবিয়াছিলাম, জগতের নিকট তাহা সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে পারি, সে শক্তি নাই। বিধাতা আমাদিগের সহায় হউন।

আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, এই বিচিত্র প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতাত্মিকা। অন্যদিকে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণান্বিত। বিবিধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রূপান্তরে এবং ভাষান্তরে প্রকৃতিকে, নানা কথায়, নানা ব্যাখ্যায় ঐ সকল ভূত এবং গুণ সমন্বিত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, প্রাচীন এবং নবীন এই উভয় যুগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, জড় এবং মায়া, আত্মা এবং কায়া, সেশ্বর এবং নিরীশ্বরবাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলি, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছুর অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত হইয়াছে, সে সকলই এক মহান অপার অনন্ত শক্তির আভাস দিতেছে। অথবা যাহা অনন্ত, তাহাই মনুষ্যের ধারণাশক্তির (Con-

* এই বিষয়ে কটক-টাউনহলে ৯ই চৈত্র, ১২৯৫; রাঁচি-জেলা-স্কুল-হলে ১৫ই চৈত্র, ১২৯৭, এবং ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ-হলে ৬ই আশ্বিন, ১২৯৯, আমি যে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ception) আয়ত্তাধীন হইবার জন্য সীমাবদ্ধভাবে উপস্থিত হইতেছে। ক্ষুদ্র যাহা, সীমাবিশিষ্ট যাহা দেখি, বোধ হয়, সে সকলই অনন্তের ছায়ামাত্র।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, এই প্রকৃতির সকল বস্তুই সীমাবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টি বলিলেই তাহাকে সান্ত বলিয়া মনে হয়। সীমাবিশিষ্ট মানুষের দর্শন ও ধারণাশক্তি (Perception and conception) অতি সামান্য, কতকদূর যায়, তার পর আর দৃষ্টি ও ধারণাশক্তি যায় না। যেমন সাগরের কতক অংশের পর আর দৃষ্টি চলে না, সেইরূপ, বোধ হয়, মানুষ অনন্তের ভাব ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রকৃতিকে সীমাবিশিষ্ট মনে করে; সীমা লইয়া, ক্ষুদ্র লইয়া থাকিতেই ভালবাসে। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, ক্ষুদ্র ও সীমাবিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের আভাস পাওয়া যায় কি না?

জড়ের কথাই প্রথম আলোচনা করি। জড় কি? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, জড় অবিনশ্বর পরমাণুর সমষ্টি। জড় বিশ্লেষ করিলে পরমাণুই পাওয়া যায়। এই পরমাণু কি?— জড়ের এমন ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহা আর বিভাগ করা যায় না, অর্থাৎ জড়ের যে অংশ মানুষ কখনও দেখে নাই, অথবা যে অংশ কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ভাবিতে হয়। পরমাণু মানুষ কখনও দেখে নাই—দেখিতে পারে নাই, অর্থাৎ এমন কিছু, যাহার মূলে দৃষ্টি চলে না, অর্থাৎ যাহা অনন্ত। পরমাণুর সমষ্টিতে পর্ব্বতের উৎপত্তি, রাজ্য ও জনপদের উৎপত্তি, এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির উৎপত্তি। পরমাণু জমিয়া যখন বিরাট পর্ব্বত অথবা মৃত্তিকা-স্তর হইয়াছে, সে পর্ব্বতকে ও মৃত্তিকাস্তরকে ধারণা করিতেও মানুষ অসমর্থ। পর্ব্বত বা মৃত্তিকা-স্তরের একাংশ দেখিয়া মানুষ অপর অংশের কথা ভাবিয়া লয়; সর্ব্বাংশ কখনও মানুষ দেখিতে পারে না। যাহা দেখে নাই, পরোক্ষজ্ঞানে তাহা কল্পনা করে। পরমাণুর আদিতে কল্পনা, পরমাণুর পরিণতিতে অথবা সমষ্টিতেও কল্পনা। মানুষের জ্ঞান ও ধারণাশক্তি এতই সীমাবদ্ধ। অথবা দেখ, প্রকৃতির একটী সামান্য পরমাণু কত বড় যে, তাহা ভাবিতে ও ধারণা করিতে মানুষ অসমর্থ হইয়া কত কাল্পনিক স্বপ্ন দেখিতেছে। প্রকৃতিতে কত পরমাণু আছে, কেহ জানে না; পরমাণুর শেষ কোথায়, তাহাও জানে না; আবার পরমাণুর সমষ্টিতে কত পর্ব্বত-জগৎ হইয়াছে, তাহাও মানুষ ঠিক বলিতে পারে না। দেখ, সান্ত ও অনন্তের কেমন যোগ!

বিন্দু বিন্দু জলকণা সকল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। এই বাষ্পকণা সকল জমিয়া জমিয়া মেঘ হইতেছে। মেঘকণা সকল জমিয়া জমিয়া পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইতেছে। মেঘ, পার্ব্বতীয় শক্তিতে দ্রব হইয়া, বৃষ্টি-প্রবাহে, ঝরণা-প্রবাহে ধরাকে শীতল করিতেছে। বৃষ্টি-বারিরাশি এবং ঝরণা-বারিরাশি মিলিয়া মিলিয়া নদী উৎপন্ন করিতেছে। নদীকণা সকল মিলিয়া মিলিয়া কত বড় বড় সাগরে পরিণত হইতেছে। দেখ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণার সমষ্টিতে কত বড় সাগরের উৎপত্তি। পলকহীন চক্ষুতে সাগরের দিকে চাহিয়া দেখ, সাগরের যে অংশ দেখিতে পাইবে, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু অনন্ত তাহার পশ্চাতে।

অনন্তের ঢেউ, অনন্তকাল-বহিয়া বহিয়া এই-রূপে যেন মানুষের নয়নাধীন হইতেছে। পৃথিবীর সাগরে কত জল, কত তরঙ্গ, কেহ জানে না, কেহ বুঝে না। সান্তে, অনন্তের আভাস দেখ।

সময়ের কথা ভাব। একটী মুহূর্ত্তের কথা চিন্তা কর। তোমার সম্মুখে একটী মুহূর্ত্ত— পরিসর নাই, ব্যাপ্তি নাই, তিলেকমাত্র। এই মুহূর্ত্তই, কত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে আয়ুঃ— জীবন-মরণ-কাল। এই মুহূর্ত্তে কত মস্তিষ্ক হইতে কত অনন্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই মুহূর্ত্ত, কাহারও জন্ম বা কাহারও মৃত্যুর কারণ হইতেছে। মুহূর্ত্ত, কত জনকে পথের ভিখারী করিতেছে, কত ভিখারীকে রাজসিংহাসনে বসাইতেছে। মুহূর্ত্ত, ভক্তের প্রাণ হইতে একটীবার মাতৃনাম উচ্চারণ করাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া দিতেছে। মুহূর্ত্ত-মহিমা চিন্তা করিলে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়। অথচ মুহূর্ত্ত অতি সামান্য জিনিস। এই মুহূর্ত্ত জমিয়া জমিয়া ঘণ্টা বা প্রহর, ঘণ্টা বা প্রহর জমিয়া জমিয়া দিন রাত্রি, দিন রাত্রি জমিয়া জমিয়া সপ্তাহ,—তার পর মাস, তার পর বৎসর, তার পর যুগ, তার পর শতাব্দী রচনা করিতেছে। শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত দর্শন বিজ্ঞান, কাব্য ইতিহাস আবিষ্কার হইতেছে। পৃথিবীর বয়স কত, কে জানে? কোথা হইতে সময়ের আরম্ভ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোথা বা সময়ের পরিসমাপ্তি, তাহাই বা নির্ণয় কে করিতে পারে? ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—আদি অন্তে অনন্ত শৃঙ্খলে বাঁধা। ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—অনন্তের ছায়া। সময় যেমন অনন্ত-জ্ঞাপক যন্ত্র, এমন আর দ্বিতীয় নাই। ভাবিলে মোহিত হইতে হয়।

র আদি কল্পনা করা যদি মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে কল্পনা কর, যেরূপে যে ভাবেই হউক, প্রথমে যেন কেবল একটী গাছের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই বৃক্ষে নয়ন-তৃপ্তিকর কত ফুল, কত ফল শোভা পাইয়াছে। সেই ফুল কালে ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই বৃক্ষ কালে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কত অঙ্কুর রহিয়া গিয়াছে। বীজাঙ্কুরসহ পরিপক্ক কত ফল মৃত্তিকায় পড়িয়াছে, তাহা হইতে কালে কত বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে। আদি বৃক্ষ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই আদি হইতে পৃথিবীতে কত বন জঙ্গল অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বন জঙ্গল অরণ্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বিলীন হইতেছে, আবার নূতন বন জঙ্গলের সৃষ্টি হইতেছে। আদিতে একটী বৃক্ষ কল্পনা না করিলেও বুঝা যায়, একটী বৃক্ষ বহু বৃক্ষের মূল—একটী বৃক্ষ হইতে পৃথিবী ঘোর অরণ্যে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবীতে কত বৃক্ষ, কত জঙ্গল আছে, কেহ জানে না। সান্তের ভিতরে এখানেও অনন্তের আভাস পাওয়া যায়।

একটু একটু মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে। আমাদের শরীর জুড়াইতেছে; আমরা অম্লজান (Oxygen) টানিয়া লইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। এই একটু একটু শীতল বায়ু যখন প্রবল প্রচণ্ড ঝড় আকার ধারণ করে, আমরা ভয়ে জড়সড় হই, আমাদের সাহস বীর্য্য উড়িয়া যায়। এই ঝড় সাগরে কত তরঙ্গ তুলে, কত জাহাজ ভাঙ্গে, কত বাড়ী ঘর চূর্ণ, ও কত বৃক্ষ পাহাড় উৎপাটন করে। এই বায়ুরাশি কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না। কত দিন বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, ভূমণ্ডলে কত বায়ু

আছে, কেহ জানিতে পারে নাই। একটু বায়ুর পশ্চাতে দেখ, কত বড় অনন্ত বায়ু-সাগর সংমিশ্রিত রহিয়াছে। সান্ত তাহাকে বলি, যাহার অন্ত গণনা করা যায়। আর অনন্ত তাহাকেই বলি, যাহার অন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। বায়ুর আদি অন্ত কে নির্ণয় করিতে পারে? এইরূপে যে সীমাবিশিষ্ট পদার্থ ধরি, একটু চিন্তার পরই দেখি, তাহারই পশ্চাতে সীমারহিত একটা বিরাট অনন্ত সংযুক্ত রহিয়াছে।

বিদ্যুতের কথা ভাব। বিদ্যুৎ কি, তাহার আজও ব্যাখ্যা হয় নাই, কিন্তু প্রবাদ এইরূপ, পৃথিবীর দক্ষিণ হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত এই বিদ্যুতের প্রবল প্রবাহ সর্ব্বক্ষণ বহিতেছে। এই বৈদ্যুতিক আকর্ষণে জগৎ নিয়মিত হইতেছে। মানুষ ব্যাটারীতে যে এক বিন্দু বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়াছে, এই বিদ্যুৎকণার সহিত সমস্ত জগৎ-ব্যাপ্ত বিদ্যুতের সংযোগ। বিদ্যুতের ক্ষমতা কত, সকলেই জানেন। এক বিন্দু বিদ্যুৎ সংস্পর্শে মানুষের সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হয়, মুহূর্ত্তমাত্রে মানুষের প্রাণ দেহ-বিচ্যুত হয়। মানুষ বিদ্যুৎ লইয়া আজ কাল ক্রীড়া করিতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ কি জিনিস, ইহার আদি অন্ত কোথায়, মানুষ জানে না। বিদ্যুতের পশ্চাতে এক মহা অনন্ত শক্তি প্রধাবিত।

প্রকৃতির এ সকল বিভাগের অনুধাবন ছাড়িয়া চৈতন্য-জগতে যাই। মানব সৃষ্টি, বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। মানব দেহে জড় ও চৈতন্য, উভয়ই আছে। মানব দেহ পঞ্চভূতাত্মক, প্রাণ মন ত্রিগুণান্বিত। মানবকে বিশ্লেষ করিলে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মানুষের এই ত্রিবিধ শক্তির ভিতরেও কি অনন্তের ছায়া পাওয়া যায়? অনুধাবন করি।

বিবর্ত্তনবাদ জগতে প্রকাশ করিয়াছে, সামান্য বস্তু হইতে মহতের উদ্ভব এবং জড় হইতে চেতনের জন্ম সম্ভব। আদি মানুষের (স্ত্রীপুরুষ) এক বিন্দু শোণিত হইতে পৃথিবীর অগণিত মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, বিবর্ত্তন-বাদ বিশ্বাস করিয়াও ইহা স্বীকার করা যায় যে, এক স্ত্রী ও পুরুষের এক বিন্দু শোণিত হইতে কোটী কোটী মানুষের উৎপত্তি হইতে পারে। এক মানুষ মরিতেছে, দশ বিশ সন্তান পশ্চাতে রহিতেছে; সেই দশ বিশ লোপ পাইতেছে, কিন্তু তাহা হইতে শত, সেই শত হইতে সহস্র, সহস্র হইতে কোটী কোটী মানুষ জন্মিতেছে। একখানি সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ভূমধ্যসাগরের কড্ নামক মৎস্য যদি মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত না হইত, তবে ১৫ কি ২০ বৎসরে ভূমধ্যসাগর কড্ মৎস্যে পূর্ণ হইয়া যাইত। জনসংখ্যার বৃদ্ধিও এইরূপ। মনুর সন্তানের বংশ বৃদ্ধি দর্শন করিলে বিস্ময় উপস্থিত হয়। এক পিতৃপুরুষ হইতে কত জাতি হইয়াছে, প্রাচীন বংশ সকলের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। আমাদের দেশে পিতৃপুরুষের নামানুসারে গোত্র হইয়াছে। এক গোত্রে এখন কত লোক হইয়াছে, গণনা হয় না। এক বিন্দু মানুষের শক্তিতে কি এক অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত ব্যাপার পরি-লক্ষিত হইতেছে!

সমষ্টিতে মানব শক্তি কত বিস্তৃত

ধারণা করা যায় না; অন্যদিকে ব্যষ্টিতে মানুষের শক্তি কত, তাহাই কি ধারণা হয়? সমষ্টিতে মানব দৈহিক বলে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী বিকম্পিত,—কত রাজ্যের উত্থান, কত রাজ্যের পতন হইতেছে, কত বংশের বিনাশ এবং কত বংশের অভ্যুদয় হইতেছে। আর ব্যষ্টিতেই কি মানব সামান্য? মহাত্মা এমারসন বলিয়াছেন—"মানবের শক্তির কথা যখন ভাবি, তখন আত্মহারা হইয়া যাই, দেখি, অচিন্ত্য বিশ্বশক্তি যেন প্রতি মানব হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত।" ঈশামুশার ন্যায় এক একজন মানুষের দ্বারা পৃথিবী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতে পারে। মানুষ কি ভাবে, কি করে, কেহ বলিতে পারে না। প্রতি ব্যক্তির ভিতরে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তার তরঙ্গ অবিরত খেলিতেছে, কেহ জানে না। কেহ কাহারও মন আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের শক্তির অন্ত কোথায়? আদি সময় হইতে কত মানুষ এবং মানুষের বংশ লোপ পাইয়াছে, কত মানুষ এবং মানব বংশ অভ্যুদিত হইয়াছে, এখনই বা পৃথিবীতে কত মানুষ আছে, কে গণনা করিতে পারে? প্রতি মানুষের শরীরে কত শক্তি নিহিত, তাহারও কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতি নূতন হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষ নূতন হইতেছে। প্রতি সামান্য মানুষেরই হৃদয়ে যেন অসামান্য অনন্তের ছায়া,—কত বল, কত বীর্য্য, কত চিন্তা, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, ধারণা হয় না। মানুষের চিন্তা, জ্ঞান ও বীর্য্যবলে এই সসাগরা পৃথিবী ধন ধান্যে, শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে। দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, রাজ্যের পর রাজ্য—আজ মানুষের অজেয় শক্তি ঘোষণা করিতেছে। মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা কত কাব্য, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, কে সংখ্যা করিতে পারে? যুগান্তব্যাপী, শতাব্দ-ব্যাপী সাধনার ফলে, মানব, সৃষ্টির রাজত্ব পাইয়াছে। মানুষের প্রতি কথায় অনন্ত জ্ঞান পরিব্যক্ত, প্রতি কাজে অনন্ত শক্তি বিকশিত। সামান্য একটী মানুষের বিষয় ভাবিতে বসিলেও হৃদয় মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। মানুষের কত প্রেম, কত চিন্তা, কত কাজ—সকলেরই ভিতরে যেন অনন্ত প্রতিভাত। বড় কাজ, বড় কথা, ছোট কাজ, ছোট কথা—সবই অবিনশ্বর, সবই প্রয়োজন। কোনটীর অভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হয় না। যত সামান্য সামান্য বিষয়, যত সামান্য সামান্য কথা কল্পনা হয়, ভাবিয়া দেখ, অবাক্ হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মানুষ—যেন বিশাল অনন্তের প্রতিকৃতিমাত্র। * আবার বলি, মানুষ ভাবে কি, মানুষ করে কি? যত সামান্য বিষয় ভাবে বা যত সামান্য কাজই করে, সে সকলেরই লক্ষ্য অনন্ত। ভাবিতে আরম্ভ করিয়া কেহ আজ পর্য্যন্ত ভাবনার কূল পায় নাই, কাজ করিয়াও কেহ কাজ শেষ করিতে পারে নাই। প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া কেহ বাসনাকে নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। দেখ, প্রেমের আকর্ষণে মানুষ পাগল, পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র হইতে তাহার ভালবাসা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এখন সে আর তাহাতে তৃপ্তি পায় না—সে আরো চায়, আরো চায়। ভালবাসিয়া তাঁর বুকের পিপাসা মিটে নাই। সে জ্ঞান, পুণ্য, ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে লালায়িত হইয়া-

* "I become a transparent eyeball, I am nothing: I see all the currents of the Universal Being circulate through me: I am part and particle of God."—*Emerson.*

ছিল, কিন্তু যত উপার্জ্জন করিয়াছে, ততই তাহার বাসনার আগুন জ্বলিয়াছে। জ্ঞান-পিপাসা, ঐশ্বর্য্য পিপাসা, বা পুণ্য-পিপাসা, মানুষের যত পিপাসা কল্পনা করা যায়, মরণ পর্য্যন্তও, কোন পিপাসারই নিবৃত্তি নাই। তাহার শরীর চায়, মন চায়, ইন্দ্রিয় চায়, বৃত্তি চায়, রিপু চায়; সকলই "দে দে" মহারবে মাতোয়ারা। দিক্‌হারা মানুষ পাপে ডুবিতে ধায় যখন, তখনও অনন্ত পাপে সে ডুবিবে; যখন ধর্ম্মে উঠিতে চায়, তখনও অনন্ত পর্য্যন্ত ছুটিবে। দিবানিশি সে ব্যস্ত। দিবানিশি সে দারুণ পিপাসায় মাতোয়ারা। তাহার অভাব কোন দিনও ঘুচিল না। তাহার পিপাসা কোন দিনও মিটিল না!

বাইবেল গ্রন্থ বলে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। মানুষের সৎপ্রবৃত্তির পিপাসা, মানুষের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তেজ ও শক্তির কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে নিমগ্ন হই, এবং মনে করি, সত্যই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। মানুষ সৃষ্টির রাজা, এ কথা বলিলেও মানবত্ব সম্যক প্রকাশ হয় না। ঈশ্বর মানব ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই কথা বলিলেই যেন অধিক যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু অন্য দিকে, মানবের পৈশাচিক প্রক্রিয়ার কথা যখন মনে হয়, তখন আর এভাব মনে থাকে না, মনে করি, "মানুষ কে যে তাহার পূজা করি?" আর যা হউক, তা হউক, এখানেও মানুষের অনন্তত্ব ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। সৃষ্টির আলোকের ধারে অন্ধকার, পুণ্যের ধারে পাপ বিধাতার সৃষ্টি কি না, জানি না, কিন্তু ইহা জানি, অনন্ত যদি আলোক, তবে অন্ধকারও অনন্ত; পুণ্য যদি অনন্ত, তবে পাপও অনন্ত। সকলের মধ্যেই অনন্তের বিশাল-বিস্তৃত আভাস পাওয়া যায়।

কোটী কোটী পরমাণু জমিয়া জমিয়া এই "সসাগরা" সদ্বীপা পৃথিবী সুসজ্জিত হইয়াছে; কোটী কোটী পরমাণু জমিয়া জমিয়া ঐ অনন্ত নক্ষত্র-জগৎ বিরচিত হইয়াছে। সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অনন্ত বালুকাপূর্ণ পুরুষোত্তমের সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সবই অনন্ত—সাগরে অনন্ত তরঙ্গরাশি এবং আকাশে চন্দ্র সূর্য্য অবিশ্রাম দিবারাত্রি কত শতাব্দী ধরিয়া অবিরত ছুটিতেছে। যাহা ভাবি, সবই অনন্ত। সাগরের কূল নাই; আকাশের কূল নাই,—সাগরতীরের অতলস্পর্শ বালুকা-রাশির কূল নাই, আকাশের নক্ষত্ররাশিরও কূল নাই। ভাবিলাম,—মানব-পরিবারের কূল নাই, মানব সম্প্রদায়ের কূল নাই। ভাবিলাম,—কূল নাই একটী বৃক্ষের, একটী নক্ষত্রের, এক গাছি তৃণের, একটী বালু-কণার, একটী মানুষের। যাহা ভাবি—সবই যেন অনন্ত। সব সীমা যেন অসীমে ধাবিত, অথবা অসীমে বিলীন;—সান্ত যাহা ছিল, সব যেন আজ অনন্ত হইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম এবং ডুবিলাম এবং বিস্ময়ে অনন্তের উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম করিলাম।

ভাই, তুমি পঞ্চভৌতিক প্রকৃতির সীমাকে ভালবাস, অসীম কিছুই দেখিতে পাও না? এই সকল কথার পর, একবার সীমার বিষয় চিন্তা করত দেখি। কিসের কূল আছে, কাহার অন্ত আছে? যাহা দেখিতেছ, উহা সব অনন্ত! পৃথিবীর কত বয়স হইয়াছে, তুমি জান না। পৃথিবীতে কত নদনদী, কত বৃক্ষ লতা, কত পাহাড় পর্ব্বত আছে, তুমি

জান না। পৃথিবীতে কত পরমাণু, কত জীব আছে, কত জীব মরিয়াছে, তাহা জান না। সন্ধ্যার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের বিষয় তুমি কিছুই জান না। জান কি বলত? তোমার জ্ঞান কতটুকু বলত? একটী পরমাণুর বিষয় ভাব, অকূল বিস্ময়ে ডুবিবে। জান কি যে, এত অহঙ্কার কর? একটী সামান্য মানুষের কথা ভাব, অবাক্ হইবে। পৃথিবীতে কত বেদ পুরাণ অভ্যুদিত হইয়াছে, কত যোগী ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন বা আছেন, সে কিছুই জান না। জান না, নিজকে নিজে, নিজের দেহে, নিজের মনে যাহা আছে, তাহাও তুমি জান না। কোথায় ছিলে, জান না; কোথায় চলিয়াছ, তাহাও জান না। তোমার লক্ষ্য কি, জান না; তোমার উদ্দেশ্য কি, জান না। কি জন্য আসিয়াছ, জান না; কি করিতেছ, তাহাও জান না। কল্য তোমার পরিণাম কি হইবে, তাহাও জান না। নিজের কথা স্থির চিত্তে নিজে ভাব, অবাক্ হইয়া যাইবে। কোন চিন্তার সীমা নাই, কোন কাজের পরিসমাপ্তি নাই। এইটুক ভাবিয়া ফেলিলেই চিন্তার শেষ হইবে, বলিতে পার না; এইটুক করিয়া ফেলিলেই হাতের কাজ সমাপ্ত হইবে, বলিতে পার না। ভাব, বুঝিবে, কোন কিছুরই শেষ নাই, সব যেন অনন্ত। অনন্ত ভিন্ন—আর অন্ত খুঁজিয়া পাইবে না। জ্ঞানের অনুসরণ কর, অন্ত পাইবে না, প্রেমের পথে চল, অন্ত পাইবে না। সান্ত যাহা, ঐ দেখ, তাহা মরিয়া গিয়াছে; এ রাজ্যে এখন যেন কেবল অনন্তেরই উদ্ভব হইয়াছে। সব ভুলিয়া, আত্মাকেও ভুলিয়া একবার অনন্তে ডুব দেখি, কি সুখ, বুঝিবে।

"আমি" বেটার দৌরাত্ম্যে পৃথিবী উচ্ছন্ন গিয়াছে। "আমার জ্ঞান, আমার ভক্তি আমার শক্তি, আমার মুক্তি।" "আমি করি" "আমি বলি"—চতুর্দ্দিকে এই রব! "আমি" সীমায় বদ্ধ থাকিলে, পৃথিবীর সবই সীমাবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কেননা, সীমার ভিতরে থাকিয়া অসীমকে দেখা যায় না। যখন "আমিত্ব" বিসর্জ্জিত হয়, তখন সব সীমা অন্তর্হিত হয়—ক্ষুদ্র দৃষ্টি অনন্তে তখন ধাবিত হয়। এই "আমি" কে, ভাই বলত? মানুষ কে? সান্ত কোথায়? আমিত্ব কোথায়? সবই যখন অনন্তে ডুবিল, তখন "আমিত্বও" বিসর্জ্জিত হইল। কাহার আমিত্ব ডুবিল? তোমার আমার? তাহা নহে। ঈশা যখন অনন্তে নিমগ্ন হইলেন, তখন উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "I and my father are one." শ্রীচৈতন্য যখন অচেতন হইয়া অনন্তে ডুবিলেন, তখন বলিলেন—"মুই সেই, মুই সেই।" শাক্য যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন নিরঞ্জনা তটে অনন্ত জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এমনই—এ দৃষ্টান্ত মানুষ দেখে না, মানুষ অহংময় সীমার ভিতরে থাকিতেই ভালবাসে। সে ডুবিয়াও, ফিরিয়া ঘুরিয়া, আবার অহং-প্রাচীরময় রাজ্যে উপস্থিত হয়। এক একবার সে যায় অনন্তপুরে, কিন্তু আবার ফিরিয়া গণ্ডির ঘরে প্রবেশ করে। ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা, ইহাই অন্ধকার, ইহাই সান্ত। এইখানেই সম্প্রদায়ের উদ্ভব, এই খানেই পাপ প্রলোভন, এইখানেই যশ মানের কুহক, এইখানেই বিবাদ বিসম্বাদ। এইখানেই দলাদলি রক্তারক্তি, এইখানেই পাপাসুরের রাজত্ব, এইখানেই সঙ্কীর্ণতা, অপ্রেম, ও কুজ্ঞান, এইখানেই সংসারাসক্তি। অহঙ্কার

নামক যে একটা সয়তান মানব পরিবারকে অনন্তের পথ হইতে সান্তের দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সয়তান এইখানেই বসবাস করে। সে মানুষকে বুঝাইয়া দেয়, আর কিছুই নাই, কেবল "তুমিই আছ!" "তোমার সমান নাহি আছে ত্রিভুবনে"—অহঙ্কারের শিক্ষা এইরূপ। অহং-পুরের দাস দাসী, ইহার চরণতলে বসিয়া পাপ-গরল পান করে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। সান্তেই আরম্ভ, সান্তেই পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির পরিণতি, এই সয়তান ইহা মানুষকে বুঝাইয়া দেয়। এই সয়তানের হাত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন, মায়া ও অবিদ্যার কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিকে বিশাল উদার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে—সম্প্রদায় নাই, দেশ নাই, রেখা নাই, দিন নাই, সব এক অবিনাশী অনন্ত শক্তিরই বিকাশ। তখন তাঁহারা দেখেন, সামান্য অবিনাশী জড় পরমাণুর ভিতরে এক অবিনাশী অনন্ত চিদ্‌ঘন আনন্দ শক্তি মূর্ত্তিমান। এখানে কেবল বিশ্বজনীন ভাব,—উদারতার পর উদারতা, মহা উদারতার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। যাহা দেখা যায়, সে সকল কেবল অনন্তের কথাই প্রকাশ করে। যাহার দিকে চাওয়া যায়, সে-ই এক অনমুমেয় অনন্তের আভাস দেয়। ফুল হাসে, পাখী গায়, নদী চলে, ঝরণা কুলকুল ধ্বনি করে—সবই সেই অনন্তের কথা প্রকাশ করে। সান্ত ভৌতিক প্রকৃতি যখন অনন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে—ভেদাভেদ যখন চলিয়া গিয়াছে, তখনই অনন্তের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। তখন মানুষ দেখে,—চন্দ্র সূর্য্য অনন্ত গগনে অনন্তেরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে; অনন্ত নক্ষত্র-জগৎ অনন্তের কীর্ত্তিই প্রচার করিতেছে, আর সেই সসাগরা পৃথিবী অনন্তের কথাই বিঘোষিত করিতেছে। এই উচ্চ ভূমিতে মানুষ যখন দাঁড়ায়, তখন মানুষ নিজশক্তির মূলে কেবল অনন্ত শক্তি অনুভব করিয়া দেবত্ব লাভ করে। তখন বিশ্বামিত্রের বাহুবল পরাস্ত হইয়াছে, বশিষ্ঠের বুদ্ধি বল হার মানিয়াছে, বাল্মীকির ধর্ম্ম ও চরিত্র বল স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া জগতে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে, অনন্ত পরিবার গঠনে সক্ষম হইতেছে।* অথবা খ্রীষ্ট তখন পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য "আমিত্ব" ক্রুশকাষ্ঠে বলি দিয়া অনন্তের পরিবার গঠনে সহায় হইয়াছেন, অথবা শাক্য কঠোর তপস্যায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অনন্তের কীর্ত্তি জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য অনন্তে ধাবিত হইয়াছিল, অনন্তেই তাঁহাদের কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তি অনন্তকাল থাকিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "Love thy enemy" শত্রুকেও ভালবাসিবে, এই উদার শিক্ষার পরও আবার খ্রীষ্টসমাজে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল কেন? অবিদ্যা এবং মায়া এবং অহং নামক দস্যুর পরাক্রম এ জগতে অজেয় বলিয়া। এখনও আমরা এই রাজ্যে বাস করিতেছি। আমরা বুঝি না, অনন্ত ধারণা করি না। আমরা নিশ্চিন্ত। আমরা উদাসীন। অহং-সেবাই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। সান্তের ক্রোড়ে আমরা সর্ব্বদা শয়ান। হায়, Physical force, Intellectual force ভুজবলে, বুদ্ধিবলে আমরা জগতে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর। আমাদের বশিষ্ঠ বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে

* বাল্মীকির জয়, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, প্রণীত, পাঠ কর।

ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন, ভাবিতেছেন; আর আমাদের বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, "বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি, বাকীটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।" কিন্তু এই সময় বাল্মীকি কাঁদিয়াই আকুল, দারুণ অনুতাপে অন্তরের সব ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন! জয় কাহার? বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যখন দেহত্যাগ হইল, তখন "ব্রহ্মা বাল্মীকিকে স্বর্গ যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারা-প্লুত নয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম, আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু! * * * এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মণ। যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে।" ইত্যাদি কথা বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মা বলিলেন— "নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ কর।" বাল্মীকি দেখিলেন, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান কণককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরন্ময় বপুঃ শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক বক্ত্র, অনেক নেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশিসূর্য্য নেত্রে দীপ্তহুতাশ বক্ত্র শরীর প্রভায় দিগন্ত-প্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ব্রহ্মাদি সকলে, মানব জীব জন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বিরাট মূর্ত্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ ত তুচ্ছপদার্থ. দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোহস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব
অনন্ত বীর্য্যোমিত বিক্রমস্তং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসিসর্ব্ব।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"বাল্মীকি! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাট স্বরে ধ্বনি হইল "জয়"*

যাহা বলিবার, শেষ হইয়াছে। সান্ত আর কিছুই নহে, অনন্তের সিঁড়ি। অথবা সান্ত আর কিছুই নহে, অজ্ঞান মানুষকে অনন্তে লইয়া যাইবার সহজ উপায়মাত্র। অনন্তই সান্তরূপে মানুষকে অনন্তে পৌঁছাইতেছে,—আকারের ভিতর দিয়া নিরাকারে, ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া মহতে লইয়া যাইতেছে। অনন্ত সাগরতীরে দাঁড়াও, কতকদূর দেখিতে পাইবে, তার পর আর দৃষ্টি চলিবে না। অনন্ত প্রসারিত আকাশের দিকে বা প্রান্তরের দিকে তাকাও, সীমা তোমার চক্ষুকে বাধা দিবে, সকল অংশ দেখিতে দিবে না। আকাশেও সীমা, প্রান্তরেও তোমার নয়ন সীমা দেখে! প্রকৃতপক্ষে যেখানে সীমা নাই, সেখানেও সীমা বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে, সমস্ত পদার্থই অনন্ত হইয়াও সীমাবদ্ধভাবে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ধীরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, অন্ত কিছুরই নাই, সবই অনন্ত, উহা মানুষের দৃষ্টি বা ধারণা শক্তির বাধামাত্র, অথবা মানুষকে অনন্তে পৌঁছাইবার সিঁড়িমাত্র। অহঙ্কার, মায়া, অবিদ্যা মানুষকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায়; কিন্তু যখন দিব্য জ্ঞান জন্মে, তখন সবই অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। অনুতাপানলে অহংকে ভস্ম করিয়া পাপী-বিমুক্ত বাল্মীকি অনন্ত তত্ত্ব পাইয়া বিধাতার জয় ঘোষণা করিয়া

* বাল্মীকি জয় ৯২, ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।

গিয়াছেন। আমরা যতদিন সেইরূপ অহং ভস্ম করিতে না পারিব, যতদিন মায়া ও অবিদ্যার উপরে উঠিতে না পারিব, ততদিন অনন্ত বুঝিব না, গণ্ডির মধ্যেই মরিব ও পচিব, অনাবিল অহেতুকী প্রেম ও পুণ্যের আস্বাদন পাইব না। যতদিন মানুষ অহঙ্কারের রাজ্যে বাস করে, ততদিনই সান্ত দেখে, সান্ত ভাবে; আর যখন অহংকে ভস্ম করে, আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়, তখনই অনন্তের ছায়া সর্ব্বঘটে বিরাজিত দেখিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হয়। অনন্তের আভাস যখন মানুষ পায়, তখন পাপদেহ ভস্ম করিয়া মানুষ উদার বিশ্বজনীন ধামে পৌছিয়াছে। তাহাই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ, তাহাই অবিদ্যা-বিমুক্ত মুক্তিধাম।

মঙ্গল লোক।

বিগত শ্রাবণ মাসে দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহ দেখিবার বিশিষ্ট সুযোগ গিয়াছে। রবি হইতে ৬ রাশি অন্তরে থাকাতে উহা সন্ধ্যাকালেই আকাশের পূর্ব্বভাগে উদয় হইত। এতদ্ভিন্ন, তখন মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটস্থ ছিল। এজন্য মঙ্গলের বিম্বও বড় দেখা গিয়াছিল।

প্রাকৃতিক জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনকারিগণের এরূপ সুযোগ শীঘ্র ঘটে না। বিগত শ্রাবণ মাসে মঙ্গল যেরূপ অবস্থিত ছিল, সেরূপ অবস্থান আগামী খ্রীঃ ১৯০৯ অব্দের পূর্ব্বে আর ঘটিবে না। সুতরাং উক্ত গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য আবার ১৬।১৭ বৎসর বিলম্ব হইবে।

পৃথিবীর কক্ষের বহির্দ্দেশে মঙ্গলের কক্ষ। প্রায় ৩৬৫ দিবসে পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। মঙ্গলও আপন কক্ষে থাকিয়া তদ্রূপ প্রায় ৬৮৭ দিবসে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী ও মঙ্গল, উভয়েই পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। এজন্য প্রায় ৭৮০ দিবস অন্তরে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটস্থ হয়।

কিন্তু পৃথিবী ও মঙ্গলের কক্ষপথ বৃত্তাকার নহে। বৃত্তাকার হইলে, সূর্য্য, পৃথিবী ও মঙ্গল এই ক্রমে যখনই সমসূত্রে অবস্থিত হইত, তখনই মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটস্থ হইত এবং ঠিক একই সময় অন্তরে পৃথিবী ও মঙ্গলের নিকট সমাগম ঘটিত। অধিকন্তু, তৎকালে মঙ্গল-বিম্বের ঔজ্জ্বল্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত না।

বস্তুতঃ, মঙ্গলের ও পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাভাষ। কিন্তু মঙ্গলের কক্ষ বৃত্তাভাষের কেন্দ্রবিভিন্নতা * পৃথিবীর বৃত্তাভাষের কেন্দ্রবিভিন্নতা অপেক্ষা অধিক। মঙ্গলের কক্ষের কেন্দ্রবিভিন্নতা .০৯৩। এজন্য কেবল এই কারণবশতঃ সূর্য্য হইতে মঙ্গল কখন বা ১৫॥০ কোটি মাইল, কখনও বা ১৩ কোটি মাইল দূরে থাকে। পৃথিবীর বৃত্তাভাষের কেন্দ্রবিভিন্নতা .০১৭ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পৃথিবী কখন ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ মাইল, কখনও বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল

* কেন্দ্রবিভিন্নতা—eccentricity.

দূরে গিয়া পড়ে। পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথের বাহিরে মঙ্গলের পথ। সুতরাং যখন সূর্য্য হইতে পৃথিবী বহুদূরে, কিন্তু মঙ্গল নিকটে থাকিয়া যথাক্রমে সমসূত্রস্থিত হয়, তখনই মঙ্গল, পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটস্থ হয়।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজ-বোধ্য হইবে। সূর্য্য, পৃথিবী ও মঙ্গল সমসূত্রে অবস্থিত হইলেই পৃথিবী ও মঙ্গলের দূরত্ব কম হইবে না। তাহার কারণ উপরে লিখিত হইয়াছে। খ্রীঃ ১৮৬৯ অব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী দিবসে উহারা সমসূত্রে আসে, কিন্তু তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গল প্রায় ৬॥০ কোটি মাইল দূরে ছিল। খ্রীঃ ১৮৭৭ অব্দের ৩রা সেপ্তেম্বর দিবসে উক্ত তিন গ্রহ সমসূত্রে অবস্থিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মঙ্গল ও পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৩॥০ কোটি মাইল ছিল। বিগত শ্রাবণ মাসে * পৃথিবীর ও মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ৩॥০ কোটি মাইল ছিল। শ্রাবণ মাস হইতে ৭৮০ দিবস পরে অর্থাৎ আগামী ১৮৯৪ অব্দে আবার সূর্য্য, পৃথিবী ও মঙ্গল যথাক্রমে সমসূত্র স্থানে আসিবে সত্য, কিন্তু তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গল প্রায় ৪ কোটি মাইল দূরে গিয়া পড়িবে।

পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্বানুসারে মঙ্গলের বিম্ব কখন বা ১৩ বিকলা আর কখনও বা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ হইয়া থাকে। উক্ত শ্রাবণ মাসে মঙ্গলবিম্বের পরিমাণ প্রায় ২৫ বিকলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সুতরাং খালি চক্ষুদ্বারা লোহিতাঙ্গ গ্রহকে বেশ বড় ও রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হইয়াছিল।

চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় মঙ্গল-বিম্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একাদশী কিম্বা দ্বাদশীতে চন্দ্রের কলা যেরূপ দেখায়, মঙ্গলের কলার হ্রাস তাহার অধিক হয় না।

দূরবীক্ষণ সহযোগে দেখিলে মঙ্গলের বিম্বের উপরিদেশ কতকগুলি উজ্জ্বল ও কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ প্রদেশে বিভক্ত দেখা যায়। বোধ হয় যেন পৃষ্ঠদেশ জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়াছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, উজ্জ্বল স্থানগুলি স্থলভাগ এবং কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলি জলভাগ।

পৃথিবীকে যেরূপ জলীয় বাস্পময় বায়ুরাশি বেষ্টন করিয়া আছে, জলীয় বাস্পময় বায়ুরাশি দ্বারা মঙ্গলগ্রহও তদ্রূপ পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর মেরুদ্বয় তুষারমণ্ডিত, মঙ্গলগ্রহের মেরুদ্বয়ও সর্ব্বদা তুষারাচ্ছাদিত বোধ হয়। হগিন্‌স প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মঙ্গলের রশ্মি বিশ্লেষণ দ্বারা জলীয় বাস্পের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। মঙ্গলের মেরুদ্বয়ে তুষার আছে, অনুমান করিবার কারণ এই যে, মঙ্গলের যে অর্দ্ধভাগে শীতকাল হয়, তখন সেই মেরুস্থিত শুভ্র পদার্থের আয়তন বর্দ্ধিত ও অপরার্দ্ধের শুভ্র পদার্থের আকার হ্রাস দেখা যায়। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের চিহ্ন সকল কখনও কখনও অল্প-কালের জন্য অস্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। বোধ হয়, তৎসমুদায় পৃথিবীর মেঘের ন্যায়, জলীয় মেঘ মালা।

মঙ্গলে জল, স্থল, বায়ু, মেঘ দেখিয়া তাহার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। খ্রীঃ ১৮৭৭ অব্দে, অধ্যাপক হল সাহেব

* ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা মতে ২১ শ্রাবণ দিবসে মঙ্গল ও সূর্য্যের অন্তর ৬ রাশি ঘটে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে মঙ্গল ও সূর্য্যের ৬ রাশি স্ফুটান্তর ১৭ শ্রাবণ দিবসে লিখিত আছে। গ্রহস্ফুটে তিন চারি দিবসের প্রভেদ ঘটিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

মঙ্গলের দুইটি চন্দ্র * আবিষ্কার করিয়াছেন। খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে ফারগুসন সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "পৃথিবীর আকারের পঞ্চমাংস মঙ্গলের আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে মঙ্গলের চন্দ্র থাকিলে, তাহা নিশ্চয়ই অতিশয় ক্ষুদ্র হইবে। এজন্যই তাহা দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় না।" মঙ্গলের নবাবিষ্কৃত চন্দ্রের ক্ষুদ্র আকারের সহিত উক্ত ভবিষ্যৎবাণীর বিশেষ্য ঐক্য দেখা যায়।

মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের চিহ্নাদির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সরল রেখা দেখা যায়। তৎসমুদায়ের অধিকাংশ উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। মিলান নগরবাসী জ্যোতির্ব্বিদ শিয়াপেরেলি এই সকল কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিয়া তৎসমুদায়কে 'খাল' বলিয়া অনুমান করেন। আবার খ্রীঃ ১৮৮১ অব্দের শীতকালে ঐ সকল রেখাকে তিনি এক একটার পরিবর্ত্তে দুইটা দুইটা দেখেন। ডাঃ তার্বি আবার সম্প্রতি সেই মত সমর্থন করিতেছেন। ইহাঁদের মতে রেখাগুলি 'কাটা খাল'।

কিন্তু যদ্যপি ঐ রেখাগুলিকে 'কাটা খাল' বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে তৎসমুদায়ের এত অধিক দৈর্ঘ্য থাকিবার কারণ বুঝা যায় না। স্থানে স্থানে এক একটা খালের প্রসার ১৪।১৫ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। আকারে, গুরুত্বে, বায়ুচাপে পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল অনেক ক্ষুদ্র। যদ্যপি পার্থিব মনুষ্যবৎ কোন প্রাণী মঙ্গলগ্রহে বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের আকার পার্থিব মনুষ্যের আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে কি? ক্ষুদ্র হইলে ১৪।১৫ মাইল চৌড়া খালের প্রয়োজন কি?

মঙ্গলগ্রহে আদৌ জলস্থলময় প্রদেশ আছে কি না, তাহারই নিশ্চয়তা নাই। সম্প্রতি 'লিক' নামক বিখ্যাত মানমন্দিরের জনৈক অধ্যক্ষ উজ্জ্বল স্থানগুলিকে জলভাগ অনুমান করিতেছেন। এইগুলিই স্থল বলিয়া অনুমিত ছিল, কিন্তু প্রকৃত জলরাশি দৃষ্ট হইলে কোন না কোন সময়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইবার কারণ কি?

বস্তুতঃ, এই সকল কথা, অনুমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জ্ঞানের সীমার বাহিরে গেলে কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কল্পনার সীমা নাই। একটি দুইটি বিষয়ে দুইটি দ্রব্যের সাদৃশ্য দেখিয়া একটির সহিত দ্বিতীয় দ্রব্যটির অন্যান্য শত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, ইহা কল্পনার প্রভাব মাত্র। অনেকে এইরূপ কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতে বড় সুখ পাইয়া থাকেন। মঙ্গলগ্রহে দেখা গেল, কৃষ্ণবর্ণ সরল ক্ষীণ রেখা আছে। রেখাগুলি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। মেরুদ্বয়ে তুষার আছে। সুতরাং কল্পনাদেবীর প্রসাদে তৎসমুদায় রেখা কাটা খালে পরিণত হইল। মনুষ্যবৎ কোন প্রাণী না থাকিলে খাল কাটে কে? সুতরাং মনুষ্যের সৃষ্টির প্রয়োজন। উত্তর দাক্ষণে খাল গুলি বিস্তৃত কেন? উত্তর—মেরুদেশস্থ জলরাশি নিরক্ষবৃত্ত মণ্ডলের গ্রীষ্মাক্লিষ্ট মনুষ্যের ব্যবহারের জন্য। খালগুলি ১৪।১৫ মাইল চৌড়া কেন? উত্তর—মঙ্গলবাসিগণের প্রচুর চাস আবাদ আছে, পানীয় জলের প্রয়োজন, খাল দিয়া

* চন্দ্র দুইটির নাম 'ফোবস' ও 'দিইমোস' রাখা হইয়াছে। ফোবসের ভ্রমণকাল ৭ ঘ ৩৯ মি ১৫ সে, দিইমোসের ৩০ ঘ ১৭ মি ৫৪ সে।

বাণিজ্য জন্য নৌকাদি গমনাগমনের সুবিধা হইবে। পার্শ্বে আর একটা খাল কাটিবার কি প্রয়োজন? উত্তর—একটা দিয়া কোন বাণিজ্যের নৌকাদি চলিবে, আর একটার জল অন্যান্য কার্য্যে আবশ্যক হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতঃ ফরাসীদেশীয় ফ্লামিরিয়ো ও ইংলণ্ডদেশীয় মৃত প্রকৃটর সাহেবদ্বয় এরূপ কল্পনার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। দুইটা 'খাল' বাস্তবিক আছে কি না, তাহাই অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, একটা রেখার পরিবর্ত্তে দুইটা দেখিবার কারণ দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র।

যাহা হউক, যখন মঙ্গলে মনুষ্যের বাস অনুমিত হইল, তখন প্রতিবেশীর সহিত আলাপ পরিচয় না করাটা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কোন ধনাঢ্য মার্কিণ রমণী মঙ্গলবাসী মনুষ্যগণের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কথাটা কতদূর সত্য, জানি না। তবে কেহ কেহ দুই একটা উপায় ব্যক্ত করিতেও ছাড়েন নাই। এক ব্যক্তি আফ্রিকাদেশের সাহারা মরুভূমিতে বালুকাময় উচ্চ প্রাচীর শ্রেণী রচনা করিতে বলিতেছেন। কেহ বা সাহারার ন্যায়, প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ দেশে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী রোপণ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিবার সঙ্কেত বাহির করিতেছেন। প্রাচীরই হউক, বৃক্ষশ্রেণীই হউক, তৎসমুদায় এরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে যে, তাহা দেখিয়া মঙ্গলবাসীগণ রচয়িতার সঙ্কেত বলিয়া তাহা মনে করিতে পারে। মঙ্গলের রেখাগুলিকে খাল মনে করিবার একটি কারণ এই, খালগুলি এরূপভাবে পরস্পর সংযুক্ত যে, দেখিলে বোধ হয় যেন মঙ্গলবাসিগণ কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে সমদ্বিভুজ ক্ষেত্র প্রভৃতি জ্যামিতির ক্ষেত্র সকল রচনা করিয়াছে, কল্পনা রাজ্যে বিচরণকারী, এই সকল লোকের মতে মঙ্গলবাসিগণের জ্যামিতিতত্ত্ব-সূচক খাল কাটিবার উদ্দেশ্য, পৃথিবীর মনুষ্যগণের সহিত মনোভাব বিনিময়। সুতরাং কথোপকথন করিতে হইলে, আমাদেরও জ্যামিতি শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া সঙ্কেত আবিষ্কার করিলে আমাদিগের কার্য্যেরও সুবিধা হইবে ও মঙ্গলবাসিগণও তৎসমুদায় সঙ্কেত সহজেই বুঝিতে পারিবে।

খালদ্বারা মঙ্গলের লোক সকলের মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা ব্যতীত কেহ কেহ মনে করেন যে, মঙ্গলবাসিগণ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে আলোক সঙ্কেত করিতেছে। বস্তুতঃ খ্রীঃ ১৮৯০ অব্দে যখন মঙ্গল পৃথিবীর নিকটস্থ হইয়াছিল, তখন জনৈক ফরাসী মঙ্গলের স্থান বিশেষের জ্যোতি পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দেখিয়া তাহা মঙ্গলবাসিগণের মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা বলিয়া মনে করেন। তবে আমাদেরও তদ্রূপ উজ্জ্বল তাড়িতালোক সাহায্যে সঙ্কেত করা আবশ্যক হইয়াছে। অবশ্য মনে করিতে হইবে যে, মঙ্গলবাসিগণের বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে।

কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ না করিয়া মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বৈধম্য আছে, দেখা যাউক। সদৃশ কারণে সদৃশ কার্য্য অনুমান করা যাইতে পারে। যদি জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা ভেদেই

পৃথিবীস্থ জীবগণের আকার প্রকার জীবনের প্রভেদ ঘটিয়াছে, স্বীকার করা যায়, এবং প্রাকৃতিক অবস্থাই যদি জীবগণের আবির্ভাবের একটি কারণও হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার যতদূর সাদৃশ্য থাকিবে, ততদূর পর্য্যন্ত সামান্যতঃ দৃষ্ট, এই অনুমানও সত্য হইবে।

পূর্ব্বে কয়েকটি সাদৃশ্যের বিষয় বলা গিয়াছে। এক্ষণে আর কয়েকটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। খগোলে রবিমার্গের (বা পৃথিবীর কক্ষের) অতি নিকটেই মঙ্গলের কক্ষ। বস্তুতঃ মঙ্গলের কক্ষ রবিমার্গ প্রতি ১ অংশ ৫১ কলা মাত্র অবগত। অর্থাৎ পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত পৃথিবীর কক্ষ প্রতি ২৩°২৭′ মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্ত তাহার কক্ষ প্রতি ২৪°২৫′ মাত্র অবগত।

সৌর জগতের যাবতীয় গ্রহের মধ্যে পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্য আছে, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ সার উইলিয়ম হার্শেল এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এ কথা সহসা অস্বীকার করা যায় না। এজন্যই মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য লোকের আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু দুইটি প্রধান বিষয়ে পৃথিবী মঙ্গলের বিসদৃশ। (১) সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে অন্তর, সূর্য্য হইতে মঙ্গলের অন্তর, তাহার প্রায় দেড়গুণ অধিক। (২) ৩৬৫ দিবসে পৃথিবীর বৎসর, ৬৮৭ দিবসে মঙ্গলের বৎসর পূর্ণ হইতেছে।

উপরি বর্ণিত দুইটি কারণবশতঃ মঙ্গলের জলবায়ুর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, সম্প্রতি গ্রীনিচ মানমন্দিরের মণ্ডর সাহেব তাহা বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য হইতে এখানে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইতেছে।

সূর্য্য হইতে মঙ্গলের অধিকতর দূরত্ব বশতঃ পৃথিবীর ১ বর্গ মাইল স্থানে যতটুকু তাপ ও আলোক পতিত হয়, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের ততখানি স্থানে উক্ত তেজের প্রায় তিন সপ্তমাংশ মাত্র পতিত হয়। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মঙ্গলের গড় উষ্ণতা দ্রবণাঙ্কের প্রায় ১৩০°।১৪০° শ নিম্নে। মঙ্গলগ্রহে উষ্ণ, শীত, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল নিশ্চয়ই আছে। মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্ত মণ্ডল নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ প্রদেশ। কিন্তু সেখানেও পৃথিবীর নিরক্ষ-প্রদেশে পতিত তাপের তিন সপ্তাংশের বেশী তাপ পড়িতে পারে না। পৃথিবীর ৬২ অক্ষাংশের স্থানসমূহ নিরক্ষমণ্ডলে পতিত তাপের তিন সপ্তাংশ প্রাপ্ত হয়। বায়ু ও জলের গতির দিক অনুসারে স্থান বিশেষের উষ্ণতার তারতম্য হইতে পারে সত্য। কিন্তু তাহাও বিচার করিলে দেখা যায় যে, মঙ্গলের সর্ব্বোষ্ণ নিরক্ষ প্রদেশের উষ্ণতা দ্রবণাঙ্কের নিম্নে। সুতরাং সমুদায় গ্রহের মধ্যোষ্ণতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কম।

দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গলের বায়ুরাশি পৃথিবীর বায়ুরাশি অপেক্ষা বিস্তর লঘু। পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল প্রায় ১/৯ লঘু। মাধ্যাকর্ষণবল তথায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের বলের পাঁচ অংশের দুই অংশ মাত্র। এজন্য মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ সমান হইলে, ক্ষীণ মাধ্যাকর্ষণ বল প্রযুক্ত বহু ঊর্দ্ধে বিস্তৃত আছে। মঙ্গলের বায়ুরাশির কণ কম হওয়াতে, পৃথিবীর মেরুমণ্ডলস্থিত ৪ মাইল উচ্চ কোন পর্ব্বতে

যেরূপ উষ্ণতা, মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্ত মণ্ডলে তদ্রূপ উষ্ণতা।

মঙ্গলে এত ভয়ঙ্কর শীত হইলে, তাহাতে জলের তরলাবস্থায় কিরূপে থাকা সম্ভব? সমগ্র গ্রহটি বরফে আচ্ছাদিত না হইয়া উহাতে জল স্থল তুষার মেঘ প্রতীয়মান হয় কেন? ইহার উত্তরে মণ্ডর সাহেব বলেন যে, মঙ্গলের গ্রীষ্ম আমাদের গ্রীষ্ম অপেক্ষা অনেক অধিক এবং শীতও আমাদের মত বেশী নহে। কারণ শীতকালেও মেরু সন্নিহিত তুষার রাশি ৪০।৫৫ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত মাত্র বিস্তৃত দেখা যায়। পৃথিবীতেও প্রায় এই রূপই দেখা যায়।

আর, যদ্যপি গ্রহের গুরুত্বানুসারে বায়ুরাশির পরিমাণের তারতম্য আছে, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের বায়ুচাপ আমাদের বায়ুমান যন্ত্রের ১১।১২ ইঞ্চের বেশী হয় না। এজন্য শতাংশিক তাপমানের ১০০ অংশে জল না ফুটিয়া ৪৬ শতে ফুটিবে। সুতরাং জলীয় বাষ্পের প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। রাত্রিকালে বাষ্প মেঘে পরিণত হইতে পারে। রাত্রিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে তাপ বিকীরণ প্রবল হইতে পারে না। সুতরাং উষ্ণতারও তাদৃশ হ্রাস হয় না। বস্তুতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালেই মঙ্গলে বেশী মেঘ দেখা যায়।

এই সমস্ত বিচার দ্বারা মণ্ডর সাহেব বলেন যে, পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের তাদৃশ সাদৃশ্য নাই। মঙ্গলের অল্প তাপ, লঘু বায়ুরাশি, বাতাসের বেগের মৃদুতা বিষয়ে পৃথিবীর সহিত অনৈক্য। পৃথিবীর সহিত শুক্রের সাদৃশ্য থাকাই সম্ভব। শুক্রের আকার, জড়সমষ্টি পৃথিবীর ন্যায়। শুক্রগ্রহের জলবায়ুর অবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর জলবায়ুর অবস্থার সদৃশ।

যাহা হউক, নানা মুনির নানা মত। মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে অতি যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। এই অল্পজ্ঞাত বিষয়কে ভিত্তি করিয়া কেবল অনুমান করিলে সকলই সম্ভব, সকলই অসম্ভব।

একটি কথা স্মরণ না করাতে এ বিষয়ে এত গোলযোগ ঘটিতেছে। আমার এক বন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন যে, চন্দ্রে মনুষ্য আছে কি না? মনুষ্য বলিতে, পৃথিবীতে যেরূপ মনুষ্য দেখা যায়, তদতিরিক্ত অপর কোন মনুষ্যের জ্ঞান আমাদের নাই। অপর কোন প্রকার 'মনুষ্যের' মনুষ্য নাম দেওয়া যাইতে পারে না। কোন মনুষ্য জল ও বায়ু অভাবে বাঁচিতে পারে না, আমরা ইহাই জানি। সুতরাং জল ও বায়ু হীন চন্দ্রে আমাদের ন্যায় জীবন-বিশিষ্ট মনুষ্য * থাকিতে পারে না, বলা যাইতে পারে।

* নব্যভারতে জনৈক "জ্ঞান-স্থির" লিখিত 'কিমাশ্চর্য্যম্' প্রবন্ধে লেখক এইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছেন। পৃথিবীর বৃদ্ধাবস্থায় ইহার প্রাকৃতিক ভূগোলের নিতান্ত প্রভেদ ঘটিবে। সুতরাং তখন এখনকার মনুষ্যের ন্যায় মনুষ্যের জীবিত থাকা অসম্ভব। জীবনধারণের কতকগুলি নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া কোন জীবকে জীবিত থাকিতে দেখা যায় না। যে মণ্ডলের মধ্যে মনুষ্যজীবন সম্ভব, তাহা অন্যান্য জীবের সহিত তুলনায় সঙ্কীর্ণ। জীববিজ্ঞানে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে, তখনকার মনুষ্যের অধিকতর জ্ঞানযোগে, এখন যাহা অজ্ঞাত বা অসম্ভব, তখন তাহা জ্ঞাত বা সম্ভব হইতে পারে সত্য। কিন্তু তাহাতেও একটু গোল আছে। সাংখ্যকার যে প্রকৃতি-বৈষম্যে জগৎ সৃষ্টি প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শক্তিবৈষম্যতত্ত্ব নামে ব্যাখ্যা করিতেছেন। পৃথিবীতে শক্তিবৈষম্য ঘুচিয়া শক্তির সমতাপ্রাপ্তি ঘটিতেছে। লয়ের আর একটি বিশিষ্ট কারণ শক্তির

মঙ্গল সম্বন্ধেও এই কথা। মঙ্গলের পৃষ্ঠ দেশের চিহ্ন সকল জল ও স্থল কি না, কে বলিতে পারে? আর জল স্থল ভাগ থাকিলেই যে মনুষ্য বাস থাকিবে, একথা স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক অবস্থাকে মনুষ্যাদি সৃষ্টির বিশিষ্ট কারণ বলিতে হয়। গ্রীণলণ্ড প্রভৃতি অতি শীতল স্থানেও মনুষ্যের বাস আছে সত্য, কিন্তু শৈত্যাধিক্য ব্যতীত আরও অন্যান্য প্রতিবন্ধক মঙ্গলে বর্ত্তমান। সুতরাং মঙ্গল গ্রহে চীন দেশের ন্যায় মনুষ্যের ঘন বাস কিম্বা চন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য-হীন কি না, একথার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে মঙ্গলে বা সূর্য্যাদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কে পার্থিব জীব ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার জীবের বাস আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

জ্ঞান ও প্রেমিক।

(জ্ঞান)

এ সংসার পণ্যশালা, শোভন বিপণি পূর্ণ,
হেথা মত্ত নর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য ল'য়ে, অসংখ্য বিপণি মাঝে
খোঁজে আত্ম পর।
কুহকী মানব ভাষা; অভিধান করে হেথা
মূল্য নিরূপণ;
ভাষার ছলনা শুধু; কাহার কি মূল্য হায়
বুঝেরে কজন?
মায়ার কাননে ভুলে, লইয়া উপলখণ্ড
ছেন
বিব্রত মানব,
স্ফটিকে হীরক ভুল, রুধিরে চন্দন, একি
ক্রীড়া অভিনব!
লয়ে শিরে রাশি রাশি, স্ফটিকের পণ্যজাত
চলে রে হাসিয়া,
পড়িয়া কঠিন ভূমে শতধা হলে যে চূর্ণ
আকুল কাঁদিয়া।
সকলি আপনা লয়ে যেথায় বিব্রত নর,
স্বার্থ অনুগামী
দেখেনাত সেথা কেহ,কেযে কোথা ভেঙ্গে সব
কাঁদে দিবা যামী।
মলিন ধরণী এ যে কেবলি ধূলায় পূর্ণ
দেখনা চাহিয়া?
কেন তবে কাঁদ নর পড়িয়া এ পান্থবাসে?
চলরে হাসিয়া।
রাশি রাশি ধূলি মাঝে ফোঁটা কত অশ্রু তব
অমনি শুকাবে;
ক্রমে বেলা বেড়ে যাবে, ধরণী উত্তপ্ত হলে,
চরণ দহিবে।
ভেঙ্গে গেছে? গেছে যাক্,অমন ভেঙ্গেই থাকে;
মুছ রে নয়ন,
আবার সাজায়ে ডালি, ব্যবসায় রঙ্গে মাতি
কর প্রাণ-পণ।

অপব্যয়। শক্তির সমতা প্রাপ্তি ও শক্তির অপাব্যয়ে ক্রমাগত ঘটিতে থাকিলে,পৃথিবীর লয় অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য সৃষ্টি অনাদি নহে, তবে ইহা অনন্ত হইবে কেন? আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানই আমাদের সম্বল। বৃদ্ধা পৃথিবীর সন্তানগণ শক্তিহীন হওয়াই সম্ভব। আমার উপরিউক্ত বন্ধু কল্পনা করিয়া কখন কখন ধ্রুবলোকে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করিয়া আসেন। তাঁহার ন্যায় লিঙ্গ-শরীর ধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার মনুষ্যাদির জীবনোপায় দেখিয়া আসিলে বৃদ্ধাজননীর ভবিষ্যৎ সন্তানগণের অবস্থার আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

(প্রেমিক)

কি বলিলে? ছি ছি! তুমি? প্রাণ লয়ে ব্যবসায়
শুধু শুধু তাই?
মলিন বাসনা ল'য়ে লাভের গণনা ছাড়া
আর কিছু নাই?
এ বিশাল ধরা তবে শুধু কিরে পণ্যশালা?
আর কিছু নয়?
পূত আকাঙ্ক্ষার নাম, শুধু কিরে স্বার্থখোঁজা
পণ্য বিনিময়?
থাক তবে থাক ওরা প্রাণের ব্যবসা লয়ে;
আমি যাই দূরে;
কি কায সাজায়ে ডালি স্ফটিকের পণ্য দিয়ে?
ম'রে ঘু'রে ঘু'রে?
আমার নিসর্গ আছে; বিশাল বিমান তলে
আছে তারাকুল
বসন্তের উষা আছে; শরতের ইন্দু অই
ফুটাতে শিঁউল।
ব্যবসা জানে না ওরা, আপনা বিলায়ে সুখী
আমি সেই সনে
আপনা মিশায়ে দিয়ে ভাবের মদিরা পিয়ে
ফুটিব গগনে।
দিবসে তারার মত গগনে অদৃশ্য রহি
বিলাব আপনা;
কি কায সে বিনিময়ে লভিয়ে আধেক প্রাণ?
নাহিক কামনা।
প্রাণের জলধি সেই, রবে চির শান্তি পূর্ণ;
ক্ষুদ্র আশা ভয়
করিবে না কভু তারে এতটুকু তরঙ্গিত;
রব আত্মময়।

(জ্ঞান)

ভাবের মোহেতে ভুলে, প্রেমিক! বুঝনা তুমি
নাহিক কামনা?
দেখ তব আঁখি খুলি, কল্পনার নিদ্রা ত্যজি
(ওযে) আত্ম প্রতারণা।
হা প্রেমিক! অন্ধ তুমি সর্ব্বদা মুদিয়া আঁখি
দেখ নাহি জ্ঞান;
"চাহি না," "চাহি না" বল, ভেবে দেখ ও যে তব
শুধু অভিমান।
না হ'লে এখনো কেন কেঁপে উঠে দেখে কার
মৃদুল নয়ান।
বহিলে নিশ্বাস শুধু, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে
তোমার পরাণ?
আপনা খুঁজিয়া দেখ, আধখানা প্রাণ ল'য়ে
কেহ সুখী নয়।
প্রণয়ের বিনিময়ে, লভেছিলে কৃতজ্ঞতা
লভনি প্রণয়!
তাই তুমি যেতে চাও, ধরণী কঠিন ব'লে;
কি লভিবে হায়?
জ্বলিবে যেথায় যাও, বাসনার ও অনল
সহস্র শিখায়।
নিসর্গ, নিসর্গ, ব'লে, কল্পনা মদিরা পিয়ে
লভিবে কি ফল?
নিভাইতে ও অনল, ঢালিবে না কোথা কেহ
এক বিন্দু জল।
তাই বলি উঠ পুনঃ, মুছিয়া স্মৃতির দাগ;
সাজাও বিপণি।
দুদিনে ভুলিবে সব, ব্যবসায় রঙ্গে নাচি,
হাসিবে পরাণী।

প্রেমিক

চাহিনে হাসিতে আমি, অশ্রুজল থাক মোর
অনন্ত নৈরাশ
পুরোহিত হাত বাঁধা? আত্মার মরণ সে যে,
দাসত্বের ফাঁস।
চাহি না, চাহি না জ্ঞান, কল্পনা আমার থাক
থাক অশ্রুজল;
স্মৃতির সমাধিতলে, চিরদিন দিব পূজা
নহে তা বিফল
প্রেমিক শ্মশানবাসী, পাগল শিবের মত;

কিবা ক্ষতি তায় ?
প্রেমিকের প্রাণ হায় নহেরে বিব্রত শুধু
লাভ গণনায়।
সংসারের তুলাদণ্ডে প্রেমিক হৃদয় তুমি
কর পরিমাণ ?
প্রেমিকের আত্মা কিরে পারেরে বাঁধিতে হেথা
তুচ্ছ ধরা জ্ঞান ?
কল্পনা কারেরে বল ? বুঝ না বুঝ না তাই
"বল অনুমান" ;
বণিকের তুচ্ছ ভাষা প্রকাশিতে নারে ; সেযে
নীরব ধেয়ান।
অমূল্য রতন আশে, গভীর জলধি তলে
ডুবিয়া ডুবিয়া
লভিনি তাই কি হায়, কুড়ায়ে উপলখণ্ড
যাইব ফিরিয়া ?
এত শুধু পান্থবাস, দুদিনে ফুরাবে সব
এর পর পারে
দেখিব আবার খুঁজে, অনন্ত জীবন ভরি
মিলে কিনা তারে।
অত্যুচ্চ শিখরে অই রবির কিরণ জালে
জ্বালিছে রতন
দুরারোহ গিরি অই, বিপদ সঙ্কুল তবু
করি আরোহণ
দেখি কভু পারি কি না, উঠিতে শিখর দেশে
লভিতে তাহারে !
চরণ স্খলিত হবে ? ক্ষতি লাভ কিবা তায় ?
মরিব পাথারে ?
এ মরণ জীবনের নব বসন্ত প্রভাত
নূতন চেতন
নির্ভীক নির্ভীক এই প্রেমিকের আত্মা কভু
ডরে না মরণ।

শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

দার্শনিক যুগ ঃ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিক অবস্থা ও স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা।

"পিতা জাতিভ্রষ্ট হইলে পরিত্যাজ্য, মাতা পরিত্যাজ্য নহেন।"

"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণে পূজ্য, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা। শতগুণে পূজ্য এবং মাতা, পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়া হন।" (বশিষ্ঠ ১৩শ, ৪৭ ও ৪৮)

হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রে মাতার জন্য এতদূর সম্মান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্যাপি প্রত্যেক হিন্দু তদনুসারে চলিয়া থাকেন।

মহাকাব্য যুগের বিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে, রমণীগণ দর্শনশাস্ত্রে প্রজ্ঞা ছিলেন। গার্গী বাচকনবী জনকরাজার সভাস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী জনক পুরোহিত স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। দার্শনিক যুগেও যে বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে মহিলাগণের অধিকার ছিল, মেগস্থিনিস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

বহুবিবাহ প্রথা ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। তবে যাহার পুত্র জন্মে নাই, তাহার পক্ষে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহের বিধি ছিল। আপস্তম্ব স্পষ্ট বলিতেছেন ;—

"১২। যদি কাহারও স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে সমর্থ ও ইচ্ছুক হয় এবং তাহার পুত্র জন্মে, তবে তাহার পক্ষে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ নিষিদ্ধ।

"১৩। কিন্তু স্ত্রী উপরোক্ত দুই বিষয়ে বঞ্চিত হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পূর্ব্বে স্বামী দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে। (২য়. ৫, ১১)

স্বামী উন্মত্ত, ক্লীব, জাতিভ্রষ্ট বা মৃত হইলে, স্ত্রী পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করিতে পারে। (বশিষ্ঠ ১৭শ, ২০) যে যে কারণে স্বামী স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা বৌধায়নোক্ত একটী প্রাচীন সূত্রে দেখা যায়।

"দশম বর্ষে বন্ধ্যাকে, দ্বাদশবর্ষে কন্যা-প্রসবিত্রীকে এবং পঞ্চদশবর্ষে মৃতবৎসা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি মুখরা, তিনি অবিলম্বে পরিত্যজ্যা।" (বৌধায়ন ২য়, ২, ৪, ৬)

মুখরাকে পরিত্যাগের কথা কেবল ধমক মাত্র, কাজে পরিণত করার জন্য নহে। ঐ কথাটি বাদ দিলে, দেখা যাইবে, পুত্র কামনা ভিন্ন স্ত্রী পরিত্যাগ-বিধির অন্যতর কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পুত্রার্থেও স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে, এরূপ ব্যবহার ভারতে কখন প্রশ্রয় পায় নাই। অদ্যাপি এরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিলেও স্বামী প্রথম স্ত্রীকে স্বগৃহেই রাখেন। সূত্র সময়েও এই ব্যবহারই ছিল। যথেষ্ট কারণ ভিন্ন স্ত্রী পরিত্যাগ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

"যে ব্যক্তি অকারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে গর্দ্দভের চর্ম্ম উল্টাভাবে পরিয়া সপ্তগৃহে এই বলিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে যে, "পরিত্যক্ত কলত্র হতভাগ্যকে ভিক্ষা দাও।" এইরূপ ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যে তাহাকে ছয় মাস জীবন ধারণ করিতে হইবে। আপস্তম্ব (১ম, ১০, ২৮, ১৯)

আধুনিক বহুবিবাহ ব্যবসায়িগণের এক বার এই শাস্ত্রীয় দণ্ড ভোগ করা কি উচিত নয়?

মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিবাহের উল্লেখ আছে, সূত্র সাহিত্যে তাহা প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ৬ প্রকারের বিবাহের উল্লেখ করেন ;—

১। ব্রাহ্ম-বিবাহে—পিতা উপনীত বরকে জলসেক পূর্ব্বক কন্যা-সম্প্রদান করেন।

২। দৈববিবাহে—পিতা সালঙ্কৃতা কন্যাকে যজ্ঞস্থলে পুরোহিতকে সম্প্রদান করেন।

৩। আর্ষবিবাহে—পিতা গাভী বা বৃষের পরিবর্ত্তে কন্যাকে দান করেন।

৪। গান্ধর্ব্ববিবাহে—অনুরাগ বশতঃ স্বামী স্বয়ং কামিনীকে গ্রহণ করে।

৫। ক্ষাত্র বা রাক্ষসবিবাহে বর কন্যার বন্ধু বান্ধবকে রণে হত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করে।

৬। মানুষ বা আসুর বিবাহে বর কন্যার পিতার নিকট হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া লয়।

আপস্তম্বও ৬ প্রকারের বিবাহের কথা বলেন, কিন্তু তিনি ক্ষাত্রকে রাক্ষস ও মানুষকে আসুর বিবাহ বলেন। তাঁহার মতে প্রথম তিন প্রকারের বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দেব, আর্ষই প্রশস্ত।

গৌতম ও বৌধায়ন ৮ প্রকার বিবাহের উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত ছয় প্রকার; অধিকন্তু প্রাজাপত্য ও পৈশাচ। প্রাজাপত্যে "উভয়ে সহধর্ম্মাচরণ কর" এই কথা বলিয়া পিতা বরকে কন্যা সমর্পণ করেন। ইহা প্রশংসার্হ বিবাহ। স্ত্রীলোকের সংজ্ঞা রহিত করিয়া, তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া বিবাহ করাই গর্হিত পৈশাচ বিবাহ।

সূত্রযুগে স্ববর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বশিষ্ঠের মতের স্বগোত্রে বা প্রবরে মাতৃকুলে ৪ পুরুষ ও পিতৃকুলে ৬ পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (৮ম, ১, ২) আপস্তম্বের মতে মাতৃ-পিতৃকুলে ৬ পুরুষের মধ্যে

স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। (২য়, ৫, ১১, ১৫ এবং ১৬) কিন্তু বৌধায়ন মাতুল বা পিতৃ-স্বসার কন্যাকে বিবাহ করিতে বলেন। (১ম, ১, ২, ৪)

সম্ভবতঃ বৈদিক ও মহাকাব্যযুগে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না। দার্শনিক যুগেও ঐ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। বশিষ্ঠ বলেন,—

৬৭। যৌবন প্রাপ্ত হইলে কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিবেন।

"৬৮। তিন বৎসর পরে তিনি স্ববর্ণে বিবাহ করিতে পারেন।

"৬৯। নিম্নলিখিত শ্লোকও উদ্ধৃত হয়; "যদি পিতার অনবধানতায় উপযুক্ত বয়সের পরে কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে যেমন অসময় গুরুদক্ষিণা দিলে, দাতার ধর্ম্ম নষ্ট হয়; সেইরূপ কন্যাদাতা পিতাকে পতিত হইতে হয়।"

৭০। রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ কর্ত্তব্য। এজন্য নগ্নাবস্থায় অর্থাৎ বাল্যকালেই বিবাহ বিধেয়, কেননা রজস্বলা হইলেই কন্যা পিতাকে পাতিত করে।

৭১। যদি কোন বালিকা, স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে ঋতুবতী না হয়, তবে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ সঙ্গত।" (বশিষ্ঠ ১৭শ অধ্যায়।)

এই প্রকারে, কখন কখন, দার্শনিক যুগে অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও, বালবিধবা-দিগের পুনর্ব্বিবাহ বিধেয় ছিল।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে সূত্রে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানা-ভাব বশতঃ তাহার অল্পই আমরা উদ্ধৃত করিব। বশিষ্ঠ বলেন যে, মৃতদেহ দাহান্তে তাহার আত্মীয়বর্গকে স্নান করিতে হইবে। দক্ষিণ মুখে স্নান করিতে হইবে, কেননা দক্ষিণই পিতৃগণের নিকট পবিত্র। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইতে হইবে এবং অনাহারে বা স্বল্পাহারে তিন দিবস কাটাইতে হইবে। ঊর্দ্ধ ও নিম্নে ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড সম্বন্ধ থাকে। মৃতাশৌচ সপিণ্ডগণের ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। (৪র্থ, ১১—১৭) শ্রাদ্ধ সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিজনবর্গ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। অথবা সমগ্রবেদ পারগ, বিদ্বান, ধর্ম্মজ্ঞ ও নিষ্পাপ এক জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও চলিবে। (১১শ, ২৯)

গৌতম বলেন, সপিণ্ড সম্বন্ধ ঊর্দ্ধে ৫ম অথবা ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে এবং মৃত্যুর পরে সপিণ্ড ব্রাহ্মণকে ১০, ক্ষত্রকে ১১, বৈশ্যকে ১২ দিবস এবং শূদ্রকে একমাস অশৌচ পালন করিতে হয়। পুত্রাভাবে সপিণ্ডগণে শ্রাদ্ধ করিতে পারে। তিনি ৯ জন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের অনুমোদন করেন (১৪শ, ১—৫, ১৩ এবং ১৫শ ৭—৯)

বৌধায়নের মতে বৃদ্ধ পিতামহ, পিতা, নিজে, ভ্রাতৃগণ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইহারাই সপিণ্ডের অন্তর্গত (১ম, ৫, ১১, ৯) আপস্তম্বের মতে ৬ পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডত্ব থাকে (২য়, ৬, ১৫, ২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিধি এই-রূপ। নিম্নে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থধর্ম্মের বিষয় কিছু বলিতেছি।

বাল্যকাল অতীত হইলেই শিক্ষার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মণকুমার ৮ হইতে ১৬, ক্ষত্রকুমার ১১ হইতে ২২ এবং বৈশ্যকুমারের ১২ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন আবশ্যক। শিক্ষার্থে এরূপ দীক্ষিত হইয়া ছাত্রকে শিক্ষকের গৃহে ১২, ২৪, ৩৬ বা ৪৮ বৎসর থাকিতে হইত। যাহার এক বেদ অধ্যয়ন উদ্দেশ্য, তাহার ১২; যাহার দুই বেদ অধ্যয়ন উদ্দেশ্য, তাহার ২৪; যাহার তিন বেদ উদ্দেশ্য, তাহার ৩৬, এবং

যাহার চারিবেদ উদ্দেশ্য, তাহার ৪৮ বৎসর থাকিতে হইত। নৃত্য, গীত ও ভোগস্পৃহা রহিত হইয়া সুশীল ও বিনীতভাবে তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে দণ্ডহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইত। ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য গুরুর নিকট সমর্পণ করিতে হইত, গুরুর আহারান্তে আহার করিতে হইত। বনে গিয়া কাষ্ঠাহরণ করিতে হইত এবং সকালে বিকালে জল আনয়ন করিতে হইত। প্রত্যহ প্রাতে তাহাকে যজ্ঞবেদি সংমার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিতে হইত, গৃহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে পবিত্র কাষ্ঠ প্রদান করিতে হইত এবং সন্ধ্যার সময় অধ্যাপকের পদ ধৌত করিয়া দিতে হইত এবং যে পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা না হয়, সে পর্য্যন্ত পদদেশে কর সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ করিতে হইত। এই প্রকারে হিন্দুছাত্র বিনীতভাবে ও বিনা ব্যয়ে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিতে যত্ন করিত।

/ বলা বাহুল্য, মুখে মুখেই শিক্ষা হইত। ছাত্র শিক্ষকের হস্ত ধরিয়া শিক্ষকের দিকে মন রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিত "মহাত্মন্! পাঠ করুন।" অবিলম্বে ঋক্‌বেদের গায়ত্রী পঠিত হইত—বেদ শিক্ষার প্রারম্ভেই উহা পঠনীয় ছিল। (গৌতম ১ম, ৫৫, ৫৬) প্রত্যহই নূতন পাঠ পঠিত হইত। ছাত্রকে শিক্ষকের গৃহকার্য্য দেখিতেও হইত, নিজের শিক্ষার বিষয়ও মনোযোগ করিতে হইত।

পাঠ সমাপনান্তে ছাত্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইত। তৎপরে বিবাহ করিয়া স্নাতক হইয়া গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হইত। পাঠান্তে স্নান করিলেই স্নাতক বলা যায়। তৎপর প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গৃহাগ্নিতে আহুতি প্রদানকে অগ্নিহোত্র বলিত। সকল সূত্রকারই অতিথি সৎকার ও শিষ্টাচার গার্হস্থ ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। অতিথিসৎকারই স্থায়ী প্রাজাপত্য যজ্ঞ। (আপস্তম্ব ১১শ, ৩, ৭, ১)

ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থাশ্রম ভিন্নও আর দুটী আশ্রম ছিল—ভিক্ষু ও বৈখানস। সংস্কৃত সাহিত্যে এই চত্তরাশ্রমে জীবনকেই পূর্ণ জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। আপস্তম্ব অতি প্রাচীন সূত্রকার নহেন। তিনিও বলেন "এই চারে (চত্তরাশ্রমে) যাহার কালাতিপাত হইয়াছে, সে-ই মুক্ত" (২য়, ৯, ২১, ২) কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, শিক্ষান্তে মানব চত্তরাশ্রমের যে কোন আশ্রমেই থাকিতে পারে। (৭ম, ৩) বৌধায়ন এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের পরে অবিলম্বে ভিক্ষুক হইতে পারা যায়, (২য়, ১০, ১৭, ২) ভিক্ষু ও বৈখানসের নিয়মাবলী সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ভিক্ষুক মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক, গৃহ সম্পত্তি বিরহিত হইয়া কষ্টে উপবাসে এবং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া, একবস্ত্রে বা চর্ম্মাচ্ছাদনে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবেন। তাঁহাকে কোন ক্রিয়াকাণ্ড করিতে হইবে না, কিন্তু বেদ পাঠ করিতে হইবে এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার চিন্তায় নিরত থাকিতে হইবে। (বশিষ্ঠ ১ম অধ্যায়) বৈখানসের বনে বাস, ফলমূলাহার, সাধু জীবন পরিচালন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় যজ্ঞানলে আহুতি দান কর্ত্তব্য। (বশিষ্ঠ ১০ অধ্যায়)

গৃহস্থাশ্রম আশ্রম-শ্রেষ্ঠ এবং ইহার কর্ত্তব্যও অনেক; কেননা, ভিক্ষু ও বৈখানস জাতীয় জীবন সংগঠন করে না—

জাতীয় জীবনের অবলম্বন গৃহস্থাশ্রম। "যেমন ছোট বড় সকল নদ নদীর আশ্রয় স্থান সমুদ্র, তেমন সকল আশ্রমীর আশ্রয় স্থান গৃহস্থ।" (বশিষ্ট ৮ম, ৫)

গৃহস্থের জন্য ৪০টী সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে (গৌতম ৮ম, ১৪—২০) নিম্নে তাহার নাম উল্লেখ করিতেছি।

গার্হস্থ্য সংস্কার—(১) গর্ভাধান (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯—১২) বেদপাঠ জন্য ব্রত চতুষ্টয় (১৩) স্নান (শিক্ষা সমাপনান্তে) (১৪) বিবাহ (১৫—১৯) পিতৃগণ, মানবগণ, প্রেতগণ, দেবগণ ও ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার উদ্দেশ্যে পঞ্চ যজ্ঞ।

গৃহ যজ্ঞকে পাকযজ্ঞ বলে—(১) অষ্টক শীতকালে (২) পার্ব্বন পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় (৩) শ্রাদ্ধ (৪) শ্রাবণী, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় (৫) অগ্রহায়ণী, অগ্রহায়ণ মাসে (৬) চৈত্রী, চৈত্রমাসে (৭) অশ্বযুগী, আশ্বিন মাসে।

শ্রৌতযজ্ঞ দ্বিবিধ (১) হবির্যজ্ঞ—তণ্ডুল, দুগ্ধ, মাখম, মাংস ইত্যাদি দেয়। ২য় সোম যজ্ঞ—সোমরস দেয়। হবির্যজ্ঞ সপ্তবিধ, সোমযজ্ঞও সপ্তবিধ।

হবির্যজ্ঞ (১) অগ্ন্যাধান (২) অগ্নিহোত্র (৩) দশপূর্ণ মাস (৪) অগ্রায়ণ (৫) চাতুরমাস্য (৬) নিরূধ পশুবন্ধ এবং (৭) শ্রৌত্রামণী।

সোমযজ্ঞ—(১) অগ্নিষ্টোম (২) অত্যগ্নিষ্টোম (৩) উক্থ্য (৪) ষোড়াসী (৫) বাজপেয় (৬) অতিরাত্র এবং (৭) আপ্তর্যাম।

গৃহস্থের জন্য ঈদৃশ ৪০টি কর্ত্তব্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পুণ্য ও সাধুতাই স্বর্গ লাভের উপায় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শিষ্টাচার, সৎকর্ম্ম, পবিত্রতা, নির্লোভ এবং নিবৃত্তি, এই অষ্টবিধ সৎগুণের উল্লেখ গৌতমে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি উক্ত ৪০টী আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, কিন্তু উক্ত অষ্টবিধ সৎগুণে ভূষিত নহে, তাহার পরমাত্মার সহিত সম্মিলন বা স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব।

"কিন্তু যে ৪০টী আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের মাত্র কয়েকটী করিয়াছে, কিন্তু সৎগুণ বিরহিত নহে, তাহার ব্রহ্ম ও স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভবপর (৮ম—২৪ এবং ২৫)

গৌতম নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করিয়া গৃহস্থধর্ম্মের শেষ মীমাংসা করিয়াছেন।

"৬৮। সদা সত্য কহিবে।

"৬৯। আর্য্যোচিত আচরণ করিবে।

"৭০। ধার্ম্মিককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে।

"৭১। পবিত্র হওয়ার নিয়ম অবলম্বন করিবে।

"৭২। বেদপাঠে আনন্দ বোধ করিবে।

"৭৩। জীব হিংসা করিবে না, নম্র কিন্তু দৃঢ় হইবে, রিপুগণকে বশে রাখিবে এবং বদান্য হইবে।

"৭৪। যে স্নাতক উপরোক্ত নিয়মে চলিবে, তাহার পিতা মাতা মুক্তিলাভ করিবেন, পিতৃগণ স্বর্গলাভ করিবেন এবং সন্তানগণ নিরাপদ হইবে। তাঁহার স্বর্গচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। (৯ম)

বশিষ্ঠও বলিতেছেন ;—

"৩। চরিত্রহীনকে বেদবেদাঙ্গ পবিত্র করিতে পারে না ; পক্ষী যেমন পক্ষ উদ্গম হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, বেদও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়া যান।

"৪। যেমন স্ত্রীর সৌন্দর্য্য অন্ধপতির নিকট নিষ্ফল, সেইরূপ বেদবেদাঙ্গ ও যজ্ঞ, চরিত্রহীনের পক্ষে নিষ্ফল অর্থাৎ স্বর্গদায়ক নহে।

"৫। কোন ধর্ম্মপুস্তকেই ধূর্ত্তকে মুক্ত করিতে পারে না। কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যক্তি "বেদ" এই দুইটী অক্ষর পাঠেও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। (৬ষ্ঠ)

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মধু-নিশীথে

কি মধু যামিনী !
সুদূর তটিনী-বুকে   চন্দ্রিকা ঘুমায় সুখে,
বিহ্বলা বিবশা যেন নবোঢ়া-কামিনী।
তর-তর থর-থর বন-উপবন,
সঙ্গীতে কাঁপিছে যেন চিত্রের মতন।

বিস্মিত নয়নে,
ঢল-ঢল পূর্ণ-শশী   সুনীল আকাশে বসি,
খুঁজিতেছে ধরণীর পাতি-পাতি যেন—
এ পূর্ণ জগত-মাঝে অপূর্ণতা কেন ?

ল'য়ে তরু-লতা-পাতা-চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা,
ধরণী নিশ্বাসি কহে,   কপোলে শিশির বহে,
'কোথা রসে মহারাসে সে শ্যাম-রাধিকা !'
কোথা—কোথা—কোথা !

২

কোথা প্রেম, কোথা প্রীতি, সে কল্পনা, স্বপ্ন,
স্মৃতি,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই জাগরণ,
নয়নে নয়নে সেই চির-অন্বেষণ !

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, কি অশ্রান্ত মহা-
ভ্রান্তি !
শুকায় না—ফুরায় না কি সুধা-নির্ঝর !
জনমে নাহিক শেষ কি কাব্য-সুন্দর !

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে, নরকের কোলাহলে
সেই এক আশীর্ব্বাদ, দেবগল-হার !
সাধনার চিরধন, জন্ম-মৃত্যু-দ্বার !

হায়, প্রিয়ে, হায়,
কই কই সে মিলন—লতিকার আলিঙ্গন,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়,
পাকে পাকে ভাঙ্গে চিত্ত, তবু কি আনন্দনিত্য,
রোমে রোমে যেন মত্ত সমুদ্র গড়ায় !

কই সেই সুথ-স্থির, সে মহান, সে গম্ভীর,
অনন্ত আকাশ সম আপনায় লীন ?
সে আগ্রহ, সে নিগ্রহ,   সে যন্ত্রণা অহরহ,
শত-রবি শশী মরে— ভ্রূক্ষেপ-বিহীন !

কই সে করুণ-স্পর্শে   শত স্বর্গ জাগে হর্ষে
কই সে ভ্রূভঙ্গে শত-নরক সৃজন ?
ধরণী লোটে না পায়,   ভাগ্য অচেতন প্রায়,
জীবনে জাগে না আর সহস্র জীবন !

৪

কবি-যোগী-ঋষি ল'য়ে সে প্রেম উধাও হ'য়ে
পলায়েছে স্বর্গে কিম্বা নন্দনে নির্ব্বাণে !
ভূত-দেহ আছে পড়ি,   পিশাচের বেশ ধরি
আমরা কি নৃত্য করি এ অমা-শ্মশানে !

ল'য়ে তার শুভ হাসি করি টীকা রাশি রাশি
প্রাণ-গত অশ্রু ল'য়ে বাদ-প্রতিবাদ ;
নিশ্বাস প্রশ্বাস ধরি   অশ্লেষ-বিশ্লেষ করি,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে হেরি শঠতা-প্রমাদ

ভালবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি,
এ অনন্ত সানুভূতি খেয়ালের নয় ;
বহু স্বার্থ-আত্ম-ত্যাগে, বহু জপে-তপে-যাগে,
বহু ধৃতি-ক্ষমা-ব্যগ্রে প্রেম সমুদয়।

ভালবাসা—দেবভোগ্য, মুমূর্ষুর দৈবারোগ্য,
অদৃষ্টের প্রসন্নতা, বিরিঞ্চি-কৌস্তভ ;
সে কারণ-সিন্ধুপায়ী নহে এত ক্ষণস্থায়ী,
চোখে চোখে মিলিতে যে হিমাঙ্গ-নীরব !

বল, প্রিয়ে, বল,
নহে প্রেম—ইহা কাম, বিধাতা সদাই বাম,
তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-ক্ষেপণ ;
রাগে-মানে বেঁচে র'য়ে, ম'রে যায় তৃপ্ত হ'য়ে,
বিরক্তি-ভ্রুকুটী স'য়ে চুম্বনে মরণ।

এ প্রাণের গলি-ঘুজি কৌতুকে ভ্রমিয়া বুঝি,
আশা-সাধ-মায়া-তৃষা দু-দণ্ডে পড়িয়া,
সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের সম,
ফেলে দিলে তৃপ্ত কিম্বা তাচ্ছিল্য করিয়া।

নীলাকাশ-শশী-রবি—অতি পুরাতন ছবি,
তাই তায় নাহি পড়ে ভুলিয়া নয়ন ;
তমান্ধ খনির তলে ক্ষুদ্র মণিকণা জ্বলে,
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া তার দুষ্প্রাপ্যে যতন।

বুকের কাছেতে তবে টানিতে কি নাই ভবে ?
হৃদয় কাহারো কাছে খুলিতে কি নাই ?

অন্ধ-কুতূহল-ডোরে সারাটা জগত ঘোরে,
প্রত্যক্ষ ফেলিয়া তাই অপ্রত্যক্ষে চাই !
কল্পনায় মূর্ত্তি এঁকে, অথবা চাকিতে দেখে,
আজীবন ভক্তিভরে প্যারি পূজিবারে ;
অজ্ঞান কৃষক মত ছুটিবারে অবিরত
ইন্দ্রধনু পিছে পিছে যেতে স্বর্গ-দ্বারে !

৬

তবে—
শত ক্ষেরে প্রাণ ঢাকি অন্ধকারে ব'সে থাকি ;
অহো, একি কপটতা—মাঙ্গল্যে সন্দেহ !
নগ্ন প্রাণে, নগ্ন দেহে, শিশু আসে ভব-গেহে,
কেন রবি-শশী-চোখে ধরা করে স্নেহ ?

দিবা-পাশে অন্ধকার, উপভোগে শ্রান্তি-ভার,
পূজা পরে বিসর্জ্জন জগত-নিয়ম ;
প্রণয় জগদতীত— যত দাও নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা, নাহি ধারা ক্রম।

যত জ্যোস্না ঝ'রে পড়ে, তত চাঁদ শোভা ধরে,
বিলালে—ছড়ালে প্রেম কোটিগুণে বাড়ে।
নায়ক মশানে যায় তবু প্রিয়াগুণ গায় ;
মৃতদেহ প'চে যায় নায়িকা না ছাড়ে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

রায়তের সুখে জমীদারের মঙ্গল

বা

হরগৌরী বিবাহ

জমীদারদিগের রাজত্ব সংস্থাপন করিতে হইলে, তাঁহাদিগের হারাণ ধন পুনর্লাভ করিতে হইলে, আমি বলিয়াছি, ফিচেলি জমীদারী বুদ্ধি প্রথমেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গোমাস্তা ও আমলাগণও যাহাতে ফিচেল শঠ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। অত্যাচারী ঘুঁসখোর গোমস্তা ছাড়াইয়া দিতে হইবে। ভাল লোক গোমাস্তা রাখিতে হইলে, উৎকোচ প্রথা রহিত করিতে হইলে, গোমাস্তাগণকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া উচিত। জমীদার গোমাস্তাদিগকে এখন ৫৲ বা ১০৲ বা ১৫৲ বেতন দেন। এখন একজন খানসামার বা বেহারার তোলা বেতন ৬৲। একজন

ভদ্রলোকের কখনও ৫৲ বা ১০৲ টাকাতে চলিতে পারে না। যখন তাহাকে তুমি ৫৲ বা ১০৲ দিতেছ, তখনই তুমি প্রকারান্তরে তাহাকে ঘুঁস লইয়া বা চুরি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিখাইয়া দিতেছ, দুর্ব্বল প্রজার অর্থ শোষণ করিতে প্রবোধ দিতেছ। তুমি যখনই একজন গোমাস্তাকে ৫৲।১০৲ টাকা দিয়া নিযুক্ত করিলে, তখনি তুমি একটী চোর বা ডাকাইত প্রস্তুত করিয়া তোমার মহালে প্রবেশ করাইলে। তহশীলদার সদ্ব্যক্তি হইলে যে টাকা তোমার তহবিলে জমা হইত, তহশীলদার চোর বলিয়া সে টাকা আত্মসাৎ করিবে, অর্থাৎ সহজ ভাষায় চুরি করিবে। আর তহশীলদার সদ্ব্যক্তি হইলে প্রজাকে যে টাকা দিতে হইত না, তহশীলদার প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাকে সে টাকা দিতে বাধ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ নানাপ্রকার, জুলুম জবরদস্ত করিয়া, তহশীলদার তাহা আদায় করিবে। জমীদার, তোমার মহলে, তোমার নিয়োজিত তহশীলদার, তোমার প্রশ্রয়ে, তোমার আশ্রিত পুত্রবৎপাল্য অনাথ প্রজার উপর নিত্য উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, দিনে দ্বিপ্রহরে একরকম ডাকাইতি করিতেছে—তাহার জন্য তুমি কি দায়ী নহ, সমাজের নিকট, সরকার বাহাদুরের নিকট, ঈশ্বরের নিকট তুমি কি দায়ী নহ? কেন ভদ্র গোমস্তা চোর হইল, ডাকাইত হইল? তুমি তাহাকে কম বেতন দিয়া প্রকারান্তরে তাহার চুরির ও ডাকাইতির পোষকতা কর বলিয়া সে এই পাপকার্য্য করে। এখানে একটী ঘটনা বলি। আমার অধীনে একটী তহশীলদারের বিরুদ্ধে কালেক্টার সাহেবের নিকট অভিযোগ হয়। অভিযোগ এই যে, গোমাস্তা রায়তদিগের নিকট "উপরি" অর্থাৎ হিসাবানা ও পার্ব্বণী বলিয়া পয়সা লয়। আমাকে এই বিষয়ের তদন্ত করিতে হয়। গোমাস্তা যে উপরি লইয়াছিল, তাহা অবশ্য প্রমাণ হইল। এবং তাহা আমাকে রিপোর্ট করিতে হইল। কিন্তু যাহাতে গোমাস্তার লঘু দণ্ড হয়, কালেক্টার সাহেবের নিকট তাহার চেষ্টা করিলাম। কালেক্টার সাহেব প্রথমে তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমি জানি যে প্রায় সমুদয় গোমস্তাই পার্ব্বণী হিসাবানা ইত্যাদি বলিয়া রায়তদিগের নিকট খাজনার উপর আরও কিছু কিছু আদায় করে। ইচ্ছা করিলে তাহা ধরিয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু যতদিন তাহাদিগের বেতন ৫৲ বা ৮ বা ১০ টাকা থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের উপরি আদায় আপনাদিগের নিকট ধরিয়া দিয়া, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কেন না, আপনারা উহাদিগকে দেশীয় জমীদারের মত নিতান্ত কম বেতন দিয়া উপরি-পাওনা আদায় করিতে বাধ্য করিতেছেন। আমি প্রার্থনা করি যে, আপনি এ বিষয় বোর্ড অব্ রেভেনিউকে জানাইয়া যাহাতে ইহাদিগের সঙ্গতভাবে বেতন বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করুন। কালেক্টার এই কথা শুনিয়া সেই গোমাস্তার দণ্ড কতকটা লঘু করিয়া দিলেন, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন উপায় করিতে পারিলেন না। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে যে সকল জমীদারি আছে, তাহার কার্য্যপ্রণালী আমাদিগের দেশীয় জমীদারগণের পক্ষে আদর্শস্থল

হইবে, ভরসা করা যায়। সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন জমীদারিতে শীঘ্রই গোমস্তাদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া যাহাতে সদ্ব্যক্তি সকল গোমাস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং পরোক্ষেও অসৎ গোমস্তা কর্তৃক প্রজাপীড়ন না হয়, তদ্বিষয় আশু ব্যবস্থা হইবে, আশা করি।

অধিকাংশ নাবালগের "ম্যানেজার" বাঙ্গালী। তাঁহারা সাহেবদিগের অপেক্ষা গোমাস্তা এবং রায়তদিগের অবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাল অবগত আছেন। এবিষয় তাঁহারা যদি কর্তৃপক্ষীয়দিগকে ভাল করিয়া জানাইয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে গোমস্তাদিগের সংস্কার এবং রায়তদিগের মুক্তি হইতে পারে।

গোমাস্তাদিগের বেতন কম থাকাতে কেবল যে রায়তদিগের উপর অত্যাচার হয়, তাহা নহে। তাহাতে জমীদারেরও নানা দিক দিয়া ক্ষতি হয়। যে ঘুঁস দেয়, সে কোন উপকার পাইবে বলিয়া দেয়। যে জমী রাম বার্ষিক ২০৲ কুড়ি টাকা খাজনা স্বীকার করিয়া পাট্টা লইতে প্রস্তুত, শ্যাম গোমাস্তা মহাশয়কে ১০৲ দশ টাকা ঘুঁস দিয়া চিরকালের জন্য ১৫ পনর টাকা মাত্র খাজনা দিবার সর্ত্তে অনায়াসে পাট্টা লইল। গোমাস্তার তাহাতে লাভ হইল ১০৲ দশ টাকা মাত্র। কিন্তু জমীদারের কত ক্ষতি হইল দেখুন। ২০ বৎসরের খাজনা ধরিলে ৫×২০=১০০৲ একশত টাকা লোকসান হইল।

আবার মোকারিম মণ্ডল একটা জমীর উচিত খাজনা এবং সেলামি দিয়া জমীদারের নকট পাট্টা লইতে চাহে। কিন্তু গোমাস্তাকে তাহার উপর আর কিছু দিতে প্রস্তুত নহে। গোমাস্তা প্রথমতঃ তাহার প্রার্থনা জমীদারের গোচর করিল না। মোকারিম স্বয়ং পত্র দ্বারা দরখাস্ত করিয়া জমীদারের নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইল। জমীদার গোমাস্তা ও মোকারিমকে তলব করিলেন। গোমোস্তা বলিল, "মোকারিম বড় বদমায়েস; যে জমি আছে, তাহারই খাজনা সহজে দেয় না, প্রজা বিগড়াইয়া দেয়, এবং সে জমীদারের শত্রুপক্ষের লোক।" জমীদার স্বয়ং প্রজার সকল অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন না। মোকারিম কি রকম লোক, বিশেষ জানেন না। সুতরাং গোমাস্তার স্তোকে ভুলিলেন।

সদরের কোন আমলা মোকারিমকে বলিল যে "আমাকে কিছু দে, আমি জমীদার বাবুকে বুঝাইয়া তোকে জমীটা দেওয়াইব।" মোকারিম এইবার কিছু ঘুঁস দিল। জমীদার বাবুর সদর কাছারীতে কিছুদিন হাঁটাহাটি করিল। কিন্তু গোমাস্তার বিরোধিতায় শেষে নিরাশ হইল। মোকারিম ন্যায্য খাজনা ও সেলামী দিতে স্বীকার হইয়াও জমীও পাইল না, তাহার উপর, বুদ্ধিমান জমীদার গোমাস্তাকে বলিয়া দিলেন, "মোকারিম যখন বদমায়েস ও আমার প্রজা বিগড়াইয়া দিতেছে, তখন উহাকে তুমি শাসন করিয়া দিবে। আমি এত করিয়া বলি, প্রজা শাসিত রাখিবে, তোমরা কেন তাহা কর না"—গোমাস্তাত এই হুকুমই চাহে। গোমাস্তা গ্রামে গিয়া মোকারিমকে ডাকাইল, ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে বলিল—"তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে ডিঙ্গাইয়া জমীদারের নিকট গিয়াছিলি, কই জমী পাইলি না? দেখ, তোর ভিটে এখন

ঘুঘু চরে কি না।" এবং অবাচ্য ভাষায় মোকারিমকে অনেক গালি দিল। মোকারিম ভীত হইল, অনেক অনুনয় বিনয় করিল, গোমাস্তার পায় ধরিল। কিন্তু গোমাস্তা বলিল "দে ২০৲ কুড়ি টাকা জরিমানা। তাহা হইলে তোকে মাপ করিতে পারি।" মোকারিম তাহা দিতে পারিল না। গুণনিধি গোমাস্তা তাহার গরু পাউণ্ডে দেওয়াইতে লাগিল। পাউণ্ড-ওয়ালার সহিত গোমাস্তার বখরা আছে। এক সনের খাজনা বাকী পড়িতে পড়িতে চারি কিস্তির সুদ, অথবা "ড্যামেজ" ধরিয়া বাকী খাজনার নালিশ করিয়া দিল। ওঠবন্দি আবাদি জমীর মধ্যে ভাল জমীটুকু আর একজন প্রজাকে বিলি করিয়া দিল। তাহাতে গোমাস্তার কিছু লাভও হইল। মোকারিম বেচারা এখন বড়ই নিরুপায়; বুঝিল, জলে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। তজ্জন্য এক দিন নিশীথে স্ত্রী পুত্র লইয়া, গরু কয়টী খেদাইয়া, গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এবং আদালতের বিনা সাহায্যে এই এক রকম 'ইন্‌সলভেন্সি' লইয়া, অন্য কোন জমীদারের আশ্রয় পাইয়া আপাততঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। এদিকে মোকারিম যে জমীর নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিল, তাহাত পড়িয়া থাকিলই, তাহার উপর মোকারিমের দরুণ দখলি বাস্তু জমী এবং মাঠাল জমিও পড়িয়া থাকিল, "পতিতে"র ঘরে জমা ওয়াসীল বাকীতে ভুক্ত করা হইল। জমীদারের যে দ্বিবিধ ক্ষতি হইল, তাহা জমীদারের হুঁস নাই।

আবার, আর একস্থানে গদাচাঁড়াল একটা জমী চোরা দখল করিতে আরম্ভ করিল। হালসালা গোমাস্তাও তাহা জানিতে পারিল। গোমাস্তা গদাকে ধরিল। সে জমীর খাজনা বার্ষিক ১৬৲ টাকা। গদা সেই জমীর জন্য হালসালা ও গোমাস্তাকে বৎসর তিন টাকা করিয়া ঘুঁস দিতে স্বীকার হইল। গোমাস্তা সেই জমীর খাজনা হিসাবে মোটেই লিখিল না। জমা ওয়াশীল বাকীতে জমীটা পতিতের ঘরে সন সন লিখিতে লাগিল। গোমাস্তার যথা লাভ ৩৲, জমীদারের ক্ষতি আপাততঃ বৎসর ১৩৲। জমীদার অনেক বৎসর এই চোরা দখল ধরিতে পারিলেন না; পরে, যখন ধরিলেন, গদা খাজনা দিতে অস্বীকার। জমীদার নালিশ করিলেন। জবাব দিল, সেই জমী "মালের" বা সকর নহে, তাহা লাখেরাজ বা নিষ্কর। জমীদার বাবু হারিলেন।

ঘুঁস পাইয়া গোমাস্তা হালসালা ও আমিনে যোগ করিয়া জমীদারের নিজের একজাই জরীপে চিঠায় অনেক স্থানে মালের বা সকর জমী লাখিরাজ বা নিষ্কর লিখিয়া থাকে। এবং একটী জমীতে অতিরিক্ত জমী ভুক্ত করিয়া দেয়।

এইরূপে গোমাস্তা অসদ্ব্যক্তি হওয়াতে জমীদারের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই সকল ক্ষতি পরোক্ষে হয় বলিয়া নির্ব্বোধ জমীদার তাহা বুঝেন না। প্রত্যক্ষে কর্ম্মচারীদিগের কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে তাঁহার কষ্ট হয়। বেতন বৃদ্ধির জন্য সামান্য ব্যয়বৃদ্ধি স্বীকার করিলে যে মোটের উপর তাঁহার আয়ের বৃদ্ধি হইবে, গোমাস্তা ধর্ম্মপথে থাকিবে, প্রজারা সুখে থাকিবে, প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া

নিজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা স্থূলবুদ্ধি জমীদার কবে যে বুঝিবেন, বলা যায় না।

গোমাস্তা প্রভৃতি আমলাদিগের উপরি পাওনার আর এক উপায়, ফৌজদারি মোকদ্দমা বাধান। সকলেই জানেন, ফৌজদারি মোকদ্দমায় পুলিশকে ঘুঁস না দিলে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়। এই ঘুঁস গোমাস্তার হাত দিয়া অনেক সময় দিতে হয়। চতুর গোমাস্তা ঘুঁস দিল ১০৲ দশ টাকা, খরচ লিখিল ৪০৲। এই খরচ কিছু যাচাই করা যায় না। এইরূপে জমীদারের মোকদ্দমার বাজেখরচ প্রকৃত পক্ষে হইল ১০০৲, কিন্তু গোমাস্তা মিছা খরচ লিখিয়া লইল ৪০০৲। তাহার পর হয়ত বিপক্ষগণ অধিক ঘুঁস দিয়া বা অন্য কোন রকমে পুলিশকে বাধ্য করিয়া, অথবা বিচারের বিচিত্র গতিতে জয় লাভ করিল। ফৌজদারি মোকদ্দমায় গোমাস্তার লাভ না থাকিলে, হয়ত এই বিবাদ আদৌ হইত না, বা হইলেও আপোষেই মিটিয়া যাইত, জমীদারের চারি শত টাকা মোটেই লাগিত না।

গোমাস্তাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলে, ভাললোক গোমাস্তা পাওয়া যাইবে। ভাল লোক গোমাস্তা হইলে জমীদারীর আয় ক্রমশঃ বাড়িবে। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু কিছু কাল অতীত না হইলে এই আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ততদিন জমীদারের ঘর হইতে কিছু টাকা লাগিবে। আর প্রজাদিগের উন্নতির জন্য জমীদারগণকে বৎসর বৎসর কিছু টাকা ব্যয় করিতে হইবে। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট যেমন খাসমহলে, আদায়ের শতকরা ১২৲ টাকা করিয়া প্রজা ও জমীদারীর উন্নতি প্রভৃতির জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন, জমীদারগণেরও সেই রকম একটা ব্যবস্থা করা উচিত। জমীদারগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, গোমাস্তার বেতন বৃদ্ধি এবং প্রজার ও জমীদারীর উন্নতির জন্য যে ব্যয় করিবার প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা কোথা হইতে আসিবে? ইহার জন্য জমীদারের নিজের এবং নিজের পরিবারের সুখ সচ্ছন্দের জন্য যে টাকা এখন ব্যয় করা হইতেছে, তাহা কি কমান আবশ্যক হইবে? না, এরূপ দুরূহ কার্য্যের প্রয়োজন নাই। এখন জমীদার মামলায় যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা মোকদ্দমায় ব্যয় না করিলে, অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু জমীদারগণ আবার জিজ্ঞাসা করিবেন, বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে মোকদ্দমা না করিলে বিবাদের মীমাংসা হইবে কিসে? বিবাদ মীমাংসা হইবে সালিসীতে। এই সালিসী সম্বন্ধে আমি "মামলায়মরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এখানে এই বলা আবশ্যক যে, সালিসী প্রথা পুনঃপ্রচলিত করার জন্য জমীদারী পঞ্চায়েৎ সভা হইতে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার অনেকগুণ অধিক চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। উকীলগণ আমাদিগের দেশে অতি ক্ষমতাশালী শ্রেণীর লোক। সালিসী প্রথা প্রচলিত হইলে অনেক উকীলের অন্নের অসংস্থান হইবে; সুতরাং উকীলগণের স্বার্থে কণ্টক পড়িবে। এজন্য উকীলগণ অনেকেই মনে মনে সালিসী বিচারের বিরোধী। তাহার পর কোর্ট ফি বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় আছে, আর বর্ত্তমান মোকদ্দমা প্রণালী ইউরো-

পীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগের আইন আদালত সঙ্কুচিত করিয়া সালিসীর যে সম্প্রসারণ করিবেন, তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহারা নিজের দেশে অদ্যাবধি সালিসী বিচার পথের রেখাপাত পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। আবার এখন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের নিকট সাহেবরা যাহা করেন, তাহাই ভাল। তাঁহারা মোকদ্দমাতে তত দোষ দেখেন না। সুতরাং (১) উকীলদিগের বিরোধিতা, (২) গবর্ণমেণ্টের ঔদাস্য, (৩) এবং দেশীয় লোকের ইংরাজ প্রথার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা, এই তিনটী বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু যে জ্বলন্ত উৎসাহ, যে কঠোর ত্যাগস্বীকার, যে প্রতিভাপ্রদীপ্ত মস্তিষ্ক, যে ঘনীভূত স্বদেশপ্রেম এই বিঘ্নত্রয়কে পরাজিত করিতে পারে, তাহা কোথায়? জানি না, হয়ত ধুঁইয়া ধুঁইয়া প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে। যাহা হউক, আবার বলিতেছি, জমীদারী পঞ্চায়েত যে শুভকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন,তাহার জন্য আমাদিগের একান্ত ধন্যবাদের যোগ্য।

আমাদিগের দেশে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, বেহার জমীদারদিগের সভা প্রভৃতি, জমীদার ও রায়ত উভয়ের যাহাতে মঙ্গল হয়, এ সম্বন্ধে প্রায়ই বড় চেষ্টা করেন নাই। জমীদারী পঞ্চায়েত তাহা করিতেছেন। তাই বড় আহ্লাদ হয়। জমীদারদিগের সভাতে প্রজার মঙ্গলের জন্য কোনও ধারাবাহিক চেষ্টা না হওয়া কত লজ্জার বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যেমন একদিকে প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, জমীদারের সভা হইতেও তেমনি অপরদিক হইতে জমীদারদিগের শিক্ষায়, উপদেশে, অর্থে প্রজাদিগের হিতের জন্য চেষ্টা করা হউক। যে সকল প্রজাপীড়ক জমীদার আছেন, ভাল জমীদারদিগের সমবেত ঘৃণার দ্বারা ভাল জমীদারদিগের একবাক্য বলের দ্বারা, তাহাদিগকে শাসন করা হউক। জমীদারে রায়তে, বা জমীদারে জমীদারে, বিবাদ হইলে যাহাতে জমীদারের সভাতে নীত হইয়া তাহা নিরপেক্ষভাবে মীমাংসিত হয়, তাহার বিহিত সতেজ চেষ্টা হউক। জমীদারগণের প্রতিনিধি সভা কেবল কলিকাতায় বসিয়া কাজ না করিয়া বৎসরে একবার করিয়া প্রতি জেলার সদরে যাইয়া সেখানে কাজ করুন। কেবল নিজের স্বার্থ কোলে লইয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। এখন জমীদার রায়তের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষায় জমীদারের মঙ্গল ও মুক্তি।

আর এক কথা। এখন কোন সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে, যাহার দখল নাই, প্রমাণের ভার তাহার উপর। এই আইনটীতে দেশে ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। এই আইন একেবারে উঠাইয়া দেওয়াতেও অনেক অসুবিধা আছে। তবে কোন কোন অংশে ইহার সংশোধন হইতে পারে। যখন নদীতে নূতন চর পড়ে, তখন তাহার দখল করিবার জন্য প্রায়ই একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আইন পরিবর্ত্তন করিলে হয়ত অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। যখনই কোন নূতন চর পড়িবে, তখনই গবর্ণমেণ্ট তাহা দখল করিবেন। এবং যে যে পক্ষ ঐ চর দাবি করেন, গবর্ণমেণ্ট প্রমাণাদি লইয়া যাহার দাবি প্রমাণ হয়, তাহাকে দখল দেওয়াইবার

আইন করিলে, বোধ হয় অনেকগুলি দাঙ্গা কমিতে পারে। এইরূপে অন্যান্য আইন কতক সংশোধন করিয়া মোকদ্দমা কমাইতে পারিলে জমীদারের অনেক মামলা খরচ বাঁচিয়া যাইবে; ইহাকে একরকম আয় বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে।

উপসংহারে বলি,—জমীদারগণ, নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন না। আর মিছা সুখস্বপ্নে কাল হরণ করিবেন না। আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিলে ইহলোকেই ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। আর কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে প্রজারুধির-লিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগ সকল উপভোগ করিলে আপনাদিগকে ইহলোকেই নরক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুঃখী লোকের দীর্ঘনিশ্বাসে, অনাথিনীর অশ্রুনীরে, প্রপীড়িতজনের অভিসম্পাতে, কখনও কাহারও মঙ্গল হয় নাই, কখনও কাহারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। পাপসাগর মন্থন করিয়া কেবলমাত্র দুঃখ বা নিপাত হলাহলই উদ্ভূত হইতে পারে, সুধামৃত কখনই উত্থিত হইতে পারে না। পীড়নে, পাপে সুখ নাই, শান্তি নাই, পরিত্রাণ নাই, মুক্তি নাই। প্রজার রক্ত শুষিয়া হয়ত তোমার জমীদারীর কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, অবোধ জমীদার, তাহা দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছ, কিন্তু পাপের মহাব্যাধিতে তোমার আত্মা যে পচিত ও গলিত হইতেছে, তাহার সংজ্ঞা নাই। প্রাণের পুত্র মরিল, ঘরে হাহাকার উঠিল, তাহাতেও সংজ্ঞা নাই। অঙ্গহীন হইলে, তাহাতেও চৈতন্য হইল না। অসহনীয় অত্যাচারে প্রজারা চালিত হইয়া একদিন বিষম গুপ্ত প্রহার দিল, তাহাতেও পাপের ঘোর ভাঙ্গিল না। প্রজারা গুপ্তাঘাতে প্রাণ নাশ করিতে পারে, এই ভয় দিবানিশি মনে—তাহাতেও অত্যাচারী জমীদারের সুবুদ্ধি হইবে না!

আমি বলিতেছি, ইহা নিতান্ত সত্য কথা, ক্ষুধার্ত্ত শিশুগণ কাতরাইতেছে, ক্লান্তা অনাহারক্লিষ্টা মাতাগণ, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, কাঁদিতেছে, নিরুপায় দরিদ্রগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, তাহাদিগের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভাই, ঈশ্বর আছেন, ধর্ম্ম আছে, ন্যায় আছে, যাহার যাহা হক্ পাওনা তাহাকে তাহা দিতে হইবে, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া, জীবনের শেষ হিসাবে, তাহাকে দিতে হইবে। দরিদ্রদিগের পাওনা টাকা সময় থাকিতে না দিলে, ভাই, ভগবানের নিকট যখন হিসাব নিকাশ হইবে, তখন অনেক টাকার দায়ে পড়িবে, বাড়ী ঘর দুয়ার বিক্রয় করিলেও তখন আর নিষ্কৃতি পাইবে না। তাই বলি, দিন থাকিতে হিসাব মিটাইয়া ফেল। ঐ দেখ নরককুণ্ডে অত্যাচারী ধূর্ত্ত পাষণ্ড পাপীদিগের জন্য নরকের অগ্নি গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। তুমি ভাবিতেছ যে, আমার টাকা আমি যদি গরিবদিগকে না দেই, তাহাতে আবার পাপ কি? অবোধ মনুষ্য! সংসারের পাপ পুণ্য ব্যতীত, নিজের কর্ম্মফল ব্যতীত আর যে কিছুই তোমার নহে, তাহা কি জান না? মূঢ় ধনী, তুমি কি জান না, তুমি ধনের অছি মাত্র। তোমার হস্তন্যস্ত ধনের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রকৃত ধনস্বামীর নিকট, সেই রাজাধিরাজ বিশ্বপতির নিকট, তুমি দায়ী। ধন যদি তোমার হইবে, তাহা হইলে মৃত্যুর সময় তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া

যাইতে পার না কেন? জাহ্নবীর তীরে, ঐশ্বর্য্য বিভব সকলই পশ্চাতে ফেলিয়া, কেবল একাকী চিতাতে আরোহণ করিতে হয় কেন? "আমার আমার" এই মোহতেই আমরা মরিলাম। যাহা আমার নহে, তাহা ছাড়িয়া, যাহা আমার তাহা লইলাম না। দূরে, বহু দূরে যাইতে হইবে; পাথেয়ের উপায় কিছু করিলাম না। ধনিগণ! অনিত্য ছার অর্থের বিনিময়ে, নিত্য, অক্ষর, প্রাণরক্ষক, পুণ্য পাথেয়, এইবেলা কিনিয়া লও। অগণ্য নিরপরাধী দরিদ্রলোক না খাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবে, আর ধনিগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইয়া, সুখস্বপ্নে ধনরাশি ধনাগারে স্তূপীকৃত করিবে, ইহা কখনও বিধাতার ব্যবস্থা নহে। ইহা অধর্ম্মের, পাপের, শয়তানের উপদ্রব।

ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। তাহার বিজ্ঞান ও সাম্যবাদের দুন্দুভি ভারতে নিনাদিত হইতেছে। ইউরোপের বিজ্ঞান ভারতে অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে; শিল্পের উন্নতি করিয়া কল কারখানা খুলিয়া দরিদ্রদিগকে কাজ দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যেও বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের সাম্যবাদ, ইউরোপের প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলে, বর্ত্তমান দুস্তর দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সভ্য বৈজ্ঞানিক, ইউরোপের অবস্থা দেখ। সেখানে প্রকৃতির উর্ব্বরতার, দেবী বসুধার ধনপ্রসবিনী শক্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; জড়জগতের গূঢ় তত্ত্ব ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়া মনুষ্যের ক্ষমতা অপূর্ব্বভাবে দিন দিন বাড়িতেছে। সেখানে একদিন একজনের মনে এমন এক অদ্ভুত চিন্তা উদ্ভাসিত হইল যে, তাহার বলে স্বয়ং অগ্নিদেব লৌহঘোটক রূপ ধারণ করিয়া, বাষ্পফেণ উদ্গার করিতে করিতে লৌহবর্ম্মে অবিরাম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে এবং অহরহ মানবাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। আবার একজন এমন একটী তাড়িততত্ত্ব প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে ইন্দ্রের ইরম্মদ, ভীষণতা পরিহার করিয়া, চারুহাসিনী চপলার বেশে সন্দেশবাহী বহন করিয়া, নিমেষে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। জড়জগতের অদ্ভুত গূঢ় রহস্য যেমন দিন দিন উদ্ভাবিত হইতেছে, তেমনি যন্ত্রযোজনা কৌশলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ধন উথলিয়া পড়িতেছে। তথাপি দানহীনের দৈন্যদশা ঘুচিতেছে না কেন? তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকা কাঙ্গালের কাতর ধ্বনিতে কোলাহলময় কেন? সেখানেও সোসিয়ালিষ্ট (Socialist), আনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট (Nihilist)দিগের উপদ্রব স্বরূপ সামাজিক ভূমিকম্প অনুভূত হইতেছে কেন? যেন সমাজ-গর্ভে কুপিত জনসাধারণের উত্তপ্ত রুদ্ধবল মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইতেছে—কে জানে, জ্বালাময়ীর অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সর্ব্বসুখ-বঞ্চিত ক্রোধাগ্নি কখন ভয়াবহ বিপ্লব "লাভা" উদ্গার করিবে।

হেন্‌রি জর্জ্জ, উন্নতি ও দুর্গতি (Progress and Poverty) নামক গ্রন্থে দরিদ্রদিগের দুঃখে কাতর হইয়া, যে গবেষণা, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য নিশ্চয়ই তিনি সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু তাঁহার

ব্যাখ্যাত প্রতিকার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিতেছেন, অন্য সকল কর উঠাইয়া দিয়া কেবল ভূসম্পত্তির আয়ের উপর কর স্থাপন কর। ফরাসি বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ কোয়েস্‌নে এবং তুর্গোও তাহাই বলিতেছেন। কেবল তাহা করিলে কি হইবে? ভারতবর্ষে ত ভূসম্পত্তির উপর কর রহিয়াছে, তাহার দরুণ ভারতের অবস্থা কি কিছু ভাল, দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা হইবার পক্ষে কি কিছু সুবিধা হইয়াছে? শ্রীমতী ফসেট বলিয়াছেন—

"In a great part of India the land is owned by the Government and therefore the land tax is rent paid direct to the State. The economic perfection of this system may be readily perceived."

কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন সুবিধা দেখি না। গভীর জ্ঞানী স্পেনসার ভূসম্পত্তির উপর কর স্থাপনকরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে "Such a doctrine is consistent with the highest state of civilization." (Social statics) কিন্তু তাহাতে যে অন্তিমে বিশেষ উপকার হইবে, দরিদ্রদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিবে, ধরাতল হইতে দুঃসহ অসাম্য তিরোহিত হইবে, তাহার আশা করিতে পারি না। সম্পত্তি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া আজ সমান ভাগ কর না কেন, কিছুকাল পরে আবার যে অসাম্য সেই অসাম্যই হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলেই যে ব্যক্তি সুস্থ বলীয়ান, বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি অসুস্থ, দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অর্থ সঞ্চয় করিবে। তাহার উপর আবার দুর্দ্দৈব হেতু কাহারও অর্থনাশ হইবে, কাহারও অর্থলাভ হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে যে অসাম্য সেই অসাম্য, আবার দাঁড়াইবে। এই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া সেণ্ট সিমং (St. Simon) এবং ফুরিয়ে (Fowrier) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অক্ষম-পোষক সমবেত সমাজগঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ একীকৃত সম্পত্তিমূলক সমাজ অদ্যাবধি কুত্রাপি প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত হয় নাই এবং যদিও জনষ্টুয়ার্ট ইহার ভাবী পরিণাম একবারে আশাহীন বিবেচনা করেন না, তথাপি ইহাতে যে জগতের উদ্ধার হইবে, তাহার সম্ভাবনা কম।

তবে, সমাজের দারিদ্র্য বিপত্তি বিমোচনের আশা কিসে? আশা, ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং ভারতীয় ধর্ম্মের যোজনায়। বঙ্কিম বাবু তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে ঠিক বলিয়াছেন যে—ইউরোপের বিজ্ঞান ও হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা মিলিত হইল হিন্দুজাতি জগতের প্রধান জাতি হইবে।

ধর্ম্মমন্দির অনেক সময়ই রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ হইয়া থাকে। যে সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা অন্য কোন রূপেই করা যায় না, ধর্ম্মের দিক দিয়া অনায়াসে তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। যে ধর্ম্ম, মনুষ্য হৃদয় বিস্তৃত, উদার, উন্নত করিয়া, স্বার্থপরতাকে নষ্ট করে,—পরার্থপরতাকে বিকশিত করিয়া, হৃদয়কে বিশ্বজগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করে,—মানুষকে পরের সুখে সুখী হইতে শিখায়,—এক কথায় যে ধর্ম্মগুণে মৈত্রীর অপূর্ব্ব মেলায়, ভালবাসার টাকায়, মনুষ্য পরস্পরকে কিনিয়া ফেলে, আপন করিয়া ফেলে—আমি সেই ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। এ ধর্ম্ম পুণ্য ভারতভূমিতে একদিন যত প্রসর পাইয়াছিল, যতটা হিন্দুদিগের হৃদয় অধি-

কার করিয়াছিল, কুত্রাপি তেমন করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাই অন্যদেশে যে সকল প্রশ্নের উত্তর সমাজনীতি বা অর্থনীতি দিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সমীচীন উত্তর দিতে পারে নাই, হিন্দুদিগের সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্ম তাহার সুন্দর ও পরিতৃপ্তিকর মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছে।

ইউরোপে ও আমেরিকাতে দরিদ্রগণ লইয়া সমাজ ব্যতিব্যস্ত। কাঙ্গাল-করে (Poor-rate এ) দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না। তাই কত রকম বিপ্লবের সূচনা হইতেছে। কিন্তু দেখ, হিন্দুসমাজে কাঙ্গালের জন্য এইরূপ টেক্স সংস্থাপন করার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগন তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমত অতিথিগণের বিষয় ভাবিয়া দেখ। অতিথি প্রবাসের কাঙ্গাল। প্রাচীনকালে হিন্দু বিদেশে যাইলেন। সেখানে তাহার ঘর নাই, বন্ধু নাই, সঙ্গে অর্থ নাই। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাবলে তিনি যে হিন্দুর ঘরে যাইবেন, তাহাই তাঁহার ঘর, প্রত্যেক গৃহস্বামী তাঁহার বন্ধু, প্রত্যেক গৃহস্থের অর্থ তাঁহার অর্থ। যেমনি তিনি কাহারও গৃহে পদার্পণ করিলেন, গৃহস্বামী সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কত যত্ন-আদর-শ্রদ্ধা-প্রেম-ভক্তিময় সেবা, যেন তিনি গৃহস্বামীর ইষ্টদেবতা, অনুগ্রহ করিয়া গৃহস্বামীকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়াছেন।

মনু—বলিয়াছেন—

"যে অজ্ঞব্যক্তি অতিথি প্রভৃতি ভৃত্য পর্য্যন্তকে অন্ন না দিয়া আপনি ভোজন করে, সে জানে না যে, সে মৃত হইলে শকুনি কুকুরেরা তাহার দেহ ভোজন করিবে" (৩ অ, ১১৫)

পরাশর বলিয়াছেন—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানিচ॥ (১ অ—৫২)

"যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করে, তাহার পিতৃগণ সহস্র বর্ষ অনাহারে থাকেন"।

সেকালে আমাদের দেশে প্রত্যেক সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ, দুই একটী দরিদ্র সন্তানকে প্রতিপালন করিতেন, পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে যত্ন করিতেন। যাহার টাকা আছে, অথচ সৎকার্য্য নাই, অর্থাৎ যে ধনী হইয়া দশজনের উপকার করে না, সমাজে তাহাকে ঘৃণিত ও লজ্জিত হইতে হইত। মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের শিক্ষায়, জলাশয়, রাস্তা, ঘাট, শিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডদ্বারা টেক্স আদায় করিতে হইত না। মৈত্রীধর্ম্ম-প্রণোদিত ধনী হিন্দুগণ স্বতই এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া অন্যকে সুখী করিয়া আপনাকে সুখী করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে যাঁহারা যে পরিমাণে বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পবিত্র ও উন্নত, তাঁহারা সেই পরিমাণে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ, পার্থিব সুখ, ধনবিভব ত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের জীবন দেখ। ব্রাহ্মণ ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, পার্থিব সুখ বিলাসে একেবারেই তাহার অধিকার নাই। যে যত উচ্চ শ্রেণীর লোক, সে তত ধনবর্জ্জন করিবে। ক্ষত্রিয়রাজাগণ ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষায় রাজ্যের ঐশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে সমভাবে পরিচালনা করিয়া, অক্ষম ব্যক্তিদিগের প্রতি সর্ব্বদা দয়া দৃষ্টি রাখিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। ইহাতে সমাজে, কতিপয় ব্যক্তির হস্তে ধন সঞ্চিত না হইয়া, সমুদ্রের জলের ন্যায়, বুদ্ধি ও

জ্ঞানের সহস্র কিরণে, উচ্চে আকৃষ্ট হইয়া সতত নিম্নে প্রজাপুঞ্জের উপর বর্ষিত হইত। সমুদায় প্রজাবর্গকে প্রাচুর্য্যময়, সুখস্বচ্ছন্দময়, হাস্যময় করিয়া রাখিত। এইরূপে মৈত্রীধর্ম্ম-প্রসূত একটী অপূর্ব্ব সাম্যভাব বিরাজিত থাকিত। সুতরাং হিন্দুর সমাজে মুক্তিফৌজনায়ক জেনেরল বুথের বা (Social scheme এর) কখনও প্রয়োজন হয় নাই। কেন না, হিন্দুর ধর্ম্ম ঘরে ঘরে মুক্তি প্রচার করিয়াছিল, ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেনেরেল বুথ সৃষ্টি করিয়াছিল, সমুদায় সমাজকে অভূতপূর্ব্ব মহামহিম গৌরব-মণ্ডিত একটা (Social scheme) করিয়া তুলিয়াছিল।

আবার দেখ, অর্থনীতি, ইংরাজি মতে, তিন শাখায় বিভক্ত (১) অর্থজনন (Production) (২) অর্থবণ্টন (Distribution) এবং (৩) বিনিময় (Exchange)। অর্থ বণ্টনের মধ্যে খাজনা এবং মজুরি, এই দুইটী প্রধান বিষয়। অর্থাৎ কিসে ভূস্বামী এবং কৃষকদিগের মধ্যে ভূমির উৎপন্ন শস্য বা তাহার মূল্য কিসে সমুচিতভাবে বিভক্ত হইতে পারে, আর ধনী ব্যবসায়ীদিগের এবং তাহাদিগের নিয়োজিত শ্রমীদিগের মধ্যে শ্রমের উৎপন্ন লাভ কিরূপে ন্যায্যভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, এই দুইটী অর্থনীতির কঠিন প্রশ্ন ইউরোপে উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ প্রশ্ন কখনও উঠিয়াছিল, বোধ হয় না, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করার কখন আবশ্যক হয় নাই। কেন না, প্রাচীন হিন্দু ধনী ইউরোপীয়-দিগের বা নব্য হিন্দুদিগের ন্যায় অর্থগ্রাসী স্বার্থপর ছিলেন না। কেন না, তাঁহারা ধন উপার্জ্জন করিতেন, দান করিবার জন্য। কেন না, তাঁহাদিগের ধনসাধনার ভিতর, ধর্ম্মসাধনা ছিল। তাই বলিতেছি, সমাজের দারিদ্র্যদুঃখ যদি বিমোচন করিতে চাহ, তাহা হইলে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মকে সংযুক্ত কর। জড়ের সহিত আত্মার, প্রকৃতির সহিত পুরুষের, শক্তির সহিত মঙ্গলের, উমার সহিত শিবের শুভ বিবাহ দেও, সেই উদ্বাহে দাম্পত্য প্রেমের যে কুমার জন্ম গ্রহণ করিবে, সে-ই বর্ত্তমান দারিদ্র্য রাক্ষসকে বধ করিয়া, নর-দেবতাগণকে নিরুপদ্রব ও সুখ শান্তিময় করিবে। হে বঙ্গীয় জমীদারগণ, হে বঙ্গীয় শিক্ষিত জন-সমাজ, আপনারা সকলেই নিজের নিজের সামর্থ্যানুসারে, একদিকে বিজ্ঞান শিল্প কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিজের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে হিন্দুদিগের মৈত্রীধর্ম্ম জীবনে অবতারণা করিয়া অর্থের ও ধর্ম্মের উদ্বাহের, এই হরগৌরী পরিণয়ের উদ্যোগ ও সহায়তা করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

খাদ্য।

আহার না করিয়া মনুষ্য অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। জীব-মাত্রেরই শরীর নানা প্রকার ধাতব, উপধাতব ও জৈবনিক পদার্থ নির্ম্মিত। শরীর মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, সুস্থাবস্থায় সেই সমুদয় যন্ত্র স্ব স্ব কার্য্য করে;

কার্য্য সাধন কালে প্রত্যেক যন্ত্রের শক্তি ক্ষয় হয়। অধিককাল পরিশ্রম করিলে সমস্ত যন্ত্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎকালে ঐ সমুদয় যন্ত্রের শ্রান্তি দূর করিবার অভিলাষ হয়। সেই অভিলাষ ক্ষুধা ও পিপাসারূপে আমাদের মনে উপস্থিত হয় ও আমরা তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভোজন ও পান করিতে প্রবৃত্ত হই। ঐ সময় স্বাস্থ্যজনক খাদ্য প্রাপ্ত না হইলে যন্ত্র সকল পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অসম্মত হয়; তাহাতেও যদি উহাদিগকে জেদ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহা হইলে কিয়ৎকাল মধ্যে যন্ত্র সকল বিকল হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা নানা প্রকার তেজ বিমুক্ত ও ব্যয়িত হয়, যথা,—গমন উত্তাপ উৎপাদন, শারীরিক রস উৎপদান ও নিঃসারণ এবং মনোবৃত্তি সমুদয়ের চালনা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যে পরিমাণ তেজ উল্লিখিতরূপে ব্যয়িত হয়,সেই পরিমাণে সঞ্চিত (Latent) তেজ বিশিষ্ট নূতন পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করান আবশ্যক এবং যথোপযুক্ত বিশ্রাম করাও আবশ্যক।

যে সমুদায় পদার্থ উদরস্থ হইলে শরীরের ঐরূপ ক্ষতিপূরণ হয়, তাহারই নাম খাদ্য।

খাদ্যের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া, কোন প্রকার খাদ্য কত পরিমাণ আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কোন মতে উদর পূরণ করিলেই জীবনী শক্তির ক্ষতিপূরণ হয় না।

বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নরশরীর নানা প্রকার অস্তিম পদার্থ দ্বারা রচিত, সুতরাং তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থের অভাব, সেই সেই পদার্থ বা তদুৎপাদক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। আমরা সচরাচর প্রতিদিন যে যে কার্য্য করি, তাহাদ্বারা শরীরের সমস্ত অস্তিম পদার্থের অল্প বা অধিক ক্ষয় হয়। এ নিমিত্ত প্রতি দিবস ঐ সমুদয় পদার্থবিশিষ্ট সামগ্রী আহার করিলে ঐ ক্ষতিপূরণ হইবে।

পরমেশ্বর মাতার স্তনে শিশু সন্তানের খাদ্যস্বরূপ দুগ্ধ সৃজন করিয়াছেন, শিশুর শরীরের পুষ্টিসাধন মাতার স্তন্যদুগ্ধ দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। ইহা হইতে সুবিখ্যাত প্রাউট সাহেব স্থির করেন যে, স্তন্যদুগ্ধে যে যে অস্তিম পদার্থ আছে, আহারের অনুরূপ সামগ্রী দ্বারাই মনুষ্য পরিপুষ্ট ও জীবিত থাকিতে পারে। দুগ্ধে চারি প্রকার অস্তিম পদার্থ আছে, যথা;—

১ম—পনিরময় পদার্থ, ২য় শর্করা, ৩য় তৈলময়, ৪র্থ জল ও অন্যান্য ধাতব ও উপধাতব পদার্থ। ইহার মধ্যে পনিরময় পদার্থ যবক্ষারযান বিশিষ্ট; শর্করা ও তৈলময় পদার্থদ্বয় যবক্ষারযান বিহীন।

মনুষ্যের খাদ্যে এই চারি প্রকার সামগ্রী থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ১ম, য়্যালবুমেন বা তজ্জাতীয়। ২য়, শ্বেতসার বিশিষ্ট বা মিষ্ট দ্রব্য। ৩য়, তৈলময় পদার্থ। ৪র্থ, জল ও নানা প্রকার ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ।

(ক) শরীর পোষণার্থ এই চারিটী পদার্থই আবশ্যক কি না, জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অনেক শরীর-তত্ত্ব-বিদ পণ্ডিত নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

"কেবল যবক্ষারযানময়, লবণাক্ত ধাতব পদার্থ ও জল ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে না।"

(খ) "অথচ ঐ তিন প্রকার পদার্থ পরিত্যাগ

করিয়া শ্বেতসার, শর্করা ও তৈলময় পদার্থ ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না।"

(গ) "য়্যালবুমেন, তৈলময়, ধাতব ও লবণাক্ত পদার্থ এবং জল ব্যবহার করিলে কিছুকাল সুস্থ থাকিতে পারা যায়।"

(ঘ) "কিন্তু তৈলময় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল য়্যালবুমেন বা শ্বেতসার, তজ্জাতীয় পদার্থ, জল এবং লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার করিয়া মনুষ্য সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।" *

(ঙ) "জল ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না।"

যবক্ষারযানময় পদার্থ খাদ্যরূপে উদরস্থ হইলে, দেহ মধ্যে কি কি কার্য্য করে, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার পেভি লিখিয়াছেন যে, তাহারা প্রধানতঃ দেহের বিধান সকলের উন্নতির ও জীর্ণসংস্কারের সহায়তা করে, দ্বিতীয়তঃ মানবদেহে জীবিতাবস্থায় যে সমুদয় রস প্রস্তুত ও ব্যয়িত হয়, তৎসমুদয়ের নিমিত্ত ও যত প্রকার শক্তি বা তেজ বিমুক্ত ও ব্যয়িত হয়, তন্নিমিত্ত যবক্ষারযানময় খাদ্য আবশ্যক। †

অপর এক স্থলে অনেক বৈজ্ঞানিক তর্কের পর বলিয়াছেন যে, যবক্ষারজান বিহীন খাদ্যকে শরীর পোষণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য উহাদিগের যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়, তন্নিমিত্তও যবক্ষারযান বিশিষ্ট খাদ্য আবশ্যক।

১৭টী যবক্ষারযানময় খাদ্য হইতে শরীরে নিম্নলিখিত উপকার হয়; যথা;—১ম,—উপধাতু বিশিষ্ট দৈহিক যন্ত্রের পুষ্টিসাধন ও জীর্ণ সংস্কার। ২য়—শ্বেতসার ও তৈলাক্ত বস্তু হইতে তেজ উৎপাদন করিবার সহায়তা করে। ঐ তেজ পেশী ও স্নায়ু মণ্ডলীর কার্য্যে এবং উত্তাপরূপে পরিণত হয়। জীর্ণসংস্কার অপেক্ষা তেজোৎপাদনেই অধিক পরিমাণে যবক্ষারযান ব্যয়িত হয়। ৩য়—এতদ্ভিন্ন যবক্ষারযানময় খাদ্য হইতে মেদ জন্মিতে পারে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

খাদ্যে যবক্ষারজানের পরিমাণ অল্প হইলে মাংসপেশী ও স্নায়ুর শক্তি হ্রাস হয়, এবং তন্নিমিত্ত অতি সামান্য কারণে শরীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য পীড়া দ্বারা শীঘ্রই আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মানসিক পরিশ্রমকালে বা কঠিন শারীরিক পরিশ্রমকালে যবক্ষারযানময় দ্রব্যের ক্ষতি শীঘ্রই ঘটে; এবং সেই ক্ষতিপূরণ করিবার নিমিত্তই মাংস ভোজনে অনুরোধ করা যায়। কারণ, পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা মৎস্য মাংস শীঘ্রই পরিপাক হয়, সুতরাং শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। উদ্ভিজ্জ য়্যাল্‌বুমিনেট শীঘ্র পরিপাক হয় না; সুতরাং উহা হইতে যবক্ষারজান শীঘ্র বহির্গত হইয়া ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত হইতে পারে না, সেই জন্যই অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা যায় না।

শ্বেতসারময় খাদ্য।—শ্বেতসারময় পদার্থ ও শর্করা শরীর পরিপোষণের জন্য বিশেষ আবশ্যক। এই সমুদয় বস্তুতে যে অঙ্গার ও উদজান আছে, তাহা অম্লজানের সহিত রাসায়নিকরূপে মিশ্রিত হইয়া উত্তাপ, গতি, ও অন্যান্য তেজ উৎপাদন করে। সুতরাং উহাদের অভাবে ঐ ক্রিয়া সুচারুরূপে হইতে পারে না, কিন্তু ইহারা তৈলময় পদার্থ হইতে

* Dr. Parkes', Manual of Hygiene P. 244-245.

† Dr. Pavy's Food and Dietetics P. 40.

অনেক (প্রায় ২॥০ গুণ) হীনবল। যথোপযুক্তরূপে অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইতে না পারিলে ঐ ক্রিয়া হয় না, তখন ঐ সমুদায় বস্তু শরীরে মেদরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। † এ নিমিত্ত শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক করে, আরও যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ ও লবণাক্ত পদার্থের সাহায্য বতীত ঐ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। এনিমিত্ত শ্বেতসারময় পদার্থ আহার করিলে উহার সহিত যবক্ষারজান ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা ও শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক।

তৈলময় পদার্থ অভাবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমুদায় পদার্থে অতি অল্প পরিমাণ অম্লজান ও অধিক পরিমাণ অঙ্গার ও উদজান থাকায়, অধিক পরিমাণে অম্লজানের সহিত রাসায়নিকরূপে মিলিত হইয়া দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বাষ্প ও জল উৎপাদন করে, ঐ মিলন ক্রিয়া (Oxidation) দ্বারা উত্তাপ উৎপাদিত হয়, তাহা হইতে গতি এবং অন্যান্য প্রকার তেজ প্রকাশিত হইতে পারে। * উহারা দেহের স্বাভাবিক তৈলময় পদার্থের জীর্ণসংস্কারে ও স্নায়ুমণ্ডলীর পরিপোষণে ব্যবহৃত হয়, শরীরের স্থানে স্থানে মেদরূপে সঞ্চিত হয়, ত্বকের নিম্নে থাকিয়া দেহস্থ উত্তাপ রক্ষণের সহায়তা করে। যে তৈলাক্ত পদার্থ যন্ত্র সকলে জমিয়া থাকে, তাহা সময়ে সময়ে শোণিতের শস্যাগার স্বরূপ হয়. অর্থাৎ আহার না পাইলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইলে, শোণিত ঐ তৈলাক্ত পদার্থ হইতে আবশ্যকমত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যথাবিহিত তেজ প্রকাশ করে। অধিক পরিমাণে তৈল, ঘৃত বা অন্য কোন তৈলময় পদার্থ আহার করিলে উহা যথেষ্ট ব্যয় হয় না, সুতরাং শরীরে অধিক পরিমাণে মেদ সঞ্চিত হয় ; মাংসপেশী, স্নায়ুমণ্ডলী ও অন্যান্য যন্ত্রের এক প্রকার মেদাপকৃষ্টতা জন্মে, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে। এই সমুদয় অনিষ্ট ঘটিতে না পারে, এজন্য অল্প পরিমাণে তৈলময় পদার্থ ব্যবহার করা আবশ্যক, এবং উহার সহিত কতক পরিমাণে যবক্ষারজানবিশিষ্ট ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার এবং শারীরিক পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় অম্লরসবিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ বস্তুও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক, তাহারা শোণিতের রক্ষা করিবার সহায়তা করে এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৈহিক উত্তাপ ও তেজোৎপাদন করে।

ধাতব, উপধাতব ও অস্থিম পদার্থ সমূহ।—জলই প্রধান উপধাতব খাদ্য। জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জল যে অমূল্য নিধি, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। জল ব্যবহারের এক প্রধান আবশ্যকতা এই যে, উহা শোণিতকে যথোপযুক্তরূপে তরল রাখে, সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণ করিবার উপযুক্ত করে, এবং যন্ত্র সকলকে যথোচিত সিক্ত ও কার্য্যক্ষম করে। উহার অভাবে তাহারা শুষ্ক হইয়া যায় ও স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। যথোচিত জল

† Dr. Pavy's Food Dietetics, pp. 107, 115, 126 and 127.

* That energy capable of resulting in the performance of mechanical work is produced in the animal system by the oxidation of carbonic acid in ether may be considered as an established fact.—Pavy, p.102.

ব্যবহার করিলে শারীরিক ক্রিয়া সমূহের বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তন ক্রিয়াও শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। দৈহিক মলিন পদার্থ সমূহ স্বচ্ছন্দে বহির্গত হইতে পারে।

লবণাক্ত বস্তু যে প্রাণ ধারণের পক্ষে প্রধান আবশ্যক পদার্থ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। লবণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন খাদ্যই সুস্বাদু হয় না, এবং যে খাদ্যে লবণের অংশ অল্প, তাহা অধিক ব্যবহার করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। ঐ সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার হেতু দৈহিক ক্রিয়া সমুদয় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। সকল প্রকার আনাজেই কিয়ৎপরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ থাকে। টাটকা আনাজ ব্যবহার না করিলে নানা প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থও খাদ্যের সহিত উদরস্থ হয় ও তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

পরীক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে খাদ্যে একভাগ যবক্ষারজানময় পদার্থ আছে, তাহাতে ৩॥০ ভাগ যবক্ষারজানশূন্য পদার্থ থাকা আবশ্যক। একজন মধ্যমাকার ইউরোপীয় পুরুষ প্রতিদিবস শরীর হইতে ফুস্‌ফুস্ (Lungs), মূত্রগ্রন্থি (Kidneys) ত্বক (Skin) ও অন্ত্র (Intestines) দ্বারা ৩০০ শত গ্রেণ বা ১৫০ রতি যবক্ষারজান, ৪৫০০ গ্রেণ বা ২২৫০ রতি অঙ্গার পরিত্যাগ করে; এতদ্ব্যতীত জল ও জলীয় বাষ্পও পরিত্যক্ত হয়। শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। (৭)

জন্মকথা

মনে করুন, আলোক লতার রূপবত্তায় ইহার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু ইহার মূল কোথা? জ্ঞানে কি বিজ্ঞানে, কোরাণে কি পুরাণে, পৃথিবীর অন্তঃভাগে কি ভূগর্ভে, কোথা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব? ব্যাসের পুত্র শুক ও অভিমন্যু গর্ভ-জ্ঞানী ছিলেন; ভগবান্ বুদ্ধ প্রসূতির উদরে প্রাজ্ঞ ছিলেন, ইলিসেবার গর্ভে এক বিজ্ঞ সন্তান দৃষ্ট হইয়াছিল, সূতিকাঙ্কশোভন যিশুর অতি শৈশবে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

"Jesum locutom esse, et qui dem cum in cunis Jocerct, dixseque matri swae mareal."

"That Jesus spoke even when he was in his cradle."
Jone's Canonical Authority. Vol. II. p. 168.

আমরা পাষণ্ড, আমাদের সন্দেহ ভগবান্ দূর করুন।

"Dia to sinai anton aikoi patrias David."

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, সর্ব্বানন্দিমেল,গৌরীকান্ত বংশজ, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যদি আদৃষ্ট হন যে, তিনি, তাঁহার পৈত্র্যাবাসে নাম লেখাইয়া দিবেন, রাজাজ্ঞা পালনার্থ তিনি কাবুলে যাইবেন কি ঝালোকাটি যাইবেন?

খ্রীষ্টের পিতা যুষেফ দায়ুদ সন্তান ছিলেন, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ দায়ুদের ১০১৫ বৎসর পরে ইহুদিদের দেশে পূর্ব্বোক্ত

প্রকার এক রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই হেতু যুষেফ বেথ্‌লেহমে নাম লেখাইতে গমন করেন, কারণ তাহার পৈত্র্যাবাস বেথ্‌লেহমে ছিল।* যুষেফ গালিল প্রদেশাধিবাসী ছিলেন; তাঁহার সময়ে উক্ত প্রদেশে ফিনিক, গ্রীক্, সিরীয় ও আরবীয় মনুষ্যগণ বাস করিত। * মিশ্রবর্ণ পরিবৃত্ত প্রদেশে থাকিয়া দায়ূদবংশে কদাচিৎ কোন বিচ্ছিত্তি ঘটে নাই, কথাটা যেন মূলহীন বলিয়া প্রাণে প্রবেশ করে না। উক্ত মিশ্রবর্ণ পরিবৃত প্রদেশ "গেলিল্‌ হগ্নোয়িম্" অর্থাৎ দেবপূজক দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্ট দেবপূজকদিগের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দেব পূজক দেশ কি ভারতবর্ষ, মিশর কিম্বা গালিলী প্রদেশ? ভারতবর্ষ বিবিধ জাতির লীলাক্ষেত্র, ভারতবর্ষ দেবপূজক দেশ। আমি অনুমান করি, মিশ্রদেশ সম্বন্ধে আধুনিক লেখকগণ অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছেন। উভয় মিশ্রদেশ ভূমধ্য সাগরের উপকূলে অবস্থিত। বিজ্ঞবর রেনান বলেন, বিবিধ জাতির মধ্যে বহুকাল একত্র বাস জন্য দায়ূদবংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা হওয়া সম্ভাবিত নহে।

"It is therefore impossible to raise here any question of race and to seek to ascertain what blood flowed in the veins of him who has contributed most to efface the distinctions of blood in humanity." Life of Jesus, Renan, p. 40.

যুষফ দায়ূদের সন্তান হইলেও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে দেশ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, রোমক শাসনকর্ত্তাগণ তাহাকে সেই পৈতৃক স্থানে পুনর্ব্বার আনয়ন করিয়া নাম লিখাইয়া লইয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? কথাটা অসঙ্গত বোধ হয় না? রোমক রাজনীতি অতীব প্রশংসনীয়, তাহারা যে দেশ জয় করিত, সেই বিজিত দেশের কোন প্রকার জাতীয় বিষয়ে তাহারা কখনই হস্তক্ষেপ করিত না। যাহাদের রাজনীতি এরূপ উদার, তাহারা পূর্ণ অন্তরাপত্যা, মন্থরা, হিব্রাঙ্গনা মেরীকে অকারণ সুদূর স্থানে রাজবিধি দ্বারা আনয়ন করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ইহুদীজাতির রীত্যনুসারে মেরীর নাম লিখাইবার কোন আবশ্যক ছিল না, কারণ, তাহা পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, সন্তান প্রসবকালে নারী যুষেফের সহবর্ত্তিনী কেন হইয়াছিলেন? খ্রীষ্টীয় উপশাস্ত্রে বলিয়াছেন, যুষেফ মেরীর প্রতিপালক, তাঁহার স্বামী নহেন, তৎকারণ তাঁহার বেথ্‌লেহেম গমনের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু অল্‌সসেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেথ্‌লেহমে মেরীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তৎকারণ উক্ত স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা শাস্ত্রীয় কথা, না অল্‌সসেনের নিজের কথা? তাঁহার কথায় পারিত্রিক বিষয়ে কতদূর ইষ্টদায়ক হইবে, বিজ্ঞপাঠক অনুভব করুন।

খ্রীষ্টের বহুকাল পূর্ব্বে দায়ূদবংশ অবমৃষ্ট দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুষেফের সময়ে উক্ত বংশের উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। সুতরাং ফরাসী পণ্ডিত রেনানের মতে খ্রীষ্ট রাজবংশীয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা প্রাচীনগণের চাতুরি। খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন নাই।

"Never does he designate himself as son of David. The title "Son of David" was the first which he accepted probably without being concerned in the innocent frauds by which it was sought to secure it to him. The family of David, as it seems, been long extinct." Renan, p. 178.

* Strabo. XVIII,35,

লোকের বিশ্বাস আছে, খ্রীষ্ট দায়ুদের সন্তান ছিলেন, এ বিশ্বাসের মূল কোথা? মিথার ভবিষ্যদ্বাক্য। "হে বৈৎলেহম্ ইফ্রাথা, তিনি ইস্রাএলের রাজা হওনার্থ তোমার মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাক্য সফল করিবার নিমিত্ত খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই, কিন্তু সমালোচকদিগের ভাব অন্য প্রকার। রেনান বলেন, খ্রীষ্টের জন্ম বৈৎলেহমে নয়, নাসারতে, "অধম কোন্‌দিক্ আশ্রয় করিবে? খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্বের এ অন্ধকারময় ভাব কিরূপে বিদূরীত হইবে কে বলিবে? প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের অনেকেই খ্রীষ্টোপাসক হইয়াও ভবিষ্যদ্বক্তা মিথার ভবিষ্যদ্বাক্য এবং খ্রীষ্টের বংশাবলী বিশ্বাস করেন নাই কেন?

"During the first three centuries, considerable portions of Christendom obstinately denied the royal descent of Jesus and the authenticity of the genealogies" Renan's Life of Christ, P. 179.

তাই বলি আলোক লতার রূপ-লাবণ্য আছে, কিন্তু মূল কোথা?

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মার্শেয়েঝ। (৩)

Rouget de Lisle, Jura প্রদেশে Lonsle-Saunier নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। (১০ মে, ১৭৬০।) তিনি সমর বিভাগে প্রথমতঃ এঞ্জিনিয়াররূপে প্রবেশ করেন, পরে কাপ্তেনের পদে উন্নীত হন। রুজে যৌবনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া সৈনিক জীবনের কঠোরতার প্রশমন করিতেন, এবং সংগীত চর্চ্চা করিয়া শীঘ্রই সংগীত বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যৎকালে Strasbourg নামক এক পূর্ব্ব সীমান্ত দুর্গের তত্ত্বাবধারণ ও সংরক্ষণার্থ তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মার্শেয়েঝ রচনা করেন। রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে, রুজে পরিমিত সাধারণতন্ত্রী ছিলেন। মার্শেয়েঝ রচনার জন্য তাঁহাকে এক সময়ে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই মুক্তি লাভ করেন। ইহাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানা নাই। তিনি শোয়াসি নগরে (Choisy) ২৬ জুন, ১৮৩৬ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মার্শেয়েঝ উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ঐতিহাসিক প্রবাদ আছে। তৎকালে Strasbourg সংগীত চর্চ্চার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি পারির নিম্নেই ষ্ট্রাসবর্গের খ্যাতি। এই নগরের মেয়র Dietrick একজন স্বদেশহিতৈষী লোক এবং সংগীত বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী। ইহাঁর স্ত্রী ও দুহিতাগণ, ইহাঁর মত, স্বদেশবৎসলা ও গীত বাদ্যের সম্যক্ পক্ষপাতিনী। রুজের কবিত্ব ও সংগীত বিশারদতার জন্য তিনি সর্ব্বদা Dietrick পরিবার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইতেন। রুজেও সন্তুষ্ট মনে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। একদা এক মধ্যাহ্ণ ভোজনের সময় টেবিলের উপর

অতি সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিয়া Dietrick রুজের পানে চাহিয়া দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিলেন—আজকাল আমাদের ভোজনের সময় আর অধিক আয়োজন বা আড়ম্বর হয় না। কিন্তু যদি দেশের কোন উৎসবের সময় উৎসাহের এবং সৈনিক হৃদয়ে সৎসাহসের অভাব না হয়, তাহাতে কি আসিয়া যায়। আমার ভাণ্ডারে এখনো এক বোতল সুরা আছে। দেশের ও স্বাধীনতার নামে আমরা উহা পান করিব। ষ্ট্রাসবর্গে সত্বর এক স্বদেশভাবময় মহোৎসব হইবে। কতকগুলি নব্য যুবক স্বদেশের জন্য "জন্মভূমির সন্তান" নামে (Enfants de la patrie) এক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যদল পরিগঠন করিতেছে। ইহাদিগের গাহিবার জন্য উপযুক্ত উত্তেজক সমর-সংগীত নাই। পুরাতন Ca-Ira এ সময়ের উপযোগী নহে। রুজে সম্প্রতি Hymne a´ Liberte´ রচনা করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ, তিনি এই শেষ সুরাবিন্দু পান করিয়া উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া এমন এক উচ্চ, উত্তেজক, ও উৎসাহপূর্ণ সংগীত রচনা করিবেন, যাহাতে লোকের হৃদয় গভীর উৎসাহের রোল তুলিতে পারে।

রুজে স্বীয় শিষ্টতা ও বিনয়-নম্রতাবশতঃ প্রথমে ডিয়াট্রিকের এই অনুরোধ পালনে স্বীয় অপারগতা জানাইয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্বীয় বেহালায় সুর চড়াইয়া হৃদয়ের সেই উদ্বেলিত ভাবসহ আলাপ করিতে লাগিলেন। Dietrickর ঘোষণার কথা এখনও তাঁর কর্ণে ভাসিতেছিল;—

"Aux Armes, citoyens! L'e´tendard de la guerre est de´ploye´! le signal est donne´. Aux armes! Il faut combattre, vaincre, ou mourir. Aux armes, citoyens; Marchons!" &c. অর্থাৎ "স্বদেশহিতৈষি! অস্ত্র পরিগ্রহণ কর। সমর-পরিজ্ঞাপক পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। যুদ্ধার্থে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। অস্ত্র ধারণ কর। আমরা সমরে বিজয়ী হইব অথবা প্রাণত্যাগ করিব। হে স্বদেশহিতৈষি, অস্ত্র ধারণ কর। এস সকলে রণযাত্রা করি।"

তিনি সুরের সহিত শব্দ, শব্দের সহিত সুর যোজনা করিয়া আপন মনে এক গান গাহিয়া গেলেন। শব্দ, ভাব, ছন্দ, সুর—সবই যেন আপনা হইতে যোগাইতে লাগিল। বিনা যত্নে ও প্রয়াসে, আপন হৃদয়ের আবেগে এক কি গানের আলাপ তিনি করিয়া গেলেন। সংগীত শেষ করিয়াই রুজে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। প্রত্যূষে জাগ্রত হইলে, বিগত নিশার স্বপ্নাবস্থার সংগীতটী ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। রুজে তখন উহা লিপিবদ্ধ করিলেন। সংগীত লিপিবদ্ধ করিয়াই তিনি ডিয়াট্রিক ভবনে সত্বর গমন করিলেন। তখনও ডিয়াট্রিক পরিবার নিদ্রায় মগ্ন। কেবল বৃদ্ধ ডিয়াট্রিক উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎসমীপে সংগীত রচনার কথা বলিলেন, ডিয়াট্রিক অনতিবিলম্বে স্বীয় পত্নী ও দুহিতাগণকে জাগরিত করিলেন। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে যাঁহারা সংগীতবিশারদ, তাঁহাদিগকে রুজের বিগত নিশার প্রত্যাদিষ্ট সংগীত শুনাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। রুজে বীণা সহযোগে গাহিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, প্রথম স্তবকটী শুনিয়াই সকলের মুখমণ্ডল অতি গভীর বিষাদ ও গাম্ভীর্য্যে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় স্তবক গীত হইলে সকলের গণ্ড দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু-প্রবাহ বহিতে লাগিল, এবং অবশিষ্টগুলি শ্রবণে

সকলের প্রাণ এক উদ্দাম উৎসাহের আবেগে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সংগীত সমাপ্ত হইলে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, দেশের জন্য উপযুক্ত সংগীতই রচিত হইয়াছে।

বিবি ডিয়াট্রিক বাদ্যযন্ত্রে বাজাইবার জন্য সংগীতের স্বর লিপিবদ্ধ করিলেন। অতি সত্বরই এই নূতন সমর-সংগীত প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক সংগীত-মণ্ডলীতে গীত হইতে লাগিল। একমাস পরে, প্রকাণ্ড ভোজের সময় Mireur নামক এক ব্যক্তি দ্বারা মার্শেলিজ বন্দরে ইহা প্রথম গীত হয়। সেই অবধি তদধিবাসীদিগের ইহা প্রিয়তম সংগীত হইয়া উঠে। মার্শেলিজবাসীরা আপনাদিগের সভা সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে ও শেষে এই জলন্ত, উৎসাহ-ব্যঞ্জক, অগ্নিনিষেককারী সংগীত গাইত। পরে যখন তত্রস্থ অধিবাসীরা বার্বারু নামা এক যুবা প্রতিনিধির ইচ্ছানুসারে পাঁচ শত লোকে ("Who know how to die") পারি অভিমুখে সম্মিলনীর জন্য সশস্ত্রে গমন করে (৫ জুলাই, ১৭৯২), তখন ইহারা সমুদয় পথে এই উত্তেজক সংগীতের রোল তুলিয়া সমুদয় দেশকে উন্মত্ত করিয়া যায়। ইহাদিগের নিকট হইতে শুনিয়াই মার্শেয়েঝ ক্রমে সমগ্র ফরাসী রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

"মার্শেয়েঝ" আখ্যা মার্শেলিজ সৈন্যগণ হইতেই। আদৌ রাইন্ নদীর তীরস্থ সৈনিকগণের জন্য প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা "রাইন সেনার সমর সংগীত" (War song of the Army of the Rhine) নামে আখ্যাত হইয়াছিল। রুজে স্বয়ং ইহার "মার্শেয়েঝ" নাম জানিতেন না। তিনি যখন অভিযুক্ত হইয়া আল্পস্ পর্ব্বতের আরণ্য গিরি-বর্ত্ম দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন তত্রস্থ কৃষকদিগের মুখে সেই গান শুনিতে পান। নিজের স্বরে নিজেই চমকিত ও শিহরিত-তনু হইয়া, স্বীয় পথদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন "উহারা ও কি গান গাহিতেছে" পথদর্শক-কৃষক বলিল "মার্শেয়েঝ।" রুজে এইরূপে স্ব-রচিত সংগীতের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন।

সকলেই ইহা স্বীকার করেন, কবিতা-লালিত্য যত হোক আর না হোক, মার্শেয়েঝ সংগীতের সুরই সর্ব্বস্ব। বাস্তবিক, ইহাপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গের অন্য অনেক রচনা ও কবিতা আছে। কবিত্ব হিসাবে মার্শেয়েঝ অত্যুচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যখন তান-লয়-মান সহযোগে বীণাযন্ত্রে গীত হয়, কবিত্ব, লালিত্য, অথবা রচনা-সৌন্দর্য্য ভাবিবার কাহারো অবসর থাকে না। সুর শুনিলেই মন উদাস হইয়া যায়, হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয়, শরীর মন এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উত্তেজনায় স্বতঃই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এমন উত্তেজক, উন্মাদকারী হৃদয়-বিলোড়নকারী বীর-রসাত্মক সুর কেহ কখন শোনে নাই। ঈদৃশ মর্ম্মভেদী, ওজস্বীতাপূর্ণ, সর্ব্বজন-হৃদয়-স্পর্শী, মৃতসঞ্জীবক সংগীতের তান আর নাই। এইজন্য জাতি নির্বিশেষে, ব্যক্তি নির্বিশেষে, স্থান ও কাল নির্বিশেষে, মার্শেয়েঝ স্বতঃই নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী বিলোড়িত করিয়া তোলে; শিরা ও ধমনীর শোণিতকে সচঞ্চল ও অগ্নিময় করিয়া দেয়; হৃদয়ের মর্ম্ম-প্রদেশে এক অনিবার্য্য মৃত্যু-তুচ্ছকারী উৎসাহ শিখা প্রজ্বলিত করে।

ইহার অভ্যন্তরে করাল মৃত্যুর আর্ত্তরব এবং উল্লাসময় বিজয়ের আনন্দ কোলাহল পাশাপাশি সংস্থাপিত। ইহার লঘু ও দীর্ঘ স্বরের পর্য্যায় মধ্যে জাতীয় সম্পূর্ণ কোপের ক্রোধোদ্দীপ্ত অগ্নিশিখা এবং জয়োল্লাসের অট্টধ্বনি পরিব্যক্ত। ইহার ছন্দে ছন্দে স্বদেশের তরে এক মৃত্যু-তুচ্ছকারী সুগম্ভীর উদ্দাম, ওজস্বীতা আর স্বদেশবাৎসল্যের এক প্রশান্ত অবিনশ্বর স্থির সংকল্প যুগপৎ সন্নস্ত। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাই, ভীষণ বিপ্লবকালে স্বদেশানুরক্ত ফরাসী মার্শেয়েঝ গাহিতে গাহিতে অধিষাদিত চিত্তে অকুতোসাহসে, অদম্য উৎসাহে বিজয় কেতন উড্ডীন করিয়া যেমন প্রলয়কারী সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি আত্ম-বিদ্রোহের সময় বিপক্ষ পক্ষদ্বারা (অনেক সময়ে বিনাপরাধে অথবা স্বদেশের জন্য অত্যধিক প্রেমোচ্ছ্বাস দেখাইতে গিয়া) অভিযুক্ত হইয়া, স্থির গম্ভীর হৃদয়ে, অতুল বীর্য্য ও অবিচলিত উৎসাহ-সহ সেই বীর-সংগীত মার্শেয়েঝ অবিকম্পিত স্বরে গাহিতে গাহিতে বধ্যমঞ্চোপরি অটলপদে দণ্ডায়মান হইয়া ভীমদর্শন শোণিতাপ্লুত, খরধার গিলটিন তলে গ্রীবা আনত ও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

এই সর্ব্বজনীন অগ্নি নিষেককারী জাতীয় সংগীতটিকে ফরাসীগণ অতি পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ চক্ষে সন্দর্শন করে। ইহার পবিত্রতা ও উচ্চ মর্য্যাদার অগৌরব হইবে বলিয়া ফরাসীগণ যথাতথা বা যে-কোন সময়ে ইহা গাহে না। অনৈক বিখ্যাত ফরাসী ইতিহাসকার লিখিয়াছেন ;—

"ধর্ম্ম মন্দিরের উচ্চ শিখরে পবিত্র পতাকা যেমন কোন বিশেষ দিবসেই কেবল অবনত হয়, অপর সব সময়ে অব্যাহত ও অস্পৃষ্ট-ভাবে উচ্চ আকাশের উচ্চতার মধ্যেই উড্ডীন থাকে, আমরা তদ্রূপ এই জাতীয় সংগীতটিকে সর্ব্বদা অনুচ্চারিত রাখি ; কেবল দেশের ভয়ানক বিপৎকালেই শেষ পন্থা স্বরূপ এই মহা সংগীতকে পবিত্রতার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে নামাইয়া আমাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করি। দেশের এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে প্রসূত বলিয়া ইহা যুগপৎ অতি গম্ভীর ও পবিত্র এবং অতি ভয়াল ও প্রভূত বিপদ-সঙ্কুল। জয় ও বিনাশ, গৌরব ও কলঙ্ক ইহার সুরে সংশ্লিষ্ট। ইহা স্বদেশ-প্রাণতার সংগীত ; কিন্তু ইহার মধ্যে উন্মত্ত ক্রোধের অভিসম্পাতও আছে। ইহা সৈন্যগণকে সীমান্ত প্রদেশে সমরক্ষেত্রে চালিত করিয়াছে এবং ইহা বধ্যদিগকেও বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছে। সেই একই তরবারী সৈনিকের হস্তে স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছে, এবং ঘাতকের হস্তে দুর্ভাগাদিগকে বধ করিয়াছে।"

মার্শেয়েঝ বিপ্লবের সমূহ সহায়তা সাধন করিয়াছিল। সংগীত রচনার পূর্ব্বে রাজ্যময় এক জ্বলন্ত অগ্নিময় ভাব পরিব্যাপ্ত। কিন্তু তাহা তখনও একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই। হৃদয়-ভাব তখনও একটা অবিকাশতার মধ্যেই পরিবৃত। প্রতিহিংসা, রোষ, ঘৃণা, আশঙ্কা, হতাশ প্রভৃতি নানাবিধ বিষম প্রকৃতির ভাবরাশি প্রত্যেক ফরাসী হৃদয়ে পূর্ণ হইলেও, তখনও কোন প্রমুক্ত পথে উৎসারিত হয় নাই। অস্ফুটভাবে হৃদয়ের চতুঃসীমা মধ্যে তখনও আবদ্ধ। সে উত্তাল ভাবরাশি হৃদয়-সৈকতের মধ্যে প্রবাহিত। পূর্ণ বিকাশোন্মুখ হইলেও যেন কি একটা অনির্দ্দেশ্য কারণাপেক্ষা করিতেছে। মার্শেয়েঝ সংগীত সেই দেশব্যাপী অপরিস্ফুট মিশ্রভাবের স্ফুরণ বই আর কিছুই নহে। রুজের ভাবময় হৃদয়ের এক অতি শুভ মুহূর্ত্তে, তাঁর জীবনের এক অসাধারণ ক্ষণে, সেই উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ স্বদেশপ্রাণতা, স্বাধীনতার সেই প্রমুক্ত উচ্ছ্বাস, বৈদেশিক শত্রুর

প্রতি সেই বিজাতীয় ক্রোধ, দাসত্বের প্রতি সেই ঘৃণনীয় ও হেয়স্কর ভাব, তান-মান-লয় সমন্বিত অতি সুন্দর কবিতার ছন্দে আকার বদ্ধ ও পরিস্ফুট হইয়াছিল। মার্শেয়েঝ তাই তদানীন্তন প্রত্যেক ফরাসীর উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিব্যক্তি বই আর কিছুই নহে। এই নিমিত্ত যে মার্শেয়েঝ শ্রবণ করে, সেই আপন হৃদয়ের মধ্যে বলিয়া উঠে, ইহাই ত আমার হৃদয় ভাব, ইহাই ত আমার প্রাণের অস্ফুট ভাষাহীন সংগীত। মার্শেয়েঝ তাই প্রত্যেক হৃদয়ের সংগীত। তাই ইহা সমুদয় ফরাসী জাতির এক সর্ব্বজনীন, অতি সুগভীর জাতীয় সংগীত। মার্শেয়েঝ সেই জন্যই একই ভাবে একই সময়ে সকলের হৃদয়তন্ত্রীকে বিকম্পিত করে। তাই যখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত মার্শেলিজ সৈন্যগণ পারি অভিমুখে যাত্রাকালে ফরাসী-গগন পূর্ণ করিয়া পথে পথে মার্শেয়েঝ তান বিস্তার করিতে করিতে গমন করিয়াছিল, ইহার সুর-লহরী এক অদৃশ্য-পূর্ব্ব জ্বলন্ত-প্রাণতার তরঙ্গ ফ্রান্সের চতুঃপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। সে তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যেক ফরাসী প্রাণ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ব্বিশেষে—আলোড়িত হইয়াছিল। প্রত্যেক হৃদয়ে এক ভয়ানক উত্তেজনার রোল সমুত্থিত হইয়াছিল। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, মার্শেয়েঝ ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিময় "বারি"। ইহা ফরাসী হৃদয়ে এক অতি বিষম রণমত্ততা, এক অতি ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী উত্তেজনা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। আমরা তাই ফরাসী বিপ্লব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি, পাঁচশত মাত্র মার্শেলিজ সৈন্য "অত্যাচারীর নিপাত সাধন জন্য" স্বদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন পারি মহানগরীতে উত্তীর্ণ হইল, তখন সেই পাঁচশত ধুরন্ধর পাঁচ সহস্র, দশ সহস্র, বিংশ সহস্রে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পথে যে সেই মোহিনী সংগীত শুনিয়াছে, সে-ই কর্ম্ম, পরিজন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দলের সহিত মিলিত হইয়াছে। অশ্রু-প্রবাহিত বক্ষের স্বর উত্তোলন করিয়া উন্মত্তকর সংগীতের তান তুলিয়া, কে জানে কোথায়, সকলেই কিন্তু সম্মুখের পানে অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিতত্তা, পথের অবশ্যম্ভাবী শ্রান্তি, ক্ষুৎ-পিপাসার পীড়ন, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা—কিছুই বাধক হইতে পারিতেছে না। প্রবল বন্যার মুখে সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে। মৃত্যু, দুঃখ, আরাম, শ্রান্তি সব উপেক্ষা করিয়া সেই এক উত্তেজক সংগীতের সুরে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সমুদয় ফরাসীজাতি কোন মহামরণের মুখে প্রধাবিত হইতেছে। ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। (১) *

বন্ধুগণ! আমি আন্তরিক প্রীতির সহিত আপনাদিগকে অভিবাদন করি। আপনারা নিশ্চয়ই মহাত্মা টমাস্ কার্লাইলের নামে আকৃষ্ট হইয়া অদ্যকার এই সভায় সমবেত

* এই বক্তৃতা বিগত ২০এ চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় আলবার্টহলে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। জীবনচরিতাংশ এবারে প্রকাশিত হইল, ধর্ম্ম-বিষয়ক অংশ আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে।

হইয়াছেন। এই সভা সেই মহাত্মার প্রতি আপনাদিগের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে। মহাপুরুষবর্গের মহত্ত্ব অনুভব করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। পূর্ণিমা রজনীতে সুবিমল শশধর সকলেরই নয়নপথে সমুদিত হয়, কিন্তু তদ্দর্শনে কেবল কবি ভাবুকদিগের হৃদয়েই অনুপম আনন্দ ও বিচিত্র ভাবসমূহের সঞ্চার হইয়া থাকে; তদ্রূপ যাঁহাদিগের হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে মহত্ত্ব আছে, তাঁহারাই কেবল মহাপুরুষদিগের অনুরাগী হন ও তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যাহার হৃদয়ের ভিতরে সৌন্দর্য্য নাই, সে বাহিরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে না; যাহার অন্তরে মহত্ত্ব নাই, সে কোন ব্যক্তির বা কোন ব্যাপারের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয় না। আপনারা কার্লাইলের মহত্ত্বে আকৃষ্ট; সেই জন্যই আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আমি যে তাঁহার মহত্ত্বের গভীরতা পরিমাণ করিয়া তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, এরূপ নহে। আমার ন্যায় সামান্য লোকের পক্ষে তাহা কি কখন সম্ভব? যেমন প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া লোকে পুনঃ পুনঃ তাহা দর্শন ও আঘ্রাণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ কার্লাইলের পবিত্র জীবন-কুসুমের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই সৌন্দর্য্য দর্শন ও সৌরভ আঘ্রাণ করিতেছি। সেই পুষ্পের ভাব-মধু কত পান করিলাম; মনে হইতেছে, আরও পান করি। মহাত্মা কার্লাইলের ভাব সমূহের কিঞ্চিৎ আস্বাদ লাভ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, সেই জন্যই অদ্য তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে উদ্যত হইলাম।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়,—"মহাত্মা টমাস কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম"। স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এক্লিফেকান গ্রামে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর টমাস্ কার্লাইল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জেম্স কার্লাইল এক যথার্থ সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি কৃষি কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জেম্স কার্লাইল যেমন পরিশ্রমী, তেমনই বুদ্ধিমান পুরুষ। সকলেই তাঁহার শুদ্ধচরিত্রের প্রশংসা করিত। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল; কাল্পনিক বিষয় অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তক লিখিত হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি তিনি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন করিতেন। সত্যের প্রতি, অকপটতার প্রতি তাঁহার যে রূপ প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত, সাধারণতঃ সেরূপ অনুরাগ আমাদের নয়ন গোচর হয় না। যাহা যথার্থ নহে, তাহাকে তিনি কোনও ক্রমেই প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার এই যথার্থানুরাগীতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। জেম্স কার্লাইলের এক পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনার বাড়ীটির কোন কোন স্থান নিতান্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল স্থান কোনরূপ আবরণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া সুন্দর করা আবশ্যক"। তিনি বলিলেন,—"কি? আবরণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিব? যাহা জীর্ণ, তাহাকে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস কখনই আমাকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে না"। বাড়ীর অপর সকলেরই অভিলাষ, জীর্ণস্থান গুলি আবরণ-দ্বারা প্রচ্ছন্ন করা হয়; তাঁহারা তদনুরূপ

উদ্যোগও করিলেন, কিন্তু সেই যথার্থানুরাগী পুরুষ কিছুতেই তাঁহাদিগের উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত করিতে দিলেন না। ঈদৃশ ব্যক্তির পুত্র যে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা অসার আড়ম্বরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। পিতার এই গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াই মহাত্মা টমাস্ কার্লাইল সমস্ত জীবন কেবল মিথ্যা ও আড়ম্বরের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। মহাত্মা কার্লাইল স্বীয় পিতার বিবিধ গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার পিতা বাইবেলশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাত্মা ঈনকের ন্যায়।" বাইবেলগ্রন্থে লিখিত আছে, ধর্ম্মাত্মা ঈনক তিনশত বৎসর এই মর্ত্ত্যলোকে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কখনই কোন প্রকার পাপে বা দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার হৃদয় মন নিয়তই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ থাকিত; পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা তিনি নিয়তই সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতেন। কথিত আছে, তিনি ঈশ্বরের সহিত নিয়ত বিচরণ করিতেন; ও তাদৃশ ধর্ম্মজীবনের পুরস্কার স্বরূপ ধর্ম্মাত্মা ঈনককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় নাই; তিনি সশরীরে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও অনেক পুণ্যকর্ম্মা পুরুষের সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার কথা আমরা পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে পাঠ করিয়া থাকি। মহাত্মা কার্লাইল এই ধর্ম্মাত্মা ঈনকের সহিত স্বীয় পিতার তুলনা করিতেন। জেম্‌স কার্লাইল কীদৃশ সাধুপুরুষ ছিলেন, এতদ্দ্বারা আমরা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মহদ্ব্যক্তিদিগের পিতা মাতার চরিত্রের প্রশংসা সচরাচর শ্রুতিগোচর হয় বটে; কিন্তু কার্লাইলের পিতার যেরূপ গুণগ্রামের বর্ণনা পাঠ করা যায়, অপর কাহারও পিতার এত প্রশংসা বোধ হয়, ইতিহাসে পাঠ করা যায় না। সকল মহাপুরুষেরই জননীর প্রশংসা ইতিহাসে বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কার্লাইল-জননী মার্গারেট, মহাপুরুষ-প্রসূতী পরম গুণবতী রমণীকুলের শ্রেণী-বহির্ভূত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। সাধু অগষ্টিনের জননী মণিকাদেবীর কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার প্রার্থনাবলে তদীয় স্বামী ও পুত্র ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছিলেন। থিয়োডোর পার্কারের জননীর পরিচয় আমরা সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছি। অষ্টম বর্ষীয় শিশুপার্কার যষ্টিহস্তে পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী ভেককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; হঠাৎ তাঁহার মনের ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি গৃহে গমনপূর্ব্বক জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমি ত ভেকটীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, অন্তরের ভিতর হইতে কে আমাকে নিবারণ করিল?" জননী কহিলেন, "মানুষে ইহাকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি, ইহা মানবাত্মার মধ্যে ঈশ্বরবাণী।" যে জননী ঈদৃশ কথা বলিয়াছিলেন, সে জননী যে কীদৃশ গুণবতী ছিলেন, তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মহাভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের জননী শচীদেবীর গুণ-কাহিনী আমাদের দেশে অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রিয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জননী বহুগুণের

আধার। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, ও অমায়িকতা আমরা সকলেই অবগত আছি; তাঁহার ভক্তিভাব নারীগণের পরম প্রার্থনীয়। এই সকল মহাপুরুষ-প্রসূতিগণের ন্যায় কার্লাইল জননীও সাধ্বী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল, এবং প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। তিনি পুস্তক পাঠে বিলক্ষণ অনুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রগাঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। উত্তরকালে মহাত্মা কার্লাইল যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কার্লাইল-মাতা তৎসমুদয় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইংলণ্ডের প্রোটেক্টর অলিভার ক্রমওয়েল সম্বন্ধে মহাত্মা কার্লাইল যে নবভাবপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন, জননী মার্গারেটই তাহার মূল। কার্লাইল-জননী সন্তানবর্গের শৈশব কালেই তাহাদিগের অন্তঃকরণে নৈতিক ভাবসমূহ বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য কিরূপ আয়াস অবলম্বন করিতেন, তাহা আপনারা একটী গল্প শুনিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। টমাস কার্লাইল পরিণত বয়সে, একদা এক বন্ধু সমভিব্যাহারে পথ দিয়া যাইতে যাইতে কর্দ্দমাবৃত এক রুটিকাখণ্ড দেখিতে পাইয়া, পদ দ্বারা উহা কর্দ্দমমধ্য হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক একস্থানে রাখিয়া দিলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ওরূপ করিলেন কেন?" কার্লাইল কহিলেন, "শৈশবে আমার জননী যে সকল নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। তিনি বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির কোন বস্তুর অপচয় হইতে দেওয়া উচিত নহে; বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের অপচয় করা নিতান্ত ... ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল বা ব্যোমচারী বিহঙ্গের ক্ষুধা নিবারণ হইতে পারে।" কার্লাইলের এই উত্তর শুনিলে লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, তাঁহার জননীর প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ও তিনি কত যত্নে সন্তানবর্গের হৃদয়ে বিবিধ নৈতিকভাব বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। জেম্স কার্লাইলকে যেমন তাঁহার সন্তান, বাইবেল-বর্ণিত ধর্ম্মাত্মা ঈনকের সহিত উপমা করিয়াছেন, জননী মার্গারেটকে তেমনই কোন কোন গ্রন্থকার, উক্ত শাস্ত্রোল্লিখিত মেরি ও মার্থার সহিত উপমা করিয়া থাকেন। মেরি ও মার্থার মধ্যে একজন ধর্ম্মে প্রমত্ত, গার্হস্থকর্ম্মে উদাসীন; অপর জন গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ ও মনোযোগী। এই উভয়ের চরিত্র মার্গারেটের চরিত্রে সমন্বয়ীভূত হইয়াছিল। ঈদৃশ জনক জননীর পুত্র প্রতিভা ও সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া মানবসমাজ উজ্জ্বল করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কার্লাইল-চরিত্রকে সুন্দর করিবার পক্ষে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ তাঁহার জন্মস্থানও বিলক্ষণ অনুকূল ছিল। শৈশবে যে স্থানে বাস করা যায়, সেই স্থানের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে চরিত্রের উপরি পতিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন, যে সকল ব্যক্তির শৈশবকালে চরিত্রোপরি সহরের প্রভাব পতিত হয়, তাঁহারাই সমধিক উন্নতিলাভে সমর্থ হন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জগদ্বিখ্যাত সেক্স্পীয়র ও মহাত্মা টমাস্ কার্লাইল প্রভৃতি তাহার ব্যতিক্রমস্থল।

জেম্স কার্লাইল স্বীয় সন্তানবর্গের সুশিক্ষা বিধানের বিশেষ মনোযোগী

ছিলেন। টমাস কার্লাইল অতি অল্প বয়সে একটী সামান্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন; একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তদনন্তর উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৫ বৎসর, তখন উপাসনামন্দিরে আচার্য্যগণের উপদেশসমূহ শ্রবণ করিবার পরে তিনি ঐ সকল উপদেশের প্রধান প্রধান অংশ সুন্দররূপে বলিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পাঠে প্রগাঢ় অনুরাগ। শৈশবে তিনি সামান্য অর্থ পাইলেই ছোট ছোট পুস্তক ক্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। ছোট ছোট বালকেরা পয়সা পাইলেই যেমন দৌড়িয়া খাবারের দোকানে গমন করে, শিশু কার্লাইল পয়সা পাইলেই অমনি দৌড়িয়া পুস্তকের দোকানে গমন করিতেন। এই অসাধারণ পাঠানুরাগ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি এত বিষয়ের এত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে তৎকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অধ্যাপকও তত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী ছিলেন; চিন্তাশীলতার লক্ষণ তৎকালেই তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে টমাস কার্লাইল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করিলেন। কি ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন? গণিতশাস্ত্রে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার পারদর্শিতা দর্শনে টমাস কার্লাইলের এক শিক্ষক তাঁহাকে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিতান্ত অভিলাষ, তিনি পুরোহিত হন। লোকের পরামর্শ লইয়া অথবা গুরুজনের অভিপ্রায় দেখিয়া কি জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায়? পরমেশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এক একটী উদ্দেশ্য বিধান করেন; সেই উদ্দেশ্য অবধারণ করিয়া যে ব্যক্তি আপনার জীবনের কর্ম্ম নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী। তিনি অবলম্বিত কর্ম্মে যেরূপ Successful অর্থাৎ সফল-প্রয়াস হন, অপর সাধারণে সেরূপ হয় না। জন সমাজের অসারতা, আড়ম্বর-প্রিয়তা ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক নূতন ভাব প্রচার করাই কার্লাইলের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালে পুরোহিত সম্প্রদায় যে সকল মত কেবল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, যে সকল কর্ম্ম কেবল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া সম্পাদন করিতেন, কার্লাইল তদানীন্তন পুরোহিত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাঁহাকে সেই সকল মত মানিয়া চলিতে হইত, ও সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইত। সেই জন্যই লোকশিক্ষাবিধান তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও তিনি পুরোহিত-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিলেন না। ইটালি দেশে লম্বার্ডি প্রদেশে মার্কুইস গঞ্জাগা নামক এক প্রধান ব্যক্তি আপনার পুত্র আলয়সিয়সকে সৈনিক ব্যবসায়ী করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রের শৈশবাবস্থাতেই ছোট ছোট কামান ও

তরবারি ক্রীড়া দ্রব্যরূপে তদীয় হস্তে অর্পণ করিতেন। বাল্যকালেই যাহাতে পুত্রের মতি যুদ্ধাদি বিষয়ে প্রবাহিত হয়, তদ্বিধানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিধাতা আলয়সিয়সকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আলয়সিয়স শৈশবে কামান তরবারি লইয়া খেলা করিয়াও যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রহ্মলাভ-লালসায় তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রোগীর সেবা করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক বিধাতা যাহাকে যে মন্ত্র প্রদান করেন, সে ব্যক্তি সেই মন্ত্র সাধন করিতে পাইলেই যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে। বিধাতার মন্ত্র যে মানুষ কখন পরিত্যাগ করে না, আমি এ কথা বলিতেছি না। যাহা হউক, মহাত্মা কার্লাইল পিতার অভিলাষ পূরণে অসমর্থ হইয়া পিতাকে আপনার ইচ্ছা অবগত করিলেন। কথিত আছে, একদা জেম্‌স কার্লাইল নিতান্ত বিমর্ষ-চিত্তে ও বিষণ্ণবদনে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, কোন বন্ধু তাঁহাকে তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "মহাশয়! আজ টমাসের পত্রে জানিতে পারিলাম, সে পুরোহিত-ব্যবসায় গ্রহণ করিতে অসম্মত। আমার বহুদিন পোষিত অভিলাষ আজ বিসর্জ্জন করিতে হইল। বাস্তবিক জেম্‌স কার্লাইলের অভিলাষ পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু মহাত্মা কার্লাইলের উত্তরকালীন কার্য্যকলাপ দর্শন করিলে, রচনা বক্তৃতা পাঠ করিলে কে বলিতে পারে, জেম্‌স কার্লাইলের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই?

টমাস কার্লাইল প্রথমতঃ এমান নগরে এক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তথায় দুই বৎসরকাল কর্ম্ম করিয়া কির্কাল্‌ডি নগরে আরও দুই বৎসর শিক্ষকতা করেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিত লিজেণ্ডার সাহেবের প্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মহাত্মা কার্লাইল উক্ত পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। যদিও নানা কারণে তাঁহার আবেদন ফলদায়ক হয় নাই, কিন্তু তিনি যে উক্ত পদের যোগ্যপাত্র, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। চারি বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার পরে কার্লাইল, চার্লস বুলার নামক এক ব্যক্তির Private tutor অর্থাৎ শিক্ষাদাতা হইয়া লণ্ডন নগরে গমন করেন। উত্তরকালে চার্লস বুলার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা করেন, তৎসমুদায়ের ভাব তিনি কার্লাইলের নিকট হইতেই এই সময়ে লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

দূরতা নিরূপণ।

যে ভানু কিরণ দানে আলোকিছে ধরা,
সে বা কত দূর?

কবিতা।

যে শশী অবনী'পরি পীযূষ বর্ষণ করি
স্নিগ্ধ করে প্রাণীগণে, কোথা তার পুর?
ক্ষণ তরে কোথা হতে আসেরে উদ্যানে
কুসুম প্রচুর?

সুমন্দ মলয়বায় বহিয়া কোথায় যায় ?
যেথায় ঘুমায় গিয়ে তাহা কত দূর ?
কোথা হতে আসে চোখে সুতন্দ্রার ঘোর
এমন মধুর ?
পুত্রশোক ভুলে প্রাণী, অপমান,অভিমানী,
ভুলে থাকে বিষজ্বালা বিরহ-বিধুর।
আমার জাগ্রত ধ্যান, নিদ্রার স্বপন,
এ জীবনে একমাত্র প্রার্থনীয় ধন,
সে বা কত দূর ?
ভানু হতে কতদূর ? শশী হতে কত দূর ?
কত দূর আমা হতে ?—হোক যত দূর,
ত্বরা করে এসে নাথ পুরাও মনের সাধ,
শূন্যময় এ হৃদয় কর ভরপুর।
তুমি কতদূর !
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

কে।

১

কাননে কে নদী তীরে
ডুবে যায় রবি,
হৃদয়ের পটে ধীরে
হেরে কার ছবি ?
কুলু কুলু নদী নীরে
মর্ম্মরে অটবী।

২

কাহার স্বপনে ভোর
কারে ভাবে সুখে ?
প্রাণে লাগিয়াছে ঘোর
'রা'টী নাই মুখে,
মোহন প্রণয় ডোর
ধরিয়াছে বুকে।

৩

বহে মৃদু সমীরণ
দুলিছে চিকুর
প'ড়ে সাঁঝের কিরণ
ললাটে মধুর
শোভে রাঙিমা-হিরণ
শোভা ভরপুর।

৪

কি লাবণ্য সুবিমল
ফুটে কেশ মাঝে !
ফুলরাশি সুকোমল
নিকটে বিরাজে।
যেন তারা সখীদল
মধুময় সাজে।

৫

ব'সে আছে নিরজনে
মাধুরী-নীরব !
পারিজাত উপবনে
রূপ অভিনব !—
জাগে আকুলতা মনে—
অতুল বিভব !

৬

দূরে ভেসে যায় তরী
মাঝি গাহে গান,
শুনে, আহা মরি-মরি
তোলে রে নয়ান—
যেন স্বরগের পরী
অমৃত-সমান।

৭

অধরে প্রণয় যেন
ঝরে শত ধারে,
সৌন্দর্য্য দেখিনি হেন
মানব-আধারে।
এখনো কাননে কেন
তটিনীর ধারে ?

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধারণ করাই ধর্ম্ম। তিনি ব্যতীত সত্য পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই, আর তাঁহাকে ধারণ করা ব্যতীত ধর্ম্মও আর নাই। সত্য কথা বলা, সত্য পথে চলা, সত্যে নিষ্ঠাবান হওয়া, আপনার ন্যায় আত্মজ্ঞানে সকলের উপকার করা, পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী হওয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং একমাত্র ব্রহ্মব্যতীত সকল বিষয়ে অনাসক্ত হওয়াই সত্য-ধর্ম্মাবলম্বীর লক্ষণ। ইহা নিশ্চয় জানিও, জগতে একমাত্র সত্যও তিনি, ধর্ম্মও তিনি। মানব-কল্পিত ধর্ম্ম সমূহকে সত্য ধর্ম্ম কোন-মতে বলা যাইতে পারে না। পরমা-ত্মার যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, তদনুসারে চলাই ধর্ম্ম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে, যেমন তৃষ্ণা পাইলে জল পান না করিলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না; ক্ষুধা পাইলে আহার না করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, অগ্নি ভিন্ন অন্ধকার দূর হয় না; সেইরূপ অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার নিয়ম, ভাব, ও ধর্ম্ম বুঝিয়া লইতে হয়। যাহা দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহা দ্বারা সেই কার্য্য না করাকে অধর্ম্ম বলে, যেমন সহজ অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর না করিয়া বরফ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আলো করিতে যাওয়াই অধর্ম্ম। এইরূপ যখন ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়, তখন স্থূল পদার্থের অংশ লইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়, আর যখন পরমার্থ কার্য্য করিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজন হয়, তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট তেজোময় জ্যোতিঃকে ধারণ করিতে হয়।

তায়কোব্রাহির জীবনচরিত। (১)

বাল্যকাল।

১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর সুইডেনের অন্তঃপাতী স্কায়ন প্রদেশে নূদস্ত্রপ্ নগরে তায়কোব্রাহির জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা দেনজাতীয়; দেন্মার্কেই তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল এবং তথায় ব্রাহিবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত। খ্রীষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহিবংশীয় তর্কিল নামে এক ব্যক্তি তাঁহার কোন ভৃত্যের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, রাজদণ্ড ভয়ে পলায়নপর হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুইডেনের দক্ষিণ প্রান্তস্থ স্কায়ন প্রদেশে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন; তদবধি তথায় ব্রাহিদিগের বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়। অদ্যাপিও দেন্মার্কের নানাস্থানে বিশেষতঃ জুৎলাণ্ডে এবং সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্ত ভাগে ব্রাহি বংশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি দেখা যায়। যে সময়ের কথা লিখা হইতেছে, তৎকালে সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্তস্থ স্কায়ন প্রভৃতি প্রদেশসমূহ দেন্মার্কের শাসনাধীনে ছিল; এবং তর্কিল ব্রাহির বংশধরগণের উপর হইতে রাজদণ্ডভীতি অপসারিত হওয়াতে তাহারা অবাধে সুইডেন হইতে দেন্মার্কে যাতায়াত করিতে পারিত। দেনীয় ভাষাতে তায়কোর প্রকৃত নাম "তাইগে।" তিনি লাটিন অধ্যয়নান্তে সর্ব্বদা স্বীয় নাম লাটিনে লিখিতেন; এবং লাটিনে "তাইসে" কে "তায়কো" বলা হয়, এই হেতু তিনি

নিজকে "তায়কোব্রাহি" বলিয়া পরিচয় দিতেন।

তায়কোর পিতার নাম অট্টোব্রাহি, এবং মাতার নাম "বিয়েতা", ইনি "বিল্ল" বংশের দুহিতা। অট্টোব্রাহি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪৪ অব্দে বিয়েতাকে বিবাহ করেন। নূদস্ত্রপ্ নগর অট্টোর পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকার ভূমি; তিনি তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, অতএব উত্তরাধিকারীসূত্রে নূদস্ত্রপের বসতবাটীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন। জোর্গেণব্রাহি নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তিনি তাঁহাদের দ্বিতীয় অধিকারভূমি তোস্ত্রপ্ নগরে আপন আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করেন। বিবাহের এক বৎসর পরেই অট্টোব্রাহির এক কন্যা জন্মে, এবং তৎপর বৎসর অর্থাৎ ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর তায়কোব্রাহি ভূমিষ্ঠ হন; তাঁহার চারি ভ্রাতা ও পাঁচ ভগ্নী ছিল, তন্মধ্যে তায়কো তাঁহার পিতার দ্বিতীয় সন্তান ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। অট্টোব্রাহির সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান সোফায়া নাম্নী দুহিতা; ইনি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (স্থলবিশেষে ইঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইবে।) অট্টোব্রাহি দেন্মার্কের রাজসরকারে নানা উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বহুবিধ রাজপ্রসাদ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন; অবশেষে তিনি হেলসিংবর্গ দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তথায় যাপন করিয়াছিলেন।

জোর্গেণব্রাহি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন, অতএব বিবাহের পর অট্টোকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মিলে ঐ পুত্র জোর্গেণব্রাহিকে পালনার্থ প্রদান করিবেন। * যখন তায়কো ভূমিষ্ঠ হন, তখন জোর্গেণ ঐ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া অট্টোর নিকট পুত্রপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন; কিন্তু পুত্রের প্রতি মমতাবশতঃ অট্টোব্রাহি তায়কোকে ভ্রাতার গৃহে পালনার্থ দান করিতে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন এবং পুত্র প্রাপ্ত্যর্থ জোর্গেণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তায়কোর জন্মের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে অট্টোর 'স্তেনো" নামে এক পুত্রের জন্ম হয়; তখন জোর্গেণ একদিন নিঃশব্দে ভ্রাতার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তায়কোকে কোলে করিয়া আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। অট্টো ও তাঁহার পত্নী প্রথমে পুত্রকে জোর্গেণের গৃহে দিতে মনস্থ না করিলেও, যখন পুত্র একবার তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তখন আর তাহাকে ফিরাইয়া আনা উচিত মনে করিলেন না। বিশেষতঃ তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, তায়কো জোর্গেণের যত্নে লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হইয়া জীবনে সুখী হইবে এবং কালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, অতএব তায়কো সুহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন।

শিশু তায়কো জোর্গেণের বসতবাটী তোস্ত্রপে থাকিয়া তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭ বৎসর, তখন জোর্গেণ একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তায়কোকে লাটিন ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে তায়কো লাটিনে এমন ব্যুৎপন্ন হইলেন যে, মাতৃভাষা ছাড়িয়া লাটিনে কথা কহিতে অধিক আনন্দানুভব করিতেন, এবং চিঠিপত্রাদি সমস্ত লিখন কার্য্য লাটিনে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অচিরে ঐ ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তিও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অবশেষে জ্যোতিষানুশীলনে জীবনোৎসর্গ করার পর তিনি গ্রহনক্ষত্রাদির যে সকল 'তালিকা' প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলের হস্তলিপিতে স্থানে স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন লাটিন কবিতা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটাই লাটিন ভিন্ন অন্য কোন ভাষায়

---

* অট্টোর বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই জোর্গেণের বিবাহ হইয়াছিল। ইউরোপে বিবাহের ক্রম জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে নিষ্পন্ন না হওয়ার প্রথা এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার জ্যোতিষ-সংক্রান্ত যে সকল কথোপকথন হইত, তিনি তাহার সারমর্ম্ম স্বীয় "পরিদর্শন পুস্তকে" লাটিনে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; তাহার স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয় যে, সময় সময় তিনি ঐ কথোপকথন লাটিন কবিতাতে লিপিবদ্ধ করিতেও ছাড়িতেন না। গমনপর্য্যবেক্ষণ-কালে যদি কোন অত্যাশ্চর্য্য শোভা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইত, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

(Versailles, June, 1864,

A new beginning for

তিলোত্তমা। *

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ মূর্ত্তি, অভ্রভেদী গিরি,—
অটল ধবল-কায়; ব্যোমকেশ যেন
ঊর্দ্ধবাহু শুভ্রবেশে, মজি চিরতপে
ভয়ঙ্করাকৃতি যোগী।—কি কাননরাজি,
কি তরু, কি লতা, কিবা কুসুমমণ্ডলী,—
আর আর শৈলশিরে শোভে যা জনমি,
(মরকতময় স্বর্ণ কিরীটের রূপে)
না পরেন অচলেশ, অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভবইন্দ্র যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
সুনিনাদী বিহঙ্গম, অলি মধুলোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা; সিংহ বনরাজা,
বন-লণ্ডভণ্ডকারী শুণ্ডধর বলী,
শার্দ্দূল, ভল্লুক, কপি, বনবাসী পশু,
সুলোচনা কুরঙ্গিনী—বন কমলিনী,
ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষভরা,
না যায় নিকটে,—বিকট শেখরী! (ক্রমশঃ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ব্রহ্মসাধন;—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য।/০। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতিপয় সুন্দর প্রবন্ধ ইহাতে আছে। কালীনাথ বাবু এক-জন প্রকৃত চরিত্রবান সাধু ব্যক্তি; প্রবন্ধ-গুলিতে তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান এবং গভীর চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

২। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প;—শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এ পুস্তক খানিতে রাম-মোহন রায়ের জীবনের কতকগুলি গল্প সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ভাষা মন্দ হয় নাই। এ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে মোটামোটী একটা জ্ঞান জন্মে। এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থের আট আনা মূল্য কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

৩। জীবন-ছায়া;—ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বিষয়গুলি খুব উচ্চ; এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া সম্ভবপর নয়

* সুদূর ফ্রান্সদেশে অবস্থানকালে, মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, তাঁহার অমিত্রাক্ষরছন্দের প্রথম কৃতি তিলো-ত্তমা সম্ভব কাব্যের যে নূতন সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর পরে, আজ তাহা জন-সমাজে প্রচারিত হইল। বঙ্গীয় কবি-শিরোমণির স্বহস্ত লিখিত আদর্শ সারদা-পুস্তকালয়ে, অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নব্যভারত-সম্পাদকের অনুরোধে সেই আদর্শ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা মুদ্রিত করা গেল।

খুলনার নৈহাটি, কৈলাস-কুটির, সারদা-পুস্তকালয়। } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু, প্রকাশক।

ভাষা বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। মোটের উপরে গ্রন্থখানি পড়িলে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই উপকৃত হইবেন।

৪। সাহিত্য-দর্পণ ;—শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। পুস্তকের বিষয়গুলি বেশ সুন্দর মনোনীত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা তত ভাল হয় নাই। অনেক ছাপার ভুল আছে। পুস্তকখানি যখন বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, এত ভুল না থাকিলেই ভাল হইত।

৫। প্রলাপ ;—লেখক তাঁহার পত্নীবিয়োগে অধীর হইয়া কবিতায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা সরল ও ভাব স্বাভাবিক হইয়াছে। তবে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইলাম না।

৬। স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত ;—এখানি একটী সাধ্বী বিদুষী হিন্দুরমণীর জীবনচরিত। এরূপ প্রতিভাশালিনী রমণী যে বঙ্গগৃহে কত আছে,কে বলিতে পারে ? কিন্তু শিক্ষার অভাবে এই প্রতিভার বিকাশ হইতে পারে না। দেবী মুক্তকেশী যদিও ১৭শ বৎসর বয়সেই মানবলীলা সংবরণ করেন, এই অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পুস্তকখানি পাঠ করিলে এই রমণীর চরিত্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে হয়।

৭। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ;—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য আট আনা। মোহিনী বাবুকে ধন্যবাদ যে, তিনি এমন সুন্দর এবং বৃহৎ গ্রন্থ এত অল্প দামে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানিকে ভ্রমণবৃত্তান্ত না বলিয়া একটী প্রকৃত সাধুর জীবনচরিত বলিলেও দোষ হয় না। ভাষা খুব সরল এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই পরম উপকৃত হইবেন।

৮। দার্শনিক মীমাংসা, প্রথম ভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ;—শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য ১৲ টাকা। এ গ্রন্থখানিতে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং বিজ্ঞতার বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভাষা ভাল হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন।

৯। Drinking ; by Taradhan Trakabhusan, মূল্য ।০। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। প্রবন্ধ দুটী লেখকের বিশেষ চিন্তাশীলতা এবং সুরাপান বিষয়ে বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণার পরিচায়ক।

১০। ধ্রুব-চরিত্র—দৃশ্যকাব্য ; শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ॥০। লেখক অতি পবিত্র বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের যথেষ্ট পবিত্রতার আভাস পাওয়া গিয়াছে। নাট্যাংশে পুস্তকখানি তত ভাল হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, উপাখ্যান আকারে এই সুন্দর বিষয় লিখিলেই ভাল হইত।

১১। মানব-সখা—প্রথম ভাগ, বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৶০। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

১২। Aryan traits by Koylash Chandra Mukherji. গ্রন্থকার পুস্তকখানির নাম Aryan traits কেন রাখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক সমালোচনাই পুস্তকের উদ্দেশ্য ; সুতরাং Aryan traits না বলিয়া "Criticism upon Indian Society &c." বলিলেই ভাল হইত। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভাল এবং গ্রন্থকার নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। লেখার বেশ জোর আছে, কিন্তু বিষয়গুলির সংযোজনা তত ভাল হয় নাই। বোধ হয়, গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম, তাই অনেক স্থলে বিষয় বিপর্য্যয় (Cofusion of points) ঘটিয়াছে। গ্রন্থকারের ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা (Humour) মন্দ নয়। আমাদের দেশের নেতৃবর্গ এরূপ গ্রন্থ একবার পাঠ করিলে মন্দ হয় না।

একাদশ খণ্ড—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩০০।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত ;

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই আষাঢ়, ১৩০০।

[এই সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা।

১। প্রেসের দোষে জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্যভারত কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আষাঢ় মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা শ্রাবণ সংখ্যায় সংলগ্ন হইবে। যাঁহারা পূর্ণ মূল্য দেন, তাঁহারা ১৩০০ সালের মূল্য আষাঢ় মাসের মধ্যে অগ্রিম দিলে ২॥০ হিসাবে গৃহীত হইবে, তৎপর পূর্ণ মূল্য ৩৲ দিতে হইবে।

২। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা মৈমনসিংহ অঞ্চলে এবং শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক আসাম ও উত্তর বাঙ্গলা অঞ্চলে নব্যভারতের মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ পূর্ব্বক, রসিদের মুড়িতে টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া, দয়া করিয়া মূল্য প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব। স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন কেহ মূল্য দিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

৩। ১২৯৯ সাল শেষ হইবার সময়ে আমরা সমস্ত গ্রাহকের নিকট স্বতন্ত্র পত্রে হিসাব পাঠাইয়াছি। অনেকে দয়া করিয়া টাকা দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন গ্রাহক পত্র refuse করিয়া ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন! যাঁহারা অ'জও আমাদের সকরুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা আর উপেক্ষা না করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

৪। মূল্য প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন।

৫। আমরা সহযোগী সম্পাদকগণকে লাইসেন্স টেক্স সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সকলে তাহা করেন নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ইউনিটি এবং মিনিস্টার পত্রিকার সহৃদয় সম্পাদক মহাশয় যেরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন, সকলে এরূপ করিলে শীঘ্রই আন্দোলনে সুফল ফলিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে একজনের প্রতি অত্যাচার হইলে আর দশজনে তামাসা দেখেন! এমনই জীবন্ত সহৃদয়তা! আগামী মার্চ্চ মাস শেষ হইতে না হইতে সকল সম্পাদককে নিশ্চয় এই কর ভারাক্রান্ত হইতে হইবে।

৬। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই। ইনসফিসেণ্ট পত্র নব্যভারত কার্য্যালয়ে গৃহীত হয় না।

সুখ।

এ সংসারে সকলেই সুখের জন্য পাগল। গিরি-চূড়ায়, সমুদ্র তলে, ব্যোমযানে, পশু-পৃষ্ঠে, জলে, স্থলে, অরণ্যে যেখানে মনুষ্য সমাগম দেখিবে, সেইখানেই জানিবে, মনুষ্য অনুদিন সুখান্বেষণে নিরত। সুখের মনোমোহিনী ছবি আমাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে—সুখান্বেষণে জগৎ নিয়ত ঘুরিতেছে—সুখই যেন সংসারের মেরুদণ্ড। শয্যা হইতে উঠিয়া পুনরায় শয্যায় যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা যত কিছু করি, সকলেরই এক লক্ষ্য সুখের দিকে—সুখকে কেন্দ্র করিয়া মনুষ্য-জীবন পরিচালিত। রাঁধি বাড়ি, খাই দিই, চলি ফিরি, নাচি গাই, কাঁদি হাসি, লিখি পড়ি সকলই সুখের জন্য—সুখ ভিন্ন অন্য কিছুকে লক্ষ্য করিয়া কে কবে কি কাজ করিয়াছে বল দেখি? অমানুষী, অসংসাহসী, নীচ, ঘৃণ্য সকল কাজই আমরা সুখের জন্য করি—আমাদিগের রোদন, হাহাকার, আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত সুখের জন্য। সংসারে সুখই মোহিনী মন্ত্র—এই মন্ত্রের সাধনায় কপর্দ্দক-শূন্য দীন দরিদ্র হইতে রত্ন-সিংহাসনারূঢ় রাজাধিরাজেন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই দিবারাত্রি ব্যস্ত। যে সুখকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সামগ্রীটা কি, কিসে তাহার উৎপত্তি, কোথায় তাহার পরিণতি, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষ কর—এক অনন্ত অজ্ঞাত স্থলে গিয়া পড়িবে, কিছুই নির্দ্ধারণ করা যাইবে না।

সুখের নামান্তর—অভাব মোচন। কিন্তু বল দেখি, কাহার কবে অভাব মোচন হইয়াছে? কত কাঁদিয়াছ, দীর্ঘশ্বাসে সুমীরণকে কত উত্তপ্ত করিয়াছ, হৃদয়ে কত করাঘাত করিয়াছ, কত ঠাকুর দেবতার দ্বার ধরিয়াছ, কি না করিয়াছ, কিন্তু যাহার জন্য এত করিয়াছ, তাহা কি পাইয়াছ? হইতে পারে, তোমার কপাল মন্দ, সেই জন্য এত করিয়াও তুমি যাহা পাইলে না, শান্তিরাম তাহা পাইয়াছে, হয়ত বিধাতা প্রসন্ন হইয়া অনায়াসে তাহা মিলাইয়াছেন—বল দেখি শান্তিরাম সুখী হইয়াছে কি? শান্তিরাম যাহার জন্য ব্যাকুল ছিল, তাহা পাওয়াতেই কি তাহার অভাব মোচন হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই। অভাবকে বিভাগ করিলে দেখিবে যে, তাহার একাংশ হয়ত মোচন হইয়াছে, অবশিষ্ট নয়শত নিরানব্বই অংশ যেমন তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে—নয়শত নিরানব্বই অংশ পূরণ কর, তথাপি দেখিবে, আরও নয়শত নিরানব্বই অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে। অভাব একটী অখণ্ড রাশি, তাহাকে যত খণ্ড খণ্ড করিবে, প্রত্যেক খণ্ডই অখণ্ড বলিয়া অনুমিত হইবে। গল্প শুনিয়া থাকিবে যে, এক ঘটী জল একটা সমগ্র রাজ্যের জীব জন্তু মিলিয়াও পান করিয়া নিঃশেষিত করিতে পারে নাই—অভাবও তেমনি যত পূরণ কর না তথাপি পূর্ব্ববৎ থাকিবে, নিঃশেষিত ত হইবেই না, তাহার হ্রাসও হইবে না। হইতে পারে, তাহাকে রূপান্তরে দেখিবে; কিন্তু নিঃশেষিত করিতে যে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত। অভাব দূরিত না হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই কিন্তু অভাব দূরিত হয় না, সুতরাং সুখও মিলে না। সুখেতে অভাবেতে সম্বন্ধটা দুইটী সমান্তরাল সরল রেখার সম্বন্ধ, স্বাভাবিক

অবস্থায় দুইটীর ত পরস্পর সাক্ষাৎ নাই-ই, উভয়কে যেদিকে ইচ্ছা বর্দ্ধিত কর, তথাপি কেহ কাহাকে স্পর্শ করিবে না। ইহার কারণ এই যে, অভাবটা অখণ্ড ও সুখটা ভগ্নাংশ—পূর্ণমাত্রায় কেহ কখন সুখের মুখ দেখে নাই। সুখ যখন ভগ্নাংশ, তখন যতই বড় ভগ্নাংশ হউক না, কখনই অখণ্ড রাশির সমান হইতে পারিবে না, অর্থাৎ কেহই পূর্ণ মাত্রায় অভাব মোচন করিয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না।

যাহার অভাব মোচন হয়, সে সুখী হয় বলিয়া, যাহার অভাব নাই সে ব্যক্তি যে সুখী অথবা পূর্ণ মাত্রায় সুখী, তাহা নহে। অভাব চাই এবং তাহা পূর্ণ হওয়া চাই, তবেই সুখের সাক্ষাৎ মিলিবে—সুখে অভাবে পরস্পর অতি গূঢ়ভাবে জড়িত। যাহার যত অধিক অভাব এবং অধিক পরিমাণে তাহা পূর্ণ হয়, সে তত সুখী—যাহার যত অধিক অভাব এবং তাহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, সে তত অসুখী। আবিশিনিয়া দেশের রাজপুত্র রাসেলাসের কোন অভাবই ছিল না; সুতরাং তিনি কিছুমাত্র সুখী হইতে পারেন নাই। যাহাকে তুমি আমি অভাব প্রযুক্ত সুখ বলি,রাসেলাসের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না, ইচ্ছামাত্র শত শত দাস দাসী তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিত; তথাপি সুখের গিরি গহ্বরস্থ প্রাসাদ তাঁহার দুঃখে প্লাবিত কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সেই সুখ নিকেতনে তাঁহার অভাব ছিল না। যখন অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহা পূর্ণ করিবার জন্য গিরি-গহ্বর হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কিছুদিন দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলেন, তখন বুঝিলেন যে, সুখ এ সংসারের সামগ্রী নহে, এ সংসারে তাহার পূর্ণ বিকাশ কেহ কখন দেখিতে পায় না। আমার দারুণ অর্থাভাব আছে, সুতরাং তোমাকে কুবেরের ভাণ্ডারের অধীশ্বর দেখিয়া আমার মনে হয় বটে যে, তুমি পরম সুখে আছ; কিন্তু তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য নয়নানন্দকর সন্তান না থাকাতে তুমি যে কি প্রকার দুঃখসাগরে ডুবিয়া আছ এবং অন্যকে পুত্রবান দেখিয়া তাহাকে কি পরিমাণে সুখী ও আপনাকে অসুখী বিবেচনা কর, তাহা তুমিই জান; পুত্রধনে যে ধনী, সে তাহা অনুমান করিতেও পারে না। যাহার যাহা আছে, সে তাহাতে সুখী হইতে পারে না—যাহা নাই তাহা পাইলেই কেবল আপনাকে সুখী মনে করে। এই কারণে দেখা যায় যে, আপন আপন অবস্থায় কেহই সুখী নহে—যাহার যাহা অভাব,অন্যকে তাহার অধীশ্বর দেখিয়া তাহাকে সুখী ও আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে। যদি আপনার সুখের সহিত অন্যের দুঃখের তুলনা করা মানুষের স্বভাব সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অনেক দুঃখী লোকে আপনাকে সুখী মনে করিতে পারিত। একে অন্যকে সুখী এবং আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে বলিয়াই সংসারে এত হিংসা, এত দ্বেষ, এত পরশ্রী-কাতরতা! আমার সুখের সামগ্রীর সহিত তোমার দুঃখের সামগ্রীর তুলনা করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই আমার জন্মে না, জন্মে তোমার সুখের সামগ্রীর সহিত আমার দুঃখের সামগ্রীর তুলনা করিতে অর্থাৎ আপনার অভাব বৃদ্ধি করিতে। অভাব বৃদ্ধি সভ্যতার অঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা পূর্ণ না হইলে যে অসুখের বৃদ্ধি হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শকটারোহণে ভ্রমণ করা সভ্যতাব্যঞ্জক, তাহাতে

সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার যদি তাহা করিবার সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে তোমাকে শকটারোহণে সন্ধ্যা সমীরণ সেবনে বহির্গত হইতে দেখিলে আমি যে উহাকে আপন অভাব মনে করিয়া অসুখী হইব, তাহা কে অস্বীকার করিবে? উত্তম অট্টালিকায় বাস, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান, সুস্বাদু দ্রব্য আহার ইত্যাদি বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার সভ্যতা পরিচায়ক এবং সভ্য জগতের কোন ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারে যদি বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার অসুখের সীমা থাকে না। ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহারে তাহার অপূর্ণ অভাবের মধ্যে পরিগণিত হইলেই তাহার অসুখের নিদান হইয়া দাঁড়ায়। অসভ্য জগতে এবম্প্রকার সামগ্রীর ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, সুতরাং কেহই উহাকে আপনার অভাবের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া দুঃখের ভরা ভারি করে না। এই জন্য অসভ্য সমাজে সভ্য সমাজ অপেক্ষা দুঃখের অংশ অল্প। একজন অসভ্য ইতর লোক যে পরিমাণে সুখী, একজন সম্ভ্রান্ত সভ্য লোক কখনই সে পরিমাণে সুখী নহে; কারণ সভ্য জগতে অভাবের অনুপাত অনেক অধিক। তাই বলিয়া আমরা অসভ্যতার পক্ষপাতী নহি। সভ্য জগতে অভাব অধিক বটে; কিন্তু সে অভাব মোচনের উপায় ত নিতান্ত অল্প নহে। সুখ সৌকর্য্যের জন্য সংগ্রামই প্রকৃতির নিয়ম—সে সমাজে যত সংগ্রাম, সে সমাজ তত সভ্য ও উন্নত। এ সংগ্রামের শেষ নাই, বিরাম নাই; সুতরাং সুখেরও পূর্ণ বিকাশ কোথাও পরিদৃষ্ট হইবে না।

এ প্রস্তাবে আমরা কেবল মানস দুঃখের কথাই বলিলাম; কিন্তু তদ্ব্যতীত শারীর দুঃখেও যে জগৎ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তাহা কে না দেখিতেছে? এ সংসারে আসিয়া শারীর দুঃখের হাত কে কবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? এ সংসার দুঃখ ভোগের জন্য—সুখ ভোগের জন্য নহে। যখন আমরা অসুস্থ থাকি, তখন দুঃখ ভোগ করি; কিন্তু যখন সুস্থ থাকি, তখন তাহার সুখ অনুভব করিতে পারি না। অভাব পূর্ণ হইবামাত্র সুখানুভব করি সত্য; কিন্তু অভাবের অভাব হইলেই আর সুখের মাত্রা অনুভব করিতে পারি না এবং সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত তাহা হইলে সুখ যে কি সামগ্রী, তাহা আমরা আদৌ অনুভব করিতে পারিতাম না। যেমন আলোক কি সামগ্রী, তাহা বুঝিবার জন্য অন্ধকারের আবশ্যক, তেমনই সুখানুভূতির জন্য দুঃখের আবশ্যক। দুঃখ অভাব জনিত—সুখ অভাবের বিনাশ জনিত। শারীর দুঃখ বা অন্য প্রকার দুঃখের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং কি উপায়ে সে সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, তাহার উল্লেখে বিরত থাকিলাম। সংক্ষেপে এইমাত্র বক্তব্য যে, অভাবই দুঃখ এবং তাহার মোচনেই সুখ।

এ সংসারে যে মনুষ্যের অভাব মোচন হয় না, তাহা আর কাহাকেও বলিতে হয় না। দুই চারিটা অভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই সকল অভাব মোচন হইল না। সকল অভাব মোচন করিয়া পূর্ণ সুখের অধিকারী হওয়া মনুষ্যের ভাগ্যলিপি নহে। পূর্ণ অখণ্ড ঈশ্বর ভিন্ন পূর্ণ সুখ আর কোথাও থাকিতে পারে না—আনন্দময় তিনি ভিন্ন আর কেহই নহে। তবে কি আমরা কোন মতেই সুখের মুখ

দেখিবার অধিকারী নহি? আমরা সুখভাগী হই না হই, যাহাতে অধিকাংশ দুঃখ সন্তাপ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, এমন উপায় পণ্ডিতেরা অবশ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অভাব মোচন আমাদিগের আয়ত্বাধীন না হইলেও অভাবকে সংক্ষিপ্ত ও নিস্তেজ করা অনেকটা যে আমাদিগের আয়ত্বাধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহার অভাব অল্প, সে অধিক সুখী না হইলেও, তাহার যে দুঃখ অল্প, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। অভাবকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাহ্যজগতে তাহার জন্ম নহে—আপনার মনের মধ্যেই তাহার জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতি। মনই মনুষ্যের রাজা, যে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সুখ দুঃখের নিদান, তাহারা সকলেই মনের অধীন হইয়া কার্য্য করে; সুতরাং এই মনকে দমন ও বশীভূত করিতে পারিলেই অভাবের মাত্রা হ্রাস ও তীব্রতার খর্ব্ব করা যাইতে পারে। অভাবকে যদি অভাব বলিয়া গণ্য না করি, তাহা হইলে আর তাহা পূরণের জন্য আমাকে বিব্রত হইয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয় না—যে সুখান্বেষণে জগৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তাহা না পাইলেও গৃহে বসিয়া তাহার অভাবজনিত দুঃখের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারি। বাসনা হইতে অভাবের জন্ম, অভাব হইতে দুঃখের উৎপত্তি। আমি সম্পদ কামনা করি এবং তাহা না পাইলেই দুঃখে মরি; কিন্তু যদি সম্পদ কামনাকে মনোমধ্যে অঙ্কুরেই ধ্বংসকরি, অথবা আদৌ জন্মিতে না দিই, তাহা হইলে আর তজ্জনিত অভাব আমাকে দুঃখ দিতে পারে না। এই প্রকারে পদ, গৌরব, স্ত্রী, পুত্র, যে কিছু সামগ্রীরই অভাবজনিত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, তদ্বিষয়ের কামনাকে যদি মনে স্থান না দিই, তাহা হইলে তাহা হইতে দুঃখ জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়?

কামনা রহিত হইলে সংসারে আর মনুষ্যের কার্য্য থাকে না—বাসনা শূন্য হইয়া আত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। সকলেই যে একেবারে কার্য্যশূন্য হইয়া সদাই মুক্তিলাভ করিবে, আমরা এমন কথা বলি না; তবে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ক্রমে কামনা সংক্ষেপ করিতে পারিলে সংসারের এত ক্রন্দন ও হাহাকার ধ্বনি অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। একেবারে কার্য্য ত্যাগ করিতে বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, এবং সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবও নহে। কার্য্য আবশ্যক; কিন্তু তাহার ফলের কামনাকে মন হইতে বর্জ্জিত করিতে হইবে। ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে সমস্ত কর্ম্মফল "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিতে না পারিলে দুঃখ নাশের আশা নাই, কারণ ফলেচ্ছু হইয়া কার্য্য করিলে যদি তাহাতে বিফল-মনোরথ হই, তাহা হইলেই সুখলাভ করিতে পারিলাম না। আর যদি ফল-কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে কার্য্যে সফল বা বিফল হইলে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। এই প্রকার ফল রহিত কার্য্য করিতে শিখিলে ক্রমে আমিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং আমিত্ব লুপ্ত হইলে আমি আর সুখ দুঃখের ভোগ কর্ত্তা নহি; সুতরাং সুখ দুঃখ আর আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে পারিবে না। এই অবস্থায় ব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করিলে আর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, ক্রমে তদ্গত হইয়া তাহার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়।

এই জন্য যোগিগণ কামনা নাশকেই যোগসিদ্ধির প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে বাস করিয়া অথচ পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত না হইয়া যিনি আপন জীবনের গন্তব্য পথে চলিতে পারেন, তাঁহার ভাগ্যেই পরমানন্দ লাভ হয়। যত কিছু কর না কেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে না পারিলেই জন্মগ্রহণ করা বিফল হইল— বাজীকর রজ্জুপথে চলিতে চলিতে যেমন নানাবিধ কৌতুক দেখায়; কিন্তু মাণদণ্ডের দিক হইতে কদাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই পড়িয়া মরে। অতএব কামনাকে ধ্বংস করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া ভজ্জিত বীজের ন্যায় সংসারে বিচরণ কর; যদি শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সত্য হয়, তাহা হইলে, আর জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। আত্মাকে পরমাত্মায় লীন কর, সংসার-সাধে জলাঞ্জলি দাও—দুঃখ সন্তাপ আর তোমাকে স্পর্শ করিবে না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

একখানি ফটো

নবীন যৌবন আননে উছলে,
　নবীন যৌবন নয়নে,
নবীন যৌবনে ঢল ঢল তনু
　ঢাকা মনোলোভা বসনে,—
কাহার নয়নে ঢালিতে অমিয়,
　পরাণে ঘুচাতে বেদনা,
এ ননীতে গড়া তনু মনোহর
　রেখেছ ফটোতে, বল না?

২

ওই যে অমল মুকুতার দামে
　জড়িত বিনান কবরী,
যেন যমুনার তরঙ্গ-মাঝারে
　খেলিছে জাহ্নবী-লহরী;

৩

যামিনী-লাঞ্ছিত চিকণ চিকুরে
　ওই সরু রেখা সিঁতিতে,
দীপ্ত ছায়াপথ নীল-নভঃ-মাঝে
　যেন কাল অমা-নিশীথে;

কুন্তলে বেষ্টিত সুন্দর ললাট
　স্ফটিকের আভা বিকাশে,
নব জলধরে ঘেরিয়াছে যেন
　সপ্তমীর চাঁদ আকাশে;

৫

অপাঙ্গের বাণে ভাঙি হৃদি-খান
　যেই ভুরু-ধনুঃ খেলিত,
এবে সে ছবিতে রহিয়াছে, মরি,
　স্থির-সুষমায় ললিত;

৬

তার মাঝে টিপ, ঘন-নীল বিন্দু,
　ছবিতে বসিয়া আছে সে,
নহিলে কোন সে প্রমত্ত অধর
　মূর্ছিত চুম্বন-আবেশে;

৭

পূর্ণ-বিস্ফারিত আয়ত লোচনে
　কাল তারা হতে ঝরিছে
কৌমুদী-মধুর মৃদু জ্যোতিঃ-ছটা,—
　হৃদয়ে আঁধার হরিছে;

অথবা নিথর বিজলী যেন বা
জলধর ত্যজি আসিয়া,
লগন-ভ্রমর কমলের কোলে
সুধীরে পড়েছে খসিয়া,
প্রকাশি কেমন সাজে চারুতর
সুষমার কোলে সুষমা,
দেখারে মোহিত মানব-নয়নে
কুসুমে দামিনী উপমা,—
নলিনী-মাধুরী ধরেছে বিজলী,
বিজলীর তেজ নলিনী,
তীরে, মৃদুতায়, শোভার জগতে,
গলাগলি ভাব এমনি!
প্রেম-মৃগয়ায়, ওগো নিষাদিনি,
অবসাদ বুঝি হয়েছে,
ক্ষিপ্র আঁখি-শর তাই কি গো থির
চাহনিতে বাঁধা রয়েছে?
ঘন-কাল-পক্ষ ওছবি-নয়নে
চঞ্চল অপাঙ্গ ছোটে না,
দারুণ বেদনে দহিয়ে পরাণ
আগুনের কণা ওঠে না!

৮

বিস্ফারিত ওই সুঠাম নাসায়
অধর-চুম্বিত নোলকে
হেরিতে বাহার প্রাণ-মন-হরা
চায় আঁখি বিনা পলকে,—
অরুণের-ছটা গোলাপ-পাপড়ি
মাঝেতে যেমন ঝলে রে,
তরুণ উষার কিরণ পরশে
নীহার, মুকুতা-ছলে রে!

৯

শারদ নিশির পূর্ণ শশধর
বিরাজে যুগল কপোলে,
ত্যজি মৃগ-চিহ্ন, ধরিয়াছে বুকে
অমল গোলাপ-মুকুলে!

উঠেছে যে বিধু (সেকালের কথা)
ক্ষীরোদ-জলধি-মথনে,
সে কিও কঠিন মৃত উপগ্রহ,
ঋণে যে পেয়েছে কিরণে?—
পুরাণ প্রবাদ যদি সত্য হয়,
সে শশী ত তব কপোলে,
দুগ্ধ ছানিলে ওঠে নবনীত,
তাহা দিয়ে গড়া যে গো এ!
কে সে নীলমণি, যে চুরি করিয়ে,
লুকায়ে যশোদা জননী,
মাখি হাতে, মাখি অধর-যুগলে,
নিরালয়ে খায় এ ননী?

১০

চারু কাণে গাঁথা কনকের দুল,
খচিত উজ্জ্বল হীরকে,
গোলাপী ফানসে সোণালী ঝালর
দীপতলে যেন চমকে!—
ছবিতে নিথর;—লীলা গতিবসে
মোহি আঁখি সে যে দুলিত,
পালঙ্কে ওতনু অনঙ্গ-মোহন
হেলিলে, কপোলে লুটিত!

১১

অবশ লেখনী লিখিতে অধর,
আঁখি যে গো আর ফেরে না,
সুবঙ্কিম-রেখা রাঙা ঠোঁট দুটি
ছাড়া আর কিছু হেরে না!—
হৃদয়ে চুয়ান প্রেমের মদিরা
ঢালিবারে প্রিয়-অধরে
লালসা-বাড়ানো চুনির পিয়ালা
খচিত মুকুতা-সুথরে!
একবার পানে, আ—রো পিয়াসা,
দুবারে, জড়তা বচনে,
তিনবারে,—তনু আর ত বহে না,
মুরছে মুদিয়ে নয়নে!

১২

বসন্ত-চাঁদিনী ছড়ায়ে কপোলে,
ছড়ায়ে ললাট উপরে,
ছড়ায়ে বিকচ-নলিন-নয়নে,
অতি মৃদু হাসি অধরে;—
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস,
জানা যায় যায়, যায় না,
জোছনা হতেও তরল আলোক
যথা ভায় ভায়, ভায় না;
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস,
আধো জাগে যাহা অধরে,
দূরদেশে থাকি প্রেম-লিপিযোগে
প্রাণেশ যখন আদরে;
এ ত হাসি নয়,—হাসির আভাস,
আধো ভাতে যাহা নয়নে,
যখন, বিরলে, পুরাণ সোহাগ
জেগে ওঠে সুখ-স্মরণে!

১৩

এ চারু মুরতি, কুসুম-কোমল,
জোছনা-মধুর-হাসিনী,
যৌবন-উছল রূপের সরসে
প্রেম-শতদল বাসিনী,
কাহার লাগিয়ে ফটোতে আঁকিয়ে
রেখেছ বল না, ললনে,
সুখ-স্মৃতি কার হৃদয়ে জাগাতে,
বরষিতে সুধা নয়নে,
কার হাতে দিয়ে, বলেছ করুণে
ঝরিয়ে মমতা-অমিয়,—
"আমার বিরহে দহিলে পরাণ,
বুকে চেপে ইহা, ঘুমিও!"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

মার্শেয়েঝ। (৪)

মার্শেলিঝ ধুরন্ধরগণ ২৯শে জুলাই ১৭৯২ পারিতে উপস্থিত হয়। ১০ই আগষ্ট পারির যাবতীয় শস্ত্রধারী পুরুষ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীতা অবলম্বন করিয়া Tuilleries প্রাসাদ আক্রমণ করে। উন্মত্ত লোকেরা বলপূর্ব্বক প্রাসাদ তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আসন্ন বিপৎপাতের সমূহ সম্ভাবনা দেখিয়া রাজা সপরিবারে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্যবস্থাপক সভা মণ্ডলী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আর প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন অথবা প্রাসাদ-সুখ সম্ভোগ করিতে হয় নাই। দিবসত্রয় সভামণ্ডপে যাপন করিয়া টেম্পল কারাগৃহে অবরুদ্ধ হন এবং সাধারণ তন্ত্রের অভিষেকার্থ বধ্যমঞ্চে জীবন শোণিতপাত জন্য চিরজন্মের মত যা একবার সে কারানিবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজার শরীর রক্ষী সুইস সৈন্যগণ প্রাসাদ সংরক্ষণ করিত। মার্শেয়েঝ-মদিরামত্ত বিদ্রোহী প্রজা-সাধারণ বাদ্যযন্ত্রে মার্শেয়েঝ সুর চড়াইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিকট রব তুলিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সুইস রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল এবং বলে পরাস্ত করিয়া উহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। দলে দলে সকলে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাতায়ন পথ দিয়া বহুমূল্য রাজকীয় দ্রব্য সামগ্রী পথে ও চতুপার্শ্বস্থ উদ্যানমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। লোকেরা রাজানুগত মৃত ও আহত সুইস সেনাদিগকে বাতায়ন পথ

দিয়া নিম্নে প্রক্ষেপ করিতেছে। উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র করিয়া লোহিত কোটের ছিন্নাংশ বর্ষাগ্রে উড্ডীন করিতেছে। দলে দলে মার্শেয়েঝ গাহিতে গাহিতে রাজার মদ্য ভাণ্ডারে অবতরণ করিতেছে। উন্মাদের ন্যায় চৈতন্য বিরহিত হইয়া মদ্যাধার ভাঙ্গিয়া মদ্য পান করিতেছে। এ দিকে প্রাসাদের চতুষ্পার্শে উদ্যানে প্রাঙ্গনে পথে নিহত সৈন্যের স্তূপ। শোণিত-স্রোতে প্রাসাদ ভূমি রঞ্জিত। আহতদিগের আর্ত্ত-রবে গগন পূর্ণ। সুরম্য প্রাসাদ ভয়াল দর্শন শ্মশানে পরিণত। সে দিকে কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ অম্লান বদনে সে ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শোণিতাক্ত কলেবরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। এইরূপেএকদিন, দুইদিন চলিয়া গেল, সে দানবীয় উৎসবের বিরতি নাই। সেই মার্শেয়েঝের উন্মত্ত রব, সেই অমানুষী চীৎকার ধ্বনি, সেই ভয়াবহ রাক্ষস-প্রকৃতির অভিনয়, অবিশ্রান্ত চলিতেছে। এ বীভৎস ভাব, এ আসুরিক আচরণ, এ অমানুষী কাণ্ড কল্পনাও বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু এ সকলের মূলে মার্শেয়েঝ-মদমত্ততা।

যখন ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্তে সন্ধি-বদ্ধ য়ুরোপীয় যাবতীয় রাজাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ফরাসীগণ প্রস্তুত হইতেছিল, এই মার্শেয়েঝ এক প্রকাণ্ড মহাশক্তির ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া সমুদয় ফরাসীজাতিকে রণক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত করিয়াছিল। য়ুরোপীয় রাজন্যগণের সমবেত যুদ্ধ-মন্ত্রণা শুনিয়া অনেক দিন হইল, সাধারণতন্ত্র উহাদিগের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছে। বিপক্ষগণ মহা সমারোহে সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে। ফরাসী-রাজ্যে প্রত্যেক ধর্ম্ম-মন্দিরের শিখর হইতে বিপদ পরিজ্ঞাপক ঘণ্টা অহর্নিশা বাজিতেছে। দায়িত্ব সম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ বিষাদ-মাখা গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন "স্বদেশীয়গণ দেশের মহা বিপদ উপস্থিত।" এ দিকে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠে মার্শেয়েঝ উচ্চারিত হইয়া ফরাসীগগন ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। সকলেরি মুখে "অস্ত্র ধর", সকলেরি মুখে "এস যুদ্ধে যাই"। মার্শেয়েঝ সকলেরি মুখে এক উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ ধূয়া যোগাইয়া দিয়াছে। স্নেহময়ী জননী প্রিয়তম সন্তানকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। প্রণয়িনী প্রিয়তমকে অস্ত্র ধারণ করিতে বলিতেছেন। যুবকগণের মধ্যে যাহারা খর্ব্বাকৃতি বলিয়া সেনাদলভুক্ত হইতে পারে নাই, তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। সকলেই স্বদেশ-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্নবান। উৎসাহ, উদ্যম, স্বদেশ-প্রাণতা শিরা ধমনীর শোণিতকে উষ্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এ সকলেরি মূলে সেই মার্শেয়েঝ। কেন না, এক্ষণে সকলেই, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি বালিকা, মার্শেয়েঝ শিখিয়াছে। এমন সর্ব্বজনীন উৎসাহোদ্দীপক মহামন্ত্র আর কি হইতে পারে! এমন জীবন-মরণ, স্নেহ-মায়া তুচ্ছকারী উন্মাদকারী আহ্বান কখনও কাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই সমুদয় ফ্রান্স-রাজ্য সমরাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল।

আমরা ইতিহাসে দেখি, যখন ফরাসী সাধারণতন্ত্র য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ সহ সংগ্রামে Jemappes নামক স্থানে জয়ী হইল (৬ নবেম্বর ১৭৯২) তখনও এই মরণ-বিজয়ী, শমন-তুচ্ছকারী মার্শেয়েঝ ফরাসী সৈন্যগণকে

মৃত্যুর করাল মুখে চালিত করিতেছে। কথিত আছে, উক্ত রণে ফরাসীদিগের জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বাস্তবিক, সেনাধ্যক্ষ ডুমুরিয়ে স্বয়ং বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-তনু; সৈন্যগণ অগ্নিময় কামানের আঘাতে জর্জ্জরিত ও ছিন্ন-ভিন্ন। এমন সময়ে ডুমুরিয়ে সহসা সে শত্রু-মেখলার মধ্যে অটল উৎসাহ-সহকারে মার্শেয়েঝ তান ধরিলেন। অগ্নি দশ-সহস্র কণ্ঠ হইতে মানব-গ্রাসকারী, মৃত্যু দলনকারী মার্শেয়েঝ সাহুঙ্কারে বজ্ররবে নিঃসৃত হইল। আর ফরাসীদিগকে কে বাধা দিতে পারে? আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসরণের ন্যায়, এক অজেয় অব্যাহত মত্ততার বেগে শত্রু ও অগ্নি তুচ্ছকারী মরণের ভীষণ ব্যাদনের মধ্যেই ছুটিল। শত্রুপক্ষ সে উৎসাহ ও রণমত্ততার সমক্ষে মুহূর্ত্তের তরেও তিষ্ঠিতে পারিল না। ফরাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে মার্শেয়েঝ গাহিতে গাহিতে অগ্নিময় ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় সম্মুখে যাহা পাইল, তাহাই কবলিত করিল। অস্ট্রিয়ানগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ডুমুরিয়ে শস্ত্রের বলে যাহা সাধন করিতে সক্ষম হন নাই, মার্শেয়েঝ দ্বারা তাহা সাধিত করিলেন। মার্শেয়েঝ বলে ফরাসীগণ বিজয়ী হইল। কার্লাইল লিখিয়াছেন ;—

"Thus, through the hands of Dumourez, may Rouget de Lille, in figurative speech, be said to have gained, miraculously, like another Orpheus; by his Marseillese fiddle-strings, a Victory of Jemappes; and conquered the Low Countries."

Carlyle's French Revo. P. 72, Vol. III. (Chapman and Hall.)

আমরা আবার দেখি, এই মার্শেয়েঝ ফরাসীদিগকে অটল উৎসাহে গিলটিন তলে লইয়া যাইতেছে। "সেই একই তরবারী সৈনিকের হস্তে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছে,—এবং ঘাতকের হস্তে দুর্ভাগাদিগকে বধ করিয়াছে।" ফ্রান্স এখন বাহ্য শত্রুর আক্রমণ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। কিন্তু গৃহ বিবাদের অনল ফ্রান্সের মধ্যে এখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজকীয়তার উচ্ছেদ সাধন হইয়া সাধারণতন্ত্র সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মদ্রোহে উহা এক্ষণে বিপর্য্যস্ত। প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে এক অতি বিষম বিদ্বেষানল প্রধূমায়িত। রাজ্য মধ্যে দুই প্রধান দল—গিরণ্ডিন ও জাকবিন। উন্মত্ত প্রজা প্রমুখ, অপরিমিত মতবাদী জাকবিন সম্প্রদায় অচিরে ন্যায়ানুগত, পরিমিত প্রজাতন্ত্রবাদী গিরণ্ডিন সম্প্রদায়পরি জয়লাভ করে। নূতন সাধারণতন্ত্র শোণিত ধারায় স্নাত হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে। শোণিত-পিপাসা ফরাসী হৃদয়ে অতৃপ্ত। জাকবিন সম্প্রদায় রাজ্যক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া রাজা ও রাণীকে বধ্যমঞ্চে নিহত করিয়া নিবৃত্ত নহে। রুধির পিপাসা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। পানেচ্ছা পরিতৃপ্তি জন্য জাকবিন-নেতাগণ প্রতিপক্ষ নেতাদিগের পানে লোলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অতি সত্বরই গিরণ্ডিন-নেতাগণ জাকবিন বিদ্বেষ কবলে গ্রস্ত হইতে লাগিলেন। শাসন-নীতি, ব্যবস্থা প্রণালী, ফরাসী আইন সকলি উপেক্ষিত। সাম্প্রদায়িক রোষ ও বিদ্বেষ একমাত্র আইন ও নীতি। দ্বাবিংশতি গিরণ্ডিন অধিনেতা, যাঁহারা গিরণ্ডিন সম্প্রদায়ের প্রধান স্তম্ভ, যাঁহারা ফরাসী দেশ হিতৈষণায় প্রকৃত রত্ন-স্বরূপ, যাঁহারা এককালে আপনাদিগের বাগ্মীতা দ্বারা জাতীয় মহাসভাকে বিকম্পিত করিতেন—আজ প্রতিপক্ষ জাকবিন সম্প্রদায় দ্বারা অভিযুক্ত ও বন্দী হইয়া

Conciergerie তে নিহিত। প্রতিহিংসার বেদী সন্নিধানে আজ তাঁহারা উৎসৃষ্ট। সম্প্রদায়িকতায় অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য জাকবিনগণ বিচারের সামান্য ভান দেখাইয়া, ইহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচার করিল। দ্বাবিংশতি গিরণ্ডিন অধিনেতা একদিনে গিলটিনের শাণিত কুঠারে ছিন্নমস্তক হইলেন। কথিত এই স্বদেশহিতৈষী ফরাসী কুলতিলকগণ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন কারামধ্যে সেই মরণবিজয়ী মার্শেয়েঝ উচ্চতানে গাহিতেন। স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিতে গিয়া জীবন-বলিদান অপেক্ষা পুণ্য জন্ম ও সৌভাগ্যের মৃত্যু কি হইতে পারে? তাই মরণের সম্মুখে নীত হইয়াও সেই উৎসাহপূর্ণ সংগীতের উচ্ছ্বাস সত্যই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে সমুত্থিত হইতেছে। শোণিত-কষায়িত তীক্ষ্ণধার গিলটিন পাদদেশে নীত হইয়াও তাঁহাদের সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের বিরাম নাই। দ্বাবিংশতি কণ্ঠ-সমস্বরে সমতানে, উৎসাহপূর্ণ প্রাণে বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মার্শেয়েঝ গাহিতে লাগিলেন। খরধার কুঠারাঘাতে যতই এক একজন ছিন্নশির হইতে লাগিল, ততই সেই সমস্বর হ্রাস হইয়া আসিল। অবশেষে শেষ ব্যক্তির সহিত সে গভীর সমতান মার্শেয়েঝ নীরব হইল। আশ্চর্য্য সঙ্গীত, আশ্চর্য্য সুর, আশ্চর্য্য ভাব! বধ্যমঞ্চতলেও সেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক, মরণতুচ্ছকর, বীরভাব, প্রত্যেক হৃদয়বান, স্বদেশপ্রাণ, উন্নতমনা ফরাসীকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মার্শেয়েঝ ফরাসী জাতীয় চরিত্রের একটি অতি সুন্দর চিত্র আমাদিগের নিকট প্রকাশ করে। মার্শেয়েঝ-প্রণেতা রুজে এক অতি সামান্য লোক; একজন সামান্য সেনানায়ক বই আর কিছুই নহে। অথচ তৎরচিত এই সংগীতটি সর্ব্বোচ্চ জাতীয় সংগীত। গর্ব্বিত জন বুলও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না যে, ইহা তাহার God save the queen অপেক্ষাও উচ্চতর। একজন সামান্য সৈনিকের পক্ষে ঈদৃশ সর্ব্বজনীন উচ্চতম সঙ্গীত রচনা নিশ্চয়ই একটি অতি গভীর মর্ম্মপূর্ণ ব্যাপার। বাস্তবিক, রুজে না হইয়া, যদি অন্য কোন প্রখ্যাত নামা সুকবি এই সুপ্রসিদ্ধ সংগীতের জনক হইতেন, তা হইলে হয়ত, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই হইত না। কিন্তু তাহা নয় বলিয়াই, আর জনৈক সামান্য ও অনুচ্চ-শিক্ষিত এবং অপ্রসিদ্ধ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঈদৃশ অনুপম স্বদেশ ভাবময় সংগীত বিরচিত বলিয়াই, মার্শেয়েঝ রচনা একটি অতীব বিস্ময়কর বিষয়। ইহা হইতেই আমরা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারি, প্রত্যেক ফরাসী স্বদেশকে কিদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগ ও মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সন্দর্শন করে। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেই স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কেমন এক অতি সুন্দর প্রাণস্পর্শী, অননুকরণীয় স্বদেশ-প্রাণতায় উদ্দীপ্ত, জীবন্ত ও জাগ্রত। স্বদেশের প্রতি ঈদৃশ সুগভীর অনুরাগ, স্বাধীনতার এইরূপ প্রাণাগত উচ্চ সম্মান করিতে জানে বলিয়াই ফরাসীগণ এতাদৃশ অতুল্য জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও অধিকারী হইয়া জগতের ইতিহাসে ধন্য হইয়াছে।

সমাপ্ত।

(মার্শেয়েঝ সংগীতের অনুবাদ অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।)

MARSEILLAIS.

মার্শেয়েঝ।

(অনুবাদ।)

মাতৃভূমি সুত! আয়রে সবে,
গৌরবের দিন এসেছে এবে,
পতাকা ভীষণ তুলেছে দেখ,
নিঠুর শাসনে শাসিবে বলে।
শোনরে ঐ সমর প্রাঙ্গণে
বিকট রোল চমূকুল করে,
আসিছে মোদের বাহুর উপরে
নাশিতে মোদের পুত্র কলত্রেরে।

স্বদেশ-প্রেমি! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে, চল সবে,
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(২)

কিবা চায় এই দাসের জাত
দ্রোহীর দল, যুক্তরাজাগণ?
অতি ঘৃণ্য এই অয়স-বেড়ী
কাদের তরে বহুদিন ধরি
গঠিল তাহারা কাদের তরে?
ফরাসি! তোমারি তোমারি তরে।
আছে অপমান এ হতে আর!
শোণিত দহে না ইথে কাহার!
আমাদের চাহে করিতে অধীন
পরাতে শৃঙ্খলা দাসত্ব প্রাচীন?

স্বদেশ-প্রেমি! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে, চল সবে
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(৩)

কি, এই বিদেশী সেনার দল
আইন চালাবে মোদের পরে?
কি, এই ঠিকা সেনাগুলো মিলে
পরাজিবে সাহসী বীরবলে?
দাসত্বের ফাঁস বিধি কি তারা
পরাবে গলে বদ্ধ-হস্ত যারা?
অধম প্রকৃতি অত্যাচারী জনে
প্রভুত্ব স্থাপিবে আমাদের শিরে?

স্বদেশ-প্রেমি! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে, চল সবে
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(৪)

ওরে অত্যাচারি! বিশ্বাস হন্ত!
সব শ্রেণীর কালিমা কলঙ্ক,
কাঁপয়ে এখন কাঁপ আবার
নাতি বিলম্বে তোদের সবার
পিতৃহন্তারক অভিসন্ধি যত
অবশেষে পাবে বিধান উচিত।
তোদের সনে করিবারে রণ
সেনাবেশে সেজেছে প্রতিজন।
যদি রে হয় তাদের পতন
আমাদের তরুণ যোদ্ধৃগণ—
নব বীরবংশ উঠিছে দেখ
যুঝিবার তরে পূর্ণ উন্মুখ।

স্বদেশ-প্রেমি! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে, চল সবে
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(৫)

হে ফরাসি! উচ্চমনা বীর সম
বিনাশ, নতুবা, সম্বর কৃপাণ।
ক্ষমিও যতেক ভ্রান্ত অভাগারে,

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা অস্ত্র ধরে।
কিন্তু অত্যাচারী রুধির পিয়াসী
বইলার যত দুষ্ট সহযোগী
ক্রূর ব্যাঘ্র প্রায় করে বিদারণ
জননীর বক্ষ, ক্ষম না কখন।
স্বদেশ-প্রেমি ! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে চল সবে
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(৬)

জন্মভূমি তরে পরিশুদ্ধ প্রেম
প্রতিশোধোন্মুখ বাহু অনুপ্রাণ।
স্বাধীনতা ! আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা !
এসগো সমরে তব রক্ষি সনে।
পৌরুষ স্বরেতে করহ আদেশ
বিজয় ছুটুক মোদের কেতনে।
মরণে নেহারে যেন শত্রু তব
তোমার বিজয় মোদের গৌরব।
স্বদেশ-প্রেমি ! অস্ত্র ধর
সেনাদল গঠন কর।
চল সবে, চল সবে
রণযাত্রা করি সবে
রণভূমি সিক্ত করি
শত্রুর রুধিরে।

(৭)

(জন্মভূমি সন্তানদের উত্তর।)

রণক্ষেত্রে মোরা প্রবেশিব সবে
অগ্রজেরা তথা নাহি রবে যবে।
তাঁদের ধূলার পাব পরিচয়,
বীরত্বের কত চিহ্ন সমুদয়।
জীবনের তরে নহি অনুরাগী
যত চাহি হতে মরণের ভাগী।
সমুচ্চ গৌরব মোদের কারণ—
প্রতিশোধ-দান নয়ত মরণ।

শ্রীপতিচরণ রায়।

দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ। (১)

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেশস্থ ও কোকনস্থ নামে দুইটী প্রধান শ্রেণী আছে। যাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই দেশস্থ নামে অভিহিত হয়েন। আর যাঁহাদের বাসস্থান কোকনে, তাঁহারা কোকনস্থ নাম ধারণ করেন। আমরা প্রথমে দেশস্থ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। কোন্ সময়ে যে ইঁহারা এতদঞ্চলে আগমন করেন, তাহার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে ইহা সুবিদিত যে, ইঁহারা প্রথমে নাসিক নামক স্থানে অবস্থিতি করেন, এবং তথা হইতে নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। মহারাষ্ট্র দেশ ব্যতীত, কর্ণাটক, মহিসুর, তঞ্জাবুর, মাদুরা, ট্রাভানকোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়ার এবং নাগপুর প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের দেখা যায়। এক সময়ে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই মহারাষ্ট্রীয়দের অধীনে ছিল। সুতরাং, তাঁহারা যে ভারতের নানা স্থানে অবস্থিতি করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের ভাষা বিশুদ্ধ মারহাট্টি, কিন্তু যাঁহারা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কালযাপন করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

দেশস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্মার্থ ও বৈষ্ণব, এই দুইটী সম্প্রদায় আছে। স্মার্থ, অর্থাৎ শৈব মতাবলম্বীগণ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। জগদ্গুরুর কয়েকটী মঠ আছে। তন্মধ্যে, মহারাষ্ট্র দেশে দুইটী। একটী করবীর ক্ষেত্রে। ইহা কোলাপুর নগরের দক্ষিণে, শঙ্কেশ্বর নামক স্থানে অবস্থিত। আর একটী দক্ষিণদিকে। ইহার নাম শ্রীঙ্গেরী মঠ। কুড়লি নামক স্থানে ইহার একটী শাখা আছে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও, তাঁহার শিষ্যগণকে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখা যায়। জগদ্গুরু, শঙ্করাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত বলিয়া, তিনি শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হয়েন। বৈষ্ণবদিগের গুরু মধ্বাচার্য্য। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণও সেই মতের অনুগামী। বাঙ্গালা দেশে যেমন অনেক ব্যক্তি গুরু বলিয়া পূজিত এবং এক এক জনের কতকগুলি শিষ্য আছে, দাক্ষিণাত্যে সেরূপ নহে। এখানে একটী সম্প্রদায়ের একটীমাত্র গুরু, এবং তিনি জগৎগুরু বলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই নিকট হইতে পূজা পাইয়া থাকেন। স্মার্থ সম্প্রদায়ের কুলদেবতা নাসিকের নিকট ত্র্যম্বক নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ত্র্যম্বকেশ্বর, আম্বাগ্রামের যোগাইদেবী, তুলজাপুরের ভবানী, কোলাপুরের আম্বাবাই এবং ভীমাশঙ্কর। বৈষ্ণবদিগের কুলদেবতা, অবণ্ড্যাগ্রামের নাগনাথ এবং পাণ্ডারপুরের বিঠোবা। এতদ্ভিন্ন, খাণ্ডোবাও অনেকের কুলদেবতা। খাণ্ডোবার প্রভাবে, জেজুরী তীর্থ-স্থানে পরিণত হইয়াছে। তথায়, একটী পর্ব্বতের উপরে এই দেবতার একটী মন্দির আছে, এবং তাহা দর্শন করিবার জন্য যাত্রীগণ দলে দলে গমন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এখানেও বেদের সমাদর আছে। বেদ অনুসারেও ব্রাহ্মণদের বিভাগ করা হইয়াছে। দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, ঋক্‌বেদী ও যজুর্বেদীই অনেক, তবে কতকগুলি সামবেদীও আছে। অথর্ব্ববেদীর সংখ্যা অতি অল্প। দেশস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা পৌরহিত্য করেন, তাঁহাদের যাজনক্রিয়া এই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁহারা স্বদেশীয় শূদ্রদের বাটীতে যাজনক্রিয়া করিয়া থাকেন, তথাপি কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য করেন না।

দেশস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই কুলকর্ণীর (১) কার্য্য করিয়া থাকেন। মারহাট্টাদের অভ্যুদয়ের সময়ে তাঁহারা রাজসরকারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, পোশোয়াদের ক্ষমতা প্রবল হইলে, তাঁহারা হীন-প্রভ হয়েন। মহারাজা শিবাজীর সময়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহার শিক্ষক দাদোজি কোণ্ডদে এবং গুরু রামদাস স্বামী দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, পন্থ প্রতিনিধি, পন্থ সচিব এবং পন্থ অমাত্যও এই শ্রেণীস্থ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বড় বড় সাধু ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও সাধু শঙ্করাচার্য্য দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং জ্ঞানদেব, একনাথ, নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, রঙ্গনাথ স্বামী প্রভৃতি অনেকগুলি সাধু ব্যক্তি এই শ্রেণী হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কি সাধু, কি পণ্ডিত,

(১) কুলকর্ণী রাজস্ব আদায় করেন ও তাহার হিসাব রাখেন।

অনেকে উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশস্থদিগের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সাধু জ্ঞানদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ভগবদ্গীতার টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহা জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন, "যোগবাশিষ্টের টীকা" "পঞ্চীকরণ," "হরিপাঠ," "অমৃত অনুভব" এবং "পৈঁষট্টি" নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে পৈঁষট্টিটী অভঙ্গ (১) সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা পৈঁষট্টি নামে অভিহিত হইয়াছে। সাধু একনাথ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একজন উত্তম কবি ছিলেন। "রুক্মিণীর স্বয়ম্বর," "ভাগবত," যাহা একনাথি ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ, "আত্ম-সুখ," "ভাগবতের টীকা," "হস্তামলক," "আনন্দলহরী" এবং "ভাবার্থ রামায়ণ" নামক পুস্তকগুলি তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভাবার্থ রামায়ণ একখানি বৃহৎ কাব্য। ইহা তাঁহার শেষ গ্রন্থ। ইহার যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার একজন শিষ্য এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। মহারাজা শিবজির গুরু রামদাস স্বামী দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিরাজ করিয়াছিলেন। "দাস-বোধ," "মনাচে শ্লোক," অর্থাৎ মনের প্রতি উপদেশ, "শ্লোক বদ্ধ রামায়ণ," অর্থাৎ শ্লোকে বর্ণিত রামায়ণ, "গুরু গীতা" এবং "পঞ্চীকরণ" তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, স্বামীজি অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে মুক্তেশ্বর একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান। তিনি মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গ্রন্থখানি মারহাট্টা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীধর একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার কবিতা সরস ও সুমিষ্ট। তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত, "রাম বিজয়," "হরি বিজয়," "পাণ্ডব প্রতাপ," এবং "অশ্বমেধ" নামক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বামন পণ্ডিত, "সমশ্লোক গীতা," "যথার্থ দীপিকা" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। মহীপতি, সাধুজনগণের জীবনচরিত লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। "ভক্তলীলামৃত," "ভক্ত বিজয়," "শাণ্ড লীলামৃত," এবং "শাণ্ড বিজয়," তাঁহা কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। এই সকল প্রসিদ্ধ লেখক ব্যতীত, দেশস্থ শ্রেণীর মধ্য হইতে আরো অনেক গ্রন্থকার ও সদ্বিদ্বান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এখন আর পূর্ব্বকার প্রভাব নাই, সে অদম্য উদ্যম নাই। পেশোয়াদিগের অভ্যুদয়ের সময় হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হতশ্রী হয়েন। রাজসরকার হইতে উৎসাহ না পাওয়াতে, তাঁহারা অলস হইয়া পড়েন। ইঁহারা দাতা এবং উদার চরিত্র।

দেশস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুইটী বিশেষ রীতি আছে। একটী এই যে, পিতৃস্বসার কন্যা এবং ভগিনীর কন্যা বিবাহ করা ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত। দ্বিতীয়টী এই যে, যাঁহাদের কুলদেবতা আম্বরা দেবী, তাঁহারা এই দেবতার প্রীতিলাভ করিবার জন্য, কোন কার্য্য উপলক্ষে, অল্প বয়স্কা বিধবাদের নিমন্ত্রণ করত, সধবার ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার

(১) অভঙ্গ মহারাষ্ট্রীয়পদ। যেমন বঙ্গদেশে রামপ্রসাদী পদ বিখ্যাত। এতদঞ্চলে, সাধুজন বিরচিত অভঙ্গও সেইরূপ বিখ্যাত।

করেন। এই সকল বিধবা, তাঁহাদের কর্তৃক পূজা প্রাপ্ত হয়েন, এবং তদুপলক্ষে, তাঁহাদিগকে সিন্দুর, হরিদ্রা, বস্ত্র, চুড়ী, প্রভৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

দেশস্থ ও সারস্বত শ্রেণী ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নামেতে অভিহিত। এই কয়েকটী সম্প্রদায়ের নাম, "কাড়াডে", "দেবরুখে", "ঝিরো-অণ্ড" এবং "বাজসনেয়"। আমরা ইহাঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

১ম কাড়াডে ব্রাহ্মণ। সেতারা নগরের দক্ষিণে, কৃষ্ণা ও কোএনা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে, কাড়াড নামক একটী স্থান আছে। এইস্থান ইহাঁদের প্রথম আবাসভূমি হওয়াতে, ইহাঁরা কাড়াডে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাঁদের আদিম বাসভূমি কোকন দেশস্থ নদীপুর নামক স্থানে ছিল, এবং তথন হইতে কাড়াডেতে আগমন করেন। কাড়াডে হইতে ইহাঁরা নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। অতি দূর দেশেও ইহাঁদের দেখা যায়। নাগপুর, ঝান্সী এবং কাশীতেও ইহাঁরা অবস্থিতি করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁদের মধ্য হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বোম্বাই নগরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। কোন্ সময়ে যে ইহাঁরা দেশস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, তাহার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে, কোন দেশস্থ ব্রাহ্মণের কন্যা দুশ্চরিত্রা হওয়াতে, তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে একজন ব্রাহ্মণ এই স্ত্রীলোকটী সংসর্গ করাতে, সেও সমাজচ্যুত হয়। এই ব্রাহ্মণটী ক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহার করাতে তাঁহারা সকলেই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এই সকল ব্রাহ্মণ একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন। ইহাঁরাই কাড়াডে ব্রাহ্মণ।

দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাঁরাও স্মার্থ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যদিও ইহাঁরা আপন আপন সম্প্রদায়ের গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিবাদ ঘটিলে ইহাঁরা আপনারাই নিষ্পত্তি করিয়া লয়েন। ইহাঁরা ঋক্‌বেদী। ইহাঁদের মধ্যে অত্রি, আঙ্গিরস, কাশ্যপ, কৌণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ বাৎস্য, বিশ্বামিত্র, শাণ্ডিল্য, প্রভৃতি ২৩টী গোত্র আছে।

কাড়াডে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। স্থান ভেদে তাঁহাদের কার্য্য ভিন্ন আকার ধারণ করে। রাজাপুর, শাওবাড়ি প্রভৃতি স্থানে ইহাঁরা গ্রহ বিপ্রের কার্য্য করেন, মালবন ও অন্যান্য স্থানে, ইহাঁরা কুলকর্ণী ও দেশপ্রভুর (১) পদে প্রতিষ্ঠিত এবং কোলাপুর অঞ্চলে, ইহাঁদের মধ্যে অনেকে কারকুলের (২) কার্য্য করিয়া থাকেন। হরিদাস (৩) পৌরাণিক এবং শাস্ত্রবেত্তাও ইহাঁদের মধ্যে অনেক আছেন। বোম্বাই নগরে কতকগুলি কাড়াডে ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পরভু (৪) দিগের পুরোহিত।

অনেকগুলি খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি কাড়াডে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা

(১) দেশপ্রভু, গ্রামের মণ্ডল। (২) কারকুল, কেরাণী (৩) হরিদাস, কথক। (৪) পরভু, এক শ্রেণীর শূদ্র।

যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী তালকর, ইংরাজী ও মারহাট্টা ভাষায় অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন; গোপাল শাস্ত্রী, বাল্মিকী রামায়ণ মারহাট্টা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। মোরাপন্থ একজন বিখ্যাত কবি ও উপন্যাস লেখক ছিলেন। কবিতা পুস্তক ব্যতীত, মহাভারত লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, নয় খানি উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ মারহাট্টা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। বাল গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মারহাট্টি, কানাড়ি, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, ফারসী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, লাটিন এবং ইংরাজীভাষা জানিতেন। ইনি মারহাট্টা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন মারহাট্টা এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রথম সংবাদ পত্র ইহাঁ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। দিগ্দর্শন নামক প্রথম মাসিক পত্রিকাও ইনি প্রকাশ করেন। গোবিন্দ বিট্টল মহাজন একজন কৃত-বিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রভাকর ও ধুমকেতু নামক দুইখানি সংবাদ পত্র সম্পাদন করিতেন। সিবিল সারভিস-ভুক্ত শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, রঘুনাথ শাস্ত্রী, কাশীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আরো কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

কাড়াডে ব্রাহ্মণগণ উদ্যমশীল। দাতা বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি আছে। গোয়াণ্ডকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্পন্ন। শান্তবাড়ীর নিকটে যাহাঁদের আবাস স্থল, তাঁহারা এখনো অসভ্য অবস্থায় আছেন। ইহাঁদের মধ্যে একটী বিশেষ রীতি আছে, তাহা বিবৃত করিতেছি;—মাত্রিকা দেবীর পূজা উপলক্ষে কাড়াডে ব্রাহ্মণদের নরবলি দিবার পদ্ধতি আছে। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে, দেবতার সমক্ষে বলি না দিলে বংশ বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। প্রতি বৎসরে, অন্ততঃ একটী বলি দেওয়া আবশ্যক। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে, বলিদান বিশেষ ফলপ্রদ। এই নিমিত্ত, কোন ব্যক্তি উক্ত দিবসে কোন কাড়াডে ব্রাহ্মণের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। প্রবাদ এই যে, খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তাহারা অল্প পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করিয়া থাকে। যদ্যপি কথিত দিবসে তাহারা এ কার্য্য সমাধা করিতে না পারে, তাহা হইলে, ইহারা অন্য কোন দিবসে তাহা কার্য্যে পরিণত করে। জামাতাই ইহাদের মতে শ্রেষ্ঠ বলি, তাহার অভাবে, অপর কোন ব্যক্তি,এবং যদি কোন মনুষ্যকে না পায়, তাহা হইলে, একটী কাককে বধ করে। এই রীতিটী, কাড়াডে ব্রাহ্মণদের কুলধর্ম্ম হইলেও, বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত নাই। তবে, এখনো লোকে তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ভয় পায়।

২য় দেবরুখে ব্রাহ্মণ। কোকন প্রদেশে দেবরুখে নামে একটী স্থান আছে। এখানে ইহাঁদের আবাস স্থান বলিয়া ইহাঁরা এইনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। একদা, ইহাঁরা কোকনস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকদের বিদ্রূপ করাতে কোকনস্থ ও দেবরুখে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। অবশেষে, দেবরুখে ব্রাহ্মণগণ সমাজ-চ্যুত হয়েন। ইহাঁরা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিতে পান না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে,

ইহাঁরা কোকনস্থ ব্রাহ্মণের অনুগামী। দেবরুখে ব্রাহ্মণদের মধ্যে,অধিকাংশ লোকই ভিক্ষাজীবী ও কৃষক, তাহাদের আচার ব্যবহার ভাল নহে। ইহাঁদের মধ্যে, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম শুনা যায় নাই।

৩য়, কিরো-অণ্ড ব্রাহ্মণ। গোমণ্ডকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁরা কিরো-অণ্ড নামে অভিহিত। সারস্বত ব্রাহ্মণ হইতে ইহাঁদের উৎপত্তি। গোমণ্ডকের অন্তর্গত শাষ্টি নামক পরগণায় যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের অন্তর্গত দ্বাদশ ঘর কিরো-অণ্ড নাম প্রাপ্ত হয়েন। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের পৌরহিত্য করিতেন না। কিন্তু, উল্লিখিত কয়েকটী ঘর এই কার্য্য স্বীকার করাতে, তাঁহারা কিরো-অণ্ড নামে অভিহিত হয়েন। কিরো-অণ্ড, ক্রিয়াবন্ত শব্দের অপভ্রংশ। শূদ্রদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেন বলিয়া, ইহাঁদের প্রথমে ক্রিয়াবন্ত বলা হয়, এবং পরে, চলিত ভাষায়, লোকে কিরো-অণ্ড আখ্যা প্রদান করিল। কথিত আছে যে, কুকার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে, ইহাঁরা অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নিকট ঘৃণাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে, কোকনস্থ ও কাড়াডে ব্রাহ্মণদের বালকগণ কিরো-অণ্ড ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হইতেছে, এবং এই সকল দত্তক কর্ত্তৃক কয়েকটী শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতেছে। কিরো-অণ্ডগণ, আর এখন অন্যান্য ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণিত নহেন। ইহাঁরা দীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁদের মধ্যে, বিখ্যাত লোক অতি অল্পই আছেন। অনেকে, দৈবজ্ঞের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

৪র্থ, বাজসনেয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের প্রথম আবাস, গোদাবরী তীরে,পৈঠন,মুদ্গি প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে ছিল। ইহাঁরা দেশস্থ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, দৌলতাবাদের রাজা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, তাঁহার পুত্র ভীম দেও, উত্তর কোকনে আসিয়া শ্রীস্থানক নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ যুবরাজের অনুগামী হয়েন। পৈঠন নিবাসী রাজগুরুও এই সঙ্গে আগমন করেন। যুবরাজ উত্তর কোকনে কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির কতকগুলি বিষয় ক্রয় করিলেন, এবং এই সকল বিষয় রাজগুরুকে প্রদান করিলেন। রাজগুরু এই সমুদায় ১১ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১১ জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। এই কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাজসনেয় আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ইহাঁদের বংশ বৃদ্ধি হইল, কতকগুলি ব্রাহ্মণ নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন। ইহাঁদের অধিকাংশ, বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী মাহিম ও ব্যাসিন্ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে গমন করেন। বোম্বাইনগরে আসিয়া ইহাঁরা পরভু, পাঁচকলসে, স্বর্ণকার এবং কোলি প্রভৃতি শূদ্রদিগের পৌরহিত্য করিতেন। কিন্তু, কয়েক বৎসর পরে ইহাঁদিগকে এ কার্য্য ত্যাগ করিতে হয়। তাহার কারণ এই যে, শূদ্রদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বৈদিক প্রণালীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সমাধা করিতে বলে। কিন্তু, বাজসনেয় ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের বাটীতে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে সম্মত হয়েন না। এতন্নিমিত্ত,

শূদ্রগণই ইহাঁদের ত্যাগ করিয়া কোকনস্থ ও কাড়াডে ব্রাহ্মণদের পৌরাহিত্যে বরণ করিল।

বাজসনেয় ব্রাহ্মণগণ যজুর্ব্বেদী। তাঁহারা নিজ শ্রেণীর মর্য্যাদা রাখিবার জন্য বিশেষ-রূপে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জাতি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সভা আহুত করিয়া তাহা নিষ্পত্তি করেন। কোন বিশেষ ব্যাপার তাঁহাদের দ্বারা মীমাংসা না হইলে, তাঁহারা তাঁহাদের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত একত্রে ভোজন করেন না। যাঁহারা উত্তর কোকনে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্যোতির্বেত্তা। ইহাঁরা পৈতা, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের শুভদিন স্থির করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বিষয় কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কার্য্যে সুদক্ষ।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাতীয় একতা (৬ষ্ঠ)—আল্লাহ্ বিস্মিলাহ্ ও ফেরেস্তা।

এই আল্লা (আল্লাহ্) ও হিন্দুদিগের ল (লহ্ বা লঃ) সম্ভবত একই শব্দ। ল শব্দের আভিধানিক অর্থ ইন্দ্র।

আল্লাহ্ আরবিক ভাষানুসারে আল্ (ঐ) এবং লহ্ (ঈশ্বর) এই দুই শব্দের যোগে উৎপন্ন। সুতরাং আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ঐ অথবা দৃশ্যমান বা জীবন্ত ঈশ্বর (living God)। মহাযোগী মহম্মদ তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১)

আল্লাহ্ শব্দ ঈস্‌লাম ধর্ম্মের শব্দ নহে। মহাযোগী মহম্মদের জন্মের অনেক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরবীয় শৈবধর্ম্মে (Sabian religion) আল্লাহ্ তালা শব্দের ব্যবহার ছিল। আল্লাহ্ তালা শব্দে অন্যান্য দেবের নিরসন হয় না, তাঁহাদের উপর প্রধানত্ব বুঝায়। সুতরাং আল্লাহ্ তালা সর্ব্ব-উচ্চ দেব; অন্যান্য দেবতারা আল্লাহৎ নামে খ্যাত (২)

ইন্দ্র শব্দেও সর্ব্বোচ্চদেব বুঝায়। এই অর্থ কেবল পুরাণের মতে, এমত নহে। বৈদিক মতেও ইন্দ্রদেবের প্রাধান্য জাজ্বল্যমান। ঋক্‌বেদ সংহিতায় ইন্দ্রদেবের যতগুলি স্তোত্র ও যেরূপ প্রাধান্য দেখা যায়, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না। সুতরাং আল্লাহ্ ও লঃ কেবল উচ্চারণ সাম্যবশত, এক দেব এমন নহে, অর্থ সাম্যবশত ও এক দেব বুঝাইতেছে। হিব্রু ঈশ্বরবাচক শব্দ Elohim (ইলোহিম) এবং ঈশকৃষ্ণের মৃত্যুকালে উচ্চারিত "Eli Eli" (আমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর) শব্দ কি ল শব্দের রূপান্তর নয়? (৩)

(১) "তিনি (মহম্মদ) তথা হইতে রফ্ রফ্ নামক মহাকিরব এস্রাফিলের মন্দিরে আরোহণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপস্থ হন।

অতঃপর ধ্যান নিরত স্বর্গলোক কম্পিত করিয়া শতকোটী বজ্রনাদ পরাস্ত করিয়া সহস্রবার ধ্বনি হইল যে "তুমি আমার নিকটে আইস।" (আবদর রহিম কৃত হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি)

(২) "For the Arabs acknowledged one Supreme God, the creator and Lord of the Universe whom they called Allah Taala, the most high God and their other deities who were subordinate to him they called simply al Ilahat *i. e.* goddesses."—Sale's discourse on Koran, chap. I, p. 12.

(৩) Mathew xxvii, 46.

যেমন ল ও আল্লাহ্ একই শব্দ ও একার্থক, তেমন স্ত্রীলিঙ্গে আল্ লাহৎ ও অহল্যা একই শব্দ ও একার্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। গ্রীকেরা লাহৎকে নক্ষত্র-শালিনী উরেণিয়া (Urania) দেবীর সহিত ঐক্য করেন; কেননা, প্রাচীন আরবীয়েরা নক্ষত্রের উপাসক ছিলেন। যাঁহারা ঋক্‌বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারেন যে Uranos ও বরুণ (আকাশদেব, পরবর্ত্তী কালে ইন্দ্রদেব) একই দেব এবং (বারুণী রাত্রী) ও Urania একই দেবী। (১) সুতরাং নৈশাকাশরূপিণী নক্ষত্রশালিনী বারুণী বা অহল্যা দেবী আরবীয় লাহৎ দেবীর সহিত অভিন্ন। কি প্রকারে লাহতের স্বামী আল্লাহ্ এবং অহল্যার উপস্বামী ল বা ইন্দ্র, ইহা বৈদিক ও কোরাণিক মতের সামঞ্জস্যেই পরিস্কার-রূপে বুঝা যায়। বোধ হয়, পরবর্ত্তীকালে শিবের পত্নী তারাদেবী এবং রুদ্রাংশ বালির স্ত্রী তারা প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প কেবল আল্লাহ্ ও লাহৎ অথবা ল ও অহল্যার কথান্তর মাত্র।

বৈদিক মতে ইন্দ্র "বৃষ্টিদাতা আকাশ-দেব।" (১) যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহাই ইন্দ্র বলিয়া প্রাচীন ভারতে পুজিত হইতেন। এই মেঘের ভীষণতর অবস্থার নাম রুদ্র। রুদ্র "শব্দায়-মান" "বজ্রাগ্নি" (২) সম্ভবতঃ ভীষণ ও গর্জ্জনকারী রুদ্র হইতে মানবমন প্রথমতঃ ঐশীশক্তির উপলব্ধি করিয়াছিল। (৩) বজ্রাগ্নি রুদ্র হইতে যে ভয়ের উৎপন্ন হইয়া-ছিল, তাহাই জগতে ধর্ম্মের আরম্ভ। "Fear is the beginning of religion" ইহা যে কেবল দার্শনিক সত্য, এমত নহে, ঐতিহাসিক সত্যও বুঝিতে হইবে।

এই জ্বলন্ত উজ্জ্বল মেঘখণ্ড কেবল আর্য্য-জাতি সমুহের ঈশ্বর ভাবাত্মক পদার্থ ছিল, এমত নহে। ইহুদীজাতিও সম্ভবতঃ উহাকে Shechinah বলিতেন। শচীনাহ্ বা শখী-নাহ্ শব্দের অর্থ উজ্জ্বলতার মেঘ ("cloud of brightness") অথবা উজ্জ্বল মেঘখণ্ড। (৪)শচীনাহ্ কি আমাদের ইন্দ্রার্থক শচীনাথ শব্দ নহে? শচীনাথ শব্দের বৈদিক অর্থ "যজ্ঞের পালক"। সত্য বটে, এই অর্থে Shechinah এর সহিত ঐক্য হয় না; কিন্তু এই অর্থেও Jehovah এর সহিত ঐক্য হয়। Jehovah নাম-করিতে-নাই; ঈশ্বর যাঁহাকে সকলে উপাসনা করে অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। Jehovah কি হু ধাতুর পদ নহে?

ইহা বলা বাহুল্য, আরবীয় প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত ইহুদী ধর্ম্মের অনেক ঐক্যমত

(১) ঋকবেদ সংহিতা (রমেশ বাবুর অনুবাদ) ১ম মণ্ডল, ২ সুক্ত, ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(২) "অতএব বেদরচনা কালে শব্দায়মান ও ভয়-ঙ্কর ঝড়ের খিতা অগ্নিরূপী বজ্রকে হিন্দুগণ ইন্দ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন।" ১ মণ্ডল, ৪৩ সুক্ত ৪ ঋকের টীকা।

(৩) "Quite opposed to this, the *solar theory* is that proposed by professor Kuhn and adopted by the most eminent mythologians of Germany which may be called the *meteorological theory*. This has been well sketched by Mr. Kelly in his Indo-European Tradition and Falklore. "Clouds" he writes, "Storms, rains, lightening and thunder were spectacles that above all others impressed the imagination of the early Aryans and busied it most in finding terrestrial objects to compare with their ever varying aspect." Max Muller's Science of Language (1882) Vol. II; pp. 565, 566. Quoted by Mr. Dutt.

(৪) Life of Christ by Bishop Farrar Vol I, p. 1 and also Luke ii, 9.

ছিল। সুতরাং মাহেশিক (Mosaic) ধর্ম্মেতে যে প্রাকৃতিক অবস্থা ঈশ্বর বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আরবীয় শৈবধর্ম্মে বা শৈব ধর্ম্মোৎপন্ন ঈশলাম ধর্ম্মে সেই অবস্থাকেই পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিয়া আসিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই মেঘাত্মক ভীষণ অথবা অনলসন্নিভ উজ্জ্বল আকাশ চিত্রই বৈদিক কোরাণিক ও বিব্লিক উপাসকের জীবন্ত ঈশ্বর বলিয়া ধারণা হইয়া আসিতেছে। রুদ্র, ল বা লহ্, ইন্দ্র, শচীনাথ, শচীনাহ্, জিহোবাহ্, এবং আল্লাহ্ সকলই প্রায় একার্থক। তন্মধ্যে আল্লাহ্ ও লঃ এবং শচীনাহ্ ও শচীনাথ উচ্চারণেও সম্ভবতঃ এক।

আমাদের কথার সমর্থনার্থে আমরা ঋক্‌বেদ ও কোরাণ হইতে দুটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"৪। রুদ্র স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক এবং উদক রূপ ঔষধিযুক্ত, তাহার নিকট আমরা (বৃহস্পতি পুত্র) শংযুর ন্যায় সুখ যাচ্‌ঞা করি।

"৫। যে রুদ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিবাসের হেতু।

"৬। আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ স্ত্রী ও গো জাতিকে সুগম্য পথ প্রদান করেন।"

ঋক্‌বেদ সংহিতা, ১ম মণ্ডল, ৪৩ সূক্ত।

"Or like a stormy cloud from heaven, fraught with darkness thunder and lightning, they put their finger in their ears because of the noise of the thunder for fear of death; God encompasseth the infidels; Sale's translation of Alkoran, ch. ii. Page 3.

ঈশ্বর বলিতে আমরা এক্ষণে যাহা বুঝি, উপরোক্ত বৈদিক ও কোরাণিক উদ্ধৃতাংশে তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। "যিনি (রুদ্র) দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিবাসের হেতু" একথায় অবশ্য পরমেশ্বরকেই বুঝায়। কোরাণিক অংশেও যে পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে, তাহা আর না বলিলেও চলে। "রুদ্র উদকরূপ ঔষধিযুক্ত" ইহাতে রুদ্রকে মেঘ ভিন্ন আর কি বুঝাইতেছে? যে অর্থে বর্ষণকারী আকাশ ইন্দ্র, সেই অর্থেই এখানে রুদ্র। "রুদ্র স্তুতিপালক ও যজ্ঞপালক"। শচীনাথ শব্দে যে ইন্দ্র বুঝায়, তাহাও এই অর্থে। হিব্রুদিগের মধ্যে ঈশ্বরের নাম করিতে নাই। যেমন আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না, ইহুদী জাতিও ব্রহ্মাণ্ডস্বামীর নাম উচ্চারণ করিত না। তৎপরিবর্ত্তে Jehovah শব্দ উচ্চারণ করিত। যদি এক্ষণ হু ধাতুর পুনঃপুনঃ অর্থে (অর্থাৎ যাহার নামে পুনঃপুনঃ যজ্ঞ হয়) জিহুবহ্ শব্দের উৎপত্তি ধরা যায়, তবে "যজ্ঞপালক" রুদ্রার্থে ও শচীনাথ শব্দের অর্থ সাদৃশ্যে কেমন আশ্চর্য্য ঐক্য হয়! আবার "সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল" রুদ্রের এই বিশেষণে Sechinoh (শচীনাহ্) শব্দের আশ্চর্য্য অর্থ সাদৃশ্য রহিয়াছে। (১)

তমোবিদ্যুদ্বজ্রযুক্ত মেঘস্বরূপে ঈশ্বর অবিশ্বাসীকে ঘেরাও করেন। কোরাণিক উদ্ধৃতাংশের ইহাই অর্থ। সেল সাহেব বলেন "that the Mahomedan doctors say, that the temptest is a type of Koran itself." যেমন ইহাতে মেঘ ও বজ্রের ভীতি আছে, তেমনি বিদ্যুদ্‌রূপিনী আশা আছে।

---

(১) Glory of God shone round about them (Shepherds) বলিয়া বাইবলে উক্ত আছে। (লুক ii, ৯) বিশপ জেবার তাঁহার Life of Christ পুস্তকে তাহার অর্থ উজ্জ্বল মেঘখণ্ড ভাবিয়াছেন, (Vide note 2, page 1, Life of Christ.)

এইক্ষণে বেদের ঋকে ও কোরাণের আয়তে ঈশ্বর ভাবাত্মক ২টী সাধারণ ধর্ম্ম পাইতেছি। (১) উজ্জ্বলতা (২) বর্ষণকারী মেঘ। ইহাই জার্মানদিগের Solar ও Meteorological myth. ল (ইন্দ্র বা রুদ্র) ও আল্লাই্ শব্দে উক্ত সমুজ্জ্বল মেঘাত্মক আকাশদেবকেই বুঝাইয়া থাকে। যদি ল শব্দ আভিধানিকগণের সকপোল কল্পিত না হয়, তবে ঐ শব্দের একদা লৌকিক ব্যবহার ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। ল উচ্চারণকারী সেই প্রাচীন হিন্দু ও আল্লাহ্ উচ্চারণকারী বর্ত্তমান মুসলমানে তবে কি প্রভেদ, পাঠকেরা এক্ষণ বিবেচনা করুন।

যেমন আল্লাহ্ ও ল এক শব্দ, তেমন বিস্মিলাহ্ ও বিষ্ণুল্ বা বিষ্ণুর্ একই শব্দ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আমরা যেমন দেবকার্য্যারম্ভে শ্রীবিষ্ণুঃ বা ওঁ বিষ্ণুঃ ব্যবহার করি, সেইরূপ মুসলমানগণ কোন কার্য্যারম্ভে বিস্মিলাহ্ শব্দ ব্যবহার করেন। সুতরাং ব্যবহার ও উচ্চারণ সাম্যে দুটী শব্দই প্রায় এক প্রকার।

এই দুই শব্দের অর্থগত কোন মৌলিক সাদৃশ্য আছে কি না, দেখা যাউক।

বিষ্ণু শব্দের বৈদিক অর্থ সূর্য্য। নিরুক্তকারদিগের মতে দেব প্রকৃত তিন জন—আকাশে বিষ্ণু, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও ভূতলে অগ্নি। বৈদিক কোরাণিক বা বিব্লিক ইহার কোন ধর্ম্মেই এই প্রাচীন বিশ্বাসের রেখা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু যখন বিষ্ণু (সূর্য্য) ইন্দ্র (বর্ষণকারী আকাশ) এবং অগ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের এক নিয়ন্তার অনুভব হইতে লাগিল, তখন সেই নিয়ন্তার নামকরণ করিতে গিয়া বিষ্ণুঃ নামই প্রদত্ত হইল। এই প্রকারে বিষ্ণু শব্দই পরমেশ্বর বোধক হইয়া উঠিল। এজন্য কোরাণে আল্লাকে বিস্মিল্লার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহম্মদের নিকট আয়ত প্রেরণ করিতে দেখা যাইতেছে এবং পুরাণের সীমায় পদার্পণ করিলে লকে (ইন্দ্রকে) পুনঃপুনঃ বিষ্ণুর কৃপাপ্রার্থী হইতে দেখা যাইতেছে। অতএব অর্থগত ভাবেও বিস্মিল্লাহ ও বিষ্ণুল্ বা বিষ্ণুঃ একই শব্দ।

আর একটী কথা। যেমন আল্লাহ্ ও ল এক শব্দ ও একার্থক এবং বিস্মিল্লাহ্ ও বিষ্ণুল্ বা বিষ্ণুঃ এক শব্দ ও একার্থক, তেমন ফেরেষ্ট ও যবিষ্ট সম্ভবতঃ এক শব্দের রূপান্তর মাত্র ও একার্থক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিকমতে ভূতলের দেবতা অগ্নি। ইহারই ইংরেজী প্রতিশব্দ Angel (অগ্নিল্)। অগ্নি শব্দের একটী বৈদিক প্রতিশব্দ "যবিষ্ট"। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মা (Hephaistos) এই "যবিষ্ট" শব্দের রূপান্তর মাত্র। (১)

হেফষ্টস্ শব্দ যদি যবিষ্ট শব্দের রূপান্তর হয়, ফেরেষ্ট শব্দ যবিষ্টের রূপান্তর নয় কেন? প্রত্যুত ফেরেষ্ট শব্দের সহিত যবিষ্ট বা অগ্নি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফেরেষ্ট শব্দকে মুসলমানী বাঙ্গলায় ফেরেস্তা বলে।

এই ফেরেস্তাগণ কোরাণের মতে অনল দেহধারী ও সম্মানার্হ। যেমন ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয়, তেমন ফেরেস্তাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয়। ইহাঁদের কার্য্য নানা প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা, তাঁহাকে স্তুতি করা এবং মনুষ্যের

(1) Vide Cox's mythology of the Aryan nations, Vol II, Chap. IV, sec 1.

হিতার্থে তাঁহার নিকট অনুরোধ করা—ফেরেস্তাগণ মনুষ্যের কার্য্য কলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কখন কখন ঈশ্বরের সিংহাসন বহন করেন (২)

ঋক্‌বেদের অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তোত্র পাঠ করিলে, ফেরেস্তগণের কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য উপলব্ধি হইবে। অগ্নি দেবগণের "আহ্বানকারী", অগ্নিদেবগণকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞে আইসেন, অগ্নি যজ্ঞের "পুরোহিত", যজমানের হিতার্থে হব্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেবতা গণের নিকটে লইয়া যান, ইত্যাদি বর্ণনা ভূরি পরিমাণে বেদে দৃষ্ট হয়। সুতরাং যবিষ্ট ও ফেরেস্ত একই অর্থে ও একই ভাবে বৈদিক ও কোরাণিক মনের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে।

এ দেশের বৈদিক ও কোরাণিক হিন্দুগণ এরূপ চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বের কোন সাধারণ ভিত্তি আছে কি না? এই প্রশ্ন মীমাংসার পূর্ব্বে আর একটী প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, আল্লাহ্, বিস্মিল্লাহ্ ও ফেরেস্ত এই তিন মহিমান্বিত শব্দের হিন্দুযান্বিত ভাব (অর্থাৎ ল, বিষ্ণুল্ ও যবিষ্ট শব্দের সহিত সাদৃশ্যভাব) কোথা হইতে জন্মিল? এ কথায় বিশিষ্ট উত্তর আমাদের নিকট পাওয়ার আশা বৃথা। বহুভাষাবিৎ-দিগের নিকটই এই প্রশ্ন কর্ত্তব্য। তবে আমরা এই বলিতে পারি যে, সেল সাহেবের মতে কার্য্যারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ শব্দের উচ্চারণ এবং ফেরেস্তগণে বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানগণ ইহুদীদিগের নিকট এবং ইহুদীগণ প্রাচীন পারসিকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন পারসিকগণ ও আর্য্যগণ একই জাতিমাত্র সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে এই প্রকারে কোরাণিক ধর্ম্মতত্ত্বের ঐক্যমত্ত্বের এক সুন্দর ঐতিহাসিক কারণ পাওয়া যায়

অতএব, বৈদিক হিন্দুগণ, আল্লাহ্ ও বিস্মিলাহ ও ফেরেস্তা হিন্দুভাব-পূর্ণ হিন্দু শব্দ, তোমরা উহা নিঃসন্দেহ গ্রহণ করিতে পার এবং মুসলমানগণের ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত তোমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের সখ্যভাব স্থাপিত হইলে, বিশুদ্ধ হিন্দুত্বের কিছুই ক্ষতি হয় না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

(2) "The existence of angels and their purity are absolutely required to be believed in the Koran * * * they believed them to have pure and subtle bodies created of fire * * * they have various offices some adorning God in different postures, other singing praises to him or interceding for mankind."

Sale's discourse on Koran, sec 4, page 56.

ফুলরেণু।

কিশোরী।

যৌবন বহিয়া আনে বসন্ত-জোয়ার
অলখিতে অমৃতের—দিনে দিনে দিনে,
সংকোচে বিস্ময়ে বালা দেখে শতবার
দর্পণে চাহিয়া মুখ, চিনে কি না চিনে!
কাছে আসে, কথা কয়, অনেক সাধিলে,
অনেক সাধিলে বসে বিছানার কোণে,
কপোলের কাছে তার মুখখানি নিলে,
ঘোমটা টানিয়া ধরে—কথা নাহি শোনে!
কি যে সে বিরক্তি ভাব—লাজ লজ্জা ভয়,
আপদ উৎপাত জ্ঞান—আশঙ্কা তরাস,
সাধিতে সাধিতে সারা নিশি গত হয়,
অধরেতে ডুবে শুক্লা দ্বিতীয়ার হাস!
কি সুন্দর কিশোরীর কঠিন স্বভাব,
নিদারুণ নিদাঘের নেয়াপাতি ডাব!

আমমাখা।

বৈশাখে বিকাল বেলা—বিনোদ বিমল,—
কচি হাতে কাচা আম কাটে এক বালা,
এলা'য়ে পড়েছে গায় সুনীল কুন্তল,
মাণিক-মৈনাকে যেন নীল মেঘ ঢালা!
বসোরা গোলাপ গাল বসন্ত প্রভাতে,
গলে তার হেমময় মোহনিয়া মালা,
কাসন্দ ও কাচা লঙ্কা আর লেবু পাতে,—
সম্মুখে রাখিয়া কাল পাথরের থালা—
চম্পক আঙ্গুলে আম মাখে কচালিয়া,—
গোলাপ রাঙ্গিয়া উঠে অরুণ আভায়,
লুকা'য়ে বিদেশী দেখে দূরে দাঁড়াইয়া,
আকুল আগ্রহে আর লোভে লালসায়!
আমমাখা থালা আর সৌন্দর্য্য-কমল,
কি দেখিয়া চোখে ওর আসিয়াছে জল?

পাঠ।

'অজ, অগ, আর, আম' পড়ে দশ দিন,
কিছুই থাকে না মনে, হাতে থাকে বই,
সে পড়ে কি আমি পড়ি বুঝা সুকঠিন,
কে জানে ভূতের মন্ত্র কার কাছে কই?
এ বিরক্তি বিড়ম্বনা সহিতে না পারি,
টিপিয়া গোলাপ-গাল, পিঠে দিনু কিল,
দারুণ আঘাত বুকে বাজিল আমারি,
ভিজিল কেবল তার আঁখি-নবনীল!
বালিকা বলে না কথা গুরু মান ভরে,
কত গুরু অপরাধ হইল আমার,
আজি শিখিলাম ভাল এত দিন পরে,
এ জীবনে এ জনমে শিখিনি যা আর!
ক্ষোভে লাজে 'বাল্যশিক্ষা' ফেলিলাম ছিঁড়ি,
নাকে খত—হেন গুরুমহাশয় গিরি!

পুষ্প-সজ্জা।

বিশুভ্র বৈশাখী নিশা, শুভ্র চন্দ্রালোকে,
প্লাবিয়াছে নীলাকাশ, শ্যাম ধরাতল,
যেন জ্যোতির্ম্ময় এক জলীয় আলোকে
রজত বার্ণিস মাখা—অমৃত শীতল!
পালঙ্কে বসিয়া বালা শুভ্র শয্যাতলে,
দুধে ভাসে শ্বেতপদ্ম—শোভা মনোহর,
এলা'রে পড়েছে বেণী ক্ষীণ কটিতলে,
অঙ্গলতা বেড়া যেন কৃষ্ণ অজগর!
আদরে যতনে কাণে পরাইনু তার,
সুগন্ধি শীতল স্নিগ্ধ শুভ্র বেলফুল,
সীমন্তে রচিয়া দিনু পত্র-অলঙ্কার,—
বনজাত কুসুমের মঞ্জরী মুকুল!
ঈষৎ হাসিয়া বালা তুলিতে নয়ন,
ফুটিয়া ভুজঙ্গ ডিম্ব দংশিয়াছে মন!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মেঘনাদবধ-চিত্র।

পঞ্চম প্রস্তাব।

শেষ কথা।

কবি অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, অশ্রুজলের সঙ্গে ইহা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বীরবাহুর শোকে কাতর, রাক্ষসরাজের আর্ত্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত, সমস্তই বিষাদপূর্ণ এবং সেই জন্ম আমরা বলিয়াছি যে, মেঘনাদবধকে বীররসাত্মক কাব্য অপেক্ষা করুণরসাত্মক কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কবিবর হেমচন্দ্রের সুন্দর সমালোচনার পর ইহার ভাষা ও ছন্দ

সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমাদিগের আর ইচ্ছা নাই। কাব্যের মধ্যে যাহা সুন্দর এবং যাহা উল্লেখ-যোগ্য, আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি, আর দুই একটী কথা বলিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

অনেকের মতে মেঘনাদবধ কাব্যের একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে পাপীর চিত্র পুণ্যবানের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টন যেমন সয়তান বা পাপ পুরুষকেই তাঁহার গ্রন্থের নায়কে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের কবিও, তেমনই রাম লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষসরাজকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া ফেলিয়াছেন। পাপাচারীর প্রতি কবির যখন এত সহানুভূতি, তখন নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, সহস্রগুণ সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য নিন্দনীয়। এই সকল কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মধুসূদন, পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও, পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। যে অসদাচারের জন্য রাক্ষসরাজ সাধু সমাজের ঘৃণার্হ, তিনি কুত্রাপি তাহার সমর্থন করেন নাই। বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাঁহারই পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, প্রতি পদেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া, কাহারও মনে রাক্ষসরাজের অনুচিত কার্য্যের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা যেমন রক্ষোবংশের অতুল ঐশ্বর্য্য, বাহুবল, সৌভাগ্য, ও রূপ, গুণ দেখিয়া বিস্মিত হই, অন্যদিকে আবার তেমনই তাঁহাদিগের অবিমৃশ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া, সন্ত্রস্ত ও উপদিষ্ট হই। সুতরাং অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে যে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে সেরূপ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমন কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও পাপাচরণের ফলে মনুষ্যের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য, ইহাতে পাপাচারী রাক্ষসরাজের নিজের কোন দণ্ড বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু দণ্ড আর কাহাকে বলে? মেঘনাদের ন্যায় পুত্র এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে স্বয়ং চিতানলে প্রক্ষেপ করিয়া, রাক্ষসরাজ যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের শরে হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইলে, কি তাঁহার তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ হইত? "ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়" যখন মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ ও পরিণাম, তখন রাক্ষসরাজের প্রতি কবির সহানুভূতি সত্ত্বেও, নীতির দিক্ হইতে বিচার করিলে, ইহার দ্বারা কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, কবি যখন ইহাতে আর্য্যবংশীয়গণের অপেক্ষা অনার্য্যবংশীয়গণেরই সম্বন্ধে অধিকতর পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইতে পারে না। মেঘনাদবধকাব্য জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইবে কি না, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু মধুসূদনকে অনার্য্যবংশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য, নিন্দার পরিবর্ত্তে অধিক প্রশংসাই করি। রামায়ণকার

মহর্ষি ভারত সমাজের যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহারই উপযুক্ত ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তখন অনার্য্য সমাজের প্রতি আর্য্য সমাজের প্রগাঢ় বিদ্বেষ; বৈদিক ঋষিগণের নিশ্বাসে নিশ্বাসে অনার্য্যগণের প্রতি যে বিষ উদ্গীরিত হইত, রামায়ণে তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি হইয়াছে। মধুসূদন যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ তাহারই উপযোগী হইয়াছে। এখন আর আর্য্য এবং অনার্য্যগণের মধ্যে সেই পূর্ব্ব বিদ্বেষ, জেতাজিত ভাব বর্ত্তমান নাই। আর্য্য এবং অনার্য্য, সকলেই এখন একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। আর্য্য-প্রপীড়িত বলিয়া, অনার্য্যগণের প্রতি এখন বরং লোকের সহানুভূতির উদ্রেক হইতেছে। এ অবস্থায় মধুসূদনের উদ্যম সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে; এবং এই জন্য বোধ হয় তিনি ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট সমাদর লাভ করিবেন। মধুসূদনের বহুদিন পূর্ব্বে বীর চরিতের সহৃদয় কবি ইহার প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদন ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহারই আদর্শে বৃত্রসংহারের ও রৈবতকের কবিদ্বয় তাঁহাদিগের দৈত্য ও নাগবালাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিতের কবি রাক্ষসরাজকে উন্নত করিতে যাইয়া রামচন্দ্রকে অবনমিত করেন নাই। মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই, ইহা অবশ্যই পরিতাপের বিষয় হইয়াছে। রাক্ষস পরিবারদিগের ন্যায় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চরিত্র সুচিত্রিত হইলে, মেঘনাদবধের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। মহর্ষি একদিক্ দেখাইয়াছিলেন, মধুসূদন আর একদিক্ দেখাইয়াছেন; ভবিষ্যৎ কোন মহাকবির দ্বারা, বোধ হয়, এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে।

মেঘনাদবধ, মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য, তাহার আলোচনা করিয়া, সময় এবং পরিশ্রম অপব্যয় করিবার আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। মধুসূদন নিজে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে, যদিও ইহা সম্পূর্ণ রূপে মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না, কিন্তু ইহার অনেক স্থল যে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করি, তাহা যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্যই একখানি মহাকাব্য। কবি ইহাতে যে উদ্দাম-কল্পনা, যে বর্ণনা-শক্তি এবং যে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই মহাকবির উপযুক্ত। কবিবর হেমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন যে, "যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়; যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে

হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি? সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক স্থলের ভাব যে অন্যান্য কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। কেহ কেহ এই জন্য মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কোন মৃত জীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি চর্ম্মাদি সংগ্রহ করিয়া, একটী অভিনব জীব সৃষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও তদ্রূপ কঠিন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্যের ভাব এখনও ত অক্ষুণ্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে আর একজন মধুসূদন জন্মগ্রহণ না করিলে, আর একখানি মেঘনাদবধ রচিত হইবে? প্রকৃতির রাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল উপাদান হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, নূতন কিছু সৃজন করাতেই প্রকৃত প্রতিভার পরিচয়।

মেঘনাদবধকাব্যে কবির যে সকল ত্রুটী আছে, আমরা তাহা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হই নাই। অন্বেষণ করিলে আরও শত শত ত্রুটি ইহাতে লক্ষিত হইবে। প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া, তাঁহার মাতুল কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট ভট্টকে দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্ব্বে রচিত হইলে আমাকে আর আমার অলঙ্কারের দোষ—পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না; এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।" মম্মট-ভট্ট নৈষধ কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদ-বধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্বেষণ করিলে তাহার প্রত্যেকটীই ইহাতে লক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই সকল দোষ সত্বেও আমরা বলিতে পারি যে, ইহা বাঙ্গালাভাষায় মহামূল্য রত্নরূপে চিরদিন সমাদৃত হইবে। কবি ইহাতে যে প্রতিভা এবং যে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিলেও ইহা বাঙ্গালাভাষায় যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে। বৈষ্ণব কবিগণ এবং তাহার পর ভারতচন্দ্র, বঙ্গভাষাকে যে আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা শিশুর উপযুক্ত, প্রেম-পিপাসুর উপযুক্ত এবং বিলাসীর উপযুক্ত। যে অর্দ্ধনিদ্রিত এবং অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় বঙ্গভূমি তখন বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাহারই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজের সংঘর্ষে উদ্বোধিত হইয়া, বঙ্গভূমি আজ যে জাতীয়জীবন লাভের জন্য সংগ্রামে

প্রবৃত্ত হইয়াছে, মেঘনাদবধের ভাষা তাহারই উপযোগী হইয়াছে। সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, হৃদয়ে যে ভাব লইয়া উপনীত হওয়া আবশ্যক, মেঘনাদ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেক স্থলে সেই ভাবে উদ্দীপিত হই। জাতীয় ভাব জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতায় নিষ্পেষিত বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও, মধুসূদন যে ইহাতে বীরোচিত ভাষা এবং বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ। ক্ষীণকায় নির্জ্জীব বাঙ্গালীর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত শৌর্য্য ও তেজস্বিতা বর্ত্তমান না থাকিলে এরূপ কাব্য কখনই রচিত হইত না। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। মধুমক্ষিকার ন্যায় নানাদেশীয় কাব্যকুসুম হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালাভাষা থাকিবে, ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে সত্যই,—

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদবধ সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন;—

"The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare."

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

A new beginning for.

তিলোত্তমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সতত তিমির ঘোর গভীর গহ্বরে
কোলাহলে জল-দল, মহা কোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহাকোপে, লয়রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ বলী—
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গসম।
দিবানিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারিদিকে
ভূতনাথ সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন!
এহেন বিজনস্থানে, দেব কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ
পঙ্কজবাসিনি দেবি এ তব কিঙ্করে?
সুরাসুরসহ অহি-অনন্ত যে বলে
আনন্দে মন্দারে বাঁধি সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত রসের আশে; সেই বলসম
যাচি কৃপা; কর দয়া আজি অভাজনে
বাগ্দেবি! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে!
কর দয়া অকিঞ্চনে, বিশ্ববিমোহিনি!
অসীম মহিমা তব; হায়, দীন আমি;
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড়-চূড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল দলে
লভে নাকি আভা কভু তাঁর শোভা হতে?

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,

কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে
সগর-রাজার বংশ ধ্বংস যার লোভে ?
কোথা সে অমরাবতী, পূর্ণ চিরসুখে ?
কোথা বৈজয়ন্ত ধাম রত্নময়ী পুরী,
মলিন-প্রভায় যার প্রভাকর ভানু ?
কোথায় সে রাজাসন রাজছত্রসহ,
রবি-পরিধির আভা মেরু শৃঙ্গোপরি ?
কোথায় নন্দন বন—বসন্ত যে বনে
বিরাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা
অক্ষয় লাবণ্য ফুল ? ঋষি মনোহরা
কোথা সে উর্ব্বশী কহ ? কোথা চিত্র-লেখা,
জগত জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী ?

(ক্রমশঃ।)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অদৃষ্ট। (৫)

কর্ম্মফল অনুসারে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির পুরস্কার ও দণ্ডস্বরূপ যে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছি, এ কথা অদৃষ্টের পোষকতা করিলেও আমরা কর্ম্মফল বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আমাদের—

প্রথম আপত্তি, পুরস্কার ও দণ্ড ভোগ করিতেছি বলিলেই কেহ একজন সেই পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়ার কর্ত্তা আছেন অনুমান করিয়া লইতে হয় ; এই জগত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাভিন্ন সে কর্ত্তৃত্ব ভার আর কাহাকেও দেওয়া যায় না, কিন্তু তিনি নির্গুণ পুরুষ হইয়া কখন কাহাকে দণ্ড বা পুরস্কার দেবেন না—যিনি সর্ব্ব শক্তিমান, কটাক্ষে যিনি আমার গতিমতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি অধম সন্তানকে একবার এক পথে চলিতে দিয়া পরে আমার উপর কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গর্ত্তস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তার জীবন রক্ষার্থে যে মহাপুরুষ মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়ার বিধান করিয়াছেন, তিনি যে সেই শিশুর কর্ম্মফল বিচার করিয়া এক কালে তাহাকে অন্ধ বিকলাঙ্গ এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত করিয়া সৃজন করিবেন, ইহা কখন মনে করা যায় না ; এমন পাপ সে কি করিয়াছিল যে ঈশ্বর তাঁর এই দারুণ যন্ত্রণার বিধান করিয়াছেন—যে যন্ত্রণা মানুষ চক্ষে দেখিতে পারে না; ঈশ্বর যদি সেই যন্ত্রণার বিধানকর্ত্তা হন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে দয়াল পুরুষ বলিয়া ডাকা যায় না।

দ্বিতীয় আপত্তি—ঈশ্বর পুরস্কার দাতা বা দণ্ডকর্ত্তা স্বীকার করা গেলেও, তিনি যে রাগের বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ড বিধান করিতেছেন, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না, কাহারও প্রতি তাঁর রাগ নাই, দ্বেষ নাই ; দোষীর চরিত্র সংশোধন জন্য তিনি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই শাস্তি দিতেছেন, কিন্তু চোর চুরি করিয়া ফাটকে গেলে তাহার শিক্ষা হইল এবং তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর দশ জন চোরেও ভয় পাইল, ফলে চুরির সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু এই ভবকারাগারে আমরা যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত কাহার কি শিক্ষা হইয়াছে ? কোন্ কাজের কি ফল তাহা আমরা জানি না, কোন্ গুণে তুমি এত সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছ এবং কোন্ দোষেই বা আমার এত লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা আমরা জানিলাম না ;

যে পাপের ফলে এ জন্মে আমি একটী চক্ষু হারাইয়াছি, তাহা বলিয়া দিলে সাবধান হইতে পারিতাম, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এ জন্মেও হয় ত আমি সেই পাপের অনুষ্ঠান করিতেছি, পরজন্মে হয় ত আমাকে দুটী চক্ষুই হারাইতে হইবে, কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইবে? যদি আমাদের চরিত্র সংশোধন করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে কোন কাজের কি ফল, তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল; দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়ার সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান ও স্মৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল—বলিয়া কহিয়া সাবধান করিয়া দেওয়ার পরও যদি আমরা দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইতাম, তাহা হইলে তখন অবশ্য শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া চোখ বাঁধিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়া এ প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া বিধাতার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে।

তৃতীয় আপত্তি:—এ জন্মে না হয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিলাম, তার পূর্ব্বেও না হয় তৎপূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছি, কিন্তু প্রথম যখন জন্ম হইয়াছিল, যেবার সর্ব্ব প্রথম এ সংসারে আসিয়াছিলাম, সেবার কোন্ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছি? যদি বল সে জন্মে কোন কর্ম্মভোগ ছিল না, সুখও ছিল না, দুঃখও ছিল না, কর্ম্মসূত্র সেইবার প্রথম আরম্ভ হইল, সেই কর্ম্মফল পর পর ভোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রথম জন্মে কোন সুখ নাই, দুঃখ নাই, কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, তবে কি জড় হইয়া জন্মিয়াছিলাম। মানুষ হইয়া সে-কি অবস্থা কল্পনাতেও ত ভাবিয়া আসিতে পারি না—যাই হোক্, প্রথম জন্মে সংসারে আসিয়া যদি অন্ত কোন কর্ম্মভোগ নাও করিয়া থাকি, গর্ভযন্ত্রণা তো ভোগ করিয়াছি, তাই বা কেন করিলাম? তৎপূর্ব্বে তো আত্মা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিল, এ ভবকারাগারে কেন আসিলাম? এ কথার উত্তর কর্ম্মফলবাদীরা কি বলেন, জানি না।

৪র্থ আপত্তি:—এ সংসারে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছি বা যাহা কিছু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তাহার মধ্যে আমাদের নিজের কিছুই নাই—চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যিনি দিয়াছেন, সুমতি কুমতি তিনিই দিয়াছেন, ইতস্ততঃ আমরা যে সকল প্রলোভনের সামগ্রী দেখিয়া পাপে লিপ্ত হইতেছি, তাহাও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সুমতি কুমতি আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকিয়া যখন যাহা বলিতেছে, সেও সেই তাঁহারই উক্তি—আমরা যে অতি দুর্ব্বল প্রাণী প্রলোভনের সামগ্রী দেখিয়া কখনও নিরস্ত থাকিতে পারিব না, তাহাও তিনি জানেন,—যদি প্রলোভনের সামগ্রী সৃষ্টি করিলেন, তবে আমাদের চক্ষু কর্ণ দিলেন কেন? না দেখিলে না শুনিলে মন কখন তাহাতে মুগ্ধ হইত না, যদি চক্ষু কর্ণ দিলেন তবে কুমতি দিয়া তাহাতে লিপ্ত হইতে বলিলেন কেন? আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার বিষয় অবগত থাকিয়া নানা প্রকার মনোমুগ্ধকর প্রলোভনের সামগ্রী মধ্যে আমাদিগকে নিক্ষেপ করতঃ তাহাতে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্তি দিয়া, পরে লিপ্ত হইয়াছি বলিয়া ভয়ানক কঠোর শাস্তি বিধান করা মন্দ বিচার নহে, ইহাকে বিচার বলা যায় না, ইহা এক প্রকার তামাসা বা খেলা মাত্র; যিনি বিধাতা পুরুষ, তিনি যে আমাদের সহিত তামাসা বা খেলা করিবেন, কথ-

নই মনে করা যায় না। এই জন্য বলিতেছি, কর্ম্মফল অদৃষ্টের অনুকূল হইলেও আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।

মনুষ্য অবস্থার দাস, এবং অবস্থা ঘটনার অধীন; এ জগতের প্রত্যেক ঘটনা নিয়মাধীনে ঘটিতেছে, সুতরাং মানুষও যে নিয়মাধীনে চলিতেছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ জগতের প্রত্যেক কার্য্য এক একটী ঘটনা বিশেষ, এবং প্রত্যেক ঘটনা কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এক সময়ে যাহা কার্য্য দেখিতেছি,তাহাই আবার অন্য সময়ে কারণ হইয়া অন্যকার্য্যের উৎপন্ন করিতেছে এবং এই শেষোক্ত কার্য্যও আর এক কার্য্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই জগত ব্রহ্মাণ্ড এক ঘটনা সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং জাগতিক সমস্ত ঘটনাই পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগে সংঘটিত হইতেছে। বাঙ্গলার লোকে ভাত খাইয়া বাচিয়া থাকে, বৃষ্টি হইতে ধান হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, আবার জল হইতে বাষ্প হয়। বাঙ্গালীর জীবন ধারণের কারণ ধান, ধান জন্মানর কারণ বৃষ্টি, বৃষ্টির উৎপত্তির কারণ মেঘ, মেঘের কারণ বাষ্প, এবং বাষ্পের কারণ জল—পরস্পর পরস্পরের কারণ হইয়া কার্য্য করিতেছে,—এ জগতে এমন কোন ঘটনা নাই, যাহার সহিত অন্য একটী ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই—সকল ঘটনারই পরস্পর কোন না কোন রকমে যোগ আছে—মেঘের সহিত শীতল বাতাসের যোগ না হইলে বৃষ্টি হয় না, জলের সহিত তাপের যোগ না হইলে বাষ্প জন্মায় না, সূর্য্যের তাপ আছে, অগ্নির তাপ আছে, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নির উৎপত্তি হইতেছে; এই রূপে দেখান যায় সকল বস্তুরই পরস্পর যোগ আছে, এবং যে কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে এক বস্তু অপর বস্তুর সাহায্য লইতেছে। এই ভাবে ঘটনা পরম্পরা কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

বাহির্জ্জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগতের কার্য্যও যে পরস্পর কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বাঁধা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। আমরা যে কাজ করি, তাহার কারণ ইচ্ছা, ইচ্ছার কারণ উদ্দেশ্য, আমাদের অবস্থানুসারে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের উৎপত্তি হইতেছে এবং বাহ্যিক ঘটনা হইতে অবস্থার জন্ম হইতেছে। তুমি হিন্দু নৈকষ্য কুলীনের সন্তান কিন্তু বড় গরীব, সহায় নাই সম্পত্তি নাই, তোমার মেয়েটী বয়স্থা হইয়াছে, বিবাহ না দিয়া আর ঘরে রাখিতে পার না, রাখিলে সমাজে নিন্দা হয়, সুতরাং পাত্র অন্বেষণে বাড়ীর বাহির হইলে, তোমার ইচ্ছা একটী সুপাত্রে দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান কর,—পাত্রটী কুলীনের সন্তান হয় লেখা পড়া জানে এবং তাহার কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকে কিন্তু পাত্রের বাজার যে প্রকার দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে তোমার ন্যায় গরিব অস্থাবর লোকের পক্ষে একাধারে এত গুণবিশিষ্ট পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা দুর্ঘট হইল, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য তুমি করিতে পারিলে না, অনেক অনুসন্ধানের পর দুইটী পাত্র স্থির হইল; একটী তোমার সঘর কুলীনের সন্তান কিন্তু মহামূর্খ এবং মহাদরিদ্র, এক দিনও তোমার মেয়ের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না; অপর পাত্রটী ছেলে ভাল, বি, এ, পাস করিয়াছে এবং বাপের কিছু জমীদারীও আছে, তোমার মেয়ে লইয়া

সাধ আহ্লাদ করিবে এবং তাহাকে দশখানা সোণা রূপার গহণাও দিবে, কিন্তু দোষের মধ্যে পাত্রটী মহাবংশজ, তোমার একান্ত ইচ্ছা এই পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান কর, কিন্তু সর্ব্বনাশ এ পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিলে তোমার কুল যাবে, সমাজে নিন্দা হবে, লোকের কাছে মুখ দেখান দায় হয়ে উঠিবে, এদিকে কন্যাটী অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে, আর পাত্র অনুসন্ধান করিবার সময় নাই, সুতরাং নিতান্ত বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহ দেওয়াই সংকল্প করতঃ একবারে দিন স্থির করিয়া বাড়ী আসিলে, এদিকে একদিন তোমার বাড়ীতে একটী ছেলে আসিয়া উপস্থিত—ছেলেটী দেখিতে সুপুরুষ, বয়স ২৫ বৎসর, এম, এ পাস করিয়া আজ তিন বৎসর পশ্চিমে ২০০৲টাকা বেতনে চাকুরী করিতেছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলে তোমার সঘর, আজও বিবাহ হয় নাই, ছুটী পায় না বলিয়া দেশে আসিয়া বিবাহ করিতে পারে নাই—এবার বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু অল্পদিনের ছুটী, পাত্রী অনুসন্ধান করিতেই ফুরাইয়া গেল, সুতরাং আবার চাকুরী স্থানে চলিয়াছে, আজ তোমার বাড়ী অতিথি।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তোমার পূর্ব্ব সংকল্প পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; তোমার ইচ্ছা হইল, এই পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান করিবে—তোমার অভিপ্রায় ছেলেটীর নিকট ব্যক্ত করিলে এবং তোমার মেয়েটীকে আনাইয়া তাহাকে দেখাইলে, মেয়েটী পরমাসুন্দরী, দেখিবামাত্র ছেলের পছন্দ হইল। পঞ্জিকা খুলিয়া দেখা গেল, সেদিন চন্দ্র তারা শুদ্ধ আছে, এজন্য সেই রাত্রেই উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে—এ স্থলেও তাহাই হইল—তোমার নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় যাহা হয় নাই, বিনা উদ্যোগে তাহাই হইল; কিন্তু কিরূপে একার্য্য সম্পন্ন হইল, একবার ভাবিয়া দেখা যাক্।

আমরা বলিয়াছি, আমরা যে কার্য্য করি, তাহার কারণ ইচ্ছা, অবস্থানুসারে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হয়; এবং বাহ্যিক ঘটনা হইতে অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাই সকল কার্য্যের মূল—তুমি যে বিবাহ দিলে, এ কার্য্যের মূল ঘটনা, তোমার কন্যার জন্মগ্রহণ ইহা একটী বাহ্যিক ঘটনা, এবং এই ঘটনা হইতে তোমার পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে; দ্বিতীয় ঘটনা বাঙ্গালাদেশে এবং হিন্দুকুলে তোমার নিজের জন্মগ্রহণ—এই ঘটনা দ্বারা তোমার চরিত্র এবং তোমার মতি গতি গঠিত ও চালিত হইয়া আসিয়াছে; এই দুই মূল ঘটনা হইতে তোমার এবং তোমার মেয়ের জীবনে পরবর্ত্তী ঘটনার উৎপত্তি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তৃতীয় ঘটনা তোমার মেয়ের বয়োবৃদ্ধি—এই সময় তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য তোমার মনে প্রথম ইচ্ছার উদয় হইল। যতদিন মেয়েটী ছোট ছিল, ততদিন তোমার মনে এ ইচ্ছা হয় নাই, তুমি যদি হিন্দু হইয়া বাঙ্গালায় না জন্মাইতে, তাহা হইলে তোমার মেয়ের ১৩ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছে, এখনও হয়ত তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য তোমার ইচ্ছা হইত না। এখন যে সে ইচ্ছা হইল, তাহার কারণ তোমার মেয়ের অরক্ষণীয় অবস্থা, তজ্জন্য তোমার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল—

ইচ্ছা হইল এবং সেই সঙ্গে বিবাহ দিতে চেষ্টা হইল; চতুর্থ ও পঞ্চম ঘটনা কুলীন ও বংশজ পাত্র উপস্থিত হওয়া—এইবার তুমি উভয় শঙ্কটে পড়িলে, দুই খণ্ড চুম্বক প্রস্তরের মধ্যে লৌহ খণ্ডের ন্যায় তুমি নিক্ষিপ্ত হইলে; দুই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সন্ধিস্থলে তুমি দণ্ডায়মান, দুদিক হইতেই তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল—এক দিকে তোমার মেয়ের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হওয়ার আশা, অন্য দিকে তোমার কুলক্ষয় জন্য সমাজের ভয়—তোমার একান্ত ইচ্ছা বংশজ পাত্রেই বিবাহ দেও, মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিলে,কত ঝগড়া বিবাদ করিলে কিন্তু সমাজের ভয়ই বেশী হইল; এবং যার শক্তি বেশী,সেই বলপূর্ব্বক তোমাকে টানিয়া লইল। শেষ ঘটনা, দৈবাৎ একটী সুপাত্র উপস্থিত হওয়া—কুলীন, লেখা পড়া জানে এবং চাকুরে, তোমার মেয়ের জন্য যাহা কিছু চাহিয়াছিলে, একাধারে তৎসমস্তই পাইবামাত্র তোমার পূর্ব্ব সংকল্প পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য এক সংকল্পের উদয় হইল—হঠাৎ যেমন এই ঘটনা উপস্থিত হইল, ফলে তোমার মনের অবস্থাও হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এই ঘটনার উৎপত্তি হইতে বিবাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই যেন যখন তখনই পর পর সম্পন্ন হইয়া গেল—বিবাহ দেওয়ার পূর্ব্বে তুমি যে একটী পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, তাহা ভাবিবার আর তোমার অবকাশ হইল না, একাজ ভাবিয়া করিলে না, করিয়া ভাবিলে যে, একটা কাজ করিয়াছ।

উপরে আমরা যে কয়েকটী অবস্থার উল্লেখ করিলাম, তাহা সমস্তই বাহ্যিক—এই সকল বাহ্যিক ঘটনার দ্বারা আমাদের অবস্থার কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে আমাদের মনে কত প্রকার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উদয় হইতেছে এবং অবস্থার শক্তি অনুসারে আকর্ষিত হইয়া দাসের মত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহা দেখা গেল; আরও বুঝা গেল যে,আমাদের সকল কার্য্যের মূল বাহ্যিক ঘটনা। অতএব সাব্যস্ত হইল,মনুষ্য ঘটনার অধীন।

ক্রমশঃ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১)

প্রায় সকল দেশেই ভূমি কর্ষণ, জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। ভারতবর্ষের যে পরিমাণ লোক কৃষিজীবী, প্রায় অন্য কোন সভ্যদেশে এ পরিমাণ কৃষিজীবী লোক নাই। দেশীয় কৃষিজীবীরা এত নিরক্ষর ও হীনাবস্থাপন্ন যে, তাহাদের উন্নতি কল্পে কোনই সাধারণ আন্দোলন এদেশে প্রায় দেখা যায় না। প্রবাদ আছে—'জোর যার মুল্লুক তার'। বর্ত্তমান কালে আন্দোলন-বলই উন্নতির একটী প্রধান উপায়, এবং যে সকল দলের আন্দোলন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের সংখ্যা বা আবশ্যকতা অতি সামান্য হইলেও এ দেশে ও অন্যদেশে ঐ সকল দলেরই উন্নতি অধিক হইতেছে। অনেকেরই বিশ্বাস, সৈনিক পুরুষ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, বি এ, এম এ পাশ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দর স্থির, এই সমস্ত সমাজের ভিত্তিমূল। এই সকল বিষয় লইয়া চীৎকার করিবার পূর্ব্বে

কেহ কি ভাবিয়া দেখেন যে, এই সমস্ত অস্বাভাবিক আড়ম্বর যদি একেবারে উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও হয়ত সমাজের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ কাউণ্ট টলষ্টয় নামক রুষিয়ান পণ্ডিত এমনও বিবেচনা করেন যে পুলিষ, বিচারালয় ও সৈন্যদল কোন সভ্যজাতি যদি একেবারে উঠাইয়া দেন, তবে ঐ জাতির বিপদাশঙ্কা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে সমস্ত বিষয় লইয়া আমাদের আন্দোলন করা অভ্যাস, তাহাদের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত আবশ্যক আছে কি না, এই বিষয় লইয়া বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃষি-ব্যবসায়ীদের উন্নতি দ্বারা যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কৃষি ব্যবসায়ের উন্নতির দুইটী প্রকরণ;— প্রথম, ব্যবস্থা প্রচলন, দ্বিতীয়, কৃষকদিগের উদ্বোধন। পূর্ব্ব কালীন মিশরদেশের সম্রাট্ সচিব যোষেফ্ অথবা এদেশের সম্রাট্ কুত-বুদ্দিন যখন শস্য গোলাজাত করিয়া রাখিতে হইবে, এই হুকুম করিলেন, তখন বলপূর্ব্বক কৃষক জাতির একটী উপকার সাধিত হইল। রাজপরতন্ত্র দেশে উন্নতি সাধনের এই এক প্রধান উপায়। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কৃষি-কার্য্যের উন্নতির কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিলেন, প্রজাবৎসল রাজা অথবা ক্ষমতা-শালী অন্য কোন রাজপুরুষকে বুঝাইলেন এবং তাঁহারা বলপূর্ব্বক সক্ষম প্রজাদ্বারা ঐ উন্নতি সাধন করিয়া লইলেন। এদেশে এই উপায় অবলম্বনের উপরই অনেক সময় নির্ভর করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন দ্বারা যে প্রজার উৎপীড়ন হওয়া সম্ভব,এমত বোধ হয় না। যে দেশে সম্বাদ পত্র আছে, সে দেশে সমাজগত উৎপীড়ন হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত উৎপীড়ন হওয়া বড় সুকঠিন। আইনজারি দ্বারা কৃষকদিগের উন্নতির বিষয়ের দুই একটী উদাহরণ এই স্থলে দিলে, প্রথম প্রকরণে উন্নতি সাধন কিরূপে হইতে পারে, বুঝা যাইবে।

বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই দেখা যায়, গো-ভাগাড়, মাঠ প্রভৃতি সকল স্থান হইতেই রাশি রাশি অস্থি কলিকাতার ব্যবসায়ীরা লইয়া অন্য দেশে চালান করি-তেছেন। প্রজা ও জমীদারদিগকে অস্থির সারবত্তা সম্বন্ধে বুঝান বড় দুঃসাধ্য; বুঝি-লেও তাঁহারা যে নিজ হইতে উদ্যোগ করিয়া অস্থি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহার আশা অল্প। কবে তাঁহারা বুঝিয়া অস্থির সংরক্ষণ ও ব্যবহার আরম্ভ করিবেন, এই বলিয়া যে আপাততঃ জমীদারদিগের খামার হইতে অস্থি চালান হইয়া একটা অযথা ব্যবসায় প্রশ্রয় পাইবে, ইহা বড় ভ্রম। আইন দ্বারা অস্থির সংরক্ষণ ও ব্যবহার-উপায় স্থির করাই প্রশস্ত। কলিকাতার ব্যবসায়ীদের খাতিরে কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, অস্থি এদেশের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার, এ বিষয় এখনও পরীক্ষার দ্বারা ভালরূপে স্থির হয় নাই। এবং এ বিষয়ে যতদিন না স্থির হয়, ততদিন বলপূর্ব্বক একটী নূতন ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কিন্তু অস্থির রাসায়নিক কার্য্য এদেশে একরূপ হইতে পারে ও অন্য দেশে অন্যরূপ হইতে পারে, ইহা 'ছেলে ভুলান' কথা। এদেশের অনেক স্থানে কোন কোন বৎসর জলাভাবে আবা-দের ক্ষতি হয়। এই রূপ স্থানের প্রত্যেক গ্রামে জমীদারদিগের দ্বারা জলাগমের কোন

প্রশস্ত উপায়, আইন অনুসারে করাইয়া লওয়া বিধেয়। 'প্রজাদের কোন উন্নতি সাধন করিয়া কর বৃদ্ধি করা আইনানুসারে জমীদারেরও আয়ত্তাধীন। কোন্ গ্রামে কিরূপ জলাগমের উপায় স্বল্প ব্যয়ে ও সহজে হইতে পারে, এ বিষয়ে জেলার ইঞ্জিনিয়ারের মতে চলা উচিত। কোথাও বা কতকগুলি প্রণালীমাত্র কাটা আবশ্যক হইবে, কোথাও বা উইণ্ডমিলের, কোথাও বা পম্পের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছাধীন রাখিলে, একার্য্য সাধনের পূর্ব্বে যে কত দুর্ভিক্ষ কাটিয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না।

এক্ষণে শস্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। শস্য বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা এক্ষণে অনেক টাকা পায়। কিন্তু পূর্ব্বেও যত টাকা খাজনা দিতে হইত, এখনও তাহাদের প্রায় তত টাকাই খাজনা দিতে হয়। কৃষকদের অবস্থা কতকটা এক্ষণে ভালই হইয়াছে। কিন্তু নগদ মূল্যে নূতন শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলা তাহাদের মধ্যে এত বাড়িয়াছে যে, একটা ফসলমাত্র যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলেই কৃষকদের হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। এক বৎসর পুরাতন না করিয়া কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিতে পারিবে না, এরূপ কোন আইন হইলে অনেক উপকার হয়। নূতন চাউল, ছোলা বা গোধুম খাইলে অপকার হয়। যে আইনের কথা বলা হইতেছে, এমন আইন হইলে পুরাতন ভিন্ন নূতন শস্য বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইবে। যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে পুরাতন চাউল, গম, ও বুট পাওয়াই সুকঠিন হইয়াছে। এইরূপ সকল কৃষকের ঘরে এক বৎসরের শস্য মজুত থাকিলে, এক বৎসরের দৈবনিগ্রহে দেশে দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবে না। এরূপ আইন হইলে, কিরূপ ভাবে শস্য গোলায় রাখিলে শস্যে পোকা লাগিবে না, এ বিষয় সকল কৃষককে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক হইবে।

পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ, উদ্ভিজ্জ বা গ্রাম্য জন্তুর সংক্রামক রোগের উপশম প্রথা অবলম্বন, কৃষকদিগের অল্প সুদে ঋণ দেওয়া, এই সমস্ত বিষয়ও আইনদ্বারা নিয়মবদ্ধ হওয়া উচিত।

কৃষিব্যবসায়ের উন্নতির প্রথম প্রকরণের কোন বিষয় অবলম্বন করিতে হইলে, নানা স্থানে দুই তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ের উপকারিতা স্থির করিয়া তবে কার্য্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পরীক্ষা সাবধানে করিতে হইবে, যেন পরীক্ষার ফল স্থির করিতে ভ্রম না হয়। এইরূপ ভ্রমেই এদেশের অনেক পরীক্ষার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ফল হইয়া দাঁড়ায়। কৃষকেরা যে উপায়ে গোধুম উৎপন্ন করে, তাহা অপেক্ষা যবক্ষার ব্যবহার দ্বারা অধিক গোধুম হয় কি না, এইরূপ স্থির করিতে হয়ত একটী পরীক্ষা হইল। যে জমীতে পরীক্ষা হইল, সে জমী হয়ত এত অধিক উর্ব্বরা ও তাহাতে যবক্ষারের ভাগ এত অধিক যে, পরীক্ষার ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। হয়ত সোরা দেওয়া মাত্রই হইল, পরীক্ষার 'মা-বাপ' না থাকিবার জন্য বেজায় খরচ হইল, গাছগুলি গোরু ছাগলে খাইয়া গেল, যে অল্প পরিমাণ শস্য হইল, তাহারও অর্দ্ধেক হয়ত মালিতে চুরি করিল। পরীক্ষার ফল হইল—অন্য দেশে সোরা দ্বারা গম অধিক হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে ক্ষতি হয়। হাড়ের ব্যবহারও ঐরূপ। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার

দ্বারা পরীক্ষা স্থলে দিয়া দেখা গেল, আলু চমৎকার হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ৫।৭ ঝাড়ের আলু ওজন করিয়া দেখা গেল, গড়ে প্রত্যেক ঝাড়ে আধসের তিন পোয়া আলু হইয়াছে। লাইন, ও ঝাড় গণনা করিয়া আন্দাজ করা গেল, বিঘা প্রতি অন্ততঃ ৫০ মণ আলু হইয়াছে। আলু তোলা শেষ হইল, পরীক্ষাস্থল হইতে রিপোর্ট আসিল, বিঘা প্রতি ৫ মণ আলু হইয়াছে। সন্দেহ করিয়া মালিকে যদি কার্য্যচ্যুত করা যায়, তাহাতে সে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহে; তাহার মাসিক ৫।৬ টাকা, সে যেখানেই থাকুক, কেহই মারিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ, 'পরীক্ষার ফল মন্দ হইল,' 'এ উন্নতি কার্য্যে পরিণত হইবে না,' 'এদেশে কৃষকদের আর কোন বিষয়ে উন্নতি হইতে পারে না,' এইরূপ কথা বলাই অতি সহজ। পরীক্ষা কৃষকদের দ্বারাই করাইয়া লওয়া উচিত এবং এমন ভাবে পরীক্ষা করাইয়া লওয়া উচিত যেন তাহাদের পরীক্ষার ফল মন্দ হইল, এরূপ বলাতে স্বার্থ না থাকে, তাহাদের প্রথমাবধিই বলিয়া দেওয়া উচিত যে এই বীজ বা এই সারের মূল্য দিতে হইবে না। যদি বেতনভোগী লোকদের দ্বারা কৃষি সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় বা কৃষকদের দ্বারা কোন পরীক্ষা করাইয়া লইবার কালে এরূপ বলা হয়, 'তোমাদের ফল যদি না ভাল হয়, তবে তোমাদের এই বীজ বা এই সারের দাম দিতে হইবে না,' তবে নিশ্চয়ই পরীক্ষার ফল ভাল হইলেও রিপোর্ট আসিবে, পরীক্ষার ফল বড়ই মন্দ। আবার পরীক্ষার ফল চমৎকার হইয়াছে, অন্যায় করিয়া এরূপ বলাও চলে। হয়ত কোন স্থানে পরীক্ষার জন্য একমণ গম ও পাঁচ সের সোরা একজন সবডিবিজনের হাকিমকে দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার চাপ্‌রাশিকে গম ও সোরা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, কি করিতে হইবে। চাপ্‌রাশি গম পিষিয়া রুটী করিয়া খাইল, সোরা দ্বারা কালী পূজার বাজি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিল। হাকিম পরীক্ষার গম দেখিতে চাহিলেন, চাপ্‌রাশি নিঃশঙ্ক চিত্তে যে কোন এক সুন্দর গমের ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল, এবং রিপোর্ট দিবার সময় "বিঘা প্রতি ২৫ মণ গম হইয়াছে, এমন গম, এদেশে কখন দেখি নাই, আগামী বৎসর যত এই গমের বীজ হুজুর আনাইয়া দিবেন, সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিব, প্রজারা ঐ বীজের মুখ চাহিয়া আছে," এইরূপ বলিয়া আসিল। পর বৎসর ৫০ মণ গম আসিল, চাপ্‌রাশি বিক্রয়ের ভার লইলেন। রিপোর্ট লিখিবার সময়, চাপরাশি খবর দিলেন "ও বীজ ভাল ছিল না, যে যে ঐ বীজ ব্যবহার করিয়াছে, সকলেরই গম মারা গেল, তাহারা দাম দিতে চাহে না, এখন হুজুর মালিক।"

উপরোক্তরূপে কোন পরীক্ষা করিয়া ভাল বা মন্দ ফল স্থির করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে আইন জারি করিলে প্রজাদের উৎপীড়ন করা মাত্র হইবে। বিজ্ঞানসিদ্ধ কোন বিষয় যে পুনঃপুনঃ ও অনেক কাল ধরিয়া পরীক্ষা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তের অতীত, তাহা নহে। কিন্তু যে কয়েকবার পরীক্ষার পরে বিজ্ঞানসিদ্ধ কোন বিষয়ের কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সে কয়েকবার ভ্রমের উপায় যেন না থাকে, এরূপ সতর্কভাবে পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কৃষিকার্য্যের দ্বিতীয় উপায় কৃষকদিগের উদ্বোধন সম্বন্ধে পরে লিখিব। ক্রমশঃ,

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (২)

পাঠকগণ, জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে যে কত প্রভেদ, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে আজ বর্ণনা করিব, আপনারা বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে তাহার সার ভাব গ্রহণ করিবেন। মূর্খ লোকেরা যদি বহুমূল্য পরিচ্ছদ-শোভিত রাজা, ধনী কিম্বা সুন্দরী যুবতী দেখে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কত আদর, যত্ন ও তোষামোদ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই; সে ভাবে যে জগতে একমাত্র অর্থ ও সুন্দরী স্ত্রীই সার; এই সকল যাহার আছে, সেই ধন্য।

কাল সহকারে যখন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট, ধনী দরিদ্র ও সুন্দরী যুবতী বিগত-যৌবনা হয়, তখন মূর্খেরা আর তাহাদের আদর ও যত্ন করে না, এমন কি তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করে না। তাহারা মনে করে যে, ইহাদের সহিত আলাপ করিলেই ইহারা অর্থ যাচ্ঞা করিবে, সুতরাং দূর হইতে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকে। কিন্তু যখন রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ধনীর অগাধ অর্থ ছিল, যুবতীর যৌবন ও সৌন্দর্য্য ছিল, তখন মূর্খেরা তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অকাতরে কত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, কত বাক্য বিন্যাস করিয়াছিল, তাহার সীমা নাই। যদি সেই রাজ্যহীন রাজা, অর্থহীন ধনী ও সৌন্দর্য্য-বিহীনা বিগত-যৌবনা স্ত্রী অজ্ঞানীদিগকে পূর্ব্ব বন্ধু জ্ঞানে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, আরও যদি বলে যে, এক সময়ে তোমরা আমাদের সন্তোষার্থে কত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলে, কত চাটুবাক্য বলিয়াছিলে, আজ আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর; তখন অজ্ঞানী মূর্খেরা ধনমদে ও মোহে অন্ধ হইয়া প্রত্যুত্তরে বলে যে, তোমরা কে? আমরা তোমাদিগকে চিনি না; কখনও তোমাদের সহিত দেখা হইয়াছে কি না সন্দেহ; অতএব তোমরা এখান হইতে দূর হও। যেমন মদ্যপান করিয়া লোকে নেশায় অন্ধ হইয়া নিজ আত্মীয়বর্গকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানী লোক ধনমদে ও অহংভাবে মত্ত হইয়া অন্য সকলকে আপনার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং কাহারও উপকার করে না। কিন্তু তাহারা জানে না যে জীব যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনে না, এবং মৃত্যুকালে কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় না! কেবল ভোগ বাসনা মাত্র তাহার থাকিয়া যায়। ধন থাকিতে, ক্ষমতা থাকিতেও সেই অজ্ঞানী জীব পরোপকার করে না!

জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করেন। তিনি, বাল্য ও কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, সৌভাগ্য ও দরিদ্র, সুস্থ ও রুগ্ন সকল অবস্থাতেই সকল কালেই জীব চেতনকে আত্মবৎ দেখেন; এবং লোক, ধন, মান, সৌন্দর্য্য, হাড় মাস ও শোভনীয় ভূষণাদিতে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র জীবাত্মার উপর দৃষ্টি রাখিয়া সদা পরোপকারে রত থাকেন। বরং বিপদকালে বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ গুণ সকলকে গ্রহণ ও নিকৃষ্ট গুণ সকলকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অজ্ঞান লোক তাহা করে না; তাহারা

নিকৃষ্ট গুণেরই আদর করিয়া থাকে। তাহারা বাহ্য শোভাতেই মোহিত হয়, বাহ্যাড়ম্বরের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। যদি কোন অসৎলোক সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া তাহাদের নিকটে আইসে, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে মহৎ লোক বিবেচনায় বহুবিধ সম্মান প্রদর্শন করে; এবং পাছে সে কোন ক্রটী পাইয়া রুষ্ট হয়, এ জন্য সদা সশঙ্কিত চিত্তে থাকে। কিন্তু যদি কোন সাধু মহাত্মা কিম্বা কোন সদ্‌গুণশালী গৃহস্থ ব্যক্তি আসেন, তবে উহারা তাঁহাদের মলিন বেশ দেখিয়া তাঁহাদিগকে মান্য করা দূরে থাকুক, যথেষ্ট ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। তাহা, অতি অল্প দিন হইল, এই, সহরে ঘটিয়াছিল। একজন মহাত্মা কোন কারণ বশতঃ তিন দিবস ট্রামগাড়ীতে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছিলেন, ১ম দিন তিনি একখানি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়া ট্রামে চড়িয়াছিলেন, ট্রামের ইন্‌স্পেক্টার বাবু টিকিট দেখিবার সময় তাঁহার মলিন বেশ দেখিয়া ঘৃণার সহিত "রে! টিকিট দে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরীক্ষার জন্য ২য় দিন তিনি একটী মূল্যবান পশমী কাপড়ের আলখেল্লা পরিয়া যান, ঐ দিন ইনস্পেক্টার বাবু "মহারাজ টিকিট দিজিয়ে" এবং তৎপরদিন একখানি রেশমী বালাপোস গায়ে দেওয়াতে "মহাশয় টিকিট দেন" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন। এখন দেখুন, একমাত্র পরিচ্ছদের জন্য সেই একই ব্যক্তি সেই একই ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নিকট তিন দিন তিন প্রকার সম্বোধনে সম্বোধিত হইলেন। এই তিন দিনের তিন প্রকার সম্বোধনে উক্ত মহাত্মার মান্যের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইল না; তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই রহিলেন, ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুরও এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে কিছুই লাভ হইল না বরঞ্চ প্রথম দিনের ব্যবহার (যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন) স্মরণ হওয়াতে অনুতাপ হওয়াই সম্ভব। অতএব পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে, অজ্ঞানীর পক্ষে অর্থই গুরু, অর্থই রাজা, অর্থই ধনী, অর্থই পণ্ডিত। কিন্তু কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে গুরু, রাজা, ধনী ও পণ্ডিত হওয়া যায় বা বলা যায়, তাহা তাহারা আদৌ বিচার করিয়া দেখে না। উদাহরণ স্বরূপ, আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। রামপুর সহরে মৃত দেবীদাস বাবুর নূতন বাটীর প্রাঙ্গণে এক মহতী সভা হয়। উক্ত সভায় অনেক রাজা, জমিদার, ধনী, ও মহাজন ও জেলার বড় বড় সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মান রক্ষার জন্য শ্রেণী বিভাগ ও আসনের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১ম শ্রেণীর আসন ১৬৲, ২য় শ্রেণীর ৮৲, ৩য় শ্রেণীর ৪৲, ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৲। দেবীদাস বাবু এইরূপ শ্রেণী বিভাগ দেখিয়া তাঁহার একজন খানসামাকে উত্তম পোষাক পরাইয়া ও ১৬৲ টাকার একখানি ১ম টিকিট খরিদ করিয়া ১ম শ্রেণীর আসনে বসাইয়াছিলেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা চক্ষের উপর অহরহ ঘটিতেছে; কিন্তু কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। আর ইহাতেই জানা যায়, অর্থই জগতের মধ্যে অজ্ঞানীর নিকট মান্য ও আদরণীয়। কিন্তু আত্মাকে আদর ও সম্মান করে না। সকল অবস্থাতেই যে আত্মাকে সম্মান করা চাই, তাহা তাহারা

আদৌ জ্ঞাত নহে। কিন্তু জানিও, সকল ধনেরই ক্ষয় ও বিনাশ আছে। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কেবল একমাত্র সত্য-শুদ্ধ-চৈতন্য-পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা ধনের বিনাশ ও ক্ষয় নাই। এই পরম ধন যিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত রাজা, ধনী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সাধু। নতুবা প্রকৃত রাজা, ধনী, জ্ঞানী, পণ্ডিত-ও সাধু জগতে কেহই নহে। অতএব নিবেদন, আপনারা সকলে সেই সত্য-শুদ্ধ-চৈতন্য-পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা ধন অর্জ্জন করিয়া জগতে প্রকৃত ধনী হউন, এবং পরমানন্দে দিন যাপন করুন। তাঁহাকে পাইলে আপনাদের আর নিরানন্দ অশান্তি থাকিবে না। ইহা শাস্ত্রের অমোঘ বাক্য।

কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। (২)

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা কার্লাইলের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী জেন, স্বাধ্বী, বিদুষী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। সক্রেটিস, জেণ্টিপিকে বিবাহ করিয়া যেমন কেবল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, এই রমণীকে বিবাহ করিয়া কার্লাইল তাদৃশ অবস্থায় নিপতিত হন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে প্রাপ্ত হইয়া, মহম্মদ খাদিজাকে লাভ করিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, কার্লাইল জেনকে জীবনপথে সঙ্গিনী করিয়াও সেইরূপ সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী ও ভাই-ভগ্নীরা,—সকলেই মনের মত ছিলেন। বিবাহ হইতেই কার্লাইলের জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরব্ধ হয়। তিনি কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন লাভ করিয়া স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ক্রেগেনপট্টক নামক এক রমণীয় স্থানে গমন করিয়া সস্ত্রীক বাস করেন। এই স্থানে বাস করিয়া তিনি অধ্যয়নে ও প্রবন্ধ রচনাতেই সময়াতিপাত করিতে থাকেন। জর্ম্মান্ সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এই সময়ে তিনি স্পেনীয় ও গ্রীক ভাষায় গ্রন্থাবলী বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই তাঁহার "সার্টর" গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের সুখ্যাতির কথা কি বলিব? এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, এই সার্টর গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি বন্ধু বিবেচনা করিব, ইহা বিচিত্র নহে; যিনি সার্টর পড়িয়া সুখী হন, তাঁহাকেও আমি বন্ধু বিবেচনা করি। কিন্তু এই গ্রন্থ রচিত হইবার পরে বহুকাল পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থবিক্রেতা অর্থব্যয় পূর্ব্বক উহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচার করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে উহা মুদ্রিত হইলে, কেবল দুই ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থের গৌরব অনুভব করিতে সমর্থ হন। এক আমেরিকাবাসী ভাবগ্রাহী মহাত্মা এমার্সন, অপর রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এক পুরোহিত। এমন কি সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলও এই সার্টর গ্রন্থের মূল্য প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "আমি প্রথমে ইহা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়াছিলাম; দুই বৎসর পরে যখন "ফ্রেজার্স ম্যাগাজিন" নামক পত্রে প্রকটিত হইল, তখন ইহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ আনন্দলাভ করিলাম ও পুলকিত-চিত্তে ইহার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে

লাগিলাম।" মিলের মত লোকে প্রথমে কার্লাইলের গ্রন্থের মহত্ত্বাবধারণে সমর্থ হন নাই; দুই বৎসর পরে সমর্থ হইলেন। কার্লাইলের নবীন গভীর ভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে অপর সাধারণের যে আরও অধিক সময় লাগিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সার্টরের ন্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ "ফরাসী-বিপ্লব" নামক গ্রন্থও জনসমাজে প্রথমে আদর লাভ করিতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থ ইংলণ্ডে আদৃত হইবার পূর্ব্বে কেবল আমেরিকাতেই আদর লাভ করিয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্লাইল ক্রেগেনপট্টক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠে চেল্‌সি নামক স্থানে বাস গ্রহণ করেন। চেল্‌সিতে বাস করিয়া তিনি একদিকে গ্রন্থ রচনা ও অপর দিকে লণ্ডন নগরে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া আপনার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। প্রথম বৎসরে তিনি "জর্ম্মান্ সাহিত্য" বিষয়ে ছয়টী বক্তৃতা করেন। এইরূপ প্রতিবৎসর এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া কতিপয় বক্তৃতা করিতে থাকেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে "মহাপুরুষ" সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতাবলী অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাগুলি অল্পকাল মধ্যেই ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, লোকে তাঁহার এই বক্তৃতাগুলির শীঘ্র আদর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কার্লাইল একজন Born-Orator অর্থাৎ জন্ম-বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি অল্পভাষী ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও একদা এক সভায় ঈদৃশ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, যে তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সন্তানের শক্তি দর্শনে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কার্লাইলের লণ্ডন নগরের বক্তৃতাসমূহে যে বহুলোকে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহার পরে তিনি ফ্রেড্‌রিকের জীবনবৃত্ত প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এই ফ্রেডরিকের জীবনবৃত্ত রচনা করিবার উপযোগী বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্যই কার্লাইল জর্ম্মণি গমন করিয়াছিলেন। রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়েও তাঁহার অনেক পুস্তিকা প্রকটিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বক্তৃতা ও গ্রন্থের দ্বারা তিনি জনসমাজে অনেক নূতন ভাব প্রচার করিয়াছিলেম। সকল দেশের সকল কালের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, যখন কোন প্রতিভা-শালী ব্যক্তি কোন নূতন ভাব বা নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন, তখনই এক দল লোক তাঁহার বিরোধী, আর এক দল তাঁহার পরমবন্ধু ও পরমভক্ত হইয়া দাঁড়ান। কার্লাইল সম্বন্ধেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ইন্ধনাচ্ছাদিত অগ্নি যেমন চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকে না, তেমনই কার্লাইলের প্রতিভা চিরকাল লোকের অজ্ঞাত রহিল না। তাঁহার খ্যাতি কালক্রমে ইংলণ্ডে, জর্ম্মণিতে, আমেরিকাতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেকেই তাঁহাকে বড় লোকের আসনে বসাইলেন। তিনি লণ্ডন পুস্তকালয়ের President অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদ শূন্য হইলে লোকে সুবিখ্যাত ডিস্‌রেলিকে তৎপদ প্রদান না করিয়া তাঁহাকে উক্ত-

পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জর্ম্মণির সাম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার চেল্‌সীর বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ তাঁহার সম্মানের সীমা রহিল না। জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডের রাজসভা হইতে তাঁহাকে "Ordre peure de merit" ও "Grand Cross of the Bath" উপাধিদ্বয় প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব হইল,কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি পদার্থ-প্রিয় ছিলেন, আড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন না।

তাঁহার চরিত্র বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চিরদিনই অতীব বিশুদ্ধ ছিল। লোকে তাঁহাকে চেল্‌সির প্রফেট ও সেজ অর্থাৎ সাধু জ্ঞানী পুরুষ বলিত। অসারতা, মিথ্যা, আড়ম্বর ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি চিরদিনই তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার লোকানুরাগও অল্প ছিল না। তাঁহার ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ও লোকানুরাগ সম্বন্ধে দুই একটি গল্প শুনিলেই আপনারা তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিখ্যাত গ্রন্থকার ডিকোয়েন্সি কার্লাইলের একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে করিতে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন, ইহাতে কার্লাইলের হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, কার্লাইল ডিকোয়েন্সির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে কখনই কার্পণ্য করেন নাই। ক্রেগেনপট্টকে অবস্থানকালে তিনি ডিকোয়েন্সিকে দেখিবার অভিপ্রায়ে অনুরাগ-ভরে স্বীয় আবাসে আহ্বান করিয়াছিলেন; ইহা কি তাঁহার কোমল হৃদয়ের পরিচয় নহে? তাঁহার "ফরাসীবিপ্লব" নামক গ্রন্থের এক ভাগের পাণ্ডুলিপি জন ষ্টুয়ার্ট মিল পাঠ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি পাঠান্তে তাঁহার সঙ্গিনী টেলর-পত্নীকে পাঠ করিবার জন্য অর্পণ করেন; ও টেলরপত্নীর অসাবধানতা নিবন্ধন তদীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক উহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে কার্লাইলের কি ভয়ানক ক্ষতি হইল, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতেছে। তন্নিবন্ধন কার্লাইল, মিলের উপরি অণুমাত্র বিরক্ত হন নাই। অধিকন্তু জন ষ্টুয়ার্ট মিল যখন বিষণ্ণ-মুখে আপনার দোষ স্বীকার করিবার জন্য কার্লাইলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কার্লাইল মিলের দুঃখাপনোদন বাসনায় অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাক্যালাপে সময়াতিপাত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা কি কার্লাইলের ধৈর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে? কার্লাইলের গুণের কথা অনেক বলিলাম; ইহা অপেক্ষা অধিক কথা অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেই সকল বর্ণনা করাই অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদিগের স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে নববিধান ঘোষণা করেন; মহাত্মা কার্লাইল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে ৮॥০ ঘটিকার সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার গুণ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই জর্ম্মণি ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের লোকেরা তদীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে পীড়ার সময়ে স্বাস্থ্য-সংবাদ অবগত হইবার জন্য প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে, জর্ম্মণিতে ও আমেরিকায় অসংখ্য লোকে হাহাকার করিয়াছিলেন।

বন্ধুগণ! কার্লাইলের প্রকৃত মহত্ত্ব যদি আপনারা অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মভাবের মধ্যে প্রবেশ করুন। আমি কার্লাইল-জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনটী বিশেষ গুণই তাঁহার মহত্ত্বের মূল। প্রথম গুণ Sincerity অর্থাৎ সরলতা, অকপটতা। এই Sincerity [সরলতা] অপেক্ষা মানবচরিত্রে আর কি উৎকৃষ্টতর গুণের সমাবেশ হইতে পারে? আমরা চারিদিকে অসরলতা ও কপটতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়ি। আমাদিগের চরিত্রে এই Sincerity অর্থাৎ অকৃত্রিমতার অভাব আছে বলিয়াই আমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না। মানুষ যদি Sincere [সরল ও অকপট] হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে অগ্রসর হয়, জনসমাজের সেবা করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইয়া পড়ে। Sincere [অকপট] পাপীও ভাল; তবু Insincere [কপট] সাধু ভাল নয়। কার্লাইলের অস্থি মজ্জায় এই Sincerity অর্থাৎ সরলতা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সমস্ত জীবন তিনি এই অকৃত্রিমতার গুণ কীর্ত্তন করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এক খাঁটি লোক ছিলেন; এবং লোকে খাঁটি হয়, এই তাঁহার প্রধান প্রার্থনা ছিল। যাহা কিছু খাঁটি নয়, অকৃত্রিম নয়, তাহার প্রতি তিনি বিষম ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"I should say, sincerity, a deep, great, genuine sincerity is the first characteristic of all men in any way heroic"—"A great man cannot be without it." ইহার অর্থ এই, প্রগাঢ় অকৃত্রিম সরলতাই মহাজনদিগের সর্ব্ব প্রথম লক্ষণ; কোন মহাপুরুষই এ লক্ষণে বঞ্চিত নহেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"The merit of originality is not novelty, it is sincerity."—"Every son of Adam can become a sincere man, an original man, in this sense; no mortal is doomed to be an insincere man." "নূতনত্বের ভিতর মৌলিকতা নহে, সরলতার মধ্যে মৌলিকতা। প্রত্যেক মানব-সন্তানই সরল ও অকপট হইতে পারে; অসরল হওয়া কাহারও নিয়তি হইতে পারে না।"

মহাত্মা কার্লাইল মহাজনদিগের চরিত্রে এই Sincerity অর্থাৎ খাঁটিভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। খাঁটি পদার্থের মর্য্যাদা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং খাঁটি হইয়া,—সরলভাবে সত্যান্বেষণ করিতেন, ও প্রাপ্ত সত্যে সরলভাবে অন্তরের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। কার্লাইল-চরিত্রের দ্বিতীয় গুণ—Belief Faith—তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Belief is great, life-giving. The history of a nation becomes fruitful, soul-elevating, great so soon as it believes." "বিশ্বাস অতি মহদ্বস্তু; ইহা জীবনপ্রদ। যখনই কোন জাতি কোন সত্যে যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করে, তখনই সেই জাতির প্রচুর উন্নতি হইয়া থাকে।"

পরমেশ্বরের প্রতি,—পরলোকের প্রতি,—সমুদয় সত্যের প্রতি,—সকল সাধুর প্রতি মহাত্মা কার্লাইলের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। তাঁহার "সার্টর" গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, Carlyle has a real belief in the invisible" এ পুস্তক পাঠ করিলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়, অদৃশ্য ঈশ্বরে ও অদৃশ্য স্বর্গরাজ্যে কার্লাইলের যথার্থ বিশ্বাস আছে। এই যথার্থ বিশ্বাস মানুষের অবস্থার কি সুন্দর পরিবর্ত্তন সাধন করে, আমরা সকলেই তাহা অল্পাধিক অবগত আছি। এই বিশ্বাস যাঁহার অন্তঃকরণে

বিদ্যমান, তিনি এই বিশাল সৃষ্টি-গ্রন্থ যেরূপ পাঠ করেন, অবিশ্বাসী কখনই সেরূপ পাঠ করিতে পারেন না। তাঁহার চক্ষে এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও জীবপুঞ্জ একভাবে দৃষ্ট হয়, অবিশ্বাসী ঐ সকল অপরভাবে নিরীক্ষণ করে। তাঁহার অন্তর নিয়ত পূর্ণ, অবিশ্বাসীর অন্তর শূন্য। তিনি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, সুন্দর ভূমিতে সুদৃঢ় ভাবে তাঁহার ভিত্তি স্থাপন হয়; অবিশ্বাসী যে গৃহ প্রস্তুত করিতে যায়, শূন্যদেশে তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া ব্রহ্মেরই অভিপ্রায় সাধন করেন, অবিশ্বাসী কিছুই দেখিতে পায় না, কিছুই বুঝিতে পারে না,—যাহা কিছু করিতে যায়, সকলই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বিশ্বাস মানব চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে; মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃত বিশ্বাসী হইয়া যদি আমরা ধর্ম্ম-সাধন করি,—কর্ত্তব্য-পালন করি, তাহা হইলে আমাদিগের উন্নতিমার্গে কেহই কণ্টক রোপণ করিতে পারে না; আমাদিগের কল্যাণ ও উন্নতি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই যথার্থ বিশ্বাস কার্লাইলের ছিল; সুতরাং কার্লাইল যে এক মহদ্ব্যক্তি হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাঁহার চরিত্রের তৃতীয় গুণ,—Admiration for whatever is great and noble,—মহত্ত্বানুরাগী। যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহা দেখিলেই বা অনুভব করিলেই কার্লাইল অবাক্ হইতেন,—স্তব্ধ হইতেন,—বিস্মিত হইতেন,—পুলকিত হইতেন। ইহার নামই ভক্তি। এই ভক্তি, এই মহত্ত্বানুরাগিতা কার্লাইলের ছিল বলিয়াই তিনি অসার বিষয় সমূহকে ঘৃণা করিয়া সার বিষয়ে আসক্ত হইতেন; ইহার জন্য তিনি সৃষ্টির তাবৎ পদার্থে ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ও সাধু মহাপুরুষগণের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কার্লাইল বলিয়াছিলেন,—

"Ah, does not every true man feel that he is himself made higher by doing reverence to what is really above him? No nobler or more blessed feeling dwells in man's heart." "প্রত্যেক লোকেই আপনা অপেক্ষা যাহা কিছু প্রকৃত পক্ষে মহৎ, তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কি বোধ করেন না, যে সেই ভক্তি-প্রদর্শন দ্বারা তিনি নিজেই মহৎ হইয়া পড়েন? মনুষ্যের অন্তরে এই মহত্ত্বানুরাগ অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর ভাব নাই। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "Worship is transcendant wonder; wonder for which there is now no limit or measure; that is worship." পূজা আর কাহাকে বলে? "প্রগাঢ় বিস্ময়রসে নিমগ্ন হওয়াই পূজা; যে বিস্ময়ের সীমা নাই, সেই বিস্ময়ে অভিভূত হওয়াই পূজা।"

আমরা প্রতিদিন পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি, আমরা কি মহাত্মা কার্লাইলের এই কথার ভাব সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না? আমাদিগের আরাধনা ও ধ্যান এই transcendant wonder (প্রগাঢ় বিস্ময়ানুভব) ভিন্ন আর কি? কার্লাইলের ভক্তিময়ী প্রকৃতির পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার রচনা হইতে আর একটি অংশ উল্লেখ করিতেছি। তিনি মহাত্মা নোভালিসের সহিত একবাক্য হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"There is but one temple in the universe and that is the body of man. Nothing is holier than that high form. Bending before men is a reverence done to this revelation in the flesh. We touch heaven, when we lay our hand on a human body." "এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল এক দেবমন্দির দেখিতে পাই। মানুষের দেহই সেই দেবমন্দির। সেই শ্রেষ্ঠ আকৃতি অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র আর

কিছুই হইতে পারে না। মানুষের সম্মুখে প্রণত হইলে, মানবদেহে যে ব্রহ্মপ্রকাশ, সেই ব্রহ্মপ্রকাশের নিকটেই প্রণত হওয়া হয়। যখন কোন মানবশরীরের উপরি হস্ত স্থাপন করি, তখন স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকি।"

কি চমৎকার ভাব! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহৎ বস্তুর বা মহৎ ব্যক্তির গৌরব অনুভব করিতেও মহত্ত্বের প্রয়োজন। যাহা কিছু ভাল, কয়জন লোকে মন খুলিয়া সেই সকলের প্রশংসা করিতে পারেন? কয়জন লোকে যথার্থভাবে সাধু মহাজনদিগের প্রশংসা করিতে সমর্থ হন? কয়জন লোকে ব্রহ্মপ্রকাশ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন? যে ব্যক্তি এরূপে ব্রহ্মের ও ব্রহ্মভক্ত মহাপুরুষদিগের যথার্থ প্রশংসা করেন, তিনি কি আর প্রশংসার্হ সদ্‌গুণাবলী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন? চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, ব্রহ্মের বা মহাপুরুষবর্গের গুণাবলী যখন সেইরূপ কাহাকেও আকর্ষণ করে, তখনই তাঁহার হৃদয় হইতে যথার্থ প্রশংসার উৎপত্তি হয়। কার্লাইলের Admiration অর্থাৎ মহত্ত্বানুরাগ ছিল; সুতরাং তিনি যে অসাধারণ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি।

তিনটি গুণ কার্লাইলকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। (১ম) Sincerity অর্থাৎ অকপটতা; (২য়) Faith অর্থাৎ বিশ্বাস; (৩য়) Admiration অর্থাৎ মহত্ত্বানুরাগ। এই তিনের সাধন করিয়া টমাস কার্লাইল কি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন; নববিধানের ভাব সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, নববিধান নামে যাহা এক্ষণে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই ভাবসমূহ কার্লাইল লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেক মতের সহিত তাঁহার ঐক্য ছিল। তিনি খ্রীষ্টান দেশে ও খ্রীষ্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি বোধ করি, তিনি অধুনাতন খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় মহাপুরুষ ঈশাকে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মত্যাগীদিগের ন্যায় তিনি ঈশাবিরোধী ছিলেন না। ঈশার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ঈশার নাম তিনি প্রগাঢ় সম্ভ্রমের ও ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিতেন। ঈশা যে Common Prayer অর্থাৎ আদর্শ প্রার্থনা শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেটী তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক মাত্র বিশ্বনিয়ন্তা অনন্ত পরমেশ্বরের চরণে মহাত্মা কার্লাইল স্বীয় দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদিগের প্রিয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় তিনি ঈশ্বরকে মাতৃ নামেও আখ্যাত করিয়াছিলেন। পরলোকে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। বিবেকবাণীর অনুসরণ করাই যে প্রকৃত ধর্ম্ম, কার্লাইল তাহা স্বীকার করিতেন। আমাদিগের আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বিবেক অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বিবেকবাণীর বিরুদ্ধাচরণ করা অপেক্ষা যে অধিকতর অধর্ম্ম আর নাই, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কেহ যদি কাহাকেও বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বলে, কার্লাইল বলিয়াছেন,—তাহার উত্তর করা উচিত,—

"No; by God's help, no! you may take my purse; but I cannot have my moral-self annihilated." "ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন; আমি এরূপ কর্ম্ম কখনই করিব না। তুমি আমার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পার; কিন্তু

আমার বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিতে পার না।"

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ন্যায় কার্লাইলের পাপবোধ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে পাপবোধ-অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তদীয় প্রবল পাপবোধের বিষয় অবগত আছেন। কার্লাইল বলিয়াছেন,—

"Faults? The greatest of faults, I should say, is to be conscious of none." "পাপের কথা কি বলিব? জীবনে কোন পাপ নাই,—বোধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পাপ।"

ব্রাহ্মসমাজে আমরা প্রকৃত অনুতাপকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া স্বীকার করি। কার্লাইলও বলিয়াছেন,—

"Of all acts, is not, for a man, repentance the most divine?"—"If sin is so fatal, yet in repentance too is man purified. "মনুষ্যের সকল কার্য্যের মধ্যে অনুতাপই কি সর্ব্বাপেক্ষা স্বর্গীয় ব্যাপার নহে?"—পাপ ভয়ানক অনিষ্টজনক ও মৃত্যুসূচক বটে, কিন্তু অনুতাপ দ্বারা মানুষ নিশ্চয়ই পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।"

প্রার্থনা দ্বারা যে মানুষের পাপ যায়, এবং প্রার্থনা দ্বারাই যে মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে কার্লাইলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। প্রার্থনা দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারি, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। ওলিভার ক্রমওয়েল প্রার্থনাশীল পুরুষ ছিলেন বলিয়াই, মহাত্মা কার্লাইল ক্রমওয়েলের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কার্লাইল বলিয়াছিলেন,—

"Can a man's soul, to this hour, get guidance by any other method than intrinsically by that same devout prostration of the earnest struggling soul before the Highest, the Giver of all Light; be such prayer a spoken, articulate, or be it a voiceless inarticulate one? There is no other method." "যিনি আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দেন, আমাদিগের জীবন পথে জ্যোতিঃস্বরূপ সেই সর্ব্বভুবনপতি পরমেশ্বরের সম্মুখে ব্যাকুলভাবে পতিত হওয়া ব্যতিরেকে মানবাত্মা আর কোন্ উপায়ে আপনার কর্ত্তব্য ও গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিতে পারে? প্রার্থনাই একমাত্র উপায়; সেই প্রার্থনা ব্যক্ত হউক, অথবা শব্দবিহীন নীরবই হউক, প্রার্থনাই একমাত্র উপায়; আর কোন উপায় নাই।"

প্রার্থনার আবশ্যকতায় মহাত্মা কার্লাইলের কিরূপ গভীর বিশ্বাস ছিল, তাহা এই উক্তি হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কার্লাইলের রচনাবলী অনুসন্ধান করিলে এইরূপ আমাদের আরও অনেক মতের ও ভাবের সহিত তাঁহার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন অস্বাভাবিক অলৌকিক ক্রিয়া মানি না; কিন্তু স্বাভাবিকতার মধ্যেই অলৌকিকতা অনুভব করিয়া থাকি। কার্লাইলও বলিয়াছেন,—

"We are the miracle of miracles."—This world wholly is miraculous." "যাবতীয় অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে আমরাই অধিকতর অলৌকিক। এই বিশ্বই সম্পূর্ণ অলৌকিক।"

কার্লাইল অধুনাতন খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় অস্বাভাবিক অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করিতেন না; অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস আমাদিগের ন্যায় ছিল। এই সকল মতের ঐক্য নিবন্ধনই কি কার্লাইলের সহিত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সম্বন্ধ ঘোষণা করিতেছি? না,—না,—তাহা নহে। তাঁহার সহিত আমাদিগের এতদাপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

একজন বিশ্বাসী সরলভাবে ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে সত্য অন্বেষণ করিলে যে সিদ্ধকাম হইতে পারেন, কার্লাইল তাহার সাক্ষী। কার্লাইল নব-বিধানের অনেক সত্য লাভ করিয়াছিলেন। নববিধান ত আর হঠাৎ

হয় নাই। এ সংসারে হঠাৎ কিছুই হয় না। হঠাৎ সূর্য্য উঠে না, হঠাৎ রজনীর সমাগম হয় না, হঠাৎ ঝড় হয় না, হঠাৎ মেঘ হইতে বারি বর্ষে না। সকলই নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। এই নববিধান ঘোষিত হইবার পূর্ব্ব হইতে বিধাতা জনসমাজে এখানে সেখানে ইহার ভাব অল্পাধিক প্রচার করিতেছিলেন। এক দেশে এক মহাপুরুষের ভিতরে, অন্য দেশে অন্য মহাপুরুষের ভিতরে ইঁহারই ভাব অল্পাধিক প্রকাশমান হইতেছিল। কার্লাইলের জীবনেও নববিধানের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশার ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মহর্ষি যোহন অনুতাপ করিবার উপদেশ দিয়া জনসমাজকে ঈশার ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত করিয়াছিলেন, কার্লাইল তেমনই অসারতা, আড়ম্বর প্রভৃতির প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া,—কপট, অবিশ্বাসী, লোকাচার-দাস লোকদিগকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিয়া নববিধানেরই পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। ঈশা যে সকল উচ্চতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, যোহন সে সকল তত্ত্ব প্রচার না করিলেও ঈশার ধর্ম্মের সহিত যখন যোহনের অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, তখন যে কার্লাইলের মতের সহিত নববিধানের প্রধান মত সমূহের স্পষ্ট ঐক্য রহিয়াছে, সেই কার্লাইলের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মের যোগ নাই, একথা কে বলিতে পারে? কেশবচন্দ্র সেন যেমন সকল ধর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্মহস্ত নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কার্লাইলও তদ্রূপ মানব-সমাজের সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Admiration for whatever is great and noble অর্থাৎ যাবতীয় সুন্দর ও মহৎ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, যে কার্লাইলের জীবনের প্রধান গুণ, তিনি যে মানবজাতির শৈশবকালিক পৌত্তলিকতার মধ্যেও সত্যানুভব করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কার্লাইল বলিয়াছেন; বিধাতা মানবজাতিকে ক্রমে ক্রমে বিবিধ ধর্ম্মভাব প্রদান করিতেছেন। স্কাণ্ডিনেভিয়ান প্রাচীন লোকদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা আকাশ ও নক্ষত্র প্রভৃতির পূজা করিতেন; ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Cannot we understand how these men worshipped canopus, became what we call Sabians, worshipping the stars? Such is to me the secret of all forms of paganism. To these primival men, all things were an emblem of the God-like,—of some God." "And look, what perennial fibre of truth was in that. To us also through every star, through every blade of grass is not a God made visible, if we will open our minds and eyes." "সেই প্রাচীন লোকেরা কিরূপে নক্ষত্রাদির পূজা করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলেই যাবতীয় আদিম পৌত্তলিকতার মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায়। যে সকল বস্তুর মধ্যে সেই আদিম লোকেরা ঈশ্বরের কোন ভাবের প্রকাশ দেখিতেন, সেই সকল বস্তুকেই তাহারা পূজা করিতেন। প্রত্যেক নক্ষত্রে, প্রত্যেক তৃণকণার মধ্যে আমরাও অন্তরের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক নেত্রপাত করিলে ব্রহ্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি।"

মহাত্মা কার্লাইলের ন্যায় আমরাও বলি, সেই আদিম লোকদিগের নিকটে তাদৃশ পৌত্তলিকতা অনিবার্য্য। আরিষ্টটল বলিয়াছিলেন, 'যদি কোন লোককে জন্মকাল হইতে অন্ধকারে প্রতিপালন করা যায়, আর বহুকাল ঐরূপে প্রতিপালন করিয়া অকস্মাৎ একদিন সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি দেখান যায়, তাহা হইলে এই সকল বস্তু তাহার নিকটে কি অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়! আমরা প্রতিদিন

এই সকল দেখি বলিয়া কোন বিশেষ ভাব আমাদিগের মনকে আন্দোলিত করে না; কিন্তু সে ব্যক্তির হৃদয় নিশ্চয়ই নানা অদ্ভুত ভাবে আলোড়িত হইয়া পড়ে।' আমাদিগের দেশের প্রাচীন আর্য্যগণও যে, কিজন্য বৃক্ষের, জলের, ঝটিকার ও হুতাশনের পূজা করিয়াছিলেন, কার্লাইলের ন্যায় আমরাও এক্ষণে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিতেছি। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকটে যে সকল ব্যাপার একরূপ, অজ্ঞানীদিগের নিকটে সেই সকল অন্যরূপ। ঈশ্বরের ভাব ও শক্তি সম্বন্ধে অস্ফুট জ্ঞান প্রাচীন পুরুষদিগের হৃদয়ে ছিল বলিয়াই তাঁহারা জড়োপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই পূজাও তাঁহাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক। কার্লাইল এ পৌত্তলিকতার নিন্দা করিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "Condemnable Idolatry is insincere Idolatry" "কপট পৌত্তলিকতাই ঘৃণার্হ পৌত্তলিকতা।" আমরাও বলি, Condemnable Idolatry is insincere Idolatry.—"কপট পৌত্তলিকতাই ঘৃণার্হ পৌত্তলিকতা।" যে জানে, ঐ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিই সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা, তাহার পৌত্তলিকতায় দোষ কি? কিন্তু যাহারা জানে সব,—বুঝে সব,—অথচ কেবল লোকাচার রক্ষার জন্য, লোকের ভয়ে,—দেশীয় প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের পৌত্তলিকতা নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ। যাহারা পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় না, সেই কপট লোকদিগের পৌত্তলিকতা নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশাবলী পাঠ করিলে দেখিতে পাই, তিনি পৌরাণিক বিষয় সমূহের মধ্য হইতে এইরূপ সত্য নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কার্লাইল নর্সদিগের পুরাণ শাস্ত্রে ভীম পুরুষের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কত তৃপ্ত হইয়াছিলেন! নর্সদিগের পুরাণে কথিত আছে, এক ভীম পুরুষের দেহাবশেষ হইতে এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার রক্ত হইতে সাগর সকলের উৎপত্তি, অস্থি হইতে ভূধর সকলের উৎপত্তি; মেঘমালা তাহারই মস্তিষ্ক, অপরাপর যাহা কিছু তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই কবিত্বের মধ্যেও কার্লাইল অপূর্ব্ব সত্যানুভব করিয়াছিলেন। যদি তিনি গীতা শাস্ত্রে বিরাট পুরুষের বিষয় পাঠ করিতেন, সেখানেও অপূর্ব্ব সত্যানুভব করিয়া সুখী হইতেন। গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে,—বিশ্বনিয়ন্তা অনন্ত পরমেশ্বর কিরূপ?—

> "বসূনাং পাবকশ্চাস্মি, * * সরসামস্মি সাগরঃ
> স্থাবরানাং হিমালয়ঃ * * অশ্বত্থ সর্ব্ববৃক্ষাণাং
> ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং * * সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ
> মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।"

"অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নিস্বরূপ, জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর স্বরূপ; স্থাবর বস্তুপুঞ্জের মধ্যে হিমালয়স্বরূপ; বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ স্বরূপ, হস্তিসমূহের মধ্যে ঐরাবত স্বরূপ, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি স্বরূপ, মৃগগণের মধ্যে সিংহ স্বরূপ, পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড় স্বরূপ।" মহাত্মা কার্লাইল যদি এই বর্ণনা পাঠ করিতেন, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে পরম সত্যের সমাবেশ অনুভব করিয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেন। তিনি যে কেবল পৌত্তলিকতার মধ্যেই সত্যানুভব করিতেন, এমত নহে; সকল প্রকার ধর্ম্মের ভিত্তিই যে স্বর্গীয়, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Some speculators have a short way of accounting for the Pagan religion:

mere quackery, priestcraft and dupery, say they; no sane man ever did believe it. It will be often our duty to protest against this sort of hypothesis about men's doings and history; and I here, on the very threshold, protest against it in reference to Paganism, and to all other *isms* by which man has ever for a length of time striven to walk in this world."

ইহার ভাবার্থ এই, কতকগুলি লোকে মনে করেন, যাবতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম কেবল ভণ্ডতা ও অন্যায় পৌরহিত্য প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কোন জ্ঞানবান লোক ঐ সকল বিশ্বাস করেন নাই। এই কথার বিরুদ্ধে সতত প্রতিবাদ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, কি পৌত্তলিক ধর্ম্ম,—কি অন্যান্য ধর্ম্ম,—যাহা অবলম্বন করিয়া মনুষ্য বহুকাল সংসার পথে যথার্থভাবে বিচরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কিছুতেই ঈদৃশ ভাব পোষণ করা বৈধ নহে।

মহাত্মা কার্লাইল বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন, খাঁটি লোক ছিলেন, সেই জন্যই খাঁটি লোকেরা কিরূপে পরিচালিত হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে কিজন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে যে বহুপ্রকার সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কার্লাইল বুঝিয়াছিলেন। সকল শাস্ত্রের মধ্যে সত্য আছে একথা যেমন তাঁহার অনুভূত হইয়াছিল, সর্ব্বদেশীয় সকল মহাপুরুষের ভিতরে মহত্ত্ব আছে, ইহাও তিনি তদ্রূপ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের সহিত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের যেমন অসাধারণ যোগ ছিল, কার্লাইলের যোগও তদ্রূপ। মহাজনদিগকে ভক্তি করিতে টমাস কার্লাইল যেমন জানিতেন, এমন আর কে জানে? তিনি বলিয়াছেন,—"No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief great men." "মহাপুরুষে অবিশ্বাস মানুষের ক্ষুদ্রতার যেরূপ প্রমাণ তদপেক্ষা দুঃখজনক প্রমাণ আর কিছুই নাই।"

মহাপুরুষদিগের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই তাঁহাদিগের সদ্গুণে ও মহত্ত্বে যাহারা আকৃষ্ট হয় না তাহারা কি আবার মনুষ্য পদবাচ্য? কার্লাইল বলিয়াছেন,—

"We all love great men; love, venerate, bow down submissive before great men; nay can we honestly bow to anything else?" "আমরা সকলেই মহাজনদিগকে ভাল বাসি; ভালবাসি ও ভক্তি করি; তাঁহাদিগের সম্মুখে বিনীত ভাবে প্রণাম করি; আর কিছুর সম্মুখে কি যথার্থভাবে প্রণাম করিতে পারি?"

কার্লাইলের এই উক্তি হইতে মহাপুরুষদিগের প্রতি তাঁহার কীদৃশ প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। যাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বানুরাগ, ঈদৃশ প্রগাঢ় ভক্তি, তিনি যে সকল মহাপুরুষ-প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্বের ও ধর্ম্মভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। আপনারা সকলেই জানেন, খ্রীষ্টানেরা সাধারণতঃ অন্যান্য ধর্ম্মের মহত্ত্ব দেখিতে পান না; বিশেষতঃ মহাপুরুষ মহম্মদের প্রতি তাঁহাদিগের কি প্রকার ভাব, তাহা আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অনেক খ্রীষ্টান পণ্ডিত মহম্মদকে সম্পূর্ণ ভণ্ড, কপট, বিলাসী, নৃশংস ও ধর্ম্মহীন বলিয়া বর্ণনা করেন। কার্লাইল বলিয়াছেন, যাহারা মহাত্মা মহম্মদকে Imposter অর্থাৎ ধর্ম্মহীন ভণ্ড বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন। ঐরূপ অন্যায় ধারণাসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"They are the product of an age of scepticism; they indicate the saddest spiritual paralysis and mere death-life of the souls of men: more Godless theory I think was never promulgated in this earth. A false man found a religion? I will venture to assert that it is incredible that a great man should have been

other than true." ইহার ভাবার্থ এই, মহাপুরুষদিগের অন্যায় ধারণা কেবল ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। উহা আধ্যাত্মিক রোগের লক্ষণ। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহাদের যথার্থ বিশ্বাস, তাঁহারা ঈদৃশ ধারণাকে অন্তঃকরণে কখনই স্থান দিতে পারেন না। একজন অসার ভণ্ডলোক কি কখন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারে? না,—না, ইহা কখনই সম্ভব নহে। মহাপুরুষ সত্যশীল, সরল ও অকৃত্রিম নহেন,—ইহা কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যায় না।

মহাত্মা কার্লাইল যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যাহার ভিতরে ধর্ম্ম নাই, সে কি কখন ধর্ম্মস্থাপন করিতে পারে? Insincere, imposter,—কপট ধর্ম্মহীন অসার ভণ্ড লোক কর্ত্তৃক কখনও কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে? সত্য সুন্দর বিধাতা যদি মহম্মদের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য না করেন, তাহা হইলে মহম্মদের সাধ্য কি, তিনি ধর্ম্ম রচনা করেন? হাজার হাজার লোকে মহম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল; "উঠ"-বলিলে উঠিত; "বস"—বলিলে বসিত; এখনও হাজার হাজার লোকে তাঁহার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ করিতেছে; এখনও তাঁহার উপদেশক্রমে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে; ঈদৃশ মহাপুরুষ মহম্মদকে ভণ্ড বলা বাতুলতার পরিচয় প্রদান আর কি হইতে পারে? কার্লাইল, মহম্মদের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহম্মদকে ভণ্ড বলিও না; যে মহম্মদ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না; ঈশ্বরের গৌরব ভিন্ন আর কাহারও গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহাকে ভণ্ড বলিও না। যে মহম্মদ দুঃখীদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে, প্রতি ব্যক্তির উপার্জ্জিত অর্থের দশমাংশ দরিদ্রদিগের প্রাপ্যসম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়ালু মহম্মদকে ভণ্ড বলিও না। যিনি বিলাসকে সর্ব্বোতোভাবে ঘৃণা করিতেন, সামান্য রুটি ও জল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, ও যিনি প্রতিবর্ষে রমজান মাসে নিভৃত শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইতেন, সেই সাধক তপস্বী মহম্মদকে ভণ্ড বলিও না। যে মহম্মদ, পাছে কেহ তাঁহার সমাধি-স্তম্ভকে ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান দান করে, এই আশঙ্কায় তাদৃশ সম্মান প্রদান করা অন্যায় বলিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহম্মদকে ভণ্ড বলিও না। যাঁহার ধর্ম্ম, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাঁহার ধর্ম্ম নিশ্চয়ই মহৎ। মহম্মদ বলিয়াছেন, ইসলাম ধর্ম্মের সার অর্থ ঈশ্বরে "সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ; ঈশ্বর হইতে ভাল হউক মন্দ হউক, যাহা আসিবে, আনন্দে তাহা গ্রহণ করাই ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীর কর্ত্তব্য।" ইহা যদি ইসলাম ধর্ম্ম হয়, কার্লাইল বলিয়াছেন, "আমিও ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাস করি।" যে কার্লাইল বাইবেল গ্রন্থে ধর্ম্মাত্মা জবের কাহিনী এত ভালবাসিতেন, যে একদা পরিজনবর্গকে লইয়া দৈনিক উপাসনা করিতে বসিয়া কেবল জবের আখ্যানটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি যে মহম্মদ-কথিত ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব পাঠ করিয়া বলিবেন, "আমিও ইসলাম ধর্ম্ম মানি,"—ইহা কোন ক্রমেই বিচিত্র নহে। কার্লাইল এইরূপ কেবল মুসলমান ধর্ম্মের ও মহম্মদের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হন নাই; ভূতকালে বিধাতা যত সত্য, যত

বিধান প্রচার করিয়াছেন, কার্লাইল তৎ সমুদয়েই বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা যেমন বিধাতার প্রাচীন বহু বিধান মানি, কার্লাইলও তেমনি মানিতেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"For the whole past is the possession of the present; the past had always something true and is a precious possession. In a different time, in a different place, it is always some other side of our common Human Nature that has been developing itself. The actual true is the sum of all these." ইহার ভাবার্থ এই,—"অতীত কালের যাবতীয় ব্যাপার বর্ত্তমানের সম্পত্তি হইয়াছে। অতীত কালের মধ্যে সত্য প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বর্ত্তমানের সম্পত্তি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই মানবচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ হইয়াছে। এই সকল ভাবের সমষ্টিতে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম গঠিত হইয়া থাকে।"

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের কথা এতদাপেক্ষা সুন্দররূপে আর পরিব্যক্ত হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, কার্লাইল কেবল একথা মানিতেন না; সকল ধর্ম্মের সমষ্টিতে যে অখণ্ড সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহাও তিনি মানিতেন। ব্রাহ্মসমাজে আমরা সকলেই মানি, সকল ধর্ম্মে সত্য আছে; কিন্তু কেবল সকল ধর্ম্মে সত্য আছে মানিলেই নববিধান মানা হয় না। পুরাকালিক সকল ধর্ম্মের এক একটি বিশেষ ভাব আছে। সেই বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচারের জন্যই বিধাতা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে জন্য ঈশার আগমন ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উৎপত্তি, সে জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার নহে। যে জন্য শাক্যসিংহের জন্ম, সেজন্য মহম্মদের জন্ম নহে। যখন যীহুদীজাতি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চালিত না হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব না করিয়া কেবল অসার ক্রিয়াকাণ্ডে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে সময়ে ফিরুশী ও সাদুকিগণ অসার ধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সময়াতিপাত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঈশার জন্ম হইল। কিরূপে প্রভুর ইচ্ছায় মানুষকে চলিতে হয়, কিরূপে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হয়, কিরূপে যথার্থ পুত্র হইতে হয়, কিরূপে ঈশ্বরের সহিত মানবের পিতা পুত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে, দেবর্ষি ঈশা তাহা শিক্ষা দিয়া গেলেন। যেমন রোগ, তেমনই ঔষধ; যেমন ক্ষুধা, তেমনই আহার ব্যবস্থা; যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিধান। এইরূপ ভক্তিহীন দেশে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম বিধান। যখন এদেশে লোকে কামনার দাস হইয়া অসার ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিল, তখনই "কামনা-বিসর্জ্জন"—পরম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য,—তপস্যা ও পুরুষকার প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক লোকে যাহাতে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহারই উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব। যখন আরব দেশীয় লোকেরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছিল না, তখনই অদ্বিতীয় ঈশ্বরে মনুষ্যের বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর উৎপন্ন করিবার জন্য মহম্মদের জন্ম ও ধর্ম্মপ্রচার। এই বিধানতত্ত্ব কার্লাইল সম্যক পরিমাণে না হউক, অনেক পরিমাণে বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছিলেন,—

"To which of these three religions do you specially adhere? To all the three, for they by their union constitute the

true religion." "এই তিন ধর্ম্মের মধ্যে তুমি বিশেষ-রূপে কোনটির অনুরক্ত? "এই প্রশ্নের উত্তর,—আমি এই তিনটিতেই অনুরক্ত; কেননা উহারা পরস্পর মিলিত হইয়াই প্রকৃত ধর্ম্মকে গঠন করে।"

ইহাই নববিধানের ভাব। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, কেবল ইহা মানিলে কোন এক-টিতে বিশেষভাবে অনুরক্ত হওয়া যায়; কিন্তু নববিধান মানিলে সকলগুলির সমষ্টিতে যে বিশেষ নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহা-রই প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। বন্ধুগণ! মহাত্মা কার্লাইলের সহিত বর্ত্ত-মান যুগধর্ম্মের সম্বন্ধ বোধ করি, আপনারা এক্ষণে সম্যক প্রকারে অনুভব করিয়াছেন। আমরা যাহাতে কার্লাইলের ন্যায় সরল, খাঁটি, বিশ্বাসী ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ করি, আমরা যাহাতে কার্লা-ইলের ন্যায় মহত্বানুরাগী হইয়া সকল শাস্ত্রের গৌরব বুঝিতে ও সকল মহাপুরুষকে আন্ত-রিক ভক্তি করিতে পারি, পরমেশ্বর আমা-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহার ন্যায় আমরা বলিয়া থাকি "The actual true is the sum of all religions."—সকল ধর্ম্মের সমষ্টিই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব না হইলে আত্মার ক্ষুধা ভাঙ্গে না, তৃপ্তি হয় না; মানব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা যাহাতে যোগ ও ভক্তি, জ্ঞান ও নীতি, কর্ম্ম ও বৈরাগ্য সাধন করি এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের জীবনকে নববিধানের সাক্ষী ও প্রমাণ স্বরূপ করিতে পারি, বিধাতা আমাদিগকে এরূপ প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করুন। সমাপ্ত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট।

(১) পঞ্চাঙ্গ।

দেশীয় পঞ্জিকা লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, দেশীয় পঞ্জিকার সংশোধন আবশ্যক হই-য়াছে, কেহ বা সংশোধনের আবশ্যকতা দেখিতে পাইতেছেন না। ভ্রম হইলেই সংশোধন আবশ্যক, শেষোক্তগণ পঞ্জিকার ভ্রম দেখিতে পাইতেছেন না। পঞ্জিকার সমুদায় বিষয়গুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। সংশোধনের বিপক্ষগণ বলিতেছেন, যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সে সকল বিষয়ে যখন ভ্রম দেখা যাইতেছে না, তখন অন্যান্য গণিত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে ভ্রম থাকা অসম্ভব। চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দ্বারা পঞ্জিকা ও দৃক্-সিদ্ধির ঐক্যানৈক্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যে পর্য্যন্ত গণনালব্ধ গ্রহণ কাল ও দৃক্‌সিদ্ধ গ্রহণ কাল দ্বয়ের মধ্যে অন্তর দৃষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত পঞ্জিকা-সংশোধনেচ্ছুকগণের কথায় আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

প্রথম পক্ষ বলিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কালের অনৈক্য দেখা যাইতেছে। যতগুলি পঞ্জিকা আজিকালি বঙ্গদেশে প্রচ-লিত আছে, কোন গ্রহণকাল তত্তৎ পঞ্জিকায় দেখিলে, তাহাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। সকলগুলিই এক সময়ে সত্য হইতে পারে না, সুতরাং অন্য প্রমাণ ব্যতীত দেখা

যাইতেছে যে, গ্রহণ গণনা ঠিক হইতেছে না।

বস্তুতঃ যাঁহারা উত্তম ঘড়ির সাহায্যে গ্রহণকাল নিরূপণ করিয়াছেন,তাঁহারা বলেন যে, পঞ্জিকায় প্রদত্তকাল ও দৃক্‌সিদ্ধকালের মধ্যে অনেক স্থলে বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

তিথি গণনা লইয়াই কথাটা উঠে। সপ্তমী অষ্টমী প্রভৃতি তিথি নিরূপণ করিয়া শারদীয় পূজা বিধেয়। অন্যান্য সময়ে যাহাই হউক, সন্ধিপূজার প্রকৃত কাল নিরূপিত না হইলে সমুদায় পূজাই ব্যর্থ। অষ্টমী, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথির, পরিমাণ বা ভোগ সর্ব্বদা আমাদের দৈনিক কার্য্যাদিতে আবশ্যক। একাদশী তিথির সময় নিরূপণ দ্বারা শত শত হিন্দুর উপবাসাদি ব্রত নিয়ত হয়। সুতরাং তিথ্যাদির পরিমাণের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, ক্রিয়াকলাপ পণ্ড হওয়ায় কর্ত্তাকে মহাপাতক গ্রস্ত হইতে হয়।

তিথি কথাটার অর্থ—অনেকে না জানিতে পারেন। তিথি অর্থে চান্দ্র দিন বুঝায়। এক অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম চান্দ্রমাস। এক চান্দ্রমাস ত্রিশ চান্দ্রদিনে বা তিথিতে বিভক্ত।

অতি পূর্ব্বকালে মানবগণ চান্দ্রদিন গণনা করিতেন। তখন সৌর মাস আরম্ভ হয় নাই। চান্দ্রমানই তখন প্রচলিত ছিল। পরে আর্য্যঋষিগণ (১) সৌর বর্ষ, মাস, দিন গণনা প্রচলিত করেন।

এক্ষণে সৌরদিন ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ দিবস বলিতে হইলে বলা যায়, আজ চৈত্র মাসের ১৫ দিবস, কল্য মাঘ মাসের ২২ দিবস ইত্যাদি। চৈত্র মাসের ১৫ দিবস বলিলে এই বুঝায় যে, রবি মীন রাশিতে আজ ১৫ দিবস হইল আসিয়াছেন।

চান্দ্রমাস ও চান্দ্রদিন দ্বারা কাল বিভাগ অতি প্রাচীন রীতি। সে রীতি এক্ষণে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ও যাত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। সৌরবর্ষ, সৌরমাস ও দিবস সাধারণ কার্য্যে লাগে। বস্তুতঃ সৌর ও চান্দ্র উভয় গণনাই (১) রাখিতে হইয়াছে। শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে সময় নির্দ্দেশ জন্য বলিতে হয়, মীন রাশিস্থে ভাস্করে পঞ্চদশ দিবসে শুক্ল দশম্যাং তিথৌ ইত্যাদি। কেবল চান্দ্রমাস ও দিবস বলিলেই চলে না কিম্বা কেবল সৌরমাস ও দিবস বলিলেও চলে না।

সুতরাং পঞ্জিকায় প্রদত্ত তিথি হিন্দুগণের কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝা যায়। আজ চৈত্র মাসের পঞ্চদশ দিবস না বলিয়া চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ দিবস বলিলে যেরূপ ভ্রম হয়, বাস্তবিক দশমী তিথির পরিবর্ত্তে নবমী বা একাদশী বলিলেও সেইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

হিন্দুজ্যোতিষ মতে চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তরের দ্বাদশাংশের দ্বারা তিথি নিরূপিত

(১) অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দুদিগকে এ বিষয়ের প্রবর্ত্তক বলিতে চাহেন না। যুক্তিসঙ্গত ও অসূয়া-বিরহিত বিশেষ প্রমাণ না পাইলে, তাঁহাদের কথায় ততদূর আস্থা প্রদর্শিত হইতে পারে না।

(১) গণিত জ্যোতিষে চান্দ্রদিন গণনা ও মধ্যম সৌর দিবসের সহিত চান্দ্রদিনের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া কল্প বা যুগাদি হইতে ইষ্ট দিবস পর্য্যন্ত কত মধ্যম সৌরদিবস গত হইয়াছে, নির্ণীত হয়। এই দিন সংখ্যার নাম অহর্গণ। অহর্গণ নিরূপণ করিয়া রবি চন্দ্রাদির স্ফুট স্থান গণিত হয়। অর্থাৎ চান্দ্রদিন হইতে সৌরদিন গণিত হয়। চান্দ্রদিন গণনার প্রাধান্য এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে।

হয় (২)। গগনমণ্ডলের যে স্থান দিয়া সূর্য্যাদি গ্রহ সকল পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার নাম নক্ষত্রচক্র (১)। সূর্য্যের পথের নাম ক্রান্তি-বৃত্ত বা রবিমার্গ (২)। নক্ষত্রচক্র ও ক্রান্তিবৃত্ত ১২ রাশিতে, ১ রাশি ৩০ অংশে, ১ অংশ ৬০ কলায়, ১ কলা ৬০ বিকলা ইত্যাদি রূপে বিভক্ত। হিন্দুজ্যোতিষানু-সারে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ সকলের স্থান ক্রান্তিবৃত্তে রাশি অংশ কলা বিকলাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে লক্ষোত্থান (৩) ও ক্রান্তি (৪) দ্বারা গ্রহাদির স্থান সচরাচর ব্যক্ত হয়।

ক্রান্তিবৃত্তকে দ্বাদশ রাশিতে ভাগ করিয়া রাশিদিগের মেষ বৃষাদি নাম দেওয়া হই-য়াছে। ঐ বৃত্তের কোন বিশেষ স্থান হইতে মেষ রাশির আরম্ভ ধরিতে হইবে, নচেৎ রাশির স্থিরতা থাকে না। সেই বিশেষ স্থান হইতে ক্রান্তিবৃত্তে গ্রহাদির যে অন্তর, তাহার নাম গ্রহস্ফুট (৫)। এই বিশেষ স্থানটি কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

গ্রহস্ফুট ধরিয়া কিরূপে তিথি গণিত হয়, এক্ষণে তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে। দেখা গেল, ২৭ জ্যৈষ্ঠ দিবসে (৬) রবিস্ফুট-রাশ্যাদি ১।২৫।২৬।১৪ এবং চন্দ্রস্ফুট-রাশ্যাদি ৬।২৬।১৫।২০ দেওয়া আছে। ইহাদের অর্থ এই যে, উপরি উক্ত বিশেষ বিন্দু হইতে তদ্দিবসে রবির অন্তর ১ রাশি ২৫ অংশ ২৬ কলা ১৪ বিকলা অথবা ৫৫ ডিগ্রি ২৬ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড। তদ্রূপ, চন্দ্রের দূরত্ব ৬ রাশি ২৬ অংশ ১৫ কলা ২০ বিকলা অথবা ২০৬ ডিগ্রি ১৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। উভয়ের মধ্যে অন্তর ১৫০ ডিগ্রি ৪৯ মিনিট ৬ সেকেণ্ড। উক্ত স্ফুটদ্বয় দিবসের কোন সময়ের, তাহা জানা আব-শ্যক। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায়, বোধ হয়, সূর্য্যোদয়কালের গ্রহস্ফুট দেওয়া হয় (১)। যাহা হউক, চন্দ্র সূর্য্যের অন্তরাংশাদি ১৫০।৪৯।৬ পাওয়া গেল। ইহার দ্বাদশাংশ, ১২·৫৬৭ এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, উক্ত ২৭ জ্যৈষ্ঠ দিবসে সূর্য্যোদয়কালে দ্বাদশী তিথি গত হইয়া ত্রয়োদশীরও প্রায় অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে।

উক্ত ত্রয়োদশীর পরিমাণ কত, জানা আবশ্যক। চন্দ্র ও সূর্য্যের তদ্দিবসের স্ফুট-গতি ধরিয়া তাহা গণনা করিতে হয়। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা দেখান হইল না। কক্ষাবৃত্তের স্থান বিশেষে গ্রহ সকলের দৈনিক গতির তারতম্য ঘটে। এজন্য সকল তিথির পরিমাণ সমান নহে। সকল তিথির পরিমাণ ৬০ দণ্ড করিয়া ধরিলে ৩০ সাবন (২) দিনে চান্দ্রমাস হয়। বস্তুতঃ চান্দ্রমাস মাস ২৯ দিন ৩১ দণ্ড ৫০ পল। (সিঃ শিঃ)

---

(২) অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ৩০ দিনে ৩৬০ অংশ হয়। অর্থাৎ এক দিনে ১২ অংশ অন্তর ঘটে। এজন্য তিথি নিরূপণের হারকাঙ্ক ১২।

(১) Zodiac.
(২) Ecliptic.
(৩) Right ascension.
(৪) Declination.
(৫) Celestial longitude.
(৬) সন ১২৯৯ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা দেখ।

(১) যে সকল পঞ্জিকায় গ্রহাদির দৈনিক বা পাক্ষিক স্ফুটাদি দেওয়া হইতেছে, তাহা দিবসের কোন সময়ের, তাহার উল্লেখ না থাকা দুঃখের বিষয়।

(২) সাবন দিবস অর্থে mean solar day বুঝিতে হইবে। হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে অনেক স্থলে ইহা মধ্যম সাবন দিবসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। সাবন দিবসের প্রকৃত অর্থ civil day হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত কুদিন শব্দ ঠিক ইংরাজী mean solar day.

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, রবিচন্দ্রের স্ফুটই তিথি গণনার মূল। উহাদের স্ফুট গণনায় কিছু-মাত্র ভ্রম হইলে, তিথি গণনায় ভ্রম হইবে।

পঞ্জিকায়, বার তিথি নক্ষত্র যোগ ও করণ এই পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হয়। এজন্য পঞ্জিকার প্রকৃত নাম পঞ্চাঙ্গ। 'যেমন, তিথি গণনা করিতে চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট গণনার প্রয়োজন, সেইরূপ নক্ষত্র' যোগ ও করণ গণনা করিতেও চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট আবশ্যক। পঞ্চাঙ্গের কেবল বার নিরূপণ করিতে চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুটের প্রয়োজন হয় না। রবি সোম মঙ্গলাদি সপ্তবার একটির পর একটি চলিয়া আসিতেছে। কোন এক দিন কি বার গিয়াছে এবং তাহার পরে কতবার সূর্য্য উদয় হইয়াছে, জানিতে পারিলে বার নিরূপিত হয়।

পঞ্জিকায় কি অর্থে 'নক্ষত্র' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। রাশিচক্রকে ২৭ সমানাংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি অংশের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকাদি, নক্ষত্র (১) নাম রাখা হইয়াছে। সুতরাং এক নক্ষত্র ভোগ, ১৩ অংশ ২০ কলা। বস্তুতঃ, ক্রান্তিবৃত্তকে যেমন রাশি অংশ প্রভৃতিতে বিভাগ করা যায়, তেমনই নক্ষত্র অংশ কলাদিতে তাহা বিভক্ত কল্পনা করা যায়। এজন্য সূর্য্যাদি গ্রহের স্থান নক্ষত্র দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রের আদি হইতে মেষ রাশির আরম্ভ এবং রেবতী নক্ষত্রের শেষে মীনরাশির অন্ত। বস্তুতঃ কোন গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি জানা থাকিলে নক্ষত্র নিরূপণ সহজ। স্ফুট রাশ্যাদি কলাতে পরিণত করিয়া কলা-সমষ্টি নক্ষত্রভোগ (৮০০ কলা) দ্বারা হরণ করিলেই হইল। ভাগলব্ধ দ্বারা গত নক্ষত্র এবং ভাগাবশেষ দ্বারা বর্ত্তমান নক্ষত্রের গতাংশ পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্জিকায় যে বার তিথি নক্ষত্রাদি দেওয়া থাকে, সে নক্ষত্র দ্বারা কেবল চন্দ্রের স্থান বুঝায়। তিথির ন্যায় গত ও গম্য নক্ষত্র উভয়ই নিরূপণ করিতে হয়। চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদি দ্বারা চন্দ্রের যেমন স্ফুট বা স্পষ্ট স্থান জানা যায়, তেমনই নক্ষত্রদ্বারাও চন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিষ্কুম্ভাদি ২৭টি যোগ। চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট সমষ্টি ১৩ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে যে সময় লাগে, তাহার নাম যোগ। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট রাশ্যাদি যোগ করিয়া ১৩ অংশ ২০ কলা দ্বারা হরণ করিলে গত যোগ পাওয়া যায়। তিথি নক্ষত্রের ন্যায় গম্য যোগ ও নিরূপণ করিতে হয়। বৈধৃতি, ও ব্যতীপাত যোগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

করণ অর্থে তিথির অর্দ্ধাংশ। সুতরাং এক চান্দ্রমাসে ৬০টি করণ। ইহাদের মধ্যে শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিংস্তুঘ্ন নামক চারিটি করণ স্থির, অর্থাৎ ইহারা কোন্ কোন্ তিথার্দ্ধে প্রযুক্ত হইবে, তাহা বিধিবদ্ধ করা আছে। আশিষ্ট বব বালবাদি ৭টি করণ ক্রমান্বয়ে এক চান্দ্রমাসে ৮ বার করিয়া ব্যবহৃত হয়। এজন্য ইহাদের নাম চর করণ। তিথি কিম্বা চন্দ্রস্ফুট জানিলে করণ গণনা সহজ।

উল্লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি হইতে সহজেই

---

(১) নক্ষত্র শব্দে তারা, তারাপুঞ্জ ও রাশিচক্রের ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত বৃত্তাংশ বুঝায়। অশ্বিনী নক্ষত্র বলিলে মেষরাশির প্রথম ১৩ অংশ ২০ কলা বুঝিতে হয়। সেইরূপ অন্যান্য নক্ষত্র।

বুঝা যাইবে যে, তিথি দ্বারা রবিচন্দ্রের অন্তর, নক্ষত্রের দ্বারা চন্দ্রের স্থান এবং যোগ দ্বারা মেষরাশি হইতে উভয়ের দূরত্বের সমষ্টি পাওয়া যায়। সুতরাং তিথি নক্ষত্র ও যোগ এই তিনটির কোন দুইটি দেওয়া হইলে রবিচন্দ্রের স্ফুট দেওয়া হইল। গণিত জ্যোতিষে করণের কোন আবশ্যকতা আছে কি না, জানি না।

যাহা হউক চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট জানা থাকিলেই পঞ্চাঙ্গের ৪টি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ না করিয়াও স্থূল নিয়মানুসারে তিথি নক্ষত্রাদি নিরূপিত হইতে পারে। সূক্ষ্ম গণনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদিতে রবীন্দুর স্ফুট ধরিয়া তিথ্যাদি গণনা করিবার বিধি আছে (১)।

গ্রহাদির প্রতিদিনের স্ফুটগণনা অল্প পরিশ্রম সাধ্য নহে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা এ বিষয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক। সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি প্রামাণিক গ্রন্থানুসারে গ্রহগণের স্ফুট গণনা করিতে হইলে বিস্তর সময় ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়। অনেকগুলি অঙ্ক হরণ গুণন করিলে ফল পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি অনুসারে দৈনিক স্ফুট আনীত হয় কি না, দেখা হয় নাই। স্ফুট গণনা প্রণালী বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে পঞ্জিকার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে সূর্য্য বৎসরে দুইবার বিষুবদ্বৃত্তকে (১) অতিক্রম করেন। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় খগোলের নিরক্ষবৃত্তের নাম বিষুবদ্বৃত্ত। ইহার আর এক নাম নাড়ীবৃত্ত। যে দুই বিন্দু দিয়া সূর্য্য নাড়ীবৃত্ত অতিক্রম করেন, অর্থাৎ যে দুই বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্ত ও নাড়ীবৃত্তের সম্পাত ঘটে, তাহাদের নাম ক্রান্তিপাত (২)। সূর্য্য যে দুই দিন ক্রান্তিপাতে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই দুই দিবসে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। এক্ষণে আশ্বিন ও চৈত্র মাসে ক্রান্তিপাত ঘটিতেছে।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষমতে বিগত ২০ মার্চ বা ৮ চৈত্র কলিকাতায় অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টা ৪ মিনিট সময়ে সূর্য্য ক্রান্তিপাত বিন্দুতে আসিয়াছিলেন। নিকটে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ব্যতীত অন্য কোন পঞ্জিকা ছিল না (৩)। উক্ত পঞ্জিকায় দেখিলাম, ৮ চৈত্র দিবসে দিবামান ২৯ দণ্ড ৫৩ পল ৭ বিপল এবং ১০ চৈত্রের দিবামান ৩০ দণ্ড। অর্থাৎ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতে বিষুবদ্দিন (৪) ৮ই চৈত্র না হইয়া ১০ই চৈত্র। দুই দিবসের প্রভেদ বড় অল্প নহে।

(১) গত বৎসরের ২৭ জ্যৈষ্ঠ দিবসের রবি চন্দ্রের স্ফুট ধরিয়া তিথি গণনা করিয়া দেখিলাম যে উক্ত দিবসে ত্রয়োদশী ২৭।৫।৫০ দণ্ডাদি ছিল। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ত্রয়োদশী ২৬।৫২।৫৭ দেওয়া আছে। দিন কৌমুদী মতে তিথ্যাদি গণিত হইয়াছে, লিখিত আছে। বোধ হয় এজন্যই উক্ত প্রভেদ ঘটিয়াছে। যোগ ও নক্ষত্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইল। যখন দৈনিক স্ফুটগ্রহ দেওয়া হইতেছে, তখন তাহা হইতে তিথি নক্ষত্রাদি গণনা করিলে ভাল হয়।

(১) Equinoctial.

(২) Equinoctial points.

(৩) গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গ্রহাদির দৈনিক স্ফুট দিতেছে। উক্ত পঞ্জিকা বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। এই দুই কারণ বশতঃ এ প্রবন্ধের সমুদায় গণনা উক্ত পঞ্জিকা হইতে গৃহীত হইল। পঞ্জিকা বিশেষের দোষ গুণ কীর্ত্তন করা আমার অভিপ্রায় না হইলেও গণনার সত্যাসত্য উল্লেখ করিতে হইল।

(৪) Equinox.

ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয় অচল নহে। অল্প অল্প করিয়া উহারা রবির গতির বিপরীত দিকে গমন করে (১)। চৈত্রমাসের ক্রান্তিপাতের নাম মহাবিষুবপাত বা মহাবিষুব সংক্রান্তি। বহু পূর্ব্বকালে মহাবিষুব সংক্রান্তি মেষরাশির আদিতে অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের শেষে এবং অশ্বিণীর আদিতে ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে বোধহয় নক্ষত্রচক্র দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত হইয়াছিল। হিন্দুজ্যোতিষ মতে ক্রান্তিপাত স্বয় বৎসরে ৫৪ বিকলা (২) করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সেই পূর্ব্বকালের ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে অল্প অল্প সরিয়া উহা এক্ষণে ২০।২২ অংশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্তরের নাম অয়নাংশ।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতে গত বৎসর (১২৯৯ সাল) ১ বৈশাখ দিবসে অয়নাংশাদি ২০।৫৩।৪২ ছিল। উক্ত পঞ্জিকার মতে ১০ চৈত্র মহাবিষুব অয়ন সংক্রান্তি, ঐ দিবসের রবিস্ফুট রাশ্যাদি ১১।৯।২৭।৬। উহা দ্বাদশ রাশি হইতে বাদ দিলে ২০।৩২।৫৪ অংশাদি পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ২০।৫৩।৪২ অয়নাংশাদি শক ১৮১৪ অব্দের ১ বৈশাখ দিবসের। ১০ চৈত্র পর্য্যন্ত অয়নাংশভুক্তি প্রায় ৫০ বিকলা এই অয়নাংশাদিতে যোগ করিলে মোট ২০।৫৪।৩২ অংশাদি পাওয়া যায়। সুতরাং ১০ চৈত্রের রবিস্ফুটাগত অয়নাংশ (২০।৩২।৫৪) ও পঞ্জিকায় প্রদত্ত অয়নাংশ (২০।৫৪।৩২) এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে (৩)।

ইংরাজী মতে ৮ চৈত্র দিবসে বেলা ৩ টার সময় রবি ক্রান্তিপাতে আসিয়া উপস্থিত হন। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় প্রদত্ত রবিস্ফুট হইতে তাৎকালিক রবিস্ফুট ১১।৭।৫০।২৩ রাশ্যাংশাদি পাওয়া যায়। উহা ১২ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে অয়নাংশ ২২।৯।৩৭ হয়। অতএব যদ্যপি রবিস্ফুটে ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে ইহাই ৮ চৈত্র দিবসের অয়নাংশ বলিতে হইবে।

বাস্তবিক হিন্দুজ্যোতিষে ও বাঙ্গালা পঞ্জিকায় এই অয়নাংশ লইয়া বড় গোলযোগ। ইহার বিষয় পর প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইবে।

অয়নাংশ ঘটিত একটি বিষয়মাত্র এখানে বলা যাইতেছে। দ্বাদশ রাশির লগ্নমান নিরূপণ হিন্দুগণের জাতকগণনায় ও বিবাহাদি কার্য্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লগ্নটা কি অগ্রে বলা যাউক। দিবা রাত্রির মধ্যে দ্বাদশ রাশি বিভক্ত রাশিচক্র একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক রাশিই পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইতেছে। ইষ্টকালে ক্রান্তিবৃত্তের যে প্রদেশটি পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, তাহার নাম লগ্ন। রাশিচক্র যদ্যপি নাড়ীবৃত্তে হইত কিম্বা উহা তির্য্যকভাবে না থাকিয়া যদ্যপি নাড়ীবৃত্তের সমান্তরালে থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক রাশির আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত উদয় হইতে একই সময় লাগিত। কোন রাশির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ক্ষিতিজ-

(১) Precession of the equinoxes.

(২) পাশ্চাত্য মতে বৎসরে প্রায় ৫২ বিকলা।

(৩) ১০ চৈত্র দিবসের কোন্ সময়ে সূর্য্য ক্রান্তিপাতে আসিয়াছিলেন, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ পাইলাম না। ঐ সময়ানুসারে রবিস্ফুটের ও অয়নাংশের কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটিবে। যাহা হউক ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসে অয়নাংশাদি ২০।৫৪।৩১।৩০ কিরূপে হইল (পৃঃ ৪১১)? তাহা হইলে বিষুবদিনাগত অয়নাংশ আরও কিঞ্চিৎ বেশী হইবে।

বৃত্তের (১) উপরে উঠিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের নাম সেই রাশির লগ্নমান (২)। পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ক্ষিতিজবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লগ্নমানও বিভিন্ন।

লগ্নমান নিরূপণ করিতে হইলে গোল-ত্রিকোণমিতির (৩) সাহায্য লইতে হয়। ইহার তত্ত্ব হিন্দু বা ইংরাজী জ্যোতিষে বিভিন্ন নহে। যে স্থানের লগ্নমান নিরূপণ করিতে হইবে সেই স্থানের অক্ষাংশ (৪) ও নাড়ীবৃত্তের প্রতি ক্রান্তিবৃত্তের যতখানি অবনতি (৫), এই দুইটি বিষয় পাইলেই তথাকার লগ্নমান স্থির করিতে পারা যায়। নাড়ীবৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যবর্ত্তী কোণের পরিমাণও যাহা, সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নান্তকালে নাড়ীবৃত্ত হইতে সূর্য্যের অন্তরও তাহা। নাড়ীবৃত্ত হইতে উত্তর দক্ষিণে রবির যে দূরত্ব, তাহার নাম ক্রান্তি (৬)। বলা বাহুল্য, উত্তরায়ণান্ত বা দক্ষিণায়নান্ত দিবসে সূর্য্যের পরমক্রান্তি ঘটে। হিন্দুজ্যোতিষ মতে উহা ২৪ অংশ মাত্র। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে উহা সম্প্রতি প্রায় ২৩ অংশ ২৮ কলা।

হিন্দুজ্যোতিষে বর্ণিত অক্ষাংশ নিরূপণের নানাবিধ প্রণালীর মধ্যে বিষুবদ্দিনের মধ্যাহ্নচ্ছায়া (৭) দ্বারা সচরাচর অক্ষাংশ নির্ণীত হয়। বিষুবদ্দিনে সমতল ভূমিতে দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমিত একটি শঙ্কুর (বা কাঠীর) মধ্যাহ্নচ্ছায়া মাপিয়া ত্রিকোণমিতির সাহায্যে অক্ষাংশ নিরূপিত হয়। এই ছায়ার নাম পলভা। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় কলিকাতা প্রদেশস্থ স্থানের পলভা পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দশ ব্যঙ্গুল (১) দেওয়া আছে। এই পলভা লইয়া গণনা করিলে কলিকাতার অক্ষাংশ ২৩।২১ হয়। বাস্তবিক, কলিকাতার অক্ষাংশ ২২।৩২ মাত্র। সুতরাং পলভা ৪ অঙ্গুল ৫৯ ব্যঙ্গুল হওয়া উচিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় 'কলিকাতা প্রদেশস্থ' লেখা আছে। ইহা দ্বারা কোন স্থান বুঝাইবে, বলিতে পারি না।

উপরে দেখা গেল লগ্নমান নিরূপণের দুইটি অঙ্গ সম্বন্ধেই ইংরাজী জ্যোতিষের সহিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার অনৈক্য হইতেছে। বলা বাহুল্য, লগ্নমানেরও তজ্জন্য অনৈক্য। প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচনায় গণিত-ভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল ফলগুলি মাত্র লিখিত হইল।

কলিকাতার প্রাচীন লগ্নমান।

	পাশ্চাত্য মতে		হিন্দুজ্যোতিষ মতে
মেষের দণ্ডাদি	৩।৫০।৫০	...	৩।৪৭
বৃষের „	৪।১৯।৪০	...	৪।১৭
মিথুনের „	৫।৫।৪০	...	৫।৬
কর্কটের „	৫।’৮।০	...	৫।৪০

ইত্যাদি।

অয়নাংশ ২২ ধরিয়া গণনা করিলে কলিকাতার বর্ত্তমান লগ্নমান দণ্ডাদি

		পাশ্চাত্য মতে		গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে
মেষের	...	৪।১১।৫৮	...	৪।৭।০
বৃষের	...	৪।৫৩।২	...	৪।৪৯।৪০
মিথুনের	...	৫।২৯।৮	...	৫।২৮।৪০

ইত্যাদি।

(১) Horizon.
(২) Ascensional time of a sign.
(৩) Spherical trigonometry.
(৪) Latitude.
(৫) Obliquity of the ecliptic.
(৬) Declination.
(৭) Meridian altitude of the sun on the equinoxes from the mid-day shadow of a given gnomon.

(১) ৬০ ব্যঙ্গুলে ১ অঙ্গুল।

অয়নাংশের নিশ্চিত পরিমাণ না জানাতে লগ্নমানের তারতম্য ঘটিতেছে। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে কলিকাতার অক্ষাংশ, সূর্য্যের পরমক্রান্তি প্রভৃতি যে সকল বিষয় জানা আছে বা সহজেই জানা যাইতে পারে, তৎসমুদায়ে তারতম্য থাকা উচিত নহে।

আর একটি কথা বলা যাইতেছে। সকলেই জানেন যে, সূর্য্যের দক্ষিণায়নান্ত দিবসে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশস্থিত দেশে দিবা সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং উত্তরায়ণান্ত দিবসে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। পাশ্চাত্য মতে বিগত ২১ ডিসেম্বর বা ৭ পৌষ কলিকাতার বেলা ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট সময়ে সূর্য্য কুম্ভরাশিতে এবং বিগত ২০ জুন বা ৭ আষাঢ় সন্ধ্যা ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে কর্কটরাশিতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ ঐ দুই দিবসে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সুতরাং উক্ত ৭ পৌষ দিবসে দিবামান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং উক্ত ৭ আষাঢ় দিবসে দিবামান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ঐ দুই দিবসের পরিবর্ত্তে ৯ পৌষ ও ৯ আষাঢ় দিবসে দিবা হ্রস্ব ও দীর্ঘ দেওয়া আছে। পূর্ব্বে বিষুবদ্দিনের তারতম্য দুই দিন পাওয়া গিয়াছে। এখানেও সেইরূপ দুই দিনের প্রভেদ।

যাহা হউক গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতানুসারে ৯ আষাঢ় দিবসে দিবামান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধরিয়া দিবামান বিচার করা যাইতেছে। ৯ আষাঢ় দিবসে দিবামান দণ্ডাদি ৩৩।৪০।২৭ ও ৯ পৌষের ২৬।১৯।৩৩ দেওয়া আছে। কিন্তু কলিকাতার অক্ষাংশ ২২।৩২ ও সূর্য্যের পরম ক্রান্ত্যংশ ২৩।২৮ ধরিলে কলিকাতার পরম দিবামান ৩৩।২৭। ৪০ দণ্ডাদির বেশী হয় না। বলা বাহুল্য, সূর্য্যের উদয়াস্ত কালেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

পঞ্চাঙ্গের নিমিত্ত গ্রহস্ফুটই মূল। ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পঞ্জিকার সহিত বাঙ্গালা পঞ্জিকার কতদূর ঐক্য আছে, দেখা যাউক। দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারাই সত্যাসত্য দৃষ্ট হইবে। তবে যখন অয়নাংশের গোলযোগ চলিতেছে, তখন কোন একটী গ্রহের স্ফুটবিচার না করিয়া দুইটী গ্রহের স্ফুটের অন্তর বিচার করিলে অয়নাংশের প্রভেদ বশতঃ গোলযোগে পড়িতে হইবে না।

ইংরাজী পঞ্জিকানুসারে বিগত ২৫ জানুয়ারী বা ১৩ মাঘ দিবসে কলিকাতার রাত্রি প্রায় দশ ঘণ্টার সময় মঙ্গল ও বৃহস্পতির সমাগম (১) ঘটিয়াছিল। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাতে ২৬ জানুয়ারী বা ১৪ মাঘ দিবসের সূর্য্যোদয়কালিক মঙ্গলস্ফুট রাশ্যাদি ১১।২৬।৫।৪৪ এবং বৃহস্পতির ১১।২৬।১৭।২৮ দেওয়া আছে। পর দিবসের স্ফুট ধরিয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত পঞ্জিকা মতে ১৪ মাঘ দিবসে বেলা প্রায় ৩ ঘণ্টার সময় বৃহস্পতি ও মঙ্গলের স্ফুটান্তর শূন্য ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে ইংরাজী পঞ্জিকার সহিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রায় ১৭ ঘণ্টার প্রভেদ।

পুনশ্চ, বিগত ৩রা আগষ্ট বা ২০ শ্রাবণ কলিকাতার রাত্রি প্রায় ১২ ঘণ্টার সময় সূর্য্য ও মঙ্গলের অন্তর ঠিক ৬ রাশি ছিল। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে উভয়ের মধ্যে ৬ রাশি অন্তর ২০ শ্রাবণ দিবসে না ঘটিয়া ১৭ শ্রাবণ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়

(১) Conjunction.

ঘটে। সুতরাং উভয় পঞ্জিকার মধ্যে প্রায় ২ দিন ২০ ঘণ্টার প্রভেদ।

উক্ত দুই দৃষ্টান্ত হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সহিত ইংরাজী পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে প্রভেদ পড়িতেছে। যেখানে দক্ষজ্যোতির্বিদগণ নিয়ত সুরচিত যন্ত্র দ্বারা গ্রহাদি পরিদর্শন পূর্ব্বক গ্রহস্ফুট নির্ণয় করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের গণনা ভ্রমশূন্য হইবার সম্ভাবনা। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনায় ভ্রম না থাকিলে বলিতে হইবে যে, যে সকল গ্রহভগণাদি লইয়া গুপ্তপ্রেস গণিত হইতেছে, তৎসমুদায়ের সংস্কার আবশ্যক। দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করাই পঞ্জিকা প্রণয়নের চরম উদ্দেশ্য (১)।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তায়কোব্রাহির জীবনচরিত। (২)

বাল্যকাল।

উপরোক্তরূপে বাল্যশিক্ষা প্রাপ্তির পর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কোপেন্‌হ্যাগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হইলেন। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব দেশের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজকীয় কার্য্যে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় জোর্গেণব্রাহি তায়কোকে আইন শিক্ষার পূর্ব্বসূত্রস্বরূপ ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং দর্শন শিক্ষা দানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে,ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বারা ভাষাজ্ঞান পরিস্ফুট হয়, দর্শন দ্বারা বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ও ন্যায়শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানকে যুক্তিসঙ্গত করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে সক্ষম করে, এবং আইন শিক্ষাতে বস্তুতত্ত্বকে যুক্তির শৃঙ্খলাতে নিবদ্ধ করিয়া ভাষাতে পরিণত করিতে হয়; এই হেতু আইন শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও দর্শন শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অট্টোব্রাহির ইচ্ছা ছিল তায়কো সৈনিক বিভাগে কার্য্যগ্রহণোদ্দেশ্যে শিক্ষা লাভ করেন, কারণ তৎকালে দেন্মার্কে রাজকীয় কার্য্য বিভাগ সমূহের মধ্যে সৈনিক বিভাগেই কর্ম্মচারীগণ অধিক বেতন পাইত; কিন্তু তায়কো কিছুতেই সৈনিক কার্য্যে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে জোর্গেণব্রাহির অর্থের অনাটন না থাকাতে তিনিও তায়কোকে ঐ কার্য্য শিক্ষার্থ পীড়াপীড়ি করিলেন না, পরন্তু শাসনকার্য্যে অধিক সম্মান লাভের সম্ভাবনা আছে জানিয়া তিনি তায়কোকে ঐ কার্য্যার্থ শিক্ষা দান করিতে অভিলাষ করিলেন। অট্টোব্রাহি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র স্তেনোকে সৈনিক বিভাগে কার্য্যকরণার্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্তেনো সৈনিক কার্য্যে অননুরাগবশতঃ ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া রাজার গুপ্ত মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জোর্গেণব্রাহি স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ

---

(১) পঞ্জিকা ব্যতীত আমাদের একদিন চলে না। বর্ত্তমান পঞ্জিকা বিষয়ক আন্দোলনে যাহাতে সকলে যোগ দিতে পারেন, এই উদ্দেশে পঞ্জিকার গণিতাংশের কয়েকটি বিষয় সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা গেল। আশা করি গণকমহাশয়গণ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

করিতেন। তায়কোর সৈনিক কার্য্যে যাইতে অনিচ্ছা দেখিয়া এবং বাল্যকালে তাহার লাটিনে ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া অট্টো প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তায়কো সাহিত্য-শিক্ষাতে তৎপর হইবে; তিনি স্বয়ং সাহিত্যশিক্ষাতে জীবন যাপন করাকে শক্তির অপচয় বলিয়া মনে করিতেন, কারণ তাঁহার মতে "সাহিত্য মানবজীবনের উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হয় না, কেবল জীবনের পথ সুগম করে মাত্র।" * অতএব পুত্রের সাহিত্যশিক্ষাতে আসক্তি জন্মিয়াছে আশঙ্কা করিয়া তিনি জোর্গেণের নিকট স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন এবং জোর্গেণ যখন জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি তায়কোকে দর্শন ও আইন শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছেন তখন অট্টো আর কোন আপত্তি করিলেন না। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে তাহা কে জানিবে? তায়কোর মানসিক গতি যে জোর্গেণব্রাহি অথবা অট্টোব্রাহি কাহারই মতানুসারী হইবে না ইহা যদি তাঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারিতেন তবে আর তাহার মনের গতি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল নিজেদের ইচ্ছানুক্রমে তায়কোর ভবিতব্য-ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইতেন না। জগতে কত বালহৃদয় অভিভাবকের অনবধানতা ও ইচ্ছার বন্ধনে পড়িয়া অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে; সৌভাগ্যক্রমে তায়কোব্রাহি ঐ বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজের পথ চিনিয়া নিজে চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, নতুবা আজ আমাদিগকে এই জীবনচরিত লিখিতে বসিতে হইত না।*

তায়কোব্রাহি ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে আপন অভিভাবকের অভিপ্রায়ানুরূপ শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন; ইতিমধ্যে অবকাশকালে ফলিত জ্যোতিষ মতে ভাগ্যফল গণনা এবং জন্মপত্রী (বা কোষ্ঠী) প্রণয়নাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভার্থ সময় সময় একান্ত উৎসাহান্বিত হইতেন। এইরূপে এক বৎসরকাল যাপন করিলে পর ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে আগষ্ট যে সূর্য্যগ্রহণ হয় তাহাই প্রথম তাঁহার চিত্তকে বিষয়ান্তরে

* উপরে যে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের বিষয় উক্ত হইল তন্মধ্যে ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র এতদুভয়ের একীকরণকে 'সাহিত্য' বলা যাইতে পারে এবং তাহাদের কার্য্যপরম্পরা হইতে সহজে বোধগম্য হইবে যে কোন "ভাবকে" জ্ঞানগত ও যুক্তিসঙ্গত করিয়া ভাষাতে অভিব্যক্ত করার নামই 'সাহিত্য', অতএব যে পর্য্যন্ত ভাব উদ্রিক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সাহিত্যের কোন কার্য্যকারিতা নাই। সাহিত্য ভাবজন্মায় না; ভাব জন্মিলে তাহা প্রকাশ করে মাত্র।

* জগতে সকল অভিভাবকেরই কর্ত্তব্য সন্তানের মনের গতি চিনিয়া তাহাকে সেই পথে চালিত করেন, নতুবা অভিভাবকের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করা হয়; যদি তাহাতে আবার সন্তানের গতি বুঝিতে সচেষ্ট না হইয়া কেবল নিজের ইচ্ছানুরূপপথে সন্তানকে চালিত করিতে প্রয়াস পান এবং তাহাতে সন্তানের জীবন উন্নত না হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় তবে তজ্জন্য অভিভাবককে পাপের ভাগী হইতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে অভিভাবকের ইচ্ছার বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনেক সন্তান নিজে পথ চিনিয়া চলিতে সক্ষম না হওয়াতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, এ সকল উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কে দায়ী হইবে? ইহা অতি ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে যে, বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ অভিভাবক অতি বিরল যিনি জ্ঞান বিষয়ে সন্তানের আন্তরিক আসক্তি বুঝিয়া তদনুরূপ পথে সন্তানকে পরিচালিত করিতে কদাপি যত্ন করিয়া থাকেন।

নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তৎকালে জর্ম্মেণিতে আলমাজেস্তের প্রভূত প্রতিপত্তি এবং জ্যোতিষালোচনার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল; কোপেন্‌হাগেনে যে সকল অধ্যাপক নিয়োজিত হইত তাঁহারা প্রায়ই জর্ম্মেণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চাও কোপেন্‌হাগেনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। উপরোক্ত সময়ে যাঁহারা তথায় জ্যোতিষচর্চ্চাতে নিবিষ্ট ছিলেন তাঁহারা উপরোক্ত গ্রহণের বহুদিবস পূর্ব্বে তাহার সংঘটনের সময় এবং কোপেন্‌হাগেনে তাহা আংশিক দৃষ্ট হইবার বিষয় গণনাপূর্ব্বক প্রচার করিয়া জনসাধারণের অপরিসীম কৌতূহল জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা কি প্রকারে অগ্রে গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে তায়কোব্রাহির কৌতূহলের উদ্রেক হওয়াতেই তিনি ফলিতজ্যোতিষে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং সেই হেতু অবকাশকালে ভাগ্যফল-গণন-শিক্ষার্থ প্রয়াস পাইতেন। অতএব যখন দেখিতে পাইলেন যে, গ্রহণ সংঘটনের বহুদিবস পূর্ব্বে তাহার কাল নির্ণয় করিয়া প্রচার করা হইয়াছে তখন ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইবে কি না তাহা দেখিবার জন্য তিনি সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিবস উপনীত হইল এবং ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা যাইতে লাগিল যে, সূর্য্যের উপর কালিমা সঞ্চার হইতেছে। ইহাতে বালক তায়কোর আর আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না, এবং ঐ আশ্চর্য্যের বেগ প্রশমিত হইলে পর তাঁহার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক হইল; তিনি বহু গবেষণার পর এই স্থির করিলেন যে, মানুষের অভ্যন্তরে এমন দৈবীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার বলে তাহারা গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি বহুকাল পূর্ব্বে গণনা করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে। পরিশেষে, যে সকল ব্যক্তি গ্রহণ গণনা প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা সকলেই চর্চ্চা দ্বারা উক্ত গণনকার্য্যে সক্ষম হইয়াছে; অতএব তিনি ইহাও অনুমান করিলেন যে, যে ব্যক্তি ঐ চর্চ্চাতে মনোনিবেশ করে সেই উক্ত শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়; শক্তি দেবানুশ্রিত হইলেও তাহার লাভকরণ দেবানুগ্রহে নিবদ্ধ নহে, কারণ তাহা হইলে যে কেহ তাহার চর্চ্চাতে নিবিষ্ট হইত সেই সফল মনোরথ হইতে পারিত না। এই অনুমান অচিরে তাঁহাকে ঐ মহিয়সী শক্তি কবলিত করণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিল, এবং বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তৎকালপ্রসিদ্ধ "স্ত্যাদিয়স্‌" প্রণীত এক খণ্ড দিনপঞ্জিকা সংগ্রহ করতঃ তাহা হইতে গ্রহণগণনা প্রণালী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে গণনা প্রণালী সকল এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তাহাতে গণকদেরই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিত, তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পিপাসা চরিতার্থ করণ বিষয়ে তাহা সম্পূর্ণ অনুপাদেয় ছিল; কারণ কিরূপে গণনা করিতে হইবে কেবল তাহারই ধারামাত্র তাহাতে লিপিবদ্ধ ছিল, সেই সকল ধারার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিধান পূর্ব্বক কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা সংযোজিত হইয়াছিল না। অতএব উক্ত গণনপ্রণালী পাঠে তায়কোর

তত্ত্বজ্ঞানকৌতূহল চরিতার্থ না হইয়া অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ঐ জ্ঞানপিপাসা দ্বারাই বালক তায়কোর প্রাণে প্রথম জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি দর্শনাদি অধ্যয়ন ভুলিয়া, কিরূপে আরও অধিক জ্যোতিষ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন এইরূপ উদ্বিগ্নচিত্তে যাপিত হইলে পর একদা তিনি কোন এক বন্ধুর মুখে শুনিতে পাইলেন যে, ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাইল নগরে টলেমির গ্রন্থ সমূহের এক নূতন লাটিনানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; তচ্ছ্রবণে কাল বিলম্ব না করিয়া উহার একখণ্ড ক্রয় করণার্থ আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যত সত্বর পারেন তাহা হস্তগত করিলেন। তায়কোব্রাহির এই গ্রন্থ অদ্যাপি "প্র্যাগ্" বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত হইতেছে; ইহার স্থানে স্থানে তাঁহার স্বহস্তলিখিত অনেক টীকা টিপ্পনী রহিয়াছে। ঐ সকল টীকা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি আলমাজেস্ত গ্রন্থ বিশেষ অবধানতার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, এবং ঐ পাঠ হইতে তাঁহার প্রাণে যে ভাববিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল তাহার বলে তিনি আজীবন অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছিলেন।

তায়কো তিন বৎসরকাল কোপেন্হ্যাগেনে অধ্যয়নার্থ অবস্থিতি করেন; তন্মধ্যে কেবল প্রথম বৎসর মাত্র ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনাধ্যয়নে ব্যয়িত হইয়াছিল, অবশিষ্ট দুই বৎসরকাল তিনি জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে নিবিষ্টমনা থাকিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার জ্যোতিষাধ্যয়ন ও তাহাতে একাগ্রচিত্ততা এবং আগ্রহের বিষয় জোর্গেণব্রাহির কর্ণগোচর হইল, তিনি তাহাতে হৃষ্টচিত্ত না হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, বালক তায়কো রাজকার্য্যে নিয়োগার্থ শিক্ষালাভ না করিয়া এবং তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া জ্যোতিষানুশীলন দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ করিতেছে। তৎকালে ইয়ুরোপে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের বালকগণ কোন বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া না আসিত এবং বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নানা দেশীয় নানা জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ না করিত সে পর্য্যন্ত বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইত না। জোর্গেণব্রাহি ঐ প্রথানুসারে বিবেচনা করিলেন যে, তায়কোকে বিদেশীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের এই সুপ্রশস্ত সময়; কারণ তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, এবং সম্ভবতঃ নানা দেশীয় বৈষয়িক কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার জ্যোতিষানুশীলন বিষয়ে একাগ্রতারও হ্রাস হইবে। তিনি যে কেবল তায়কোর রাজকার্য্যার্থ শিক্ষালাভে বিঘ্নোৎপাদন করিতেছে বলিয়াই তাঁহার জ্যোতিষানুশীলনে অনভিমত ছিলেন তাহা নহে; অপরাপর ধনীবর্গের ন্যায় তিনিও এই ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া জীবন যাপন করা কেবলমাত্র দরিদ্র লোকদিগের পক্ষেই শ্রেয়স্কর, কিন্তু ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই রাজকার্য্যে উচ্চপদ লাভ করিয়া রাজার রাজ্যশাসনে সহায়তা করিবে। এই ধারণা হেতু তৎকালে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-

দিগের পক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চা করা একরূপ নীচতা স্বীকার বলিয়া অনুমিত হইত। এই হেতু জোর্গেণ তায়কোর জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানানুশীলনে অভিরুচির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। *

পূর্ব্বকালে দেনেরা শিক্ষাসমাপণার্থ 'পারি' নগরে গমন করিত, কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের দুরূহ মীমাংসা সকলকে লৌকিক ভাষাতে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য ফরাশিজাতি বহুকাল হইতে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছিল এবং সেই হেতু তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ শিক্ষানুগমতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিল।+ কিন্তু যখন জর্ম্মেণ বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া উঠিল এবং দেন জাতির সহিত জর্ম্মেণদিগের সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল তখন হইতে দেনেরা শিক্ষাসমাপনার্থ পারিনগরে না গিয়া জর্ম্মেণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গমন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ফরাশি 'রাজধানী হইতে জর্ম্মেণ বিশ্ববিদ্যালয় সকল দেন্মার্কের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ব্যয় সঙ্কুলতা নিবন্ধন অনেক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকও আপন সন্তানদিগকে জর্ম্মেণি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জোর্গেন-

* বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপে অনেক ধনী ব্যক্তিকে জ্ঞান বিজ্ঞানে অনুরক্ত দেখা গিয়া থাকে। তাঁহারা যে কেবল আর্থিক সহানুভূতি দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতেছেন তাহা নহে; নিজেরা তাহার অনুশীলন ও আলোচনাতে এবং স্থল বিশেষে তাহার বিশেষরূপ উৎকর্ষসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। আয়র্লাণ্ড নিবাসী লর্ড রশ্ (Earl of Rosse) ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; ইঁহারই একমাত্র অর্থ ও অধ্যবসায়বলে আজি পর্য্যন্ত নিউটন ও হর্শেলাবিষ্কৃত "প্রতিফলক দূরবীক্ষণ" (Reflecting Telescope) জগতে কেবল দৃষ্টিশোভার সামগ্রীরূপে পরিণত না হইয়া কার্য্য সম্পাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে। এইমহান্ দূরবীক্ষণ জগতে অদ্বিতীয় কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছে, গত বৎসর 'ছায়াপথের' প্রথম আলেখ্য উপহার প্রদান করিয়া জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। লর্ড রশ্ স্বীয় বশতবাটীকে একটী প্রকাণ্ড মানমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে যন্ত্রব্যবহারাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইয়ুরোপে স্বল্পমাত্রাতে এইরূপ লোক বিরল নহে।

+ ফরাশিজাতি অদ্যাপিও আপনাদিগের সেই প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই বরং এবিষয়ে তাহারা অপরাপর জাতিদিগের পথপ্রদর্শকরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতে একমাত্র ফরাশি জাতিই বোধ হয় গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে যে, তাহারা কখনও পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই; ফরাশিগণ চিরকাল জ্ঞানের কথাকে নিজের ভাষায় বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে। এইহেতু সহজ ও লৌকিক ভাষাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বচন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জগতে ফরাশি ভাষার মতন অপর কোন ভাষাই উপাদেয় নহে। যে পর্য্যন্ত স্বকীয় ভাষা জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যবর্ত্তীর অধিকার না করিয়া পরকীয় ভাষাকে স্থানদান করিবে সে পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি চেষ্টা করা বা কামনা করা উভয়ই বাতুলতা। ভাষাকে জ্ঞানের কথা প্রকাশার্থ প্রয়োগ না করিলে তাহা কখনই উপাদেয় হইতে পারে না, অতএব যাহারা মনে করে যে ভাষা উপাদেয় নহে কি দিয়া তাহাতে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা যায়, তাহাদের ভাব ঠিক সাঁতার শিখাইয়া জলে নামাইবার মতন। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন একদা কোন জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ (বরুণগ্রহের অন্যতম আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক আডামস্) সহিত আলাপকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে "ফরাশি ভাষা না শিখিয়া যে ব্যক্তি গণিত বা জ্যোতিষ শিখিতে চাহে তাহার ঐ অভিলাষকে আত্মপ্রতারণা ('Self-pretention') বলা যায়, ইংরাজি ভাষাতে কখনই উচ্চ গণিতের ভাব ব্যক্ত করা যায় না, এখনও তাহা ঐ ভাব প্রকাশার্থ উপাদেয় হয় নাই; ফরাশি ভাষাতে যে সকল ভাব এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা ইংরাজিতে প্রকাশ করিতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে।"

ব্রাহি তায়কোকে জর্ম্মেণিতে পাঠাইবার মনস্থ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবার নিমিত্ত জুৎল্যাণ্ডের অন্তর্গত বারলা নগর নিবাসী "বেদেল" নামক এক ভদ্রসন্তানকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন, এবং উভয়কে লাইপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। বেদেল তৎকালে কোপেনহ্যাগেনে ইতিহাস ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষাতে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তথায় সেই সময় ইতিহাসের কোন অধ্যাপক নিয়োজিত ছিল না হেতু শিক্ষার সুযোগাভাবে তিনি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন; এদিকে আবার নিঃস্ব বিধায় কোন বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনেও সক্ষম ছিলেন না। অতএব যখন জোর্গেণব্রাহি তাঁহার নিকট তায়কোর অভিভাবক হইয়া লাইপ্‌জিগ্‌ গমনের প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐ কার্য্যগ্রহণে সম্মত হইলেন; কারণ তিনি মনে করিলেন যে, একেত লাইপ্‌জিগে তাঁহার যথোচ্চ শিক্ষালাভ হইবে, তদ্ভিন্ন দরিদ্র সন্তান হইয়াও সম্ভ্রান্ত পদবীর লোকের সহবাসে থাকিয়া তাহাদের ন্যায় বিদেশীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বেদেলের বয়স যদিও তায়কো হইতে চারি বৎসরমাত্র অধিক ছিল, তথাপি দরিদ্রতানিবন্ধন নানা অবস্থায় পতিত হওয়াতে এবং নানা লোক চরিত্র সন্দর্শন করাতে তাঁহার নিজচরিত্রে সমধিক গাম্ভীর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এবং বিষয় বুদ্ধিতে তিনি অতীব প্রখর ছিলেন; এই হেতু জোর্গেণ তাঁহার হস্তে তায়কোর ভারার্পণ করিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাকে তায়কোর 'অভিভাবক' মনোনীত করিয়াছিলেন। তায়কো অনতিবিলম্বে বেদেলের সমভিব্যাহারে লাইপ্‌জিগ্‌ প্রেরিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

জাতিভেদ এবং ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু। (১)

এদেশে প্রথমে যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই জাতিভেদের বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি হিন্দুসমাজে একটী পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। কতকগুলি লোক ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াও জাতিভেদের জীর্ণ ও ভগ্ন দুর্গ সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, এখন যেরূপ চতুর্দ্দিকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের বিপ্লবক গোলা গুলি ছুটিতেছে, তাহাতে জাতিভেদ-দুর্গ হিন্দুসমাজের একমাত্র আশ্রয়, তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে ভেরীনাদে বলিতেছেন—

"ভাই হিন্দু, খবরদার, জাতিভেদ দুর্গ ছাড়িও না। এ দুর্গ বড় কৌশলে নির্ম্মিত; মনু পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণের অপূর্ব্ব 'এন্‌জিনিয়ারিং' ইহাকে, (জাতি) ভেদের মসলায় গড়িয়াও দুর্ভেদ্য ও অজেয় করিয়াছে। তোমরা যদি এই দুর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব-'প্লান' একবার বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে পার, এবং স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ইহা রক্ষা করণপক্ষে যত্নবান হও, তাহা হইলে বিলাতি শিক্ষার কামান ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। আর যদি এই দুর্দ্দিনে এই দুর্গ ছাড়িয়া, জাতিভেদ শূন্য সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া, জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই মরিবে।"

এই দলের দুইজন নেতা দেখিতে পাইতেছি। বহুদর্শী ও চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত ভূদেব-

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে (২২৮—২৪০ পৃঃ) জাতিভেদ প্রথার গুণ কীর্ত্তন ও পোষকতা করিয়াছেন। পণ্ডিত ও উচ্ছ্বাসময় সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার মনোহর "হিন্দুত্ব" পুস্তকে (পৃঃ ৩১৩—৩১৭) জাতিভেদের অপার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব বাবু (জাতি) ভেদে মিল দেখিয়াছেন (পৃঃ ২৩৬)। চন্দ্রবাবু জাতি (ভেদে) সাম্য দেখিয়াছেন। কথাটা বিস্ময়জনক। কিন্তু সার উইলিয়াম হামিল্টন ঠিক বলিয়াছেন যে, সংসারে এমন কোন মত নাই, যাহা কোনও না কোনও দার্শনিক পোষকতা করেন নাই। ভূদেববাবুর ও চন্দ্রবাবুর অধিকাংশ যুক্তিই আমি বুঝিতে পারি নাই। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রবর্ত্তমান ও অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রাচীন জাতিভেদের সারাংশ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে,তাহাও আমার উপলব্ধি হয় নাই।

যাহা হউক, ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবুর কথা বিশ্লেষরূপ ভাবিয়া দেখা উচিত। তাই আমি তাঁহাদিগের যুক্তি আলোচনা করিয়া দেখিব, এবং এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। কিন্তু কাহারও যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলে, মনে তাঁহার প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব থাকিলেও প্রতিবাদের ভাষা অসম্মানের ভাষা বলিয়া সহসা বোধ হয়। তাই পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি, ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু, বয়সে, পাণ্ডিত্যে, ও প্রতিভায় আমার শিক্ষক, আমি মনে করি। এবং শিক্ষকের সহিত বিচার করিয়া ছাত্র যেরূপ জ্ঞানলাভ করে, আমিও এই সমালোচনায় সেইরূপ করিতে পারিব,আশা করি।

জাতিভেদ সমর্থনকারীদিগের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, দুইই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মহিমাতে মুগ্ধ হইবেন—যে জাতিভেদের মাহাত্ম্যে তিনি মর নরদেহ, ধারণ করিয়াও অমর সুরগণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, * সেই জাতিভেদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের যে মজ্জাগত আসক্তি থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত শূদ্র বা অব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে কোনও কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জাতিভেদ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। সেকালে জেতা ব্রাহ্মণগণ জিত শূদ্রদিগকে সমুদায় অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের পায় দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছিল, ইংরাজ শাসনে, ইংরাজশিক্ষায়, সেই শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। শূদ্রগণ সাধ করিয়া যথার্থই কি আবার সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের পদসেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন? এই উত্তর শূদ্র জাতিভেদ সমর্থনকারিগণই দিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, এখন জাতিভেদ-পক্ষপাতীদিগের যুক্তি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অনেকে বলিয়া থাকেন, "জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়।" ভূদেব বাবু এই কথার উত্তর অতি সংক্ষেপে দিতে চাহেন, তিনি বলেন—"যাহা নাই, তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তদ্ভিন্ন, সম্পূর্ণ সাম্যভাবের প্রভাবে বশ্যতার লোপ এবং বশ্যতার লোপে সম্মিলন একেবারে অসম্ভবপর হয়।" (পৃঃ ২৩৭)। এই উত্তরে আমার আপত্তি আছে। "পৃথিবীতে সাম্য

* ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তি তানি দেবতাঃ। (পরাশর) প্রভৃতি বচন দেখ।

নাই" ইহার দুই অর্থ হইতে পারে (১) পৃথিবীতে পূর্ণ সাম্য নাই। (২) পৃথিবীতে অপূর্ণ সাম্যও নাই, বা সাম্যের লেশমাত্র নাই। ১ম অর্থানুসারে উত্তর,— পৃথিবীতে পূর্ণ সাম্য আছে। (বা পূর্ণ ধর্ম্ম আছে, বা পূর্ণ সত্য আছে) এমন স্পষ্টত অসঙ্গত কথা কেহ বলেন না। যাহা কেহ বলে নাই, তাহার প্রতিবাদ নিরর্থক। ২য় অর্থানুযায়ী কথার উত্তর—পৃথিবীতে অপূর্ণ সাম্যও নাই বা সাম্যের লেশমাত্র নাই, একথা স্বতঃই অসিদ্ধ। আর, ভূদেব বাবুর যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া ইহাও বলা যাইতে পারে না কি যে "সাম্য পৃথিবীতে (লেশমাত্রও) নাই, সেই "সাম্যভাবের প্রভাব" একেবারে "অসম্ভবপর," এবং তজ্জন্য পাঠককে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ "সম্পূর্ণ সাম্যভাবের প্রভাবে বশ্যতার লোপ হয়" এই কথা দ্বারা ভূদেববাবু, পৃথিবীতে (অসম্পূর্ণ) সাম্য আছে, স্বীকার করিতেছেন। এবং পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছেন, অব্যবহিত পরেই সেই কথা আপনিই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছেন। সে যাহা হউক, জাতিভেদ যে সাম্যের বিরোধী, তাহা সাহসপূর্ব্বক ভূদেব বাবু স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রবাবু এই স্বতঃসিদ্ধ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। হিন্দুত্বের প্রতি তাহার ভক্তি এমনি প্রগাঢ়, অনুরাগ এমনি গভীর যে, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর, হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থার ভিতর যাহা কিছু আছে, তাঁহার চোখে যেন সকলই ভাল ও নিখুঁত। হিন্দুধর্ম্মকে তিনি প্রেমিকের চক্ষুতে দেখিয়াছেন। তাই দার্শনিক হইয়াও তাহা দার্শনিকের চক্ষুতে দেখেন নাই। প্রেমিকের নিকট প্রণয়িনী জগতে সকলের অপেক্ষা সুন্দর, বিধাতার ললামভূতা অনুপমা সৃষ্টি। অন্যের চক্ষে যাহা খুঁত প্রেমরাগ-রঞ্জিত চক্ষে তাহা সৌন্দর্য্যের লীলা, মধুরতার তরঙ্গভঙ্গ। তাই, চন্দ্রনাথবাবুর নিকট, হিন্দুর জাতিভেদ, সাম্যের বিরোধী হওয়া দূরে যাউক, সাম্যের অনুকূল ও পোষক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। চন্দ্রবাবুর সাম্যব্যাখ্যা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, সাম্য শব্দটার অর্থ কি বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমাদিগের আলোচ্য সাম্য সম্বন্ধে দুই অর্থ হইতে পারে। (১) সাম্যের এক অর্থ, যাহার যেরূপ যোগ্যতা বা গুণ তাহাকে তেমনি অধিকার দেওয়া, বা সম্মান করা। যথা, ধার্ম্মিককে ভক্তি করা, জ্ঞানীকে সম্মান করা। এই অর্থে মার্কিনে বৈষম্য আছে। সেখানে ধনী ও নির্ধনের ভিতর যে ঘৃণিত বৈষম্য, almighty dollarএর যে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আছে, তাহা মহাত্মা ডিকেন্স মার্টিন চিজ্‌লুয়িট নামক উপন্যাসে তাঁহার রঙ্গময় ভাষায় নির্ম্মমভাবে চিত্র করিয়াছেন। সাম্যের এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্রে বৈষম্য আছে। কারণ শূদ্র গুণে ব্রাহ্মণের সমান হইলেও সমান সম্মান পাইতে পারেন না। (২) সাম্যের আর এক অর্থ,—যাহাতে প্রত্যেকে নিজের শক্তি অনুসারে সমভাবে অবাধে ধন জ্ঞান প্রভৃতি অধিকার লাভ করিতে পারে, এমন অবস্থা। এই অর্থে মার্কিনে যে সাম্য আছে, হিন্দু সমাজে তাহা নাই। হিন্দুধর্ম্মে ধনে ও শাস্ত্রজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই বলিলেই হয়। সুতরাং ১ম ও ২য় এই দুই অর্থেই ব্রাহ্মণ শূদ্রে বৈষম্য। শূদ্রের যদি ব্রাহ্মণের সমান গুণ থাকে, ব্রাহ্মণের সমান অধিকার পান না। সমান গুণ লাভ করিবার সমান

সুবিধা পান না। ইহা যদি বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে জগতে কুত্রাপি বৈষম্য নাই। তথাপি চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "বর্ণভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে না" অর্থাৎ এই বর্ণভেদে সমত্ব আছে, বৈষম্য নাই। তাঁহার যুক্তি ;—"লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণভেদে তাহাদের কর্ম্মও বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের পদও বিভিন্ন এবং সমাজের সম্মান ইত্যাদির কম বেশী হইয়া থাকে। কর্ম্ম পদ এবং সম্মান ইত্যাদির বিভিন্নতা প্রকৃত সাম্য"।* এই যুক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি রহিয়াছে যে, শূদ্রের ক্ষমতা ও প্রকৃতি ব্রাহ্মণের সমান হইলেও তিনি, "বর্ণভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ত্বের" প্রভাবে সমান সম্মান বা অধিকার পান না।

চন্দ্রবাবু ও অন্য অনেকে বলেন যে, "ইউরোপে আইন-বৈষম্য না থাকিলেও রিপোর্ট গ্রন্থে দণ্ড-বৈষম্য আছে (হিন্দুত্ব পৃঃ ৩১৭) অতএব ইউরোপের দণ্ডবিধি আইন হইতে বড় একটা বিভিন্ন নহে।" এইটীতে আমি সায় দিতে পারি না। ইউরোপে দণ্ডবিধানে অর্থাৎ আইন প্রয়োগে বিভ্রাট হইলেও ইউরোপের দণ্ডবিধির আদর্শ মনুর আদর্শ অপেক্ষা উচ্চ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলেন, আদর্শ উচ্চ হইয়া লাভ কি? লাভ—কার্য্য বা আইন প্রয়োগ ক্রমে আদর্শ মত বা আইনানুরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে। এক ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে, পাপ বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু সেই পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। অন্যব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না, পাপ বলিয়া আদৌ স্বীকার করে না, বরঞ্চ তাহাই কর্ত্তব্য, এইটী শিক্ষা দেয় ও প্রচার করে, প্রথম ব্যক্তির অবস্থা দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভাল। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা প্রথম ব্যক্তির অবস্থা অপেক্ষা অনেক শোচনীয়। সুতরাং যদিও বলিতে ভয় হয়, তথাপি ইহা সত্য যে, মনু এবিষয় ইংরাজ আইন-প্রণেতা অপেক্ষা নিম্ন স্তরে অবস্থিত। আর ইউরোপে যদি বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে ভারতের বৈষম্য কিছু সাম্য হইয়া যায় না। দুইটী কাল বস্তু মিলিলে একটী সাদা বস্তু হয় না।

পার্থিব অধিকার সম্বন্ধে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে বৈষম্য আছে, তাহা চন্দ্রনাথ বাবুকে স্বীকার করিতে হইবেই। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু এই পার্থিব অধিকার-বৈষম্য, আধ্যাত্মিকতার সমত্ব মিশ্রণে, সমীকৃত করিতে চাহেন। তাঁহার যুক্তি ;—"এক সমত্বময় ব্রহ্মপদার্থ লইয়া আধ্যাত্মিকতা, অতএব যেখানে পার্থিবতার পরিহার এবং আধ্যাত্মিকতার আদর, সেখানে কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত সকল প্রকার সমত্বের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বিনাশ।" অর্থাৎ হিন্দুসমাজে আধ্যাত্মিকতা অধিক, আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মমূলক, ব্রহ্ম সমত্বময় পদার্থ, সুতরাং হিন্দু সমাজে সমত্ব অধিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রে বৈষম্য নাই। এই যুক্তির তাৎপর্য্য ভাল বুঝিলাম না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সমত্বময় ইহার অর্থ অতিশয় অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ সমত্ব অধিক হইয়াও তাহা উচ্চ তিন বর্ণে আবদ্ধ থাকিতে পারে, শূদ্রবর্ণ পর্য্যন্ত পহুঁছিতে না পারে।

ইদানীং মার্কিণদিগের মধ্যে ক্রীতদাসগণ ইহার দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আমরা কোনজাতির উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে অধিকার, স্বত্ব, সাম্য প্রভৃতি সৌভাগ্য দেখিতে পাই, সমুদয় সমাজে অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও তাহা

* হিন্দুত্ব পৃ ৩১৪।

ব্যাপ্ত, সহসা এই অনুমান করিয়া লইয়া ভ্রমে পতিত হই। পেরিক্লিসের সময় যখন এথেন্স নগরী সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল, তখনও তাহার দাসগণের সংখ্যা স্বাধীন আথিনিয়ানগণের সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক। যখন বলি, এই সময় এথেন্স নগর সুখ ও সাম্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন হতভাগ্য দাসগণের দুরবস্থা স্মরণ রাখি না। যখন বলি, প্রাচীন ভারত, সুখ সাম্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন হতভাগ্য বিজীত শূদ্র দাসগণের শোচনীয় দশা বিস্মৃতির অন্তরালে রাখিয়া দিই।

তাই চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন— 'বর্ণভেদ অনুসারে যে পার্থিব অধিকার ভেদ আছে,তাহাকে কিছুতেই বর্ণ মধ্যে বৈষম্যের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, সে সকল অধিকার বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ সমৃদ্ধি এবং ভোগের নিমিত্ত দেওয়া হয় নাই,কেন না পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণেরই সমান উদ্দেশ্য। অতএব সম্ভব এই যে, সমস্ত সমাজের রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে।" (হিন্দুত্ব পৃঃ ৩৩২) এখানে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে,চন্দ্র বাবু তাহা জাতিভেদে পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। "সমস্ত সমাজের" মঙ্গল সমভাবে রক্ষিত হয়,এই কথা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিপক্ষের লোকেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,দ্বিজগণের পার্থিব মঙ্গলের জন্য জাতিভেদ প্রথা দ্বারা শূদ্রগণের মঙ্গল খর্ব্ব করা হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে স্বীকার করিয়াছেন "মূর্খ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ।" (পৃ ৩৩১) মূর্খতা, দাসত্ব বন্ধন, শাস্ত্রাধ্যয়নে অনধিকার এইগুলি যে জ্ঞান, স্বাধীনতা, শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারের ন্যায় সমান মঙ্গলজনক, এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করিতে না পারিলে, জাতিভেদে শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে, অথবা "সমস্ত সমাজের (সমান) রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত (ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অসমান) অধিকার দেওয়া হইয়াছে" এই বোধাতীত কথা কেমন করিয়া মানিব ?

মার্কিণ পণ্ডিত জন্সন বলেন—

"The theoretic aim of the manavasastra is the utter suppression of selfish desire."

এই কথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে, আমি স্বীকার করি। কিন্তু শূদ্রগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে "Utter suppression of selfish desire" স্বার্থ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, এই কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

খাদ্য। (২)

পরীক্ষা দ্বারা আরও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, একজন ইউরোপীয় মধ্যমাকার পুরুষের (৫´ ৭´´ দীর্ঘ ও ১৫০ ভারী) সচরাচর খাদ্যে নিম্নলিখিত অন্তিম পদার্থ সমূহ নিম্নলিখিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক; যথা—

য়্যালবুমিনেট্	৪·৫৮	আউন্স জলশূন্য
তৈলময়	২·৯৬	„
শ্বেতসারময়	১৪·২৫	„
লবণময়	১·০৫	„
	২২·৮৪	

এবং এই পরিমাণ খাদ্যে মোট ৩১০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৮১৬ গ্রেণ অঙ্গার থাকে। অর্থাৎ প্রায় ২৩ আউন্স (১১২ ছটাক) জলশূন্য পদার্থ ভক্ষণ করা আবশ্যক।* ইহা হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রত্যেক স্ব স্ব দেহ ভারের ১০০ শত ভাগের ১ ভাগ মাত্র শুষ্ক ও জলশূন্য খাদ্য ভক্ষণ করিলে সুস্থ থাকিতে পারে। সচরাচর স্বাভাবিক খাদ্যে প্রায় শতকরা ৫০।৬০ ভাগ জল মিশ্রিত থাকে; অতএব প্রত্যেক মধ্যমাকার ব্যক্তি প্রায় ৪০ আউন্স বা ২০ ছটাক স্বাভাবিক খাদ্য আহার করিলে সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে।

এমন কোন্ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, যাহা সকল দেশে ও সকল অবস্থায় লোকের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যেকে সচরাচর আপনার দেহ ভারের শতাংশ জলশূন্য বা ৫০ ভাগের একভাগ স্বাভাবিক খাদ্য ভক্ষণ করিলে সুস্থ থাকিতে পারে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

গুরুতর পরিশ্রম কালে যবক্ষারজানের ভাগ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক, তৎসহিত অন্যান্য খাদ্যেরও পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। শ্রমবিমুখ ব্যক্তিরা মোট ১৬ আউন্স বা অর্দ্ধসের পরিমাণ জলশূন্য খাদ্য ভক্ষণ করিলেই এক প্রকার সুস্থ থাকিতে পারে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে;—

১ম। মনুষ্যের দেহভারের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্যের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক, নচেৎ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে।

২য়। মনুষ্যের পরিশ্রমের সহিত খাদ্যের পরিমাণের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, এমন কি একের বৃদ্ধি হইলে অন্যেরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, নচেৎ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ঘটনা দ্বারা ঐ পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে;—যথা, জলবায়ু, ঋতু ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি। শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশ অপেক্ষা অধিক খাদ্য ভক্ষণ করা আবশ্যক। শারীরিক যন্ত্র সকলের চঞ্চলতানুসারে খাদ্যের পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা উচিত। *

---

* Parkes' Hygiene P. 178.

১ আউন্স জলশূন্য য়্যালবুমিনেটে ৬৯ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ২৩৩ গ্রেণ অঙ্গার থাকে। ১ আউন্স জলশূন্য তৈলময় পদার্থে ৩৪৫·৬ গ্রেণ অঙ্গার থাকে, যবক্ষারজান নাই। ১ আউন্স জলশূন্য শ্বেতসারময় খাদ্যে ১৯৪·২ গ্রেণ অঙ্গার থাকে *; অর্থাৎ জলশূন্য শ্বেতসারময় পদার্থে শতকরা ৪৪ ভাগ অঙ্গার, এবং জলশূন্য য়্যানবুমিনেটে শতকরা ১৫·৫ ভাগ যবক্ষারজান ও ৫৩·৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। জলশূন্য তৈলময় খাদ্যে শতকরা ৭৯ ভাগ অঙ্গার থাকে। সুতরাং

ভাল্লাখত পরিমাণ	৪.৫ × ৬৯ = ৩১০·৫	গ্রেণ যবক্ষারজান
	৪·৫ × ২৩৩ = ১০৪৮·৫	,, অঙ্গার
অন্তিম পদার্থে	২·৯ × ৩৪৫·৬ = ১০০২·২	,, ,,
	১৪·২৫ × ১৯৪ = ২৭৬৫·৫	,, ,,

মোট প্রায় ৪৮১৬·২ গ্রেণ অঙ্গার থাকে

অতএব তাহাতে শরীরের ক্ষতি পূরণোপযোগী যবক্ষারজান ও অঙ্গার থাকে, স্বীকার করিতে হইবে।

* Parkes' Hygiene P. 181.

* The citizen who takes little or no exercise, and females generally, when not subjected to bodily labour require less nitrogenous food : the wear and tear of tissue being less with them. They consequently take less as a general rule, unless actuated by the erroneous impression that in animal food lies strength, and that the more they take the stronger they will become. From falling into this error, however, they often consume an amount of nitrogenous food which they can neither digest nor assimilate. It is the same with the indolent inhabitant of warm countries.—Nutrition in Health and Disease—Bennet—P. 62.

আমরা এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মধ্যমাকার ব্যক্তির খাদ্যের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম, এক্ষণে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীরা, কোন্ প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে ভক্ষণ করিলে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বঙ্গদেশের লোকের দৈর্ঘ্য কত, ও তাহাদের দেহ ভারই বা কত? তাহারা সচরাচর যেরূপ পরিশ্রম করে, তদ্দ্বারা কি পরিমাণে তেজ ক্ষয় হয়? এই বিষয়ে ডাক্তার লায়ন্স সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

ফরিদপুর কারাগারের সুস্থ কারাবাসীর দেহভার ও দৈর্ঘ্য।—কারাবাসীদিগের প্রথম আগমনকালে প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ও দেহভার লিখিত হয়, তন্মধ্যে ক্রমান্বয়ে (consecutive) আগত ২৫১ জন সুস্থ ব্যক্তির দৈর্ঘ্য ও দেহভার নিম্ন তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

দৈর্ঘ্য	৫′	৫′ ১″	৫′ ২″	৫′ ৩″	৫′ ৪″	৫′ ৫″	৫′ ৬″	৫′ ৭″	৫′ ৮″	৫′ ৯″	৫′ ১০
কত ব্যক্তি	১৫	২১	২৫	৩৬	৫৩	৪০	৩৬	১২	৬	৪	৩
শতকরা	৬জন	৮·৪	১০·	১৪·৪	২০·৮	১৬·	১৪·৪	৪·৮	২·৪	২·৬	১·৪
গড় দেহভার	১/৭ ৩/৫	১/৯ ১/৪	১/১১ ১/১০	১/১৩ ১/৬	১/১৪ ১/২	১/১৫ ৩/৪	১/১৭ ১/৬	১/১৯ ১/৪	১/১৯ ১/৬	১/২০	১/২২

মোট ২৫১ জনের মধ্যে ২১২ জন অর্থাৎ শতকরা ৮৪·৪ জন লোক ১ মণ দশ সের হইতে ১ মণ ২০ সের পর্য্যন্ত ভারী, ৩৬ জন অর্থাৎ শতকরা ১৪·৩ জন ১ মণ হইতে ১ মণ ১০ সের পর্য্যন্ত ভারী; কেবলমাত্র ৩ জন ১মণ ২০ সেরের অধিক ভারী। উল্লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, এ প্রদেশের অধিকাংশ লোকই প্রায় ৫′—৩″ হইতে ৫′—৫″ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লোক ৫′—৬″ অপেক্ষা অল্প দীর্ঘ; এবং অধিকাংশ লোকের দেহভার ১ মণ ১৪ সেরের অনধিক। প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক এক মণ দশ সের হইতে একমণ কুড়ি সের পর্য্যন্ত ভারী, এবং দেড়মণের অধিক ভারী লোক অতি অল্প। আরও দৃষ্ট হইয়াছে যে, শরীরের দীর্ঘতার বৃদ্ধির সহিত গুরুত্বেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।*

কারাবাসীদিগের দেহভার কারাগারের যন্ত্রণা, পরিশ্রম, ও আহার দ্বারা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু উল্লিখিত সংখ্যা সকল কয়েদীদিগের কারাগারে প্রথম প্রবেশকালে লওয়া হইয়াছিল, সুতরাং কারাগারে বাস হেতু দেহভার কম হইবার পূর্ব্বে ও শরীর সুস্থ থাকিতে থাকিতেই উক্ত পরিমাণ স্থির হইয়াছিল। তবে তাহাদের মানসিক কষ্ট থাকা প্রযুক্ত দেহের ভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইলেও হইয়া থাকিতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সাধারণ পরিশ্রমী ব্যক্তির দেহভারের শতাংশের একাংশমাত্র জলশূন্য খাদ্য, অর্থাৎ দুই অংশমাত্র কাঁচা স্বাভাবিক খাদ্য আহার করা আবশ্যক। এদেশের পক্ষে গড়ে ৫′—৪″ দীর্ঘব্যক্তির দেহভার ১।৫ সের স্বীকার করিলে, প্রত্যেকের ১৮ ছটাক স্বাভাবিক কিম্বা ৯ ছটাক জলশূন্য খাদ্য আবশ্যক বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ১¼ ছটাক যবক্ষারজানময়, ১ ছটাক তৈলময়, ৬ ছটাক শ্বেতসারময়, ও ¾ ছটাক লবণময় পদার্থ থাকা আবশ্যক।

কোন্ কোন্ খাদ্য কত পরিমাণে ভক্ষণ করা আবশ্যক, স্থির করিবার নিমিত্ত

* বীরভূমের সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার জি, সি, রায় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, তত্রত্য কারাগারের ১০০ বন্দীর মধ্যে ১জন মাত্র ৫′—৬″ এর অধিক দীর্ঘ, ও ১ মণ ১০সেরের অধিক ভারি, এবং অধিকাংশ কারাবাসীর দৈর্ঘ্য ৫′—১″ হইতে ৫′—৪″ পর্য্যন্ত ও দেহভার ১মণ ৯ সের হইতে ১মণ ১২ সের পর্য্যন্ত।

*"That in estimating the food requirements of Natives of India or what authorities state to be the requirements of Europeans, we must make allowance for difference in average weight, and that the quantity of food required by such races of the natives of India as are of low average weight is less than the quantity required by such races as are of high average weight." I. M. G. November, 1879

কতকগুলি দেশীয় খাদ্যের নাম ও গুণ বর্ণনা করা যাউক। বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্য চাউল, কয়েক প্রকার মৎস্য, দুগ্ধ আলু, বেগুণ, পটল, সিম, লাউ, কলা, চিনি বা গুড়ই প্রধান। এতদ্ব্যতীত ময়দা, মাংস, মাখন, ঘৃত ইত্যাদিও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। পার্কস্ ও লেথ্‌বি সাহেবের এবং রায় কানাইলাল দে বাহাদুরের তালিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী খাদ্যের পুষ্টিকারিতার ও উপকরণ সমূহের তালিকা প্রস্তুত হইল।

কোন্ কোন্ খাদ্যে কি কি অস্তিম পদার্থ শতকরা কতভাগ থাকে

	খাদ্যের নাম	জল	যবক্ষারজানিক	শ্বেতসার শর্করাদি		লবণ
	চাউল গড়ে	১৩	৬·৩	৭৯·৫	·৭	·৫
	দাল ঐ	১৫	২০·	৬০·		২·
১	ঐ খেসারি	১৩	২৮·	৫৬·		৩·
১	ঐ মসুর	১৫	২৪	৫৯		২·
১	ঐ মুগ	১৩	২৪	৬০		৩
১	ঐ মাসকলাই	১৩	২২	৬২		৩
১	ঐ মটর কলাই	১৫	২৩	৫৭·৪	২·১	২·৫
১	ঐ অরহর	১৬	১৯	৬২	—	৩·
৩	ময়দা (গমের)	১৫	১০·৫	৭০·৫	২·	১·৭
৩	বিলাতি রুটি	৩৭	৮.১	৫১·	১·৬	২·৩
	যব	১৫	৬·৩	৭৪·৩	২·৪	২·
৩	এরোরুট	১৮		৮২		
৩	গুড়	২৩		৭৭		
৩	চিনি (উত্তম)	৫		৯৫		
৩	মাখন	১৫		৮৩		২·
৩	পনির (Cheese)	৩৬·৮	৩৩·৫	—	২৪·৩	৫·৪
৩	উত্তম দুগ্ধ (গাভীর)	৮৬·৭	৪	৫	৩·৭	·৬
২	ঐ (গর্দ্দভীর)	৮৯·	৩·৫	৫·০	১·৮৫	·৫
৩	মৎস্য রোহিত জাতীয়	৭৭	১৬.১		৫·৫	১·৪
	ঐ সিঙ্গি, মাগুর ,,	৭৫	৯·৯		১৩·৮	১·৩
৩	ঐ বাটা, মৌবলা ,,	৭৮	১৮·১		২·৯	১·
৩	ডিম্ব গড়ে	৭৪	১৪·		১০·৫	১·
৩	উত্তম মেষ মাংস	৫৩	১২·৪		৩১·১	৩·৫
৩	গোমাংস	৭২	১৯·৩		৩·৬	৫·১
৩	পক্ষীর মাংস	৭৪	২১·		৩·৮	১·২
৩	গোল আলু	৭৫	২·১	২২	·২	·৭
৩	গাজর	৮৩	১·৩	১৪·৫	·২	১·
৩	কফিশাক	৯১	২·	৫·৮	·৫	·৭
৩	বিস্কুট (গড়ে)	৮	১৫·৬	৭৩·৪	১·৩	১·৭
২	দুগ্ধ (ছাগীর)	৮৪·৪৯	৩·৫১	৩·৬৯	৫·৬	·৬

Smith's Food P. 315. ২ Letheby on Food P. 5. Parkes' Hygiene P. 180.

কয়েকটী খাদ্য দ্রব্যে প্রতি এক আউন্সে যে পরিমাণ যবক্ষারজান, অঙ্গার, লবণ ও জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার তালিকা ডাক্তার পর্কস সাহেবের পুস্তক হইতে গৃহীত হইল।

খাদ্য * এক আউন্স	জল গ্রেণ	যবক্ষার-জান গ্রেণ	অঙ্গার গ্রেণ	লবণ গ্রেণ
চাউল	৪৩'৭	৩৫	১৭৬	২'২
বড় মটর কলাই	৬৫'৬	১৫	১৬১	১০
বিলাতি রুটী	১৭৫.	৫.৫	১১৯	৫.৬
আলু	৩২৪.	১.	৪৯.	৪.৪
মৎস্য (গড়ে)	৩৩০	১০.	৫০	৪.
মাখন উত্তম	২৬	.২	৩১৫	১১.৮
শর্করা	১৩	—	১৮৭	২.
দুগ্ধ	৩৮০	২.৭৫	৩০.৮	২.৬
মাংস	৩২৮	১০.৩৫	৬৪.	৭.
ময়দা	৬৫.৬	৭.৬	১৬৯	৭.৪
জনার ভুট্টা	৫৯	৭.	১৭৬.	৬
ডিম্ব	৩২১	৯.৩	৭১.৫	৪.৪

উল্লিখিত তালিকাদ্বয় দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, চাউলে যবক্ষারজান অপেক্ষা অঙ্গার অধিক, দাউলে চাউল অপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান ও কিঞ্চিৎ অল্প অঙ্গার আছে। সকল প্রকার দাউল পুষ্টিকর নহে। মৎস্যে অঙ্গার প্রায় নাই, যবক্ষারজান চাউল অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ অধিক। মিষ্ট দ্রব্য কেবল অঙ্গারময়। দুগ্ধে সকল প্রকার অন্তিম পদার্থই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে। চিনিতে প্রায় অঙ্গারই অধিক, যবক্ষারজান নাই। ময়দায় চাউলের দ্বিগুণ যবক্ষারজান ও প্রায় সমান অঙ্গার আছে। কপি, পুঁই, পালন ইত্যাদি শাক শতকরা ৬ ভাগ মাত্র পুষ্টিকারক দ্রব্য আছে।

* এক আউন্সে ৪৩৭'৫ গ্রেণ

এই সমুদয় খাদ্যের পুষ্টিকারিতার তারতম্য স্মরণ রাখিয়া পথ্যাপথ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এ প্রদেশের সাধারণ লোকে সচরাচর যেরূপ পরিশ্রম করে, তাহার নিমিত্ত যবক্ষারজানময় ১৪, শ্বেতসার ৬, তৈলময় ১ ও লবণময় পদার্থে ½ ছটাক পরিমিত আহার করা আবশ্যক, যেহেতু ১ আউন্স বা অর্দ্ধছটাক যবক্ষারজানময় পদার্থে ৬৯ গ্রেণ বা ৩৫ রতি যবক্ষারজান ও ও ২৩৩ গ্রেণ বা ১১৬ রতি অঙ্গার আছে; প্রত্যেক আউন্স শ্বেতসারময় পদার্থ ১৯৪ গ্রেণ অঙ্গার ও প্রত্যেক আউন্স তৈলময় পদার্থ ৩৪৫ গ্রেণ অঙ্গার আছে। উল্লিখিত নিরূপিত খাদ্যে যবক্ষারজান ২৪২, অঙ্গার ৩৮৩২ ও লবণ ৪০০ গ্রেণ থাকিবে।

আরও দৃষ্ট হইবে যে, ১মণ ৩৫ সের ভারী ইউরোপীয় পুরুষের নিমিত্ত ৩০০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৫০০ গ্রেণ অঙ্গার আবশ্যক, অর্থাৎ দেহভারের প্রত্যেক সেরের নিমিত্ত ৪ গ্রেণ বা দুই রতি যবক্ষারজান, ও ৬০ গ্রেণ বা ৩০ রতি অঙ্গার আবশ্যক। এদেশের লোকের গড় দেহভার ৫৫ সের হইলে, ৫৫ × ৪ = ২২০ গ্রেণ যবক্ষারজান, ও ৫৫ × ৬০ = ৩৩০০ বা ১৬৫০ রতি অঙ্গার আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ স্থির করা হইয়াছিল, তাহাতে ২৪২ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৮৩২ গ্রেণ অঙ্গার থাকে।

মাংস এদেশীয় লোকের নিকট বিশেষ আদরণীয় নহে। কিন্তু বাস্তবিক যে মাংস অনাবশ্যক, বা সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে মাংসের

ব্যবহার কমিয়া আসিবে, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। সত্য বটে এ পৃথিবীতে নিরামিষভুক্ ও আমিষভুক্ উভয় শ্রেণীর মনুষ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উভয় শ্রেণীর লোকেই এক প্রকার সুস্থ শরীরে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। এ দেশেও কতকগুলি হিন্দু পুরুষ ও বিধবা স্ত্রীলোক নিরামিষ ভোজন করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুষ্য কেবল উদ্ভিজ্জ ভোজন ও জলপান করিয়া প্রাণধারণ, ও কতক পরিমাণে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে। তাহার কারণ এই যে, প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদেই যবক্ষারজানময়, শ্বেতসার বা শর্করময় এবং লবণাক্ত পদার্থ অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সুতরাং নিরামিষ ভোজনেও ঐ চারি প্রকার পদার্থ ভক্ষণ করা হয়। প্রায় সকল উদ্ভিজ্জেই শ্বেতসার ও শর্করময় পদার্থের পরিমাণ অধিক, কিন্তু কতকগুলিতে যবক্ষারজানময় পদার্থও প্রচুর পরিমাণে থাকে; তন্মধ্যে গম, যব, ভুট্টা, ছোলা, মটর ও অন্যান্য দাউল, সীম, বরবটী ইত্যাদিই প্রধান। এই সমুদয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে শোণিত, মাংসপেশী, স্নায়ু ইত্যাদি দেহের উপাদান সমুদয় নির্ম্মিত বা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মাংসের অভাবে এদেশীয় লোককে অযথোচিত পরিমাণে অঙ্গারক দ্রব্য আহার করিতে হয়; মাংস ভোজন করিলে উহা ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের দন্ত ও পাকস্থলীর গঠনের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে "মিশ্রভুক্" করিয়া স্বজন করিয়াছেন। পাকস্থলীর পাচকরসের প্রধান কার্য্য এই যে, যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থকে জীর্ণ করিবে। মৎস্য বা মাংস ভোজন ব্যতিরেকে যথোচিত যবক্ষারজানময় পদার্থ উদরস্থ করিবার অন্য সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, কোন কোন ব্যক্তি মৎস্য বা মাংস না খাইয়া সুস্থ শরীরে সাংসারিক কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়েন, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। এদেশীয় হিন্দু বিধবাগণ মাংস বা মৎস্য না খাইয়াও সাংসারিক সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীলোকের যে সাংসারিক ক্রিয়া, তাহা তাঁহাদের এককালে বন্ধ হইয়া যায়। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব করণ ও স্তন্য দান দ্বারা যে কি পরিমাণে শারীরিক যন্ত্র সকলের তেজ ক্ষয় হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের যখন সেই তেজ ক্ষয় হয় না, তখন মাংসাদি খাদ্য আহার না করিলেও, বোধ হয়, তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না। আরও বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং মানসিক পরিশ্রমের নিমিত্তই মাংস বিশেষ আবশ্যক। "যাঁহারা অনুক্ষণ মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করেন মাংস তাঁহাদের পক্ষে উপকারী।" আধুনিক সভ্য জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই মাংস ভোজন প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম বলে যে জাতি উন্নত হইতেছে, ও যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব দেশের উন্নতি করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আমিষ ভক্ষণ করেন। দুগ্ধ, পনির, ডিম্ব

ইত্যাদিও আমিষ বলিয়া স্বীকার কর উচিত। অতএব মনুষ্য এককালে দুগ্ধ, ঘৃত, পনির, ডিম্ব ও মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শস্য ও আনাজ ভক্ষণ করিয়া বাস্তবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন, তাহার উত্তমরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে মাংস ভোজন নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

মাংসে যবক্ষারজানের ভাগ অধিক, শ্বেতসার নাই এবং তৈলময় পদার্থ অধিক বা অল্প পরিমাণে থাকে বলিয়া মাংস অন্নের সহিত উত্তমরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,—

খাদ্য	পরিমাণ		যবক্ষারজান	অঙ্গার
	ছটাক	আউন্স		
চাউল	৮	১৬	৫৬	২৮১৬
মাংস	৮	১৬	১৬০	১০২৪
ঘৃত	½	১	—	৩১৫
আনাজ	৪	৮	১২	১০০
	২০½	৪১	২২৮	৪২৫৫

ইহাতে যবক্ষারজান ও অঙ্গার প্রায় যথোচিত পরিমাণে থাকে। এইরূপ আহার করিলে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পাইবে না, অথচ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সমুদয় সুসম্পন্ন হইতে থাকিবে। এদেশে যেরূপ অন্নাহার পদ্ধতি আছে, তাহাতেও যবক্ষারজানময় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

বিন্ধ্যবাসিনী

(পূর্ব্বভাগ)

(১)

আর্য্যের নিবাস-ক্ষেত্র বেষ্টিয়া যখন
অনার্য্য করিত বাস পর্ব্বতে কাননে ;
লুণ্ঠিত সুযোগ দেখি আর্য্যের ভবন,
করিয়া শঙ্কিত নিত্য ঋষি তপোধনে ;

(২)

সেই কালে পঞ্চনদ-ধৌত পুণ্যস্থল
ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ পুরি' আর্য্যবাসে,
গঙ্গার প্রবাহ ধরি, পূরব অঞ্চল
হেরিয়া উর্ব্বর অতি, আর্য্যস্রোত আসে।

(৩)

শুভ্রতোয়া সরস্বতী, নীলাম্বু যমুনা,
উচ্ছ্বসিত গঙ্গাবক্ষে নীরবে যথায়
মিশিয়া পাইল আখ্যা ত্রিবেণী, ত্রিগুণা,
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি সম মিশি ত্রিধারায়,—

(৪)

সেই পুণ্যতটভূমে আর্য্য ঋষিগণ
রচিলা কুটীর আসি তপস্যার তরে;
পত্নীসহ নিত্য তথা যত তপোধন
উদাত্তাদি স্বরত্রয়ে বেদ গান করে।

(৫)

যজ্ঞ, বলি, তপস্যায়, কিম্বা বেদগানে,
রমণীর অধিকার অক্ষুণ্ণ তখন ;
প্রভাতে সায়াহ্নে তারা নিত্য সোমপানে
পুরুষের মত হ'ত সমাধি মগন।

(৬)

একদিন সন্ধ্যাকালে ঋষিপত্নীগণ
একত্রে মিলিয়া সবে সামগান করে,
বায়ুকণ্ঠ পুণ্যগীতি বহিয়া পবন
উড়িছে আনন্দে সেই সায়াহ্ন অম্বরে ;

(৭)
ত্রিস্বরে * মিলিয়া গীতি, ত্রিবেণীর মত,
সে চারু তপস্যাক্ষেত্র পরিপ্লুত করে ;
ভাবে, ভাবমগ্ন নিত্যস্নায়ী ঋষি যত,
'কাহার প্রবাহ সমধিক তাপ হরে ?'
* * * *

(৮)
সহসা থামিল গীতি অৰ্দ্ধ উচ্চারিত,
সহসা রমণীকণ্ঠে চিৎকারের ধ্বনি ;
কুটীরে যতেক ঋষি, ত্রাসে চমকিত—
কি হইল বলি সবে ছুটিল অমনি।

(৯)
যে যাহার সংগ্রহিয়ে আত্মধনুর্ব্বাণ,
সামগৃহ লক্ষ্য করি হ'ল আশুসার ;
কিন্তু হেরি শূন্য গৃহ স্তম্ভিত পরাণ,
দূরে দূরে শোনা যায় সরিছে চিৎকার।

(১০)
দূর হতে শোনা যায় নৈশ স্তব্ধতায়—
'দস্যু হস্ত হতে আজি রক্ষা কর আসি'।
উন্মত্ত হইয়া সবে বেগে ক্রোধে ধায় ;
কোথা পথ ? অন্ধকার আছে বিশ্বগ্রাসি।

(১১)
দারুণ ক্রোধের দাহে জ্বলিছে পরাণ,
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে নিরন্তর।
প্রতিজ্ঞা, যেমনে হোক্ করিবে সন্ধান ;
দিশেহারা, সংজ্ঞাহারা, হয় অগ্রসর।

(১২)
কণ্টকে আকীর্ণ পথ, বিষম বন্ধুর ;
বিশাল অরণ্য তাহে ব্যাপি' পুরোভাগে ;
কিছু নাহি গণি চিতে যায়, যতদূর
কাতর ক্রন্দনধ্বনি যায় আগে আগে।

(১৩)
দুর্গম সে বনভূমি, কোথা যাবে আর ?
ক্রমে মিলাইয়া গেল রোদনের ধ্বনি ;
ক্রোধে, ক্ষোভে, নিরুপায়ে ছাড়িল হুঙ্কার ;
লৌহের পিঞ্জরে যথা গর্জ্জে কালফণী।

(১৪)
সহসা নিশীথে একি বিপদ পড়িল,
ভাবি, বিধুনিয়া পক্ষ, ছাড়িয়া কুলায়,
তরাসে চমকি শত বিহগ উড়িল ;
মর্ম্মরি কানন, ভয়ে বনপশু ধায়।

(১৫)
কিছুক্ষণে আরবার নিঃশব্দ ধরণী ;
নিঃশব্দ কানন ; শুদ্ধ ঋষি কণ্ঠস্বর ;
যদিও বহিয়া বেগে মস্তিষ্ক ধমনী
চিন্তা আর রক্তস্রোত ছোটে তীব্রতর।

(১৬)
বিষাদপূরিত স্বরে ঋষি গ্রামপতি,
কিছু ক্ষণে কহিলেন সম্ভাষিয়া সবে ;—
"চিন্তহ উপায় উদ্ধারিতে আর্য্যসতী,
"নিশীথে অরণ্যে রহি কিবা ফল হবে ?

(১৭)
"অনার্য্য দস্যুর দল, আসি আর্য্যধামে,
"নরহত্যা, পশুহত্যা, শস্যাদি হরণ,
"কত যে করিছে নিত্য ; কিন্তু আর্য্য গ্রামে
"এ হেন বিপৎপাত হয়নি কখন।

(১৮)
"ভীরু কাপুরুষ সেই কৃষ্ণ দস্যুদল,
"জানেনা সম্মুখ যুদ্ধ কিম্বা সন্ধিনীতি,
"কেমনে বা বল তবে বর্ব্বর কবল
"হইতে উদ্ধারি নারী, এই মনে ভীতি।

(১৯)
"কেন উৰ্দ্ধে দেবগণ উন্মীলি নয়ন,
"নেহারি এ অত্যাচার এত উদাসীন ?
"নিত্যপূজি নবপুষ্প করিয়া চয়ন,
"তবুও কি অপরাধে এ দশা মলিন ?

(২০)
"দেবতা আর্য্যের বল, আর কেহ নাই ;
"খণ্ডিবে বিপদ তাঁর পূজিলে চরণ ;

* ত্রিস্বরঃ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত।

"কি হবে হেথায় তবে, চল গৃহে যাই ;
"যদিও রমণীশূন্য শ্মশান ভবন।

(২১)

"চল যাই ঘৃত কাষ্ঠ আহরি যতনে,
"ত্রিধারা সঙ্গমে করি যজ্ঞ আয়োজন ;
"তপ্ত সিকতায় বসি থাকি অনশনে ;
"দেখি তুষ্ট হয় তাহে যদি দেবগণ।"

(২২)

দলপতি, গ্রামপতি, তাঁহার আদেশে,
কি আছে, করিতে যাহা ক্ষুন্ন হবে কেহ ?
শিরোধার্য্য করি কথা ফেরে অবশেষে
বিষাদ মলিন মনে সুখহীন গেহ।

(২৩)

না রঞ্জিতে পূর্ব্বাকাশে উষার প্রভায়,
না ডুবিতে দীপ্তিগর্ব্বে তারকা উজ্জ্বল,
সমবেত যত ঋষি স্তব তমিস্রায়
ত্রিবেণী সৈকত ভূমে বিষাদ-বিহ্বল।

(২৪)

স্নান করি শুদ্ধনীরে, কুশকাষ্ঠ আনি,
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ ভক্তিপূর্ণ মনে ;
উচ্চারিলা মন্ত্রপূত দিব্য বেদ বাণী—
হোত্র-ধূম সহ স্তোত্র উঠিল গগনে।

(২৫)

গেল নিশা, গেল উষা, প্রভাত অতীত ;
ঊর্দ্ধে বর্ষে দীপ্তবহ্নি মধ্যাহ্ন তপন ;
সুতপ্ত বালুকাভূমে যজ্ঞ প্রজ্বলিত ;
ত্রিবহ্নি, ত্রিবেণীকূলে জ্বলিছে কেমন !

*   *   *   *

(২৬)

ত্রিবেণীর পরপারে সহসা হেরিলা,
চকিত বিস্মিত নেত্রে যত তপোধন,—
(যজ্ঞ পুণ্যফল যেন বিধি প্রদানিলা)
হৃতা তপস্বিনীগণ করে আগমন।

(২৭)

এত নহে দৃষ্টি ভ্রান্তি, ওই সারি সারি—
ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারিয়া পুণ্য বেদগান,
ঋষির নয়নানন্দ আসে যত নারী ;
আচম্বিতে মৃত দেহে সঞ্চারি পরাণ।

(২৮)

জানু পরশিয়া ভূমে, যুড়ি দুইকর,
বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে গায়, দেবতার জয়;
বাস্পরুদ্ধ নেত্রে হেরি ঊর্দ্ধে দিবাকর,
বরণীয় জ্যোতি তার ধ্যায় ঋষিচয়।

(২৯)

উতরি সঙ্গম বারি, ঋষিপত্নীগণ,
হোমাগ্নি বেষ্টিয়া সবে নমি দেবতায়,
ভক্তি ভরে বন্দি গ্রাম-পতির চরণ,
অধোমুখে বসে সবে তপ্ত সিকতায়।

(৩০)

বসিলা নিস্তব্ধে সবে সজল নয়নে ;
কুশ হস্তে গ্রাম-পতি দাঁড়ায়ে তথায়;
সম্ভাষিয়া আর্য্যনারী গম্ভীর বচনে
বিষাদ বারতা যত জিজ্ঞাসে সবায় ;—

(৩১)

"দেবপ্রাণ আর্য্যসতি, কহ কি কৌশলে
"কৃষ্ণ দস্যুহস্ত হ'তে পাইলে উদ্ধার ?
"দেখিতেছি ফিরে তো গো আসিলে সকলে,
"কিন্তু কোথা পুত্র বধূ রহিল আমার ?

(৩২)

"গৃহের আলোক মম, নয়নের তারা,
"সংসার যজ্ঞের সেই দীপ্ত পুণ্যফল,
"কোথা সে রহিল বল, একা, সঙ্গহারা ?
"কহ তার ঘটিয়াছে কিবা অমঙ্গল ?"

(৩৩)

ভাসিয়া নয়ন জলে, করে কর চাপি',
কহিলা করুণকণ্ঠে ধর্ম্মপত্নী তাঁর,—
কহিতে না পারে যেন উঠে বক্ষ কাঁপি—
রুদ্ধ কণ্ঠ, রুদ্ধ আঁখি বাষ্পে অনিবার ঃ—

(৩৪)

"কোথা সে জানিনা পথ, নৈশ অন্ধকারে
বহিয়া লইয়া সবে দস্যু পল্লী মাঝে,
পূরি গ্রাম ক্রুর হর্ষে পাশব চিৎকারে,
হ'ল উপস্থিত যথা দস্যুপতিরাজে।

(৩৫)

"আশীষিয়া দস্যুদলে, বর্ত্তিকা লইয়া,
একে একে হেরিলা সে আনন সবার ;
লাজে ভয়ে সংজ্ঞা যেন এল মিলাইয়া,
উদ্দেশে দেবতা-পায় যাচিনু উদ্ধার।

(৩৬)

"বিস্ময় হইল বড় যবে সে বর্ব্বর
ঋষিবর-পত্নী বলি সম্ভাষিলা মোরে ;
কি রূপে চিনিল সবে জানেন ঈশ্বর ;
সন্ধান কত না জানি রাখে দুষ্ট চোরে।

(৩৭)

"কহিলা সে :—'ঋষিপত্নী, বাসনা আমার
ছিল সুধু তব পুত্র-বধূ হরিবারে ;
কিন্তু অনুচরগণ চিনিতে তাহার
পারিবে না, তাই হেথা এনেছি সবারে।'

(৩৮)

"শুনিয়া বিষণ্ণ প্রাণে জ্বলিল অনল,
কি করিব সাধ্য নাই যুঝি তার সনে ;
তবু যেন মৃতদেহ হইল সবল,
উঠিনু বধিতে বৃথা বর্ব্বর সে জনে।

(৩৯)

"তুচ্ছ করি সে বিক্রম নিরস্ত্র নারীর,
কহিল : 'বিদায় তুমি পাইবে অচিরে ;
স্পর্শিবনা তব পুত্রবধূর শরীর,
যদিও রহিবে একা আমার মন্দিরে।

(৪০)

" 'লয়ে যাও এই বার্ত্তা, কৃষ্ণদস্যুপতি,
ফিরাইয়া দিতে পারে বন্দিনী রমণী,
বনভূমি আত্মসাৎ নাহি কর যদি,
শত গাভী, শত অশ্ব, দিবে যদি গণি।

(৪১)

" 'সঙ্গে লয়ে এক শত আর্য্য ধনুর্ব্বাণ,
সঙ্গে লয়ে বিংশখানি আর্য্যতরবারি,
আসিবে একাকী গ্রামপতির সন্তান,
বর্ষ মধ্যে এই স্থানে। নতুবা এ নারী—

(৪২)

" 'হবে মম সেবাদাসী। পথের সন্ধান
দিবনা তোমায় ; এই মম অনুচর
রাখি যথা তোমা সবে করিবে প্রয়াণ,
সেই স্থান হতে লক্ষ্যে আসিবে নগর।

(৪৩)

" 'সেই স্থানে পুত্র তব একাকী যখন
আসিবে ; দেখাতে পথ রবে মমচর ;
সত্য প্রিয় জাতি মোরা, করি না কখন
ছলনা আর্য্যের মত, যদিও বর্ব্বর।'

(৪৪)

"এত বলি চরসঙ্গে করিল বিদায় ;
নিবিড় সে বনপথে আসিনু আঁধারে।
অবশেষে উপনীত হইনু, যথায়
হেরিনু আর্য্যের গঙ্গা বহে মন্দ ধারে।

(৪৫)

"বিষাদ-বিহ্বলচিতে নদী তীর ধরি,
আসিলাম অবশেষে কহিতে সন্দেশ,
যা হয় বিহিত কর পরামর্শ করি ;
কি আছে দেবের মনে জানিনা বিশেষ।"

(৪৬)

শুনি এই বার্ত্তা, শত ঋষির কুমার
দাঁড়াইল আসি গ্রাম-পতির-নিকটে ;
কহিল :—"গ্রামের ধন রত্ন কিবা ছার
সঁপিতে কুণ্ঠিত যাহা হইব শঙ্কটে ?

(৪৭)

"এখনি সমরসজ্জা করি দলে বলে
যাইতাম দস্যুগণে করিতে সংহার,
কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট তারা ; কি হবে বিফলে
শূন্য বায়ু মাঝে অসি করিয়া প্রহার ?

(৪৮)

"প্রাণ দিয়ে যে রমণী করিতে উদ্ধার
ছিলাম প্রস্তুত মোরা ; করি অর্থ দান
মোচন করিতে তারে এখন কাহার
হইবে আপত্তি বৃথা, গণি অপমান ?

(৪৯)

"সতীর উদ্ধার তরে এই অপমান,
নিরুপায়ে, যদি মোরা না সহি এখন,
হবে কি সে আর্য্যোচিত ? কিসের সম্মান,
কলঙ্কিত হয় যদি সতীর জীবন !

(৫০)

"এ গ্রামের তুমি পতি, পিতা সবাকার ;
তোমারি সম্মানে, সুখে, সুখী মোরা ; তবে
ক্ষালিতে কলঙ্ক এরে, কি আছে ধরার—
যাহা না করিবে দান গ্রামবাসী সবে ?"

(৫১)

সাধু সাধু করি সবে উঠিল চৌদিকে ;
কিন্তু এ সাহস কি গো হইবে উচিত ?
বিশ্বাস করিয়া ধূর্ত্ত অসুর অরিকে,
যাবে কি কুমার ? চিন্তা হইল উদিত ।

(৫২)

"তোমার কি অভিমতি পুত্র প্রিয়তম ?"
জিজ্ঞাসিলা গ্রামপতি । কুমার তাঁহার
অমনি কহিলা উঠি ঃ—"স্বামীর ধরম,
সুখে দুঃখে সমভাগী হইবে দারার ।

(৫৩)

"যাইব একাকী বন পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া
যা করিবে দস্যুদল করুক আমার ;
যায় যাবে তুচ্ছ প্রাণ কর্ত্তব্য সেবিয়া,
আর্য্যের সম্বল কৃপাদৃষ্টি দেবতার ।"

(৫৪)

শুনি কহে গ্রামপতি সুগম্ভীর স্বরে ঃ—
"যাইবে কুমার স্থির বুঝিনু কথায় ;
মাসব্যাপী হবে যজ্ঞ বিদায়ের তরে,
দেব আশীর্ব্বাদ বিনা সিদ্ধি বা কোথায় ?"

(৫৫)

মন্ত্রণা করিয়া স্থির গেল সবে ঘরে ;
আরম্ভিলা মাসব্যাপী যজ্ঞ অতঃপর ;
কবে যজ্ঞ হবে শেষ, ভাবিয়া অন্তরে,
পত্নী সুবৎসল দিন গণে নিরন্তর ।

(৫৬)

মাসান্তে, সে যজ্ঞ অন্তে, যবে গ্রামপতি,
'স্বাহা' বলি শেষাহুতি দিলা হুতাশনে,
জ্বলিল না অগ্নিশিখা । 'একিরে নিয়তি !'
ভাবিয়া উঠিল কাঁপি ঋষি সেইক্ষণে ।

(৫৭)

'সচস্বা স্বস্তয়ে' বলি আহুতি আবার
প্রদানিলা ঋষিবর, জ্বলিল অনল ;
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ ; উঠিল কুমার
লভিবারে দেবাশীষ, হইয়ে চঞ্চল ।

(৫৮)

অপাংশুল যজ্ঞ পাংশু প্রদানি ললাটে,
আশীষিয়া পতিপত্নী কুমারে তখন
কহিলা ঃ—"দেখিও বাছা এ ঘোর বিভ্রাটে
ইষ্ট দেবতার নাম ভুলোনা কখন ।

(৫৯)

"যাও বৎস নিরাপদে আনিতে কান্তারে,
তুমি বীর আর্য্যকুলে, নয়ন-রঞ্জন ।"
সাশ্রুনেত্রে তার পর নেহারি কুমারে
চুম্বিয়া ললাট দেশ দিলা আলিঙ্গন !

(৬০)

বন্দিয়া দেবতাগণে, বন্দি বাপ মায়,
অস্ত্র অশ্ব গাভী লয়ে বর্ব্বরের তরে,
উদ্যুক্ত হইল যুবা যাইতে ত্বরায়
বার বার ইষ্টনাম স্মরিয়া অন্তরে ।

(৬১)

আশ্বাসিয়া বাপ মায় আশার কথায়,
তুষি প্রিয় সম্ভাষণে সহচর গণে,
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে যুবা লইল বিদায়,
করিলা মঙ্গলাচার গ্রামবাসী জনে ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। (৮)

জন্মকথা।

কপিলবাস্তুর রাজকীয় সূতিকাগারে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, খ্রীষ্টের জন্মকথায় প্রায় তাহাই প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী অধুনা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ সময়ে ত্রিলোক ব্যাপক এক মহালোক উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

"When the preceptor was born in the earth, a delightful light spread everywhere." --Lalita Vistara II 132.

"The Kshmas in the thre great chileocosms were illuminated by a brilliant light." Fa Hean. 209.

মেরীর সন্তান প্রসবকালে বৃদ্ধ যুষেফ ব্যগ্র চিত্তে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধাত্রী অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন; যখন তাঁহারা গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন, সেই সময়ে এক অতি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিলেন, যাহা কখন নয়নগোচর করেন নাই, এমন একটি আলোক গুহাকে আলোকিত করিয়া আছে। সেই আলোক দীপালোকাপেক্ষা উজ্জ্বলতর, বাতির আলোকাপেক্ষা সুমনোহর, সূর্য্যের আলোকাপেক্ষা রশ্মিরাশিময় এবং অত্যন্ত দীপ্তিকর।

"Et ecce ! replitailla erat luminibus lucernorum et candelarum fulgorem excentibus et Solari luce majoribus."

"Behold it was filled with lights, greater than the light of lamps, candles, and greater than light of the sun itself."
Jone's Canonical Authority II. 169.

খ্রীষ্টের জন্মকালে যুষেফ গুহাদ্বারে উপনীত হইয়া যে আলোক রাশি দর্শন করিলেন, বুদ্ধের সূতিকাগৃহে কি ঐরূপ আলোক দৃষ্ট হয় নাই? ঘটনাটি এক কি না সত্য বলিলে অধম কৃতার্থ হয়।

ও কথার আর আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। যুষেফের সহিত যে বৃদ্ধা ধাত্রী গুহাদ্বারে উপস্থিতা হইয়াছিলেন, ইনি কে? কিন্নরী না মায়াবিনী? কিম্বা ভীমা, বিকটলোচনা রুদ্রযোনী? আপনি আমায় বলুন বৃদ্ধা কে? আপনার কথাই স্বীকার করিলাম সে কোন হিব্রুযোষিৎ, ধাত্রী কার্য্য সম্পন্ন করিতে আসিয়াছে, বৃদ্ধা মায়াবিনী নহে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ কালে এক বৃদ্ধা উপমাতার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অভিনিষ্ক্রমণ সূত্রে বলিয়াছেন, স্বর্গাধিপতি শক্র বৃদ্ধা রূপ ধারণ করিয়া ভগবানের ধাত্রী কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, অতীত বুদ্ধের প্রসূতী তাহা সম্পন্ন করেন। ললিতবিস্তরে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার নামোল্লেখ আছে, যেহেতু বোধিসত্ত্ব মনুষ্য হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে, সুতরাং ইন্দ্র বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া ভগবানের উপমাতার কার্য্য করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধএবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রোল্লিখিত বৃদ্ধা ধাত্রীর কথাটার সামঞ্জস্য কে করিবে? বিজ্ঞ পাঠকেরা তাহার মীমাংসা করুন।

শিশুর জন্মগ্রহণ কালে স্বাভাবিক নিয়মের নানা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

"All nature seems to pause for a mighty effort."

খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ কালে সচল জলদাবলী জড়পিণ্ডবৎ শূন্য পথে নিশ্চল হইয়া রহিল। আকাশগামী বিহঙ্গকুলের গতি রোধ হইল। মেষগণ ক্রীড়া কৌতুকে বিরত হইল এবং মেষ রক্ষকেরা উহাদের উৎপীড়নে ক্ষান্ত হইল। ছাগবৎসগণ নদী ও জলাশয়ের

ধারে জলে মুখাবনত করিয়া আছে, কিন্তু জলপান করিতেছে না ইত্যাদি। (Protevangelion chap. xiii)

ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ কালে স্বাভাবিক নিয়মের ঘোরতর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

"The air seemed still and did not blow. Rivers, currents stood still and did not flow. The chariots of the sun, and the moon, and the stars and the celestial constellations stopped their courses. Fire ceased to burn. Banks and low grounds on earth all became even and level. The voices of crows, owls, vultures, wolves and jackals were no longer audible. The whole of mankind appeared to have retired from labour."

অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মকালে কপিলবাস্তু নগরে বায়ু বহে নাই বোধ হইয়াছিল। নদী যেন সরোবরের ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ অচল হইয়াছিল। অগ্নি নিস্তেজ হইয়াছিল। অসমতল স্থান সমতল হইয়াছিল, গৃধ্র, বায়স, পেচক, তরক্ষু, এবং শৃগালের রব কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। পরিশ্রান্ত মানবকুল যেন পরিশ্রম হইতে অবসর লাভ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত বহুতর অপ্রাকৃত ঘটনা হইয়াছিল। বেথ্‌লেহমে খ্রীষ্টকে দর্শনার্থ দেবগণের আগমন, নক্ষত্রের উদয় এবং পূর্ব্বদেশ হইতে জ্ঞানী লোকদিগের আগমন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিলে, বোধ হয় যেন বুদ্ধের জন্মের ঘটনাগুলি খ্রীষ্টীয় জন্ম কথায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কবে নর নারীগণ নিঃসন্দিগ্ধ প্রাণে ভগবানের পবিত্র ও পরম মঙ্গলকর নীতি পালন জন্য দিব্য চক্ষু লাভ করিবে, তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন!

বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, বুদ্ধের জন্মকালে সূতিকাগৃহে যে আলোক হইয়াছিল, সর্ব্বদা অন্ধকার-মগ্ন স্থানেও ঐ আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তৎপ্রদেশবাসীগণ ঐ আলোক দৃষ্টে বলিল, "চন্দ্র, সূর্য্য, তেজ বিরহিত আমাদের এই স্থান কিরূপে আলোকিত হইল, আমরা পরস্পর আপনাদিগকে চিনি না, নিজ হস্ত প্রসারিত করিলে দেখিতে পাই না, অদ্য আমাদের আলোক সম্পর্ক-শূন্য এই স্থানটী কি কারণে আলোকিত হইল, এ আশ্চর্য্য আলোক কোথা হইতে আসিল?"

যাঁহারা অনুমান বলে অনায়াসে আকাশপুষ্প দ্বারা রমণীয় মাল্য রচনা করেন, তাঁহারাই লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের জন্মকালে যে তারকা উদিত হইয়াছিল, উহা সেই আলোক। আমি এ সম্বন্ধে বিতর্ক করিব না, এই মাত্র বলিতেছি, যুসেফ খ্রীষ্টের জন্ম সময়ে যে মহজ্জ্যোতি সন্দর্শন করেন, তাহা কি? সূতিকাগারে বা ঐ জ্যোতি কেন? খ্রীষ্টের জন্ম সময়ে যে তারা দৃষ্ট হইয়াছিল, উহা সেই নক্ষত্রের আলোক, বলিতে পারেন না, প্রতিবাঞ্জেলিয়ন নামক খ্রীষ্টীয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের সূতিকাগৃহের আলোক সূর্য্যালোকাপেক্ষা দীপ্তিকর ছিল। যে আলোক সূর্য্যাপেক্ষা দীপ্তিকর, তাহাকে নক্ষত্রের আলোক বলিলে বক্তা বিজ্ঞ সমাজে যে উপহাসাস্পদ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই হেতু এ স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের সূতিকাগৃহে মহাতেজস্কর আলোক কোথা হইতে আসিল?

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব মর্ত্ত্যে পুনর্জ্জন্মগ্রহণার্থ স্বর্গের শ্রীগর্ভ সিংহাসন হইতে যৎকালে গাত্রোত্থান করেন, তৎকালে তাঁহার দেহ হইতে এক অদ্ভুত আলোক নিক্রান্ত হইয়া

সমস্ত ভুবন আলোকিত করিয়াছিল। ভগবানের সে আলোক সূতিকাগৃহেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

"Now the Bodhisattva, seating himself, in the presence of all the gods, on the most virtuous throne of Srigarbha, in the great tower surrounded and followed by Bodhisattvas, Devas, Nagas and Yaksas without number, issued forth from the above Tushitu. When proceeding on, he caused a light to issue forth from his person. By that most extensively spread, far expanding, unperplexed, glorious light, transcending all other light, these three thousand great thousands of regions became resplendent."

এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠকগণ খ্রীষ্টের এবং বুদ্ধের সূতিকাগৃহের আলোক দর্শন করত ভগবানকে ধন্যবাদ করুন।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৫৬)

বল্লভভট্টের আগমন।

বল্লভ ভট্টের কথা পাঠকের স্মরণ আছে। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে ইঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া নৌকাযোগে ইঁহার বাসগ্রাম আম্বলী-গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আম্বলী গ্রামের বর্ত্তমান নাম আড়াইল; এখানে বল্লভাচার্য্যের এখনও আসন আছে। বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য্য একই ব্যক্তি। ইনি বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, গুজরাটে ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখা যায়।

বল্লভভট্ট শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় নীলাচলে আসিয়া পাদ বন্দনা করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলে ভট্ট বলিতে লাগিলেন, 'বহু দিন হইতে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল; আজ তাহা পূর্ণ হওয়ায়, ধন্য হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়; দর্শনের ত কথাই নাই। কলিযুগের ধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি ভিন্ন তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাহা যখন তুমি প্রবর্ত্তন করিয়াছ, তখন তোমাতে যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি মহা প্রেমিক; যে তোমাকে দর্শন করে, সেই প্রেমসিন্ধুতে ভাসিতে থাকে।'

বল্লভ ভট্ট এই সব বিনয় বাক্য বলিলেও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান ছিল যে, তিনি যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত জানেন, তেমন কেহ জানে না; তিনি যেমন ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন কেহ পারে না। কৃষ্ণচৈতন্য ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন 'শুন ভট্ট মহামতি! আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী; ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। অদ্বৈতাচার্য্যের সমান সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা কৃষ্ণভক্ত কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গ-গুণে ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধূত মহা ভাবে উন্মত্ত ও কৃষ্ণপ্রেমের সাগর। ষড়দর্শন-বেত্তা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মহাভাগবত আর কে আছে? কৃষ্ণরসের খনি রামানন্দ রায়ের ন্যায় রসিক ভক্ত জগতে নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসে তিনি অগ্রগণ্য;

রাগাত্মিকা-ভক্তিমার্গে তাঁহার ভজন; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবলা রতিতে তাঁহার অনুরাগ। স্বরূপদামোদর মূর্ত্তিমান্ মধুর রস এবং ব্রজদেবীর কাম-গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী। হরিদাস ঠাকুর নাম-মাহাত্ম্যে অগ্রগণ্য; তিন লক্ষ নামগ্রহণ তাঁহার নিত্য ব্রত। এবং আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, জগদানন্দ, দামোদর, প্রভৃতি ভক্তগণ, কেহ গৌড়ে, কেহ উৎকলে, অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের উপায় করিতেছেন। এই সকল মহাভাগবতদিগের সঙ্গে আমার যাহা কিছু শিক্ষা।'

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ সব বৈষ্ণব কোথায় আছেন? কি প্রকারে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ এখানে, বাস করেন। সম্প্রতি রথযাত্রা দেখিতে সকলেই এ স্থানে একত্রিত হইয়াছেন। তুমি এখানেই তাঁহাদের দর্শন পাইবে?'

পর দিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে ভট্টের পরিচয় করিয়া দিলে ভট্ট বৈষ্ণবগণের তেজ ও বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন 'না জানি এ সব ভক্ত কেমন, যাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।' ইহার পর বল্লভ ভট্ট সপার্ষদে শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন ও মালা চন্দন পরাইয়া সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া ও সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইলেন এবং কতকদিন নীলাচলে বাসের পর স্বশিষ্যে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

বারান্তরে বল্লভ ভট্ট পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন 'আমি ভাগবতের এক টীকা প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি শুনিলে কৃতার্থ হই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'ভাগবতার্থ বুঝিতে আমার অধিকার নাই। আমি কেবল বসিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া থাকি? তাও সংখ্যা-নাম পূর্ণ হয় না।' ভট্ট বলিলেন, 'আমি কৃষ্ণ নামের অর্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছি; তুমি শুনিলে বুঝিতে পারিবে।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন ভিন্ন কৃষ্ণনামের অন্য অর্থে আমার অধিকার নাই।'

বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা সব 'বল্‌গু' 'ফল্‌গু'র ন্যায় হাস্যাস্পদ জানিয়া শ্রীচৈতন্য উপেক্ষা করিয়া শুনিলেন না। ভট্ট অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। অন্তরে শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার ভক্তি কিছু শিথিল হইল। শ্রীচৈতন্য বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনেন নাই, একথা শীঘ্রই নীলাচলের বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রচার হইয়া গেল। ভট্ট যেখানে যান, সেই খানেই মুখ পান না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া এক দিন গদাধর পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া মনোদুঃখ বলিতে লাগিলেন:— 'সকলেই ত আমার প্রতিকূল হইয়াছে। এক্ষণে তোমার শরণ লইতেছি। তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর; তবেই আমার লজ্জা নিবারণ হয়।' পণ্ডিত গোস্বামী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মৌনী হইয়া থাকিলেন। বল্লভ

ভট্ট জোর করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। গদাধর ভদ্রতার অনুরোধে ও তাঁহার গৌরবে নিষেধ করিতে না পারিয়া মনে মনে 'কৃষ্ণ! রক্ষা কর, এ সঙ্কটে উদ্ধার কর' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'মহাপ্রভুকে তত ভয় নাই; তিনি সব অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু বিষম তাঁহার গণের হাতে কিছুতেই রক্ষা নাই।' ফলে তাহাই হইল; গৌর ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া পণ্ডিতের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

বল্লভ ভট্ট প্রতিদিন গৌরাঙ্গসভায় যাইয়া লঘু, গুরু, সকলের সঙ্গেই বিচার তর্ক লাগাইয়া দেন। ভক্তগণ চারিদিক হইতে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া টীট্‌কারী দিতে থাকেন। ভট্ট হংসমধ্যে বকের ন্যায় বসিয়া থাকেন। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা, বলুন দেখি, জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নাম করে কেন? পতিব্রতা নারী কখন ত পতির নাম লয় না। আপনারা কৃষ্ণনাম লইয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন?' আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন 'তোমার আগে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইবে।' শ্রীচৈতন্য ভট্টকে বলিলেন 'তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ নাই। স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করা পতিব্রতার প্রধান ধর্ম্ম। পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁহার নাম লইতে। সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভক্ত নাম লইয়া থাকেন।'

বল্লভ ভট্ট নিরুত্তর হইয়া দুঃখিত মনে বাসায় আসিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'এই সভায় নিত্যই আমার কথা খণ্ডিত হয়। একদিন যদি সকলকে হারাইয়া লজ্জা দিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুখ হয়। যাহা হউক, আর একবার চেষ্টা করিব।' পরদিন সভায় যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, 'শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা অগ্রাহ্য। তাহা খণ্ডন করিয়া আমি নূতন টীকা রচনা করিয়াছি। স্বামী যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আগাগোড়ায় সামঞ্জস্য নাই। সে জন্য তাঁহার টীকা মানিতে পারি না।'

শ্রীচৈতন্য ইহা শুনিয়া বিরক্তির হাসি হাসিয়া, 'যে স্বামীকে মানে না, তাহাকে ত বেশ্যার মধ্যে গণনা করিতে হয়' বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বল্লভভট্ট স্বীয় অভিমানে বাধা পাইয়া রোষকষায়িত মনে বাসায় আসিলেন। এবং রাত্রিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'ইনি ত পূর্ব্বে প্রয়াগে আমাকে বহু কৃপা করিয়াছিলেন; আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার আশ্রমে গিয়াছিলেন; এখন কেন এত নিগ্রহ করিতেছেন?' বল্লভ ভট্ট বুদ্ধিমান্ ও ভক্ত; মনশ্চাঞ্চল্য অপনীত হইলে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন;— 'আমি জ্ঞানের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মহানুভব সাধুদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অভিমানে অন্ধ হইয়া আমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, ইহা জানাইতে গিয়াছি; জগৎপূজ্য শ্রীধরস্বামীকে অবজ্ঞা করিয়াছি; এমন কি, শ্রীচৈতন্যকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছি। এ সব অপরাধ বুঝিয়া আমাকে সংশোধন করিবার জন্যই

কি তিনি অপমান করেন নাই? ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; আমি মূর্খ, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন দূর হও অভিমান! দূর হও জ্ঞানগর্ব্ব! হায়! আমি কি ঘোর অপরাধী! ভক্তাপরাধ হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া বল্লভ ভট্ট প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্তের নিকটে আসিয়া চরণ ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া বলিলেন 'তোমার কৃপায় এখন আমার গর্ব্বান্ধকার চলিয়া গিয়াছে; কৃপা করিয়া উপদেশ দাও, যাহাতে আমার হিত হয়।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমভাবে উত্তর করিলেনঃ— 'তুমি মহাপণ্ডিত ও পরম ভাগবত। যেখানে এই উভয় গুণ থাকে, সেখানে ত গর্ব্বপর্ব্বত স্থান পায় না। তবে কেন গর্ব্বিত হইয়া শ্রীধরস্বামীকে নিন্দা করিয়াছ? শ্রীধর জগদ্‌গুরু; তাঁহার কৃপা ভিন্ন ভাগবতার্থ জ্ঞান হয় না। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যে ভাগবতের টীকা লিখিতে যাইবে, তাহার ব্যাখ্যা কেহ মানিবে না। আর শ্রীধরের অনুগত হয়ে যে অর্থ করিবে, সেই অর্থ পরম সুখদ হইবে। যাও, অভিমান পরিত্যাগ ক'রে স্বামীর অনুগত হ'য়ে টীকা লেখ গে; সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সাধু অপরাধ মহাপাপ; এ পাপ থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় না। সে অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমান চিত্তে কৃষ্ণভজন করগে; অচিরে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।'

বল্লভ ভট্ট গৌরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ও ভক্তগণের নিকট আত্মদোষ ক্ষালন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সুখ দিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সদলে পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

বল্লভ ভট্ট বালগোপালের উপাসক। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে থাকিতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি কিশোর গোপালের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন। গদাধর উত্তর করিলেন 'এ কর্ম্ম আমা হইতে হইবে না; আমি ত স্বাধীন নই। প্রভু গৌরচন্দ্র আমার পরিচালক; তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমার কোন কিছু করিবার সাধ্য নাই। তুমি যে আমার নিকট যাতায়াত কর, তাহাতেই আমি তিরস্কৃত হইয়া থাকি।'

বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলার সহায়তা করে, এ সত্য কে না স্বীকার করিবে? যেমন সনকাদিতে শান্তভাব, ধ্রুব প্রহ্লাদে দাস্যভাব, রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেমভাব অবতীর্ণ; তেমনি আবার সনকাদির শান্তভাব শাক্যসিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্যভাব যবন হরিদাসে ও রুক্মিণী সত্যভামার ভাব গদাধরপণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিতে অবতীর্ণ। পরন্তু রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই প্রেমভাব হইলেও উভয়ের প্রেমের প্রকৃতিগত তারতম্য অনেক। সত্যভামার প্রেম বাল্যস্বভাব, কুটিল; তাহা প্রণয়-কলহে ও খট্‌মটি-কোন্দলে পরিস্ফুট। জগদানন্দ এই ভাবের লোক। শ্রীচৈতন্যের সহিত তিনি অনুদিন প্রেমের ঝগরা করিয়া থাকেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ

ও প্রগাঢ়। দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ ও সহিষ্ণুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া ছাড়িয়া যাইব বলিলে রুক্মিণীর ত্রাসের সীমা ছিল না। গৌরে গদাধরের প্রেম সেই প্রকারের। শ্রীচৈতন্য পরীক্ষা করিবার জন্ম দিন কতক গদাধরের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলেন নাই। গদাধর নীরবে তাহা সহ্য করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সভায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। যে দিন বল্লভ ভট্টের বাসায় ভক্তগণের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সেদিন স্বরূপ ও জগদানন্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্য গদাধরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পথে আসিতে আসিতে স্বরূপ বলিলেন 'তোমাকে যেমন তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন; তুমি নীরবে সহ্য না করিয়া দশকথা শুনাইয়া দিলে না কেন?' গদাধর উত্তর করিলেন, 'তাও কি পারি? তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করা কি ভাল? রাগের মাথায় না হয় দু'কথা বলেছেন। ইহার পর বু'ঝে আপনিই কৃপা করিবেন।'

শ্রীচৈতন্যের সমীপে আসিয়া গদাধর রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য মধুর বচনে বলিলেন 'আমি তোমাকে কতই বলেছি; কিন্তু তুমি একটী কথারও উত্তর না দিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছ। জগদানন্দ হ'লে আমাকে কতই শুনাইয়া দিত। যাহা হউক, তোমার এই সরল সুদৃঢ় প্রেমে আমি চির-ঋণী থাকিলাম।'

গদাধরে গৌরের প্রেম দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গৌরকে 'গদাধরের প্রাণনাথ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; এবং উভয়ের নাম একত্র যোগ করিয়া 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত গদাধর ইহার পর সভক্ত গৌরচন্দ্রকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। সেইদিন গৌরের আজ্ঞায় বল্লভ ভট্ট গদাধরের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। গীত-রত্নাবলী।—তৃতীয় খণ্ড, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ।০। এই পুস্তকের অধিকাংশ সঙ্গীতই শর্ম্মার নিজের জিনিস। যে যে শক্তি থাকিলে সঙ্গীত-রচনায় পারদর্শিতা জন্মে, তাহাতে শর্ম্মা অলঙ্কৃত; তিনি একজন বিধাতার বিশ্বাসী, ভক্ত ও সাধু সন্তান; তিনি একজন সুগায়ক, তাঁহার সুকণ্ঠের ভগবদ্বিষয়ক মধুর সঙ্গীত যতবার শুনিয়াছি, ততবার মোহিত হইয়াছি; ইহার উপর তিনি একজন হৃদয়বান কবি। তিনি ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে জানেন। তাঁহার বয়সের প্রবীণতার সহিত ভক্তি বিশ্বাসের গাঢ়তা, এবং কবিত্বের মধুরতা বৃদ্ধি পাইতেছে; সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশ্বজনীন উদারতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে দেবতুল্য করিয়া তুলিয়াছে। গীতরত্নাবলী, তাঁহার এই অবস্থার ফল। এই পুস্তক যতবার পড়ি, ভক্তি বিশ্বাসে মজি;—ইহার সুললিত গীত যতবার শুনি, ক্ষণকালের জন্ম সংসারের উপরে উঠিয়া যাই। গীত-রত্নাবলীর বহু রত্ন হইতে একটী রত্ন তুলিয়া দিলাম—

থাম্বাজ—কাওয়ালি।

করহে আনন্দে জয়গান ; হয়ে এক প্রাণ।
আমরা সকলে সেই এক পিতার (মায়ের) সন্তান ॥
এক জ্ঞান এক শক্তি, এক ধর্ম্ম এক ভক্তি,
এক পথ, এক গতি, এক গম্যস্থান ;
তবে কেন ভেদ বুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান ॥
গৃহ বিবাদ অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে,
জ্বলে প্রাণ শান্তিজলে কর হে নির্ব্বাণ ;
সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান ॥
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ ॥
হরি প্রেমরসে গলে, প্রেমধামে যাই চলে,
ভাই বলে করি সবে আলিঙ্গন দান ;
যেখানে ভকতবৃন্দ, সেই খানে ভগবান ॥

এই সঙ্গীত যে সময় যে অবস্থায় রচিত হয়, আমরা সে সময় উপস্থিত থাকিয়া সে অবস্থা দেখিয়াছি। শর্ম্মার অসাধারণ শক্তি, ভাবের উদয় হইলে তিনি যে কোন সময়ে গান রচনা করিতে পারেন। এরূপ লোক এদেশে অতি অল্পই দেখা যায়। এই পুস্তকখানি সকল ভক্তের একবার পাঠ করা উচিত। অতি অমূল্য জিনিস।

২। গায়ত্রী।—উপন্যাস ; শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৲, মৈমনসিংহ দেবনিবাসে প্রাপ্তব্য। দেবেন্দ্র বাবুর এই দ্বিতীয় গ্রন্থ আমরা খুব মনোযোগ সহকারে, সাদরে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সময় বৃথা যায় নাই। দেবেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ অধিকার, তিনি অতি পরিষ্কার, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ মধুর ভাষায় এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। পড়িবার সময় ঘটনাগুলি কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয় যেন পূর্ব্ববাঙ্গালার কোন জমীদার পরিবারের সত্যকাহিনী পড়িতেছি। পুস্তকের প্রথমাংশ খুব ভাল হইয়াছে, শেষাংশ অপেক্ষাকৃত নীরস হইয়াছে। বোধ হয় যেন লেখক লিখিতে লিখিতে ভাব ভুলিয়া অন্য কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ ও লোকনাথ দুই বন্ধু। সাবিত্রী লোকনাথের স্ত্রী। ভবশঙ্কর হরিশপুরের জমীদার। গায়ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের বিধবা কন্যা। বাঙ্গলার জমীদারের অত্যাচার ; কর্ম্মচারীর কুপরামর্শে জমীদারগণ কিরূপ আত্মজ্ঞানশূন্য হন ; বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিলে তরুণী ভার্য্যার দ্বারা কিরূপে কুলধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম বিনিষ্ট হয় ; এই সকল কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। স্ত্রীর কুপরামর্শে গায়ত্রীর পিতা তাহার প্রতি যেরূপ নিদারুণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। লোকনাথ সুশিক্ষিত ব্যক্তি, ঘটনাক্রমে ঢাকা থাকা কালীন গায়ত্রীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইখানে শিবনারায়ণ গায়ত্রীর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া আত্মসংযমে অসমর্থ হন এবং পরে এই জন্যই সন্ন্যাসী হন। গায়ত্রী চিত্র পবিত্রতার মূর্ত্তি, একবারও তিনি মায়া মোহে, পাপ প্রলোভনে বিচলিতা হন নাই। গায়ত্রীর জীববনের শেষ অধ্যায় বড় তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। লোকনাথের চিত্র খুব ভালরূপ চিত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রধান দোষ এই, একক্রমে কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই, এক চিত্র শেষ হইতে না হইতে অপর চিত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে পাঠকের মনে কোন ভাব স্থায়ী রূপে মুদ্রিত হয় না। কিন্তু এ দোষ অতি সামান্য। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে অস্ফুটভাবে গ্রন্থকারের যে উজ্জ্বল

হৃদয়ের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি মনোরম, অতি সুন্দর। বুঝা যায়, তিনি একজন প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট বাঙ্গলা ভাষা অনেক প্রত্যাশা রাখে। অকপট, সরল লেখকের আদর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে। আজকাল এ দেশের অনেক লেখকই সমাজের ভয়ে, লোকের ভালবাসার খাতিরে হৃদয় চাপিয়া, ভাব ঢাকিয়া পুস্তক লিখিতেছেন। ইঁহাদের দ্বারা সমাজের যে প্রভূত অকল্যাণ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্র বাবু সেরূপ লেখক নহেন, দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। লোকের ভালবাসা ও সমাজের অত্যাচারের কথা ভুলিয়া, জনসাধারণের হিতেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা পুস্তক লিখিতে না পারেন, তাঁহাদের পুস্তক লেখা ব্যবসাদারী মাত্র। তাহাতে দেশের কোনরূপ স্থায়ী মঙ্গল নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের স্বাধীন লেখক, যাহা বুঝেন, লিখিতে কুণ্ঠিত হন না। এই জন্য, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা এদেশের প্রভূত মঙ্গল হইতেছে। স্বাধীনতা যেখানে নাই, সেখানে প্রতিভা নাই। প্রতিভা পরমুখাপেক্ষী হইতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বস্ব গেলেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ আপন স্বাধীন মত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দেখিয়া সুখী হইলাম, দেবেন্দ্র বাবুও একজন স্বাধীন লেখক। সুখী হইলাম, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের ভাব গোপন করেন নাই। তাঁহার লেখনী সার্থক, তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

৩। মায়া।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ।০। এই পুস্তকে প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিরূপে প্রবোধচন্দ্রের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তাহা সুন্দররূপ চিত্রিত হইয়াছে। পড়িয়া খুব সুখী হইলাম।

৪। দুলালী,—উপন্যাস।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ॥০। ত্রিবক্র, এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র। হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ কতদূর ঘৃণিত কাজ করিতে পারে, ত্রিবক্রের চরিত্রে তাহা উজ্জ্বলরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। অন্যের অনিষ্টের চেষ্টা করিলে নিজের কিরূপে সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। পঞ্চাননের সাহায্যে ত্রিবক্র জমীদার নরেন্দ্র নারায়ণের হুজুরে প্রবেশলাভ করেন, ক্রমে ক্রমে ত্রিবক্র নরেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রীর স্থান পাইলেন। নরেন্দ্র এখন ত্রিবক্রের হস্তে ক্রীড়নক। ত্রিবক্রের মনে যে কিছু দুরভিসন্ধি ছিল, নরেন্দ্রের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যে পঞ্চানন ত্রিবক্রকে নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, ত্রিবক্র সেই পঞ্চাননেরও সর্ব্বনাশ করে! ধর্ম্মের চক্ষে কত সয়? অবশেষে হতভাগ্য ত্রিবক্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! সে প্রায়শ্চিত্ত অতি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত! গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পাপের প্রকোপে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে থাকে, অধর্ম্মের জয় দেখিয়া অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এরূপ চিত্র জ্বলন্তরূপ দেখা যায়। ত্রিবক্রের ন্যায় কত লোক যে প্রতিদিন কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, সংখ্যা নাই। আমাদের সমাজের মধ্যে ইহারাই আবার গণ্য মান্য! হা দেশ, হা সমাজ!! টাকা যার, এ পৃথিবীর যশ, মান, সম্ভ্রম, সকলই যেন তার। যে জমীদারদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ পর্য্যুদস্ত হইতেছে, সেই জমীদারদিগের মধ্যে একজনের একখানি উৎকৃষ্ট ছবি হারাণবাবু চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট এজন্য খুব কৃতজ্ঞ। এ কাহিনী পাঠ করিয়া একজন নৃশংস ব্যক্তিরও যদি চৈতন্য হয়, হারাণ বাবুর লেখনী সার্থক হইবে। বিধাতা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

একাদশ খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা। শ্রাবণ—১৩০০।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মলিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত ;

১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩০০।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। প্রেসের দোষে শ্রাবণ মাসের নব্যভারত কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আষাঢ় মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা এই সংখ্যায় সংলগ্ন হইল।

২। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে এবং শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক আসাম ও উত্তর বাঙ্গলা অঞ্চলে নব্যভারতের মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ পূর্ব্বক, রসিদের মুড়িতে টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া, দয়া করিয়া মূল্য প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব। স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন কেহ মূল্য দিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

৩। ১২৯৯ সাল শেষ হইবার সময়ে আমরা সমস্ত গ্রাহকের নিকট স্বতন্ত্র পত্রে হিসাব পাঠাইয়াছি। অনেকে দয়া করিয়া টাকা দিয়াছেন, এবং অনেকে দিতেছেন, কিন্তু কোন পত্র refuse কোন গ্রাহক করিয়া ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন! যাঁহারা আজও আমাদের সকরুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা আর উপেক্ষা না করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

৪। মূল্য প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন।

ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা।

আগামী ২৯শে শ্রাবণ, রবিবার, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ভোটিং পেপার প্রেরিত হইয়াছে এবং কতক এতদসহ প্রেরিত হইল। সভ্যগণ যথা সময়ে ভোট পাঠাইয়া ও সভায় উপস্থিত হইয়া সভাকে বাধিত করিবেন।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (৬)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রচলিত হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যে মত-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কেবল বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে, এমন নহে, শাস্ত্রেও ঐ মত বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সকলের অবলম্বিত শাস্ত্র সকল পরস্পরের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছেন। পরস্পরের ধর্ম্মমত ও উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ভগবতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উদ্ভবকারিণী; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, বিষ্ণু হইতেই দেবগণ ও বেদের উৎপত্তি; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহাদেব; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, ব্রহ্মা হইতে মহাদেবের উৎপত্তি। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, বিষ্ণুই আদি কারণ; তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আবার কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, মহাদেবই আদি কারণ; তাঁহাদ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, মা কালীর কৃপায় বিষ্ণু পালনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন। কোন শাস্ত্র বিষ্ণুপূজা নিষেধ করিতেছেন, এবং কোন শাস্ত্র বা বিষ্ণু ভিন্ন অন্য সকল দেবতার পূজাই নিষেধ করিতেছেন। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, যাহাতে ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাই ভাগবত; সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শাস্ত্র ভাগবত, ধূর্ত্ত দুরাত্মাদিগের কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। এ স্থলে আরও কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

> সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বংহি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বৎ সমুদ্ভবাঃ।
> চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বং বৈ চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়া॥
>
> কাশীখণ্ড।

"তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভবকারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িকা।

> বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণমহ মীশান এব চ।
> কারিতা স্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
>
> মার্কণ্ডেয় পুরাণ। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী। মধুকৈটভ-বধ প্রকরণ। ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক।

"তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার), বিষ্ণুর ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে?

> "বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মণ্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তিতত্ত্বতঃ।
> নারায়ণ পরাবেদা দেবানারায়ণাঙ্গজাঃ।
>
> * * *
>
> সৃষ্টং সৃজামি সৃষ্টোঽহ মীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ।
>
> ভাগবত। ২।৫।১৪, ১৫ ও ১৭।

"ব্রহ্মণ্! বাসুদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই। নারায়ণ হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগণ নারায়ণের অঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। * * * তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি তাঁহার কটাক্ষপাতমাত্র আদেশ পাইয়া তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সমুদয় পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি।

> "অশক্তোঽহং গুণান্ বক্তুং মহাদেবস্য ধীমতঃ।
> যোঽসর্ব্বগতো দেবোন চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে॥
> ব্রহ্মা বিষ্ণু সুরেশানাং স্রষ্টা চ প্রভুরেব চ।
> ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তাযংহি দেবাউপাসতে॥
> প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
> চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভি ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
>
> * মহাভারত। অনুশাসন পর্ব্ব১৪।৩-৫।

"যিনি সর্ব্বত্রব্যাপী অথচ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর নন,

যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দেবরাজের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু এবং ব্রহ্মা অবধি পিশাচ পর্য্যন্ত দেবগণ যাঁহার উপাসনা করেন, আমি সেই ধীমান্ মহাদেবের গুণ বর্ণনে অশক্ত।

ব্রহ্মা তস্তোদর ভবস্তথাচাহং শিরোভবঃ।

মহাভারত। অনুশাসন পর্ব্ব।১৪৭।৪॥

"ব্রহ্মা কৃষ্ণের উদর হইতে উৎপন্ন হন এবং আমি (অর্থাৎ মহাদেব) তাঁহার শিরোদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করি।

ভ্রূকুটী কুটিলাৎ তস্তললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভঃ॥

বিষ্ণু পুরাণ ১।৭।১০॥

"তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) ক্রোধানলে প্রদীপ্ত ভ্রূকুটী কুটিল ললাটদেশ হইতে মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য-প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতিতদ্বশঃ।

ভাগবত। ২।৬।৩০॥

"আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) তাঁহা (অর্থাৎ বিষ্ণু) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন করিতেছি এবং মহাদের তাঁহার নিদেশক্রমে সংহার করিতেছেন।

"অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতংমাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং বিমুঞ্চতম্॥
যুবাং প্রসূতৌগাত্রাভ্যাং মম পুর্ব্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ॥
বামে পার্শ্বে চমে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ।

লিঙ্গ পুরাণ। ১৭।১-৩॥

"পরে মহাদেব বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠ! (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) আমি (নারায়ণের স্তবে) সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব; আমারে নির্ভয়ে দর্শন কর। পূর্ব্বকালে, তোমরা দুই মহাবল (পুরুষ) আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই লোক পিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগতের আত্মাস্বরূপ হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে প্রসূত হন।

"বৎস বৎস হরে বিশ্বোপালয়ৈ তচ্চরাচরম্।"

লিঙ্গ পুরাণ। ১৭।১১॥

"বৎস! বৎস! হরি! বিষ্ণু! তুমি এই চরাচর জগৎ পালন কর।

বয়সে ও সম্পর্কে ছোট হইলে যেমন ভাবে লোকে কথা বলিয়া থাকে, এ স্থলে মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি সেইরূপ বাৎসল্য ভাবে কথা বলিতেছেন।

"বেদাবিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিনা।
হরের্নামনগৃহ্নীয়াৎন স্পৃশেৎ তুলসীদলম্॥
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ।

কুলাবতী তন্ত্র।

বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসি পত্র স্পর্শ করিবে না,ও শালগ্রাম-শিলা পূজা করিবে না।

গোলোকাধিপতির্দেবী স্তুতিভক্তি পরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোক পালকঃ॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র।

"কালিকার স্তুতিভক্তি পরায়ণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, কালীপদ প্রসাদে লোকের পালন কর্ত্তা হন।

"যেঽ ন্য দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞান মোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যাংতে বৈ পাষণ্ডি নস্তথা॥
রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ স্ফাটিকাক্ষাদি ধারিণঃ।
জটিলাভস্মলিপ্তাঙ্গা স্তেবৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৪২ অধ্যায়

যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎ পূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানা দৈত্য বধোপেতংতদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌকেচিৎ দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণব মানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

স্কন্দ পুরাণ।

যে গ্রন্থেতে অনেকানেক অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। কলিযুগে বৈষ্ণবা-ভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে।

"তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদুরমতি বিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥
তস্য সর্ব্বানি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০৩ অধ্যায়।

"বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত। তাহা করিলে, দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়, তাহার সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকো বিধিঃ
তেষ্যাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনম্॥

কূর্ম্মপুরাণ ২৫ অধ্যায়।

"যাঁহারা শিব নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়।

"সৌরস্য গানপত্যস্য শৈবাদের্ভূরি মানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তেহন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ।
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্য মমেধ্যবৎ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০০ অধ্যায়।

"সৌর, গাণপত্য, শাক্ত শৈবাদির হস্তে বৈষ্ণবে অন্ন জল গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণু ভক্তে শৈবশাক্তাদির সংসর্গ করিবে না, ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনাও করিবে না। তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য।

মোহাদাঃ পুজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষাস্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥
সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবং॥
কল্পকোটী সহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৭৮ অধ্যায়।

"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্রও শিবাদির প্রসাদ সামগ্রী ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। সে নরকাগ্নিতে কোটী সহস্র কল্প দগ্ধ হয়।†

একজন সুলেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে "পুরাণ সকল পরস্পর কবির লড়াই।" একই পরমেশ্বর বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ হইয়াছেন,—যিনি বিষ্ণু,তিনিই শিব, তিনিই দুর্গা, ইহা আজ কাল অনেকে উদারতা রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই মত শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। পুরাণ সকল পাঠ করিলে ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, নিজ নিজ উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য বর্দ্ধন এবং অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য বিবিধ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। এক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, এই মত কিছুতেই রক্ষা পায় না। বহুদিন হইল, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে এই মত উড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে এ বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন; "পুরাণের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেদব্যাসকে প্রচলিত পুরাণ সকলের রচয়িতা বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না; প্রত্যুতঃ, স্বধর্ম্মানুরক্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব মতানুযায়ী স্বধর্ম্মপ্রণালী প্রচলন উদ্দেশে তাঁহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে, এইটীই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আর একরূপ প্রমাণেও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধমত, ঘোরতর নিন্দাবাদ ও বিষময় বিদ্বেষভাব প্রকাশিত রহিয়াছে যে, সে সমুদায় এক মতাবলম্বী একব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়।" অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা নিরূপণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথাটা আনুষঙ্গিকরূপে আসিয়া পড়িল। যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার একত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন,তাঁহাদের মত উদার ও অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত হইলেও উহা যে পুরাণশাস্ত্র-

† উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পুরাণ বিবরণ দেখ।

সঙ্গত নহে, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, পুরাণ সকলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবতানিন্দা এবং উপাসনা সম্বন্ধে ঘোরতর মত বিরোধের বিষয়ে অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবদুক্তিরূপে রহিয়াছে;—

যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

"যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে,আমি তাহাকে সেই প্রকারে অনুগ্রহ করি।" এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া অনেকে বলেন যে, যে ব্যক্তি সাকারভাবে পরমেশ্বরের ভজনা করে, পরমেশ্বর তাহাকে সাকার-রূপেই কৃতার্থ করেন। যাঁহারা এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সাকারবাদ সমর্থন করিতে-ছেন, তাঁহারা নিরাকার উপাসককে আক্র-মণ করেন কেন, বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি যেরূপে তাঁহার ভজনা করিতেছে, পরমেশ্বর যদি তাহাকে সেইরূপেই কৃতার্থ করেন, তাহা হইলে যিনি নিরাকার ভাবে তাঁহার ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকটে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশ হইবেন না কেন? শ্লোকটীর ঐ প্রকার অর্থ করিলে উহাদ্বারা সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ উভয়ই সমর্পিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্লোকের প্রকৃত অর্থ নহে। সকাম, নিষ্কাম এই উভয়ভাবে ভজনার কথা শ্লোকে বলা হইতেছে।*

উপসংহার।

আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সাকার ও নিরাকার এই উভয় প্রকার পদার্থ রহিয়াছে। জড় বস্তু ও জ্ঞানবস্তু বিভিন্ন লক্ষণদ্বারা আমাদিগের নিকটে পরিচিত হইতেছে। আগে নিরাকার, পরে সাকার। জ্ঞান নিরাকার। জ্ঞান আপনাকে আপনি জানে। আমরা জ্ঞানদ্বারা জড় বা সাকার পদার্থকে জানি; সুতরাং নিরাকার দ্বারা সাকার আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সাকারবাদীদিগের বিশ্বাস এই যে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠান হয়। আবার পূজা হইয়া গেলে দেবতা প্রতিমা হইতে চলিয়া যান। দেবতা প্রতিমাতে আসেন, কিয়ৎকাল থাকেন, পরে চলিয়া যান। দেবতার আবির্ভাব, অধিষ্ঠান, ও তিরোভাব কেহ স্বচক্ষে দেখিতে পান না, বিশ্বাস করেন। যদি বিশ্বাসের উপরে দেব দেবীর পূজা নির্ভর করে, তবে নিরাকার উপাসকের প্রতি আক্রমণ কেন? তোমারও বিশ্বাস, আমারও বিশ্বাস। উভয় স্থলেই বিশ্বাস। উভয়েরই অবলম্বন রহিয়াছে। উভয় স্থলে বিশ্বাস বলিয়াই কি নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাসনা তুল্য হইল? কখনই না। একটী কল্পনা ও কুসংস্কার, আর একটী সত্য। সাকারবাদী কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত প্রতিমায় কল্পিত দেবতার কল্পিত আবির্ভাব ও তিরোভাবে বিশ্বাস করেন। ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বভূতে, জলস্থলশূন্যে সেই সত্যস্বরূপ প্রাণস্বরূপ পরম দেবতার সত্তা জ্ঞান চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। এই উভয় কি সমান হইতে পারে? মনুষ্যের জড়দেহে জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। জড়দেহ চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাই; কিন্তু যে জ্ঞানবস্তুর সত্তা তাহাতে রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না। চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাই না, জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাই। মৃত দেহকে চর্ম্মচক্ষে দেখি, তাহাতে আর কিছু দেখি না।

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ-মহাশয়ের অনুবাদ দেখ।

জীবিত মনুষ্যে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা মন ও আত্মা দেখি। সেইরূপ ব্রহ্মোপাসক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। কুম্ভকারনির্ম্মিত পুত্তলিকা দেখিলে তাহার কর্ত্তা কুম্ভকারকেই স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; জগৎ দেখিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণকে কার্য্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পুত্তলিকা ও কুম্ভকার, জগৎ এবং জগদীশ্বর এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কোন ব্যক্তির ছবি দেখিলে তাহাকে স্মরণ হয় সত্য; কিন্তু সেই অনন্ত পরাৎপর পুরুষের ছবি কোথায়? কোন্ শিল্পী অনন্তের ছবি চিত্রিত করিতে পারে? মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব কথা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন, ইহা একান্ত অযুক্ত কথা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু আত্মস্বরূপ বিনাশে তাঁহার ক্ষমতা আছে, এমন কথা বলিলে নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। তিনি বিশ্বরূপ; সকলই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; সুতরাং জ্ঞানীগণ এক ভাবে বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব তাঁহার রূপ প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু আবার ইহাও বলিয়াছেন এ সকলের কিছুই তিনি নহেন। জগৎ অসত্য; অনিত্য। তিনি সত্য, নিত্য। জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; তিনি সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। তিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের অতীত; অথচ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ। সাকার চিন্তা করিতে করিতে নিরাকার উপাসনার অভ্যাস জন্মে; এবং অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে আলোক দেখিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, এ উভয়ই সমান কথা। যে সকল বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহাদের মধ্যে একটি অভ্যাস করিলে অপরটিকে জানিবার ও আয়ত্ব করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, ইহাই অভ্যাসের নিয়ম। প্রচলিত পৌত্তলিকতা ব্রহ্মোপাসনার নামান্তর মাত্র, এ কথা সত্য নয়। প্রতিমাতে অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া পৌত্তলিক উহার পূজা করেন, ইহা অমূলক বাক্য। স্বভাবতঃ ভৌতিক পূজা ও প্রতিমা পূজার উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি রূপক কল্পনা মাত্র। রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উপকার আছে।

অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব; সুতরাং পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। অনন্তকে আমরা জানি, অথচ জানি না। মনুষ্য অনন্তের পূজায় সমর্থ। পুত্তলিকাকে পরমেশ্বরের পূজার চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিলে, চিহ্নই ক্রমে আসল বস্তুর স্থান অধিকার করে। নিরাকার পরমেশ্বর সম্বন্ধে মুখ চরণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কোন দোষ নাই। পৌত্তলিকতাদ্বারা মানবাত্মার জ্ঞান ও ভাব, এই উভয়ের কিছুরই পূর্ণ তৃপ্তি হয় না।

মূর্ত্তি পূজা কল্পনামাত্র। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে, নিরাকার পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পূজা কর। এইরূপে সাকার অবলম্বনে নিরাকার উপাসনা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সাধকেরা ইহা করিয়া থাকেন। এস্থলেই সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য।

প্রিয়তমকে প্রাণের ভিতরে রাখিতে

ইচ্ছা হয়। পুত্তলিকা বাহিরের বস্তু। চৈতন্যস্বরূপ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণের ভিতরে। সেখানেই তাঁহার প্রকৃত পূজা। সাধকের উচ্চ অবস্থায় অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। তখন সকলই পরমেশ্বরের প্রকাশ।

পরিত্রাণ কাহারও একচেটিয়া নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে জীব মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে শত কণ্ঠে উপদেশ দান করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, ইহা প্রাচীন মহর্ষিগণের সুস্পষ্ট উপদেশ। আমরা সেই মহর্ষিগণের উপদেশ না বুঝিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পরিত্রাণের পথ ছাড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছি। ভারতে আবার সুদিন আসুক। ঋষিদিগের, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের জয় পতাকা ভারতবাসীর গৃহে গৃহে উড্ডীন হউক। কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বিদূরিত হউক। হে সত্য পুরুষ! ভারতবাসীর হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক! পবিত্র ব্রহ্মনাম ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকুক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্য।

রোমীয় সাহিত্যে ওভিডের অতুল প্রতিপত্তি। ইহার কারণ, তাঁহার অনুপম কাব্য "মেটামর-ফোসিস্"। বস্তুতঃ বর্ণনার সজীবতায় ও ওজস্বিতায়, মাধুর্য্যে, রচনা-কৌশলে ও কল্পনার দুরগামীতায়, শুধু রোমীয় সাহিত্যে কেন, ইহা সমগ্র কাব্য-জগতে দুর্লভ। সকল দেশের পুরাণ ও ধর্ম্মেতিহাস যেরূপ মনোহর কবিকল্পনা ও দুর্ব্বোধ রহস্যে জটিল, বলা বাহুল্য, রোমীয় পুরাণও তদ্রূপ। এই পুরাণ কাহিনীর (Mythology) উপাখ্যান ভাগের উপরই এই কাব্যের ভিত্তি; ঐ কাহিনীগুলির মূল ঘটনা লইয়া পত্রাকারে এই কাব্য রচিত। পত্রগুলি কাব্যের বিভিন্না নায়িকা কর্ত্তৃক লিখিত, এরূপ কল্পিত হইয়াছে। কোন পত্রে প্রেতপতি প্লুটোর রাজ্য "হেডিস" হইতে, বিখ্যাত ট্রয়যুদ্ধের মূল কারণ লোক-ললামভূতা হেলেন নিজ দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন, কোন পত্রে সুধী রাজা ইউলিসিস্ "শ্রান্তিহীন কর্ম্ম সুখ তরে" লালায়িত হইয়া তাঁহার তাৎকালিক অলস জীবনের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, কোন পত্রে বা প্যারিস-পরিত্যক্তা বিয়োগ-বিধুরা দেবকন্যা ইনোনি নিজ শোকগাথায় আইডার শৈলমালা বিগলিত করিতেছেন ও পরে তাঁহার সপত্নী ভাগ্যবতী হেলেনকে অভিশাপ দিয়া পারিসের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এইরূপ পত্রের পর পত্রে এই কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। ইউরোপে অনেক পরবর্ত্তী কবিও এই কাব্যের ছায়া লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের সম্প্রতি লোকান্তরিত রাজ-কবি টেনিসনের নাম উল্লেখ যোগ্য।

আমাদের দেশে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও এই কাব্যের অনুকরণে এক কাব্যরত্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে

প্রদান করিয়াছেন। সেই কাব্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য বিষয়। অনুকরণ বলিয়া যে এ কাব্যের মর্য্যাদা কমিয়াছে, তাহা আমরা বলিতেছি না। এই কথার সমর্থনে বলা যাইতে পারে, জগতের সাহিত্যে দুই খানি অতুলনীয় কাব্য, একখানি অন্য খানির অনুকরণ! (১) অনুকরণ, প্রতিভা-শালী লেখকের হস্তে অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, কোনও বহুকাল-বিস্মৃত প্রবাদ বা কোনও তৃতীয় শ্রেণীর কবির অপাঠ্য কবিতার উপাখ্যান ভাগ লইয়া, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটক-গুলি প্লুটার্কের "জীবনী" অবলম্বনে মহা-কবি সেক্ষপিয়র স্বীয় অমর নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌতুহলী প্রত্নতত্ত্বান্বেষী বা নীরস ঐতিহাসিক ছাড়া প্লুটার্কের চর্চ্চা আর বড় কেহ করেন না। এই অর্থে সেক্ষপিয়র অমর, এবং প্লুটার্ক বহুদিন মৃত। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্কট, লিটন, ডিকেন্স প্রভৃতি, ও জগতের সাহি-ত্যে যাঁহারা লীলাময়ী প্রতিভা-বলে ঐতি-হাসিক ও সমালোচকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করি-য়াছেন, সেই মহাত্মাদের সম্বন্ধেও একথা বেশ খাটে। তবে অনুকরণের দোষও আছে। সে দোষ যে বীরাঙ্গনা কাব্যে নাই, একথা বলি না। হয়ত এমন হয়, যে কাব্যের অনুচিকীর্ষু কবি স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন, সেই "সময়"টা অনুকৃত কাব্যে ঢুকাইলে অসংলগ্ন (Anachronism)—হয়। হয়ত এরূপ ঘটে, মূল কবি বা লেখক স্বীয় গ্রন্থে নায়ক নায়িকার যে উক্তি, বা তাঁহা-দের কথোপকথনের ভাব, বা তাঁহাদের যেরূপ পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, অনুকারী কবিও অনুকরণ করিতে গিয়া, আপনার নায়ক-নায়িকাকে সেই পরিচ্ছদ ও সেই ভাষা দিয়া এরূপ দোষে পতিত হইয়াছেন। যাঁহার কাব্য এই প্রবন্ধের সমালোচ্য, তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিয়া আমাদের এইরূপ ধারণা হয়। ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদিও কবি হিন্দু-কুলসূর্য্য রামচন্দ্রকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন, কিন্তু সেই পরিচ্ছদ হইতে কোট-প্যাণ্টালুন যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। (২) এরূপ হইতেই পারে, কারণ তখন হয়ত কবি মিল্টনের "সয়তান-পক্ষপাতিত্ব" স্মরণ করি-তেছিলেন। এই দোষ বীরাঙ্গনা-কাব্যেরও উপাখ্যান ভাগ ও রচনা-কৌশলে পাওয়া যায়। ওভিড যখন রোমীয় সাহিত্যে অভ্যুদিত হয়েন, তখন রোম সাম্রাজ্যের বড় সুখ-সমৃদ্ধির সময়। তখন সাম্রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী অগষ্টাস্ সীজর্ সিংহাসনে সমাসীন। সাহিত্য, বাণিজ্য, ধনাগম, সকলদিকেই রোমসাম্রাজ্য তখন চরমসীমায় উপস্থিত। তখন লিভি-প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দ, বর্জ্জিল-হোরেস্-ওভিড প্রমুখ কবিগণ রোমীয় সাহিত্য সমলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন; এগ্রিপা-প্রমুখ সুযোগ্য সৈন্যা-ধ্যক্ষ সমূহে রাজ্যের সৈন্যবল পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাহিত্য যদি সামরিক সমা-জের উন্নতি বা অবনতির নিদর্শন হয়, তবে ওভিডের নায়ক-নায়িকাদের পত্র লিখি-

(১) মহাভারত যে রামায়ণের অনুকরণ, তাহা ইউরোপে অধ্যাপক মোক্ষমুলর, ল্যাসেন, উইলসন আদিও এদেশে বঙ্কিমবাবু পূর্ণবাবু প্রভৃতি বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, একথা পাঠকের অবিদিত নহে—লেখক।

(২) তাঁহার "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" দ্রষ্টব্য।

বার ক্ষমতা কল্পনা করা অন্যায় বোধ হয় না, কারণ কাব্যের বর্ণনীয় সময়ে ও তাহার বহুপূর্ব্বে, স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপিও অতি দূরদর্শী সমালোচক Dr. Bayne, Steadman প্রভৃতিও ইহাতে কবিকে দোষ দিয়া থাকেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকারা যে এরূপ কল্পিত হইয়াছে,ইহা উপাখ্যান ভাগের দোষ বলিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল ও মালতীমাধব ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে—যে সাহিত্য হইতেও যে সব চরিত্রের অনুকরণে কবি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন, সে সাহিত্যে কোন নায়িকা পত্র লেখে, এরূপ বোধ হয় না। কাব্যের শীর্ষদেশে সাহিত্য-দর্পণ হইতে কবি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থিত হয় না, কারণ যে "সময়" কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়, সে সময়ের তুলনায় সাহিত্যদর্পণ সম্পূর্ণ আধুনিক বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না। এই জন্য উপাখ্যান ভাগের রচনা-কৌশলে আমরা দোষারোপ করিতেছি।

কিন্তু কাব্যের উপাখ্যান ভাগ ছাড়িয়া যখন চরিত্র-চিত্রনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন কবির প্রতিভার অলৌকিকী ক্ষমতা আমাদের চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যদিও কাব্যের সকল নায়িকা চরিত্র কবির মূল সৃষ্টি নহে, তথাপি যেমন বিশাল প্রকৃতি-রাজ্যের অপূর্ব্ব কুহকী বহুরূপী যে স্থান দিয়া গমন করে, সেইরূপ বর্ণ ধারণ করে, এক মূলচরিত্রও বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া বিভিন্নাকার ধারণ করে, কারণ কাব্যগত নায়ক নায়িকাচরিত্র এক হইলেও, সকল কবির প্রতিভার মূলতত্ত্ব এক নহে। জগতের সাহিত্যালোচনায় সমালোচকেরা এই তত্ত্বেই উপনীত হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাব্যের শকুন্তলা চিত্রের আলোচনা করিব। এই চরিত্রের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যাস—কিন্তু আর দুইজন প্রতিভাশালী কবি এই চরিত্র নিজ-কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; একজন সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাস; অপর বঙ্গের কবিবর মধুসূদন। দুইজনের চিত্রই মূল সৃষ্টিকারের চিত্র হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু কবিত্রয়-বর্ণিত তিনটি চিত্রই, এক হইয়াও, প্রতিভাবৈচিত্র্যে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাসের চিত্র মধুসূদনের চিত্র হইতে যত বিভিন্ন, কালিদাসের চিত্র হইতে কিন্তু তত নহে। ব্যাসের শকুন্তলা মুখরা, গর্ব্বিতা; প্রেমিকা হইলেও, সেই প্রেমে মহত্ত্ব বা ঔদার্য্য কিছুই নাই। এই শকুন্তলা সরলা ঋষিকুমারী হইলেও, সংসারাভিজ্ঞা। রাজসভায় তাহার ব্যবহার অভদ্রোচিত ও সামান্যা নারীর ন্যায়। ব্যাস-বর্ণিত শকুন্তলা বায়রণের নায়িকাগুলির ন্যায়, ও রবীন্দ্র-নাথের বিক্রম-চরিত্রের ন্যায়। যখন ভালবাসে, তখন পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ভুলিয়া ভালবাসে, কিন্তু প্রেমের পাত্র যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও অনুচিত কার্য্য করিয়া তাহার বিষ নয়নে পতিত হয়, তবে সে ভালবাসা ঘোরা দানবীর ঘৃণায় পরিণত হয়। ইহা তেজস্বিনী নারী প্রকৃতি হইতে পারে, কিন্তু মহীয়সী, সরলা, প্রেম-সর্ব্বস্বা সংসারানভিজ্ঞা ঋষিকুমারী চিত্র নহে। কালিদাস-বর্ণিত শকুন্তলা চরিত্র আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি, এখানে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, কালিদাসের শকুন্তলা চিত্র আদর্শ করিয়া সম্ভবতঃ আমাদের বঙ্গীয় কবি নিজ নায়িকাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। উভয় কবির চিত্র দুইটি প্রায় এক হইয়াছে—সম্পূর্ণ

রূপে নহে। কালিদাসের শকুন্তলা সরলা, পতিপ্রাণা অথচ মহীয়সী, শম-প্রধানা, মনে হয় যেন তপোধন কন্বকর্তৃক লালিত পালিত হইলেও অগ্নিগর্ভ শমী বৃক্ষের ন্যায় ক্ষত্রিয় রমণীর তেজঃ তাঁহাতে অন্তর্নিহিত। তাঁহার প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক ব্যবহারে, বিশেষতঃ রাজসভায় এই মহত্ত্ব ও তেজ সম্যক প্রকাশিত। রাজা যখন তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন শকুন্তলার, রাজার জন্য যত দুঃখ, নিজের জন্য তত নহে, —কারণ তাঁহার বিশ্বাস, পরিণীতা পূর্ণগর্ভা পত্নীকে সভামধ্যে কুবাক্য বলিয়া রাজা ক্ষত্রিয় বীরোচিত ও রাজোচিত ব্যবহার করেন নাই। দুষ্মন্ত যে বিনাদোষে, প্রকাশ্য রাজসভা মাঝে, পারিষদগণের সম্মুখে শকুন্তলার সতীত্বে সন্দেহ করিলেন, এই জন্য রাজার উপর তাঁহার বড় ক্রোধ হইল—নির্দ্দোষা সাধুর যেমন চৌর্য্যাপবাদে ক্রোধোৎপত্তি হয়। কবি মধুসূদনও এইরূপ চিত্র করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের অতুলনীয় চিত্রের সমক্ষে সে চিত্র তত ভাস্বর নহে। কবি মাইকেলও তাঁহার শকুন্তলাকে প্রেম-প্রাণা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে প্রেমে ধৈর্য্যবল নাই—যাহাতে প্রেমের অর্দ্ধেক মহত্ত্ব। এজন্য বিয়োগ বিধুরা বালা "দূর বনে পবস্বননে" "মদকলকরী" বোধ, প্রতি বৃক্ষপত্র মর্ম্মরে প্রিয়ের আগমনবার্ত্তা, "আকাশে ধূলিরাশি" সমুত্থিত দেখিলে দুষ্মন্তের সেনাগমের আশায় বুক বাঁধিয়া, শেষে হতাশ হইয়া ক্রন্দন করেন। এইরূপ মিলন-ব্যাকুলতা কবি মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা চরিত্রে দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে চরিত্র যে মহত্ত্ব ও তেজে বিজড়িত, শকুন্তলার তাঁহার [illegible] প্রিয় কর্তৃক উপেক্ষিত হন, এই ভয়েই, আহা, কোমলহৃদয়া বালিকা মৃতপ্রায়। তবে একথা আমরা বলিব যে, আলঙ্কারিক নির্দ্ধারিত (৪) "মুগ্ধা নায়িকার" লক্ষণ মাইকেলের শকুন্তলা যতটা সার্থক করিয়াছেন—কালিদাসের সেরূপ নহে।

দ্বিতীয়, তারা-চরিত্র। পুরাণের একটী অশ্লীল উপাখ্যান লইয়া এ পত্র লিখিত। অন্যে যে রূপ মনে করুন, আমরা এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সমর্থন করিতে পারিব না। আমরা ইহাকে কোন দুশ্চরিত্রা রমণীর কু-প্রণয়-পত্র বলিব। জানি না, এই পৌরাণিক উপাখ্যানে কোন্ আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত আছে। সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—"আর্য্যামি"-রোগগ্রস্ত মহাশয়েরা তাহা করিবেন। আমরা সৎসাহিত্যে কুরুচির সমর্থক নহি। এ পত্রে স্থানে স্থানে ভাষার প্রাঞ্জলতার অভাব। ছেকানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, ইত্যাদির ব্যবহার কালিদাস, জয়দেব ও শ্রীহর্ষাদির গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ইংরাজ-কবি Tennyson যেমন বাক্যানুপ্রাসের সুন্দর ব্যবহার করিয়াছেন, (বিশেষতঃ তাঁহার Maud এ), সেরূপ আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমাদের বঙ্গকবি এই বাক্যানুপ্রাসের অস্থানে ব্যবহার, দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ এবং অলস বাক্‌ছলের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, এই পত্রের স্থানে স্থানে (এবং অন্যত্রও) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষার প্রাঞ্জলতা নষ্ট করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থানে বলা অন্যায় হইবে না, বোধ হয়, ভারত-

(৪) "প্রথম যৌবনাবতীর্ণা রতৌ বামা
কথিতা মৃদুশ্চমানে সা নারী মুগ্ধেতি।"
ইতি কাব্যপ্রকাশে।

চন্দ্র ও শ্রীহর্ষাদির কবিতারও ইহাই প্রধান দোষ। এই পত্রের আর একটী দোষ উল্লেখযোগ্য। তারার উপাখ্যান পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবি যথাযথ পুরাণের অনুসরণ না করিয়া "কালানৌচিত্য দোষে" * পতিত হইয়াছেন। তারার সহিত ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত হওয়াতে দেবগুরু বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র কলঙ্কী হইয়াছিলেন,ইহাই পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু সমালোচ্য পত্রে তারা এই ঘটনার পূর্ব্বেই চন্দ্রকে "কলঙ্কী" ও "তারানাথ" সম্বোধন করিয়া উক্ত দোষ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাষার মাধুর্য্য ও কল্পনার দুরগামীতা এই পত্রের প্রশংসনীয় বিষয়,কিন্তু ইহাতে কবির অন্তর্দৃষ্টির অভাব।

রুক্মিণীর পত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, কারণ সকল চরিত্র বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার স্থান ও অবসর আমাদের হইবে না। তবে তারা ও রুক্মিণী চরিত্র তুলনা করিলে আমাদের পূর্ব্বের কথা আরও স্পষ্ট হইবে। উভয়ের বস্তুগত প্রার্থনা স্থূলতঃ এক কিন্তু চরিত্রগত বিভিন্নতায় সে প্রার্থনা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। রুক্মিণী পতিব্রতা—স্বপ্নে একবার যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, পাছে তাঁহাকে ছাড়িয়া, গুরুজনবর্গ কর্ত্তৃক চেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে বিবাহিত হইয়া মানসিক ব্যভিচারে পতিতা হন, সেই ভয়ে এই পত্রে তাঁহার করুণ মর্ম্মোক্তি। সতী তজ্জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা—সমস্ত পত্রখানিতে কবি তাঁহার নায়িকার এই ভাব জাগাইতে বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। রুক্মিণী অসামান্যা রূপসী—ইহা আমাদের পুরাণের ধারণা ছাড়া পত্র পাঠেও বেশ বোধ হয়, তথাপি রুক্মিণীর আকুলতায় স্বীয় অলৌকিক রূপের প্রতি কটাক্ষ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এই স্থানে তারার সহিত রুক্মিণীর প্রধান প্রভেদ। এই প্রভেদ এই সতী ও অসতীর চরিত্র মাত্রেই অন্তর্নিহিত। তারা রূপসী, তাহার "এ বর-বরণ মম কালি অভিমানে" ইত্যাদি উক্তিতে স্পষ্ট ব্যক্ত। সে সেই 'রূপহার' চন্দ্রকে উপহার দিবে, কারণ তিনিই অতুলনীয় রূপে তাহার যোগ্য নায়ক। ইহা ব্যভিচারিণীর রূপজ মোহ। ইহাতে পবিত্রতা, গভীরতা বা অন্তর্দৃষ্টি কিছুই নাই। কুরুচির ভয়ে আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারিব না। এই কাব্যে কেবল শকুন্তলা চরিত্রের সহিত রুক্মিণী চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে,তবে পূর্ব্বোক্ত চরিত্র শেষোক্তের ন্যায় তত মহত্বপূর্ণ নহে।

চতুর্থ পত্রে কৈকেয়ী চিত্র বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে, কবির অন্যান্য অনুকৃত চরিত্রের মত ইহা স্বতন্ত্র নহে,ইহাই বিশেষত্ব। বাল্মীকির কৈকেয়ীতে আর মধুসূদনের কৈকেয়ীতে বড় একটা প্রভেদ নাই। কবির অন্যান্য কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের কথা বলিলে একথা আরও স্পষ্ট হইবে বোধ হয়। "মেঘনাদ বধে" রাম,লক্ষ্মণ,বিভীষণ, প্রমীলা, হনুমান প্রভৃতির চিত্র, একটিও ঠিক বাল্মীকির চিত্রের মত নহে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবুর মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বাল্মীকি চিত্রিত চরিত্রের ন্যায় কবি মধুসূদনের কৈকেয়ী চরিত্রেও সেই কু-উচ্চাভিলাষ, সেই নিষ্ঠুরতা ও কাপট্যতা, সেই রাক্ষসী প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। এই পত্রের ভাষায় কবি বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। [illegible] বিষয়োচিত ও সময়ো-

* Anachronism; শ্রীযুক্ত লালমোহন শর্ম্মা সঙ্কলিত অলঙ্কার গ্রন্থে এই শব্দটী পাইলাম।

চিত হইয়াছে। আমাদের কাব্যামোদী পাঠকগণের সম্ভবতঃ কণ্ঠস্থ থাকিলেও এই-খানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী। দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি।'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ ঘোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে ;
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে তাপসে,
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।'
পুষি শারি শুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ ঘোর দুঃখের কথা দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা তবে দিব দোঁহে ছাড়ি,
অরণ্যে গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে
'পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুল পতি।' ইত্যাদি—

আবার কৈকেয়ীর শেষোক্তিতে তাহার চরিত্র কেমন ব্যক্ত হইয়াছে,—

পিতৃ মাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা,
মাতা মহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে
পতিপদগতা সদা পতিব্রতা দাসী,
বিচার করুন ধর্ম্ম, ধর্ম্ম রীতিমতে।

ইংরাজ কবি Gray, Dryden এর কবিত্বের কথায় বলিয়াছিলেন—"Words that breathe and thoughts that burn"। এই পত্র সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। পত্রখানা শেষ করিয়া মনে হয়, যেন একটী রূপবতী, ক্রুদ্ধা, প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া গর্ব্ব ও ঘৃণামিশ্রিত তীব্রস্বরে ঐ কথাগুলি বলিয়া গেল—যতক্ষণ বলিতেছিল, ততক্ষণ যেন তার বিস্ফারিত নয়নযুগল অগ্নি-বর্ষণ করিয়াছিল।

এই পত্রের স্থানে স্থানে রুচি দুষ্ট। দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, কবির ইহা সাধারণ দোষ।

শূর্পনখা পত্রের বিশেষ সমালোচনা করিব না, কারণ ইহাও রুচিদুষ্ট। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, কবি ওভিডের অনুকরণে পুরাণের এরূপ অশ্লীল কাহিনী না লইলেও পারিতেন। ওভিডের রুচি দুষ্ট হইলেও মার্জ্জনীয়, কারণ সে সময় এই সভ্যতালোক-দীপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে নিশ্চয় স্বতন্ত্র-তর। সুরুচিসম্পন্ন ইংরাজ কবি টেনিসনও ওভিডের অনুকরণ করিয়া অশ্লীলতা দোষে পতিত হইয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকি, যাঁহার উপাখ্যান আমাদের কবি অনুসরণ করিয়াছেন, ও যাঁহাতে ব্যাসের ন্যায় অশ্লীলতা দোষ প্রায় দেখা যায় না, তাঁহাকেও শূর্পনখা চরিত্র অবতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ কুরুচির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এরূপ স্থলেও, মাইকেল কবির এরূপ অশ্লীল কাহিনী অবলম্বন করায় কাব্যের উপাখ্যান ভাগে অবশ্য দোষ আসিয়াছে ; এবং সত্যানুরোধে ইহাও বলিব, ভট্টিকার শূর্পনখা চিত্রে যে অশ্লীলতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় এ অশ্লীলতা কিছুই নহে। আর একটী কথা এ ক্ষেত্রে বলা উচিত। কবি তাঁহার স্বভাবিক রাক্ষস-পক্ষপাতীতায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে শূর্পনখা চরিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নতাকারে প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই পত্রিকার সূচনায় একথা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা শূর্পনখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।" এই অন্যায় পক্ষপাত

তাঁহার কাব্যের দোষ। এবিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর মত আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বাল্মিকী যে রাবণের পরিবারবর্গকে বীভৎস রসে বর্ণনা ও অন্তিমে তাহাদের সবংশে উচ্ছেদ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে স্ব-কাব্যে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের বিনাশ দেখাইয়াছেন মাত্র—তাহার অন্য কোন অর্থ ছিল না। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, রামায়ণ কেবল বহির্জগতের চিত্র নহে, অন্তর্জগতেরও চিত্র। যুদ্ধে অশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রহীন, রাক্ষস সেনা তুলনায় মুষ্টিমেয় বানর সৈন্স ও সহোদরমাত্র সহায় রামচন্দ্রের অনধিগম্য রাক্ষসকুল ধ্বংস করা কেবল অন্তর্জগতেই সম্ভব। পুণ্যের অভ্যুদয়ে পাপ কিরূপ সমূলে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য হৃদয়ের এই আধ্যাত্মিক রহস্য মহাকবি বাল্মীকির কাব্যে নিহিত, এরূপ পূর্ব্বোক্ত সমালোচকদের বিশ্বাস। * এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বের যুক্তি আরও সমর্থিত হইল। যদিও সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ন্যায় অন্যায়ের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হয়, সত্য অসত্যের নিকট মস্তকাবনত করে, ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা শত রূপে পীড়িত হয়, তথাপি অধর্ম্মের গৌরবে কোন লাভ নাই, সম্যক হানি আছে, এবং ইহাতে কাব্যের সদুদ্দেশ্য বিফল হয়। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা যাহাকে Poetical Justice বলেন, এই কাব্যে সেই Poetical Justice অর্থাৎ কবির ন্যায় বিচার হয় নাই। বিখ্যাত আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট "কাব্যং যশসে" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ন্যায় বুদ্ধি সাধনের প্রয়োজনীয়তায় লিখিয়াছেন "রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।" সে যাহা হউক, বাল্মীকি চিত্রিত শূর্পণখার চিত্রে মনে বীভৎস রসেরই উদ্রেক হয়, কারণ পাপিষ্ঠা মায়াবিনী নিশাচরীর কুৎসিৎ ব্যবহারে পাঠকের মনে ঘৃণোৎপত্তি করাই কবির অভিপ্রেত। কবি যদিও তাহাকে রূপসী শ্রেষ্ঠার আকার ধারণে সমর্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তাহার পূর্ব্বের বর্ণনা বশতঃ আমরা তাহার কদাকার বিস্মৃত হই না। ভট্টিকারের শূর্পনখার ন্যায় বঙ্গকবির শূর্পনখায় একটু উন্নতি থাকিলেও অশ্লীলতার স্পর্শে সে টুকু নষ্ট হইয়াছে।

* ১২৯৪ সালের "বিভায়" শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "মহাকাব্যের পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

বর্ণনীয় কাব্যে শূর্পনখার সহিত আর দুইটী চরিত্রের মিল আছে—সে দুইটী তারা ও উর্ব্বশী। এ তিনটী চরিত্রের অবতারণায় কাব্যের গঠনোপাদানে দোষ হইয়াছে, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তবে এ তিনটী চরিত্রের মধ্যে উর্ব্বশী চরিত্রে আমরা একটু অন্তর্দৃষ্টি পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে মানসিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উর্ব্বশী প্রথমা, তারা দ্বিতীয়া এবং শূর্পনখা তৃতীয়া। প্রার্থনা তাহাদের তিনেরই দূষ্য, ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ, তবে ইতর বিশেষ এই যে, বর্ণনার ভঙ্গি ও উক্তির বৈচিত্র্যে উর্ব্বশী-চরিত্রে কিছু আপেক্ষিক মহত্ত্ব আছে। এ সব চরিত্রের অবতারণায় রুচিদোষ আসিবেই; এ কথার সমর্থনে আমরা "বিক্রমোর্ব্বশীর" উল্লেখ করিতে পারি। মনোহারিণী কল্পনায়, মনুষ্য হৃদয় ও মনুষ্য চরিত্রে দূরদৃষ্টিতে কালিদাসের উর্ব্বশীচিত্র বীরাঙ্গনা কাব্যকর্ত্তার চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে উজ্জ্বল হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি উক্ত নাটক পাঠে উর্ব্বশী চরিত্র

আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে উর্ব্বশী যে স্বর্বেশ্যা,তাহার প্রেম যে ক্ষণিক রূপজ মোহ মাত্র, তাহার কথায় বা ভাব ভঙ্গিতে এ কুৎসিৎ সত্য আবৃত হয় না। তাহাকে শত কল্পনা, শত সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া থাকিলেও তাহার উর্ব্বশীত্ব উহার মধ্যে বিলুপ্ত হয় না— সুতরাং পুরোরবা বিরহে উর্ব্বশীর খেদে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা হয় না। কিন্তু শকুন্তলার বিরহবেদনা কিরূপ মর্ম্ম-স্পর্শী! সেক্ষপীয়রের ক্রেসিড, ক্লিওপেট্রার বিরহোক্তিতে চক্ষে জল ধরে না কেন? বোধ হয়, মনুষ্য হৃদয়ের নৈসর্গিক পুণ্য-প্রবণতা এ সমবেদনার মূলীভূত কারণ।

অতঃপর দ্রৌপদী-চরিত্র। মহাভারত-কারের এ উজ্জ্বল চিত্র দেশীয় বিদেশীয় অনেক সমালোচকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের বঙ্গকবির হস্তে এ চিত্র কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা এই কাব্যের সমালোচক মাত্রেরই অভিনিবেশের বিষয়। বস্তুতঃ ব্যাসের দ্রৌপদী হইতে মাইকেলের দ্রৌপদী কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না— উভয়েই সেই হিন্দুরমণীর "সনাতন পাতি-ব্রত্য," সেই ধর্ম্মপরায়ণতা, সেই রাজপদা-ভিলাষ, সেই মহত্ত্ব। বরঞ্চ বীরাঙ্গনা কাব্যে দ্রৌপদী চরিত্রের শ্রেষ্ঠাংশ ততদূর চিত্রিত হয় নাই, মধুর ও কোমল অংশ যতটা হইয়াছে। ইহা বঙ্গরমণীর কোমলতা, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিনীর কোমলতা ও কঠিনতা মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নহে। কবি এরূপ অবস্থানে কোমলতা আনিয়া চরিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন। মেঘনাদবধে সীতা ও প্রমীলা চরিত্র তুলনা করুন, বোধ হইবে, একার বীরপত্নী-যোগ্য কঠোরত্ব অন্যার চরিত্রে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদী চরিত্রেও এই দোষ আসিয়াছে। মনে হয়, দ্রৌপদীর সে প্রেমপ্রাণতা থাকিলেও, হৃদয়ে সে বল কই? সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি কই? গভীর প্রেমের লক্ষণ সে বিশ্বাসের উদারতা কই? দ্রৌপদী যেন পতিচরিত্রে অর্দ্ধসন্দিগ্ধ। অপ্সর কন্যারা অলৌকিক রূপলাবণ্যে পাছে স্বামীটিকে বেদখল করিয়া ফেলে, দ্রৌপদী এই ভয়েই সারা। ব্যাসের দ্রৌপদী এরূপ নহেন। বৈর-নির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্র-শিক্ষার্থে স্বামী ইন্দ্র লোকে গিয়াছেন,যে পর্য্যন্ত সে শিক্ষার শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্রৌপদী-বিরহে কাতরা হইলেও কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার এত প্রবল যে, পতি-চরিত্রে অন্যায় সন্দেহে বা বিরহানল নিবাইবার জন্য স্বামীকে স্বর্গ হইতে ফিরা-ইয়া আনিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কৌর-বেরা তাঁহাদের কি দুর্গতি না করিয়াছিল? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূতবেশে পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করিতে গিয়া মদদর্পিত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্য আধুনিক য়ুরোপের অদম্য রাজ্য সম্পদ লালসার পরি-তৃপ্তি নহে! ইহা ধর্ম্ম-ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য।* সে কার্য্যে ব্যাঘাত দেওয়া সহধর্ম্মিণীর উচিত কার্য্য নহে।

এই পত্রে এক স্থানে কবি কালানৌচিত্য দোষে পতিত হইয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্য কোন সমালোচক এ দোষ দেখাইয়া-ছেন কি না, জানি না। মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হই, যখন বৃহদশ্ব ঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে নলোপাখ্যান বিবৃত

* গীতায় "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়" ইত্যাদি শ্লোকের বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যা দেখ।

করেন, † তাহার বহু পূর্ব্বে অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছেন। § এরূপ অবস্থায় দ্রৌপদীর "শুনি বৈদর্ভীর কথা ধরিতাম ফাঁদে রাজহংস" ইত্যাদি উক্তিতে কালানৌচিত্য দোষ আসিয়াছে—কারণ সে সময়ে দ্রৌপদী নলোপাখ্যান অবগত ছিলেন না।

ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কারণ স্থানে স্থানে কাব্যমাধুর্য্য ছাড়া আর কিছু প্রশংসনীয় নাই। কবির অবস্থায় লোকের হিন্দুপুরাণে জ্ঞান দেখিয়া (এ গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ এই দুই পত্রে) আমরা বিস্মিত হই, যদিও স্থানে স্থানে এই পুরাণোপমা বাহুল্যই দোষাবহ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এই দুই পত্রে কবির চরিত্র সৃষ্টিকৌশল তেমন নাই। দুঃশলা ও ভানুমতী চরিত্র প্রায় এক, কেবল প্রভেদ নায়ক নায়িকার অবস্থান ভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অবস্থাগত সাদৃশ্যে জনা কৈকেয়ী তুল্যা। যতটুকু উগ্রতা জনাচরিত্রে বাহ্যতঃ পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল অবস্থাগত। কৈকেয়ী জনার অবস্থায় পড়িলে বোধ হয় আরও উগ্রা হইতেন। জনা একে পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা, তাহাতে আবার হতবুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় স্বামী দ্বারা পুত্রহন্তা শত্রুকে ষোড়শোপচারে পূজিত হইতে দেখিয়া সে ক্ষত্রিয় রমণী হৃতশাবকা বাঘিনীর ন্যায় ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পতিকে ভৎসনা করিতেছে, সে ভৎসনা তীব্র ঘৃণাপূর্ণ ও বিদ্রূপময়। ব্যাস জনা-চরিত্র উজ্জ্বল করিতে প্রয়াস পান নাই। কারণ সকল পারিপার্শ্বিক চিত্রে মনোযোগ দিতে তাঁহার অবসর বা উদ্দেশ্য ছিল না। কবি মধুসূদনের এ চিত্র সুতরাং বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দ্বৈত চরিত্রে (Duplicate characters) কাব্যের গঠনে বৈচিত্র্যহীনতা দোষ আসিয়াছে। রুক্মিণী ও শকুন্তলায়, তারা, উর্ব্বশী, ও শূর্পনখায়, কৈকেয়ী ও জনায়, দুঃশলায় ও ভানুমতীতে উক্তরূপে সাদৃশ্য আসিয়া কাব্যগত নায়িকাচরিত্রের বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়াছে। একেবারে স্বাতন্ত্র্য নাই, এরূপ নহে, তবে খুব স্পষ্ট নহে। একটী চরিত্রে কেবল উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান, সেটি গঙ্গাচরিত্র। এই কাব্যের অন্য কোন চরিত্রের সহিত ইহার তুলনা দেওয়া যায় না। গঙ্গা অনেক দিন শান্তনু পত্নী ছিলেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যদিও এই পুরাণ কাহিনীর প্রথমাংশ (অর্থাৎ শান্তনু পিতার রূপে দেবীর অনঙ্গবান বিদ্ধ হওয়া) দেবী চরিত্রের বড় মাহাত্ম্য-সূচক নহে। প্রতিজ্ঞা, দেবতনয় শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর উদ্ধার। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইলে গঙ্গা অন্তর্হিতা হইয়াছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পত্নী-বিয়োগ-বিধুরা শান্তনু জ্ঞান-শূন্য হইয়া, নিদ্রাহার ত্যাগ করিয়া ভাগিরথীতটে ভ্রমণ করিতেছেন। ব্যাস ও মাইকেলের শান্তনুচরিত্র এরূপ রূপলালসাময়। তাঁহার প্রেম অনেকটা রূপজাত মোহ। প্রমাণ, কিছুদিন পরে আবার তিনি সত্যবতীকে দেখিয়া এইরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণটা যেন কর্ণধারবিহীন তরী; রূপসীর রূপের প্রতি তরঙ্গে উলটিয়া যায়। ইন্দ্রিয়-সংযম নামক যে একটা কর্ণধার থাকে, তাহার অস্তিত্ব সে তরীতে অনুভূত হয় না। যে যাহা হউক,

† বনপর্ব্ব—নলোপাখ্যান প্রকরণ, ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

§ বনপর্ব্ব—ইন্দ্রলোকগমন প্রকরণ, দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ।

গঙ্গা শান্তনুকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে"। গঙ্গা আত্মপরিচয় দিতেছেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং "হর শিরঃ নিবাসিনী হরপ্রিয়া জাহ্নবী।" যে কারণে এত দিন রাজার আলয়ে মানবী আকারে পত্নীভাবে ছিলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। শেষে সর্ব্বগুণধর পুত্রের মুখ দেখিয়া স্ত্রীবিয়োগ ব্যথা ভুলিতে পারেন, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন :—

কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্ব কথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মন,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে রাজা; শৈলেন্দ্র নন্দিনী
রাজেন্দ্র গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে;
যত দিন ভবধামে বহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশঃ, গুণ ভবধামে,
কহিবে ভারত জন; ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেব-ব্রত রথী।

আমাদের প্রবন্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী বারে ভাষা, রুচি, রস ইত্যাদি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী

জাগরণ

তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
নিশিতে আপনা পাশরি,
মধু কথা তার স্মৃতির মাঝার
পশে যেন দূর-বাঁশরী!
জ্যোৎস্না-নিন্দিত তার রূপভাতি
উজলে আলোক হৃদয়ের রাতি,
শতেক কামনা
কুমুদ-বরণা
তরল রজতে ঝলসে!
নলিনী-কোমল তার মুখখানি
ভাসাই মানস-সরসেতে আনি,—
লহরী-লীলায়
প্রাণ ভেঙে যায়
অসহ সুখের অলসে!
পরিমল-মাখা সে মধুর হাসি
কোমল নিক্বণে বাজে হৃদে আসি,
বড় যে তাহায়
ভালবাসি, হায়,
মাণিক কি তায় গড়ে গো?
মধুর বেদনে আঁখি ছল ছল
দেখেছি যে তার নয়নের জল,
চুমেছি যতনে
সে অমূল্য ধনে,—
মুকুতা কি তায় গড়ে গো?
বসন্ত-পবনে সৌরভের মত,
তার মৃদু-শ্বাসে পিয়াসে সে কত,
দুলায়ে আদরে
হৃদি-ফুল-থরে,
পশিত-মরম-নিভৃতে!
পরশ তাহার বিজলি-সমান
পশিলে স্মরণে, মুরছে পরাণ,
মরণের সুখে
চাহি পুনঃ বুকে
সে ফুল-অশনি ধরিতে!
তাহারি ত লাগি সারানিশি জাগি
গগনে তারকা গুণি রে,
তারি সুধা কথা, তারি মধু ব্যথা,
তারি মৃদু-শ্বাস শুনি রে!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

এক্ষণে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ খাদ্যের গুণ ও ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

পানীয় জল ব্যতীত কোন খাদ্যই সুপক্ক হয় না। জল যে যে কারণে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে পানার্থেই সর্ব্ব প্রধান। কোন মহামূল্য বা সুমিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিলেও তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। যাহাকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সময়ে সময়ে তৃষ্ণা নিবারণ না করিলে সে ব্যক্তি কখনই পরিশ্রম করিতে পারে না; যাহাকে বিশেষ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষেও ঐরূপ। সময়ে সময়ে জলপান না করিলে মস্তিষ্ক ও মাংস-পেশী সমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা প্রতিদিবস গড়ে /৩ তিন সের জল দেহ মধ্যে গ্রহণ করি; তন্মধ্যে কিয়দংশ নিশ্বাস দ্বারা ফুস্ ফুস্ মধ্যে গমন করে ও স্নান করিবার সময় লোমকূপ দ্বারা শোণিতে প্রবেশ করে এবং কতক পরিমাণে খাদ্যের সহিত উদরস্থ হয়, অবশিষ্টাংশ (প্রায় /২ সের) পান করিতে হয়। জলপান করিবার সময় এককালে অধিক জল পান করা অবিধেয়। আহারের অনতিপূর্ব্বে অল্প পরিমাণে শীতল জল পান করিলে পাচকরস সমূহ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে পারে। অধিক পরিমাণে পান করিলে বিপরীত ঘটিবে। আহারের সময় অধিক জল পান করা নিষিদ্ধ, কারণ তদ্দারা পাচকরস সমুদয় অযথোচিত রূপে তরলীভূত হইয়া যায়, সুতরাং পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণ জল অধিক পরিমাণে পান করিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। যবক্ষারজানময় পদার্থ ভোজন করিলে অল্পপরিমাণ জল পান করা উচিত। অধিক পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জল পান করা অবিধেয়; ঐরূপ করিয়া কত লোক হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে।

উত্তম গাভীর দুগ্ধ * দেখিতে গাঢ় শ্বেত-বর্ণ, অস্বচ্ছ, নীলের আভাশূন্য,—আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gravity) ১০২৬-১০৩৫। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ অধিক তরল, নখের উপর এক ফোঁটা ঐ দুগ্ধ রাখিলে তৎক্ষণাৎ চেপ্টা হইয়া যায় ও পার্শ্ব দেশে নীলের আভা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৬ অপেক্ষা ন্যূন। উত্তম দুগ্ধে শতকরা ১১৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে, জল মিশ্রিত হইলে উহার পরিমাণ হ্রাস হয়। দুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ় করিয়া অর্থাৎ ক্ষীর করিয়া ব্যবহার করা স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ। কারণ উহাতে পনিরময় পদার্থ অত্যন্ত ঘনিভূত ও অপাচ্য অবস্থায় থাকে। কেহ কেহ দুগ্ধ পান করিবার পূর্ব্বে উহার সর পরিত্যাগ করেন; উহাতে পুষ্টির ব্যাঘাত হয়, কারণ সরই দুগ্ধের প্রধান অংশ—উহাতে তৈলময় ও শর্করময় পদার্থই অধিক পরিমাণে থাকে। ঐ দুই পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে যবক্ষার-জানময় পদার্থ, লবণ ও জলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কোন কোন রোগীর পক্ষে ঐ প্রথা অবলম্বনীয়। সরের সমাস—জল ৬৬, যবক্ষারজান ২.৭, শর্করা ২.৮, তৈলময় পদার্থ ২৬.৭, লবণ ১.৮। অনেক সময় দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত লোকেরা উহাতে জল মিশ্রিত করে,

* উত্তম গাভীর দুগ্ধে শতকরা ১১.৫ ভাগ (১৩.৫২ —স্মিথ,) ছাগীর দুগ্ধে প্রায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ

কখন কখন উহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় এবং কখন বা উহার গাঢ় শ্বেতবর্ণ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উহাতে ফুলখড়ি গুঁড়া করিয়া দেয়। দুগ্ধ পরিমাপক ও পরীক্ষক যন্ত্র (Lactometer) ব্যবহার করিলে সহজেই ঐ সমুদয় দোষ অবগত হওয়া যায়, উহার মূল্যও অধিক নহে এবং উহার সহিত যে ব্যবস্থাপত্র থাকে, তাহা পাঠ করিলে উহার ব্যবহার সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দধি উত্তম খাদ্য, কিন্তু সকল সময়ে বা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে পীড়া জন্মে। উহাতে ল্যাকটিক্ (Lactic) অম্লরস থাকে, এ নিমিত্ত পাচক ক্রিয়ার সাহায্য করে। ঘোলও অতি সুখাদ্য, গ্রীষ্মকালের পক্ষে উপাদেয় পানীয়, এবং অনেক পীড়ার পথ্য। ছানা ও তদুৎপন্ন মিষ্ট সামগ্রী সমুদয় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছানা দুগ্ধাপেক্ষা দুষ্পাচ্য, এ নিমিত্ত অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। উহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ আপক্ষাকৃত অধিক; চিনির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় শীঘ্রই পরিপাক হয়। সর হইতে মাখন ও ঘৃত উৎপন্ন হয়, ঘৃত অপেক্ষা মাখন সহজে জীর্ণ হয়, মাখনে জলের ভাগ অধিক, পনিরের ভাগও ঘৃত অপেক্ষা অধিক বোধ হয়। ঘৃতে অঙ্গারের ভাগ অধিক, জলের ভাগ অল্প, যবক্ষারজানময় পদার্থ প্রায় নাই, এ নিমিত্ত অনেকদিন ব্যবহার-যোগ্য থাকে।

চাউলই বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য, কিন্তু কোন্ প্রকার চাউলের কি গুণ ও কোন্ প্রকার চাউল সিদ্ধ করিলে কিরূপ ভাত হয়, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে সিদ্ধ চাউল আহার করিতে ভালবাসে ও নূতন চাউল খাইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু কি নিমিত্ত এরূপ ইচ্ছা হয়, তাহার কারণ সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কোন কৃতবিদ্য রসায়নশাস্ত্রবেত্তা এই বিষয়টী অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশ করিলে দেশের একটী মহৎ উপকার করা হয়। ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, নূতন চাউল সিদ্ধ করিলে শীঘ্রই অত্যন্ত নরম হইয়া যায় এবং মাড় অত্যন্ত ঘন হয়, ও শীঘ্রই জমিয়া যায়। বাস্তবিক নূতন চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে অধিক সময় লাগে। নূতন চাউল সিদ্ধ হইলে পরিমাণে অল্পই বৃদ্ধি হয়। পুরাতন চাউল অধিক পরিমাণ জল ধারণ করে ও উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়।*

(১৫.৫—স্মিথ) এবং গর্দ্দভীর দুগ্ধে ৯.৫ ভাগ (১০.৯৯—স্মিথ) কঠিন পদার্থ থাকে। মহিষীর দুগ্ধে সকল প্রকার খাদ্যই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পীড়িতাবস্থায় স্তন্যপায়ী শিশুগণকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করিতে পরামর্শ দেওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দুগ্ধ মাতার স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকারী। ছাগী, মহিষী ও গাভীর দুগ্ধ অধিক পুষ্টিকর; আবশ্যক হইলে কিয়ৎ পরিমাণে উষ্ণ জল ও শর্করা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় আমাদিগকে এমন স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, যথায় টাট্কা দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে স্থলে পুরাতন "তোলা" দুগ্ধ পাইলে যথেষ্ট তৃপ্তি বোধ হয়, এ নিমিত্ত তোলা দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার উপায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। মিশ্রি বা "দোবারা" চিনি ও অল্প পরিমাণ কার্বনেট অব সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে মন্দ মন্দ অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া রাখিলে, ১০।১৫ দিবস স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। বিদেশীয় দুগ্ধ পূর্ণ টিনে যে দুগ্ধ থাকে (Condensed Swiss milk), তাহাও ঐরূপে প্রস্তুত করা, এবং (উহা হইতে বায়ু নিষ্ক্রান্ত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ টিন খুলিয়া রাখিলেও ১ মাস পর্য্যন্ত উত্তম থাকে, কিন্তু উহাতে প্রায় তৃতীয়াংশ শর্করা মিশ্রিত থাকে।

* ১ পোয়া উত্তম আতপ চাউল /১ সের ১০ ছটাক

চাউল সিদ্ধ করিবার বিষয়ে উপদেশ অনাবশ্যক। ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইলেই উহা সুপক্ক হয়। ভাতের সহিত মাখন বা ঘৃত ও লবণ ব্যবহার করা পরামর্শ-সিদ্ধ। কিন্তু যদি কোন ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে নহে। সচরাচর সিদ্ধ চাউল জীর্ণ করিতে অতি অল্প সময় আবশ্যক, প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্ন পাকস্থলী পরিত্যাগ করে। ঘৃতপক্ক পলান্ন কিম্বা পায়সান্ন প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অতীত না হইলে পাকস্থলী পরিত্যাগ করে না।

জলের সহিত সিদ্ধ করিলে ৩ পোয়া ভাত ও ৩ পোয়া মাড় উৎপন্ন হয়। ১ পোয়া সিদ্ধ (পুরাতন) চাউল /১ সের ১০ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৩ ছটাক ভাত ও ৮ ছটাক মাড় হইয়াছিল। এক পোয়া মোটা সিদ্ধ চাউল /১ সের ১২ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিলে ৸৶০ সাড়ে তিন পোয়া ভাত ও একসের মাড় উৎপন্ন হয়। এক পোয়া আতপ চাউল ৩ পোয়া জলে সিদ্ধ হইয়া মোট সাড়ে তিন পোয়া ভাত হইয়াছিল, মাড় ছিল না। এই সামান্য পরীক্ষার উপর নির্ভর কয়িয়া কোন মত স্থির করা যায় না। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে, আতপ চাউল অপেক্ষা সিদ্ধ চাউল অধিক জল ধারণ করে ও মোটা চাউল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল ধারণ করে। চাউল সিদ্ধ করিয়া উহার মাড় ফেলিয়া দেওয়া প্রথা কতকাল চলিতেছে ও কি কারণে পুরাতন বঙ্গবাসীরা ঐরূপ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, এক সের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড় জন্মে ও প্রতিসের মাড়ে প্রায় ৪০০ শত হইতে ৮০০ শত গ্রেণ পর্য্যন্ত শ্বেত সার পদার্থ থাকে; সুতরাং তিনসের মাড়ে (গড়ে সের প্রতি ৬০০ গ্রেণ) প্রায় ১৮০০ মত গ্রেণ অর্থাৎ দুই ছটাক অপেক্ষা অধিক শ্বেতসার থাকে; অতএব এক সের চাউল পাক করিলে কেবল চৌর্দ্দ ছটাক চাউলের ভাত উৎপন্ন হয় এবং যে পরিমাণ চাউল সিদ্ধ করা যায়, তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়। ডাক্তার পার্কস্ সাহেব বলিয়াছেন যে, মাড়ের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে যবক্ষারজানময় পদার্থও বহির্গত হইয়া যায়। একেইত চাউলে যবক্ষারজানের অংশ অতি অল্প, আবার মাড়ের সহিত তাহার কোন অংশ পরিত্যক্ত হইলে ভাতের পুষ্টিকারিতার অত্যন্ত অভাব ঘটে, তথাপি কি কারণে আমরা ভাতের মাড় ফেলিয়া দিই? কেবল শ্বেতসার পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি বিশেষ হইত না, কারণ চাউলে শ্বেতসারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এবং যবক্ষারজানের পরিমাণ হ্রাস না হইয়া শ্বেতসারের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, যবক্ষারজান ও অঙ্গারকের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকিত।

দাউল।—এদেশে কয়েক প্রকার দাউল ব্যবহৃত হয়; যথা,—মুগ, মাসকলাই, মসুর, অরহর, ছোলা, মটর, ও খেঁসারি। ইহাদের সমাস পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

তাহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, খেঁসারি দাউল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যবক্ষারজানময়, মটর ও মসুরে তদপেক্ষা কিছু অল্প, মসুরে অতি অল্প পরিমাণ লবণ আছে, তৈলময় পদার্থের পরিমাণ সকলেতেই অতি অল্প।

পশ্চিম বঙ্গদেশে মাসকলাই দাউল এবং পূর্ব্ব বঙ্গদেশে মসুর ও মটরই অধিক ব্যবহৃত হয়। লোকের বিশ্বাস, মাসকলাই অতি স্নিগ্ধকারী ও মসুর "গরম"; ইহাও বিশ্বাস যে, মুগ রেচক গুণবিশিষ্ট। অরহর, মটর ও ছোলা সকলই গুরু ও দুষ্পাচ্য বলিয়া বিখ্যাত। ছোট মটরও অন্যান্য দাউলের ন্যায় পুষ্টিকর নহে। কি কারণে ঐ সমুদয় দাউলে উক্ত দোষ বা গুণ আরোপ করা হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। পূর্ব্ববিবৃত তালিকা দৃষ্টে বোধ হয় যে, মসুরই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। পূর্ব্ব বঙ্গদেশে উহা সহজেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অরহর, মটর, ও ছোলার দাউল সহজে উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, ও সিদ্ধ করিলেও কঠিন থাকে, সুতরাং পাকস্থলীতে গিয়া জীর্ণ

হইতে বিলম্ব হয়। অধিক কাল রাখিলে, প্রায় কোন দাউলই উত্তমরূপ সিদ্ধ হয় না, এ নিমিত্ত সর্ব্বদা টাট্‌কা দাউল ব্যবহার করা উচিত।

সকল প্রকার দাউলেই তৈলময় পদার্থের অংশ অল্প, এ নিমিত্ত রন্ধনকালে উহাতে ঘৃত বা তৈল সংযোগ করা আবশ্যক। চাউলের ন্যায় দাউলও অতি ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়। কখন কখন খেঁসারির দাউলও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার এক প্রধান দোষ আছে, অধিক পরিমাণে বা অধিক কাল ধরিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। কি কারণে যে এরূপ হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু যে কারণেই হউক না কেন, ইহার অনিষ্টকারিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ নিমিত্ত ঐ দাউল ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। দাউলের যে যে গুণ আছে, তাহা অন্য কোন খাদ্যে নাই, সুতরাং দাউল ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন সামগ্রী ব্যবহার করিলে সমান উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত প্রতিদিবস নিরূপিত পরিমাণে দাউল ব্যবহার করা আবশ্যক, এবং যাহারা অন্ন আহার করে, তাহাদের সকলেরই দাউল ব্যবহার করা উচিত। *

মাংস বা মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যের সাহায্যে নিরূপিত পরিমাণ যবক্ষারজান ও শ্বেতসারময় পদার্থ উদরস্থ করা যাইতে পারে না। মৎস্য না খাইয়া মাংস ব্যবহার করিলে আর সে অভাব থাকে না, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা এ দেশের এক প্রকার অখাদ্য সামগ্রী বলা যাইতে পারে। সুতরাং যাহারা মাংস ভক্ষণ করিবে না, তাহারা মৎস্য আহার না করিলে কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে। যবক্ষারজানের পরিমাণ যথোচিত না হইলে পরিশ্রম (বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম) করা অসম্ভব।

সার হেনরী টমসন যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা,—রোহিত, কাতলা, মিরগেল, কালবোস, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত লালবর্ণের মাংস বিশিষ্ট মৎস্য অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। মাগুর, সিঙ্গী, ইত্যাদি শল্কশূন্য শ্বেতবর্ণের মাংস বিশিষ্ট মৎস্য সুস্বাদু ও সহজে জীর্ণ হয়, এ নিমিত্ত রোগীর পথ্য বলিয়া বিখ্যাত। বাটা ও বড় পুঁটি মাছও উত্তম। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সহজে জীর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে অত্যন্ত কাঁটা থাকায় আহার করিতে বিরক্তি জন্মে, অথচ কাঁটার সহিত আহার করিলে পেটের পীড়া উৎপন্ন হয়। ইলিস ভেট্‌কী ইত্যাদি মৎস্যে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক; সুতরাং দুষ্পাচ্য। অল্প পরিমাণে আহার করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক সময় ইলিস মৎস্য অত্যন্ত সুলভ হয়, তৎকালে লোকে লোভপরবশ হইয়া অধিক পরিমাণে উহা ব্যবহার করিয়া পীড়িত হয়। অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, পচা মৎস্য ভক্ষণ করিবে না,—উহা উদরাময় রোগের এক প্রধান কারণ।

* অনেক সময় দাউলকে জলের সহিত সিদ্ধ করত তরল্যাবস্থায় ব্যবহার না করিয়া বড়ি রূপে ব্যবহার করা হয়, দাউল ঐরূপে অনেকদিন রাখা যায়, অনেক স্থানে লইয়া যাওয়া যায় ও অনেক দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করা যায়। বড়ি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাওয়া যায়।

মৎস্যের ডিম্ব অতি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য, কিন্তু অধিক খাইলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইলিস্, কৈ ইত্যাদি মৎস্যের ডিম্ব ভাজিয়া রাখার প্রথা আছে, আবশ্যক মত ঐ ভাজা ডিম্ব অন্য সময় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোনও মৎস্যের তৈলও ঐ রূপে সঞ্চিত থাকিতে পারে।

বাস্তবিক মৎস্য না হইলেও চিঙ্ড়ি এদেশে মৎস্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। মৎস্য অপেক্ষাও বড় চিঙড়ি অধিক পুষ্টিকর, কিন্তু যেমন পুষ্টিকর, সেইরূপ দুষ্পাচ্য। তবে পরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে অনিষ্ট না হইয়া বিশেষ উপকারই হয়। ছোট (বাদা) চিঙড়ি উদরাময় রোগের জন্মদাতা বা প্রতিপালক। উহার মাংস তত অনিষ্টকর নহে, কিন্তু উহার উপরে যে ছাল আছে, তাহাই বিশেষ অনিষ্টকর।

ময়দা।—অনেকে রাত্রিকালে অন্ন আহার করেন না, তৎপরিবর্ত্তে ময়দা বা আটার রুটি খাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একবেলা ময়দা ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু চাউল অপেক্ষা গোধূম অধিক পুষ্টিকর সামগ্রী। চাউলে যে পরিমাণে যবক্ষারজানময় পদার্থ থাকে, গোধূমে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। কিন্তু গোধূম সকল ব্যক্তির পাকস্থলীর যোগ্য নহে। অভ্যাস দ্বারা কিরূপ হইতে পারে, বলা যায় না, কিন্তু আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রুটি ভক্ষণ করিলে অনেকের অম্লরোগ জন্মে; বোধ হয় অনভ্যাসই তাহার কারণ। অনেক সময় পুরাতন ময়দা ব্যবহার করিয়া পীড়িত হইতে হয়।

সুজি এক প্রধান ও বিশুদ্ধ শ্বেতসার; উহা অত্যন্ত লঘু ও সহজে জীর্ণ হয়, এ নিমিত্ত রোগীকে সময়ে সময়ে সুজির রুটি ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়। সুজি বাহির করিয়া অবশিষ্টাংশকে পেষণ করিলে এক প্রকার ময়দা হয়, উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর কিন্তু গুরুপাক,* কারণ উহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। এইরূপ ময়দা কোন কোন পীড়ার বিশেষ উপকারী পথ্য,—যেমন বহুমূত্র। সুজি বাহির করিয়া না লইলে ময়দায় শ্বেতসার ও যবক্ষারজানময় পদার্থ যথোচিতরূপে মিশ্রিত থাকে। সেই ময়দা দেখিতে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অতি কোমল এবং দুর্গন্ধ ও অম্লতা শূন্য। ময়দা কিছুদিন রাখিলে উহাতে গন্ধ হয় এবং উহা বিবর্ণ ও অম্ল হইয়া যায়। অনেক সময় এইরূপ পুরাতন, অর্দ্ধ বিকৃত ময়দা ব্যবহার করিয়াই পীড়িত হইতে হয় এবং উহাতে অনিচ্ছা জন্মে। "দুধে" গমের ময়দা এককালে শুভ্রবর্ণ, "জামালি" গমের ময়দা ঈষৎ পীতবর্ণ।

এদেশে সুজির দানা বড় বড় রাখা হয়, সুতরাং সিদ্ধ হইতে বা পরিপাক করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। উত্তমরূপ পেষণ করিয়া লইলে সহজেই পরিপাক হইতে পারে। সচরাচর যে সুজি ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ১০।১২ ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রুটি প্রস্তুত করিলে সহজে

* সচরাচর দুই প্রকার গোধূম দৃষ্ট হইয়া থাকে,—(১) "দুধে" (২) "জামালি"—প্রথমোক্ত গোধূম অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড়, শ্বেতবর্ণ ও কোমল; উহাতে শ্বেতসারের পরিমাণ অধিক। দ্বিতীয় প্রকার গোধূমে সুজির পরিমাণ অল্প, উহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, এবং উহার ময়দা কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণ হয়। এক মণ "দুধে" গম হইতে ।/১ সুজি ।/১৮ ময়দা এবং /৮ ভুষি পাওয়া যায়।

জীর্ণ হইবে, ও অম্লতা বা অন্য কোন দোষ জন্মিবে না। উহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত সিদ্ধ হইলে অতি উপাদেয় খাদ্য হয়, কিন্তু লোভপরবশ হইয়া অধিক খাইলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ময়দা হইতে রুটি ও লুচি, দুই প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে, লুচি অপেক্ষা রুটি সহজে জীর্ণ হয়। ময়দায় তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অল্প, এ নিমিত্ত উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত সংযোগ করা আবশ্যক। সেই নিমিত্ত রুটিতে প্রায়ই অল্প পরিমাণে ঘৃতের প্রলেপ দেওয়া যায় ও তদ্বারা উহার ঐ অভাবের মোচন হয়। কিন্তু লুচিতে ঘৃতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, সেই নিমিত্ত উহা দুষ্পাচ্য।

মাংস।—যে দেশে অন্নই প্রধান খাদ্য, তথায় মেষ মাংসাপেক্ষা ছাগ মাংসই অধিক ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কারণ অন্নাহার দ্বারা শরীরে অযথোচিত পরিমাণ অঙ্গারক দ্রব্য প্রবেশ করে; মেষ মাংসেও অধিক পরিমাণ তৈলময় পদার্থ থাকে; সুতরাং অন্নের সহিত মেষ মাংস আহার করিলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারময় পদার্থ ব্যবহার ঘটে, তাহাতে "গরম" হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার স্মিথ বলেন যে, মেষ মাংসাপেক্ষা ছাগমাংস অধিক পুষ্টিকর।

পক্ষীর মধ্যে হংস, কপোত ও কুক্কুট ইত্যাদির মাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং পরিমিতরূপে আহার করিলে সহজে জীর্ণ হয়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার আনাজ অপেক্ষা মাংস শীঘ্র ও সহজে জীর্ণ হয়। কিন্তু এদেশে যেরূপে মাংস পাক করা হয়, তাহাতে অজীর্ণ হইবারই সম্ভাবনা। অত্যন্ত ঘৃত সংযুক্ত হইলে পাচকরস-সমূহ মাংসের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতে পায় না। মাংস যত সামান্য মসলাযুক্ত হয়, ততই মঙ্গল।

যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহাকে রন্ধনের ১০।১২ ঘণ্টার অধিক পূর্ব্বে বধ করা উচিত নহে। সে জন্তু কোন প্রকার পীড়িত কি না, তাহা প্রায় অনেক সময় তাহার আকার, চলন ও ক্ষুৎপিপাসাদি দেখিয়া স্থির করিতে পারা যায়। মাংস টাট্‌কা কি না, তাহা তাহার বর্ণ ও গন্ধদ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। মাংস ফ্যাকাসে বা গভীর লোহিত বর্ণ হইবে না। উত্তম মাংস রক্ত-শূন্য ফ্যাকাসে বা গাঢ় লালবর্ণ অর্থাৎ অতিরিক্ত রক্তবিশিষ্ট হইবে না; উহা ঈষৎ লালবর্ণ ও অল্প কাঁচা মাংসের গন্ধবিশিষ্ট হইবে। অতি অল্পবয়স্ক ও অতি প্রাচীন পশুর মাংস ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; তাদৃশ মাংস দুষ্পাচ্য ও অল্প পুষ্টিকর। মাংসকে অধিক উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিলে কঠিন ও অপাচ্য হয়, এ নিমিত্ত ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ উত্তপ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। লবণ, জিরেমরিচ, ধনে, তেজপাত, হরিদ্রা ও অল্প পরিমাণে পিয়াজ ও ঘৃত ভিন্ন মাংসে অন্য কোন মসলা আবশ্যক করে না।

ডিম্ব।—হংস প্রভৃতি পক্ষীর ডিম্ব অতি পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু গুরুপাক। উহাতে গন্ধক ও ফস্‌ফরস্ অধিক পরিমাণে থাকে, এ নিমিত্ত জীর্ণ না হইলে বিসমাসিত হইয়া গন্ধক উদজান নামক বাষ্প উৎপাদন করে। ডিম্ব কাঁচা অবস্থায় অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে শীঘ্র জীর্ণ হয়, রন্ধন দ্বারা কঠিন ও দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। উহা অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ ২।৩ মিনিট উষ্ণ জলে রাখিয়া, অল্প মাখন, লবণ ও গোল মরিচ মিশ্রিত করিয়া আহার করিলে সকল প্রকার দোষ খণ্ডিত হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকেও ঐরূপে ডিম্ব

দেওয়া যাইতে পারে। সুস্থ শরীরে ২।৩ টার অধিক খাইলেই অজীর্ণ ও পিত্ত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিম্বে অধিক পরিমাণে ফস্‌ফরস্ থাকায় উহা স্নায়ুমণ্ডলীর দৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকার করে।

আনাজ।—বঙ্গবাসীরা যত প্রকার ও যে পরিমাণে আনাজ ব্যবহার করেন, বোধ অন্য কোন দেশের লোক সেরূপ করে না। দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ আনাজই প্রায় জল ও কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য সামগ্রী বিশিষ্ট, সুতরাং অধিক পরিমাণে আহার করিয়া উদরস্ফীত হইলেও শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। যত প্রকার আনাজ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বাস্তবিক উপকারী বলিয়া বোধ হয়। যথা ;—কয়েক প্রকার আলু, কচু, কাঁচকলা, বেগুণ, পটোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ডেঙ্গোডাঁটা, দুই প্রকার কুমড়া, লাউ, সীম, মটরশুঁটী, বরবটী, ও পেঁপে।

কয়েক প্রকার আলু কচু কাঁচকলা ও কাঁটালের বীচিতে, শ্বেতসারময় পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডেঙ্গোডাটা, বিলাতি কুমড়া, লাল আলু, বীট ও গাজর ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে শর্করময় পদার্থ থাকে। এ নিমিত্ত তাহারা রোগ বিশেষে নিষিদ্ধ।

সীম, বরবটী, ও মটরশুঁটী অতি পুষ্টিকর পদার্থ, উহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থের পরিমাণও অধিক, সুতরাং সময়ে সময়ে দালের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শাকের মধ্যে বাঁধা কপি, পালঙ্ক ও পুঁই খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নটে, সজনে, ইত্যাদি শাক ভক্ষণ করিলে শরীরের উপকার না হইয়া অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শাকের হরিদ্বর্ণ বিশিষ্ট অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না।

পাকা উচ্ছে, করোলা ও পটোলের বীজ মহাপকারী বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে। কচি পটোল, পেঁপে, ডুমুর, কাঁচকলা ও কুমড়া ইত্যাদি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ রোগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিশ্বাস আছে। এই সমুদায় আনাজে খনিজ ও লবণময় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, এই নিমিত্তই উহাদিগের আদর। আলুতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অল্প। সকল গোল-আলু সমান পুষ্টিকর নহে। যে প্রকার আলু যে পরিমাণে অধিক ভারী, তাহাই সেই পরিমাণে পুষ্টিকর। নূতন অর্থাৎ টাট্‌কা তরকারী ব্যবহার না করিলে রোগ জন্মে।

ফল।—এ দেশে অনেক প্রকার সুখাদ্য ফল জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা,—আম্র, লিচু, পেঁপে, রম্ভা, আনারস, কমলালেবু, আতা, দাড়িম্ব, বেল, ও নারিকেল, এতদ্ব্যতীত পেয়ারা, কুল, খেজুর, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদিও সময়ে সময়ে খাওয়া যায়।

আম্র।—যে আম্রে "আঁস" নাই, সুমিষ্ট বা অম্লমধুর এবং যাহাতে কোন প্রকার কীটের চিহ্ন নাই, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। আম্রের "আস" উদরাময় রোগের এক প্রধান উদ্দীপক। এ নিমিত্ত আঁসযুক্ত আম্রের কেবল রস, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। কাঁচা আম্র কাটিয়া শুষ্ক (আমচুর) করিয়া রাখিলে অসময়ে অম্লের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। অরুচি ও পুরাতন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও উহা দেওয়া

যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আমরা ইহাতে নানা প্রকার "আচার" "কাসুন্দি" ও "মোরব্বা" প্রস্তুত হয়।

সুপক্ক লিচু অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর, কিন্তু অধিক খাওয়া উচিত নহে; উহা জীর্ণ হইতে অনেক সময় লাগে।

পেঁপের পাচক ও রেচক শক্তি আছে। রোগ বিশেষে কাঁচা পেঁপের তরকারী ও পাকা পেঁপে ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হয়। কাঁচা পেঁপের আঠা সহজে মাংসকে জীর্ণ করিতে পারে। এ নিমিত্ত মাংস সিদ্ধ করিবার সময় ব্যবহৃত হইতে পারে। পাকা পেঁপে কিছু স্নিগ্ধকর।

রম্ভাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে যবক্ষারজানময় ও শর্করময় পদার্থ আছে, এজন্য গুরুপাক, এবং অনেক জল থাকাতে স্নিগ্ধ গুণ ধারণ করে। ইহা কাঁচা অবস্থায় আনাজ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তৎকালে কিছু কষায় ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে।

কমলালেবু অম্ল ও মিষ্ট গুণবিশিষ্ট এবং স্নিগ্ধ ও তৃষ্ণা নিবারক।

দাড়িমও অম্ল ও মিষ্টগুণ বিশিষ্ট বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাইলেও উহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

আনারস অম্ল, মিষ্ট, পাকযন্ত্রের উত্তেজক, ও কিঞ্চিৎ রেচক গুণ বিশিষ্ট, উহার রস পান করিয়া অসার কঠিন অংশ ত্যাগ করা উচিত। অন্নের ন্যায় রন্ধন করিয়া ব্যবহার করিলে উহার অপকারিতা দূর হয়।

সুপক্ক আতা অতি সুমিষ্ট, রুচিকর ও কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ গুণ বিশিষ্ট ফল।

বেল বিশেষ উপকারী ফল ও ঔষধ কাঁচা বেল দগ্ধ, মোরব্বা ও শুষ্ক করিয়া খাইলে পুরাতন আমাশয় রোগের উপকার হইয়া থাকে, এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে। উহার রক্ত শোধক ও ধারক গুণ আছে। বৃক্ষপক্ক বেল সরবৎ করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ ও নাড়ী পরিষ্কার হয়।

খেজুর অত্যন্ত অধিক শর্করময় ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু অতিশয় গুরুপাক। ইহা ত্বক সহিত ভক্ষণ করিলে পেটের পীড়া উৎপন্ন হয়।

অল্প বীজ বিশিষ্ট উত্তম পেয়ারা সচরাচর দৃষ্ট হয় না; উহা বাস্তবিক উত্তম ফল।

কাঁটাল অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও দুষ্পাচ্য।

পাকা নারিকেল অত্যন্ত দুষ্পাচ্য। ডাব অতি উত্তম পানীয় ও খাদ্য। উহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধকর, এনিমিত্ত কোন কোন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। নারিকেল স্বয়ং দুষ্পাচ্য হইলেও অন্যান্য খাদ্যের পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে, এ নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত।

বিদেশীয় ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা ফলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, আকরট ইত্যাদি অত্যন্ত দুষ্পাচ্য ও তৈলময়। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রোগ জন্মিবে। দ্রাক্ষা ফলে অধিক পরিমাণে শর্করা ও তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় উহা অত্যন্ত রুচিকর এবং অম্লরস থাকায় স্নিগ্ধ ও তৃষ্ণা-নিবারক গুণ ধারণ করে। দ্রাক্ষাফল পক্কাবস্থায় আঙ্গুর নামে ব্যবহৃত হয়।

টাটকা সুপক্ক ফল যেরূপ উপকারী, অপক্ক বা অধিকপক্ক ফলও সেইরূপ অপকারী।

ইক্ষু।—ইক্ষু ফল নহে, কিন্তু ফলের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে,

উহা জল ও শর্করময় পদার্থে পূর্ণ। এনিমিত্ত উহা স্নিগ্ধকর, তৃষ্ণানিবারক ও পুষ্টিজনক; কিন্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

মিষ্টান্ন।—বঙ্গদেশীয় মিষ্টান্নের তালিকা অতি বৃহৎ। সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্নের নাম ও গুণ ব্যাখ্যা করা আমাদের অসাধ্য। কয়েকটী প্রধান প্রধান ও উপকারী মিষ্টান্নের নাম ও গুণের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

মিষ্টান্নের উপকরণ চিনি বা গুড়, ছানা, ময়দা, সুজি, ঘৃত, নারিকেল, ক্ষীর, বেশম ইত্যাদি; সুতরাং উহা অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং সেইরূপ দুষ্পাচ্য।

সন্দেশ ও রসগোল্লা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুখাদ্য এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাইলেও পীড়া হয় না। টাট্‌কা গজা ও জিলাপিও অতি উত্তম সামগ্রী। পুরাতন হইলে সহজে জীর্ণ হয় না। টাট্‌কা বুন্দে ও মিঠাইও মন্দ নহে; কিন্তু অধিক খাইলে পেটের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মোহনভোগ সকলের পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না। চন্দ্রপুলি ও রসকরা অতি সুস্বাদু বটে, কিন্তু দুই তিনটার অধিক ভক্ষণ করিলে বুক জ্বালা ও অম্ল দোষ উপস্থিত হয়। তাহাতে নারিকেলের তৈলময় পদার্থ থাকে বলিয়াই বোধ হয় সহজে জীর্ণ হয় না। খাজা, সীতাভোগ, সরপুরিয়া অল্প পরিমাণে খাওয়াই উচিত।

এই সমুদয় খাদ্য ভিন্ন আরও কতকগুলি সামান্য খাদ্য প্রায় প্রতিদিবস অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা,—মুড়ি, চাউলভাজা, খৈ, চিড়ে, মোয়া, মুড়কি, ইত্যাদি; এই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে গুণের তারতম্য আছে। টাট্‌কা মুড়ি, খৈ, চিড়েভাজা অতি লঘু ও সহজে জীর্ণ হয়, কিন্তু ঐ সমুদয় সামগ্রী টাট্‌কা না হইলে (নিওনো) সহজে পরিপাক হয় না। টাট্‌কা মুড়কি, মোয়া ইত্যাদিও এক প্রকার মন্দ নয়। চাউলভাজা অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্পাচ্য।

কয়েক প্রকার ফল মূল ব্যতীত, প্রায় সকল প্রকার খাদ্যই সুপাচ্য করিবার নিমিত্ত রন্ধন করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত রন্ধন দ্বারা খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খাদ্য যত পুষ্টিকর হউক না কেন, জীর্ণ হইয়া শোণিতের সহিত মিশ্রিত না হইলে শরীরের কোনই উপকারে আইসে না, বরং অনিষ্টপাত করে। কাঁচা বা স্বাভাবিক খাদ্য মনুষ্যের পাকস্থলীতে সহজে জীর্ণ হয় না; এ নিমিত্ত রন্ধন দ্বারা তৎসমস্তকে খাদ্যানুরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। অনেক খাদ্য কেবল রন্ধন করিলেই ভক্ষণোপযোগী সুস্বাদু হয় না, সুতরাং মনের তৃপ্তি না হওয়ায় আবশ্যকমত পাচক রস সমূহ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং অজীর্ণ রোগ জন্মে। এ নিমিত্ত কতকগুলি খাদ্য রন্ধনকালে মসলা-দ্বারা সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু করিয়া লওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা লাল ও পাচক-রস নিঃসারণ-যন্ত্রের স্নায়ু উত্তেজিত হয় ও কৈশিকাজালে শোণিতের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক পরিমাণে রস নিঃসৃত হয়, সুতরাং খাদ্যও উত্তমরূপে জীর্ণ হইয়া শোণিতের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া যায়। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ খাদ্য জীর্ণ না হইলে, বিকৃত হওয়ায় নানাপ্রকার অনিষ্টকর ও দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প, ও রস উৎপন্ন হয় এবং পীড়া জন্মে।

রন্ধনদ্বারা সকল প্রকার খাদ্য সমান সুপাচ্য হয় না, কোন দ্রব্য রন্ধনদ্বারা অধিকতর দুষ্পাচ্য হয়, আর কোন খাদ্যের সারাংশ রন্ধনকালে পরিত্যক্ত হয়। গুরু-পাক অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মসলা মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা এ দেশের পক্ষে অবিধেয়। অনেক সময় সুগন্ধ ও সুস্বাদ বৃদ্ধি করিবার অনুরোধে খাদ্যকে অপাচ্য করা হয়। পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয়, অধিক পরিমাণে পলান্ন, লুচি, কচুরি, ক্ষীর, ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন, কিন্তু প্রায় ১৫ আনা ভাগ লোক তাহা পারেন না। যাঁহারা ঐরূপ খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও বলিতেছি যে, এক্ষণে পাকযন্ত্র সমুদয়কে অন্যায়রূপে নিস্তেজ না করিয়া লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিলে আরও অধিককাল স্বচ্ছন্দে ক্ষেপণ করিতে পারিবেন। স্বভাবতঃ শীত প্রধান দেশের লোক অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈলাক্ত খাদ্য আহার করিয়া থাকে, কারণ শীতাধিক্য প্রযুক্ত তাহাদের দেশে অধিক পরিমাণ উত্তাপ-উৎপাদক অঙ্গারময় পদার্থ আবশ্যক। তজ্জন্য ঘৃত বা তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

স্বাভাবিক অবস্থায় চাউল, দাউল, ও ময়দায় তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অতি অল্প; এ নিমিত্ত ঐ কয়েকটী দ্রব্য আহার করিবার পূর্ব্বে উহাদের সহিত কিঞ্চিৎ মাখন বা ঘৃত মিশ্রিত করা বিধেয়। লুচিতে অপরিমিতরূপ ঘৃত মিশ্রিত হয়, তজ্জন্য লুচি গুরুপাক। মাংসে সচরাচর অতি অল্প ঘৃত আবশ্যক করে। কারণ মৎস্য ও মাংসে স্বভাবতঃই কিয়ৎ পরিমাণে তৈলময় পদার্থ থাকে।

সময়ে সময়ে মাংস, মৎস্য ও অন্যান্য খাদ্য "বাসি" ব্যবহার করিতে হয়। ঐ সকল খাদ্য যেরূপ রাখিলে অনিষ্টকর না হয়, তাহার উপায় করা উচিত। অদ্যকার মৎস্য কল্য বা পরশ্ব ব্যবহার করিতে হইলে কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। জৈবনিক পদার্থ মাত্রেই জল, বায়ু, ও উত্তাপ সংযোগে বিকৃত হয়, অতএব যদি আমরা ঐ খাদ্যের জলীয় অংশ হ্রাস করিয়া দিই, কিম্বা উহাকে বায়ু হইতে রক্ষা করি, অথবা উহাতে উত্তাপ লাগিতে না দিই, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। এদেশে সচরাচর মৎস্য ও মাংসে লবণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, পরে কতক জল ঝরিয়া গেলে, উত্তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লওয়া হয়। লবণ পচন-নিবারণ শক্তি-বিশিষ্ট ও হরিদ্রা অনেক ক্ষুদ্র কীট বিনষ্ট করিতে সক্ষম, অতএব এই দুই পদার্থই উপকারী। উহা উত্তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লওয়ায় ফল এই যে, উত্তপ্ত হইলে মাংস ও মৎস্য মধ্যস্থ বায়ু বিস্তীর্ণ হইয়া বহির্গত হয় ও তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্রস্থ উত্তপ্ত তৈল বায়ুর স্থান গ্রহণ করে। মৎস্যের চতুঃপার্শ্বে তৈলময় আবরণ থাকায় বাহ্য বায়ু পুনর্ব্বার উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তাপ প্রাপ্ত মৎস্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। সেইরূপ মাংস কিছু দিন রাখিবার আবশ্যক হইলে, এক পোয়া বা অর্দ্ধসের পরিমাণ এক এক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিবে, পরে একটী পাত্রে খানিকটা ঘৃত দিয়া তাহাতে ঐ মাংস ছাড়িয়া দিবে; পরে আরও কতকটা ঘৃত

দিয়া মাংসকে একবারে ঢাকিয়া ফেলিবে, ও ফুটাইবে। একবার ফুটিলে উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া কোন শীতল স্থানে রাখিবে, মৎস্য বা মাংসকে লবণাক্ত করিলেও অধিক দিন থাকে। দুই সের লবণ, এক পোয়া সোরা, ৬০ সের জল একত্র করিয়া তাহাতে মাংস মগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে, কিম্বা খানিকটা শুষ্ক লবণ ও অল্প পরিমাণ সোরা লইয়া মাংসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে, এবং উহা হইতে নিঃসৃত জলীয় পদার্থকে প্রতিদিন পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ লবণ মর্দ্দন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক করিলেও মাংস বা মৎস্য অনেক দিন থাকে। এবং বরফের মধ্যে রাখিলেও উত্তম থাকে।

এদেশে নানা প্রকার পিষ্টক ব্যবহৃত হয়। বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন স্বাদ পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অল্প পরিমাণে উহা খাইলে অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস কেবল পিষ্টকাদি আহার করিলে যে পীড়া হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অনুরোধ বা লোভপরবশ হইয়া অধিক পরিমাণে পিষ্টক ভক্ষণ করা অবৈধ।

খাদ্যের বিষয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি আনুষঙ্গিক বা সহকারী খাদ্যের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক।

লেবু।—কাগচি বা পাতি লেবু, এই দুই প্রকারই আহারের সময় ব্যবহৃত হয়। লেবুর গন্ধ অতি উত্তম, উহার রসে সাইট্রিক য়্যাসিড নামক অম্ল পদার্থ আছে এবং উহার ত্বক (খোসা) অত্যন্ত ক্ষুধা উদ্দীপক। নুন-লেবু, লেবুর আচার ইত্যাদি সামগ্রী অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

আচার ও কাসুন্দি।—অনেকের এরূপ অভ্যাস আছে যে, আচার বা কাসুন্দি না হইলে আহারে তৃপ্তি বোধ হয় না। উহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করায় উপকার আছে।

এদেশে অনেক প্রকার মসলা ব্যবহৃত হয়। পরিমিতরূপে ব্যবহার করিলে তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। সচরাচর গোলমরিচ, লঙ্কা, ধনে, জিরা, তেজপাত, হরিদ্রা ও সর্ষপ ব্যবহৃত হয়। কখন কখন আর্দ্রক, পলাণ্ডু, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, জায়ফল, ও জৈয়িত্রী ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। মসলার প্রধান গুণ এই যে, উহা পাচক-যন্ত্র সমুদয় হইতে অধিক রস নিঃসারণ করিয়া তাহাদের পাচিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। মসলা সকল উত্তেজক গুণবিশিষ্ট, এ নিমিত্ত অধিক ব্যবহার করিলে পাক-যন্ত্রের প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা, কিম্বা অধিক পরিমাণে দূষিত পাচক রস উৎপন্ন হইয়া পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত ও উদরাময় রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

অম্ল।--আহারের সহিত অম্ল ব্যবহার করা সমস্ত বঙ্গদেশের অভ্যাস; আহারের শেষভাগে কিঞ্চিৎ অম্লরস বিশিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিলে তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে খাদ্য জীর্ণ হইবার ব্যাঘাত জন্মে।

তাম্বুল।—আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ প্রথা এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এই প্রথাটি অতি স্বাস্থ্যকর। পানে যে সমুদয় মসলা থাকে, তাহাদিগের সাহায্যে খাদ্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র জীর্ণ হয়। সুপারি চর্ব্বণ-কালে প্রচুর লালারস এবং ধনে, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা

অধিক পরিমাণে পাচক রস সমুদয় নিঃসৃত হয়, ও পাকস্থলী ও অন্ত্রের সুস্থতা সম্পাদিত হয়। অন্ন যাহাদিগের প্রধান খাদ্য, পান ও মসলা ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অতীব হিতকর প্রথা। আহারান্তে ব্যতীত অন্য সময় পান খাওয়া অনুচিত। অধিক পরিমাণে পান খাইলে ক্ষুধামান্দ্য হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। অনেক বালিকা অতি অল্প বয়সে অধিক পরিমাণ পান খাইয়া পাচক-যন্ত্রের ও দন্তের পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে। তাহাদের শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়, উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যে রুচি থাকে না, এবং তাহারা বয়স্থা হইলে দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত নানা ক্লেশ পাইয়া থাকে।

শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

বিন্ধ্যবাসিনী।

উত্তর ভাগ।

(১)

দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালা বেষ্টি চারিদিকে,
সুচ্ছায় কানন তরু শোভে গায় গায়,
বৃত্তাকারে গড়খাই খোদিত অন্তিকে,
মধ্যে পুরী, দস্যুরাজ বিরাজে যথায়। *

(২)

বিস্তীর্ণ চত্বর ভূমি—রাজ দরবার,
বসি সেথা কৃষ্ণদস্যু প্রসন্ন আননে
করিছে মন্ত্রণা কিম্বা ব্যবস্থা বিচার
বেষ্টিত হইয়া যত অনুচর গণে।

(৩)

কহে দস্যুপতি :—"এই ঋষির কুমার
দুই মাস অবস্থান করিয়া হেথায়
শিখায়েছে আর্য্যদের অস্ত্র ব্যবাহার,
উপযুক্ত প্রতিদান কি করি উহায় ?

(৪)

"যার তরে আসিয়াছে, এখনো তাহায়
পায়নি নিকটে যুবা করিতে দর্শন,
না জানি নিষ্ঠুর কত ভেবেছে আমায়,
আজি তারে ওর করে করিব অর্পণ।

(৫)

"দিব শত গজ দন্ত, উজ্জ্বল প্রস্তর,
মনে করে আর্য্যজাতি বহুমূল্য যারে ;
সতত করিব রক্ষা এদের নগর,
আচরিব পরস্পরে মিত্র ব্যবহারে।

(৬)

"নিশিশেষে পতি পত্নী ফিরে যাবে ঘরে,
সঙ্গে যাবে একশত যোগ্য অনুচর ;
করি সবে মদ্যপান আনন্দ অন্তরে,
বিদায় উৎসবে মত্ত কর এ নগর।"

(৭)

জয় জয় রবে সভা করিয়া কম্পিত
বর্ব্বরের অনুচর করে মদ্যপান ;
আত্মকীর্ত্তিময় যত সমর সঙ্গীত,
বেষ্টি ঋষি পুত্রে তারা করে সবে গান।

(৮)

চারিদিকে কোলাহল, মধ্যে যুবা ঋষি,
সাশ্রুনেত্রে ধ্যায় আর্য্য দেবের মহিমা ;
গণিছে কখন দিবা অন্তে আসে নিশি—
হেরিবে যখন তার প্রাণের প্রতিমা।

(৯)

ক্রমে দিবা অবসান ; রবির কিরণ,
গিরিশিরে মেঘস্তরে নানা বর্ণে ভরা

* যে অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া, আর্য্যজাতি, এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহারা বর্ব্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগের যে গড় ছিল, নগরী ছিল, ঋগ্বেদেও তাহার উল্লেখ আছে। যে হিসাবে ইংরাজের দৃষ্টিতে আমরা বর্ব্বর, তাহারাও, সেই অতি প্রাচীনকালে সেইরূপ বর্ব্বর ছিল।

রচে গিরি শত শত ; শোভিল কানন
উজ্জ্বল কমলাবর্ণে ; রম্য চারু ধরা।

(১০)

অসংখ্য বিহঙ্গ কণ্ঠে উঠিল সংগীত
ছাইয়ে কাননস্থল, ছাইয়ে গগন ;
বিপুল কানন ভূমে মৃদুল ললিত
বহিল আনন্দে স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ।

(১১)

থামিল উৎসব গীতি, আদেশে রাজার ;
ভঙ্গ হ'ল দরবার। একাকী তখন
বসিলেন ঋষিপুত্র নিকটে তাঁহার,
হইল উভয়ে কত প্রীতি আলাপন।

(১২)

কহে রাজা ; "শুন শুন হে ঋষি কুমার,
অচ্ছেদ্য মিত্রতা পাশে মোদের অন্তর
বদ্ধ হল আজি হতে ; বিপদে তোমার
জানিও সহায় আমি রব নিরন্তর।

(১৩)

"স্পর্শে নাই দেহ কেহ তব রমণীর ;
চল তার গৃহে আজি।" শুনিয়া যুবার
পুলকে উঠিল কাঁপি সমগ্র শরীর ;
সাশ্রুনেত্রে ধন্যবাদ করিলা অপার।

* * * * *

(১৪)

জ্যোছনা প্লাবিত নিশি স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ;
নিস্তব্ধ কানন গিরি ভূতল গগন ;
নিস্তব্ধ নিদ্রার কোলে যতেক বর্ব্বর ;
দস্যুপুরে নিদ্রাশূন্য স্বধু দুইজন।

(১৫)

সম্ভাষি পতীরে পত্নী কহে মৃদুস্বরে ;
"দুই পত্নী আছে এই বর্ব্বর রাজার,
কনিষ্ঠা সতত হেথা অনুরাগ ভরে
লইত অশেষ তত্ত্ব বন্দিনী আমার।

(১৬)

"অতীব নির্দ্দয় জ্যেষ্ঠা জানিল যখন
আসে সে আমার পাশে সান্ত্বনিতে চিত,
নিষেধ করিল তারে করিয়া তর্জ্জন,
বন্দীসহ সদালাপ ভাবি অনুচিত।

(১৭)

"তবুও গোপনে নিত্য আসিত বসিত,
ভুলিতাম নির্জ্জনতা তাহার কৃপায় ;
মর্ম্মে মর্ম্মে স্মৃতি তার রহিল গ্রথিত,
একবার তারে প্রাণ দেখিবারে চায়।

(১৮)

"প্রত্যূষে করিব যাত্রা ; তখন তাহায়
পাবনা সাক্ষাৎ, তাই নিশীথে এখন
যাইব তাহার পাশে মাগিতে বিদায়,
আছে যথা একাকিনী করিয়া শয়ন।

(১৯)

"আজি নিশি একাকিনী আপনার ঘরে
প্রতীক্ষিয়া রবে মোরে, বলেছে গোপনে।
বিশেষ আছেন রাজা বাহির চত্বরে,
পূর্ণিমায় এই রীতি বর্ব্বর ভবনে।" (১)

(২০)

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত আর্য্যের নন্দন,
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিতে দিলেক সম্মতি ;
বাহিরিলা পত্নী একা ত্যজিয়া শয়ন,
অপেক্ষিয়া আগমন রহিলেন পতি।

(২১)

চাহিয়া পশ্চাতে আর চাহি চারি ভিতে,
এলোকেশে, এলোবেশে, মৃদু পাদে নারী
বাহির চত্বর মুখে উদ্বেলিত চিতে
চলিলা ; পাপিষ্ঠা কিরে আর্য্যের কুমারী ?

(২২)

অন্তঃপুরে যাবে বলি স্বামীরে ছলিয়া
রাজার শয়ন ঘরে যায় আর্য্যনারী ?

(১) গণ্ড ভীলাদির মধ্যে অদ্যাপিও এই রীতি প্রচলিত আছে।

ছি ছি কলঙ্কের কথা কি হবে বলিয়া ;
অসার রমণীদেহ স্বধু পাপে ভারি।

(২৩)

ট্রৈলসের অনুরাগ দলি পদতলে
পাপীয়সী কলঙ্কিণী ক্রেসিদা যেমন—
ভুলি দিওমিদিসের অনুরাগ-ছলে
ঘৃণিত যৌবন তারে করিল অর্পণ—

(২৪)

তেমনি কি ঋষিপত্নী ডুবিলা নরকে
আর্য্যের প্রণয় ত্যজি বর্ব্বরের তরে ?
নতুবা স্বামীরে কেন ভুলায়ে কুহকে
প্রবেশে নিশীথে দস্যু-রাজার চত্বরে ?

(২৫)

ঘুমাইছে দস্যুপতি গভীর নিদ্রায় ;
বিশাল উরস আর কপোল ছাপিয়া
বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ শোভা পায়
স্ফুট শুভ্র চন্দ্রালোক অঙ্গেতে মাখিয়া।

(২৬)

যৌবনের দীপ্ত শ্যামবর্ণ সমুজ্জ্বল
ভাতিছে ললাটে মুখে জ্যোছনা প্লাবিত
বহিছে গভীর শ্বাস সম অচঞ্চল,
পূর্ণ স্বাস্থ্য দীর্ঘ আয়ুঃ করিয়ে সূচিত।

(২৭)

নিঃশব্দে শয্যার পাশে বসিয়া তখন
পরশিয়া অঙ্গ, বালা ডাকে মৃদুস্বরে।
চমকিয়া দস্যুপতি মেলিয়া নয়ন
দেখিল আর্য্যের পত্নী, বিস্মিত অন্তরে।

(২৮)

"কি চাও ললনা তুমি, কেন এ নিশিতে
আসিয়াছ একাকিনী নিকটে আমার ?
এসেছ বা পতি সঙ্গে গোপনে কহিতে
বলিতে পারনি যাহা সাক্ষাতে সবার ?

(২৯)

"সুজন সুন্দর বীর তব প্রিয়পতি,
বহু উপকারে বাধ্য করেছেন মোরে ;
যা চাহিবে তাঁর তরে দিব তাহা সতী,
হইয়াছি বদ্ধ মোরা মিত্রতার ডোরে।

(৩০)

"কহ গো নির্ভয়ে তুমি খুলিয়া পরাণ
ভুলি যত পূর্ব্বকৃত মন্দ আচরণ ;
দস্যু বটে, তবু পর নারীর সম্মান
করিতে কুণ্ঠিত মোরা নহি কদাচন।"

(৩১)

"কি কহিব দস্যুপতি," কহে আর্য্যবালা—"
"প্রভাতে বিদায় লবে বন্দিনী রমণী
কিন্তু চিরদিন তরে অন্তরের জ্বালা—"
কহিতে কহিতে কথা থামিল অমনি।

(৩২)

শুভ্র ক্ষুদ্র দন্তে দংশে ফুল্ল বিম্বাধর,
নয়নে মোহিনী জ্যোতি চাপিল পাতায়,
গণ্ডে রক্তরেখা ভাসে সুগভীরতর,
তরল লাবণ্য ছেয়ে জ্যোছনা খেলায়।

(৩৩)

"মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি!" ভাবে দস্যুপতি ;
"অনুভবে যাহা মনে হতেছে উদিত
সম্ভবে কি কভু তাহা ? কভু আর্য্য সতী
শুনিনি ত কলঙ্কিনী পাপমগ্ন-চিত ?"

(৩৪)

প্রকাশে কহিল দস্যু, "বুঝিতে না পারি
কি কামনা করি মনে আসিলে হেথায় ;
জানে যদি পতি তব, একা তুমি নারী
এসেছ আমার পাশে, মরিবে লজ্জায়।"

(৩৫)

কহে পাপীয়সী, "এই হৃদয় আমার
তোমারে করেছি মনে মনে সমর্পণ,
সাধ নাই আর্য্যপুরে ফিরিতে আবার ;
হউক আমার নামে কলঙ্ক রটন।

(৩৬)

"আর্য্যের কঠোর বিধি, ইন্দ্রিয় দমন,
ব্রহ্মচর্য্য, তৃপ্তি তাহে হয় না আমার,

উদ্দাম স্বাধীন এই বর্ব্বর জীবন,
নৃত্য গীত, মদ্যপান, ইচ্ছি ভুঞ্জিবার।

(৩৭)

"সুন্দর আমার স্বামী, কিন্তু মুখে তাঁর
কামনা লালসা মাখা হাসি রাশি নাই;
শুধুই বৈদিক নিষ্ঠা—শুদ্ধ সদাচার,
নিয়মিত হাসি, কথা—আমি নাহি চাই।

(৩৮)

"কি বলিব দস্যুপতি, প্রাণপতি তুমি;
তোমারে পাইলে হবে বাসনা পূরণ;
স্পর্শিব না এই পদে শুষ্ক আর্য্যভূমি,
তুমি লও এই মম জীবন যৌবন।"

(৩৯)

"কি বলে বিদায় করি স্বামীরে তোমার?
বহু উপকারে তাঁর ঋণী মোরা সবে।
কিরূপে বল না ভঙ্গ করি অঙ্গীকার?
সত্যপ্রিয় বলি মোর গর্ব্ব কোথা রবে?

(৪০)

"নিষ্ফল প্রার্থনা তব; ফিরে যাও ঘরে।
কি কর কি কর বালা? স্পর্শিও না আর—
জেনো স্থির, তুচ্ছ এক রমণীর তরে,
দিব না হইতে প্রাণে কলঙ্ক সঞ্চার।"

(৪১)

উঠিল সে পাপীয়সী; গেল বেগ ভরে,
যদিও জীবন্তে মৃত হইল পরাণ।
একাকী তখন দস্যু বিস্তীর্ণ চত্বরে
চিন্তায় হইয়া মগ্ন রহিল শয়ান।

* * * * *

(৪২)

দ্বিতীয় প্রহর দিবা; সূর্য্যের কিরণ
ঝলসিছে ঘনন্যস্ত বৃক্ষের পাতায়।
তপ্ত নগ্নশৈল করে অগ্নি উদ্গীরণ;
লুকাইছে পশু পক্ষী নিবিড় ছায়ায়।

(৪৩)

এই যেন স্পর্শে দেহ সমীর শীতল,
অগ্নির ঝলকে পুনঃ যায় শুকাইয়া;
যেন বহ্নি খুঁজি খুঁজি ঘন ছায়াতল
দহে সমীরণে, যেবা থাকে লুকাইয়া।

(৪৪)

ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে এ হেন সময়
আর্য্যপতিপত্নী, শত বর্ব্বরের সাথে
উপনীত হল যথা শৈল গুহাদ্বয়,
ছায়াময়, পরিপূর্ণ সুশীতল বাতে।

(৪৫)

লভিতে বিশ্রাম সবে, দক্ষিণ গহ্বরে
প্রবেশিল ধীরে ধীরে; মধ্যভাগে যার
বিকট রমণীমূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরে;
রাজ্য রক্ষা কর্ত্রী যিনি বর্ব্বর রাজার।

(৪৬)

আচম্বিতে উঠে শব্দ ধীর ভয়ঙ্কর;
'অসতী রমণী হেথা প্রবেশিতে নারে'
সভয়ে কাঁপিল আর্য্য নারীর অন্তর,
ভয় শুষ্ক মুখ তার সবাই নেহারে।

(৪৭)

'সতী অসতীর এই পরীক্ষার স্থল'
আবার উঠিল শব্দ ধ্বনিয়া গহ্বর;
'অসতী স্পর্শিলে এই দেবীপীঠতল,
মরিয়া হইবে এই শিলার প্রস্তর'।

(৪৮)

সন্দেহ উপজে সদা গভীর প্রণয়ে;
ভাবে ঋষিঃ "কি বিশ্বাস বর্ব্বর কথায়?
কি জানি কি ঘটিয়াছে রাজার আলয়ে,
মীমাংসা করিব তাহা দৈব পরীক্ষায়।

(৪৯)

অনার্য্য জাতির এই দেবতা, প্রস্তর;
বিশ্বাস করি না তায়। কিন্তু পত্নী লয়ে
না করি পরীক্ষা যদি, ভাবিবে বর্ব্বর—
অসতী লইয়া ঋষি ফিরে গেল ভয়ে।

(৫০)

কহিল প্রকাশেঃ "প্রিয়ে নিঃশঙ্কে এখনি
কর স্পর্শ পীঠতল, নিষ্কলঙ্ক তুমি;

সতী পতিব্রতা নিত্য আর্য্যের রমণী-
সাক্ষ্য দিবে একথায় অনার্য্যের ভূমি।"

(৫১)

স্রোতরূপে বহে ঘর্ম্ম; অসাড় শরীর;
বক্ষের ধমনী শিরা হইল নিশ্চল।
লুঠাইয়া পীঠতলে আর্য্য রমণীর
পড়ে মৃত দেহ লতা, কলঙ্কি ভূতল।

(৫২)

বিস্ময়ে বর্ব্বর যত চাহে দেবী পানে;
বিস্ময়ে মুদিল চক্ষু আর্য্যের কুমার।
হেনকালে অলক্ষিতে মৃদুল আহ্বানে
'মিত্র' বলি পার্শ্বে কেহ ডাকিল তাহার

(৫৩)

চাহিল ঋষির পুত্র, চাহিল বর্ব্বর;
চেয়ে দেখে দস্যুপতি উপস্থিত তথা
সম্ভ্রমে সকলে দূরে হইল অন্তর;
দুজনা বসিয়া তারা কহে কত কথা।

(৫৪)

পত্নীর কলঙ্ক কথা কহি বিশেষিয়া,
প্রশংসিল মাহাত্ম্য সে আত্মদেবতার।
কহিল, 'যাও গো মিত্র দেশেতে ফিরিয়া,
হইয়াছে উপযুক্ত এ দৈব বিচার।'

(৫৫)

অনার্য্য দেবতা পূজা সে দিন হইতে
অনুষ্ঠিত আর্য্যকুলে হল ধীরে ধীরে।
বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্ত্তি আর্য্যের মহীতে
আজো আছে প্রতিষ্ঠিত বিন্ধ্যাচল শিরে।*

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রেমের পরীক্ষা।*

(সমালোচনা)

'প্রেমের পরীক্ষা'র নায়ক একজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাঙ্গালী যুবক। তাঁহার সাধনার চরম লক্ষ্য—সুখ অন্বেষণ; তাঁহার নিরাশ জীবন-সঙ্গীত 'হায়! তুমি সুখ! কোথায় তুমি, কিসে তুমি, কেমন তুমি?'

যুবক সম্ভবমত জ্ঞান-চর্চ্চা করিলেন—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির ভাসা ভাসা আস্বাদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে সুখ মিলিল না। বুঝিলেন, জ্ঞান-চর্চ্চা সুধু বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কি কর্ম্মে সুখ? কর্ম্ম করিবেন? কিন্তু কাহার কর্ম্ম, কোথায় কর্ম্ম? হীন বাঙ্গালীর আবার কর্ম্ম কি? কর্ম্মে সুখই বা কি? কর্ম্ম করা হইল না। একটি গৃহ-লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা হইয়া গৃহ আলো করে; বন্ধুবর্গের ইচ্ছা—যুবা প্রেমের কুসুম-ডোরে হৃদয় বাঁধিয়া ত্রিদিবের সুখাস্বাদন করে। দাম্পত্য-প্রেমে কি সুখ আছে? হয় ত আছে? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? অনেক ভাবিয়া শেষে যুবা, পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইলেন।

নবীন প্রেমে একটা মত্ততা আছে, একটা হৃদয়ব্যাপী মোহ আছে। যুবক তাহার ঘোরে দিন কয়েক কি এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির আবেশে জীবন কাটাইলেন। সুখের কাঙালের চক্ষে সুখাভাসই সুখ বোধ

* এলাহাবাদের অদূরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল নামক রেল-ওয়ে ষ্টেসনের অনতিদূরে, পর্ব্বতগুহায়, বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন বিন্ধ্যবাসিনী আর্য্যের দেবী

হইল। ক্রমশঃ প্রণয়ের মত্ততার অংশ কাটিয়া গেল, উচ্ছল জীবন-স্রোতে ভাঁটা পড়িল। হৃদয় অবসাদ-ক্লিষ্ট হইল। সুখ? কই সুখ? প্রেমে ত সুখ নাই। প্রেম? ও কবির কল্পনা। পিপাসীর তৃষ্ণা কি প্রেম-গোষ্পদে নির্ব্বাপিত হয়?

তবে কোথা সুখ? সংসারে সুখ নাই; সুখ বোধ হয় অরণ্যে। যুবা সুখের অন্বেষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিল—সাধ, একবার দেখিবে, সে দুর্লভ রত্ন কোথায়, যাহা পাইলে সকলই পাইলাম বলিয়া মনে হয়। জনশূন্য অরণ্যানী মধ্যে, অনন্ত আকাশ-তলে, বৃক্ষ-পত্রের মর্ মরে, তটিনীর কলকলে, বিহগীর কূজনে, অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতির শান্তি-অভিনয়ে কিছু দিন উদ্বেল অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করিল। কিন্তু সুখ কই? এ ত সুখ নয়। যুবক বুঝিল যে, যে নিজে সুখী, তাহার চক্ষে বিশ্বও সুখময়। আবার চলিল; সুখের সন্ধানে সাত বৎসর ভারতের নানা-তীর্থে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিল। কিন্তু কোথায় সুখ? কিসে সুখ?

শেষে বুঝিল, সুখ-অন্বেষণ মানুষের দুর্বুদ্ধি। সুখ খুঁজিলে মিলে না, সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী প্রণয়িনী, জগদ্ধাত্রী জন্মভূমি এ সকল পরি-হার করিয়া অরণ্য-বাস, মানুষের উপযোগী নহে। ব্যাকুল প্রাণে আবা রজননীর ক্রোড়ে, প্রণয়িনীর হৃদয়ে ফিরিয়া চলিল। স্বদেশ, স্বভূমি, মাতৃভূমির উদ্দেশে ফিরিয়া চলিল।

গৃহে আসিয়া কি দেখিল? পতিপ্রাণা পতি-বিরহে মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিয়াছে—কোমল সেফালিকা প্রভাত না হইতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। বুঝিল, সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র বেদনার অক্ষরে এ শিক্ষা অঙ্কিত হইল। কিন্তু জগৎ বিলাপের স্থান নহে; ইহা অতি ঘোর কঠোর কর্ম্ম-ভূমি। যুবকের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষা এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। যুবা জীবনের অবশেষ, জীবনের ধ্রুবতারা সেই সর্ব্বাতিশায়ী সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া জন্ম-ভূমির সেবায় নিয়োজিত করিল।

এই প্রেমের পরীক্ষার গল্পাংশ। গল্পাংশ বেশ সরস ও সুন্দর হইয়াছে। কারলাই-লের পাঠক দেখিবেন যে, নায়কের জীবনে 'Teufelsdrockh'এর (Carlyle's Sartor Resartus) ছায়া বিদ্যমান। উভ-য়ের ব্যাধির স্বরূপ একই—সুখের অদর্শনে হৃদয়ের নৈরাশ্য-বিকার। তাহার ফলে উভয়েরই জীবন-মর্ম্মহীন—ভার মাত্র; আত্মা, অবিশ্বাস-অন্ধকারিত। বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মত উভয়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পৃথিবীময় শান্তির উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু 'শান্তি, সুখে নয়, সুখ-ত্যাগে, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নয় আত্ম-বিসর্জ্জনে' এই বুঝিয়া উভয়ই শান্তি লাভ করে। Teufelsdrockh এর ছায়া থাকি-লেও 'পরীক্ষা'র নায়ক স্বতন্ত্র সৃষ্টি; Teufelsdrockh পাশ্চাত্য নৈরাশ্যের প্রতিকৃতি; পরীক্ষার নায়ক অধুনাতন বাঙ্গালী-নৈরাশ্যের প্রতিবিম্ব। তবে পাশ্চাত্য নৈরাশ্যের স্বরূপ প্রচণ্ডতর ও পরিমাণ প্রকাণ্ডতর, সেই জন্য Teufelsdrockhএর গঠন-প্রণালী প্রচণ্ডতর এবং প্রকাণ্ডতর। আর Teufelsdrockh এর সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সংঘর্ষের এবং আশা ও নিরাশার প্রতিদ্বন্দ্বের যে বিপুলতা, তাহা 'প্রেমের পরীক্ষা'র সে পরিমাণে নাই।

'সারটারে'র সহিত তুলনায় 'প্রেমের

পরীক্ষা'র আর একটু ত্রুটি লক্ষিত হয়। গল্পাংশ পাঠে আমরা দেখিয়াছিলাম যে, যুবক—জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে, সংসারে, সুখ না পাইয়া অরণ্য আশ্রয় করে। সেখানেও সুখ না পাইয়া নানা দেশে নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু তাহাতেও সুখ পায় না। শেষ আপনার ভ্রম বুঝিয়া আবার লোকালয়ে ফিরিয়া যায়। হৃদয়ের এ পরিণতি বা বিপরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নহে। রত্নও মানুষের কাছে পরিচয়ে অবজ্ঞাত হয়; কিন্তু হারাইলে তবে মানুষ রত্নের মহার্ঘতা বুঝিতে পারে। রত্নের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, জগতের সকল পদার্থ-সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। অতএব যুবকের চিত্তের ঐ বিপরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রেমের পরীক্ষায় যেন এ বিপরিবর্ত্তন কিছু হঠাৎ সংঘটিত হইয়াছে; অন্ততঃ কি প্রণালীতে, কি পর্য্যায়ে, কেমন করিয়া যুবার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল—তিনি নবজীবন লাভ করিলেন, কবি তাহার বিবরণ বিশদ করেন নাই। কাব্যের অন্যান্য অংশে কূটচিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, হৃদয়ের ছবি যেরূপ উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করিয়াছেন, এ অংশ সেরূপ ফুটে নাই। এরূপ কাব্যের ইহাই সংকট সন্ধিস্থল—এখানেই জীবন-মরণের মিলন। এ অংশ বিশেষ বিশদ হওয়া আবশ্যক। কার্‌লাইল এ স্থলে পরতে পরতে নায়কের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিশ্বাস অবিশ্বাস, আশা নিরাশার ক্রীড়ারঙ্গ বুঝাইয়াছেন। ঐরূপই করা উচিত।

নূতন গ্রন্থের দোষ উদ্ঘাটন করিলাম। দুই একটা গুণের পরিচয় দিই। গ্রন্থের ভাষা গদ্য-কাব্যের উপযোগী;—সরস' তীব্র, করুণ, সালঙ্কার। গদ্যপদ্যের মধুর মিশ্রণ; কাব্যের সকল উপাদান আছে, কেবল ভাষার স্রোতে ছন্দের বাঁধ নাই। এই ভাষাই গদ্য-কাব্যের উপযোগী। এ ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন নহে; বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের দপ্তরে ইহার সৃষ্টি ও পূর্ণ বিকাশ; চন্দ্রশেখর বাবুর উদ্ভ্রান্ত-প্রেমে ইহার উৎকৃষ্ট অনুকরণ। আমাদের কবির লেখনীতেও এ ভাষা বেশ ফুটিয়াছে।

স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক বর্ণনাও সুন্দর হইয়াছে। ষষ্ঠাংশের ২য় অধ্যায় ইহার উদাহরণ। চেতন পদার্থের মত প্রকৃতিরও একটা প্রাণ আছে; এ প্রাণ প্রকৃতির হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। আমার মনে হয়, এ প্রাণের সহিত কবির যেন কতক পরিচয় হইয়াছে।

কূট চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণের কথার পূর্ব্বেই কিছু আভাষ দিয়াছি। কবি, অল্প কথায় প্রথম প্রেমের অতি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। মনে হয়, নববধূর ব্রীড়া-বিনম্র প্রেম অভিনয় যেন তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া আঁকা। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রেমের অবসাদ-কাহিনী আরও মনোরম। কূল-বিপ্লাবী নদীর জল সরিয়া গেলে,যেমন একটা বিরস অবকাশ রহিয়া যায়, প্রণয়-সাগরে ভাঁটা পড়িলেও, তেমনই কেমন একতর হয়। প্রাণে প্রেম নাই—মুখে রাখিতে হয়; হৃদয়ের মিলন নাই—দেহের মিলন রহিয়া যায়। কবি এই বিষাদ-ছবি এমন উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে মানবের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতে হয়।

প্রেমের পরীক্ষা যে জাতীয় কাব্য, তাহার দুই উপায়ে উপসংহার হইতে পারে। নায়কের আত্মহত্যায় অথবা রোগের উপশমে। নিরাশা-কবিরা প্রথম উপায়ই অবলম্বন করেন; তাহাতে মানুষের জীবন-অন্ধকার গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম হয়; আর স্বর্গের আশীর্ব্বাদ এই কাব্য কবিত্বের উচ্চ প্রয়োজন সাধিত না করিয়া আত্মাদরী অসহিষ্ণু মানবের আত্মাদর ও সুখ-প্রিয়তার সহায়তা করে। বাইরণ, হাইনে প্রভৃতির কাব্য অনেক স্থলে উক্ত দোষে দুষ্ট। আমার মনে হয়, 'পরীক্ষা'র কবি, নায়কের ব্যাধির প্রশমন দেখাইয়া সদ্‌দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি যে পথের পথিক,—গেটে, সেক্ষপীয়র প্রভৃতির তাহাই অনুমোদিত। কাহারও কাহারও বিশ্বাস আছে যে, আত্মহত্যা, রক্তপাত, খুনাখুনি, দুই চারিটা না থাকিলে বিয়োগান্ত কাব্য সিদ্ধ হয় না। এ মত, বড় সুসঙ্গত নহে; বিয়োগ মানব-হৃদয়ে, কাব্যের ছত্রে বা নাটকের রঙ্গভূমে নহে। তা' ছাড়া আমার বিশ্বাস, 'পরীক্ষা'য় যে উচ্চ শিক্ষা নিহিত আছে,নায়কের আত্মহত্যায় সে শিক্ষা নিষ্ফল হইত। কাব্যের চরম উদ্দেশ্য, লোক-শিক্ষা—মানুষের জীবনের পথে সহায় হওয়া। আত্মহত্যায় কি তাহা সাধিত হইত?

কিন্তু কবির প্রধান গুণপনা এ সকলে নহে। সে গুণপনা এইরূপে। কবি জাতীয় জীবনের সমালোচক; অর্থাৎ কোন জাতির কোন কালে আশা উৎসাহ উদ্যম বিষাদ ব্যাকুলতার যে বিশেষত্ব থাকে, কবির কাব্যে তাহারই ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। হ্যামলেট, রঙ্গদর্পণে যে প্রতিফলনের প্রসঙ্গ (Holding the mirror up to Nature) করিয়াছেন, তাহারও বোধ হয় অর্থ এই। এজন্য কেহ কেহ ক্লাফ্‌কে (Clough) টেনিসন অথবা ব্রাউনিং অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবি বলিয়াছেন; যেহেতু এই শতাব্দীর ইংলণ্ডের বিশেষত্ব ক্লাফের কাব্যেই উজ্জ্বলতর প্রতিফলিত হইয়াছে। 'প্রেমের পরীক্ষা'ও এই ধরণের প্রশংসার উপযোগী। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, পরলোকে ও পরমেশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস হারাইয়া, বিদেশী শিক্ষার বশে কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন উদ্দেশ্যহীন বাঙ্গালীর হৃদয়ে, মর্ম্মশূন্য জীবনের যে গুরুভার অনুভূত হইতেছে, কবি তাহার চিত্র বাঙ্গালীর নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন, এই তাঁহার চরম প্রশংসার কথা। প্রেমের পরীক্ষার এই সারবত্তা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি। তাই সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বাবুর দীর্ঘ কবি জীবন কামনা করি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য।

যতদূর বুঝিয়াছি, জাতিভেদ সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর মত এই যে, মৌলিক বর্ণভেদ অর্থাৎ মৌলিক কুলভেদ হইতে আকার ও প্রকৃতির পার্থক্য হইয়াছে। আকার ও প্রকৃতির পার্থক্য হইতে ব্যবসায় ভেদ হইয়াছে। (সামাজিক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩৮) এবং ব্যবসায়ভেদ হইতে জাতিভেদ হইয়াছে। সুতরাং জাতিভেদ ত্রিবিধভেদ-মূলক—কুলভেদ, আকার ও প্রকৃতিভেদ ও ব্যবসায়ভেদ, এই ত্রিবিধ পার্থক্যজাত।

তাই ভূদেব বাবু বলেন, "ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়।" ভূদেব বাবুর এই ব্যাখ্যাতে জাতিভেদের মূলের গভীরতা ও দৃঢ়তার সম্যক্ কারণ দেখা যাইল না। ভারতবর্ষের জাতিভেদে যে বিশেষত্ব আছে, ভূদেব বাবুর ব্যাখ্যাতে তাহার হেতু নির্ণয় হয় নাই, কেন না, মৌলিক বর্ণভেদ তাহার প্রধান কারণ নহে। মৌলিক বর্ণভেদ অন্য অনেক দেশেও আছে। ইংলণ্ডে, গ্রীসে, ইতালীতে, মিসরে, যত মৌলিক বর্ণ একত্রিত হইল। কিন্তু, কই, তাহাতে ত সেখানে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইল না। যদি ইংলণ্ডে বা নব্য ইতালীতে, মিশর বা নব্য গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিকভেদের বহুত্বের প্রচুরতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে, তাহা হইলে না হয় তাহা ছাড়িয়া দিন। কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে, ইংরাজ হইতে নিগ্রো পর্য্যন্ত, কত দেশের কত জাতি সেখানে একত্রিত হইতেছে, কত ভিন্ন ভিন্ন মৌলিকবর্ণ তথায় মিশ্রিত হইতেছে। তাহাদের বিবিধ আকারের ও প্রকৃতির কত পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি সেখানে ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইল না কেন? সেখানে "সঙ্করো নরকায়ৈব" বর্ণসঙ্কর নরকের নিমিত্তই হয়, এ মত প্রচারিত ও গৃহীত হইল না কেন? সেখানে যাহারা মোটেই "সমবর্ণ এবং সমাকার" বিশিষ্ট নহে, তাহাদিগের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে কেন? আর ভারতবর্ষে হয় না কেন?

হিন্দুদিগের জাতিভেদ যে কেবল মৌলিক বর্ণভেদের উপর স্থাপিত, তাহা নহে। এই মৌলিক বর্ণভেদের সঙ্গে জেতৃজিতভেদ বা রাজনৈতিকভেদ মিলিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিকভেদের উদ্দেশ্য জেতৃগণের অর্থাৎ দ্বিজগণের প্রভুত্ব রক্ষা করা। সেই রাজনৈতিক-ভেদ পোষণ করিবার জন্য, সামাজিকভেদ অর্থাৎ ব্যবসায়ভেদ ও বিবাহভেদ বিধান করিতে হইয়াছিল। এবং এই সামাজিকভেদ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান স্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ, ধর্ম্মের ভিতরে নিজের স্বার্থ প্রবেশ করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মিস্ত্রিগণ কর্ণিক হাতে করিলেন, ব্যবস্থার উপর ব্যবস্থার প্রস্তর দিয়া অতি কৌশলময় মসলায় প্রাচীর গাঁথিতে লাগিলেন; ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের পর দুর্ভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিলেন। কেবল প্রাচীর গাঁথিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এই সকল প্রাচীর যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের মঙ্গলের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা দ্বারা, দিনরাত্রি প্রচার করিতে লাগিলেন। এখন যেমন ইংরাজ জেতৃগণ জিত ভারতবাসীগণের উপর কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিয়া ক্ষান্ত আছেন, ব্রাহ্মণগণ সেরূপ শূদ্রদিগের উপর কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। ব্রাহ্মণগণ রাজনৈতিক প্রভুত্ব এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রভুত্বে বিকশিত ও পরিণত করিয়া সেই প্রভুত্ব সর্ব্বাঙ্গীন ও অসীম করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যখন নিজের স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও তখন বলেন যে, সকলের হিতের জন্য, ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেরই মঙ্গলের জন্য, তাহা করিতেছেন।

কিন্তু সেই সব কথা আমরা সকল সময় বিশ্বাস করি না। কেন না, ইংরাজেরা আজিও উক্ত শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দেন নাই, এখনও আমাদিগের জ্ঞান-চক্ষু নষ্ট করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের কূপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করেন নাই। আমাদিগের ধন সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের অধীন হইয়াছে বটে; কিন্তু আমাদিগের মস্তিষ্ক, আমাদিগের বিচারশক্তি, এখনও একবারে ইংরাজদিগের অধীন হয় নাই। তাই, ইংরাজ যাহাই বলেন, তাহাই বিশ্বাস করিবার আমরা প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রদিগের উক্ত শিক্ষার পথ প্রথম হইতেই বন্ধ করিয়া দিয়া শূদ্রদিগের মস্তিষ্ককে আপনাদিগের মুষ্টির মধ্যে আনিয়াছিলেন। এই জন্য ব্রাহ্মণগণ যাহা বুঝাইলেন, অজ্ঞ শূদ্রগণ তাহাই বুঝিল, তাহাই মানিল।

এখন আমরা দেখিলাম, হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথা চতুষ্টয় ভেদের উপর স্থাপিত; (১) বর্ণ বা বংশ ভেদ, (২) রাজনৈতিক ভেদ (জেতা ও জিতের মধ্যে যে প্রভেদ), (৩) সামাজিক ভেদ (ব্যবসায় ভেদ ও বিবাহ ভেদ) (৪) ধর্ম্ম (বা অপধর্ম্ম ভেদ যথা দ্বিজদিগের সেবাই শূদ্রদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল)। হিন্দুদিগের জাতিভেদের বিশেষত্ব এই যে, অন্য দেশে যে মৌলিক শ্রেণীভেদ কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত থাকে, হিন্দুগণ তাহা তাহাদিগের বিশাল ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, এই প্রথাটীকে বিচিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; তাই হিন্দুদিগের জাতিভেদের এত দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা। তাহার উপর দাসত্বের ভিতর রাখিয়া, শূদ্রগণের প্রতি যতদূর সদয় ব্যবহার করা যাইতে পারে, দাসের প্রতি যতদূর দয়া দাক্ষিণ্য দেখান যাইতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ এক দিকে যেমন শূদ্রদিগের সম্পূর্ণ বশ্যভাবের বিধান করিয়াছিলেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণকে মৈত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য শাসনে শূদ্রের জীবন, এই দয়া-লালিত দাসত্ব নিতান্ত দুঃসহ হয় নাই। এমন কি, ইউরোপ ও মার্কিন দেশের সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর স্বাধীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই দাস শূদ্রগণের অবস্থা মন্দ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে অবশ্য হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের ব্যবহারিক প্রজ্ঞার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া, আমি, চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে মিলিয়া, বলিতে পারিব না যে, জাতিভেদে বৈষম্য নাই। ভূদেব বাবুর কথায়ও স্বীকার করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ বর্ত্তমান আকারে সমাজের উপযোগী বা মঙ্গলজনক (সাঃ প্রঃ পৃ ২৪০)।

হিন্দুদিগের প্রাচীন জাতিভেদের যে সকল গুণ ছিল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। পৃথিবীতে সকল দেশেই ধনের দম্ভ ও প্রতাপ বড় অধিক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ধনের দুর্দ্ধর্ষ দম্ভকে অনেক পরিমাণে দমিত করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, সম্মানিত ও পুজিত হওয়ায়, শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্মানিত ও পুজিত হইত। এখনকার Plutocracy অপেক্ষা তখনকার Brahminocracy হয়ত ভাল ছিল। প্রাচীনকালের

জাতিভেদে সম্ভবতঃ এমন কোন দোষ নাই, যাহা আধুনিক জাতিভেদশূন্য ইউরোপীয় সমাজে কোন না কোন আকারে অবস্থিত নাই। জাতিভেদ, মানুষে মানুষে ব্যবধান করিয়া দেয় বটে। ব্রাহ্মণ, শূদ্রের সহিত আহার করিতে পারেন না বটে। কিন্তু এখনও বিলাতে একজন লর্ড একজন ছোট লোকের সহিত আহার করেন না। জেতা ইংরাজ জিত ভারতবাসীর সহিত একত্রে আহার করিতে চাহেন না। ব্রাহ্মণ যতদূর আত্মীয়ভাবে ও ঘনিষ্ঠভাবে শূদ্রের সহিত মিশিতেন, ইংরাজ ভারতবাসীর সহিত ততদূর আত্মীয় বা সমভাবে মিশেন না। শূদ্রদিগের দাসত্ব নিবন্ধন দুরবস্থা কখনই বিলাতের সোয়েটিং (Sweating) প্রণালীর মজুরদিগের দুরবস্থার মত কষ্টজনক হয় নাই। এবং এখন স্বাধীন বেকার মজুরেরা ইউরোপে যেমন কষ্টভোগ করে, প্রাচীনকালে অধীন শূদ্রদাসগণ কখন বোধ হয় তেমন কষ্টভোগ করে নাই। এমন কি, এখন জাতিভেদ বন্ধনমুক্ত বাবুরা চাকরদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জাতিভেদ মানিয়াও তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল ব্যবহার করিতেন। পূজ্যপাদ ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-প্রণেতা তাঁহার একখানি গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে—সেকালের কর্ত্তারা জাতিভেদ মানিয়াও শূদ্র ভৃত্যগণকেও যথেষ্ট সমাদার করিতেন। তাহাদিগের সহিত দাদা মামা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইতেন। শূদ্রভৃত্যের শিশু সন্তানকে কোলে লইয়া আদর সোহাগ করিতেন। একালের বাবুরা সখ করিয়া কুকুর কোলে লইবেন, কিন্তু ভৃত্যশিশুকে কখন কোলে লইবেন না, যেন চাকরের শিশু সন্তান কুকুরের অপেক্ষাও ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্য। কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও আধুনিক খ্রীষ্টিয়ান সমাজের ভিতর এই একটী প্রভেদ দেখিতে পাই। প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যতদূর বৈষম্য দেখিতে পাই, ফলে সমাজে ততদূর বৈষম্য দেখিতে পাই না। আবার খ্রীষ্টিয়ান সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রে যতদূর সাম্য দেখিতে পাই, সমাজে ততদূর সাম্য দেখিতে পাই না। ইহার কারণ, বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ প্রভু হইয়াও ত্যাগী * হওয়াই তাহাদিগের ধর্ম্মের চরমসিদ্ধি মনে করিতেন। ইউরোপীয়গণ যেন প্রভু হইয়া ভোগী হওয়াই তাঁহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন। ইউরোপের সাম্যে প্রতিযোগিতা প্রবেশ করায়, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়নে, পরস্পরের হিংসা করার সমান অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। ফলে যেন এই অর্থ হইয়া পড়িয়াছে, প্রাচীন হিন্দুদিগের জাতিভেদ বৈষম্য দয়াপ্রসূত সংযোগিতা ভাবে দমিত হওয়ায় এক দিকে রক্ষা ও অন্য দিকে সেবার ভাবে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ শিক্ষা দিলেন যে "হে শূদ্রগণ বিধাতা তোমাদিগকে দ্বিজগণের সেবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। † দ্বিজসেবাই তোমাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের কাছে তোমার কোন অধিকার ¶

* গীতা।

† শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যংক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥
(মনু সং। ৮ অ—৪১৩।)

শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিত্তত্তবেত্তস্য নিষ্ফলম্॥
(পরাশর ১ অ—৬১)

¶ বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎদ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥
(মনু সং ৮ অ—৪১৭)

ও স্বত্ব নাই। তুমি ব্রাহ্মণের দাস।" অন্য দিকে, আবার ব্রাহ্মণগণকে শিক্ষা দিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, দাসের আহার না হইলে তুমি আহার করিতে পাইবে না।" (খ) ‡ এক দিকে বশ্যতা ও সেবা, অন্য দিকে রক্ষণ ও পালন। হিন্দুরা যেন বিবেচনা করিয়াছিলেন যে সকল লোক কিছু ঠিক সমান হইতে পারিবে না। সকল লোক ঠিক সমান জ্ঞানী, সমান ক্ষমতাশালী হইতে পারিবে না। কেহ ছোট কেহ বড় হইবে না। শূদ্রগণ ছোট হউক, আমরা বড় থাকি। ছোট যে সে বশ্যভাব স্বীকার করুক, বড়র আশ্রিত হউক, বড়র সেবা করুক, বড়র সমান হইতে চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকুক। তাহা হইলে ছোটতে আর বড়তে, সমাজের উচ্চলোকে ও নিম্নশ্রেণীর লোকে মাথা ঠুসাঠুসী হইবে না। অন্যদিকে যে বড় সে ছোটকে, আশ্রিত দাসকে, রক্ষা করুক, স্নেহের সহিত পালন করুক। এই বশ্য ও রক্ষা ভাব প্রাচীন হিন্দুসমাজে পরিব্যাপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, প্রভু ও ভৃত্যে, স্বামী ও স্ত্রীতে, রাজায় ও প্রজায়, গুরু ও শিষ্যে—সর্ব্বত্রই একদিকে বশ্যতা, অন্যদিকে রক্ষা, একদিকে সেবা অন্যদিকে লালন পালন। কেহ কেহ বলেন যে, এই সেবা ও রক্ষা সম্বন্ধ ইউরোপের প্রাচীন সমাজেও অনেকটা ছিল। জানি না, হইতে পারে। কিন্তু রক্ষা ও বশ্যভাব ছাড়িয়া, আমরা যে আধুনিক সাম্যভাব গ্রহণ করিয়া অধিকতর সুখী হইয়াছি, তাহাতে সংশয় আছে। আধুনিক সাম্যভাবের ভিতরে বৈষম্যের বিষ রহিয়াছে। আধুনিক সমাজে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সম্পত্তি ও সুখ লাভ করিবার সকলের সমান অধিকার আছে বটে। কিন্তু বাহুবলই হউক আর মস্তিষ্ক বল হউক, সকলের বল সমান নহে। কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল। সবল ও দুর্ব্বল সমান চেষ্টা করিয়া অসমান ফল পাইবে। এখানেই বৈষম্য হইল। তাহার পর আবার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার অর্থ অনেক স্থলে এই, সভ্যতার বেশে অসভ্য প্রকৃতির বিকাশ বা কার্য্য কাড়িয়া লইবার বা ঠকাইয়া লইবার পরস্পরের অবিরাম চেষ্টা। এই অধর্ম্মমূলক প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে সকল দেশেই বিষম বৈষম্য উৎপাদন করিতেছে। তাই (বিকৃত) সাম্য-নিনাদিত ইয়ুরোপ ও মার্কিন বৈষম্যময়। প্রকৃত সাম্য বস্তু খুব ভাল, উহা অমৃতস্বরূপ কিন্তু ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে, মৈত্রীশূন্য হইলে, তাহা বৈষম্যময় হইয়া যায়, হলাহলে পরিণত হয়। আবার বৈষম্য জিনিষ খারাপ বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু ধর্ম্মে সিক্ত হইলেই তাহার বিষাক্তভাব অনেক পরিমাণে উপশমিত হয়।

প্রাচীন জাতিভেদের যাহা গুণ ছিল, তাহা কতক আমি লিখিয়াছি। তাহার আরও গুণ ছিল। ইউরোপে ব্যবসায় সঙ্ঘ (Trades Union) দ্বারা (১) যে কার্য্য বা উপকার হইত, ভারতবর্ষে জাতিভেদ সেই কার্য্য করিত। এবং এখনও কতক কতক করে। তবে ভারতবর্ষে জাতিভেদ বিচার না করিয়াও, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া এক একটী ব্যবসায় সঙ্ঘ গঠিত হইতে দেখা

(খ) ‡ "যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত লোকদিগকে অন্ন না দিয়া আপনি ভোজন করে, সে জানে না সে মৃত হইলে শকুনি ও কুকুরেরা তাহার দেহ ভোজন করিবে।" (মনু সং ৩ অ—১১৫)

শাসন বাক্য এখানেও কত কঠিন দেখুন।

গিয়াছে। সুরাট, আহম্মদাবাদ, ব্রোচে ইহার প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়। এক জাতির লোক পরস্পরকে সাহায্য করিত; অন্নাভাবে মরিতে দিত না; ইউরোপের "Mutual Assurance Societies" রূপে কার্য্য করিত। সুতরাং ভারতে কখনও "পূয়র ল" (Poor law) আবশ্যক হয় নাই। প্রত্যেক জাতি তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর কতকটা পুলিশের ন্যায় দৃষ্টি রাখিত, কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, বা বিবাদ উপস্থিত হইলে এখনকার মত ঘৃণিত মোকদ্দমা হইত না; অপরাধীর বা বিবাদীর স্বজাতীয়গণ মিলিয়া তাহার দণ্ড বা মীমাংসা করিয়া দিত; দণ্ড করিতে হইলে জরিমানা করিত অথবা জাতিচ্যুত করিত। সুতরাং এই জাতিভেদ প্রথার ক্রিয়াতে, কয়েকটী কার্য্য সংসাধিত হইত, সাম্যবাদী "সোসিয়ালিষ্টিক" দিগের পরস্পরকে সাহায্য করা কতকটা দীনদুঃখ মোচন ব্যবস্থার "পূরর ল"র কার্য্য; পুলিশের তত্বাবধায়িতা এবং সালিশের পূর্ণবিকাশ।

কোনও কোনও পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জাতিভেদ প্রথায় এতগুলি সুবিধা ছিল, তাহা আমরা ত্যাগ করি কেন? বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা রাখিব না কেন? অথবা প্রাচীন জাতিভেদ আমরা আবার আগেকার মত দেশে প্রচলিত করি না কেন? এই কথার উত্তর দিতে যাইলে আর একটী বা দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বকালীন জাতিভেদ প্রথা আজিও আছে কি না? জাতিভেদের সারাংশ যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আবার ফিরাইয়া আনা যায় কি না? ইহাই উপস্থিত প্রশ্ন।

উত্তর। প্রাচীনকালে যে জাতিভেদ ছিল, বাস্তবিক সেই জাতিভেদ এখন আর আমাদিগের সমাজে নাই। তাহা এখন আর কোনমতে ফিরাইয়া আনা যায় না।

এখন যে জাতিভেদ আছে, তাহা প্রাচীনকালের জাতিভেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অথবা তাহা প্রাচীন জাতিভেদের মৃত ও গলিত দেহ।

প্রাচীন জাতিভেদে, জেতৃ ব্রাহ্মণগণ সমাজের সাহেব ছিলেন; জিত শূদ্রগণ Niggers ছিল। এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই সমভাবে "নিগার" পদবাচ্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ। (ক) এই মনু বচন মনে রাখিয়া কখন চাকুরী স্বীকার করিতেন না। এখন ব্রাহ্মণকুলতিলকগণ সেই "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা" সেই কুকুরবৃত্তি চাকুরীর জন্য লালায়িত। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বংশধরগণ অদ্য ম্লেচ্ছপদ লেহন করিয়া রজত সুধা আস্বাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই কেবল সমাজের শিক্ষাদাতা ছিলেন, এখন ইংরাজ দেশের শিক্ষাদাতা। এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই একাসনে বসিয়া ইংরাজের পদপ্রান্তে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। এবং এখন অনেক সময় শূদ্র ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতেছেন। কেবল ইংরাজি বিদ্যায় নহে, বেদাদি বিষয়েও ব্রাহ্মণ, শূদ্রের গ্রন্থ পড়িয়া, শিক্ষা লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। এখন টাকা দিলে সব ব্যবস্থাই পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এখন জেতা নহেন,

(ক) সেবা কুকুরবৃত্তি, ব্রাহ্মণ ইহা কখন করিবে না। মনু—অ ৪—৬

শিক্ষক নহেন, ব্যবস্থাপক নহেন, স্বধর্ম্মে রত নহেন, নিত্য "ভয়াবহ পরধর্ম্মে" রত। এবম্বিধ ব্রাহ্মণগণ কি ব্রাহ্মণজাতির পূর্ব্ব-কালীন শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, সম্মান ও অধিকার রক্ষা করিতে পারেন? না। পুরাকালের ব্রাহ্মণজাতি, বঙ্কিম বাবু, ভূদেব বাবু, ও চন্দ্রনাথ বাবু যাঁহাদিগের গৌরব মানস-মন্দিরে ধ্যান করিয়া ভক্তিভাষায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন,তাঁহারা আর বিদ্যমান নাই, তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশধরও নাই। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা, তুলনায়, প্রাচীন ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার সন্তান পূর্ব্ব পুরুষগণের শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, পবিত্রতা নাই, স্বাধীনতা নাই, তেজ নাই, ত্যাগ-স্বীকার নাই—কিন্তু তাহারা পূর্ব্বপুরুষ-দিগের প্রভুত্ব চাহে। শক্তিহীন প্রভুত্ব জগতে কবে কোথায় ছিল? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণগণ! দম্ভ ত্যাগ কর, অভিমান ত্যাগ কর, অলীকতা ত্যাগ কর। পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া আর চলিবে না। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, প্রাচীন জাতিভেদ চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন জাতিভেদ চলিয়া যায় নাই? প্রকৃত ব্রাহ্মণশ্রেণী আর নাই। ব্রাহ্মণহীন জাতিভেদ—মস্তকহীন দেহ—অথবা নায়ক হ্যামলেটহীন নাটক হ্যাম-লেট। কেবল যে ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহা নহে। হিন্দু সমাজের অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং জাতি-ভেদে, দ্বিজ ও শূদ্রগণের মধ্যে জেতৃজিত-ভেদ আর নাই, জ্ঞান ও চরিত্র ভেদ আর নাই, ব্যবসায় ভেদ আর থাকিতেছে না, ধর্ম্মভেদ আর নাই। তবে জাতিভেদের আর আছে কি? বিবাহভেদ। এই বিবাহ-ভেদের ভিত্তি কি? অভ্যাসজাত সংস্কার ও মিথ্যা অভিমান। এই সংস্কার ও অভি-মান সহজে যাইবে না। মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এই অভিমানের পোষক। আর, দীর্ঘকালের সংস্কার দীর্ঘ-কাল স্থায়ী। কিন্তু যাহাই হউক, প্রাচীন জাতিভেদ চিরকালের তরে অপনীত হই-য়াছে, যাহা চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না, তাহার মধুরমোহন গীতি আর শুনিতে চাহি না। বিশাল প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ব্রাহ্মণ রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ গঠিত হইতেছে। এই নবযুগে নূতন ভাবে গুণ ও চরিত্রভেদে সমাজ বিভক্ত হইতেছে। নূতন ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাচিত হইতেছেন।

ইহা প্রাচীন আর্য্যদিগের ব্যবস্থার বিপরীত নহে। কেননা শুক্রাচার্য্য বলিয়া-ছেন, এই সংসারে জাত্যনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও ম্লেচ্ছ হয় না। গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদে, কেহ বা ব্রাহ্মণ, কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা বৈশ্য, ও কেহ বা ম্লেচ্ছ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে" * এই প্রাচীন মহর্ষির ব্যবস্থানুসারে আমাদিগের নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যে, লোক, গুণ ও কর্ম্ম প্রভেদে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানের অনু-শীলন ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া দেবারাধনায় অনুরক্ত এবং যিনি + জিতে-ন্দ্রিয় বিনয়ী ও দয়ালু, তিনিই ব্রাহ্মণ।

* ন জাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণ কর্ম্মভিঃ।
শুক্রনীতি—অ ১

\+ জ্ঞান কর্ম্মোপাসনাভি দেবতারাধনে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ।

অর্থাৎ যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বিদ্যা ও চরিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ইহা কেবল যে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহা নহে। অন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। গৌতম সংহিতায় আছে—"ক্ষমবান্, দমশীল, জিতক্রোধ জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র" (ক) "ন জাতি পূজ্যতে রাজন"—"হে রাজন জাতি পূজ্য নহে," "গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ" গুণই কল্যাণকারক। মহাভারতে বনপর্ব্বের এক স্থানে আছে:—পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত,দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" আর এক স্থানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"শূদ্র বংশে জন্মিলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে।" মূল কথা,—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ "বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেননা সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়"। গুণভেদেই জাতিভেদ হইয়াছে, তাই বলি, আইস ব্রাহ্মণগণ, গুণভেদ অবলম্বন করিয়া আমরা নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপন করি। এই নব ব্রাহ্মণ্যরাজ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান, কবিত্ব, দর্শনশাস্ত্র থাকিবে; কিন্তু তাঁহাদিগের কোন বিরুদ্ধ একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না—সেখানে ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন প্রভুত্ব থাকিবে, অথচ শূদ্রদিগের বা অন্য কোন শ্রেণীর উপর অত্যাচার থাকিবে না। সেখানে যে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র, সে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণত্ব হারাইবে; আর শূদ্র পণ্ডিত ও সাধু হইলে ব্রাহ্মণ হইবে। সেখানে ব্রাহ্মণগণ নিজের প্রভুত্ব প্রয়োগ করিবে বটে, কিন্তু তাহা শূদ্রদিগকে উন্নত, সাধু ও জ্ঞানী করিবার জন্য; তাহাদিগকে পদতলে রাখিবার জন্য নহে। সেখানে ব্রাহ্মণগণ নূতন নূতন বেদ, দর্শন, সংহিতা রচনা করিবে; এবং তাহা অধ্যয়ন করিবার জন্য, অজ্ঞ শূদ্রগণকে, প্রাণের ভাইয়ের মত ভালবাসিয়া সাদরে আহ্বান করিবে। সেখানে, জ্ঞানের ও ধর্ম্মের মন্দির মনুষ্য মাত্রেরই জন্য অবারিতদ্বার থাকিবে। সেখানে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, উপদেশে ও জীবনে, সকলকেই শিক্ষা দিবেন। সেখানে স্বার্থের পরিবর্ত্তে পরার্থ বিরাজ করিবে। সেখানে শক্তিশালী শ্রেণীগণ দুর্ব্বল শ্রেণীর লোকদিগকে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলকেই, অসঙ্কুচিত, উদার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দিয়া,তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পূর্ণ ও প্রাপ্য অধিকার দিয়া, সমাজের পক্ষপাতী ব্যবস্থা রূপ শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন—এবং এই মানবগণ মুক্ত হইয়া,জ্ঞান, কবিত্ব ও পবিত্রতার অনন্ত আকাশে বিচরণ করিবে—স্বর্গীয় বিহঙ্গের ন্যায়, নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যের গৌরবগান করিতে করিতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর দেশে উঠিবে।

আইস তবে ব্রাহ্মণ কুমারগণ, আইস তবে ব্রাহ্মণ কন্যাগণ, আমরা সাধু ও জ্ঞানী শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণদলে লইয়া, অসাধু ও অজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, নূতন এক ব্রাহ্মণদলের সৃষ্টি করি—এবং এক নূতন ব্রাহ্মণ রাজ্য সংস্থাপন

(ক) শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।

করি। পূর্ব্বে আমরা ক্ষত্রিয়ের হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়াছিলাম, কেবলমাত্র শিক্ষা-দানের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলাম। নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যে শিক্ষা ও শাসন উভয়ই ব্রাহ্মণের হস্তে থাকিবে। এবার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'পুরোহিত-যোদ্ধা' হইবেন।

এবার ব্রাহ্মণগণ (প্রথম কালের) Knights Templars স্বরূপ হইবেন। প্রত্যেকে ঋষিরাজা "Pontiff-king"* এক একজন পরশুরাম হইবেন। আমি যেন মানসনেত্রে, ভবিষ্যতের রাজ্যে, এই নূতন ব্রাহ্মণদিগের জ্যোতির্ম্ময় উন্নত বরবপু দেখিতে পাইতেছি। আমি যেন দেখিতেছি, ভারতে নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, সংসারে কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বিদ্যা ও প্রেম, গুণ ও চরিত্র আদৃত হইতেছে; অত্যাচার, হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা তিরোহিত হইয়াছে, ভারতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

* Aristocracy and Priesthood, a governing class and a teaching class; these two sometimes separate and endeavouring to harmonise themselves, sometimes conjoined as one, and the king a Pontiff-king.

পঞ্জিকা-বিভ্রাট। (২)

অয়নাং

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, রব্যাদি স্ফুটগ্রহ হইতে পঞ্জিকার পঞ্চাঙ্গ গণিত হয়। পঞ্চাঙ্গই গণিত ভাগ, অপরাপর যে সকল বিষয় পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ফলিত জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদির অন্তর্গত। এতৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলা এ সকল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে পঞ্জিকার অয়নাংশ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বিস্তারিতভাবে লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ক্রান্তি-বৃত্তকে বার অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশের নাম রাশি ও তাহাকে ২৭ অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশের নাম নক্ষত্র রাখা হইয়াছে। মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশি ও অশ্বিনী ভরণ্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র। সুতরাং মেষ রাশির আরম্ভ রেবতীর অন্তে ও অশ্বিনীর আদিতে। ঐ বৃত্তের কোন বিশেষ স্থান হইতে মেষের আরম্ভ ধরিতে হইবে, নচেৎ রাশি ও নক্ষত্রের স্থিরতা থাকে না। সেই বিশেষ স্থানটি কি, তাহা বলা যাইতেছে।

রাশিচক্র বৃত্তাকার। বৃত্তের কোন স্থানকেই আরম্ভ বলা যায় না। তবে ক্রান্তি-বৃত্তের যে দুইটি স্থানে সূর্য্য আগমন করিলে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয় এবং যে দুইটি স্থানে আসিলে দিন মান সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়, এই চারিটি স্থানের কোন এক স্থান হইতে ক্রান্তি বৃত্তের আরম্ভ কল্পিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, ক্রান্তিবৃত্তস্থ কোন স্থির তারা হইতেও ক্রান্তিবৃত্তের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। অতি পূর্ব্বকালে মহাবিষুবক্রান্তিপাত রেবতী যোগতারার শেষে ও অশ্বিনী যোগতারার আদিতে ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, সেই সময় রাশিচক্র দ্বাদশ রাশি ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ তখন হইতে রেবতী যোগতারাই এইরূপে ক্রান্তিবৃত্তের

আদি বিন্দু স্বরূপ গণ্য হইতে লাগিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগে (১) নক্ষত্রচক্র পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ৬০০ বার গমনাগমন করে। নক্ষত্রচক্র পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ২৭ অংশ গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করে। অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দুটি পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। পূর্ব্ব সম্পাত ও বর্ত্তমান সম্পাতদ্বয়ের যে অন্তর, তাহার নাম অয়নাংশ।

নক্ষত্রচক্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে মেষ বৃষাদিতে বিভক্ত। ক্রান্তিপাত বিলোমগতিতে (২) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। এজন্য মীন রাশির ৮।৯ অংশে এক্ষণে ক্রান্তিপাত ঘটিতেছে। ক্রান্তিপাত হইতে ক্রান্তিবৃত্তকে মেষ বৃষাদিতে বিভক্ত কল্পনা করিয়া যে গ্রহস্ফুটাদির গণনা করা হয়, তাহার নাম সায়ন গণনা এবং পূর্ব্ব-ক্রান্তিসম্পাত হইতে মেষ বৃষাদি কল্পনা করিয়া যে গণনা হয়, তাহার নাম নিরয়ণ গণনা।

সেইরূপ, সচলক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে ক্রান্তিবৃত্তে গ্রহাদির যে দূরত্ব, তাহার নাম সায়নস্ফুট এবং পূর্ব্ব সম্পাত বিন্দু হইতে ক্রান্তিবৃত্তে গ্রহাদির যে দূরত্ব, তাহার নাম নিরয়ণ স্ফুট। অয়নাংশ ঠিক জানা থাকিলে সায়নস্ফুট হইতে নিরয়ণস্ফুট এবং নিরয়ণস্ফুট হইতে সায়নস্ফুট অনায়াসেই নিরূপিত হয়।

সেই পূর্ব্ব সম্পাতটি কোথায় ঘটিয়াছিল? পরে দেখান যাইবে যে, বোধ হয়, রেবতী যোগতারাটি পূর্ব্ব সম্পাত বিন্দু নির্দ্দেশ করিতেছে অর্থাৎ রেবতী যোগতারাটিতে মেষের আদি ও মীনের অন্ত। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে রাশিচক্র স্থির নহে। যখন যেখানে ক্রান্তিপাত ঘটিবে, তখন তথা হইতেই মেষাদি গণনা করিতে হইবে।

মাদ্রাজের টিঃ শুভারাওয়ের মতে মেষাদি দ্বাদশ রাশি স্থির নহে। তাঁহার এ কথা বলিবার প্রধান যুক্তি এই যে, আর্য্যসিদ্ধান্তকারগণ যখন অয়ন-চলন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা যে পূর্ব্ব সম্পাত বিন্দুটি স্থির রাখিয়া রাশিচক্র নির্ণয় করিতেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত।

ডাঃ থিব সাহেব পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও লঘ্বার্য্যভট্টীয়ম্ বিচার করিয়া বলেন যে, অশ্বিনী নক্ষত্রের আদি ধরিয়া হিন্দু জ্যোতিষে যে গণনা প্রণালী প্রচলিত, সেই অশ্বিনী নক্ষত্রের আদি দ্বারা খগোলের কোন বিশেষ বিন্দু বুঝিতে হইবে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা হইতেই রাশিচক্র অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর পূর্ব্বতন গ্রীকগণের ন্যায় আজ কাল পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ যেমন ক্রান্তিপাত বিন্দুকেই মেষাদি বিন্দু (১) বলিয়া ব্যবহার করেন, প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণও অশ্বিনীর আদিকে সেইভাবে ব্যবহার করিতেন। রেবতী তারাটি ক্ষুদ্র। তাঁহার মতে একটী ক্ষুদ্র তারকা লইয়া মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে রাশিচক্র বিভক্ত করা তত সম্ভবপর নহে। এজন্য তিনি বলেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণের সময় রেবতী তারা

(১) ৪৩২০০০০ সৌর বৎসরে এক মহাযুগ।

(২) রবির যে দিকে গতি, তাহার বিপরীত দিকে।

(১) First point of Aries.

হইতে ২।৩ কিম্বা ৪।৫ অংশ পূর্ব্বে কোন এক বিন্দু অশ্বিন্যাদি বিন্দু বুঝাইত। অর্থাৎ তখন অশ্বিনী যোগতারা ও রেবতী যোগতারা দ্বয়ের মধ্যস্থিত কোন এক বিন্দু অশ্বিন্যাদি বিন্দু কল্পিত হইত। আর্য্যভট্টের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সিদ্ধান্তে যোগতারাগুলির ধ্রুব (১) দেখা যায় না। প্রথমে রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্তকারগণকে অশ্বিন্যাদি বিন্দু কথা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কালক্রমে ক্রান্তিপাত রেবতী যোগতারায় বা তাহার নিকটে ঘটাতে এবং তখন অচল রাশিচক্র হিন্দু জ্যোতিষে বিধিবদ্ধ হওয়াতে রেবতী তারাটি তখন হইতে রাশিচক্রের আদি স্বরূপ গণ্য হইতে লাগিল। সূর্য্য সিদ্ধান্ততেই প্রথমে যোগতারা সকলের ধ্রুব দেখা যায়।

ডাঃ থিব সাহেবের অনুমান সত্য হইলেও দেখা যাইতেছে যে, বরাহমিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের সময় হইতে অচল রাশিচক্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। আজ কাল আমরা যে সূর্য্য সিদ্ধান্ত দেখিতেছি, তাহার সহিত বরাহমিহিরোক্ত সূর্য্য সিদ্ধান্তের অনেক স্থলে অনৈক্য। ইহার বিস্তারিত সমালোচনা ডাঃ থিব কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার উপক্রমণিকাতে দ্রষ্টব্য।

বরাহমিহিরের উদ্ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্যতীত সেই প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত এখন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বরাহমিহির অয়ন-চলনের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৌলিশ সিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন :—

অশ্লেষার্দ্ধাদাসীদ্ যদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণ কিরণস্য।
যুক্তময়নং তদাসীৎ সাম্প্রতময়নং পুনর্ব্বসুতঃ॥

অর্থাৎ যখন সূর্য্যের গতির নিবৃত্তি অশ্লেষার অর্দ্ধাংশ হইতে ঘটিত, তখন অয়ন ঠিক ছিল, সম্প্রতি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে অয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

এই কথাই তিনি পুনশ্চ তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় লিখিয়াছেন :—

অশ্লেষার্দ্ধাৎ দক্ষিণমুত্তরময়নং রবেধনিষ্ঠাদ্যম্।
নূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্ব শাস্ত্রেষু॥
সাম্প্রত ময়নং সবিতুঃ কর্কটাদ্যং মৃগাদিত শ্চান্যৎ।

অর্থাৎ বরাহমিহিরের সময়ে কর্কটের আদিতেই রবির অয়ন পরিবর্ত্তন ঘটিত। তাহা হইলে দেখা যায় যে, ঠিক মেষ রাশির আদিতেই তখন ক্রান্তিপাত ঘটিত। সুতরাং অয়ন চলনের বেগ ও বরাহমিহিরের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই অনায়াসেই অয়নাংশ নিরূপিত হইত। কিন্তু দুইটি বিষয় সম্বন্ধেই মত ভেদ। সুতরাং যাঁহারা উপরোক্ত শ্লোকাদি হইতে অয়নাংশ নিরূপণের প্রয়াসী, তাঁহাদের নিরূপিত অয়নাংশ কত দূর বিশ্বাস্য, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

অন্ততঃ সূর্য্য সিদ্ধান্তের সময় হইতে মেষাদি রাশি স্থির কল্পিত হইয়াছে, অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সূর্য্য সিদ্ধান্তের গ্রহ-ভগণ স্থলে—

তেষান্তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃস্মৃতঃ॥

ইহার অর্থ রঙ্গনাথের গূঢ়ার্থ প্রকাশক টীকায় এইরূপ আছে।

"সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মণা ক্রান্তিবৃত্তে রেবতীযোগতারাসন্নপ্রদেশে সর্ব্ব গ্রহাণাং নিবেশিতত্বাৎ তদবধিতো গ্রহচলনাচ্চা পৌষ্ণস্য রেবতী যোগতারায়া অন্তে নিকটে প্রদেশে তথাচ রেবতী যোগতারাসন্নাগ্রিম স্থান মেষাদ্যত্বাবধি ভুক্তমিতিভাবঃ॥"

রেবতী যোগ তারার ধ্রুবাদি দেখিলেও উক্ত কথা প্রতিপন্ন হইবে।

(১) Polar longitude.

এক্ষণে অয়নাংশ কত? এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় দুরূহ। তিন চারি প্রণালীতে ইহার মীমাংসার চেষ্টা করা যাইতে পারে। পাঠকগণ দেখিবেন, কোনটিকেই ভ্রমশূন্য বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক উপায় দ্বারা আনীত অয়নাংশেই সন্দেহ যাইতেছে না। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রণালী গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করা যাইতেছে। (১) হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে গণনা দ্বারা অয়নাংশ, (২) রেবতী প্রভৃতি যোগতারাদি হইতে অয়নাংশ, (৩) কোন্ সময় অয়নাংশ ছিল না, তাহা জানিয়া বার্ষিক অয়ন-চলন দ্বারা বর্ত্তমান অয়নাংশ, এবং (৪) অন্যান্য উপায় দ্বারা অয়নাংশ নিরূপণ।

(১) হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অয়নাংশ।

গণিত অয়নাংশ সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্তে—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং
চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।

অর্থাৎ এক মহাযুগে (৪৩২০০০০ বৎসরে) নক্ষত্রচক্র ৬০০ বার পরিলম্বিত হয়। এতদ্দ্বারা ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫৪ বিকলা পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে—

তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুত ত্রয়ং কল্পে।

অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মতে কল্পে (সহস্র মহাযুগে) ৩০,০০০ বার ক্রান্তিপাত ভগণ। অর্থাৎ বৎসরে ক্রান্তিপাত ২·৭ বিকলা করিয়া চলে। (১)

সিদ্ধান্ত শিরোমণির উদ্ধৃত মুঞ্জালাচার্য্য মতে—তদ্ভগণাঃ কল্পে গোঽঙ্গর্ত্তু নন্দ গোচন্দ্রাঃ।

অর্থাৎ এক কল্পে ক্রান্তিপাত ভগণ ১৯৯৬৬৯ বার। (১) এতদ্দ্বারা বার্ষিক অয়নচলন ৫৯ বিকলা পাওয়া যায়।

গণেশ দৈবজ্ঞ কৃত গ্রহলাঘব মতে—

বেদাব্ধ্যব্ধ্যূনঃ খরসহৃত শকোঽয়নাংশাঃ।

অর্থাৎ ইঁহার মতে ৪৪৪ শকে অয়নাংশ ছিল না এবং বৎসরে ৬০ বিকলা করিয়া অয়নাংশ বৃদ্ধি হয়।

জাতকার্ণব মতে (২)

শাকমেকাব্ধি বেদোনংদ্বি কৃত্বা দশভি র্হরেৎ।
লব্ধেন হীনং তত্রৈব অয়নাংশ কলাঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ইহার মতে ৪২১ শকে অয়নাংশ শূন্য ছিল এবং বার্ষিক অয়ন-চলন ৫৪ বিকলা।

উড়িষ্যার জ্যোতির্ব্বিদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ মতে (সিদ্ধান্তদর্পণ)

প্রতিলোম-গতেঃ কল্পে ক্রান্তি পাতস্য পর্য্যয়াঃ।
দৃক্ সমাকল্পিতা খাদ্রি চন্দ্রাব্রাগ্নৃধি সম্মিতা॥

অর্থাৎ, কল্পে ক্রান্তিপাত গেল ৬৪৩১৭০ বার সুতরাং বার্ষিকগতি ৫৭·৬১৫৩ বিকলা।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক সমুদায় হইতে ক্রান্তিপাতের বেগ সম্বন্ধে কতকগুলি মত দেওয়া গেল। পাঠকগণ দেখিবেন, অয়নাংশ নিরূপণের প্রধান বিষয়েই কতদূর মতভেদ।

(২) যোগতারা সকলের ধ্রুব সাহায্যে অয়নাংশ নিরূপণ।

অশ্বিন্যাদি যোগতারার ধ্রুবাদি দেখিলে

---

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্তে আর একটী পাঠ আছে—

ত্রিংশৎ কৃত্যাযুগে ভানাম্, অর্থাৎ এক মহাযুগে ৯০০ বার রাশিচক্র পরিলম্বিত হইতেছে। অর্থাৎ ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৮১ বিকলা।

(১) ভাস্করাচার্য্য মতে ক্রান্তিপাত বিন্দু পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে পরিলম্বিত হয় না। অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে যেমন অয়ন চলন একই দিকে হইতেছে, সেইরূপ ভাস্করাচার্য্য মতে উহার পশ্চিমদিকে মাত্র গতি হয়। পূর্ব্বদিকে গতি হয় না অনুমান করিতে হইবে; কেননা তিনি গ্রহাদিতে অয়ন-চলন-সংস্কৃতি কেবল যোগ করিতেই বলিয়াছেন। অন্য দিকে গতি হয় স্বীকার করিলে গ্রহাদির স্থান হইতে কখন কখন অয়নাংশ হীন করিবার প্রয়োজন। (সিদ্ধান্ত দর্পণকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ)

(২) জাতকার্ণব বরাহমিহিরাচার্য্য কৃত বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু ইহার অয়নাংশ নিরূপণের নিয়ম দেখিলেই গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ইনি যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ-সংহিতা প্রভৃতির প্রণেতা নহেন, তদ্বিষয়ের কোন সন্দেহ থাকে না।

রেবতী যোগতারাকে রাশিচক্রের আদি বলিয়া কোন সন্দেহ থাকে না। সুতরাং আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যে কোন যোগতারা ঠিক করিয়া লইয়া তাহা হইতে ক্রান্তিপাত পরিমাণ করিয়া লইলেই যে কোন সময়ে অয়নাংশ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ বিষয়ে একটু গোলযোগ আছে। প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে যোগতারাগুলির ধ্রুব ও বিক্ষেপ (১) ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। পঞ্চ সিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সৌর সিদ্ধান্তে কেবল সাতটি যোগতারার ধ্রুবাদি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রেবতী যোগতারার ধ্রুবাদি নাই। এখানে কয়েকটি যোগতারার ধ্রুবাদি প্রদর্শিত হইল।

যোগতারা		প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্ত		আধুনিক সৌরসিদ্ধান্ত		সিদ্ধান্তশিরোমণি	
		ধ্রুব	বিক্ষেপ	ধ্রুব	বিক্ষেপ	ধ্রুব	বিক্ষেপ
কৃত্তিকা	...	৩২।৪০	৩।১০ উঃ	৩৭।৩০	৫।০ উঃ	৩৭।২৯	৪।৩০ উঃ
রোহিণী	...	৪৮।০	৪।৫৯ দঃ	৪৯।৩০	৫।০ দঃ	৪৯।২৮	৪।৩০ দঃ
পুষ্যা	...	৯৭।২০	৩।১০ উঃ	১০৬।০	০।০	৯৬।০	০।০
মঘা	...	১২৬।০	০।০	১২৯।০	০।০	১২৯।০	০।০
চিত্রা	...	১৮০।৫০	২।৪৩ দঃ	১৮০।০	২।০ দঃ	১৮৩।০	১।৪৫ দঃ
রেবতী	...	...	...	৩৫৯।৫০	০।০	০।০	০।০
অশ্বিনী	...	...	...	৮।০	১০। উঃ	৮।০	১০।০উঃ

উপরের উদ্ধৃত যোগতারার ধ্রুবাদি দেখিলেই বুঝা যায় যে, তৎসদায় সকল সিদ্ধান্তে একরূপ নহে। এজন্য সকল যোগতারা হইতে অয়নাংশ একই পাওয়া যায় না। যে কারণেই হউক, ধ্রুবাদিতে অনৈক্য লক্ষিত হয়। আবার, আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত যোগতারা বেধ করিলে সিদ্ধান্তোক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভ্রম দৃষ্ট হয়। নিম্নে দশটি যোগতারার ইংরাজী নাম, পাশ্চাত্য মতে বর্ত্তমান ধ্রুবাংশ, সিদ্ধান্ত মতে ধ্রুবাংশ ও এতদনুসারে অয়নাংশ প্রদত্ত হইল। ঔজ্জ্বল্যানুসারে প্রায় সকল তারাগুলিই প্রথম শ্রেণীস্থ।

যোগতারার নাম	ইংরাজী নাম	ইং মতে বর্ত্তমান ধ্রুবাংশ	সূঃ সিঃ ধ্রুবাংশ	সিঃ সিঃ ধ্রুবাংশ	সূঃ সিঃ অয়নাংশ	সিঃ শিঃ অয়নাংশ
অশ্বিনী	*Hamal*	৩২।২৯	৮।০	৮।০	২৪।২৯	২৪।২৯
রোহিণী	*Aldebaran*	৬৯।৯	৪৯।৩০	৪৯।২৮	১৯।৩৯	১৯।৪১
আর্দ্রা	*Betel geux*	৮৭।৩৪	৬৭।২০	৬৭।০	২০।১৪	২০।৩৪
পুনর্ব্বসু	*Pollux*	১১২।৫৩	৯৩।০	৯৩।০	১৯।৫৩	১৯।৫৩
মঘা	*Regulus*	১৪৮।৩৭	১২৯।০	১২৯।০	১৯।৩৭	১৯।৩৭
চিত্রা	*Spica*	২০১।৩১	১৮০।০	১৮৩।০	২১।৩১	১৮।৩১
স্বাতী	*Arcturus*	২১৪।৫৯	১৯৯।০	১৯৯।০	১৫।৫৯	১৫।৫৯
জ্যেষ্ঠা	*Antares*	২৪৭।৩১	২২৯।০	২২৯।০	১৮।৩১	১৮।২৬
শ্রবণা	*Altair*	২৯৮।২৪	২৮০।০	২৭৮।০	১৮।২৪	২০।২৪
পূর্ব্বভাদ্রপদ	*Markab*	৩৪৬। ৩	৩২৬।০	৩২৬।০	২০।৩	২০।৩

(১) Polar longitude and polar latitude.

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, যোগতারার ধ্রুব লইয়া অয়নাংশ গণনা করা বৃথা। এই দশটি যোগতারার মধ্য-ধ্রুব লইলে সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বর্ত্তমান অয়নাংশ ১৯।১০ ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিমতে ১৯।৪৫ য়। বেণ্টলী সাহেব সমুদায় যোগতারা ইতে এইরূপে অয়নাংশ নির্ণয় করিতে এলেন।

দ্বিতীয়তঃ রেবতী তারা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে রেবতী নক্ষত্রের যোগতারার যে ধ্রুব ও বিক্ষেপ দেওয়া আছে, তদ্দ্বারা রেবতী যোগতারা কোন্‌টি, তদ্বিষয়ে এক্ষণে সন্দেহ আছে। ইংরাজীতে যে তারাটির নাম "জিটা মীন" তাহাকেই অনেকে রেবতী যোগতারা বলিতেছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার ধ্রুব ১১ রাশি ২৯ অংশ ৫০ কলা ও বিক্ষেপ ০ দেওয়া আছে। অতএব অনুমান করিতে হইবে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের সময় উহা ক্রান্তিপাতের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল।

"জিটা মীন" তারকাটি অতিশয় ক্ষুদ্র। ঔজ্জ্বল্য অনুসারে উহাকে পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেলিতে হয়। ক্রান্তিবৃত্তে বা তাহার নিকটে বড় বড় তারা থাকিতে "জিটা"মীনের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র তারাকে রাশিচক্রের আদি বিন্দু কেন ধরা হইল? ইহার উত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, 'জিটা'মীনই যদি রেবতী তারা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অয়নাংশ নিরূপণ করা অতি সহজ। ক্রান্তিপাত হইতে ইহার দূরত্ব পরিমাণ করিলেই অয়নাংশ পাওয়া যায়। বাস্তবিক, 'জিটা'মীনকে (১) রাশিচক্রের আদি বিন্দু মনে করিলে এক্ষণে অয়নাংশাদি ১৮।২৬ হয়, এবং সূর্য্য সিদ্ধান্তোক্ত রেবতীর ধ্রুবাংশাদি ৩৫৯।৫০ গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান অয়নাংশাদি ১৮।৩৬ পাওয়া যায়। (২)

(৩) কোন্ সময়ে অয়নাংশ ছিল না, তাহা নির্ণয় করিয়া ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতির সাহায্যে বর্ত্তমান অয়নাংশ নিরূপণ।

সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিপাতের গতি আছে কি না, বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মগুপ্তাদি নিপুণ গণকেরা কেন ইহার উল্লেখ করেন নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সময় অয়নাংশ অল্প ছিল। ইদানীং বহুত্ব হেতু অয়নাংশ সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। অবশেষে লিখিয়াছেন যে, "যদা যেহংশা নিপুণৈ রূপলভ্যন্তে তদা স এব ক্রান্তি

(১) 'জিটা' মীনের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এমন হইতে পারে এইটি পূর্ব্বে উজ্জ্বল ছিল, কালক্রমে এক্ষণে হীনপ্রভ হইয়াছে। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের নিমিত্ত বলা উচিত যে, নভোমণ্ডলস্থ সমুদায় নক্ষত্রগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। গ্রীকভাষার বর্ণমালা ও এক দুই তিন ইত্যাদি অঙ্কানুসারে এই সকল নাম রচিত হইয়াছে। 'জিটা' গ্রীকভাষার একটি বর্ণ।

(২) উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ মহোদয় দৃগ্‌গণিতৈক্যের পক্ষপাতী আধুনিক হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌। তাঁহার কৃত সিদ্ধান্তদর্পণে তিনি রেবতীর ধ্রুবিমা শূন্য ও উত্তর বিক্ষেপ পাঁচ অংশ লিখিয়াছেন। ইনি নক্ষত্র মানচিত্র কিম্বা নক্ষত্রের তালিকা দেখিয়া রেবতী তারকা স্থির করেন নাই। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ধ্রুবাদির সাহায্যে রেবতী যোগতারা নির্ণয় করিয়া তাঁহার স্বকীয় বেধ যন্ত্র দ্বারা যে বিক্ষেপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। ইঁহার মতে রেবতীর ধ্রুব ০ ও বিক্ষেপ ৫ উঃ। অশ্বিনীর ধ্রুবাংশাদি ৯।৪৫, ভরণীর ২১, উত্তরভাদ্রপদের ৩৩৮। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজীতে যে তারাটিকে 'ঈটা' মীন বলে, ইঁহার মতে সেইটি রেবতী। তাহা হইলে বর্ত্তমান অয়নাংশাদি ২৩।৯ হয়।

পাতঃ"। বরাহমিহিরের সময় অয়নাংশ ছিল কি না, ইহার বিবরণ সংক্ষেপে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে মেষরাশির আদিতেই ক্রান্তিপাত ঘটিত। এক্ষণে প্রশ্ন এই, তিনি একথা কখন লিখিয়াছেন। অহর্গণাদি সাধন নিমিত্ত পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দ করণাব্দ (১) গৃহীত হইয়াছে। এজন্য কেহ কেহ বলেন, ৪২৭ শকাব্দ বরাহমিহিরের জন্ম শকাব্দ, কেহ বা বলেন, ঐ শকাব্দে পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা রচিত হইয়াছিল, আবার কেহ বা বলেন যে, উহা গ্রন্থ রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শকাব্দ হইবে (২)। বরাহমিহিরের পরলোক প্রাপ্তি ৫০৯ শকাব্দে ঘটে, সুতরাং ৪২৭ শক গ্রন্থ রচনাব্দ হওয়া অসম্ভব।

আর্য্যভট্টের গ্রন্থ হইতে বরাহমিহির উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, আর্য্যভট্ট ৩৮৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২১ শকাব্দে তাঁহার লঘ্বার্য্যভট্টীয়ম্ গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য ৪২৭ শকাব্দে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যায় না। বরাহমিহিরের জন্ম ও পুস্তক রচনার শকাব্দ যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সকল দ্বারা তিনি কোন শকাব্দ মনে করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ—সে সময়ে যে অয়নাংশ একেবারে কিছুই ছিল না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, ১০।১২ বৎসরের তারতম্যে অয়নাংশে ৯।১০ কলার প্রভেদ ঘটিবে।

ইংরাজী "জিটা"মীনই যদি রেবতী তারা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, শক ৪৯৪ অব্দে রেবতী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে রেবতী নক্ষত্রের দ্রাঘিমা ৩৫৯ অংশ ৫০ কলা লিখিত আছে। ইহা ধরিলে বলিতে হয় যে,শক ৪৯৪ অব্দের আরও ১২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৮২ শকাব্দ অয়নাংশশূন্য ছিল।

অধ্যাপক হুইট্নী সাহেব বলেন যে, রেবতী তারা ছাড়িয়া দিয়া ৪৮২ শকাব্দে যোগতারা সকলের দ্রাঘিমা কত ছিল, গণনা করিলে দেখা যায় যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত সমুদায় যোগতারার দ্রাঘিমাতে প্রায় ১ অংশের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এজন্য তিনি অনুমান করেন যে, পূর্ব্বোক্ত ৪৮২ শকাব্দায় যে স্থানে ক্রান্তিপাত ঘটে, তাহা হইতে প্রায় ১ অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান হইতে যোগতারাগণের দ্রাঘিমা পরিমিত হইয়াছিল। এতদনুসারে বলিতে হইবে যে, ৪১২ শকাব্দে অয়নাংশ ছিল না। সিদ্ধান্ত রহস্য ও জাতকার্ণব মতে ৪২১ শকাব্দে অয়নাংশ ছিল না। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মতেরও অনেকটা ঐক্য দেখা যায়।

কিন্তু অয়নাংশশূন্য বৎসর পাইলেও বর্ত্তমান অয়নাংশ নিরূপণ করা কঠিন। প্রথমতঃ, হিন্দুজ্যোতিষ মতে অয়নচলন বেগ ৫৪ বিকলা হইতে ৬০ বিকলা পর্য্যন্ত। পাশ্চাত্য মতে এক্ষণে প্রায় ৫০·২৫ বিকলা। সুতরাং প্রভেদের এই এক কারণ বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ, সৌরবর্ষমান সম্বন্ধেও একটু প্রভেদ আছে। হিন্দুজ্যোতিষ মতে কোন এক নক্ষত্র (যথা রেবতী) হইতে গমন করিয়া সূর্য্যের সেই নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে যে সময় লাগে, তাহার নাম সূর্য্যের ভগণকাল (১)। ইহাই

(১) Epoch.

(২) ইহার বিবরণ ডাঃ থিব কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(১) Sidereal revolution.

সৌরবর্ষ। ইহার পরিমাণ ভাস্করাচার্য্য মতে ৩৬৫ সাবন দিবস, ১৫ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল, ৩০ অনুপল অর্থাৎ ৩৬৫০ ·২৫৮৪৩ সাবন দিবস। সৌরসিদ্ধান্ত মতে ইহার পরিমাণ ৩৬৫·২৫৮৭৫ দিবস। ইংরাজি মতে ইহার নাম নাক্ষত্রিক বৎসর (২) এবং পরিমাণ ৩৬৫·২৫৬৩৭ দিবস। সুতরাং সৌর বর্ষমান সম্বন্ধে আমাদের গণিত বৎসর পাশ্চাত্য গণিত বৎসরাপেক্ষা প্রায় ৮।৯ পল বড়। অনেক বৎসরে এই প্রভেদ অধিক হইয়াছে। সুতরাং বর্ষমানের প্রভেদ থাকাতে ভগণকাল ধরিয়া নিরয়ণ মেষের আদি স্থান নির্ণয় করাও তত সহজ নহে।

(৪) অন্যান্য উপায় দ্বারা অয়নাংশ নিরূপণ।

(ক) সিদ্ধান্ত শিরোমণির "চক্রে চক্রার্দ্ধে ব্যয়নাংশে" ইত্যাদি শ্লোকের বাসনা ভাষ্যে অয়নাংশ নিরূপণের একটি উপায় বর্ণিত আছে। তাহা এই, "তস্মিন্ দিনে (বিষুবদ্দিনে) গণিতেন স্ফুটো রবি কার্য্যঃ। তস্য রবের্মেষাদেশ্চ যদন্তরং তেঽয়নাংশা জ্ঞেয়াঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ রবি বেধ করিয়া প্রথমতঃ বিষুবদ্দিন নির্ণয় কর এবং গণিত দ্বারা ঐ দিনের নিরয়ণ রবিস্ফুট স্থির কর। রবির উত্তর গমন কালে উক্ত নিরয়ণ রবিস্ফুট ১২ রাশি হইতে এবং দক্ষিণ গমনকালে ৬ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে অয়নাংশ পাওয়া যাইবে। এইরূপ, দুইটি অয়ন দিন নিরূপণ করিয়াও অয়নাংশ পাওয়া যাইতে পারে।

পণ্ডিত বাপু দেবশাস্ত্রী মহোদয়, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকার ও দাক্ষিণাত্যের আধুনিক কোন কোন পঞ্জিকাকারগণ অয়নাংশ সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। আপাততঃ, এই যুক্তিটি সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এতদ্দ্বারাও রাশিচক্রের আদি নিরূপিত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তাদি মতে গ্রহস্ফুট গণনা ভ্রমশূন্য ও সূক্ষ্ম হইলে উক্ত নিয়মানুসারে গণিত অয়নাংশ ভ্রমশূন্য হইত। সকলেই জানেন যে, সিদ্ধান্তাদির গ্রহভগণ তাদৃশ সূক্ষ্ম নহে। সুতরাং নিরয়ণ রবিস্ফুট গণনা হইতে প্রত্যক্ষ বেধযন্ত্র দ্বারা নিরূপিত সায়নরবিস্ফুট বাদ দিলে, অয়নাংশ ঠিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

(খ) তিরুবাদী জ্যোতিষতন্ত্র সভার প্রতিষ্ঠাতা মাদ্রাজ নিবাসী চিদম্বরম্ আয়ার, বি, এ বলেন, তিনি অয়নাংশ নিরূপণের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন (১)। তিনি নাড়ী গ্রন্থ নামক কতকগুলি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যত লোক জীবিত হইয়াছেন, আছেন বা ভবিষ্যতে হইবেন, সকলের জন্মকাল, ধর্ম্ম, ব্যবসায় প্রভৃতি কোষ্ঠী সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা এই সকল গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ পাঁচখানি গ্রন্থ তিনি দেখিয়াছেন এবং অনুমান করেন যে, এরূপ আরও পাঁচখানি আছে। দক্ষিণ ভারতের সত্যাচার্য্য-কৃত ধ্রুবনাড়ী ও শুক্রনাড়ী দ্বয় উৎকৃষ্ট। এক ধ্রুবনাড়ী ৭০ খানি গ্রন্থে সম্পূর্ণ। ধ্রুবনাড়ীতে সকলের জন্মদণ্ডের নিরয়ণ স্ফুট দেওয়া আছে; সুতরাং তদ্দ্বারা অয়নাংশ অনায়াসেই নির্ণীত হইতে পারে। এতদনুসারে শক ১৮১৪ অব্দের চৈত্র মাসের অয়নাংশাদি ২০।৩২।৩৭।

উক্ত অয়নাংশ যে ঠিক, তদ্বিষয় প্রমাণ

(২) Sidereal year.

(১) ইং সন ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাসের "থিওসোফিষ্ট" কাগজ এবং তৎকৃত বৃহৎ-সংহিতার ইংরাজি অনুবাদের মুখবন্ধ দেখুন।

করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তিনি বরাহমিহিরের কালও নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি বলেন, বরাহমিহিরের মতে (১) অয়নাংশ বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৫০ বিকলা। এবং পাশ্চাত্য মতে এই অয়নাংশ হারের বার্ষিক বৃদ্ধি '০০০২৪ বিকলা। তিনি নাড়ী গ্রন্থ হইতে ইং সন ১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারী দিবসের অয়নাংশাদি ২০।২৪।১৫ পাইয়াছেন। সুতরাং গণিত সাহায্যে দেখা যায় যে, ১৪৬৬ কিম্বা ১৩১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩৩৮ ও ৪৯৪ শকাব্দে বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল। পূর্ব্বে অন্য উপায়েও আমরা ৪৯৪ শকাব্দ স্থির করিয়াছি।

(গ) সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বর্ত্তমান অয়নাংশ ২০।৫৫ ও ক্রান্তিপাতের বার্ষিকগতি ৫৪ বিকলা। পাশ্চাত্য মতে এক্ষণে বার্ষিকগতি ৫০.২৫ বিকলা। অর্থাৎ যে সময় (শক ৪২১) হইতে অয়নাংশ আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি ৫০.২৫ বিকলা করিয়া অয়নাংশ বৃদ্ধি হইলে বর্ত্তমান শকে অয়নাংশ ১৯।২৭।২৮ হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েক মতে বর্ত্তমান অয়নাংশ কত হয়, তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

শক ১৮১৪ অব্দের ৮ চৈত্র বা সায়ন মেষারম্ভ দিনে অয়নাংশ।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	২০।৫৫
গ্রহলাঘব মতে	২২।৫০
জাতকার্ণব মতে	২০।৫৫
সিদ্ধান্তদর্পণ মতে প্রত্যক্ষায়নাংশ (উৎকল পঞ্জিকা)	২২।২৫
বাপুদেব শাস্ত্রীর পঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপঞ্জিকা মতে ...	২২।১০
বোম্বাইএর শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানার পঞ্জিকা মতে ...	২২।৫০
চিদম্বরম্ আয়ার মতে ...	২০।৩৩
যোগতারা সকলের ধ্রুবমধ্য হইতে	১৮।২১
রেবতী তারা ৪৯৪ শকে ক্রান্তিপাতে ছিল ধরিলে	১৮।২৬
ঐ অন্যমতে	১৭।২৬
"জিটা" মীনকে রেবতী স্বীকার করিলে	১৮।২৬
সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে অয়নাংশ হইতে	১৯।২৭

অয়নাংশ সম্বন্ধে কি প্রকার মতভেদ, তাহা উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। গণিতজ্যোতিষের অনেকগুলি বিষয় অয়নাংশ লইয়া গণনা করিতে হয়। সুতরাং সেই সেই বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করা কঠিন। অয়নাংশ না থাকিলে এই সকল গণনা সহজ হয় (১)।

বাস্তবিক অয়নাংশ তুলিয়া দিলে অনেকগুলি গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু অয়নাংশ তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বর্ষারম্ভ দিবস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইংরাজী মতে অয়নবর্ষ ধরিয়া বৎসর গণিত হয়। অর্থাৎ এক মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে অন্য পর বা পূর্ব্ববর্ত্তী

(১) বরাহমিহিরের কোন্ গ্রন্থে এই হারে অয়নাংশের বৃদ্ধি লিখিত আছে, তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(১) আমার বিবেচনায় সম্প্রতি অয়নাংশাদি ২২।১০ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লগ্ন, ক্রান্ত্যংশ প্রভৃতি গণনায় অয়নাংশের প্রয়োজন। যখন তৎসমুদায় সিদ্ধান্তোক্ত সাধন প্রণালী অনুসারে গণনা করিতে হইতেছে, তখন যত অয়নাংশ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই গ্রহণীয়। রাশিচক্রের আদি বিন্দু হইতে গণনা করিলে অত অয়নাংশ পাওয়া যায় কি না, তাহা স্ফুটাদি গণনার পক্ষে অনাবশ্যক। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে অয়নাংশ ২০।৫৫ ধরিলে ঠিক বিষুবদ্দিন পাওয়া যায় না। প্রথম প্রবন্ধে তাহা দেখান গিয়াছে।

মহাবিষুব সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাই বর্ষের পরিমাণ ধরা হয়। পাশ্চাত্য দেশে, এমন কি ইরাণীগণের মধ্যেও এই অয়নবর্ষ প্রচলিত। পূর্ব্বাবধি অয়নবর্ষ প্রচলিত থাকাতে অয়নাংশ বলিয়া একটা গণনাই পাশ্চাত্য দেশে নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত রোমক সিদ্ধান্তে অয়নবর্ষ ধরা হইয়াছে। সুতরাং অয়নবর্ষ গণনা হিন্দুজ্যোতিষে নূতন নহে।

বৈশাখ মাস বর্ষারম্ভ স্থির রহিয়াছে অথচ অয়নাংশের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ইহাতে কয়েকটী বিষয়ের বড় গোলযোগ হইতেছে। চৈত্র মাসের শেষ দিবসকে অর্থাৎ মীনরাশি হইতে সূর্য্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ দিবসকে এক্ষণে মহা-বিষুব সংক্রান্তি বলা হইতেছে। বস্তুতঃ উহা মহা-বিষুব-সংক্রান্তি নহে। উহা রাশি-সংক্রান্তি মাত্র। শাস্ত্র মতে মহা-বিষুব সংক্রান্তি মহাপুণ্যপ্রদ। এক্ষণে প্রকৃত মহা বিষুব সংক্রান্তি দিনের পরিবর্ত্তে ২২।২৩ দিবস পরে দানাদি কার্য্য করা হইতেছে। সুতরাং প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়াশীল হিন্দুগণের পক্ষে এই ব্যতিক্রম চিন্তার বিষয় বটে।

অয়নাংশের বৃদ্ধি হেতু আর একটি গুরুতর ফল ঘটিতেছে। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুকালের মাস নির্দ্দিষ্ট থাকিতেছে না। ফাল্গুন চৈত্র দুইমাস বসন্তকাল ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুইমাস গ্রীষ্মকাল শৈশবাবস্থা হইতে শুনিয়া আসিতেছি। বস্তুতঃ মহাবিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্ব দুইমাস বসন্তকাল ও পরবর্ত্তী দুইমাস গ্রীষ্মকাল। সুতরাং এক্ষণে বলা উচিত ৮ চৈত্র হইতে দুইমাস গ্রীষ্মকাল ইত্যাদি। অয়নাংশের ক্রমশঃ বৃদ্ধি বশতঃ কয়েকশত বৎসর পরে পৌষ মাঘ মাসে গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইবে।

এক্ষণে রবির মেষরাশিতে সংক্রমণ দিন হইতে সৌর বর্ষারম্ভ ধরা হইতেছে। সৌর বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অয়নবর্ষ গ্রহণ করিলে অয়নাংশ আর বৃদ্ধি হইবে না। কোন বৎসর হইতে ২২।২৩ দিন বাদ দিয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন হইতে তাহার পর বর্ষ গণনা করিলে ভবিষ্যতে অয়নাংশ ঘটিত যাবতীয় গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। এ বিষয়টি তত সহজ নহে এবং দুই চারি কথায় মীমাংসা করাও অসম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া ইহার বিচার করিলে ইহার মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের জ্যোতিষের গণিত ভাগ ব্যতীত এক ফলিতাংশ আছে। আবার তাহাই কেবল নহে, যোগ তিথ্যাদি অনুসারে স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী বহুবিধ ব্যবস্থা আছে। বর্ষ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ঐ সমস্ত বিচার করিতে হইবে।

খগোলে সায়ন মেষাদি রাশিগুলির স্থিরতা নাই। কেন না, আদি বিন্দু সচল। হিন্দু ফলিত জ্যোতিষে সায়ন মেষাদি রাশি ধরিয়া ফলাফল গণিত হয় না। সায়নমতে গণনা করিলে ফলের প্রভেদ ঘটিবে কি না, বলিতে পারি না (১)। অন্যদিকে নক্ষত্র সকলের যৎসামান্য স্বকীয় গতি ছাড়িয়া দিলে নিরয়ণ রাশিগুলি স্থির। আজ বৈশাখ মাসের ১৫ দিবস বলিলে জানা গেল যে মেষরাশিতে রবির প্রায় অর্দ্ধেক ভোগ হইয়াছে এবং অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগুলি জানা থাকিলে ঐ সকল নক্ষত্রের

(১) পাশ্চাত্য দেশে সায়ন মেষাদি ধরিয়া ফলিত জ্যোতিষের গণনা করা হয়। সেখানে জাতকাদি সমুদায়ই সায়নমতে গণিত হয়। তথায় ফলের বৈলক্ষণ্য ঘটে কি ?

মধ্যে কোথায় আজ রবি আছেন, তাহারও কতকটা জ্ঞান হইল। নিরয়ণ গণনানুসারে তারাগুলি গগনে গ্রহগণের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। জ্যোতিষে বেশী জ্ঞান না থাকিলেও ১৫ই বৈশাখ বলিলে অন্ততঃ এটুকুও মনে হইবে যে, আজ রবি ভরণী নক্ষত্রে আছেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে যেমন ইতঃস্ততঃ জাত বৃক্ষাদি প্রান্তরের স্থানবিশেষ সহজেই নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ তারাগুলি বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের স্থান নির্দ্দেশক স্বরূপ।

অনেক স্থানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়াদি মাসের নামোল্লেখ না করিয়া মেষ বৃষাদি দ্বারা বর্ষ বিভাগ করা হয়। উড়িষ্যায় এই রীতি বিশেষ প্রচলিত। সামান্য লোক পর্য্যন্ত ১৫ বৈশাখের পরিবর্ত্তে ১৫ মেষ বলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষে, যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহাদের পক্ষে ১৫ বৈশাখ বা ১৫ মেষ বা ১৫ 'ক' 'খ' সকলই সমান কথা।

নিরয়ণ গণনার পরিবর্ত্তে সায়ন গণনা করিলে কোন বিশেষ অসুবিধা আছে কিনা, উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন, "সায়ন মতে গ্রহাদির স্থান নির্ণয় করিলে অনেক ক্ষতি আছে। যথা, প্রথমে সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিত নক্ষত্র ধ্রুব ও ক্রান্তিমার্গ হইতে দক্ষিণোত্তরে যত অংশ কলা বিক্ষেপ লিখিত আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। ১৮০০ কলা রাশি মধ্যে ৮০০ কলা নক্ষত্র সকলের স্থিতি নিয়ম অর্থাৎ মেষ রাশিতে অশ্বিনী ভরণী, বৃষে কৃত্তিকা রোহিণী ইত্যাদি স্বকীয় স্বকীয়রাশি সকলে নক্ষত্র থাকিবার ব্যভিচার কদাপি ঘটে না। * * * যদি মীনের ৮ অংশ হইতে মেষ গণনা করা হয়, তাহা হইলে অশ্বিনী বৃষ, ভরণী বৃষ, রোহিণী মিথুন, ইত্যাদি রাশি নক্ষত্রের প্রভেদ হেতু সিদ্ধান্ত বিরোধ ও দৃষ্টি বিরোধ হইবে। পুনশ্চ, সৌর ও চান্দ্রমাসে, ১৫ দিনের অধিক অগ্র পশ্চাৎ কদাপি হয় না। দেখা যাইতেছে যে, এই বর্ষের (১৮১৪) গত শ্রাবণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সায়ন সিংহ সংক্রান্তি, ভাদ্র শুক্ল প্রতিপদে সায়ন কন্যা সংক্রান্তি হওয়াতে অসংক্রান্তি চান্দ্র শ্রাবণ, অধিমাস হইবে। শ্রাবণ মলমাস হেতু শ্রাবণ শুক্ল প্রতিপদে সায়ন সৌর আশ্বিন প্রবেশ যোগে সৌর চান্দ্র অন্তর দেড়মাস পড়িল। ইহাতে কি প্রকার ব্যবহার চলিবে? পুনশ্চ সায়ন রবি চন্দ্র স্ফুট যোগ হইতে বিষকুম্ভাদি ২৭ যোগ সাধন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত গঙ্গা মহামহাবারুণী মহা বৈশাখী অর্দ্ধোদয়াদি দুর্লভ যোগ সকল উৎসন্ন হইবে। অতএব নিরয়ণ গ্রহ সংক্রান্তি কেবলই গ্রাহ্য। নিরয়ণ রবি মেষরাশি প্রবেশ দিন হইতে সৌর বৈশাখাদি বর্ষারম্ভ আমার সম্মত।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হঠাৎ বর্ষারম্ভ দিন বা সায়ন গণনা প্রচলিত করিলে অনেক বিষয়ে গোলযোগ ঘটিবে। কিন্তু এই সমস্ত সামঞ্জস্য করিতে হইলে প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ ও স্মার্ত্ত মহাশয়গণের বিচার ও ব্যবস্থা আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান পঞ্জিকা সংশোধনের নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। আশা করি, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ

(৩)

পাঠকগণ, যে কোন বিষয়ের শব্দার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র সার ভাবার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে, সহজেই মন স্থির হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন থাকে। স্থূলরূপে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, সূক্ষ্মরূপে সার ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন জল একটি পদার্থ; কিন্তু দেশ ও ভাষা বিশেষে ইহার নানা প্রকার নাম আছে। যথা জল, পানী, নীর, সরিত, তোয়, অম্বু, বারি, জীবন, ওয়াটার, লীনু, তনি ইত্যাদি। কিন্তু পদার্থ একই। যদি শুদ্ধ "জল" শব্দের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে জ+অ+ল তিন শব্দ হয়। যদি বর্গীয় "জ" হয়, তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান বহির্জগত; যদি অন্তরস্থ "য" হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগত। যথা চারি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি। "অ" শব্দে অব্যয় শক্তি; যাহা দ্বারা আমরা সকল প্রকার কার্য্য করিতেছি। "ল" লিঙ্গাকার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এখন দেখ, সামান্যত এক "জল" শব্দের কত অর্থ হইল; ইহার পর অন্যান্য নামের অর্থ করিতে গেলে একটা যুগ কাটিয়া যায় এবং কত শাস্ত্র রচনা হয়, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। ইহা ব্যতীত অভিধানে জল শব্দের অর্থ আরও অনেক আছে। কিন্তু আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া "জল" শব্দের অর্থ করিয়া মরিলাম, তাহাতে জলের কিছুই হইল না; জল যেমন তেমনই রহিল, আমার কেবল মাত্র পরিশ্রমই সার হইল। যদি আমি সমস্ত শব্দ অর্থ নানা প্রকার নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে বস্তু, তাহাকে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে সহজেই আমার পিপাসা নিবৃত্তি হইত—আমি শান্তি পাইতাম। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া কেবল নাম-উপাধি, লইয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম; তাহাতে আমার পিপাসাও গেল না, শান্তিও হইল না। এইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুর নাম শাস্ত্রে, বেদে, বাইবেলে, কোরাণ ইত্যাদিতে ঋষিমুনিরা কত যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। কিন্তু তিনি অখণ্ডাকার নিরাকার সাকার ভাবে পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন। অতএব তাঁহার নামের শব্দার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তিনি যে সার পরিপূর্ণ আছেন, তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে (পূর্ণভাবে) ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিলে সহজেই মনের অন্ধকার দূর হইয়া শান্তি লাভ হয়।

পাঠকগণ, নিরাকার ও সাকার রূপের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব, তোমরা ইহার সারভাব গ্রহণ করিবে। নিরাকার ব্রহ্ম অদৃশ্য, বাক্য মন অতীত ও ইন্দ্রিয় অগোচর। তাহাতে কোন শব্দ অর্থ চলে না। তিনি যাহা, তাহাই আছেন। যত শব্দ অর্থ কেবল সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের। নিরাকার ব্রহ্ম যখন আপনি বহুরূপ হইতে ইচ্ছা করিলেন, অর্থাৎ সাকার জগৎস্বরূপে বিস্তার হইলেন, তখন প্রথমে ওঁকার অর্থাৎ অকার উকার ও মকার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—রজঃ, সত্ত্ব ও তম এই তিন গুণে) স্বরূপে বিস্তার হইলেন। আবার এই তিন হইতে সাত ভাগে বিভক্ত

হন; আবার সাত ভাগ হইতে চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপা হন; পুনরায় চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী হইতে একান্ন বর্ণরূপা হন। এই একান্ন বর্ণ দ্বারা সমষ্টি চরাচর বিরাট ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। প্রথমে ওঁকার যে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, কোন শাস্ত্রে তাহাকে সাত ধাতু বলে, কোন শাস্ত্রে সাত বস্তু বলে। যাহাকে সাত ধাতু বলে, তাহাকেই সাত বস্তু ও দ্রব্য বলে; তাহাকেই সাত ঋষি বলে, ব্যাকরণে তাহাকেই সাত বিভক্তি বলে, ও তাহাকেই অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি বলে। তাহাকেই নব গ্রহ বলে। শাস্ত্রে আছে "গ্রহরূপী জনার্দ্দন"। তাহাকেই ব্রহ্ম গায়ত্রীতে সপ্ত ব্যাহৃতি বলে। যথা ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ জলঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ তপঃ, ওঁসত্যম। ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। একই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম যথাক্রমে তিন, তিন হইতে সাত, সাত হইতে চব্বিশ ও চব্বিশ হইতে একান্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর স্ত্রী পুরুষ বিরাট ব্রহ্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর— অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন হইয়াছে। পৃথিবী ওঁকার হইতে হাড় ও মাস, জল ওঁকার হইতে রস, রক্ত ও নাড়ী, অগ্নি ওঁকার হইতে ক্ষুধা, আহার ও অন্ন পরিপাক ক্রিয়া, বায়ু ওঁকার হইতে নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ, আকাশ ওঁকার হইতে শব্দ (কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ) চন্দ্রমা ওঁকার হইতে নেত্রদ্বারে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন হইতেছে ও সৎ অসতের বিচার করিতেছে। জীবজ্যোতিঃ ও সূর্য্যজ্যোতিঃ এক হইয়া কারণ পরব্রহ্মে স্থিতি করিতেছে। সূর্য্যনারায়ণ ওঁকার জীবের মস্তকে আছেন; যখন মস্তক হইতে সূর্য্যনারায়ণ নেত্রদ্বারের নিজ তেজ সঙ্কোচ করিয়া লয়েন, তখন সকলেরই ঘুম আইসে, আর কোন চৈতন্য থাকে না। পুনরায় যখন মস্তক হইতে তেজরূপে প্রকাশ হয়েন, সেই সময়ে সকলে জাগরিত হয়। এই সাত হইতে চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রীপুরুষ, ঋষি, মুনি, আউলিয়া, পীর, প্যাগম্বর ও যিশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি অবতারগণ উৎপত্তি হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, পুনরায় এই সাতে যাইয়া লয় পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও পাইবেন। কিন্তু এই সাত অনাদি বিরাট রূপে বিরাজমান আছেন। স্বরূপ পক্ষে ইহার ক্ষয় বৃদ্ধি উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নাই। যাহা, তাহাই পরিপূর্ণ আছেন। বাহিরে সাতটা দেখা যাইতেছে, কিন্তু অন্তরে জ্যোতিঃ বিরাট রূপে একই ভাবে বিরাজমান আছেন। যেরূপ তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহিরে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে; যেমন হাত পৃথক, পা পৃথক, নাসিকা কর্ণ, মুখ ও চক্ষু প্রভৃতি সমস্তই পৃথক পৃথক; কিন্তু তুমি তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমষ্টি লইয়া ভিতর বাহিরে একই পুরুষ বিদ্যমান আছ; সেইরূপ এই বিরাট ব্রহ্ম বাহিরে সাতটা হইলেও স্বরূপে তিনি একই পুরুষ অনাদিকাল বিদ্যমান আছেন। যেমন তুমি এক এক অঙ্গ দ্বারা এক একটা কার্য্য করিতেছ, তেমনি তাঁহার এক এক অংশ দ্বারা (পৃথিবী জল প্রভৃতি) এক এক কার্য্য হইতেছে। তোমার এক অঙ্গকে অপমান করিলে যেমন তোমার সমষ্টি অঙ্গকে অপমান করা হয়, সেইরূপ সেই বিরাট ব্রহ্মের কোন অঙ্গকে অপমান করিলে সমষ্টি পূর্ণ বিরাট ব্রহ্মকে অপমান করা হয়। যেমন তোমার শরীরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ,

সেইরূপ এই বিরাট ব্রহ্মের শরীরের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। তুমি রাগ করিলে যেমন তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাগান্বিত হয়, তেমনি ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম রাগিলে, সমষ্টি চরাচর জগৎব্রহ্মাণ্ড ক্রোধিত হন। আবার তুমি প্রসন্ন হইলে যেমন তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসন্ন হয়; তদ্রূপ ঐ জ্যোতিঃ প্রসন্ন হইলে জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রসন্ন ভাব ধারণ করেন।

শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্ম হইতে সূর্য্যনারায়ণ জগতের আদি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়েন। সূর্য্যনারায়ণ হইতে ক্রমশঃ এই জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ এই জগৎকে নিজ তেজ দ্বারা আপনাতে লয় করিয়া অর্থাৎ আপনার রূপ করিয়া কারণেতে যাইয়া স্বয়ং স্থিত হয়েন। ইহা সকল শাস্ত্রের সার ভাব। ইহা ব্যতীত সাকার ব্রহ্ম আর কেহ হয়েন নাই, হইবেন না ও হইবার সম্ভাবনাও নাই। যাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা ঐ তেজোময় জ্যোতিঃ হইতে এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম বেদে ও শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষেপে লেখা আছে; কিন্তু আমি এস্থলে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি। সেই বিরাট ব্রহ্মের নেত্র হইলেন সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার মস্তক, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই প্রত্যক্ষ বিরাট ব্রহ্ম জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা অনাদি কাল হইতে বিরাজমান আছেন। ইহাঁর জ্যোতিঃ রূপের অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের শাস্ত্র বেদে রূপক অলঙ্কারে কত যে ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহাঁরই নাম সাবিত্রী দেবী মা, গায়ত্রী দেবী মা, বিষ্ণু, ভগবান, বিশ্বনাথ, শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, শালগ্রাম, দেবী দুর্গা, ভদ্রকালী, আদিত্য রুদ্র, ইন্দ্র ও ওঁকার ইত্যাদি; কিন্তু তিনি যাহা, তাহাই আছেন—একইরূপে, একই অবস্থায় সেই অনাদি কাল হইতে নিরাকার সাকার রূপে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছেন। এই জন্য প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সূর্য্যনারায়ণকে ও সূর্য্যনারায়ণেতে সকল নামের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। তাঁহাকে অর্থাৎ সেই জ্যোতিকে ধারণ করিলে জীবাত্মা-জ্যোতিঃ ও সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর-জ্যোতিঃ এক হইয়া অভেদ হইয়া নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ রূপে অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। তাহা হইলে ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ এবম্বিধ মনের ভ্রম আর থাকিবে না। সদা মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে থাকিবে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ, যাঁহা হইতে এই জগৎব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে, যিনি স্বপ্রকাশ, অনাদি কাল হইতে যিনি প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে কেহ একবার চাহিয়াও দেখে না! কেবল অজ্ঞান-অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হইয়া সাম্প্রদায়িকতার ঘোর তমসে অন্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া মরিতেছে। তাহারা জানে না যে, যিনি আমার গুরু, তিনিই জগৎব্রহ্মাণ্ডের গুরু; যিনি আমার ধ্যেয়, তিনিই জগৎব্রহ্মাণ্ডের ধ্যেয়। এই অনন্ত বিশ্বমাঝে সেই এক বই আর দুই নাই। তাহার ইষ্টদেবতার নিন্দা করিলে যে আমার ইষ্টদেবতার নিন্দা করা হয়, এবং আমার ইষ্টদেবতার নিন্দা করিলে যে তাহার ইষ্ট-

দেবতার নিন্দা করা হয়, এ জ্ঞান তাহাদের একবারে লুপ্ত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, তোমরা একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, আর কোথায়ই বা যাইবে, আর তোমাদের কার্য্যই বা কি? আর তোমাদের উপাস্যই বা কি? তিনি কোথায়ই বা আছেন? আর অসার বস্তুতে আসক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িকতার ঘোর তমসে অন্ধ হইয়া থাকিও না; একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ,—চাহিয়া দেখিয়া কার্য্য কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। চিরকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে কোনকালেই আর মঙ্গলের মুখ দেখিবে পাইবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(৪)

পাঠকগণ, এস্থলেও গম্ভীর ও শান্ত ভাবে সার ভাব গ্রহণ করিবে। যদি সৎপুত্র ও সুমতী কন্যা পিতামাতার নেত্রের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহা হইলে পিতামাতার সমষ্টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের নমস্কার করা হয়। মাতাপিতা দেখেন যে, আমার পুত্রকন্যা নমস্কার করিল, অতএব আমার সমষ্টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নমস্কার হইয়াছে। যদি পিতামাতার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম ধরিয়া নমস্কার করে, অর্থাৎ হাত পিতাকে নমস্কার, পা পিতাকে নমস্কার, নাক পিতাকে নমস্কার, মুখ পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি, তাহা হইলে পিতামাতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেক আছে; আর এইরূপে পুত্রকন্যার নমস্কার করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ইহাতে অনর্থক কষ্ট ও সময় নষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু মাতাপিতার নেত্রের সম্মুখে নমস্কার করিলে সহজেই তাহাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নমস্কার করা হয়।

এস্থলে মাতাপিতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ব্রহ্ম। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত চরাচর দেব দেবী নাম কল্পিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই বিরাট ব্রহ্মের মন ও নেত্র জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। সেই পরম জ্যোতিঃ মন ও নেত্ররূপী চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিলে সমষ্টি চরাচর দেবতা দেবী,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জগৎপিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মাকে নমস্কার করা হয়। আর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের কল্পনা করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন হয় না। যদি সাকার জ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা রূপে দিবা রাত্রিতে প্রকাশমান থাকেন, তাহা হইলে প্রাতে ও সায়ংকালে,—উদয় ও অস্ত সময়ে প্রীতিপূর্ব্বক রাজা প্রজা, স্ত্রীপুরুষ, বালবৃদ্ধ, সাধু গৃহস্থ সকলেই তাঁহাদের সম্মুখে নমস্কার করিবে; যদি নিরাকার ভাবে অপ্রত্যক্ষ থাকেন, তবে সকলে আপনার অন্তরে, ঘরের ভিতরে হউক কি বাহিরে হউক, শয়ন করিয়া হউক, কি বসিয়া হউক, আসনে হউক কি নিরাসনে হউক, যে দিক ইচ্ছা সেই মুখ হইয়া, যেরূপ অবস্থায় থাক না কেন, সেইরূপ অবস্থায়, উঠিবার ও শুইবার সময় পূর্ণরূপে প্রণাম করিও। এই কথা বলিয়া প্রণাম করিও যে, হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরু ও আত্মা, তোমাকে পূর্ণরূপে নমস্কার বা প্রণাম করিতেছি। হে বিশ্বময়, আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া

তোমাকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু হে অন্তর্যামি, তুমি আমাদিগকে ভুলিও না। আমি নিজে আপনাকে যখন চিনি না, তখন তোমাকে চিনিব কি করিয়া? অতএব তুমি নিজ গুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের অন্তরে সৎবুদ্ধি প্রেরণ করত সদা জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দে যুক্ত রাখিও।" এইরূপ নমস্কার ও প্রার্থনা করিলে নিরাকার ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে নমস্কার ও প্রার্থনা করা হইবে। অর্থাৎ সমস্ত চরাচর দেবদেবীকে নমস্কার করা হইবে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তিত ও ভীত হইও না। তোমাদের গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ও সাকার ত্রিগুণাত্মা জগৎস্বরূপ বিস্তার হইয়া তোমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন; তোমাদিগের সকল অভাব দূর করিয়া সতত রক্ষা করিতেছেন; তোমরা একবার চাহিয়া দেখ, দেখিয়া সেই বিরাট ব্রহ্মকে ভক্তিপূর্ব্বক সকলে একবার প্রণাম কর। সেই মঙ্গলময়ের, আনন্দময়ের প্রসাদে তোমাদের সকল অমঙ্গল দূরে যাইবে, তোমরা নিত্য পরমানন্দ উপভোগ করিবে।

তোমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই যে, নিরাকার ও সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে পূর্ণরূপে উপাসনা করিবে। প্রথমে নিরাকার রূপের ধারণা হইবে না, অতএব সাকার প্রত্যক্ষ বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাকে ধারণ করিও; আপনার রূপ, মন্ত্রের রূপ, ও পরমাত্মার রূপ এই জ্যোতিঃরূপ ভাবিয়া ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে ধ্যানধারণা করিবে ও একাক্ষর মন্ত্র ওঁকার জপ করিতে থাকিবে; তাহা হইলে মন ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া আসিবে; মন স্থির হইয়া আসিলে আপনা হইতে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। তখন ব্যবহারিত ও পারমার্থিক কোন কার্য্যই আর অসিদ্ধ থাকিবে না। আর কোন বিষয়েই আসক্তিও রহিবে না। গৃহস্থধর্ম্মে যথাশক্তি নিত্য, অথবা সপ্তাহে সপ্তাহে কিম্বা অমাবস্যা পৌর্ণমাসীতে অগ্নিতে নিজে আহুতি দিবে। উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্যে উত্তম শ্রেষ্ঠ ফল আছে, আর নিকৃষ্ট কার্য্যে নিকৃষ্ট ফল আছে। যে কেহ চাস করিয়া ধান্য বপন করে, সে ধান্যই পায়, যে কেহ চাষ করিয়া কাটাবীজ বপন করে, সে কাটাই পাইয়া থাকে; অতএব সকলে সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠ কার্য্যই করিবে। নিকৃষ্ট কার্য্যে মিথ্যাপ্রপঞ্চে কদাচ লিপ্ত হইও না। মানুষ মাত্রেই, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই জ্ঞানের অধিকারী। ইহাতে জাতি বা বর্ণভেদ নাই। অতএব জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়া জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। নিজে খাইলে নিজেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, অপরে আহার করিলে নিজের উদর পূর্ত্তি হয় না। সেইরূপ আমার ইষ্ট কার্য্য অপরে করিবে, আর তাহার ফল আমি পাইব, ইহা নিতান্তই ভুল। যদি কোন অজ্ঞানী ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বলে যে, স্ত্রী ও শূদ্রের শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকার নাই, তাহা হইলে তাহার কথা আদৌ শুনিবে না। শাস্ত্রের অর্থ সেরূপ নহে। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ নিজ মনঃকল্পিত অর্থ করিয়া লোককে প্রতারণা করে। আমি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিতে পারি যে, তাহাদের উক্তি সকল নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। সামান্যতঃ ভাবিয়া দেখ যে, যে অগ্নি দ্বারা সাধু ও ব্রাহ্মণের ঘরে আলো ও পা-

কাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই অগ্নি দ্বারাই ত শূদ্রের ঘরে ঐ সকল কার্য্য হইতেছে। যদি ভগবানের নিকট স্ত্রী শূদ্র ব্রাহ্মণাদি হইতে পৃথক হইত—অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অংশ না হইত, তাহা হইলে তাহাদের ব্যবহারিক দ্রব্যাদিও পৃথক হইত, সন্দেহ নাই। ঐ একই অগ্নি দ্বারা সকলের কার্য্য কদাচ হইত না। অতএব জ্ঞান ও মুক্তির পথ মনুষ্য মাত্রেরই এক ব্যতীত দুই নাই। বেদ পাঠ করা, পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্রর উপাসনা করা, ওঁকার মন্ত্র জপ, ব্রহ্ম গায়ত্রী জপ, ও অগ্নিতে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতে স্ত্রী শূদ্র, গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে; এবং সকলের করাও কর্ত্তব্য। কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক, উভয় কার্য্যেতে গৃহস্থ লোকের তীক্ষ্ণ ভাবে থাকা চাই। কোন কার্য্যেতে আলস্য করা উচিত নহে। যে কার্য্যে আলস্য করা হয়, সে কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। অল্পেতে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিতে হয়। যাহাতে আপনার ও জগতের মঙ্গল হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আপনার মঙ্গল হইলেই জগতের মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল হইলেই আপনার মঙ্গল হয়। কারণ জগৎময়ই সব আপনার আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ। গৃহস্থ ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই; গৃহস্থ ধর্ম্মকে অন্য সকল ধর্ম্মই আশ্রয় করে। অর্থাৎ যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ আহারের প্রয়োজন, সুতরাং সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও অন্নের জন্য গৃহস্থের দ্বারে আসিতে হইবে। গৃহস্থ ব্যক্তি অন্যান্য সকল আশ্রমীকেই পোষণ করিয়া থাকেন। উপরি উক্ত কার্য্য সকল করিলে গৃহস্থ লোক চারি ধর্ম্মেরই ফল প্রাপ্ত হয়েন। অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ কেহ বলেন যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরমার্থ কার্য্য হয় না; কিন্তু সেটা তাহাদের বড় ভুল। কেননা গৃহীদিগের সাংসারিক কার্য্য করিয়া এত সময় থাকে যে, সে সময় তাঁহারা অনর্থক গল্প ও আমোদে না কাটাইয়া ভগবৎচিন্তা করিলে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। যিনি সংসারে থাকিয়া নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়াও মনকে সেই পূর্ণ ব্রহ্মে ঠিক রাখিতে পারেন; তিনিই প্রকৃত সাধু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রত্নহারা ফরিদপুর।

মনুষ্যের জন্ম ও মৃত্যু, দেশের উত্থান ও পতন, কালের নিয়ম। যে জন্মিয়াছে, সে-ই মরণের আয়ত্বাধীন, যে উন্নতি-মার্গে উঠিয়াছে, সে-ই পতনের হস্তগত। যে জন্মে নাই, সে মরিবেও না। যে উর্দ্ধে মস্তক তোলে নাই, সে পড়িবে কিরূপে? সৃষ্টির এই স্বাভাবিক নিয়ম বটে, কিন্তু জন্ম ও উত্থান যত আনন্দের, মৃত্যু ও পতন ততোধিক বিষাদের। মানুষ যখন জন্মে, তখন পিতামাতার আনন্দ, নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের আনন্দ; কিন্তু যখন মরে, তখন সকল পরিচিত ব্যক্তির ঘোর বিষাদের কারণ। সেই মানুষ যখন আবার মানুষের মত মানুষ হয়, তখন, তাহার জন্য দেশের সকল লোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দেশ সম্বন্ধেও এই কথা। রোমের উত্থানের সময় পৃথিবীর অল্প লোক আনন্দ

করিয়াছে, কিন্তু রোমের পতনের সময় পৃথিবীর সকল দেশ হাহাকার করিয়াছে!! নেপোলিয়নের জয়োল্লাসের সময় পৃথিবীর অল্প লোক আনন্দ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পতনের সময়,যে তাঁর নাম শুনিয়াছে, তারই চক্ষে জল পড়িয়াছে। বাঙ্গলায় মুসলমানের অভ্যুদয়ে কে আনন্দ করিয়াছিল? কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক বীর, স্বদেশপ্রেমিক, ইংরাজদ্রোহী সিরাজের পতনে সকলে হাহাকার করিয়াছে। মৃত্যু এবং পতন ঘোর বিষাদের চিত্র। কিন্তু মৃত্যু এবং পতন যেখানে নব জীবন সঞ্চারের কারণ হয়, তখন দুঃখ করিবার কিছু থাকে না। যতদিন তাহা অপরিজ্ঞাত, ততদিন মানুষ হাহাকার করিবেই করিবে। খ্রীষ্টের দেহত্যাগের পর মানব সমাজ জাগিবে, এ বিশ্বাসের কথা কাহার অন্তরে স্থান পাইয়াছিল? সুতরাং মেরি মেগ্‌ডেলিন-প্রমুখ নরনারী কাঁদিয়া আকুল না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মৃত্যুর করালগ্রাসে মানুষকে ডুবিতে দেখিলে, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সকলের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, সকল হৃদয় সমস্বরে বিধাতার অতি পবিত্র বিধানেও দোষার্পণ করিয়া বলে, হা ভগবান, তোমার একি বিধি!!

ফরিদপুর পূর্ব্ব বাঙ্গলার মধ্যে একটী নগণ্য ক্ষুদ্র জেলা। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা এবং পাবনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের নাম ফরিদপুর। ইহার উত্তর সীমায় পদ্মা, পূর্ব্ব সীমায় মেঘনা, পশ্চিম সীমায় নদীয়া,যশোহর ও মধুমতী নদী, দক্ষিণ সীমায় খুলনা ও বরিশাল। বিধাতার কৃপায় এই ক্ষুদ্র জেলা একটু একটু জাগিতেছিল। অথবা এই জেলায় অল্পে অল্পে কতিপয় মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইতেছিল। সে দেশ দেশই নয়, যে দেশে মহৎ এবং সাধু লোকের অভ্যুদয় না হয়। প্রকৃতির অনুজ্ঞায়, ঘোর দারিদ্র্যসংগ্রামে প্রপীড়িত হওয়ায়, ফরিদপুরের সাধারণ জনগণ, সুশিক্ষা এবং সর্ব্ববিধ উন্নতির অনুসরণ করিতেছিল। সুপবন বহিতেছিল, অনেকে কঙ্কালাবশিষ্ট দেহপিঞ্জর হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিতেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া বহু ছাত্র উন্নতির দিকে ছুটিতেছিল। প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতি বৎসর দুটী একটী ছাত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছিল। শিক্ষিত মণ্ডলী দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইতেছিলেন। গ্রামে গ্রামে সভা, গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইতেছিল। পূর্ব্বে এই জেলায় কেবল ১টী এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল, তাহার স্থলে এখন ৮টী এণ্ট্রান্স স্কুল চলিতেছে। শিক্ষিত মাত্রেই চরিত্র লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছিলেন। ফরিদপুরে কোন বড় লোক নাই—কিন্তু সাধারণের চেষ্টায় দেশের এই সকল অভাব দুর হইতেছিল। এই সময়ে কালের ভীষণ রণ-রবে সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। মৃত্যু,করাল মুখব্যাদান করিয়া এই উন্নতির দিনে, ভীষণ মুর্ত্তিতে, ফরিদপুরের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসরের মধ্যে ফরিদপুরের বহু অমূল্য রত্ন, যুবা বৃদ্ধ,এই যুদ্ধে দেহত্যাগ করিলেন!! দিন দিন ক্রন্দনের রোল আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে, দিন দিন মহারথি সকল একে একে দেশের মমতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন! যেন কি এক ভয়ানক মহামারি উপস্থিত; যেন কি এক মহাপ্রলয় উপস্থিত!! ফরিদপুরের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দারুণ বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। সকলের চক্ষে বারিধারা, সকলের মুখে হাহাকার, সকলের হৃদয় উৎসাহশূন্য, সকলের প্রাণ অধীর। ফরিদপুরের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। উন্নতিতে আনন্দ করিবার এ জগতে কেহ না থাকিলেও, এই ঘোর বিষাদের দিনে সকল সহৃদয় ব্যক্তিই ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। সকলের সমবেদনার প্রার্থনা-ধ্বনিতে এই দরিদ্রদেশ কৃতার্থ হইবে।

১। ৺রসিকচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিবাস উলপুর। ইনি জাহানাবাদের মুন্সেফ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের পর প্রথম ওকালতি করেন, তৎপর মুন্সেফ হন। বাল্যকাল হইতে তিনি সচ্চরিত্রতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ৩০০৲ বেতন পাইতেন, সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ গত বৎসর মৃত্যু-গ্রাসে কবলিত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে পিতৃবংশ লোপ পাইয়াছে। উলপুরের মুখ মলিন হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নী পৃথিবী শূন্য দেখিতেছেন। উলপুরে এরূপ সচ্চরিত্র লোক আর বড় দেখা যায় না। ইঁহার বয়স ৪৫ বৎসরের অধিক হয় নাই।

২। ৺সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ডি-এল, মহাশয়ের নিবাসও উলপুর। মৈমনসিংহের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট-উকীল ৺পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর ইনি দ্বিতীয় পুত্র; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শেষে ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫।৬ জন মাত্র ডি-এল আছেন, তন্মধ্যে ইনি একজন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আর ডি-এল নাই। ইনি একজন প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান, পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আপন ক্ষমতা বলে মৈমনসিংহ জেলার প্রধান উকীল হইয়াছিলেন। ইঁহার বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক হয় নাই। গত বৎসর কলিকাতাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উলপুরে, কেবল উলপুরে কেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করে নাই।

৩। উলপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বধারে কোটালিপাড় পরগণা। কোটালিপাড় পরগণা অতি বিস্তৃত স্থান। ইহার অন্তর্গত কাশাতলি গ্রামে ৺উমেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স এলে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ওকালতি করিতেছিলেন। ইনি খুব উৎসাহী, সচ্চরিত্র এবং দেশহিতৈষী ছিলেন। ২৯ কি ৩০ বৎসর বয়সে কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যুতে কোটালিপাড়ের আপামর সাধারণ গভীর শোকে নিমগ্ন।

৪। খান্দারপাড় গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা ৺গঙ্গাচরণ সেন মহাশয় খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অমায়িকতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সর্ব্ববিষয়ে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয় ফরিদপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কলিকাতায় ইঁহার অসাধারণ সম্মান; পরোপকার-ব্রত ইঁহার জীবনের অলঙ্কার। ইঁহার সর্ব্বগুণ ইঁহার ভ্রাতাতেও ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ফরিদপুরের একাংশ ইঁহার অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

৫। উজানি গ্রামের রাজবংশের মধ্যে

একজন গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত, সর্ব্ব-পূজ্য, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নাম গিরীশ চন্দ্র রায়। ইনি উজানির রাজকুলের গৌরব ছিলেন, বুদ্ধিতে, সহৃদয়াতে, জ্ঞানে, প্রতিভায় ইনি উজানি কেন, ফরিদপুরের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি খুব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নববর্ষের প্রথমেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে উজানি প্রকৃত বড়লোক শূন্য হইয়াছে।

৬। ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বাংশে রাহাপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের বাবু কালীমোহন ঘোষ গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া সাহেব মহলে খুব সম্মান এবং প্রতিপত্তি পাইয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতা গোপীমোহন ঘোষ একজন প্রকৃত সাধু এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। গত বৎসর তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

৭। লোনসিংহ-নিবাসী বাবু অভয়াচরণ দাস রায় বাহাদুর মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ইনি একজন ফরিদপুরের অদ্বিতীয় পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকার যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে তিনি। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও উৎসাহে নবীন ছিলেন। শেষ বয়সে পূর্ব্ববঙ্গ এসোসিয়েসন গঠন করিয়া তাহার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি। বোধ হয়, তাঁহার অভাবে এ সভার অস্তিত্বআর থাকিবে না। এরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন,গত ৫০ বৎসরের বঙ্গের ইতিহাসে তাহা বিজড়িত। এক বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ফরিদপুর এবং বঙ্গদেশের মুখ মলিন করিয়া, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

৮। রামভদ্রপুর নিবাসী ৺রাজকুমার ভট্টাচার্য্য নেলফাগারীর প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। সাধুতা, সচ্চরিত্রতা, অমায়িকতা ইঁহার জীবনের অলঙ্কার ছিল। ইনি এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। নেলফাগারির সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে তিনি ছিলেন। এরূপ মহৎ ব্যক্তির অভাবে ফরিদপুর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক বৎসরের পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

৯।১০। নপাড়ার ৺শশিভূষণ নন্দী এবং গয়ঘরের ৺ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ দুই অকৃত্রিম বন্ধু। ব্রজেন্দ্রবাবু ফরিদপুরে এবং শশী বাবু খিদিরপুরে মোক্তারী করিতেন। কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য উভয়েই বিশেষরূপ ব্রতী ছিলেন। শশী বাবু একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কায়স্থপুরাণ নামক পুস্তক ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া শশিবাবু বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কায়স্থ সমাজের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেন। গত বৎসরের শেষভাগে উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। উভয়ই সচ্চরিত্র, পরোপকারী, দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের অভাবে কায়স্থ-সমাজ প্রকৃত হিতৈষী শূন্য হইয়াছে।

১১। পাঁচ্চরের ৺বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি এমন দয়া,আর ফরিদপুর কোথাও দেখা যায় নাই। দুঃখী কাঙ্গালকে ভাই বলিয়া কোলে লইতেন। তাহাদের উন্নতির জন্য জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর প্রতি জমীদারের অত্যাচারের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িত।

চিরকাল নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য জমীদার ও ধনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। অন্য-দেশে এরূপ লোক জন্মিলে, এরাবি পাশার ন্যায় সকলে পূজা করিত। তিনি ধনী ব্যক্তিদিগের অত্যাচার হইতে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া, ধনীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন এবং অব-শেষে জেলে প্রাণ হারাইলেন!! এদে-শের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীও ধনীর বশ, সুতরাং তিনি কোথাও ন্যায় বিচার না পাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,শেষে প্রাণ দিলেন। এরূপ মহৎ ব্যক্তি ফরিদপুরে অতি অল্প জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রাণ স্বদেশ-হিতৈষণায় পূর্ণ ছিল, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, দুঃখী দরিদ্রের জন্য হৃদয়ে যেন সহানুভূতির অনল সদা জ্বলিতেছিল। এরূপ লোকের অভ্যুদয়ে পাঁচ্চর ধন্য হইয়াছে; ফরিদপুর ধন্য হইয়াছে।

১২। তারপর খালিয়ার ৺অমৃতলাল রায়। বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ইনি স্বর্গারোহণ ক-রিয়াছেন। বয়স ৪২।৪৩ বৎসর মাত্র হইয়া-ছিল। ইঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী,হৃদয়বান,পর-দুঃখকাতর,দুঃখীর বন্ধু ফরিদপুরে অল্প আছে। খালিয়া ফরিদপুরের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রাম, শিক্ষা ও ধনবলে ফরিদপুরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও, শ্রেষ্ঠের মধ্যে যে অন্য-তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, এই গ্রামের মধ্যে অমৃত-লাল রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ধনে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, বিদ্যায়ও নহে; কিন্তু বুদ্ধি, প্রতিভা, জ্ঞান-পিপাসা, সহৃদয়তা এবং দেশহিতৈষণায় তিনি কেবল খালিয়ায় কেন, ফরিদপুরের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সমাজ-সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করায় তাঁহাকে জীবনের অ-ধিকাংশ সময় দেশে এক-ঘরে হইয়া থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও দমিয়া যান নাই। দুঃখী কৃষকদিগের উন্নতির জন্য সদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, যাঁহারা চিরকাল তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও একবাক্যে বলিতে-ছেন,এরূপ লোক আর খালিয়ায় জন্মে নাই। বুদ্ধির তেজে কখনও তিনি অন্যের নিকট ম-স্তক অবনত করেন নাই; আপন প্রতাপে চিরকাল ভয়ানক ভয়ানক বিপদ হইতে উ-দ্ধার পাইয়া শেষে সর্ব্বলোকের নিকট প্রতি-পত্তি পাইয়াছিলেন। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর তিনি মা বাপ ছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; ইহার প্রসঙ্গ উঠিলে রোগ-কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। ফরিদ-পুর সুহৃদ্ সভার তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং উৎসাহী সভ্য ছিলেন। জাতীয় ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, নব্য-ভারতের একজন প্রকৃত সুহৃদ্ ছিলেন। দেশের এমন কোন বিষয়ছিল না, যাহা তিনি জানিতেন না; কিম্বা এমন কোন সৎকাজ ছিল না, যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার যোগ ছিল না। সঞ্জীবনী নামক পত্রিকায় কৌলিন্য-কাহিনী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার মূলে তিনি। তাঁহার অভাবে খালিয়া এবং ফরিদপুর প্রকৃত বড়লোক শূন্য হইয়া-ছে। ফরিদপুর এবং খালিয়াতে আরো ভাল লোক জন্মিয়াছেন,ঈশ্বর করুন,তাঁহাদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হউক, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ লোকের অভাব আর পূর্ণ হইবে না। অমৃতলাল রায় যেন আগুনের খণি ছিলেন। দুদণ্ড তাঁহার নিকট থাকিলে, দেশহিতৈষণার আগুন মৃত প্রাণে জ্বলিয়া উঠিত। পিণ্ডার পার্কার যেমন আমেরি-

কায়, অমৃতলাল যায় তেমন থালিয়ায়—দরিদ্রের বন্ধু। এরূপ প্রকৃত হৃদয়বান, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, অকপট দেশহিতৈষী এদেশে এ কালে খুব কম মিলে। ফরিদপুর ইঁহার অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ফরিদপুরের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে।

১৩। তারপর বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় ব্যক্তি, নবাব আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর। বিগত ২৭শে আষাঢ় বেলা ২ ঘটিকার সময়ে এই মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন। "মুসলমান ধর্ম্মের উত্থানের সময় খালিদ বিনওয়ালিদ একজন প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন। লোকে 'ঈশ্বরের তরবারি' বলিয়া তাঁহার উপাধি দিয়াছিল, তাঁহারই বংশে আবদুল লতীফের জন্ম। সেই বংশীয় সাহ আইনদ্দিন নামক এক ব্যক্তি, বোগদাদ্ হইতে সম্রাট আউরঙ্গজেবের সময় দিল্লিতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী দিল্লির সম্রাটের অধীনে বড় বড় কার্য্য করিয়া ফরিদপুরে জায়গীর লাভ করেন। আবদুল লতীফের পিতা দেওয়ানি আদালতের ওকালতি করিতেন। ১৮২৮ খ্রীঃ মার্চ্চমাসে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। ২১ বৎসর বয়সের সময় তাৎকালিক ডেপুটি গবর্ণর সার হার্বার্ট ম্যাডক তাঁহাকে আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৯ বৎসর কাল নানা স্থানে সম্মানের সহিত এই কার্য্য করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শেষ শিয়ালদহের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে বিলাতে কমন্সসভার কমিসন-সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য মনোনীত করেন, কিন্তু পার্লমেণ্ট দলভ্রষ্ট হওয়ায় আর তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ১৮৬৩ খ্রীঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" হন। ১৮৮১ খ্রীঃ ভূপাল রাজের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৮৭৬ খ্রীঃ তুরস্কের সুলতান তাহাকে "মেদজেদি" উপাধি দেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি সরকারী চাকরী হইতে অবসর লওয়ায় ভারতসচিব তাঁহার জন্য বিশেষ পেন্সনের বন্দোবস্ত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লির দরবারে 'এম্প্রেস' মেডেল ও ১৮৮৩ খ্রীঃ C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাণীর জুবিলির সময় "নবাব বাহাদুর" উপাধি পান।"

তাঁহার জীবন গত ৬০ বৎসরের ভারত-ইতিহাসের সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে, সংক্ষেপে তাঁহার জীবন চরিত লেখা কঠিন। তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন-স্থল ছিলেন। জাতীয় মুসলমান-সাহিত্য-সভা তাঁহার জীবনের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি।

তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশের সকল লোক হাহাকার করিতেছে, ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব অভিব্যক্ত। নিরপেক্ষ, সদ্বিবেচক, চিন্তাশীল ইণ্ডিয়ান নেসন সম্পাদক তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"It is our melancholy duty to announce the death of Nawab Abdul Luteef Bahadoor, the most representative Mahomedan gentleman of Bengal. The Nawab was a self-made man, and he rose not merely by his intellectual but by his social qualities. Through the greater part of his life his official position was that of a Deputy Magistrate, but his circle of acquaintance was probably the largest that any Bengalee had, and his influence was second to that of none. * * * He did useful work as an Honorary Magistrate, as a Fellow of the Calcutta University, as a Municipal Commissioner, as a member of the Bengal Legislative Council. The most important of his work, however, was, we believe done in private life by his private influence. He did many a good turn to friends and served his community no less in unobtrusive ways."

আবদুল লতীফ বঙ্গের অলঙ্কার ছিলেন, তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন; হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের জন্য তাঁহার কাঁদিত। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু, ইংরাজ, মুসলমান হাহাকার করিতেছে; কিন্তু কাহার অঙ্গে এ বেদনা অধিক লাগিয়াছে? দরিদ্র ফরিদপুর তাঁহার অভাবে একজন অদ্বিতীয় বড়লোক শূন্য হইল! তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের নিকট তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহৃদয়তার নিকট অনেক দরিদ্রব্যক্তি ঋণী—ইত্যাদি নানা কারণে নানা ব্যক্তি আজ কাঁদিয়া আকুল; কিন্তু

ফরিদপুর আজ উপযুক্ত সৎপুত্র হারা, আজ প্রকৃত রত্নহারা। ফরিদপুর এজন্য আজ গভীর শোকে শোকাচ্ছন্ন, দরিদ্র ফরিদপুর আজ অন্ধকারময়।

ফরিদপুরের গৌরবের আর কিছুই নাই, কেবল এই সকল অমূল্য রত্ন ছিল। আজ ফরিদপুর এই সকল রত্ন-হারা হইয়া হাহাকার রব করিতেছে, গভীর শোকের উচ্ছ্বাস গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এমন দুর্দ্দিন কোন দেশে, একই সময়ে, উপস্থিত হয় নাই। কত লোক প্রত্যহ জগতে আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে, কে তাহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করে? কিন্তু এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের অভাব, দুঃখী ফরিদপুরের পক্ষে অসহনীয়। ফরিদপুরের যে যেখানে থাক, দেশের এই গভীর শোকের দিনে সকলে মিলিত হইয়া, বিলাস-সুখ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, ইঁহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা কর। এমন দুর্দ্দিন আর কখনও ফরিদপুরে উপস্থিত হয় নাই।

গত বৎসর আরো যে সকল মহৎ ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিব না। তাঁহারাও দেশের অলঙ্কার ছিলেন, কিন্তু সাধারণে সে জন্য কাঁদিবে কেন? যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম, ইঁহাদের প্রতিজনের জীবনই বিশেষত্ব এবং মহত্ব পূর্ণ ছিল, ইঁহাদের প্রতিজনের দ্বারাই স্বত পরত, ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রভূত উপকার হইতেছিল। প্রতি মহৎ লোকের দ্বারাই সেইরূপ হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রতিজনেরই জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা উচিত। ইঁহাদের অভাবে ফরিদপুরের এবং সমগ্র বঙ্গদেশের যে অমঙ্গল হইয়াছে, ইহা ভাবিবার, কিন্তু লিখিবার নহে; ইহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার, কিন্তু ব্যক্ত করিবার নহে। এই গভীর শোকের ভিতর বিধাতার কি শুভ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, জানি না; কিন্তু আমরা ফরিদপুরের সামান্য অধিবাসী, আমাদের প্রাণ শোকে আকুল হইয়াছে, আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে। এই সকল মহৎ ব্যক্তির রক্ত হইতে যদি ম্যাট্‌সিনি বা পার্কারের সমতুল্য কোন মহাত্মার অভ্যুদয় হয়, মহানন্দে নৃত্য করিব। কিন্তু আজ কাঁদিবার দিন, শুধু কাঁদিবই। ফরিদপুরের বন্ধু, যে যেখানে আছ, ফরিদপুরের হিতাকাঙ্ক্ষী যে যেখানে আছ, একবার উচ্চ রবে গগন কাঁপাইয়া ক্রন্দনের রোল তোল। সকল আনন্দের ব্যাপার অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ফরিদপুরে ক্ষান্ত থাকুক। প্রতি গৃহে শোক-গাথা কীর্ত্তিত হউক, সকলে শোক পরিচ্ছদ পরিধান করুক। মহতের পূজা করিতে না শিখিলে কেহ মহৎ হইতে পারে না। মহতের জন্য কাঁদিতে না জানিলে কেহ মহত্ব পায় না। আজ কাঁদিবার দিন, সকলে একবার কাঁদ। দেখি, বিধাতা দরিদ্র ফরিদপুরের প্রতি প্রসন্ন হন কি না।

বঙ্গের বৈষ্ণব কবি। (১)

"গোবিন্দদাস" প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার মনে কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সন্দেহগুলি মিটাইবার জন্য আমি একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ও ভক্ত

বৈষ্ণবকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ কি উত্তর দেন, দেখিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রশ্নগুলি ছাপাইয়া দেই। সে প্রশ্নগুলি এই:—

১। যে রাজা নরসিংহ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি কোথাকার রাজা?

২। খেতুরীর মহোৎসবে বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ কর্ণপুর উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা কে? চৈতন্য ভাগবতকার ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটককার অনেক পূর্ব্বের। ১৪৯৪ শকে চৈতন্যচন্দ্রোদয় সম্পূর্ণ হয়। ১৫৩৭ শকে কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত রচনা করেন। কবি কর্ণপুর প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে চৈতন্যচন্দ্রোদয় রচনা করেন। ইহাঁরা কি করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের সমকালবর্ত্তী হইবেন?

৩। আচার্য্যঠাকুর চরিতামৃত গ্রন্থ গৌড়দেশে আনিবার পরে রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তবে কি করিয়া চরিতামৃতে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের নাম দৃষ্ট হয়।

৪। জ্ঞানদাসকে মনোহর উপাধি কে দিয়াছিল? তাঁহার নাম শ্রীমদন জ্ঞানদাস কেন হইয়াছিল?

৫। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ আচার্য্যঠাকুরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দের শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কেন?

৬। গোবিন্দদাস কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের অদর্শনের পর মিথিলায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন কি?

মিথিলায় গোবিন্দদাস নামে এক বৈষ্ণব কবির অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত আছে। নিম্নলিখিত উত্তর পাঠে বুঝা যাইবে, তিনি বুধুরীর গোবিন্দ কবিরাজ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আর একটী কথা বুঝা যাইতেছে, ঠাকুর মহাশয়ের সমকালবর্ত্তী দুই জন বসন্তরায় ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ, অন্য জন কায়স্থ, ও রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। ইনিই পদকর্ত্তা রায় বসন্ত।

এই কয়েকটী প্রশ্ন প্রকাশিত হইবার পর আমি একখানি গ্রন্থে জ্ঞানদাস সম্বন্ধে এই কবিতাটী প্রাপ্ত হই—

রাঢ়দেশে কাঁদড়া গ্রামেতে গ্রাম হয়
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

অনন্তর এতৎসম্বন্ধেও আমার গুরুতুল্য দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি ও এডুকেশন গেজেটে কয়েকটী প্রশ্ন পাঠাইয়া দিই।

মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্টনিবাসী বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও বদনগঞ্জ হুগলীনিবাসী বাবু হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া আমাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, ভক্তিনিধি মহাশয় তৎপূর্ব্বে সে সকল কথাই বলিয়াছিলেন। কেবল জ্ঞানদাস সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মঙ্গলঠাকুর ভিন্ন মদন মঙ্গল নামেও জ্ঞানদাসকে ডাকা হইত।

ভক্তিনিধি মহাশয়ের উত্তর বিস্তৃত ও পূর্ণ। (এখনও যে দু একটী কথায় আমার সংশয় আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আবার আমি লিখিয়াছি, সময়ান্তরে তাহাও প্রকাশিত হইবে)। তাঁহার উত্তর পাঠে সকলই পুলকিত হইবেন এবং সহস্র মুখে তাঁহার গবেষণার ধন্যবান করিবেন। কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে যে সংশয়ে অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই

বিভূষিত হইয়াছেন, ভক্তিনিধি মহাশয় তাহার যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষার চিরদিনের উপকার হইয়াছে। ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রিয়পরিকর উদ্ধারণ দত্তের বংশাবতংস। ইঁহার নিকট দুর্লভ বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল আছে। ইনি সে সকল আলোচনা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকেন। ইহাঁর যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি বিনয়। ভক্তিমাখা, স্নেহ-মাখা কোমল হৃদয়খানিতে বনমালীর বনমালার সুরভি আঘ্রাণ প্রচারিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া ইনি আমাকে বৈষ্ণব গ্রন্থের জটিল রহস্যের মীমাংসা করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন। ইনি সুবিস্তৃত পদামৃত সমুদ্র প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নব্যভারতের পাঠকগণ দুর্লভ কবিতা রসের লোলুপ হইলে ইঁহাকে গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

অবতার এবং ভক্ত প্রকরণম্।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্য্যের রহস্য ভেদকরা অতিশয় কঠিন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিজ ভক্ত দিগকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিয়াছিলেন; যথা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্য খণ্ডে ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে;—

"এইরূপ আরো আছে, দুই অবতার।
কীর্ত্তনানন্দ রূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব, এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিব মহা সুখে আমা সঙ্গে॥"

"আরো আছে" প্রভুর এই বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে।

যথা,—"পরিত্রাণায় সাধুনাং ইত্যাদি"

জীবোদ্ধার নিমিত্ত প্রভুকে পুনর্ব্বার অবতার স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে, সে আবার কোন অবতার? উত্তর প্রেমাবতার। পাত্র কে? শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, আর শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। সঙ্গী কে? শ্রীরামচন্দ্র করিরাজ প্রভৃতি ভক্তগণ। সে কোন্ সময়? ১৪৫৫ শকে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে জগৎ অন্ধকার এবং ভক্তগণ মুমূর্ষু, তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র (প্রেমাবতার স্বরূপ) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনাম প্রেমভক্তি বিতরণ দ্বারা বৈষ্ণব জগৎ পুনঃ মাতাইয়া ছিলেন। অদ্যাপি সেই প্রেম-বন্যা জগতে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রেমতরঙ্গ ভক্তিস্রোত স্বরূপ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা এবং প্রার্থনা গীতে কে না মুগ্ধ?

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ভাষা গ্রন্থকার প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীপ্রেমদাস প্রভুর অবতার সম্বন্ধে নিজকৃত পদে এই মত লিখিয়াছেন:—

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, যাঁর প্রেমপরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডি, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শুধিল, যাচিয়া যাচিয়া ঘরে॥
ভববিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে পদ, জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচয়ে, বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, প্রেমে কোলাকুলি, কবেবাছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাঁকিয়া, খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া সমন, তরাস পাইয়া, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে মাতিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমদাস, হেন অবতারে, রতি না জন্মিল মোর॥"

পদসমুদ্র—১৩০৩।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর। শ্রীশ্রীরাজা নরসিংহ ও নৃসিংহ দেব।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে একই নামে হরিপরায়ণ দুইজন রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গদেশান্তর্গত পবিত্র-সলিলা শ্রীগঙ্গার উপকূলবর্ত্তী "পক্কপল্লীর" রাজা নরসিংহ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, আর মধ্য রাঢ় দেশের অন্তর্গত মানভূম প্রদেশের রাজা নরসিংহদেব শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

প্রেমবিলাসে আছে ;—

"নরোত্তমের স্বগণ, নরসিংহ মহাশয়।
দূরদেশ পক্কপল্লী, যার রাজা হয়॥"

এস্থলে স্বগণ শব্দে "জ্ঞাতি" আর পক্কপল্লী শব্দে "পাইকপাড়া"। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, রাজা নরসিংহ খেতুরীর রাজপরিবারের মধ্যে একজন ও ভিন্ন স্থানের ভূম্যধিকারী ছিলেন।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তানকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তদ্দেশবাসী কতকগুলি লোক ঠাকুরের বিপক্ষ হইয়া রাজা নরসিংহের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে শিষ্য করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইহাই অভিযোগের মূল কারণ।

রাজা সেই বিচার করিবার নিমিত্ত শ্রীরূপনারায়ণ অমাত্য এবং অন্যান্য অধ্যাপকাদি সমভিব্যহারে খেতুরীর নিকট নিজ অধিকার "কুমারপুরে" আগমন করিয়া পটগৃহ রচনা ও ছাউনী করেন। কুমারপুরে বসিয়াই বিচার করিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

শ্রীআচার্য্য-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এবং ঠাকুর-শিষ্য শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ইহা অবগত হইয়া হাঁড়ি ও পান বিক্রয় করিবার ছলনায় কেহ কুমার ও কেহ বারুই বেশ ধারণ করিয়া কোমারপুরে গিয়া দোকান সজ্জা করেন। অধ্যাপকের শিষ্যগণ উক্ত দোকানে হাঁড়ি ও পান আদি ক্রয় করিতে আসিলে তাহাদের সহ সংস্কৃত ভাষায় কথারম্ভ ও আলাপ পরিচয়, ও তৎসূত্রে বিচারের সূত্র হয়। শেষে ছাত্রগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া অধ্যাপকগণের নিকট গমন করিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। অধ্যাপকগণ তচ্ছ্রবনে রাগান্ধ হইয়া কুম্ভকার ও বারুইর নিকট উপস্থিত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন্। বহু তর্ক বিতর্কের পর অধ্যাপকগণ শেষে পরাভব হইয়া প্রস্থান করেন। পশ্চাৎ রাজা সেই কথা অবগত হইয়া আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। লোক' পরম্পরায় অবগত হইলেন যে, খেতুরী রাজধানী এখন পুণ্যভূমি, প্রতিদিন প্রত্যুষে এবং সায়ংকালে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। সে স্থানে সহজে অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারে না, ইত্যাদি। অনন্তর, রাজা স্বরাজ্যে গমন করিলেন। কিন্তু নদীর বেগ কখন কেহ কি ধরিয়া রাখিতে পারে? শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের দর্শনের নিমিত্ত রাজা বড়ই উন্মনাঃ হইলেন। শেষে করিলেন কি?

"রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ *।
দেশে গিয়া শীঘ্র আইসেন দুইজন॥"

(শ্রীনরোত্তমবিলাস)

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত হইবার নিমিত্ত রাজা সস্ত্রীক এবং অমাত্য রূপনারায়ণ সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্য

* রূপনারায়ণ, ইনি একজন আসামবাসী। রাজা নরসিংহের অমাত্য ও বড়ই বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার কথা পরে বলিব।

হইতে খেতুরী আগমন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করেন।

ঈশ্বর যখন যে কিছু অবতার হইয়াছেন, বা হইয়া থাকেন, কখনও নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কায়স্থ অতি পবিত্র জাতি। বেদ আপস্তম্ভ শাখায় বিদিত আছে;—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয় জাতা কায়স্থা জগতি তলে;
চিত্রগুপ্ত স্থিত স্বর্গে বিচিত্র ভূমি মণ্ডলে;
চৈত্র রথ সুত তস্য যশস্বীকুল দীপক;
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমা নাম সত্তম;
তস্য শিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ চিত্রকূটাচলাধিপ॥

অর্থাৎ প্রজাপতির বাহু হইতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণে উৎপন্ন হইয়া চিত্রগুপ্ত স্বর্গে এবং বিচিত্র পাতালে গমন করেন। ঐ চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ কুলপ্রদীপ গৌতমঋষির শিষ্য এবং চিত্রকূটের রাজা হন্। সেই হইতে কায়স্থ জাতি ধরাধামে গণ্য মান্য। বস্তুতঃ শূদ্র নহে।

পরন্তু, এক সময় এই জাতি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের জন্মিবার ৫০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে) বঙ্গাধিপ বেদাচার-বিহীন বল্লালসেনের কুহকে পড়িয়া অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ প্রভৃতি কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি (লালা) ও দক্ষিণদেশে করণ নামে প্রসিদ্ধ।

বিদিত আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় খেতুরীর রাজবংশীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়, গঙ্গার উপকূল পক্কপল্লীর অর্থাৎ পাইকপাড়ার রাজাও কায়স্থ। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি পাইকপাড়ার রাজবংশীয়েরা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবার।

উত্তরে বলিব, কথাটী "বড় বিষম সমস্যা" পাইকপাড়ার রাজবংশের পর্য্যায় না জানিলে হঠাৎ কেমন করিয়া সে কথা বলা যায়। তবে এই এক কথা যে, খণিগর্ভে মণি ভিন্ন কখনও অসার পদার্থের উৎপত্তি হয় না। পাইকপাড়ার বর্ত্তমান রাজা ইন্দ্রচন্দ্র, কায়স্থ কুলোদ্ভব বঙ্গের উজ্জ্বল রতন, পরম বৈষ্ণব প্রাতঃস্মরণীয় গোলকবাসী জেমুরাকাঁদির ৺ লালাবাবুর দৌহিত্র। মহাত্মা লালাবাবু বিশিষ্ট কুলে বিশিষ্ট বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সে কথার ভুল নাই। অপিচ, প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি কিছু কম ২০০ শত বৎসরের। যখন তাহার ভিতরে স্পষ্টাক্ষরে গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী "পক্কপল্লী" বলিয়া রাজ্য নির্দ্দেশ আছে, আর পক্কপল্লী শব্দের অপভ্রংশ নাম পাইকপাড়া, তখন অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পাইকপাড়া রাজধানী এক সময় রাজা নরসিংহের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং রাজা নরসিংহ ঐ স্থানেরই রাজা ছিলেন।

দ্বিতীয়, রাজা নৃসিংহদেব মধ্য রাঢ় দেশান্তর্গত মানভূমের রাজা, এবং শ্রীশ্রী আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। ইনি ক্ষত্রিয়। সারাবলী গ্রন্থে ব্যক্ত আছে;—

"আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন্।
পরম পণ্ডিত হরি ভক্তিপরায়ণ॥
পূর্ব্বপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি।
পদকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র যার খ্যাতি॥"

ইনি, একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি, মল্লবংশাবতংশ বিষ্ণুপুরাধিপতি রাজা বীরহাম্বিরের পরমবন্ধু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে "আদি বক্তা" বলিয়া যে ভাবে সম্বোধন করিতেন, রাজা বীরহাম্বির সেই ভাবে শ্রীনৃসিংহ দেবকে "আদিবক্তা" বলিয়া সম্বোধন করি-

তেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ, বিশেষাত্মীয় ও স্বগুরুর শিষ্য ব্যতিরেকে, আদিবশ্যা, এ সম্বোধন অন্যকে সম্ভবে না। তুলসীকৃত রামায়ণে তাহার প্রমাণ আছে। রাজা নৃসিংহ তোটকে পত্র লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার কৃত পত্রগুলি এই ধরণের লেখা। যথা পদং—

নবনীরদ নীল সুঠাম তনু।
শ্রীমুখাকৃত ঝলমল, চাঁদ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত, কুন্তল বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত, গোময় চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল, রঙ্গিম বিম্ব জনি।
গলে শোভিত মতিম হারমণি॥
ভুজস্বিত অঙ্গদ, মণ্ডলয়া।
নখচন্দ্রক পর্ব্ব, বিখণ্ড নয়া॥
হিয়ে হার করু নখ, রত্নে যোড়া।
কিট কিঙ্কিণী, ঘাঘর তাহে মোড়া॥
পাদ নূপুর বক্ষরাজ সুশোভে।
ফল পঙ্কজ, বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত, দেওত, শ্যাম করে॥
বিহরে নন্দ নন্দন, এ ভবনে।
পদ সেবক, দেব, নৃসিংহ ভণে॥"

পদসমুদ্র—১৮০৫।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর "শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবন দাস।"

শ্রীপাঠ খেতুরীর মহামহোৎসবে যে দাস বৃন্দাবন উপস্থিত ছিলেন, তিনিই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য, শ্রীশ্রীনারায়ণী গর্ভজাতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবত-প্রণেতা শ্রীঠাকুরদাস বৃন্দাবন। ইনি, নারায়ণী গর্ভজাত; বস্তুতঃ কাহারও ঔরষজাত নহেন। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর চর্ব্বিতচর্ব্বন (পরিত্যক্ত) পান আহার করিয়াছিলেন। ইহাতেই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীনারায়ণী উদরে জন্ম হয়। এই দাস বৃন্দাবন ব্যতীত ঐ মহোৎসবে অন্য বৃন্দাবন দাস; কি "কাঞ্চণপল্লী" অর্থাৎ কাচড়াপাড়া নিবাসী শিবানন্দাত্মজ শ্রীকবিকর্ণপুর উপস্থিত ছিলেন না। কবিকর্ণপুর সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে নিজ সমাপিতে।

অন্যতম কবিরাজ কর্ণপুর নামে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য বুধুরীর কবিরাজ বংশীয়। তিনি, শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর নিয়োজন সূত্রে ঐ মহোৎসবে আগন্তুক ভক্তগণের বাসার তত্ত্বাবধারণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যথা শ্রীনরোত্তমবিলাসে ;—

"শ্রীরঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসাঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে॥" ইত্যাদি।

সারাবলী গ্রন্থে আছে ;—

"বুধরীতে বাস, কবিরাজ কর্ণপুর।
লিখিয়াছে আচার্য্য শাখা, গ্রন্থ অতি শূর॥"

ইহা একটী কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে,—পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপানুগ্রহে শ্রীশ্রী কবিকর্ণপুর যে প্রকার শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, শ্রীআচার্য্য প্রভুর কৃপায় কবিরাজ কর্ণপুর সেইরূপ (সংস্কৃত) কবিতায় শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখাবর্ণন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে প্রেমবিলাস গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীনিবাস নরোত্তম, দুই অধিকারী।
এ দুয়ের অসংখ্য শাখা, কহিতে না পারি॥
শ্রীনিবাস প্রভুর শাখা, হয় বহুজন।
কর্ণপুর করিয়াছেন, সে শাখা বর্ণন॥
গ্রন্থ বহুত হয়, না লিখিনু ক্রম।
কর্ণপুর কৃত কত আছয়ে নিয়ম॥"

ইহাই কবিরাজ কর্ণপুরের পরিচয়। দাস বৃন্দাবন ঠাকুরের সম্বন্ধে যা কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে বাকী, তা বলিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র দাস

বৃন্দাবন ব্যতীত ঠাকুর মহাশয়ের মহা মহোৎসবে অন্য বৃন্দাবন কেহ ছিলেন না। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন, যখন মহা মহোৎসবে অসংখ্য ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তখন যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা শ্রীদাস বৃন্দাবন উপস্থিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? মনে করুন, সকল বিষয়ে প্রবীণ এবং বয়সে প্রাচীন না হইলে কেহ কখন কি একটী বৃহৎ সমারোহ ক্ষেত্রে (বিজ্ঞ) এ সম্মান লাভ করিতে পারেন? দাস বৃন্দাবন ঠাকুর সর্ব্বাংশে সেই সম্মান লাভের যোগ্যপাত্র ছিলেন। কারণ, তিনি সর্ব্ব প্রথমেই শ্রীশ্রীচৈতন্য-লীলার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার (বৃন্দাবনের) পশ্চাদ্বর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর এবং নরোত্তম বিলাস গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের এবং অন্যান্য সম্মানপ্রাপ্ত ভক্তগণের মর্য্যাদা স্থাপনার্থে গ্রন্থের স্থানে স্থানে ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, বৃন্দাবন বিজ্ঞবর।
শ্রীসুলোচন, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

যে যেমন মান্য গণ্য, ভক্ত তাঁহাকে সেই সম্মান সূচক পাঠ লিখিয়া পয়ারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেই প্রতীত হয়, একমাত্র শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন ব্যতীত (বিজ্ঞ) এ সম্মান লাভ করিতে ঐ মহোৎসবে অন্য বৃন্দাবন ছিলেন না।

আর একটী সিদ্ধান্তের কথা ;—শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের ঐ মহোৎসব ঘটা এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবল্লভিকান্ত প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির অর্থাৎ দেবালয় কোন্ শকে উদ্ভূত হইয়াছিল, যদিও কোন গ্রন্থের ভিতর সেই শক নির্দ্দেশ নাই বটে, পরন্তু গ্রন্থের আভাসে স্পষ্টই প্রমাণ আছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেবকীর্ত্তি যৎসময়ে স্থাপন হইয়াছিল, রাজা বীর হাম্বিরের কৃত দেবস্থাপন ও দেবমন্দিরও সেই কালে। তবে কিছু অগ্র আর পশ্চাৎ।

গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ আছে :—শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ মানসে দেবগৃহ নির্ম্মাণ কারণ মল্লভূমি অর্থাৎ বিষ্ণুপুর রাজধানী হইতে "ভাস্কর" পাঠাইবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুকে পত্র লেখেন, তদনুসারে শ্রীআচার্য্য প্রভু মল্লভূমি হইতে খেতুরীতে উপযুক্ত বহু ভাস্কর পাঠাইয়া দেন। সারাবলী গ্রন্থে সেই প্রসঙ্গ আছে। যথা,—

"নরোত্তমের মনোবৃত্তি, শ্রীআর্য্য বুঝিলা।
জন্মভূমি হইতে বহু ভাস্কর পাঠাইলা॥
শ্রীবীর হাম্বির দেব, জানি সব তত্ত্ব।
শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ লাগি হইলেন ব্যস্ত॥"

ইহাতেই বোধ হয়, ১৫০৪ কি ১৫০৫ শকের মধ্যে শ্রীঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ মহোৎসব ঘটা ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং দেবালয় নির্ম্মাণ হইয়াছিল। সেই সময়ের কিছুদিন পরেই রাজা বীর হাম্বির কর্ত্তৃক যে সকল বিগ্রহ স্থাপন ও দেউল নির্ম্মাণ হয়, সেই সকল দেউলোপরি একএকটী প্রস্তর ফলকে ১৫০৬।১৫০৭ এবং তদোধিক শক সংখ্যা আছে। গ্রন্থে এ কথাও বিদিত আছে যে, শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ কীর্ত্তি স্থাপনার পরেই শ্রীবীর হাম্বির দেবকৃত শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন ইচ্ছায় শ্রীবিষ্ণুপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ভক্তদিক্‌দর্শনী তালিকায় ব্যক্ত আছে ;—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ১৪২৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫১১ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এমন অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের মহা মহোৎসবে তাঁহারই উপস্থিত থাকা সম্ভব। পরন্তু, শ্রীশ্রীবীর হাম্বির কর্ত্তৃক

শ্রীবিগ্রহ স্থাপন কালে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বিষ্ণুপুর মহা মহোৎসবে আগমন করেন নাই। শ্রীশ্রীপ্রভু বীরভদ্র গোস্বামী আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত দাস ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্দর্শন হয় নাই। তাহার কারণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থিতি করিবার কালে দাস ঠাকুর অতি শিশু ছিলেন। তন্নিবন্ধন দর্শনের উপায় ছিল না। পরন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইয়াছিল। দাস বৃন্দাবন তাঁহারই অনুমতি ক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশমালা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় উক্ত আছে;—

"বেদব্যাসো যত্রবাসী দাস বৃন্দাবনাধুনা॥"

ইনিই পূর্ব্ব যুগে বেদব্যাস, আর ইহ যুগে শ্রীবৃন্দাবন দাস। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রামে ইহাঁর কৃত একটী শ্রীমন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন আছে। উহা দেনুড় শ্রীপাঠ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর কেবল গ্রন্থকার ছিলেন না, পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীপদ সমুদ্র গ্রন্থে তাঁহার কৃত বিস্তর সঙ্গীত উপযোগী পদ আছে। তাহার মধ্যে এই একটী;—

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, বহুরি জয়ধ্বনি, গাওয়ে মধুর বিশাল রে।
বেদ অগোচর,ভেটিয়া গৌরবর,বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
হরষে ইন্দ্রপুর,আনন্দে কোলাহল,সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহুপুণ্যে শ্রীচৈতন্য প্রকাশিল আওল নবদ্বীপ মাঝেরে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন,চুম্বন ঘনে ঘন,লাজ কেহ নাহি মানেরে।
নদীয়াপুরবাসী, জনমে উল্লাসি, আপন পর নাহি জানরে॥
ঐছন কৌতুক,দেবতা নবদ্বীপে,আওল শুনি হরিনামরে।
পাইয়া গৌররসে,বিভোর পরবশে,চৈতন্য জয়জয় গান রে॥
দেখিলা শচীগৃহে,গৌরাঙ্গ পরকাশে,একত্রে যৈছে কত চাঁদরে।
মানুষ রূপধরি,গ্রহণ ছলকরি, বোলয়ে উচ্চ হরিনামরে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে, পাষণ্ডি কেহ নাহি জানরে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণগানরে॥

পদসমুদ্র—২২৩৪

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পিপাসী।

১

সবে কয় "সুখ সুখ সুখ"
মোর দেখি অনেক অসুখ!—
তপত তপন গা'য়,
ঊষাটী পুড়িয়া যায়,
অমায় সোণার চাঁদ ঢাকে চাঁদমুখ
শৈশব, যৌবন, হায়!
সময়ে ফুরায়ে যায়,
জরা, মৃত্যু, পাপে ভাঙ্গে মানবের বুক!
মোর কেন এ সব অসুখ!

এ দশা কি সকলের তরে?—
না, শুধু আমারি ভয় করে?
শুনে কি আমার কথা,
ললিতা বিজলী লতা
অমৃত বদলে বুকে বজ্রানল ধরে?
চেয়ে কি আমার পানে
জলধি নিঠুর প্রাণে,
গরাসিতে চায় ধরা রাক্ষস-উদরে?

৩

আমারে দেখে কি, দুখ-বশে,
প্রকৃতি বিধবা হ'য়ে বসে?—

খোলে সে গহনা পাতি,
মল্লিকা মালতী জাতি,
সিঁথির সিঁদুর তার পলকেই খসে ?
নিবে যায় সাধ হাসি,
ভেঙ্গে যায় বীণা বাঁশি,
বাতাস "বিষাক্ত," সে কি আমারি পরশে ?

৪

হায় !
হেন অমঙ্গল-মাখা প্রাণ,
তবে মোর কেন তাহে টান ?
যে দিন বসন্ত আসে,
কেন যাই তার পাশে,
শরতে চাঁদেরে সাধি খুলিতে বয়ান ?
মলয়া লাগিলে গা'য়,
ফুল ফোটে, পাখী যায়,
শিলার কি আসে যায়, সেযেরে পাষাণ !

৫

এ দেশে যাহার পানে চাই,
"সুখ সুখ" সাধিছে সদাই ;
অনশনে, জাগরণে,
কোটী আয়ু বিতরণে,
সুখের সাধনা সাধে, দেখিবারে পাই ;
সবাই সুখের পা'য়,
সরবস্ব দিতে চায় !—
—হায় রে সে "সুখ" মোর ত্রিসীমায় নাই !

৬

মোরে
বল তোরা "সুখ" কার নাম,
কোথা তার সুধামাখা ধাম ?—
কেমন মূরতিময়,
কি ব'লে সে কথা কয়,
আমাদের দেশে তার কার মত ঠাম ?
উষার সোণার গেহে,
সন্ধ্যার শ্যামল দেহে,
কোথা না মিলিল সুখ, কত খুঁজিলাম !

৭

কত বার মনে ভাবি তাই,
"সুখ" বুঝি সত্য কেউ নাই !
এ মরত মরুভূমি,
"মরীচিকা" সুখ ! তুমি,
আকুল পিপাসী আমি ধরিবারে চাই,
স্বপনে চমক দিয়ে,
যাও তৃষা বাড়াইয়ে !
নিঠুর তামাসা এত শিখেছ কি ছাই !

৮

তোরা সবে বল মোর কাছে,
"সুখ" কি তোদের বাড়ী আছে ?
নদী ভরা কূলে কূলে,
তরু লতা, ফল ফুলে,
জগত স্বরগ-সনে মিলে মিশে আছে ?
নাই সেথা কোন তাপ,
রোগ, শোক, হিংসা, পাপ,
মরণ রহে না লুকি, জীবনের পাছে ?

৯

তবে
অমি সে সুখের দেশে যাব,
মরমের পিপাসা মিটাব !
আমারে "গরীব" বলে,
যা'স্নে কো পায়ে দলে,
তোদেরি রতনে আমি ভাণ্ডার পূরাব !
তোরা যাবি আগে আগে,
আমি যাব পা'র দাগে,
আমিও তোদের সাথে আপনা হারাব !

১০

তোদের ও মুখভরা হাসি,
আমি কেন আঁখি জলে ভাসি !—
না হয় "অভাগা দীন"
না হয় "শকতি হীন"
না হয় সুখের আমি শত উপবাসী !—
তথাপি তোদের সুখে,
জুড়াব দগধ বুকে,
অফুরন্ত সুধা পাবে, অনন্ত পিপাসী !

১১

তোরা—যারা সবার সবাই,
আমিও তাদের হ'তে চাই !
এ বেদনা, এ বিষাদ,
দেবতার আশীর্ব্বাদ !
ঘুমি থা'ক্, প্রাণে থা'ক্, উঠে কাজ নাই ;
সকলি হাসিবি যদি,
আমি কেন নিরবধি,
হাসির জগতখানি কাঁদিয়ে কাঁদাই ?—
তাই ত তোদের পাশে,
এসেছি সুখের আশে,—
তোরা কি আমার হ'বি সহোদর ভাই ?
আমি কি তোদের সনে,
ফুটিব নন্দন-বনে,
আমারে সে দেব-দেশে তোরা দিবি ঠাঁই ?
বিশ্ব-জননীর বিশ্ব,
আমারে কি ক'রে শিষ্য,
কাণে কাণে ইষ্টমন্ত্র, শিখাবে সদাই ?
আমি কি পূরায়ে আশা,
দিব প্রীতি ভালবাসা,
বেঁচে র'ব তারি হয়ে, আর কিবা চাই ?
বল্ তোরা, নিত্য সুখ-পিপাসা মিটাই !

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

দ্বি-প্রহরে।

নিস্তবধ দ্বিপ্রহর বেলা ;
সজন সংসারখানি সহসা বিজন পারা,
ভেঙ্গে গেছে কলরব-মেলা !
মৌনব্রতী মধ্যাহ্নের, হৃদ্পিণ্ড স্পন্দনের
সবিরাম ধ্বনির মতন,
ঠক্ ঠক্, চঞ্চু দিয়া বৃক্ষ শাখা আঘাতিয়া
শবদ তুলিছে পাখী কোন্ !
রাজপথ দুইধারে, দাঁড়াইয়া দুটি সারে,
তরুশ্রেণী প্রহরী মতন ;
শাখায় বিস্তারি' পাতা, যেন ঘনশ্যাম ছাতা ;
নিবারিছে দারুণ তপন।
নিরজন বারেন্দায়, এক কোণে তরুচ্ছা'য়
আছি বসে' আপনার মনে,
সুমুখে প্রাঙ্গণখানি, বক্ষে শস্পাঞ্চলটানি,
শুয়ে আছে রবির কিরণে।
পুচ্ছ তুলে, ত্রাস পেয়ে, চকিত নয়নে চেয়ে,
কাঠবিড়ালীটি আশে পাশে,
দ্রুত আসে,দ্রুত যায়, কি খুঁজিয়া নাহি পায়,
পুনঃ ঢোকে কোটর আবাসে।
পল্লবের মরমর, বাতাসের ঝর্ ঝর্,
তুলিতেছে কি অলস তান,
তা' শুনে একটি পাখী, সকরুণে থাকি থাকি,
মনে করিতেছে ভোলা গান।
মাথা নেড়ে তরু লতা, ইঙ্গিতে কহিছে কথা
নিরিবিলি বনের ভিতরে ;
ছায়ারা ছায়ার পাশে, চুপি চুপি চলে' আসে,
পরশ করিতে পরস্পরে।
রৌদ্র দীপ্ত নীলকায়, মহাকাশ মরুপ্রায়,
ভাতিতেছে নয়ন উপর,
কৃষ্ণপাখা প্রসারিয়া, হৃদে তার মিশাইয়া,
উড়িতেছে দুইটি খেচর।
একখানি শুভ্র মেঘ, না পেয়ে বায়ুর বেগ,
দিগন্তের প্রান্তে দাঁড়াইয়া,
লক্ষ্যহারা বুদ্ধি হত, নিরাশ জনের মত
ধরা পানে আছে তাকাইয়া।
দক্ষিণের উষ্ণ বায়, আসি অতি ক্লান্তপায়,
পরিচিত মৃদু স্পর্শ দিয়া,
অশরীরী হস্তে তার, কপোলের কেশভার
অতি ধীরে ধীরে সরাইয়া,
কাণে কাণে স্নেহভরে, যেন অস্ফুটিত স্বরে
এক কথা বলে বার বার ;
মনে হয় সেই কথা বুঝিলে মনের ব্যথা
বুঝি মোর রহিত না আর।

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (২)

কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বিতীয় প্রকরণ কৃষাণদিগের উদ্বোধন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে যে সকল আন্দোলন বা আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে রাজ-পুরুষ, জমীদার বা সাধারণ ভদ্রলোকের বিশেষ উৎসাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন রাজ-পুরুষ 'সক্' করিয়া বহু আয়াস ও যত্নে কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিবেন বলিয়া দুই তিন বা তদোধিক বর্ষ ধরিয়া কোন পরীক্ষার জন্য কৃষিবিভাগ স্থাপন করিলেন। প্রথমে অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক ভ্রমে পতিত হইলেন। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিসহকারে কার্য্যের প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু পরীক্ষার সুফল ফলিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থানান্তরিত হইলেন, অথবা কার্য্যস্থল হইতে স্বদেশে যাত্রা কবিলেন। পরীক্ষা ঐ স্থানেই শেষ হইল; লোকে জানিল, পরীক্ষা দ্বারা কতকগুলি অর্থ নষ্ট মাত্র হইল। রাজ-পুরুষদিগের অনুরোধে কোন জমীদার হয় ত কতকগুলি বিলাতি লাঙ্গল ও জল তুলিবার কল কিনিলেন, প্রজাদের মধ্যে পরীক্ষার জন্য বিতরণ মাত্র করিলেন, অথবা তাঁহারই কাছারি বাটীতে পড়িয়া ঐ সকলে মরিচা ধরিতে লাগিল। ফল কিছুই ফলিল না। অথবা সিম্‌সিনাটাস্, গারিবল্‌ডি প্রভৃতি ইটালীর মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠে উন্মত্ত হইয়া কোন স্কুলের শিক্ষক কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইলেন। দুরূহ ইংরাজী ভাষার গূঢ়ত্ব শিখিবার জন্য দশ পনের বৎসর ধরিয়া সাহিত্য ব্যাকরণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া,প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা হারাইয়া, এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, শিক্ষক, এক বৎসর কৃষি লীলা করিলেন, লীলা দ্বারা তাঁহার অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিল, লীলা শেষ হইল।

ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালীর যে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তদ্দ্বারা বাঙ্গালী শেষে কার্য্য ক্ষমতা হারায়। শাস্ত্রে নিপুণ অথচ কার্য্যক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য, ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমাদের এইরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজী ভাষার মধ্যস্থতা দ্বারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মেকলে ও ডফের সময় ছিল বটে,কিন্তু এক্ষণে আর নাই। এক্ষণে দেশের যেরূপ সাধারণ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে দেশীয় ভাষায় সকল শাস্ত্রের অনুশীলন চলিতে পারে। দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কোন জাতিরই ব্যাকরণ ও সাহিত্যের আবশ্যক করে না। ইংরেজ, ফরাশিস্ বা জর্ম্মন্ নিজ নিজ ভাষায় সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলিয়া অতি অল্প বয়সেই কোন না কোন বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি জন্মে। সাহিত্য ও ব্যাকরণ তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্র বিশেষ মাত্র, কেহ অধ্যয়ন করেন, কেহ করেন না। কিন্তু সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন না বলিয়া যে, মাতৃ ভাষায় লিখিত শাস্ত্র বুঝিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হয়,এমত নহে। আমাদেরও দেশে কৃষি বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, কৃষাণদিগের মাতৃভাষায় ইউরোপীয় নিয়মে কৃষিশাস্ত্র প্রণয়ন করা আবশ্যক। দেশীয় কৃষিশাস্ত্রের এক্ষণে কেবলমাত্র বাল্যাবস্থা। কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতেই প্রকৃত নিয়মে কার্য্য হওয়া বিধেয়। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ

রিপোর্ট বাহির হইতেছে, তাহাদের সার সংগ্রহ দেশীয় ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। কেহ বলিবেন, এই সকল প্রবন্ধ ও রিপোর্টের সার সংগ্রহ করিবে কে? আমাদের দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র বসু বাঙ্গলা ভাষায় কৃষি গেজেট প্রণয়ন দ্বারা সমস্ত কৃষিবার্ত্তা ইউরোপীয় নিয়মে অথচ দেশীয় ভাষায় বিস্তারের প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৈ কৃষি-গেজেট ত স্থায়ী হইল না। বাস্তবিক এ দেশে শাস্ত্র বিশেষের পাঠ্য পুস্তক, প্রবন্ধাদি প্রস্তুত মাত্র করিলে ফল হইবে না। ঐ সকল নিয়মিত পাঠের জন্য উদ্যোগও আবশ্যক। উদ্যোগ দ্বারা যে সহস্র সহস্র কৃষি পুস্তক কৃষক বালকদিগের মধ্যে প্রত্যহ পাঠ করাইতে পারা যায়, তাহার আর প্রমাণের আবশ্যক করে না। প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিবিষয়ক পাঠ্য-পুস্তক অধীত হওয়াতে, এ কার্য্য একরূপ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ্য-পুস্তক দ্বারা বিশেষ কিছুই উপকার দর্শিতেছে না। কোন কোন পাঠ্য পুস্তক হইতে দেশীয় কৃষি প্রণালীর আভাস মাত্র পাওয়া যায়। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের আজন্ম কৃষি ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়া ঐ সকল প্রণালী বিষয়ে এরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মায় যে, এরূপ পাঠ্য পুস্তকে শিখিবার কিছুই নাই, এই মনে করিয়া উহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জন্মায়। এরূপ অবস্থায় যে যে পাঠ্য পুস্তকে কিছু নূতন বিষয় আছে, এমন সকল পাঠ্য পুস্তকেরই উপর তাহাদের অধিক আস্থা। ঐ সকল পুস্তক তাহারা যত্ন সহকারে ব্যাকরণ ও ভূগোলের ন্যায় কণ্ঠস্থ করে। আবার কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে কৃষি শাস্ত্রের কেবল বৈজ্ঞানিক সার, ভাগ মাত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষি শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক সার অনুভব করা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই কঠিন। কঠিন বলিয়া না বুঝিয়া অথচ ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন ও পরীক্ষা কালীন ঐ সকল বিষয়ের প্রশ্ন থাকা সম্ভব, এই মনে করিয়া ঐ সকল ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করে। কয়েক মাস গত হইল, কোন এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগের কৃষি বিষয়ে আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম;—“কোন বৎসর স্থান বিশেষে ধান্য প্রচুর হয়, কোন বৎসর বা সেই স্থানেই ধান্য মারা যায়, ইহার দুই একটী কারণ বলিতে পার?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে কেহ উত্তর করিল ‘সোরা-জানের অভাব' কেহ উত্তর করিল—‘হাড়-জান, সোরা-জান ও ক্ষার-জানের অভাব।' অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে যে গ্রামে ধান্য মারা গিয়া থাকে, এ কথা কাহারও মনে পড়িল না। ‘সাররূপে ব্যবহার হইলে বিশেষ উপকার দর্শে অথচ জ্ঞানাভাবে গ্রামস্থ লোক উহাদের অবহেলা করে, এমন কতকগুলি সাধারণ সামান্য পদার্থের নাম করিতে পার?' ইহারও উত্তর হইল ‘সোরা-জান, হাড়-জান, ক্ষার-জান।' শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, তিনি এই তিনটী পদার্থ যে কি, তাহা কিছুমাত্র বুঝেন নাই বলিয়াই বালকদিগের এই তিনটীর অত্যাবশ্যকতা বিষয় এমন বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

কৃষক বালকদিগের নূতন নূতন শিক্ষা না দিলে, কৃষি বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে তাহাদের উৎসাহ না জন্মিবারই কথা, কিন্তু তাই বলিয়া যে দুর্বোধ্য মূলীভূত কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য ফলদায়ক এমন কতকগুলি বিষয়

শিক্ষা দিলে কৃষি কার্য্যের উন্নতির পক্ষে কিছু সহায়তা হইবে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কৃষি শাস্ত্রের মূল বিষয় অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে, কার্য্য স্থলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কি করা উচিত, ইহা কৃষকেরা আপনারাই পরে নির্ণয় করিয়া লইতে পারিবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। যাহাতে কৃষকদের পরিচিত অভাব মোচন হয়, ইহাই পাঠ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কৃষক বালক দেখিল, গৃহের গম ও বুটের বীজ পোকায় নষ্ট করিয়াছে, দুশ মণ বীজের মধ্যে দুইমণও অঙ্কুরিত হইল না। পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া সে যদি তাহার পিতাকে কেমন করিয়া বীজ রাখিলে পোকা ধরিবে না, ইহা না বলিতে পারে, তবে ঐ পুস্তক পড়িয়া লাভ কি? এইরূপ যখনই কৃষকের কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তখনই যদি কৃষিপাঠ্য পুস্তক হইতে সে সহায়তা পায়, তবেই ঐ পাঠ্য পুস্তক হইতে উপকার দর্শে।

এদেশের পক্ষে নূতন, কিন্তু অন্যদেশে প্রচলিত, এমন অনেক বিষয় কৃষি পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়া কর্ত্তব্য। এদেশেও কৃষি বিভাগে কোন কোন বিশেষ উপকারক বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিষয়ও কৃষি-পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়া কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্থলে এখানে একটী মাত্র বিষয় উল্লেখ করিলে চলিতে পারে। বর্দ্ধমানে দশ বৎসর ধরিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ মত একই গোড়া হইতে, কেবল গোবর সার দিয়া এক জাতীয় ইক্ষু প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ব্যয় কম হয়, অথচ ফসল অধিক হয়। এই বিষয়টী পাঠ্য পুস্তকে উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

বৎসর বৎসর যেমন কৃষি পরীক্ষায় অভিনব ফল পাওয়া যাইবে, তেমনই পাঠ্য পুস্তকেরও নূতন নূতন সংস্করণ আবশ্যক হইবে। ইউরোপীয় কৃষি শাস্ত্র ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষি পরীক্ষার ফল উদাহরণ স্বরূপ সম্বলিত করিয়া ৪।৫ বৎসর অন্তর কৃষি পাঠ্য পুস্তক গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া, স্বল্প মূল্যে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ বিক্রয় হওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষি শিক্ষা অন্যান্য প্রকারেও গবর্ণমেণ্টর বিশেষ তত্ত্বাবধারণাধীন থাকা কর্ত্তব্য। শিক্ষা বিভাগ ও কৃষি বিভাগের সহিত অধিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইলে কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীগণ শিক্ষা বিভাগের অধীনেও কার্য্য করিতে পারেন। যাহাতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কৃষি বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা পাইয়া, ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহার সুবিধা তাঁহাদিগের করা উচিত। কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল নর্ম্যাল বিদ্যালয় আছে, ঐ সকল বিদ্যালয়ে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দিয়া আসিতে পারেন এবং প্রাইমারি বিদ্যালয় গুলিরও তদারক তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত হইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল পুঁথিগত কৃষি বিদ্যার কথা। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে কৃষক বালকদিগের কখনই সম্যক কৃষি শিক্ষা হইতে পারে না। বঙ্গদেশে যদি বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের একটি মাত্র স্থল নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে শিবপুর শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহার কয়েকটী কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) উদ্ভিদতত্ত্ব গবেষণার জন্য শিবপুরের প্রশস্ত বোটানিক্যাল উদ্যান কৃষি উন্নতির একটী ভিত্তি।

(২) শিবপুরস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কৃষি উন্নতির অন্যতম ভিত্তি।

(৩) শিবপুরে বৈজ্ঞানিক কৃষি পরীক্ষারও সূত্রপাত হইয়াছে।

(৪) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য শিবপুর বিশেষ উপযুক্ত স্থান।

বঙ্গদেশের সমস্ত বিভাগ হইতে শিবপুরের বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রে ছাত্র আনাইবার সুন্দর উপায় বৃত্তিদান। প্রাইমারি পরীক্ষায় ও বিশেষ কৃষি পাঠ্য পুস্তকে উত্তীর্ণ ছাত্র বৃত্তি পাইলে, তিন বৎসর ধরিয়া কৃষি শিক্ষা করিবার প্রতি কিছুই বাধা থাকে না। কালসহকারে বঙ্গদেশের প্রত্যেক মহকুমা হইতে কৃষিবৃত্তি-প্রাপ্ত এক একটী ছাত্র প্রতি বৎসর শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে আসিতে পারে। কেহ মনে করিতে পারেন, প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণ কখনই স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে চাহিবে না। কিন্তু স্থানীয় বোর্ড উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচন করিয়া বৃত্তি দিয়া ছাত্র পাঠাইলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষিকার্য্য যাহাদের জাতীয় ব্যবসা, যাহাদের পাঠ্যাবস্থায়ও কৃষিকার্য্য স্বহস্তে করা অভ্যাস আছে, এমন ছাত্র না হইলে কোনই ফল হইবে না। পল্লিগ্রামস্থ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে আজ কাল এবম্বিধ অবস্থাপন্ন অনেক ছাত্রই দৃষ্ট হয়। পুস্তক পড়িতে শিখিলেই নাঙ্গল অগ্রাহ্য করিতে হইবে, সে কাল আর নাই।

বঙ্গদেশের সকল স্থানের পক্ষেই যে শিবপুর উপযুক্ত কৃষি শিক্ষার স্থান, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোটামুটি ধরিতে গেলে, বঙ্গদেশে তিন অবস্থার ভূমি দৃষ্ট হয়। (১) পর্ব্বতময় অতি বৃষ্টিসঙ্কুল ভূমি। (২) প্রস্তরখণ্ডময় নীরস ভূমি, ও (৩) নিম্ন বঙ্গের বালুকা ও কর্দ্দমময় ভূমি। এই তিন প্রকার ভূমির উপযুক্ত তিনটী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপিত হইলে আরো উত্তম হয়। এরূপ হইলে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার ছাত্রেরা তিনটী কেন্দ্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল প্রকারেই ছাত্রদিগের ইহাতে সুবিধা আছে। প্রথম শ্রেণীর ভূমির জন্য দারজিলিং সহরের বোটানিক্যাল উদ্যানের নিম্নস্থ স্থল উপযুক্ত ক্ষেত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য সাঁইথিয়া অথবা রাজমহল উপযুক্ত স্থান।

বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রে, এদেশের পল্লিগ্রামে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে, ঐ প্রণালীতেই কার্য্য করা বিধেয়। অর্থাৎ এদেশের কৃষকেরা ভৃত্য না রাখিয়া যতটুকু জমীর আবাদ করিতে পারে, ততটুকুই স্বাধীনভাবে আবাদ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে কৃষকেরা বর্দ্ধিষ্ট লোক। তাঁহারা ভৃত্য রাখিয়া অন্যূন সহস্র বিঘা জমী আবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এক একটী ক্ষেত্রের আয়তন ৩০।৪০ বিঘা বা তাহারও অধিক। তাঁহাদের পক্ষে বাষ্পীয় নাঙ্গল, ধানকাটা কল, এই সমস্তে কিছু সুবিধা আছে। আমাদের দেশের এক এক কৃষক ১২।১৪ বা ২০ বিঘা জমী চাস করে। তাহাদের ক্ষেত্রের ভাগ দুই এক বিঘা মাত্র। তাহারা নিতান্ত সামান্য লোক। তাহাদের পক্ষে বিলাতি কৃষি প্রণালী সম্যক উপযুক্ত নহে। দেশীয় প্রণালীতে অথচ বৈজ্ঞানিক নিয়মে গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ছাত্রদিগের কৃষি শিক্ষা দেওয়া উচিত। ৪।৫ জন ছাত্র এক একটী গৃহে এক একটী পরিবার স্বরূপ স্বাধীনভাবে ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের নিয়মানুসারে কার্য্য

করিলে, কুলি খাটাইয়া কোন কার্য্যই করিতে হইবে না। ছাত্রেরা স্ব স্ব স্থানীয় বৃত্তি পাইবার কারণ, শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যয় অতি অল্পই হইবে। উৎপন্নের অর্দ্ধেক ভাগ ছাত্রেরা নিজে লইয়া অবশিষ্টাংশ শিক্ষা-ক্ষেত্রের সাধারণ ব্যয়ের জন্য খাজনা স্বরূপ দিলে, উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইবে। শিক্ষা-ক্ষেত্র একটী দেশীয় পল্লি স্বরূপ হওয়া উচিত। এই পল্লিতে এক এক দল ছাত্র এক একটী গৃহে এক এক পরিবার স্বরূপ থাকিয়া, পৃথক্ ভাবে এক জোড়া বলদ রাখিয়া ২০ বিঘা জমীর আবাদ করিতে পারে। এই ২০ বিঘা জমীতে ভিন্ন ভিন্ন দলের ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন প্রকার ধান্য, গোধুম, মটর, কলাই, শাক, লতা, মূল, তৈল ও রজ্জু প্রদ ফসল জন্মাইলে, এক এক বৎসরে শিক্ষাক্ষেত্রে বহুবিধ পরীক্ষা হইতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ সমস্ত ক্ষেত্রের কার্য্যের এমন বন্দোবস্ত করিতে পারেন যে, তিন বৎসরের পরে প্রত্যেক ছাত্র নান বিধ শস্য, নানাবিধ সার, নানাবিধ কৃষি প্রকরণ বিষয়ে শিক্ষকের মুখে শিক্ষা করিয়া, স্বহস্তে সেগুলি লিখিয়া লইয়া নিজে নিজে কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে। এই সকল শিক্ষিত কৃষক যুবক-দিগের মধ্যে বিশেষ সুদক্ষ দুই এক জন জমীদারগণ কর্ত্তৃক খামার জমীর তত্ত্বাবধা-রণে নিযুক্ত হইলে, আরও উপকার দর্শিবে। বিলাতে কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জমীদারগণ আগ্রহ করিয়া নিজেদের খাস জমীর তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত করেন।

এদেশে গবর্ণমেণ্টের যে কৃষি শিক্ষার ভার লওয়া কর্ত্তব্য, লর্ড মেয়ো প্রভৃতি অনেক সুবিজ্ঞ রাজপুরুষ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত যে অন্যান্য অনুষ্ঠান হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের উৎসাহের দ্বারা, ঐ সকল অনুষ্ঠানের শ্রীহীন না হইয়া, যেন আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল ও হর্টি-কালচারাল সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া, কাশিপুর প্র্যাক্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউসান ইত্যাদি স্থায়ী অনুষ্ঠান গুলিনের সাহায্য দ্বারা কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে যত কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে, ততই ভাল। সরকারী ও বেসরকারী কৃষিকার্য্যের উন্নতি কার্য্যে প্রবৃত্ত সকল ব্যক্তি পরামর্শ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবার জন্য একটী সমিতি থাকা কর্ত্তব্য। এই সমিতির পরামর্শদাতা রসায়ণ বিদ্যাবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ, প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত থাকা কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর এমন সকল শিল্প-কার্য্যের উন্নতি কল্পেও এই সমিতির উৎ-যোগ আবশ্যক। ভুট্টার ময়দা, কলের মো-রব্বা, কার্পাসের সুতা, এই সমস্ত যাহাতে এদেশে প্রস্তুতের সুবিধা হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট থাকা এই সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যে অন্তরায় এত সূক্ষ্ম ও অনির্দ্দিষ্ট যে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে গেলেই শিল্পকার্য্যেও হস্তক্ষেপ আবশ্যক, ভারতবর্ষে শতকরা ৮৩ জন ব্যক্তি কৃষিজীবী, ৯ জন শিল্পজীবী ও কেবল অব-শিষ্ট ৮ জন ব্যক্তি 'ভদ্রলোক' অভিধেয়। দেশের যত আন্দোলন, যত অর্থব্যয় প্রায় সমস্তই এই ৮ জনের জন্য। অবশিষ্ট ৯২ জনের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। অথচ তাহারাই অন্যের অন্ন বস্ত্র দাতা, তাহারাই দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিত্তি, তাহারাই দেশের প্রকৃত বল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মেঘদূত (কাব্যানুবাদ)—শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্.এ, সি, এস্, কর্ত্তৃক। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির হিসাবে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত জগতে অতুলনীয়। এই কাব্যের বিষয় এমনই নূতন, এবং বিষয়বিবৃতি এমনই মনোহর অভিনব প্রণালীতে সাধিত যে, সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে এরূপ শ্রেণীর কাব্য আর দৃষ্ট হয় না। মহাকবির এই

নববিধান, কাব্যপ্রিয় ভারতবাসীর হৃদয়ে এমন এক অপূর্ব্বাস্বাদিত নবরসের সঞ্চার করিয়াছিল, এমন এক নবীন আকাঙ্ক্ষা ও ভাবের উদয় করিয়াছিল যে, অকৃতকার্য্য হইলেও, মহাকবির পদানুসরণ করিয়া কত কবি কত কাব্য রচনা করিয়াছেন। লালিত্য-শূন্য হংসদূত, অলঙ্কার-কুপ্রয়োগ-দুষ্ট পদাঙ্কদূত, অপ্রথিতনামা কোকিলদূত ও পবনদূত প্রভৃতি, ইহার সাক্ষী। কালিদাসের বরে, মেঘের সহিত বিদ্যুতের প্রয়োগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই হউক, অথবা মহাকবির প্রতি কিঞ্চিৎ "অনুক্রোশ বুদ্ধি" বশতই হউক, একালের জড়বিজ্ঞান-জ্ঞানগ্রস্ত কোন বাঙ্গালী কবি যে আজিও বিদ্যুদ্দূত রচনা করেন নাই, সেটা আর কাহারও না হউক "বেঙ্গল-লাইব্রেরিয়ানের" পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কে বা ন স্যুঃ পরিভব পদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ? কাজেই অনুকরণ করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া, প্রাচীনেরা যে উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক। বিধাতার চারুসৃষ্টির অনুকরণ করিতে গিয়া, চিরকালই বিশ্বামিত্রের দল বিড়ম্বিত হইয়া আসিতেছেন। জৈবনিক (Protoplasm) গড়া দূরে থাকুক, জীবন রহস্যের কণামাত্রও উদ্ভিন্ন হইতে পারিল না। তিনিই বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক, যিনি জ্ঞাত ও স্থূলজগৎ বিশ্লেষণ করিয়া বিমোহিত ও বিস্মিত হইয়া, অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত শক্তির নিকটে প্রণত হয়েন। তিনিই বুদ্ধিমান কাব্যরসিক, যিনি স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া, দম্ভ বিসর্জ্জন দিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে, কবি-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে ও সম্ভোগ করাইতে প্রয়াস পান, কাব্যচাতুরী বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এবং কবির মাহাত্ম্য অনুধ্যান করিয়া তাঁহার অপরিমিত গূঢ় শক্তির নিকটে মস্তক অবনত করেন।

সংস্কৃতের আবরণ মনোহর হইলেও, সাধারণ চক্ষু, তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা মেঘদূতের কাব্যানুবাদ করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে কবিসৃষ্ট সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। ভারত-সাহিত্য "দৃষদ্দেশে" ব্যক্ত, কালিদাসের এই মেঘদূতরূপ চরণন্যাস, কত কত উপচিত বলি ভক্তিনম্র কাব্যরসিক নিত্য পরিক্রমণ করিতেছেন; কিন্তু অমরত্ব ও কৃতার্থতা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে কৈ? ন্যূনপক্ষে মেঘদূতের ৩৪ খানি পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি, কিন্তু বরদা বাবুর অনুবাদ সকলগুলিকে পরাস্ত করিয়াছে। নব্যভারতে যাহা সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকদিগের নিকট তাহার আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? অনুবাদ এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না; মনে হয়, নবরচিত কাব্য পাঠ করিতেছি।

এখানে পাঠকদিগকে ইহার সাক্ষী স্বরূপে পূর্ব্ব মেঘের ১০ম ৩৮ এবং উত্তর মেঘের ৩য়, ২১শ এবং ২২শ, এই পাঁচটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের অনুবাদ নব্যভারত হইতে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। অনুবাদক যে নিজে সুকবি, প্রারম্ভে স্বীয় "সূচনা"য় তাহা বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। লিখিয়াছেন:—

> বিরহ কি শুধু ব্যথা—কেবলি বেদন?
> না, না, কবি, তুমিই তো দিয়াছ বলিয়া,
> শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ স্বপন,—
> জাগে রতিপতি বল দ্বিগুণ লভিয়া;
> সে নহেত তাপ সে যে রবির কিরণ,
> সে নহেত অশ্রু সে যে বরষার ধারা;
> উষ্ণ শ্বাস নহে, সে যে বসন্ত পবন,
> বাড়ে তায় গোড়া বাঁধি প্রণয়ের চারা।

অবশেষে গোটাকতক সামান্য রকমের ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব। আশা করি, মিত্র মহাশয় তাহা সদ্ভাবে গ্রহণ করিবেন। প্রথমতঃ চাঁদে কলঙ্কের মত, অতি সুন্দর সূচনায় "আত্মা দুটি .....হইয়াছে সুদূরে মিলন," বড় বাধিল। ব্যাকরণের এ ত্রুটি টুকু পরিহার করিলে ভাল হয়। ১১ পৃষ্ঠায় ২১শ শ্লোকে "কদম" না লিখিয়া কদম্ব লিখিলে শব্দসঙ্গীত অধিকতর রক্ষিত হইত, মনে হয়। বরদা বাবুর অনুবাদে যেটি ৩০ শ্লোক (দেখ সিন্ধুনদী ইত্যাদি) সেটী প্রক্ষিপ্ত। সর্ব্বশুদ্ধ পূর্ব্ব মেঘে ৬৩ শ্লোক। কিন্তু বরদা বাবু করিয়াছেন ৬৪টি। সুতরাং অবশ্যই কোন একটি প্রক্ষিপ্ত। মনোযোগ করিয়া

পড়িলেই দেখা যায় যে, ঐ শ্লোকটী দুরন্বয়-দোষ-দুষ্ট। সমগ্র মেঘদূতে এ দোষ কোন শ্লোকে নাই। "তাং কস্যাঞ্চিৎ ভবনবলভৌ সুপ্ত পারাবতায়াং" ইত্যাদির অনুবাদে লিখিত হইয়াছে "ভবন শিখরে ঘুমায় যেথায়, কপোত কপোতী মুখেতে মুখ।" এই অনুবাদ মল্লিনাথ বিরোধী। মল্লিনাথ পারাবত অর্থ "কলরব" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাই সঙ্গত। মল্লিনাথ ছাড়িয়া Wilson আদির অর্থ গ্রহণ পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। মল্লিনাথের টীকা পড়িলেই "কলরব" অর্থের সাঙ্গত্য বিশেষ লক্ষিত হয়। আর এক স্থানে অনুবাদ মল্লিনাথের বিরোধী হইয়াছে। উত্তর মেঘে ২৪ শ্লোকে বরদা বাবুর অর্থ সঙ্গত বোধ হইল না। সহসা কাব্যরসিক মল্লিনাথের অর্থ ত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, গুণ-তুলনায় এ দোষ অকিঞ্চিৎকর।

২। ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—প্রথম ভাগ; শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ২৲। এখানিও অতি অমূল্য গ্রন্থ। বাঙ্গালার আধুনিক যুগে যত সুন্দর সুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, নবকান্ত বাবু সে সকলই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের গীত ইহাতে আছে। এই পুস্তকের শেষে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের সংক্ষেপ পরিচয় আছে। ইহা অতি সুন্দর জিনিস। বাঙ্গালার আর কোন পুস্তক পড়িলে এত লোকের বিবরণ পাওয়া যায় না। এই তৃতীয় সংস্করণে ১৫৮২ সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রনয় সঙ্গীত, কবির গান প্রভৃতি থাকিবে। এই সঙ্গীত সংগ্রহে নবকান্ত বাবু যে অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রমও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর আদর্শ। এ পুস্তক বঙ্গদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। এই তৃতীয় সংস্করণে অনেক নূতন সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ পরিপাটী হইয়াছে। আশা করি, অতি অল্পদিনের মধ্যে এ সংস্করণও উঠিয়া যাইবে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সঙ্গীত-সংগ্রহ বাঙ্গালায় আর নাই। নবকান্ত বাবুর সংগৃহীত সঙ্গীত বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিয়া যাঁহারা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কাহারও উচিত নহে। বাঙ্গালার ৫০ বৎসরের ইতিহাস, এই সঙ্গীতসংগ্রহে সুন্দর রূপ অধ্যয়ন করা যায়। ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির সহিত ভাষার কিরূপ ক্রমোন্নতি হইতেছে, এবং ভাষার ক্রমোন্নতির সহিত দেশের রুচির কিরূপ ক্রমোন্নতি হইতেছে, এই গ্রন্থের অন্তরালে তাহার অস্ফুট আভাষ পাওয়া যায়। সংগ্রহকারকে শত শত ধন্যবাদ। কাব্যামোদী সকল ব্যক্তিই নবকান্ত বাবুর নিকট, এজন্য কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শাঙ্করভাষ্য স্বামি কৃত টীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত শাস্ত্রী দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৩৲; ৬১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। বাঙ্গালার বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই অমূল্য গীতা শাস্ত্রের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, গীতা বাঙ্গালায় একরূপ দুষ্প্রাপ্য ছিল, প্রায় পাওয়া যাইত না, কখনও কখনও ৭৲ টাকা মূল্যে কেবল আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রয় হইত। কিন্তু দেখিতেছি, ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ৩৪ সংস্করণ গীতা বাহির হইয়াছে। দিন দিনই গীতার আদর বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ। আমরা বহির্মুখী ধর্ম্মান্দোলনের তত পক্ষপাতী নহি, কিন্তু গীতার বহুল প্রচারে প্রতিপন্ন হইতেছে, ধর্ম্ম ক্রমেই এদেশের নর নারীর হৃদয় অধিকার করিতেছে। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গীতার অনুবাদ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

একাদশ খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা।　　　　ভাদ্র—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়।　　　　পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত;
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৬ই ভাদ্র, ১৩০০।

[ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲]　　[এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী ব্রহ্মদাস, উৎকল ও মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা ও ফরিদপুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক, আসাম ও উত্তর বাঙ্গলা অঞ্চলে নব্যভারতের মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ পূর্ব্বক, রসিদের মুড়িতে টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া, দয়া করিয়া মূল্য প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব। স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন কেহ মূল্য দিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

২। পূজা আসিতেছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া প্রাপ্য মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৩। মূল্য প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন।

৪। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

কর্ণেল টডের স্বভাব।

বিদ্বজ্জন সমাজে এবং পাণ্ডিত্যক্ষেত্রে, হিন্দুহিতৈষী, রাজপুত-রক্ষক, ভারত বিখ্যাত কর্ণেল টড্ কেবল দিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ নহেন, অগণ্য অনন্যসাধারণ অতুলনীয় সদ্গুণরাশিতেও তিনি আপনার পবিত্র জীবনকে সমুজ্জ্বল ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই; পুরাকালে যাহা কিছু লিখিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাও ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত, অপহৃত, বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে কর্ণেল টড্ বোধ হয় ভারতবর্ষের সেই বিনষ্ট ও কণ্টকাকীর্ণ ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রথম কৃতকারী কৃষক। রাজস্থানের ভুবন-বিখ্যাত মহা ইতিহাসের সংগ্রাহক ও লেখক মহাত্মা টড্ বহু দিনের লোক নহেন, কিন্তু তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে পুরাবৃত্তালোচনার প্রবৃত্তি-বহ্নি এদেশীয় শিক্ষিত সমাজের হৃদয়ক্ষেত্রে সম্যক প্রকারে উদ্দীপ্ত হয় নাই; নতুবা বোধ হয়, আর একজন চাঁদবর্দ্দী বা হিন্দু-আবুল ফজল তাঁহার সমগ্র জীবনী সংগ্রহ করিয়া ভারতহিতৈষী টডের অনন্যসাধারণ সদ্গুণ ও সাধ্বী কীর্ত্তিমালার স্মরণার্থে আয়াস ও প্রয়াস স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইতেন না। সারমেয়-তাড়িত মেষপালের ন্যায় অধঃপতিত ও পরপদানত হিন্দুর দুরবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া, অনাহার, অপমান, অত্যাচার ও অশিক্ষার পীড়নে ভারতবাসীকে কর্ত্তিত-কণ্ঠ-রোহিতের ন্যায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে নিজ নয়নে ঈক্ষণ করিয়া, কর্ণেল টড্, শিক্ষিত হিন্দুর উন্মীলিত নয়ন সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের অতুল গৌরব, অসামান্য মহিমা, অনন্যসাধারণ একপ্রাণতা, স্বধর্ম্মবৎসলতা এবং অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্যের এক জীবন্তচিত্র আপনার সুবৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের যোগে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই মহামূল্য ইতিহাস কেবল তাঁহার নিজের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে, ইহা আমাদিগের গৌরব ও মহিমাশালী পূর্ব্ব পুরুষদিগের অগণ্য সদ্গুণ ও মনুষ্যত্বেরও এক চিরস্থায়ী চিত্র। পতিত দেশে, একপ্রাণতা ও স্বদেশবৎসলতা উদ্দীপন করিবার পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর কোনও মহামন্ত্র জগতে আছে কি না, জানি না। কর্ণেল টডের পবিত্র জীবনের কিয়দংশও যদি লিখিতে পারা যায়, তাহা হইলেও আমরা তাঁহার মহাঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করিতে সক্ষম হই।

কর্ণেল টডের জীবনের অধিকাংশ অথবা (বস্তুতঃ) সমগ্র জীবন রাজপুতানায় অতিবাহিত হয়। বীর্য্যক্ষেত্র রাজপুতানা, তিন অংশে বিভক্ত; মেয়োয়ার, মারোয়ার এবং হারোয়ার বাহারাবতী। মেয়োয়ারের রাজধানী উদয়পুর; কাশ্মীর এবং দক্ষিণ ভারতান্তর্গত গুলবর্গা নগরী ভিন্ন এরূপ মনোহর নগর ভারতে আর নাই। প্রভূত প্রতাপ ও প্রভাবশালী সুপ্রসিদ্ধ "প্রতাপ সিংহ" যবন গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার অন্যতম আত্মীয় উদয় সিংহ চিতোর নগর পরিত্যাগ করিয়া আরাবল্লী গিরিমালার পদপ্রান্তে আপনার নামে উদয়পুর স্থাপনা করেন। কাল প্রভাবে দিগ্বিজয়ী ব্রিটীশ সিংহের বীর্য্য ও বিক্রম বিশেষরূপে বিস্তৃত হইলে, উদয়পুর ইংরাজের রাজনৈতিক নীতির (policy)

অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, এবং সন্ধি দ্বারা উভয়-পক্ষের শান্তি সংরক্ষিত হয়। ঐ সন্ধিপত্রের তৃতীয় ধারায় লিখিত ছিল যে,"যতদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বন্দোবস্ত না হয়, অথবা বর্ত্তমান বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে অন্য সন্ধিপত্রের অবতারণার আবশ্যকতা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত উদয়পুরে ব্রিটীশের রাজনৈতিক দূত অবস্থান করিবেন, কিন্তু ঐ দূত উদয়পুর বা চিতোর নগরের সীমা মধ্যে আপনার কার্য্যালয় খুলিতে পারিবেন না। নগর হইতে অন্ততঃ ৬ ক্রোশ (ইং দ্বাদশ মাইল) অন্তরে দূত অবস্থান করিতে পারেন।" এই সন্ধিপত্র বিধিমত রাজদরবারে উভয় পক্ষকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া গেলে, কর্ণেল টড্ সর্ব্বপ্রথম মেয়োয়ারের পলিটীকেল্ এজেণ্ট (Political Agent) নিযুক্ত হইয়া আইসেন এবং ক্রমাগত ষোড়শ বৎসরকাল মেয়োয়ারে অবস্থান করেন। তাঁহার মেয়োয়ারে অবস্থিতি,হিন্দু গৌরব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

যে গ্রামে তিনি অবস্থান করেন, তাহার নাম "ডাবুক," ইহা উদয়পুর হইতে সার্দ্ধ সপ্তক্রোশ। আমরা সম্প্রতি ঐ ডাবুক গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলাম। গ্রামের পার্শ্বদেশে মহাত্মা কর্ণেল টডের ভগ্নগৃহ (Tiled bungalow) এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাঙ্গলোটিতে ৮টি কামরা এবং একটি সুবৃহৎ হল। দক্ষিণ প্রান্তে বৃহৎ সরোবর এবং পূর্ব্বদেশে একটি বৃহৎ রমণীয় উদ্যান। সুবৃহৎ হলের প্রস্তর-নির্ম্মিত দেওয়ালে,রাজপুতানার ছোট ছোট লুপ্ত চিত্রের এখনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা এখনও বিদেশীয় লোকদিগকে বলিয়া থাকে যে, ইহা "বাবা সাহেবের কুঠি।" মেয়োয়ারের লোকেরা পরম সাধু বা মহাপুরুষদিগকে আপনাদের স্থানীয় ভাষায় "বাবা" বলিয়া থাকেন। কর্ণেল টড, বাস্তবিক, স্বভাবে 'বাবা'ই ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রজাপুঞ্জ-প্রদত্ত তাঁহার সেই সুমধুর বাবা উপাধি এখনও লুপ্ত হয় নাই। গোলাপ শুকাইলেও কি তাহার গৌরব যায়? শুষ্ক গোলাপের সুগন্ধি অনেক সময়ে তাজা গোলাপ অপেক্ষা অধিক!*

কর্ণেল টড্ রাজপুত জাতির ইতিহাস, আচার ব্যবহার, প্রকৃতি, সামাজিক রীতি নীতি এবং স্বভাব প্রভৃতি এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজপুত আগমন করিলে, তিনি কেবল তিন মিনিটকাল তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চিতভাবে বলিয়াদিতে পারিতেন যে, আগন্তুক রাজপুত "ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র"! টড্ প্রতিদিবস অপরাহ্নে দরিদ্ররোগীদিগকে স্বহস্তে ঔষধ বিতরণ করিতেন; একদিন একটি সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের অল্প বয়স্কা বিধবা কন্যা পীড়িতা হইয়া টডের গৃহে আগমন করতঃ ঔষধ প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণের তখন নিতান্ত হীনাবস্থা; কন্যাটি টডের নিকটে আসিয়া এই বলিয়া পরিচয় দিলেন যে,"আমি দরিদ্র জাঠ কন্যা; আপনার নিকটে ঔষধ প্রার্থনায় আগমন করিয়াছি।" কর্ণেল সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের মুখে মিথ্যাকথা

* ইচ্ছাছিল, এই প্রস্তাবের সঙ্গে ঐ গৃহের ফটোগ্রাফখানি পাঠাই। ফটোগ্রাফখানি বোম্বায়ের একজন ইংরাজ খোদক (ইন্‌গ্রেভার) মহাশয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে,প্লেটটি এ পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই। কর্ণেল টড্ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার সময়ে (বারান্তরে) প্লেট পাঠাইতে পারিব, এরূপ ভরসা আছে। লেখক।

শোভা পায় না এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবীর্য্যের উজ্জ্বলতা কপট বাক্যের কুহকতেজে হীন-প্রভঃ হয় না।” ব্রাহ্মণকন্যা লজ্জায় বদনাবনত করিয়া মুকভাব অবলম্বন করিলেন।

টডের চাকুরীর পঞ্চমবর্ষে রাজপুতানায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে এবং হত্যা, দস্যুতা, চৌর্য্য, বঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ-মালায় সমগ্র মেয়োয়ার ভয়ানক বিপদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে টড্‌সাহেব এক দিবস আরাবল্লী গিরির সর্ব্বোচ্চ শিখর পব্‌নাল্ পস্ (Publan Pass) সন্নিহিত গ্রামসমূহে গমন করিয়া ভীলজাতি মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এক পক্ষকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে, পথিমধ্যে এক নিবিড় বনপার্শ্বে একটি অনাথ ক্ষত্রিয় শিশুকে পতিত হইতে দেখিয়া,ভাবুক গ্রামে আপনার বাঙ্গালো মধ্যে আনয়ন করেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ইহার পিতা বা মাতার কোনও সমাচার প্রাপ্ত হইবার কোনও আশা নাই দেখিয়া, মহাত্মা টড্‌সাহেব শিশুটিকে আপনার ব্যয়ে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে শিশু বয়ঃস্থ হইলে, টডের ইংরাজ বান্ধবগণ,বালকটিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ইংরাজী নামে অভিহিত করিবার জন্য টড্‌কে পরামর্শ দেন। মহাত্মা কর্ণেল টড্ এই পরামর্শের প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, “ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস, শৌর্য্যবীর্য্যের আকরস্বরূপ মেয়োয়ার-বাসী রাজপুত বালককে আমি কেমন করিয়া তাঁহাদের ঘৃণিত ইংরাজ জাতির নামে ও ধর্ম্মে সংযোজিত করিতে পারি ? স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং স্বজাতীয় প্রথার বিরোধীতা,হিন্দুসমাজে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত।” ক্রমে ক্রমে ঐ বালক, কেবল বয়সে ও স্বভাবে নহে, সুশিক্ষা ও নির্ম্মল জ্ঞানেও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ; এই বালক কালে কর্ণেল টডের মহা ইতিহাসের বহুসংখ্যক নোট্ (Note) সংগ্রহ করিয়া দেন এবং পরিশেষে রাজপুতানায় মাসিক ৩ শত টাকা বেতনে এক সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত হয়েন। মেওয়ারী ভাষায় “টাবর্” শব্দে “বালক” বুঝায়, টড্‌সাহেব এই প্রিয় বালককে রামটাবর বলিয়া ডাকিতেন। লালা রামটাবর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পৌত্র এক্ষণে যশলমীরে বর্ত্তমান। রাজপুতানার যে স্থানেই যাও, কর্ণেল টডের সদ্গুণের পরিচয় সেই খানেই বর্ত্তমান।

রাজকর্ম্মের কঠোরতায় টড্‌সাহেব নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে, কিছু দিবসের অবসর গ্রহণ করতঃ সিংহল দ্বীপে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে উদয়পুরের মহারাজ বাহাদুর, রাজ্যের চিরাগত প্রথানুসারে সসম্মান “সেলামী” দিবার জন্য টডের নিকটে আগমন করিয়া, বন্ধুত্ব ভাবে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন,—“আপনি সিংহল হইতে আমার জন্য কিছু লইয়া আসিয়াছেন কি ?” কর্ণেল টড্ উত্তরে বলেন, “মহারাজ ! সিংহলে বহুমূল্যবান মুক্তা ও অতীব প্রোজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ পাওয়া যায়। মনে করিলে আমি তাহাদের কতকগুলি বা কিয়দংশ আপনার উপহারের জন্য আনিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আনি নাই। না আনিবার কারণ এই যে, সুবর্ণ বা মুক্তা জগতের নশ্বর এবং অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ; সিংহল হইতে আপনার জন্য যাহা আনিয়াছি,তাহার এক তোলার মূল্য লক্ষ তোলা

সুবর্ণ বা লক্ষমণ মুক্তা অপেক্ষাও অধিক।” নিতান্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া,উদয়পুরাধিপতি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কি সেই অপূর্ব্ব জিনিষটি দেখিতে পারি না?” কর্ণেল টড্ ক্ষণকাল মধ্যে আপনার সুবৃহৎ ইংরাজী কোটের পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া মহারাজার হস্তে সমর্পণ করতঃ বলিলেন—“ইহা একখানি পালি ভাষায় লিখিত বহুমূল্যবান গ্রন্থ। রঘুকুলতিলক, বীরকেশরী, পিতৃবৎসল, প্রজাহিতৈষী, মহাগুণী ও মহাধার্ম্মিক মহারাজ রামচন্দ্র এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী জানকী, সিংহলে অবস্থানকালে তত্রস্থ পুরুষ ও রমণীদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান, জীবন, মুক্তি, ভক্তি, মৃত্যু, চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মহোপদেশ সকল প্রদান করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজা রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, আপনিও সেই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া “মহারাণা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার পবিত্র হস্তে এতদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বস্তু আর কি দিতে পারি? ইহা শত সহস্র মণি মাণিক্য হইতেও অধিকতর মূল্যবান।” কর্ণেল টডের কথা শুনিয়া উদয়পুরের রাণা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেলাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

টড্ সাহেব অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া চা পান করিতেন এবং ৫ টার সময় বাটীর বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া বন্য ময়ূর, বন্য পারাবত, ও বন্য কুক্কুটদিগকে তণ্ডুল, গোধূম, ও যব বিতরণ করিতেন। তৎপরে গৃহপালিত গাভী, হরিণ, ও নানাজাতীয় জীবজন্তুকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। ৭টার সময়ে অন্ধ, খঞ্জ ও দরিদ্রবর্গকে প্রতিদিন /০ এক আনা হিসাবে পয়সা দান করিতেন। অপরাহ্নে ঔষধ বিতরণ, দরিদ্রের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন এবং বালক বালিকার শিক্ষা, এই সকল দেবদুর্ল্লভ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সায়াহ্নে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া গৃহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। সাহিত্য ও রাজনীতির কার্য্য প্রায় রাত্রেই সম্পাদিত হইত। মধ্যাহ্নে শয়নের ব্যবস্থা ছিল।

ডাবুকে অবস্থানকালে, টডের বাটীতে নাছুনী নাম্নী এক মাড়োয়ারী দাসী ছিল। ঐ দাসী টড্ সাহেবের একটি ছাগীকে পালন করিত এবং তজ্জন্য মাসিক ৪৲ টাকা বেতন পাইত। কর্ণেল টড্ এই সময়ে সমগ্র রাজপুতানা এজেন্সীর চিফ এজেণ্ট (অথবা Governor General's Agent for Rajputana) পদে নিযুক্ত হইয়া আবু পর্ব্বতে স্থানান্তরিত হইলে, বৃদ্ধা নাছুনী আবু যাইতে অস্বীকার করে। টড্ সাহেব প্রতি মাসে বুড়ীকে দুই টাকা পেন্সন্ দিতেন। কিছুকাল পরে বুড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু সমাচার কর্ণেল টডের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বহস্তে ইংরাজী ভাষায় বুড়ীকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান; আমরা ঐ পত্রের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ এস্থানে দিতেছি।

“প্রিয় নাছুনী!

তোমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকস্মাৎ শোচনীয় মৃত্যু সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আবু, ডাবুক হইতে বহুদূর, সুতরাং স্বয়ং যাইয়া তোমাকে সান্ত্বনা করিতে আমি অক্ষম এবং সেজন্য আমি আরও দুঃখিত। আমার মুন্সী দেবীপ্রসাদকে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি, এই দেবীপ্রসাদ আমাকে হিন্দী পড়াইয়া থাকে। এই ব্যক্তি তোমাকে এই পত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে। ইহার সঙ্গে তোমার পুত্রবধুর ব্যবহারের জন্য এক জোড়া বস্ত্র, তোমার ব্যবহারের জন্য

দুইখানি বিলাতী কম্বল এবং তোমার বিধবা কন্যার জন্য ২৫৲টি টাকা পাঠাইলাম। তোমার ভগ্ন গৃহের পুনঃসংস্কার জন্য দেবীপ্রসাদের হস্তে ৫০ টাকা স্বতন্ত্র দিলাম। ভরসা করি, তুমি গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর করুন তোমার মৃত পুত্রের আত্মার শান্তি হউক।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও দুঃখে দুঃখিত
টড।”

মহাত্মা কর্ণেল টড্ ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মরিয়াছেন কি? আর্য্য-বংশসম্ভূত প্রকৃত রাজপুতের হৃদয়ে মহাত্মা কর্ণেল এখনও আপনার সদ্গুণে জীবিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

বাঙ্গালার কবি অকবি অনেককেই আজকাল সনেট-রচনায় বিশেষ ব্যগ্র দেখিতে পাই। ইহা ক্রমশঃ একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই ইহার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে লেখক পাঠক উভয়েরই সুবিধা। সনেটের যাহা প্রাণ,সনেটের যাহা চিরানুমোদিত ভিত্তি, পাঠক যদি তাহা কোনও চৌদ্দলাইন কবিতায় দেখিতে না পান, তবে উহাকে ময়ূরের দল হইতে দাঁড়কাকের ন্যায় বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। আর, লেখক মহাশয়ও আপনার কর্ম্মের দায়িত্ব, ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া কথঞ্চিৎ সাবধান হইতে পারিবেন।

শুনা যায়, ইটালী প্রদেশের গীতোনি নামক কবি সর্ব্বাগ্রে এই শ্রেণীর কবিতা রচনার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে পিত্রার্কের হস্তে ইহা সম্যক্ পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠে। একজন লেখক সনেটকে সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা সুরের টান ও ঝঙ্কারই ইহার প্রাণ। চতুর্দ্দশটি মাত্র লাইনের ভিতর ইহার স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য বড়ই বিস্ময়কর। ইহাতে বিবিধ ঝঙ্কার ও ওজনবিশিষ্ট বিবিধ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রঙ্গালয়ে যেরূপ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গায়কের গানের ভিতর ডুবিয়া, প্রাণোন্মাদকারী, সমঞ্জসীভূত একটা সুরের সৃষ্টি করে, সনেটের প্রকৃতিও সেইরূপ। মিত্রাক্ষর কবিতার যে বিশেষ সৌন্দর্য্য শব্দের মিল—ইহাতেও তাহা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। অথচ বারংবার একই প্রকার মিল বশতঃ পাঠকের কাণে আঘাত লাগিবারও সম্ভাবনা নাই। অমিত্রাক্ষরের যে রীতি ও বৈচিত্র্য,তাহাতেও সনেটের সম্পূর্ণ অধিকার। ইহাতে ছত্রের ভিতর ছত্র একরূপে মিলিয়া মিশিয়া যায়, বিরামের পর বিরামের এতই বিভিন্নতা রক্ষিত হয় যে,যথার্থ চতুর্দ্দশপদী লেখকের রচনা চাতুর্য্যে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যবিৎ বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

সকল বিষয়ই সনেটের উপযোগী নহে। কোনও কোনও কবি বড় বড় বিষয় লইয়া চতুর্দ্দশের চাঁদমালা (Sonnet sequence) গাঁথিয়া যান, দেখিয়াছি। কিন্তু, প্রস্তাব-লেখক সে প্রথার বড় পক্ষপাতী নহে। উহা সনেটের অপব্যবহার। একটা বৃহৎ বিষয়ের হাত পা বাঁধিয়া, সনেটের সঙ্কীর্ণ থালীর ভিতর পুরিলে, উহার শ্বাসরোধ ও প্রাণবিয়োগের প্রভূত সম্ভাবনা। অথচ

কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলেও বিপদ বরং বাড়িয়াই উঠে। একটি সম্পূর্ণ হৃদয়ভাব কিম্বা স্বভাব দৃশ্য লইয়া একটি সম্পূর্ণ সনেট রচিত হওয়াই উচিত। অনেক স্থলে একমাত্র কবিতার আয়তনে কুলাইয়া না উঠিলে, দুইটি বা তিনটি সনেট রচনাতেও তেমন মারাত্মক কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু সুদীর্ঘ একটা মহাকাব্য অথবা প্রণয়মূলক উপাখ্যান বা বর্ণনা-কাব্য যে আগাগোড়া চতুর্দ্দশপদীর আকারে বিরচিত হইবে, উহা নিতান্তই অসহ্য। প্রত্যেক সনেট নিজেই একটি সম্পূর্ণ প্রাসাদস্বরূপ। উহাকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কোনও অট্টালিকার অংশমাত্রে পরিণত করিলে, উহার সৌন্দর্য্যের হানি করা হয়। যেখানে ভাবটি আয়তনে ক্ষুদ্র, অল্প কথায় বলিলেও, সব কথাই বলা হয়, সেইখানেই সনেটের উপযোগিতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায় ইহার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থে যে সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আভ্যন্তরিক ভাব অথবা বাহ্য দৃশ্য লইয়া কোনও কবিতাই রচিত হওয়া উচিত নহে। যাহাতে আমাদের পবিত্র হৃদ্বৃত্তিনিচয় উন্নত ও প্রসারিত, আকাঙ্ক্ষা সত্য ও সৌন্দর্য্যের পানে প্রধাবিত, এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের পথে পরিচালিত না হয়, তাহা কবিতারই বিষয় নহে।

পিত্রার্ক চতুর্দ্দশপদীর যে গঠন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, প্রতিভাশালী মহাকবিগণ এ পর্য্যন্ত তাহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চারি চারি করিয়া আট লাইন; এবং দ্বিতীয় ভাগে তিন তিন করিয়া ছয় লাইন। প্রথম ভাগের ১, ৪, ৫, ৮ সংখ্যক লাইনে এবং ২, ৩, ৬, ৭ সংখ্যক লাইনে মিল থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় ভাগে ছয় লাইনের তিনটি তিনটি করিয়া অথবা দুইটি দুইটি করিয়া মিত্রাক্ষর হওয়া চাই। ইহাই সনেটের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি; তবে সকলেই যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এমন নহে। স্বয়ং সেক্ষপীয়র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার সনেট অভিধেয় কবিতাগুলি প্রকৃত কবিত্বের আধার হইতে পারে, কিন্তু উহারা বাস্তবিক সনেট নহে। চতুর্দ্দশপদী বটে; কিন্তু সনেট নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা সনেটের বাহ্য লক্ষণ মাত্র। ভিতরকার কথা বড়ই গুরুতর। যিনি কখনও অকৃত্রিম চতুর্দ্দশপদীর আলোচনা করেন নাই, সে কথা তাঁহাকে বুঝান এক প্রকার দুঃসাধ্য। ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে অপূর্ব্ব ঐক্যতান, তাহা সাধারণ পাঠকের হৃদয়গম্য নহে। ইহাতে ভাষা ও ভাবের যে বিচিত্র সংমিশ্রণ, পাপিয়ার স্বরলহরীর ন্যায় ইহার যে ক্রমবিন্যস্ত স্বাধীন উর্দ্ধগতি, তাহা প্রাণের ভিতরেই অনুভব করিতে হয়। গোলাপের দলগুলি যেরূপ নৈশসমীরণ স্পর্শে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করে। আবার, যেরূপ গোলাপের ভিতরকার কয়েকটি দল পরাগরূপী ঘনীভূত সৌন্দর্য্য-সৌরভকে বর্ত্তুলাকারে লুকায়িত করিয়া রাখে; সেইরূপ এই সনেট-কুসুমের শেষ দুই চরণে, উহার প্রাণগত সমস্ত সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব আসিয়া পুঞ্জীভূত হয়। যেন এইখানে আসিয়াই আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষিত উভয়েই যুগপৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। ভাব ও ছন্দের ঝঙ্কার, পরস্পর পরস্প রে নিম-

ঞ্জিত হইয়া, আমাদের প্রাণ ও কাণকে তৃপ্তিসুখে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে মনে হয়, যে কয়দিন বাঁচিব, বুঝি এই ঝঙ্কার, এই সঙ্গীত হৃদয়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রতিনিয়ত এইরূপই বাজিতে থাকিবে!

আমাদের দেশে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনই চতুর্দ্দশপদী রচনার আদিগুরু। মাইকেলের আদর্শ, মিল্‌টন ইংরাজী ভাষায় যে কয়টি সনেট লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের তুলনা আজিও মিলিল না। আমাদের মধুসূদনও দীনা বঙ্গভাষার কণ্ঠে যে দুই চারিটি অমূল্য সনেট-রত্ন পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না। সম্প্রতি যে অজস্র চতুর্দ্দশপদী প্রসূত হইতেছে, তাহার অধিকাংশে কেবল আঙ্গুলে গণিয়া চৌদ্দলাইনে ১৯৬ বাঙ্গালা অক্ষর মাত্র পাওয়া যায়। ইহার অতিরিক্ত বড় কিছুই পাওয়া যায় না। সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েকটী ভাল সনেট রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীর সে প্রাণ নাই। রবীন্দ্রনাথ বাবুর অধিকাংশ কবিতার যে দোষ, আমাদের মতে, তাহা তাঁহার সনেটকেও স্পর্শ করিয়াছে। দুই চারিটিকে ছাড়িয়া দিলে, বাকীগুলি কেবল—"Ingenious conceits and maudlin sentiments." ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং ভাষার তেজ নহিলে কবিতা হয় না। ভাব্যের গাম্ভীর্য্য তাঁহার সনেটে নাই, এমন নহে। কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বীতা না থাকিলে মানুষের হৃদয় ত তাহাতে উদ্দীপিত হইয়া উঠে না। যে কবিতা সহকার-বিচ্যুতা লতার ন্যায় মৃত্তিকা-শয়নে শুইয়া কেবল কাঁদিতেছে, তাহা কি প্রকারে শত সহস্র নর নারীর হৃদয় মনের আশ্রয়স্থল হইবে, আমরা কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। এই দুঃখ শোকসন্তপ্ত জগতে Masculine কবিতারই প্রয়োজন; Feminine এর আবশ্যকতা নাই বলিলেও হয়। সেই কারণে, যে কবিতার অস্তিত্ব বিলাসপ্রিয় কবির ইন্দ্রিয় ব্যাধিবিকৃত মস্তিষ্কের নিভৃত কক্ষেই নিবদ্ধ, তাহা কবির সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মানবের সুখ দুঃখের সঙ্গীত গাঁথিয়া "অমর আলয়" রচনা করিতে চান, যুবতীর "স্তনের ছায়ায়" শয়ন করিয়া কেবল "অঞ্চলের বাতাস" সেবন করিলে তাঁহার চলিবে না। তাঁহার কবিতার ভিত্তি সমগ্র মানবজাতির অথবা সমাজ বিশেষের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভরসা করি, আধুনিক ঢংয়ের "কমল-বিলাসী" কবিকুল (Lotus-eaters) আমাদের কথায় একটু কাণ দিবেন। উপরে রবীন্দ্রনাথ বাবুর নাম দেখিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য; অথবা আমরা তাঁহার কবিতার আদৌ অনুরাগী নহি। আমাদের বিরাগ সাধারণতঃ কমল-বিলাসী সম্প্রদায়ের উপর;—ব্যক্তি বিশেষের উপর নহে।

কেহ কেহ বলেন, সনেটের রচনাপ্রণালী ভাণ ও কৃত্রিমতার এক শেষ। স্বাধীনক্ষেত্র না পাইলে কবিতার স্ফূর্ত্তি হয় না। চতুর্দ্দশপদীর কঠোর বন্ধনে অষ্ট পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া, কাব্যের সত্য ও স্বাভাবিকতা একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ প্রকার সমালোচনার অর্থ আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সনেট সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সকল প্রকার কবিতাতেই উত্থাপিত হইতে পারে।

কোনও প্রকার নিয়ম সম্পর্ক শূন্য কবিতা এ পর্য্যন্ত জগতে বিরচিত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালা রঙ্গভূমির "আভিনয়িক ছন্দের" উল্লেখ করিয়া, সমালোচক মহাশয় আমাদের সম্মুখে হয়ত হস্ত পদ সঞ্চালনে আস্ফালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে,ঐ ছন্দে বিরচিত গ্রন্থের যে স্থলটা কবিতা নামের উপযুক্ত, তাহা যে নিয়মের অতীত নহে,এ কথা বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তবে উহার নিয়ম প্রণালী সাধারণের চক্ষে তত সুস্পষ্ট নহে। কবিতার নির্ব্বাচন বিষয়ে পাঠকের কালই প্রধান নিয়ন্তা। যদি উহা কোনও স্থলে সেই কালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এই অধম বাঙ্গালাদেশে এমন অধম বালকও নাই, যে উহাতে কাব্যরাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবে না। ফলতঃ বহির্দৃষ্টিতে যেখানে যত নিয়মের অভাব বলিয়া বোধ হয়,যে সকল পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁহারা সেইখানেই তাহার তত প্রভাব দেখিতে পাইবেন।

ইংলণ্ডে নাটকোচিত অমিত্রাক্ষর রচনায় সেক্ষপীয়র, এবং মহাকাব্যোচিত অমিত্রাক্ষর রচনায় মিল্‌টন, কাব্যজগতে আজিও আদর্শস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। ঐ দুই মহাপুরুষের জুতার ফিতাটি খুলিবার লোকও এ পর্য্যন্ত মিলিল না। আর আমাদের মাইকেল মধুসূদন গৌড়বাসীর প্রাণে যে মহান্ সঙ্গীতের স্রোত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন,আজ পর্য্যন্ত আমরা কেহই তাহার কাছে পঁহুছিতে পারিলাম না। সমালোচক যাহাই বলুন, মাইকেল কবি উচ্চাকাশে মেঘের উপর স্বকীয় স্বর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; কমল-বিলাসীকুল আলস্যের হাই তুলিয়া, তাঁহার পেণ্টুলনের অগ্রভাগটিও কাঁপাইতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ আমরা কি বুঝিব? নিয়মের নিষ্ঠুর বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও স্বাধীনতার সুবর্ণ-রাজ্যে বিচরণ করিতে যে প্রতিভার প্রয়োজন, তাহার অভাবই কি ইহার কারণ নহে? যাঁহারা নিয়ম পদ্ধতির দায় হইতে একবারে উদ্ধার হইয়া, পৃষ্ঠের উপর স্বাধীনতার ডানা বাঁধিয়া, কাব্যাকাশে বিচরণ করিতে চান, জন্‌সন-বর্ণিত দার্শনিকের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, আমরা তাঁহাদের নিমিত্ত বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়ি। সনেট, মায়ার খেলা বা হাওয়ার খেলা নহে; কঠোর সত্য ও স্বাভাবিকতাই উহার প্রাণ। সত্য এবং স্বাভাবিকতা যে নিয়মেরই এক প্রকার প্রতিশব্দমাত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যাহা বাস্তবিক কৃত্রিমতা, অপরবিধ কাব্যে যেরূপ তাহার মার্জ্জনা নাই, চতুর্দ্দশপদীতেও তদ্রূপ। কিন্তু কৃত্রিমতা এবং কাব্যকৌশল সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। ইহা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহাদের সহিত তর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইন তাঁহাদিগকে শুনাইয়া নিরস্ত হইব।

"Scorn not the sonnet; critic, you have frowned,
Mindless of its just honours; with this key
Shakespeare unlocked his heart; the melody
Of this small lute gave ease to Petrach's wound;
...........And, when a damp
Fell round the path of Milton, in his hand
The thing became a trumpet, whence he blew
Soul-animating strains—alas, too few!"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

মহারাজ দুর্য্যোধন।

"দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ ফল পুষ্প, অজ্ঞানান্ধ ও প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল স্বরূপ। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ; অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার সমৃদ্ধ ফল পুষ্প, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল স্বরূপ হইয়াছে।" মহাভারত, (বঙ্গবাসী সংস্করণ) আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ৩য় পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান মহাভারতের প্রারম্ভেই দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ গ্রন্থে মহারাজ দুর্য্যোধনকে "অল্পবুদ্ধি," "পাপাত্মা" ইত্যাদি সহস্র কুৎসিৎ শব্দে অলঙ্কৃত করা হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। মানব কল্পনায় যত কিছু পাপ দুরভিসন্ধি, অশিষ্ট ও অশ্লীল আচরণ সম্ভবে, যত নৃশংসতা মানববুদ্ধি উদ্ভাবন করিতে পারে, দুর্য্যোধন-চরিত্রে তাহার সকলই আরোপিত হইয়াছে। ক্রীড়াচ্ছলে প্রীতিভোজনোপলক্ষে ভীমকে বিষ প্রদান, জতুগৃহে মাতার সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ চেষ্টা, সভাস্থলে রজঃস্বলা ভ্রাতৃবধূর বস্ত্রাপহরণ, সকলই রাজাধিরাজ, দুর্য্যোধনের চরিত্রে সম্ভাবিত হইয়াছে। ইংরেজ লেখনী সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রও এরূপ কাল রঙে চিত্রিত করিতে পারে নাই। এত দুষ্ট ভাব, এত গভীর অনিষ্ট চিন্তা সিরাজের চরিত্রে নাই।

পক্ষান্তরে ক্লাইবের জাল যেমন জাল নহে, তেমন যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা নহে। শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক, বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্মের সংহার, মিথ্যাবাদ প্রচারিত করিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিধন এবং কৌশলক্রমে কর্ণের কবচ হরণ ইত্যাদি পাণ্ডবপক্ষীয় অসদ্ব্যবহার নিন্দার্হ হয় নাই। বরঞ্চ পাণ্ডবগণের মন্ত্রদাতা এই সকল কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দেবশ্রেণীতে উঠিয়া গিয়াছেন। ধন্য সাহিত্য! ধন্য কল্পনা! তুমি যাহা কর, তাহাই সম্ভবে।

মহাভারত ইতিহাস নহে, কাব্য, ইহাই আধুনিক ও পরীক্ষিত মত। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন, প্রভৃতি নাম ঐতিহাসিক নহে, কবি-কল্পনাপ্রসূত। কুরু পঞ্চাল নামে দুই আর্য্যজাতি গাঙ্গ্যপ্রদেশে আসিয়া যথাক্রমে বর্ত্তমান দিল্লী ও কান্যকুব্জের নিকটে হস্তিনা ও কাম্পীল্য নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক মৈত্রভাবে বাস করিতেছিলেন। যেমন একদা এদেশে ফরাসী ও ইংরেজজাতি মৈত্রভাবে বাস করিয়া শেষে বিবাদকরত, ফরাসী পরাজিত ও ইংরেজ জয়ী হইয়াছেন, সেইরূপ কুরু পাঞ্চালের মৈত্রভাব তিরোহিত হইলে, যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কুরু পরাজিত ও পাঞ্চাল জয়ী হইয়াছিলেন। এই টুকুই ঐতিহাসিক সত্য; ইহা হইতেই প্রকাণ্ড মহাভারত উৎপন্ন হইয়াছে।

কেবল এও নয়, আর একটী কথা আছে। শতপথব্রাহ্মণের ১৩শ অধ্যায়ে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-পুত্র ভরত, কাশীরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং জনমেজয় পরীক্ষিৎ ও তদীয় তিন ভ্রাতা ভীমসেন, উগ্রসেন এবং শ্রোতসেনের উল্লেখ আছে। আর ইহাও লিখিত আছে যে, জনমেজয় পরীক্ষিৎ ভ্রাতৃগণ সহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই সকল নাম হইতে মহাভারতের নায়ক ও প্রতিনায়কের নাম গৃহীত ও কল্পিত হইয়াছে, ইহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-

দিগের মত। কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের সমসাময়িক সাহিত্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এতদপেক্ষা অধিক কিছু পাওয়া যায় না।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভট্টমোক্ষমূলর, গোল্ড্‌ষ্টুকার এবং ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে, আদি ও অকৃত্রিম মহাভারত আশ্বলায়নের সময় বিদ্যমান ছিল। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে উক্ত সূত্রকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারত রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ ধরা যাইতে পারে। কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের সময় খ্রীঃ পূঃ ১২৫০ অবধারিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহাভারতে "কৃষ্ণ,বেদ ও ব্রাহ্মণগণের" প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা, এক প্রধান উদ্দেশ্য। উপনিষদ রচনাকালে (খ্রীঃ পূঃ ১১০০—৯০০) যে ব্রাহ্মণগণের এত প্রাধান্য ছিল, তাহাত বোধ হয়না। সে সময়ে বেদের পূর্ণ মর্য্যাদা ছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণ নামে কোন দেবতা ছিল, ইহার প্রমাণাভাব। খ্রীষ্টের জন্মের পর একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাঘ ও জয়দেবে কৃষ্ণের দেবত্ব বিষয়ক প্রথম প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহারই অত্যল্পকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রাধান্য সূচিত হইয়া থাকিবেক। সুতরাং প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে মহাভারতের যে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হইয়াছে, "চতুর্ব্বেদার্থ প্রতিপাদিনী" সংহিতাকে যদ্দ্বারা "পৌরাণিকী পবিত্র কথায়" পরিণত করা হইয়াছে, তাহাতে আদি ও প্রকৃত মহাভারতের চরিত্রগুলির কিরূপ যথাযথ ভাব রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। হয়ত অনেক চরিত্র ও ঘটনা অতিরঞ্জিত ও অপরঞ্জিত হইয়াছে,কিম্বা মূলতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কুরুগণ আর্য্যজাতি, তাহাতে অনার্য্য স্বভাব আরোপিত করা হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ অনার্য্যজাতি, তাহাকে আর্য্যভাবাপন্ন করা হইয়াছে। দুর্য্যোধনকে কলি বা পাপ এবং তৎভ্রাতৃগণকে রাক্ষসের অবতার (আদি পর্ব্ব ১৬৭ অধ্যায়) বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতাদৃশ গ্রন্থ হইতে কুরু পক্ষের নেতৃবর দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য ও চরিত্রবল সম্যক্ উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। তবে মহাভারতের "সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদক" কোন কোন স্থান হইতে দুর্য্যোধন চরিত্র যতদূর বুঝা যায়, তাহাই প্রদর্শন করা, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উত্তর কুরু হইতে আসিয়া কুরুজাতি ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐতরীয় ব্রাহ্মণ মতে (৮ম, ১৪) উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্রজাতি হিমালয়ের উত্তরে বাস করিত। ল্যাসেন সাহেব বলেন, বর্ত্তমান ক্যাসগর উত্তর কুরু। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে যে ভৌগলিক বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে আর্মেনিয়া বা ককেসস্ প্রদেশ উত্তরকুরু বলিয়া অনুমিত হয়। (১) মহাভারতের স্থানে স্থানে এরূপ বর্ণনা আছে, যদ্দ্বারা ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি হয় যে,মেরু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উত্তরকুরু প্রভৃতি প্রদেশ।

"ভূতভাবন ভগবান পশুতি স্বয়ং ভূতগণে পরিবৃত হইয়া উমা সহ তথায় বিহার করেন।" সুতরাং এই প্রদেশের অধিবাসীগণ শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। তথাকার ঔপনিবেশিকেরা অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কুরু ও মদ্রগণও যে শৈব, ইহা অক্লেশে বুঝা যায়। কুরুগণের নেতা দুর্য্যোধন ও মদ্রগণের নেতা শৈল্য কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের প্রধান প্রতিপক্ষ। যেমন পাণ্ডব পক্ষের মূল "কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ", তেমন কৌরব পক্ষের প্রকৃত ধর্ম্ম মূল রুদ্র বা মহেশ্বর এবং ভূতগণ বা অনার্য্যগণ।

(১) ১২৯৯ সালের ভাদ্রমাসের প্রথম পক্ষের অনুসন্ধানে "বর্ষ ও বর্ষপর্ব্বত" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, মেরু পর্ব্বতের অর্থাৎ আরারাটের উত্তরে উত্তরকুরু।

১। "শুভলক্ষণা সুবলাত্মজা গান্ধারী ভগ নামক দেবতার নেত্রহারী মহাদেবকে আরাধনা করিয়া শত-পুত্রলাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" আদিপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায় ২ পেরা।

২। নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র সময়ানুসারে (শৈব) জয়দ্রথকে যথাবিধি দুঃশলা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।" ।১।১১৭।১।

৩। বারাণাবতে যে উৎসবে যুধিষ্ঠিরাদি আসিয়া দগ্ধ হইতে বসিয়াছিলেন, তাহাও ধৃতরাষ্ট্র অনুষ্ঠিত একটী "পশুপতি (শৈব) উৎসব।" ।১।১৪৫।২।

এইরূপ অনেক স্থান উদ্ধৃত করা যায়, যদ্দ্বারা কৌরব পক্ষকে রুদ্র বা শৈব্য ধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্য পক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানটী পাঠকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব দ্বারা পরাজিত ও কারারুদ্ধ হইলে, অর্জ্জুন গিয়া দুর্য্যোধনকে সস্ত্রীক মুক্ত করিয়া আনেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অপমানিত মনে করিয়া প্রায়োপবেশনে মৃত্যু স্থির করিলেন। কর্ণ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ অশেষ রকমে প্রবোধ দিয়াও তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে "পাতালবাসী সেই ঘোর মূর্ত্তি দৈত্য দানবেরা তাঁহার সেই নিশ্চয় বোধগম্য করিয়া এবং স্বপক্ষের ক্ষয় হইবে জানিয়া তখন দুর্য্যোধনকে আহ্বান নিমিত্ত অগ্নি বিস্তার সাধ্য যজ্ঞ আরম্ভ করিল।" এই যজ্ঞে কৃত্যা নাম্নী এক দেবতা উদ্ভূত হইয়া দানবগণের আদেশক্রমে মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্য্যোধনকে পাতালপুরী আনয়ন করিলেন। তখন দানবেরা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে বলিতে লাগিল,—

"হে রাজন্, পূর্ব্বে আমরা তপস্যা দ্বারা তোমাকে মহেশ্বর হইতে লাভ করিয়াছি। হে অনঘ! তোমার সমুদায় পূর্ব্বকায় সমূহ বজ্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং উহা অস্ত্র শস্ত্র সকলের অভেদ্য। অপিচ দেবী পার্ব্বতী তোমার শরীরের পশ্চিমভাগ পুষ্পময় করিয়াছেন। * * * হে নরোত্তম! মহেশ্বর ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তোমার দেহ এইরূপে বিরচিত হইয়াছে। * * * অপর অসুরেরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরে অনুপ্রবেশ করিবে। * * * নিধন প্রাপ্ত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। * * * হে কৌরব তুমি বিনষ্ট হইলে আমাদের পক্ষ হীন হইয়া পড়ে; অতএব হে বীর! গমন কর, কোন ক্রমে অন্য বুদ্ধি করিও না; কেন না; পাণ্ডবেরা যেমন দেবতাদিগের, সেইরূপ তুমিই, আমাদের নিত্যকাল একমাত্র গতি।" আদিপর্ব্ব ২৫০, ২৫১ অধ্যায়।

এই উদ্ধৃতাংশে কি আমাদের মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে না? কৌরবপক্ষ যে দানবপক্ষ এবং মহেশ্বর যে তাহাদের শুভানুধ্যায়ী দেব, ইহা কি নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল না?

পাঞ্চালগণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে কাহার কাহার মত এই যে, ঋক্‌বেদে স্থানে স্থানে যে "পঞ্চজন" শব্দের ব্যবহার আছে, তাহাতে পঞ্চনদ অর্থাৎ পাঞ্জাব দেশের পঞ্চনদের তীরস্থ পঞ্চজাতিকে ("Five tribes") বুঝায়। ইহাদের গাঙ্গ্য প্রাদেশিক ঔপনিবেশিকগণ পাঞ্চাল নামে খ্যাত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ কুরুপাঞ্চালের সুনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাঞ্চালগণের বিদ্যালয়ের গৌরব, পুরোহিতগণের গৌরব, যজ্ঞের জাকজমক ইত্যাদি বিষয় ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারম্বার লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহায়মাত্র—কোন প্রধান পক্ষ বলিয়া বর্ণিত হন নাই। দ্রুপদ মরুৎগণ, দৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি, এবং দ্রৌপদী শচীর (যজ্ঞের) অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আদিপর্ব্বের ৬৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। রুদ্র যেমন কুরু-

গণের দেবতা, তেমন পাঞ্চালগণের দেবতা অগ্নি ও মরুৎগণ।

পাণ্ডবগণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আরও তমোবৃত। পণ্ডিতেরা বলেন, সমসাময়িক সাহিত্যে পাণ্ডবগণের উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রন্থ ললিতবিস্তারে পাণ্ডব নামে এক বর্ব্বর পার্ব্বত্যজাতির উল্লেখ আছে। আদি-পর্ব্বের ১২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব "শতশৃঙ্গ" অর্থাৎ "পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে" জন্মগ্রহণ করিয়া "বর্দ্ধমান" হইয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর চরিত্র যেরূপ তির্ব্বতীয় বহু পতি-গ্রহণ প্রথা আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বৌদ্ধ মত এবং পাণ্ডবগণের জন্মস্থান ও বৃত্তান্তের সহিত ঐক্য করিয়া বুঝিলে উঁহাদিগকে তির্ব্বতীয় ঔপনিবেশিক বলিয়া অনুভূত হয়। যে সময়ে গাঙ্গ্যপ্রদেশে কুরুপাঞ্চালগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন হিমালয়, মগধ, মালব, সিন্ধু ও গুজরাট প্রভৃতি স্থান অনার্য্যবসতি ছিল। যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে মহাভারতের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা হৈমালয়িক অনার্য্য পাণ্ডব-জাতিকে দ্রৌপদীর বিবাহ দ্বারা আর্য্যভাবাপন্ন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রৌপদী (১) অর্থাৎ শচী বা যজ্ঞপ্রথা গ্রহণ দ্বারা অনার্য্য পাণ্ডব আর্য্যকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, জনমেজয়পরীক্ষিৎ, ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রৌতসেন, চারি ভ্রাতা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যদি ইহা হইতেই পাণ্ডব চরিত্র কল্পিত হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা একবার ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—অনার্য্য আর্য্যীকৃত হইয়াছিলেন—পাণ্ডবগণ হিন্দুকৃত অনার্য্যজাতি।

পাণ্ডব চরিত্রই বর্ত্তমান মহাভারতে প্রধান ভাবে বর্ণিত; সুতরাং গাঙ্গ্যপ্রাদেশিক হিন্দুগণের প্রিয়তম দেব সকল পাণ্ডবচরিত্রে প্রতিফলিত। অর্জ্জুন ইন্দ্র, ভীম বায়ু,নকুল সহদেব অশ্বিদ্বয়, এবং যুধিষ্টির বরুণ বা ধর্ম্মদেব স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্য্যোধনকে কলি বা পাপ এবং তৎভ্রাতৃগণকে রাক্ষসাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (আদিপর্ব্ব ৬৭)। এই সকল প্রিয়তম বাক্য অবশ্যই এদেশের আদিম জাতিকে উপহার দেওয়া হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং দুর্য্যোধন চরিত্র বর্ত্তমান মহাভারতে দেশের অধিবাসী অনার্য্যজাতির চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। যে সকল আর্য্যগণ দেশের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, তাঁহারা রুদ্রাংশে বা অপ্রধানদেবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দুটী পক্ষ নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝা যাইতে পারে ;—

(১) আর্য্যপাঞ্চাল ও হিন্দুকৃত অনার্য্যপাণ্ডব।

(২) দেশীয়গণ বা অনার্য্যগণ ও আর্য্যকুরুগণ।

কিন্তু কেবল মনুষ্যগণের পক্ষাপক্ষ বুঝিলে তদানীন্তন সময়ের যুদ্ধের পক্ষাপক্ষ বুঝা যায় না। ট্রয়নগরের যুদ্ধে দেবগণ বিভক্ত হইয়া দুইপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাও যে অন্তবিধ নহে, তাহা প্রায় সকলেই জানেন। ইন্দ্র, অগ্নি,

(১) দ্রৌপদীকে মহাভারতে এক স্থানে শচী ও অন্য এক স্থানে স্বর্গ-শ্রীর অবতার বলা হইয়াছে। স্বর্গ-শ্রীভাবে শচী হিব্রুদিগের Sechinah তুল্য।

বরুণ, অশ্বিদ্বয় ও বায়ু প্রথম এবং রুদ্র, সূর্য্য, বসুগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলই বৈদিক দেবতা। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহার একটী পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাইবে।

১। আর্য্যপক্ষ।

অর্জ্জুন = ইন্দ্র
ভীমসেন = বায়ু
নকুল সহদেব = অশ্বিদ্বয়
যুধিষ্ঠির = বরুণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন = অগ্নি
দ্রুপদ
সাত্যকি
কৃতবর্ম্মা
বিরাট
} = মরুৎগণ
অভিমন্যু = বর্চ্চাঃ (চন্দ্র)
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র = বিশ্বদেবগণ ইত্যাদি

২। অনার্য্যপক্ষ।

দুর্য্যোধন = কলি (পাপ)
তাহার ভ্রাতৃগণ = পৌলস্তেয়গণ অর্থাৎ রাক্ষস
শকুনি = দ্বাপর (অসুর)
শৈল্য = প্রহ্লাদানুজ সংহ্লাদাসুর
ভগদত্ত = বাস্কলাসুর
সুবাহু = দানবশ্রেষ্ঠহর
বলিক = সুহর
উগ্রসেন = স্বর্ভানু
কাশীরাজ = দির্ঘজিহ্ব
জরৎসেন, সমুদ্রসেন ইত্যাদি = অষ্ট সংখ্যক কালেয়গণ

যে সকল আর্য্যগণ অনার্য্যপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভীষ্ম = অষ্টমবসু
ধৃতরাষ্ট্র = অরিষ্টাপুত্র গন্ধর্ব্ব হংস।
বসুসেন (কর্ণ) = সূর্য্য
দ্রোণ = ব্রাহ্মণস্পতি
কৃপ = রুদ্রাংশ
অশ্বত্থামা = মহাদেব (রুদ্রাংশ)
বিদুর = অত্রিপুত্র ধর্ম্ম ইত্যাদি।*

এক্ষণে বোধ হয় পাঠকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, কেন যুধিষ্ঠির চরিত্র প্রাতঃস্মরণীয়, কেনই বা দুর্য্যোধন চরিত্র মেকলেলিখিত দেশীয় চরিত্র অপেক্ষাও হীন।

পাণ্ডবগণের ন্যায় হিন্দুয়ায়িত অনার্য্য চরিত্রের প্রশংসা মহাভারতে নূতন, এমন বুঝিতে হইবে না। বেদেও এইরূপ একটী চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা আছে। আমরা পাঞ্চাবের সুদাস রাজার কথাই বলিতেছি। সুদাস রাজার যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ট পৌরহিত্য করিতেন এবং তাঁহার প্রশংসার্থে ঋক রচিত হইয়া উদ্গীত হইত। সুদাস দশজন অনার্য্য দস্যুকে পরাজিত করিয়া আর্য্যবসতিগুলিকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। বেদে সুদাস আর্য্য বলিয়াই বর্ণিত। কিন্তু তাঁহার নাম স্পষ্টতঃ অনার্য্য নাম এবং মহাভারতীয় সামাজিক ঘটনা যদি বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তবে "সৌদাসবনিতা স্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্তা" হইয়া অন্য পতি হইতে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন (আদিপর্ব্ব,২২ অঃ)। ইহা নিশ্চয়ই অনার্য্য ব্যবহার। সুতরাং সুদাস পাণ্ডবদের ন্যায় আর্য্যকৃত অনার্য্য।

ভারতীয় আর্য্যগণ যতই আস্ফালন করুন না কেন, ইহাঁরা পরাজয়ের কলঙ্কপসারা মস্তকে করিয়া পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। (১) ভারতে আসিয়া কতক ক্ষমতা বিস্তার

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৭ অধ্যায় হইতে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

(১) "It may offend the self-love of the

করিতে সমর্থ হইলেও অনার্য্য সহায়তাই এই ক্ষমতা বিস্তারের প্রধান কারণ। সুদাসের দ্বারা পাঞ্জাবে এবং পাণ্ডবগণের দ্বারায় গাঙ্গ্যপ্রদেশে রাজ্যবিস্তার এবং বৌদ্ধ বিপ্লবের পর রাজপুতগণের সাহায্যতায় পুনরায় হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপন সকলই একবিধ ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সর্ব্বত্রই আর্য্যকৃত অনার্য্যের প্রভাবে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপন। কিন্তু আজকাল এ দেশে কৃষ্ণ, অতি কৃষ্ণ, ঘোরকৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামাঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের ব্রাহ্মণ-প্রমুখ আর্য্যগণ এই সার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের কৃষ্ণচর্ম্মত্বের সহিত মানসিক আর্য্যত্ব এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, আজ আর তাঁহারা অনার্য্যের জলগ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহাই কৃতজ্ঞতা! কৃতজ্ঞতা!! কৃতজ্ঞতা!!! আর ইহারই ফল অধীনতা! অধীনতা!! অধীনতা!!!

দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ন্যায় কালাপাহাড়ত্ব করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ লেখকগণ তাঁহাকে একটা অদ্ভুত মাংসপিণ্ড হইতে লব্ধজন্ম ও জন্মকালে গর্দ্দভশব্দ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহার প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার একত্র সমাবেশ করিলে আর একখানি পুস্তক হইয়া উঠে। আমাদের পাঠকেরা ইহা সবিশেষ অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, দুর্য্যোধন যখন দেশীয় চরিত্রের প্রতিকৃতি, তখন তাঁহার দেশীয় প্রাধান্য, দেশীয় ধর্ম্ম

Brahmans to be told that the celestial wars (between Indo Aryans and Iranians) resulted in the final overthrow of Indra or in other words that their ancestors were expelled from their ancient-home by the followers of Asuras." Dr. Ragendra Lal Mitra's Indo Aryans XV.

ও সমাজ রক্ষা করিতে যত্ন অতীব সঙ্গত হইয়াছিল। পুরাণে তাঁহার চরিত্রকে পঙ্কিল মনে করুক, ইতিহাস এই দেবোপম চরিত্রের মূল্য ভুলিতে পারিবে না। কে বিদেশাগত ধর্ম্মভাব, বৈদেশিক কর্তৃত্ব প্রবল হইতে দিতে পারে? প্রাণ থাকিতে ইন্দ্রের প্রাধান্য ও রুদ্রের অপমান হইতে দেওয়া যাইবে না; প্রাচীনতম বিশ্বাস, প্রাচীনতম ধর্ম্ম ও লৌকিক ব্যবহার হইতে কিছুতেই স্খলিত-পদ হইতে হইবে না; কিছুতেই "সূচাগ্র ভূমি" আক্রমণকারী সভ্যতার নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না;—এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধন হৃদয়ে চিরদিন জাগরুক ছিল। দুর্য্যোধন চরিত্রে তদানীন্তন নব্য মতের প্রাদুর্ভাব না থাকিতে পারে কিন্তু দুর্য্যোধন চরিত্র প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা ও মহত্বের লীলাভূমি।

দুর্য্যোধন স্বর্গীয় চরিত্র। মানুষ তাঁহার প্রশংসা করুক আর নাই করুক, দেবগণ তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রিবিষ্টপে (ত্রিবিষ্টপ স্বর্গে) গমন পূর্ব্বক শ্রীসম্পন্ন দুর্য্যোধনকে দীপ্যমান দিবাকরের আসনে সমাসীন দর্শন করিলেন। তিনি তৎকালে বীর শ্রীসমাবৃত এবং দীপ্যমান দেবগণ ও পুণ্য কর্ম্মশীল পুরুষগণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন।

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, ১ম অধ্যায়।

"এত কষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠির গিয়া প্রথমতঃ দেখেন, দুর্য্যোধন ইতঃপূর্ব্বেই উৎকৃষ্ট স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে বলিলেন, "আমি অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধনের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতে কামনা করি না।" (ঐ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির! বাস্তবিক তুমি ঐ স্বর্গের উপযুক্ত নও। গাল্পিকগণ তোমাকে সহস্র স্বর্গ প্রদান করুন, ইতিহাস তোমাকে প্রশংসা করিবে না। দেবগণ ও ইতিহাস দুর্য্যোধনের জন্য স্বর্গ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

আর একখানি ফটো

কৌমার-সীমা প'রে
দাঁড়ায়ে ধীরে,
কপোল করে রাখি,
প্রসারি চারু আঁখি,
ফিতেতে এলো চুলে
বাঁধিয়ে শিরে,
বুজিয়ে ঠোঁট দুটি,
নয়নে আলো ফুটি,
বল না, কি দেখিছ
অলসে চেয়ে, —
কিশোর-মুখ-'পরে
অফুট-ভাব-ভরে
ঈষৎ গভীরতা
পড়েছে ছেয়ে ;
তরুণ ও বয়ানে
এখনো কোনখানে
ভাবনা-জাত রেখা
পড়েনি, বালা,
তবুও মনে হয়
যেন গো ও হৃদয়
কি যেন ভাবাবেশে
আপনা ভোলা ;
তাহারি ছায়া যেন
ছড়ায়ে মুখে হেন,
এ চারু নিথরতা
মেখেছে তায়,
নবীন-ভাব-মেলা
কেমনে করে খেলা
দেখিতে যেন আঁখি
ভিতরে চায় !

বাহির জড়-শোভা,
বালিকা-মনোলোভা,
ভুলিয়ে এবে, কি গো,
কিশোরী নারী,
হৃদয়ে লালসার
কুঁড়িতে কি বাহার,
দেখিছ আনমনে
সুষমা তারি ?

২

আধেক ঘুমঘোর
পরাণ ব্যাপি,
নয়নে আধো আলো
ফোটেনি করি ভালো,
শরীর আধো ঢলে
মধুরে কাঁপি ;
ত্রিদিব কি আঙুলে
পরশি হৃদি-মূলে,
ঘুমানো বীণা-তারে
জাগায় গান,
অস্ফুট কলনাদে
শুনিয়ে, অবসাদে
ঈষৎ চমকিয়ে
শিহরে প্রাণ !
করিয়ে প্রেম-আশা,
কহিতে প্রেম-ভাষা,
মলয় যবে ছাড়ি
অলস বায়,
মধুতে ফুটি-ফুটি
মালতী-পাশে জুটি,
ছুঁয়ে না ছুঁয়ে যথা
কাঁপায়ে যায়!

এ নব ভাবগুলি
যদি গো লয়ে তুলি
ফলাতে চারু রঙে
বাসনা রাখি,
বল, কি সুষমার
বরণ করি ধার,
সাজায়ে মনোমত
যতনে মাখি ?—
তরুণ উষাবালা
রূপেতে করি আলা,
নয়ন আধো মেলি
যথন চায়,
চরণে ফুল লুটে,
বরণ নভে ফুটে,—
এ ভাবগুলি গড়া
তাহারি ভায়!

৩

নয়ন আধো-ফোটা,
নলিন-কলি,
আলোকাঁধারে ছেয়ে,
অলসাবেশে চেয়ে,
বল না কি দেখিছ
আপনা ভুলি ?—
সুমুখে, আঁখি-কাছে,
কি চারু শোভা আছে,
অথবা মনোমাঝে
ফুটেছে ফুল ?
দেখিছ যে সুষমা,—
ত্রিদিবে অনুপমা,—
বাহিরে তা, না, ঘিরি
হৃদয়-মূল ?
অথবা হৃদি-কোলে
যে কলি ফোটে বোলে,
তাহারি প্রতিছায়া
বাহিরে আসি,

প্রকৃতি-জড়-কায়
ঘিরেছে সুষমায়,
মধুর ঢালি তায়
নিজের হাসি ?
তারি কি উষা-মাখা
শোভায় দেছে ঢাকা
সাধের ধরাখানি,
গোলাপে যেন ?
সুরভি তারি শ্বাসে
মাখিয়ে ফুল-বাসে,
অনিল নভঃ-পথে
চলিছে হেন ?
শশীর সু-আননে,
নিশির তারাগণে,
এ নব মধু জ্যোতিঃ
তাহারি ভাসে ?
বিমল বেলা-থরে,
কমল কলি'পরে,
এ নব বিহ্বলতা
তাহারি হাসে ?

৪

স্বপন-ঘোর কেন
নয়ন-কোণে ?
পরাণে নব আশ
হতেছে পরকাশ,
কাঁপায়ে মূল তার
মধুর দোলে!
সোনালী কুয়াশায়
হৃদয় সমুদায়
ঘিরেছে, চারিধারে
বরণ ফুটি,
অফুট পরীনারী
গোলাপী ডানা পরি,
চকিতে তার মাঝে
বেড়ায় ছুটি!

শ্বাসটি না ফেলিতে,
মিলায় সোনালীতে,
আবার ফিরে আসে
নূতন সাজে,
চকিতে মিশে যায়,
ঝলকি শশী-ভায়,
পলক না পড়িতে,
কুয়াশা-মাঝে !
কুহক-খেলা-মত,
মূরতি আনে কত,—
কখন গড়ে যেন
কুসুম ইষু;
ভ্রমর-গুণ দিয়ে,
চূতের ধনু নিয়ে,
কখন খেলে যেন
মদন-শিশু ;
রচিছে বা কখন
রুচির উপবন,
খচিত ফুল-দলে,
মুখর অলি,
যমুনা, প্রেম-প্রায়,
মাঝেতে বহে যায়,
চাঁদের চুমে ঢেউ
পড়িছে ঢলি !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র ।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি (৩) ।

ব্যবস্থা দ্বারা উন্নতি ।

ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনের উপায় সকল অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য, এই বলিয়া যদি দেশীয় লোক উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে উন্নতির পথে অনেক প্রকার বাধা আছে। দেশীয় লোকের কি কারণে স্বাধীন ভাবে এ সকল বিষয়ে মতামত সংগঠন করা আবশ্যক, তাহা এক্ষণে বিবেচ্য। এ সকল বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও মত সর্ব্বতোভাবে স্বার্থশূন্য না হওয়া সম্ভব। ইউরোপীয়েরা মুসলমান রাজপুরুষদিগের ন্যায় যদি এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ মত পাওয়া যাইত। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশের সম্বন্ধ প্রধানতঃ বাণিজ্য ঘটিত, এইজন্য এই সম্বন্ধ নিতান্ত শিথিল। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া শিল্প কার্য্যের প্রবর্ত্তনায় এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু শিল্পকার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া ইউরোপীয় বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলি উপলক্ষে কত শত ঢনাঢ্য ব্যক্তি শিল্প-উন্নতির আয়োজনে অর্থ দানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই সকল অর্থ প্রায় সংগ্রহই হইল না। ইহার কারণ এই যে, দেশীয় লোক এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞান এবং ইউরোপীয়েরাও এ বিষয়ে উদাসীন। বাস্তবিক কৃষি-শিক্ষার পক্ষে এদেশের সহিত ইউরোপীয় সম্বন্ধ একটী বিশেষ বাধা। কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথে এই সম্বন্ধ যে কিরূপ বাধা, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখান যাইবে।

ইংলণ্ডের কৃষকেরা প্রতিবৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ হাড় সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জমীতে যত প্রকার সার ব্যবহার হইয়া থাকে, হাড় তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অস্থি-চূর্ণ ও অস্থি-দ্রব (Dissolved bones) ইংলণ্ডে ন্যূনাধিক ৫৲ মণ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। যে ২৫ লক্ষ মণ হাড়ের সার ইং-

লণ্ডে ব্যবহার হয়, তাহার মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ মণ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়। তৈল-প্রদ বীজ হইতেও উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এই সকল বীজও প্রতিবৎসর বহুলপরিমাণে (প্রায় ৬ কোটী টাকার) অন্য দেশে চালান হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত গোধুম, চাউল ও চা, এই তিন সামগ্রীর রপ্তানি দ্বারাও জমীর অনেক ক্ষতি হইতেছে। এদেশে যে সমস্ত পদার্থ আমদানি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে জমীর সার বৃদ্ধি হয়, এমন কোন পদার্থই নাই। এদেশ হইতে ইউরোপ খণ্ডে যে সমস্ত বস্তু রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই মুখ্য অথবা গৌণভাবে ভূমির তেজঃ সম্পাদন করে। যে সকল উপাদানের ব্যবহার দ্বারা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের জমী ভারতবর্ষের জমীর দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক শস্য প্রদানে সমর্থ হয়, ঐ সকল উপাদান অসভ্য ও অজ্ঞান জাতিদের নিকট হইতে আহরণ করিয়া সভ্যজাতিরা স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন। এই সকল ব্যবসায় সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতিদের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া ইউরোপীয়দিগের নিকট কখনই আশা করা যায় না। এই সকল বিষয় লইয়া দেশীয়দিগের আন্দোলন, সমিতি ও দৃঢ়বদ্ধ সংকল্প যে কতদূর আবশ্যক, তাহা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যে রাজপুরুষদিগের সাহায্য পাওয়া যাইবে না, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে মীমাংসা করা এত দুরূহ যে, শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্য ব্যতীত ইহা কখনই সম্পন্ন হইবে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেরই এক অংশ, ভারতবর্ষের হীনতায় ইংলণ্ডের হীনতা, ভারতবর্ষের বলে ইংলণ্ডের বল, সাম্রাজ্যের স্বল্পাংশের উন্নতি বৃহদাংশের অবনতি দ্বারা সাধিত হইলে সমগ্র সাম্রাজ্য হীনবল হয়, এবম্বিধ জ্ঞান উচ্চপদাভিষিক্ত ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের অনেকেরই আছে। কিন্তু তাঁহারা সংকল্পে দেশীয় সহায়তা না পাইলে উক্ত দুরূহ বিষয় সকলে হস্তক্ষেপ করিতে কখনই সাহস করিবেন না। ব্যবস্থাপক-উন্নতি সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই এরূপ আভাস দেওয়া গিয়াছে যে, অস্থি-সংরক্ষণ ও অস্থির সার ব্যবহার, কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে এক প্রধান সোপান। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আরও বুঝা গিয়াছে যে, অস্থি সংরক্ষণ বিষয়ে এদেশের সাধারণ ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আপত্তি হইবারই সম্ভাবনা। এ বিষয়ে, দেশীয় আন্দোলন ও ব্যবস্থাপক সভার সুদূরদর্শিতা ও ন্যায় বিচার, এই দুইটী ভিত্তির উপর নির্ভর আবশ্যক। ব্যবস্থাপক সভায় ইউরোপীয় মত প্রবল হইলেও অবিচার আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজের পক্ষে ব্যবস্থা অতি পবিত্র বিষয়। ব্যবস্থা দ্বারা বিধিমতে ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করা ইংরাজ রাজের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন। ইংরাজ যেরূপ জাতিগত মান অপমান জ্ঞানে কার্য্য করেন, অন্য কোন জাতি এরূপ করেন না।

এ স্থানে উল্লেখ করা উচিত যে, ব্যবস্থা দ্বারা অস্থি-ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ বিষয়ে ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবের সম্পূর্ণ অমত। ডাক্তার ভল্‌কারের মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতে না পারিলে যে এ বিষয়ে ব্যবস্থার কিছুমাত্র আশা নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রায় ১০,০০০৲ টাকা খরচ করিয়া ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবকে এদেশে আনাইয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষি-উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার মত ভ্রমাত্মক,

এ প্রতীতি যে গবর্ণমেণ্টের সহজে জন্মিবে, ইহা আশা করা যায় না। একারণ, অস্থি-রপ্তানি সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা বিশেষ আবশ্যক। ডাক্তার ভল্‌কারের প্রধান যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের ভূমিতে ইংলণ্ডের ভূমি অপেক্ষা অধিক ফস্‌ফরাস আছে এবং অস্থির প্রধান উপাদানই ফস্‌ফরাস। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ হইতে অস্থি রপ্তানি দ্বারা ভারতবর্ষের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, অথচ ইহাদ্বারা ইংলণ্ডের বিশেষ লাভ আছে। এই যুক্তির পোষণার্থে তিনি বলেন যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যমুনার নিকটবর্ত্তী কোন এক কার্পাসের জমির মৃত্তিকা হিলসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ জমীতে শতকরা ·১১ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ বিদ্যমান। আবার উক্ত হিলসাহেব কানপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের জমিতে শতকরা ·৫১ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ আছে, দেখিয়াছেন। ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব নিজে, পাঞ্জাব প্রদেশস্থিত সীর্সা নামক স্থানের গোধুমের জমী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন স্থানে শতকরা ·১৭, কোন স্থানে বা ·১৯, আবার কোন স্থানে বা ·২৩ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ বিদ্যমান। ইংলণ্ডের অনেক জমীতে ইহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ আছে।

যে ব্যক্তির কৃষি রসায়ন সম্বন্ধে অতি সামান্য ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছে, সেও বলিতে পারে যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের জমিতে ফস্‌ফরাস আদি সম্বলিত খনিজ (Inorganic) পদার্থের ভাগ অধিক ও উদ্ভিজ্জাদি (Organic) পদার্থের ভাগ অল্প। উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাবের মনুষ্য, গো, প্রভৃতি যে সকল জন্তু উদ্ভিজ্জ বস্তু আহার করিয়া থাকে, তাহাদের আকার ও অবয়ব দেখিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অস্থি প্রস্তুতকারক খনিজ পদার্থ সকলের অভাব ঐ দেশে নাই। আবার কার্পাস ও গোধুম জন্মিবার জন্য যে ভূমি বিশেষ উপযোগী, সে ভূমিতে যে স্বভাবতঃ ফস্‌ফরিক এসিডের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহাও কৃষি রাসায়নিকদিগের অবিদিত নাই। বঙ্গদেশ ও বোম্বাই অঞ্চল হইতে যে যে স্থানে চালানের জন্য অস্থি সংগ্রহ হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানের জমীর ও শস্যের অবস্থা, ও মনুষ্য গবাদি জন্তুর অবয়ব দেখিলে বোধ হয় যে, এই দুই প্রদেশের জমিতে ফস্‌ফরিক এসিডের বিশেষ অভাব আছে। আত্মমত পোষণার্থ এই দুই প্রদেশের মৃত্তিকা পরীক্ষা না করিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের বিশেষ বিশেষ জমীর পরীক্ষা করিয়া, ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব যে ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার কেবল "ছেলে ভুলান" মাত্র হইয়াছে। বিলাতে যে হাড় চালান যাইতেছে, তাহা যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব দেশ হইতে যাইত, তাহা হইলেও বা কথা থাকিত; কিন্তু প্রায় সমস্ত হাড়ই বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে চালান হয়।

ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় ফস্‌ফরিক্ এসিডের ভাগ অধিক, এই মত ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে, বোধ হয়, ডাক্তার ভল্‌কার স্থির করিয়াছেন, এদেশে কৃষি-রসায়নবিৎ কেহই নাই। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কৃষি-রাসায়নিক পণ্ডিত ব্যারণ লিবিগ্‌ এর ছাত্র ফ্রট্‌কি সাহেব বোম্বাই নগরে অনেক কাল ধরিয়া কৃষি-রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছেন। ইহার মত ডাক্তার ভল্‌কারের মত অপেক্ষা ন্যূন মূল্যের নহে। ফ্রট্‌কি সাহেব লিখিত

"ভারতবর্ষের উপযোগী বৈজ্ঞানিক কৃষি-বিধি" (The principles of Rational Agriculture applied to India) নামক গ্রন্থ হইতে কতকগুলি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, তাঁহার মত ডাক্তার ভল্কারের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

"Phosphoric acid forms fully 50 per cent of the ashes of all the edible grains."

"It is a well-known fact that phosphoric acid is one of those substances the restoration of which to the fields has been totally neglected in India."

"It may not be out of place here to draw attention to the export of bones from India, which is steadily on the increase. It is really a matter of deep regret that India's stores of this most important manure, which she herself needs so sadly, should be thus gradually withdrawn to fertilise the soil of a foreign country which has to spend now several millions sterling annually in order to repair the agricultural waste that preceding generations have been guilty of." "India, I say, cannot afford to lose a particle of this most essential aliment for her grain crops."

"The richest soil of the Deccan contains at present only ¼lb of Phosphoric acid in every 100 lbs of soil."

"From two analyses of rice grown in Italy and south America which I have before me I find that both their ashes contain 63 per cent of phosphoric acid, while those of rice which was grown near Bombay, on what is considered an average fertile soil, yielded me only 52 per cent. It would appear from this that the comparative sterility of our fields is to a great extent due to the want of Phosphoric acid, a substance which has been taken away year after year without any restoration. To ensure a good and abundant crop of rice the plants should be able to take up 63 per cent. of Phosphoric acid from the soil, the roots must find within the radius of their assimilating powers 63 per cent. while my analysis shows that only 52 per cent are available."

"Bone-manure has contributed more to the large out-turns of the soils in Europe, than any of the other improvements that science has recommended to the agricueturist."

"The practical agriculturist in choosing between bonedust and superphosphate of lime, will be guided by the objects he has in view,—whether that is, he wishes immediate or prospective results and intends growing plants that are surface or sub-soil feeders."

"Bone-dust is most effective two or three years after application."

ডাক্তার ভল্কার সাহেবের আর এক বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। কেবল ফস্ফরিক এসিডের অভাব হইলেই যে অস্থি-সারের দ্বারা উপকার দর্শে, এরূপ নহে। যবক্ষারজান, ক্ষার ও চূণ, ফস্ফরিক এসিড্ ভিন্ন আর যে তিনটী বিশেষ সারবান বস্তু আছে, ঐ তিন বস্তুই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অস্থিতে বিদ্যমান। বাস্তবিক গোময় প্রভৃতি সাধারণ সারের ন্যায় অস্থিকেও সাধারণ সারের মধ্যে গণ্য করা যায়, অর্থাৎ জমীতে যে কোন পদার্থেরই অভাব হউক না কেন, অস্থি সার দ্বারা সেই অভাব কিছু না কিছু পরিমাণে পূর্ণ হয়। সাধারণ সার ও বিশেষ সারের মধ্যে এই প্রভেদ যে, বিশেষ সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে কোন কোন স্থলে কিছুই উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। যে সকল জমীতে সোরা জন্মে, ঐ সকল জমীতে যদি সোরা সাররূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উহাদের ফসল "জ্বলিয়া" যাওয়া সম্ভব। যে সকল জমী নিতান্ত নিস্তেজ ঐ সকল জমীতে চূণ অথবা নাইট্রেট্ অব্ সোডা সাররূপে ব্যবহার করিলে, জমী আরও নিস্তেজ হইয়া যায়। গোময়, গলিতপত্র, পুষ্করিণীর মাটী, অস্থির গুঁড়া, এই সকল সার ব্যবহারের দ্বারা উপরোক্তরূপে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যে সকল সারের দ্বারা স্থান বিশেষে উপকার ও স্থান বিশেষে অপকার হয়, ঐ সকল সারের নাম "বিশেষ সার।" যে সকল সারের দ্বারা কোন স্থলেই ক্ষতি হয় না এবং সর্ব্ব স্থলেই কিছু না কিছু উপকার হয়, সেই সকল সারের নাম "সাধারণ সার।"

অন্যান্য সাধারণ সারের অপেক্ষা অস্থি-সার উৎকৃষ্ট, কেন না অল্পায়তন মধ্যে অস্থিতে যেরূপ সারবান পদার্থ সকল আছে, এরূপ অধিক পরিমাণ সারবান পদার্থ সকল আর কোন সাধারণ সারে নাই। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, ১০০ মণ গোময় দ্বারা জমীর যে উপকার হয়, ৪ মণ হাড়ের গুঁড়ার দ্বারা তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। অস্থি-সারের সমস্ত উপকার প্রথম বৎসরেই বাহির করিয়া লইতে হইলে,উহাকে গন্ধক দ্রাবক দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যদি ৩।৪ বৎসর ধরিয়া উপকার পাওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে অস্থি চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। অস্থি চূর্ণ না করিয়া যদি অমনই ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হয়, তাহাতেও কিছু উপকার আছে। ঐ উপকার স্বল্প কিন্তু বহুকালব্যাপী। বস্তুতঃ অস্থি অস্পৃশ্য পদার্থ বলিয়া যদি গ্রামে উহা কেহই স্পর্শ না করে এবং না করিতে দেয়, তাহা হইলেও দেশের সামগ্রী দেশেই থাকিয়া যায় এবং স্বাভাবিক নিয়মে কালসহকারে ধীরে ধীরে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুকালব্যাপিয়া শস্যের কিছু না কিছু উপকার করে। গো-ভাগাড়গুলিন জমীদারদিগের খামার ; ঐ সকল গো-ভাগাড় হইতে কেহ গ্রামের বাহিরে অস্থি লইয়া না যায়, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব আরও বলেন যে,ভারতবর্ষের পক্ষে অস্থি উত্তম সার, এ বিষয় পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে হইবে ; এমন কি, প্রত্যেক কৃষককে, আপন আপন ক্ষেত্রে অস্থির সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, ক্ষেত্রগুলির রাসায়নিক অবস্থা স্থির করিয়া লইতে হইবে। ভবিষ্যতের গর্ভে এদেশের কপালে যে কি রাসায়নিক বিপ্লব লিখিত আছে তাহা এক্ষণে কাহারও বলিবার উপায় নাই. কিন্তু ভল্‌কার সাহেব আমাদের দেশের কৃষকদিগের যেরূপ রাসায়নিক করিয়া তুলিতে চাহেন, আজিও ইংলণ্ডের ধনাঢ্য কৃষকেরা সেরূপ রাসায়নিক অবস্থায় উপনীত হয়েন নাই। সে যাহা হউক, হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারের পথে যদি ১৬৲ টাকা "ফি"রূপ মহাকণ্টকের ব্যবস্থা হয়, তবে এদেশের কৃষকেরা ঐ পথ দিয়া কেহই হাঁটিতে চাহিবে না, এবং কলিকাতা ও লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা অবাধে ভারতবর্ষের হাড় লইয়া টাকার ভেল্কি খেলিতে থাকিবেন।

ডাক্তার ভল্‌কার আরও বলেন যে, ইংলণ্ডেরও প্রত্যেক জমীর জন্য হাড়ের গুঁড়া উপযুক্ত সার নহে এবং কোন কোন কৃষক এ কারণে উহার পরিবর্ত্তে সুপার ফসফেট অব্ লাইম্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপার ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম্ কি পদার্থ, ইহা যদি পাঠক শুনেন, তাহা হইলেই বুঝিবেন, ভল্‌কার সাহেবের এই যুক্তির কি মূল্য। অস্থির গুঁড়া অথবা কপ্রোলাইট্ অভিহিত খনিজ অস্থিময় পদার্থের গুঁড়া গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা ভাবান্তর করিয়া লইলেই সুপার ফস্‌ফেট অব্ লাইম্ প্রস্তুত হয়। "ঠাকুর-ঘরে কে ? আমি তো কলা খাই নাই," এইরূপ যুক্তি দ্বারা ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব আপনাকেই আপনি ধরা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলি দ্বারা যে সকল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া অস্থির সারবত্তা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। ফলতঃ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা সার্‌চার্লস্ এলিয়ট গত বৎসরে কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধীয় ম-

স্তবো প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাবতীয় কৃষি-পরীক্ষার মধ্যে অস্থির ব্যবহারের দ্বারাই অধিক সুফল হইয়াছে, এবং তাঁহার মতে অস্থি চূর্ণ করা ও ব্যবহার করা জেলসমূহ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার ভল্‌কারের আর একটী যুক্তি এই, সমস্ত ভারতবর্ষ কুড়াইয়া ৯ লক্ষ মণ হাড় চালান হয়। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র দেশ বলিয়াই ইহার সমূহ উপকার হইতেছে। বিশাল ভারতবর্ষে ঐ অস্থি ছড়াইয়া থাকিলে তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই নাই। প্রত্যেক কৃষক অতি সামান্য পরিমাণ অস্থিও যে সংগ্রহ করিয়া ও উহাকে সারে পরিণত করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উপকার পাইবে, তাহারও সম্ভব নাই। অন্যদিকে দেখিতে গেলে, অস্থি সংগ্রহ দ্বারা এক্ষণে গ্রামের কোন কোন ডোম্ বা মুসলমান কিছু কিছু লাভ করিয়া থাকে; অস্থি চালানের ব্যবসায় উঠিয়া গেলে এই সকল গরিবের ক্ষতি মাত্র হইবে। অর্থাৎ যে বাণিজ্য দ্বারা অনেকেরই লাভ আছে এবং কাহারও কিছু ক্ষতি নাই, এরূপ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। ডাক্তার সাহেবের এই যুক্তিও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ডোমে ও মুসলমানে কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগকে যে হাড় দুই বা তিন আনা মণ দরে বিক্রয় করে, সেই হাড় যদি তাহারা সাররূপে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহারা দুই তিন আনার পরিবর্ত্তে পাঁচ ছয় টাকা উপায় করিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিলাতে এক মণ হাড়ের সারের দাম পাঁচ টাকা হওয়া সম্ভব, কেন না সে দেশে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ। সে দেশে পাঁচ টাকার সার দিয়া যে অধিক শস্য হইবে, সেই অধিক শস্যের মূল্যও পাঁচ টাকার অধিক। বিলাতে কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য সকল মহার্ঘ নহে। এ দেশেও গোধুম, আলু ও দুগ্ধের যেরূপ দাম, বিলাতেও সেইরূপ দাম। এ কারণ বিলাতে যদি হাড়ের সারের দাম ৫৲ টাকা মণ হয়, এদেশেও উহার দাম ৫৲ টাকা মণ ধরা যায়, অর্থাৎ এক মণ হাড়ের সার ব্যবহারের দ্বারা ৫৲ টাকার শস্য বৃদ্ধি হয়। হাড়ের রপ্তানি যদি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সমভাবে হইত, তাহা হইলে ডাক্তার ভল্‌কারের উপরোক্ত যুক্তির কিছু পোষকতা করিতে পারা যাইত। কিন্তু রপ্তানি প্রতি বৎসর প্রায় একই স্থান হইতে, অর্থাৎ রেলের রাস্তার দুই ধারে দুই তিন ক্রোশ স্থান হইতে চলিতেছে। রেলের দুই ধারের জমী হইতে এত হাড় রপ্তানি হইয়া গিয়াছে যে, এক্ষণে এই সকল স্থানে হাড় আমদানি করিবার কোন বন্দোবস্ত আবশ্যক। রাসায়নিক পরীক্ষায় যে যে ভূভাগে ফস্‌ফরিক এসিডের পরিমাণ শতকরা ·২৫ এর অধিক সাব্যস্ত হইবে, সেই সেই ভূভাগ হইতে রেল পথে অস্থি আনয়ন করিয়া যে যে ভূভাগ হইতে অস্থির রপ্তানি চলিতেছে সেই সেই ভূভাগে সংগ্রহ করা আবশ্যক। সার্ চার্লস্ এলিয়টের প্রস্তাব অনুসারে এই সকল সংগৃহীত অস্থি যদি কারাগার সমূহে চূর্ণ বা দ্রবীভূত হইয়া ব্যবহার ও বিক্রয় হয়, তাহা হইলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হয়।

ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবেরও মত, কৃষকদিগের সার প্রাপ্তির কোন সু-বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক গ্রামের নিকটে জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণের জন্য এক একটী অরণ্য গবর্ণমেণ্টের করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ হ-

ইলে কৃষকেরা গোময় জ্বালাইবার কারণ ব্যবহার না করিয়া সাররূপে ব্যবহার করিবে। প্রস্তাবটী মন্দ নহে, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা বহুকাল ও বহু ব্যয় সাধ্য। ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, বোম্বাই ও বঙ্গদেশের জেলসমূহে ঐ অস্থি-চূর্ণ বা দ্রবীভূত করিয়া, অস্থি সারের ব্যবহারের উদ্যোগ করা যাইতে পারে। অস্থি-সার সুপ্রাপ্য হইলে, প্রথমে জেল উদ্যানে, তৎপরে মুসলমান কৃষকের ক্ষেত্রে, ক্রমশঃ হিন্দু কৃষকের ক্ষেত্রে, এইরূপে ইহার ব্যবহার শীঘ্রই প্রচলিত হইয়া পড়িবে। অস্থি চূর্ণ ব্যবহারে বিশেষ আপত্তি কোথাও কখন দেখি নাই; কোন কোন স্থলে বিশেষ আগ্রহও দেখিতে পাওয়া যায়। আপত্তির মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতাই প্রধান। ক্রমশঃ যদি প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় অস্থি চূর্ণ করিবার বন্দোবস্ত হয়, তবে এই বহুমূল্য সার কৃষকদিগের পক্ষে অনায়াসলব্ধ হইয়া পড়িবে।

অস্থির ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে যে বাধা উপস্থিত হইবে, তৈলপ্রদ বীজের ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ করায় তাহার শতগুণ অধিক বাধা উপস্থিত হইবে। তৈলে জমীর পক্ষে সারবান পদার্থ অল্পই আছে এবং তৈলের রপ্তানির উন্নতিতে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই। কিন্তু তৈলপ্রদ বীজ দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। এদেশে বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া, খৈল এদেশে রাখিয়া, তৈল রপ্তানি করা যাইতে পারে। খৈল অস্থির ন্যায় তেজস্কর সার নহে, কিন্তু গোময় অপেক্ষা অধিক তেজস্কর। খৈলের ব্যবহারে গুণের বিষয়েও কৃষকেরা অনভিজ্ঞ নহে।

ভারতবর্ষ হইতে যে যে সামগ্রী রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে গোধুম, চাউল, তিসি, সর্ষপ, তিল, চা ও অস্থির রপ্তানি দ্বারা জমীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতেছে। এই সমস্ত সামগ্রীই দেশে রাখিয়া, ব্যবহারের উপায় না থাকিলেও ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ যে ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা নহে। অস্থির ও খৈলভাগের রপ্তানি ব্যবস্থা দ্বারা একেবারে বন্ধ হওয়া আবশ্যক। আর আর সামগ্রীর পরিবর্ত্তে এমন সকল সামগ্রীর আমদানী হওয়া আবশ্যক, যেন সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে জমীর উপকার সাধিত হয়। অন্য দেশ হইতেই যে সারবান পদার্থ আহরণ করিতে হইবে, তাহাও নহে। এদেশেই কোন কোন প্রদেশে সোরা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কোন কোন প্রদেশে শম্বুক, অস্থি ইত্যাদি ফস্‌ফরাস সম্বলিত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কোথাও বা ঘুটিং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পড়িয়া আছে। এই সকলের ব্যবসায় আরম্ভ হওয়া উচিত। ব্যবস্থা দ্বারা কোন কোন রপ্তানি বন্ধ করিয়া কৃষিকার্য্যের কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা দ্বারা নূতন নূতন ব্যবসায় স্থাপন করা অথবা আমদানি আরম্ভ করা বাতুলের প্রস্তাব। তৈলপ্রদ বীজের ব্যবসায় অস্থির ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বিশাল; কিন্তু ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবেরও মত, ঐ সকল বীজের খৈল-ভাগ দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে, এ কারণ এ বিষয়ের সামান্য উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

জাতিভেদ এবং ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু। (২)

নব্যভারতের গত সংখ্যায় "নূতন ব্রাহ্মণ রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে,—১। জাতিভেদ প্রাচীনকালে যে আকারে ও অবস্থায় ছিল, তাহাতে, তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা ছিল।

২। বর্ত্তমানকালে জাতিভেদ প্রথা যেরূপ বিকৃত ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তাহাতে তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজন ও উপকারিতা নাই।

৩। ইংরাজ শাসনে, বর্ত্তমান অবস্থায়, প্রাচীন কৌলিক জাতিভেদ পুনরুদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। তাই, এখন জ্ঞানী, গুণী ও সাধুজন মাত্রকেই ব্রাহ্মণ মানিয়া, এক প্রকার নূতন জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত করিয়া, "নূতন ব্রাহ্মণ-রাজ্য" সংস্থাপিত করিতে হইবে।

ঐ প্রবন্ধে আমি আরও দেখাইয়াছি যে, ভূদেববাবু বর্ণ বা বংশ-পার্থক্যকে হিন্দুজাতিভেদের বিশেষত্ব বিবেচনা করিয়া প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে জাতিভেদ-প্রথার সহিত ধর্ম্মের দৃঢ়বন্ধনই হিন্দু জাতিভেদ প্রথার বিশেষত্ব। কোন না কোনও ভাবে সকল দেশেই, চিরকাল জাতিভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু অন্য দেশে জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের যোজনা নাই। হিন্দু জাতির ভিতরে তাহা আছে। হিন্দু জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের বজ্রবন্ধনীতে রক্ষিত। এমন কি জাতিভেদই যেন হিন্দুধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সম্প্রতি মহীশূরের আদম সুমারি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত নরসিম্মিয়েঙ্গারও (Narasimmiyengar) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, "A kind of social caste exists all over the world and is almost co-eval with human existence, but in other countries and nations, it is of the earth earthy, neither sanctioned nor demanded by religion. * * * In India however caste is quasi-religious, and it has acquired such an ascendency over all sections of the people as to supplant religion."

আমি জাতিভেদ সম্বন্ধে নব্যভারতে গত দুই সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট, ভূদেব বাবুর অন্যান্য যুক্তি আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। তবে, ভূদেব বাবু জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী হইতে যে কথা নিঃসৃত হয়, তাহা বিশেষ আলোচ্য। তজ্জন্য আমরা তাঁহার আরও দুই একটী যুক্তি আলোচনা করিব। তিনি বলেন,—

"'যেমন গঙ্গাতে আসিয়া পড়িলে সকল নদনদীর জল গঙ্গার জল হইয়া যায়, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে'—বুদ্ধদেবের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল জাতির লোককে তুল্যমূল্য করিলেন, এবং সেই জন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা লাভ করিল"। সামাজিক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩১।

পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই যুক্তির অর্থ এই মৌলিকবর্ণ ভেদযুক্ত ভারতে, জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইল না; কিন্তু মৌলিকবর্ণ ভেদহীন (এক বর্ণাত্মক) ব্রহ্ম চীন তিব্বতে জাতিভেদ-হীন বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইল। অতএব ভারতে, মৌলিকবর্ণ ভেদই জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্ফলতার কারণ, অর্থাৎ ভারতে মৌলিকবর্ণ ভেদ আছে বলিয়া জাতিভেদ থাকিবে। এই যু-

ক্তিতে প্রমাদ ঘটিয়াছে। একটী সহজ উদাহরণ দ্বারা তাহা দেখাইতেছি। হরি কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হইল না। যদু গৌরবর্ণ, তাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হইল। অতএব কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে না, গৌরবর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে। এ যুক্তি যেরূপ,ভূদেব বাবুর উল্লিখিত যুক্তি সেইরূপ নহে কি? আমরা জানি, বর্ণের সহিত কুইনাইনের ফলাফলের কোন সম্বন্ধ নাই। হয় ত হরির লিভার খারাপ হইয়াছে, অথবা দেহের অন্য কোন যন্ত্র এককালে বিকৃত হইয়াছে, তজ্জন্যই কুইনাইন খাটিল না। সেইরূপ হিন্দু সমাজের দেহের কোন যন্ত্র হয় ত বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতিসাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইতে পারিল না। (১) ভারতে মৌলিক বর্ণভেদ আছে, জাতিভেদ আছে। (২) তিব্বতে মৌলিক বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদও নাই। (৩) অতএব মৌলিকবর্ণভেদ জাতিভেদের কারণ। এই যুক্তিতে হঠাৎ চটক লাগিতে পারে। হঠাৎ যেন বোধ হয়, এই যুক্তির প্রথমভাগে, মৌলিক বর্ণের সহিত জাতিভেদের নিত্য অন্বয় প্রদর্শিত হইল এবং দ্বিতীয় ভাগে, মৌলিক বর্ণভেদের ব্যতিরেকে জাতিভেদের নিত্য ব্যতিরেক দেখান হইল। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা যেন ভূদেব বাবু মনে করিয়াছেন, মৌলিক বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের মধ্যে, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অথবা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইল। কিন্তু একটী মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা, কার্য্যকারণভূত অচ্ছেদ্য অন্বয় প্রমাণ হয় না। একাধিক বা অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। Mill তাঁহার তর্কশাস্ত্রে যে প্রমাণ প্রণালীকে Method of Agreement বলিয়াছেন, তাহাকে অন্বয়মূলক প্রমাণ বলা যাইতে পারে,তাহার লক্ষণ—"If two or more instances of the phenomenon under investigation (এখানে জাতিভেদ) have only one circumstance in which alone all the instances agree (এখানে ভূদেব বাবু বলিতে চাহেন, মৌলিক বর্ণভেদ) is the cause (or effect) of the given phenomenon."—Mill's Logic (V. I. p. 422),

ভূদেব বাবুর অন্বয় মূলক দৃষ্টান্তে কেবল ভারতের জাতিভেদ স্বরূপ একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। আর কোনও দেশে মৌলিক বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখান হয় নাই। বরঞ্চ আমি তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যথা, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ (United States) প্রদেশে মৌলিক বর্ণভেদ সত্ত্বেও (ভারতবর্ষের) জাতিভেদ নাই। ভূদেব বাবু যুক্তিতে Method of Agreement প্রয়োগ পক্ষে অন্যান্য আপত্তি আছে। কিন্তু সে কথা যাউক। তাহার পর, ভূদেব বাবুর যুক্তির (২) ভাগ অর্থাৎ তিব্বত প্রভৃতি দেশে মৌলিক বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদও নাই—ইহাকে ব্যতিরেক যুক্তি বলিয়াছি। Mill যাহাকে Method of difference বলিয়াছেন, বোধ হয়, ইহা তাহারই কল্পিত ছায়া। কিন্তু Method of differenceএর লক্ষণ কি, দেখুন—"If an instance (ভারতবর্ষ) in which the phenomenon under investigation (এখানে জাতিভেদ) occurs, and an instance (এখানে তিব্বত দেশ) in which it (এখানে জাতিভেদ) does not occur, have every circumstance in common save one that one occurring only in the former (ভারতবর্ষে); the circumstance in which alone the two instances differ (এখানে মৌলিক বর্ণভেদ), is

hte effect, or the cause, or a neccessary part of the cause, of the phenomenon."— Vol ; p. 423.

এখন, এই Method of difference প্রয়োগে ভূদেব বাবুর যুক্তিতে মূলে প্রমাদ ঘটিয়াছে। কারণ,এই যুক্তি প্রণালীতে,দুইটী দৃষ্টান্তে,একটী ভিন্ন-অন্য সমুদয় অবস্থা সদৃশ হওয়া চাহি। কিন্তু ভারত ও তিব্বতে, মৌলিক বর্ণভেদ গত বিভিন্নতা ব্যতীত, অন্য নানাবিধ অবস্থার তারতম্য আছে। Method of difference বা ব্যতিরেক যুক্তি প্রণালী কিরূপ স্থলে প্রমাণ হয়, তাহা দেখাইতেছি। পক্ষী বাঁচিয়া আছে, তাহাকে কার্বণিক এসিড গ্যাসে নিক্ষেপ কর, সে মরিবে। এখানে, আর সমুদয় অবস্থা এক বা সদৃশ। কেবল বায়ু না হইয়া কার্বনিক এসিড গ্যাস, এই তারতম্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই গ্যাসে যে পক্ষীর মৃত্যু হইল,এই সিদ্ধান্ত প্রশস্ত।

আর এক কথা। এইরূপ যুক্তি প্রণালী, অর্থাৎ Method of Agreement and Method of Difference, অবলম্বন করিয়া, সামাজিক প্রশ্ন মীমাংসা করিতে যাইলে প্রায়ই বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। কারণ, সমাজতত্ত্বে প্রমাণের উপকরণগুলি ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করা যায় না। পদার্থতত্ত্বে প্রমাণের উপকরণ ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করা যায়। তাই, সমাজতত্ত্বে একটী কোনও ঘটনার কারণ, সহজে স্থির হয় না। নানা জন নানা কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাই, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের কারণ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু এক কথা বলেন, রমেশ বাবু আর এক কথা বলেন। ভূদেব বাবু বলেন যে, মৌলিক বর্ণ ভিন্ন ভারতসমাজে, জাতিসাম্য প্রয়োগ করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নিষ্কাশিত হইল। রমেশ বাবু বলেন,—

"Buddhism gradually declined during the centuries after the Christian era,much in the same way as the Hinduism of the Rig Veda had gradually become corrupted in the Epic Period when the Hindus had settled down in the Gangetic valley. Budhist monks formed a vast and unmanageable body of idle priesthood, owning vast acres of land attached to each monastery, and feeding on the resources of the people; and Budhist ceremonials and forms bordered more and more on Budha-worship and idolatry." (R.C. Dutt's Ancient India—Introduction. P. 17.)

ভূদেব বাবুর প্রদর্শিত যুক্তিটী যে নিতান্ত অমূলক, স্বকপোলকল্পিত, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে দেখাইলাম। সামান্য লেখকের যুক্তি সমালোচনা করিতে হইলে যে স্থলে এক কথায় সারিতাম, ভূদেব বাবু বলিয়া, সে স্থলে কয়েক পাতা লিখিতে হইল।

তৎপরে,তাঁহার আর একটী যুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ভূদেব বাবু বলেন—

"জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটী কথা বলা হয়। ঐ কথাটী ঐতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুদ্ভূত। কথাটী এই,—কোন সময়ে,ইউরোপীয় সকল সমাজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে ঐ প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এখন এই প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতি নিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকূল নহে—এইজন্য উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক হইয়াছে, এবং উৎসাহিত হওয়া উচিত। এই কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, জাতিভেদ প্রথা যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় কেবলমাত্র শ্রমবিভাগের প্রয়োজনে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের ঐ প্রথার পরিণতি তদনুরূপ হইত,, উহা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত।"

(সাঃ প্রঃ ২৩৬ পৃঃ)

ভূদেব বাবুর এই যুক্তি এই কথার উপর

স্থাপিত যে,—যাহার প্রয়োজন নাই, তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যায়। প্রয়োজন অর্থে (১) উপযোগিতা হইতে পারে। উপযোগিতা অর্থে কি? যাহা অবস্থাবিশেষে তিষ্ঠিতে সমর্থ, তাহা সেই অবস্থার উপযোগী; এবং যাহা অবস্থাবিশেষে তিষ্ঠিতে পারে না, অর্থাৎ "আপনা হইতে চলিয়া যায়," তাহা সেই অবস্থার উপযোগী নহে, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন নাই। ভূদেববাবুর কথাটী এখন কি আকারে পরিণত হইল, দেখুন; যাহার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যাহা আপনা হইতে চলিয়া যায়, তাহা আপনা হইতে চলিয়া যায়। এই কথার কোন সার্থকতা নাই। প্রয়োজন অর্থে (২) উপকারিতা হইতে পারে। এই অর্থে ভূদেব বাবুর কথা দাঁড়ায় যে, যে প্রথার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যে প্রথার উপকারিতা (সুখদায়িতা) নাই, তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যায়। এ কথার একটা মস্ত হঠোক্তি রহিয়াছে, যাহা প্রমাণ সাধ্য, তাহা বিনা প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কে বলিল যে, যখন প্রথার উপকারিতা নাই, তখন তাহা আপনা হইতেই উঠিয়া যায়? আপনা হইতে উঠিয়া যায় না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যদি উপকারিতা-লুপ্ত প্রথা সকল আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে সমাজ সংস্কার বা ধর্ম্মসংস্কার, আইন-সংস্কার বা চিকিৎসা-সংস্কারের চেষ্টার প্রয়োজন হইত না। তাহা হইলে, সমাজের মঙ্গলের জন্য কোনও প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রচারকের অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইত না; সকলেই সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইলে বেশ হইত। কোন প্রথা সম্বন্ধে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করার আবশ্যক হইত না, উপকারিতা বিযুক্ত-প্রথা সকল 'আপনা হইতে উঠিয়া যাইত।' ভূদেব বাবুর মতে,—এখন হইতে কোন সংস্কারক আর বলিতে পাইবেন না যে, "এই প্রথা নিষ্প্রয়োজন, ইহার উপকারিতা নাই, অতএব ইহা উঠিয়া যাওয়া উচিত।" কেন না, ভূদেব বাবু বলিতেছেন, 'যদি প্রথা নিষ্প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে 'আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত'।'

কোন প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া সমাজ-হৃদয়ে শিকড় নামাইলে, তাহার উপকারিতা চলিয়া যাইলেও, তাহা অসাময়িক হইলেও, তাহা অনেক স্থলেই "আপনা হইতে উঠে না"। দীর্ঘকালে সেই প্রথা কেমন জমাট বাঁধিয়া যায় যে, তাহা পরিবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। এবিষয় Bagehot তাঁহার Physics and Politics নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে প্রথাতে মানুষকে সভ্য করে, সমাজকে উন্নত করে, সেই প্রথাই আবার অনেক স্থলে কালক্রমে অনমনীয় বা কঠিন হইয়া উঠে। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে তখন আর তাহাকে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্কাশিত করা যায় না। তখন প্রথা বা দেশাচার, যুক্তি বিচারের অতীত হইয়া উঠে এবং এই সময়েই সভ্যতার অবনতি, সমাজের অমঙ্গলের আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, যুক্তি-বিরুদ্ধ দেশাচার-বশ্যতাই সমাজের অনিষ্টের মূল, সভ্যতা পতনের কারণ।

যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাচীন প্রথা বা দেশাচার বা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে যে সমাজের অমঙ্গল হয়, প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হয়, সভ্যতার পতন হয়, তাহা যে কেবল ম্লেচ্ছ Bagehot বলিতেছেন, তাহ

নহে,তাহা ভগবান্ বৃহস্পতিও বলিতেছেন,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই যুক্তিহীন বিচারে আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, গৌরবময় সভ্যতা হইতে আমাদিগকে হেয় দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে।

যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাতে লোকের কেমন একটা অচলাভক্তি জন্মিয়া যায়। তাহা, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলেও, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অনেকে মনে করেন, এতদিন যে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেও যেমন সমাজের উপযোগী, এখনও সমাজের পক্ষে তেমনি উপযোগী। অর্থাৎ এখন তাহা সমাজের পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে, তাহা কখন হইতে পারে না। তাহাদের যুক্তিটী এইরূপ,—"এই বাটীটী যখন একশত বৎসর পড়ে নাই, তখন ইহা এখনও পড়িতে পারে না।" আমি ব্যঙ্গ করিতেছি না। সাধারণ লোকে যথার্থই এইরূপ যুক্তিতে চালিত হয়। উদাহরণ স্থলে, আমি এখানে একটী বাস্তবিক ঘটনা বলিতেছি। কতিপয় বৎসর হইল,এইদেশে কোন স্থানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকা অতিশয় প্রাচীন,সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড ছাদের একদিক পড়িবে পড়িবে হওয়াতে, সেইখানের আড়ায় একটা দীর্ঘ বাতি শালকাষ্ঠ দিয়া ঠেকো দিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক বৎসর এই অবস্থায় ছিল। ক্রমে, বোধ হইল এই খুঁটিতে আর ছাদ রাখিতে পারিবে না, কোন দিন ছাদ বিকট শব্দ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। কোন পর্ব্বোপলক্ষে প্রতি বৎসর ঐ ছাদের নীচে, লোকারণ্য হইত। এবং সেই দিনে ঐ ছাদের নিকট তোপ ধ্বনি হইত। আমার ভয় হইল, যদি ঐ দিনে ছাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনেকগুলি লোকের প্রাণ যাইবে। তজ্জন্য যাহাতে ঐ স্থানে জনতা না হয়,তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকে বলিলেন,

"মহাশয়, আমরা বহুকাল ছাদের ঐ খানটা ঐরূপ খুটী লাগান দেখিতেছি। এতদিন যখন উহা পড়ে নাই, এই বৎসরই কি উহা পড়িবে? তাহা কখন হইতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোন ভয় নাই। অধিকন্তু এখানে লোক আসিতে না দিলে ধর্ম্মহানি হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম ;—

"অধিককাল ঐরূপ জীর্ণাবস্থায় আছে বলিয়াই, ঐ বাটী এখন পড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। ইহা সহজ কথা, জীর্ণছাদ কালাতিপাতে দৃঢ় হয় না, আরও জীর্ণ হয়। আর পতনোন্মুখ ছাদের নীচে লোক সমাগম নিবারণ করাতে ধর্ম্মহানি হইতে পারে না, ধর্ম্ম পালন করা হয়।"

কিন্তু আমার কথা কে শুনে। যাহা হউক, সৌভাগ্য বশতঃ সেই অট্টালিকার ছাদ পর্ব্বদিনের পূর্ব্বেই একদিন, ঘোর শব্দে, সুদূরস্থ স্থান প্রতিধ্বনিত করিয়া, ভূমিসাৎ হইল। তখন সেখানে গিয়া দেখি, প্রাচীনতা প্রিয়-তার্কিকগণ, নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিছুদিন পরে সেই অট্টালিকার সংস্কার বা একরকম পুনর্নির্ম্মাণ হইল।

সামাজিক প্রথার ছাদও যখন ঐ রকম জীর্ণ হয়, তখন ঐপ্রথা প্রাচীন বলিয়া, অনেকে মিথ্যা সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কিন্তু এইরূপ জীর্ণ প্রথার নীচে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা মহা বিপদজনক। চিরকাল ঠেকো দিয়া পতনোন্মুখ প্রথাকে রক্ষা

করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার সংস্কার বা পুনর্নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। একদিকে, যেমন না বুঝিয়া সুজিয়া, একদিক্ হইতে সটান পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা ভাল নহে; অন্যদিকে তেমনি বিচার না করিয়া, শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া, অথবা কেবল মাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, প্রাচীন সামাজিক প্রথা মাত্রকেই অক্ষুণ্ণ বা অপরিবর্ত্তিত রাখিবার প্রয়াসও প্রমাদজনক। মহর্ষি বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভুলিবেন না;

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

মনে রাখিবেন,—

যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কেবলমাত্র প্রাচীন প্রথার বশীভূত হইয়া, অথবা কেবলমাত্র শাস্ত্রের বচনের উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ও অসাময়িক জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না। আমাদিগের জাতিভেদের ভিতর যাহা ভাল ছিল, তাহা গিয়াছে। জাতিভেদের প্রাণ-বায়ু চলিয়া গিয়াছে। এখন আছে, জাতিভেদের মৃত দেহ। সেই মৃতদেহ, এখন পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে। বিষময় বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া, সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। সত্য, পুত্রের মৃত্যু হইলে জননী তাহার মৃতদেহ ছাড়িতে চাহেন না, সেই মৃতদেহকেও কোলে করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু কতক্ষণ তিনি সেই মৃতদেহকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিতে পারেন? সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের দেহকে অবশেষে তাঁহার বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাদেব, তথাপি, মায়াতে বিভোর হইয়া, সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য, নারায়ণের সুদর্শন-চক্র নির্ম্মমভাবে সেই সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। আমাদিগের দেশে ভূদেব বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মাগণ, জাতিভেদের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবের সুখময় স্মৃতিতে বিভোর হইয়া, মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সকল মহাত্মাগণকে আমি আন্তরিক ভক্তির সহিত নমস্কার করি। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এখন সু-দর্শন চক্রের বড়ই প্রয়োজন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাতে মানবহৃদয় বড় অসুখী। কেন না, বিজ্ঞান বিচারে অখণ্ডকে খণ্ড, ঘনকে তরল, নিয়ন্তাকে নিয়মে, ব্যক্তিকে শক্তিতে, বিধাতাকে বিধিতে পরিণত করিতেই ভালবাসে। জগৎকৌশল, ভৌতিক নিয়মাবলীর সুশৃঙ্খলা এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ এই সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলেই বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হয়, সে আর কিছু চায় না। সর্ব্বপ্রকার বিয়োগ সাধন কেবল তাহার লক্ষ্য। তাই সে নিয়ন্তাকে ছাড়িয়া নিয়ম, রাজাকে ছাড়িয়া রাজবিধি, গুরু এবং শিক্ষককে ছাড়িয়া ধর্ম্মনীতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষকের, উপদেশের সঙ্গে উপদেশকর্ত্তার, শাস্ত্রবিধির

সহিত শাস্ত্রীর, নিয়মের সহিত নিয়ন্তার অনেক স্থলে মিলন দেখিতে পায় না বলিয়া সে ব্যক্তিত্ব হইতে সত্যকে পৃথক্ রাখিতে চায়। অন্ধ বিশ্বাসী যেমন সত্য পরিহার করিয়া কেবল ব্যক্তিতে আসক্ত হয়, বিজ্ঞানী তেমনি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সত্য অন্বেষণ করে। এইজন্য একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এতদুভয়ের সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই জগৎকৌশল, নিয়মশৃঙ্খলা দেখাইয়া বিজ্ঞান কি বিশ্বাসের অবলম্বা পুরুষ হইতে মানবহৃদয়কে নির্গুণ অদ্বৈতবাদের দিকে লইয়া গিয়া সুখী করিতে পারিবে? কখনই না। আবার সগুণপ্রিয় বিশ্বাস কি তেত্রিশ কোটী দেবমূর্ত্তি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি ভৌতিক দেবগণের পূজায় মত্ত হইয়া জ্ঞানপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিবে? তাহারো সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি পূজা, ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ, আর বহুদেবোপাসনা, এই চতুর্ব্বিধ চক্রের মধ্যে ধর্ম্মের ইতিহাস পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীতে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যে ইহার অল্পাধিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্বনিষ্ঠ আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার অনুচরগণ ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে,কেবল বিয়োগ সাধন করিলে মানুষ দাঁড়ায় কি ধরিয়া? শেষে কি আবার ভূত পেত চন্দ্র সূর্য্যের জল বায়ু অগ্নির পূজা আরম্ভ করিবে? অনেক স্থলে তাহাই ঘটিতেছে এবং প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে তাহা ঘটিবে। একদেশদর্শী বিজ্ঞান যেমন সগুণ ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া নির্গুণ নিয়মের দিকে অতি বেগে ধাবিত হইতেছে, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসও তেমনি আপনার যথার্থ অবলম্বন না পাইয়া নানাবিধ কুসংস্কার ভ্রান্তি ভূতকালের গর্ভ হইতে টানিয়া আনিতেছে। উভয় যত দিন উভয়ের সহিত না মিলিবে তত দিন এইরূপই হইবে।

প্রাচীন ইতিহাসে মানব মনের স্বাভাবিক গতি কিরূপ অঙ্কিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা দেখিলে এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। আদিমকালে, অথবা বৈদিক সময়ে লোকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম কৌশল কিছু দেখিত না, তাহারা সর্ব্বত্র ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে কেবল অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিত। আকাশে মেঘে বজ্রবৃষ্টিতে, নদী সমুদ্র পর্ব্বতে, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিতে শস্যক্ষেত্রে বনে এক একটী স্বতন্ত্র দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব দর্শন করিত। ইঁহারাই সকল বেদের দেবতা। পরে ক্রমে যখন জ্ঞান চিন্তা বিচার বুদ্ধি বিকসিত হইল, তখন ভৌতিক ক্রিয়াসকল একজন কর্ত্তা পুরুষ কর্তৃক সম্পন্ন হইতেছে, ইহাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন। যাঁহারা অধিক চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী হইলেন,তাঁহারা আবার সেই এক পরমপুরুষকে শেষ নির্গুণ শক্তিরূপে অদ্বৈতবাদে পরিণত করিলেন। বিশ্বাসপ্রধান যুগের ভৌতিক দেবতাগণ বৈজ্ঞানিক চিন্তার যুগে একত্বে পর্য্যবসিত হন, পরে সেই এক ব্রহ্ম আবার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিরূপে সৃষ্টির সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যান। অনন্তর পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ বা বহু-দেববাদ আসিয়া নরনারীর হৃদয়কে অধিকার করে। তখন সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই তেত্রিশকোটী রূপ বিবিধাকারে প্রকাশিত হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত নির্গুণ নির্ব্বিশেষ সত্বা মাত্র, কিম্বা উপনিষদের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা এক নিরাকার পরমপুরুষ, ইহাতে মানবহৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি নাই; তাই

পৌরাণিক যুগে বহু দেবদেবীর আবির্ভাব দেখা যায়। যিনি ইষ্টদেবতা তাঁহাকে সমস্ত কাজে কর্ম্মে,সুখে দুঃখে না পাইলে কি চলে ? খাইতে শুইতে বসিতে চলিতে বলিতে বিদেশে স্বদেশে রোগে শোকে গৃহে প্রবাসে কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরে অন্নজলে জ্ঞানে ধনে, জীবনে মরণে তাঁহাকে নানা ভাবে মানবস্বভাব দেখিতে চায়। সেই জন্যই বহু বহু দেবতার সৃষ্টি। বাস্তবিকত ঈশ্বরের কোন নাম রূপ নাই, তিনি অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকল্প ত্রিগুণাতীত এক অদ্ভূত রহস্য। মানসিক বিচিত্র অবস্থা এবং বাহিরের নানাবিধ ঘটনাচক্রে সেই অনন্ত গূঢ় রহস্যকে বিবিধ প্রকারে গঠন করে। সাধক এক এক অবস্থায় তাঁহার সহিত বিশেষ বিশেষ এক একটী সম্বন্ধ অনুভব করিয়া সেই প্রত্যেক সম্বন্ধের এক একটী বিভিন্ন নাম দেন; তাহা হইতে ভগবানের নামমালা গ্রথিত হইয়াছে ; এই জন্য প্রেমিক কবিরা বলেন, ভক্তেরাই ভগবানের মা বাপ। তাঁহারা সেই একই ইষ্টদেবতাকে,বিপদে পড়িয়া বিপদভঞ্জন, পাপে দগ্ধ হইয়া পতিতপাবন পাষণ্ডদলন, প্রেমে মজিয়া প্রেমময় সখা, ভয় পাইয়া অভয়দাতা, নৈরাশ্যে ডুবিয়া দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু দয়াময় নাম দিয়াছেন। বিদ্যার মধ্যে সরস্বতী, ধনে লক্ষ্মী, গৃহাশ্রমে পিতা মাতা, রাজার ভিতর রাজরাজেশ্বর, দয়ালু উপকারীর ভিতরে বিধাতা ইত্যাদি বহুরূপে তাঁহাকে দেখিয়া বহুল সুন্দর নামে তাঁহাকে ভক্তগণ সাজাইয়াছেন। সাধারণ অশিক্ষিত অবৈজ্ঞানিক জনসমাজ কেবল সম্বন্ধজ্ঞাপক নামটীমাত্র ধরিয়া বস্তু অনুভব করিতে সক্ষম হয় না বলিয়া প্রত্যেক সম্বন্ধকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া তাহাকে পরে এক একটী মূর্ত্তিমান আকারও দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের সেই মূর্ত্তি সকল দেশ কালে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড অনন্তকে খণ্ডিতাকারে বদ্ধ করত বদ্ধজীব স্থূলদর্শীদিগের ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী ভগবানের স্মরণার্থ এই দেবমূর্ত্তি সকল পরিশেষে স্বয়ং ভগবানরূপে সাধারণ লোকচক্ষে প্রতীত হয়।

কিন্তু ইহা দ্বারা যেমন বিশ্বাস চরিতার্থ হইল, জ্ঞানের চরিতার্থতা তেমন হইল না। যাঁহারা এক্ষণে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি হইয়া মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু কাষ্ঠনির্ম্মিত জড়মূর্ত্তি কিম্বা কোন প্রাচীন আখ্যায়িকোক্ত অবতার বা দেবচরিত্র পূজা করিতে পারেন না, তাঁহাদের বিশ্বাসের অবলম্ব্য কি হইবে ? নিরাকার নির্গুণ ব্যক্তিত্ববিহীন বেদান্তের ব্রহ্ম কেবলমাত্র কঠোর জ্ঞান বিচারের সিদ্ধান্ত ; উপনিষদের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরম পুরুষও জন কয়েক যোগী সন্ন্যাসীর আরাধ্য দেবতা ; বৈদিক দেবতাসকল প্রকৃতির ভৌতিক ক্রিয়া মাত্র ; —বিজ্ঞান সূর্য্যোদয়ে তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; তবে এখন বিষয়ী গৃহস্থ আধুনিক সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কোথায় দাঁড়াইবেন? কারণ স্বরূপ এক পরম ব্রহ্মকে জ্ঞান বিচারে বুঝিয়াও তাঁহাকে পিতা মাতা গুরু সখা সুহৃদ্রূপে তাঁহারা ধারণ করিতে পারিতেছেন না। এইজন্য আস্তিক হইয়াও তাঁহারা কার্য্যকালে নাস্তিকবৎ। জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিন্ন জীবন রক্ষা পায় কি ? অতএব, সেই এক আদি অনন্ত সর্ব্বগুণাকর পরমাত্মাকেই আহারে বিহারে, সুখে দুঃখে,বিপদ সম্পদে,গৃহে পরিবারে,জলে স্থলে শূন্যে,প্রাকৃতিক ক্রিয়ার

মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে হইবে। যাবতীয় ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রকাশ, বিচিত্র বিকাশ। মূর্ত্তিমান জড়াকারে খণ্ড খণ্ডরূপে নয়, কিন্তু মূর্ত্তিমান গুণাকারে অখণ্ড অনন্তরূপে প্রকাশ। বাহ্যঘটনা ও আন্তরিক অবস্থার মধুর ও রুদ্ররসের ভিতর সেই অখণ্ড চিন্ময়ের বিচিত্র রূপ প্রকটিত হইয়া সাধককে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। স্বয়ং ঈশ্বর চির-অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াও মনুষ্যের অবস্থানুযায়ী বিচিত্র চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। মানসিক পরিবর্ত্তন, চরিত্রের উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট অবস্থা নামরূপবিহীনকে নাম রূপ প্রদান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই অনন্ত গুণাকর পরম পুরুষের ন্যায় দয়া প্রেম পুণ্য,পিতৃ মাতৃ সখ্যভাব মানবের বিচিত্র অবস্থার ভিতর মূর্ত্তিমান আকারে জীবন্তলীলা প্রদর্শন করে। বিশ্বাসীর চক্ষে তাহা সত্য সত্যই এক একটী ব্যক্তির ন্যায় প্রতীত হয়। বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসঙ্গত কাল্পনিক অচেতন জড়মূর্ত্তি এখানে নাই; কিন্তু যিনি পিতা তিনিই মাতা, যিনি প্রভু, তিনিই সখা, যিনি দণ্ডদাতা বিচারপতি, তিনিই আবার দয়াময় দীনবৎসল; একই দেবতা বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ অখণ্ডভাবে এক এক স্বরূপে দর্শন দেন। জড়মূর্ত্তি অপেক্ষা এই ঘনচিৎ মূর্ত্তি সকল অতিশয় জীবন্ত স্পর্শনীয়। কিন্তু এই জ্ঞান প্রেম ন্যায় দয়ার যাবতীয় প্রকাশ বা মূর্ত্তি অনন্ত গুণবিশিষ্ট অখণ্ড। দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী বিশ্বাসী ভক্ত যখন নানাকার্য্যে বিবিধ ঘটনায় প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই এক অনন্ত অখণ্ড দেবতাকে অসংখ্য আকারে প্রকটিত দেখেন, তখন তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ হরিময় হইয়া যায়। তখন তিনি সেই বিশ্বব্যাপী মহাদেবের অনন্ত বিচিত্র লীলাতরঙ্গে ভাসিতে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার জীবনে বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য হয়। অনন্তের অনন্ত মূর্ত্তি, অনন্ত লীলা প্রতিক্ষণে, প্রতি ঘটনায় অনুভব করিয়া তিনি নিরন্তর আনন্দসাগরে সন্তরণ করেন। ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন, এ কথা সত্য। তিনি নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র, নিরুপাধি নির্ব্বিকার; অথচ তাঁহাকে বিজ্ঞান বিশ্বাসানুরঞ্জিত চক্ষে যখন যে ভাবে দেখিতে চাহিবে,তাহা পাইবে। বহুরূপী ভগবান বহুভাবে নিত্যকাল লীলা করিতেছেন। যে সুরসিক কবি,প্রেমিক তত্ত্ববিদ্ বিশ্বাসী,সে এই অসার সংসারে ঘোর কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও জাতীয় ইতিহাসে,ভৌতিক জগতে, নিজ জীবনে, ভক্ত মহাত্মাগণের চরিত্রে বিশেষরূপে মহাপ্রভুর মহালীলা ধ্যাননেত্রে অনুক্ষণ অবলোকন করিয়া থাকেন। কোন্ ঘটনার কি অর্থ, কি ভাবে ঠাকুর কাহার মধ্যে কি লীলা করিতেছেন, তাহা কেবল তিনিই দেখেন, আর আপন মনে হাস্য ক্রন্দন করেন। নতুবা এই বিশ্বপুরাণের গভীর কাহিনীর মর্ম্ম চর্ম্মচক্ষে কি কেহ দেখিতে পায়? না বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা কেহ তাহা অবধারণ করিতে পারে? যিনি ইহা বুঝিতে চান, তিনি বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঘটে ঘটে, প্রতি ঘটনায় বহুরূপী ভগবানকে দেখিবার জন্য দিব্য চক্ষু উন্মীলিত করুন।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ইতিহাস শিক্ষা। (১)

ইতিহাস কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে,তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।"

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশাত্মক পুরাণ কথাকে ইতিহাস বলা যায়। এইটী ইতিহাসের অতি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা, আমরা এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারি।

ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার লেখক ইতিহাসের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"History, in the most correct use of the word, means the prose narrative of past events, as probably as the fallibility of human testimony will allow."

বিগত ঘটনায় অসম্পূর্ণ মনুষ্যের সাধ্যানুরূপ সত্য এবং গদ্যে লিখিত বিবরণের নাম ইতিহাস। কোন দেশের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, অধিবাসীগণের আমূল বৃত্তান্ত সমন্বিত গ্রন্থকে সাধারণতঃ ইতিহাস বলা যায়। এইরূপ গ্রন্থের উপকারিতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করেন, তাঁহারা বলেন যে, কোন্ দেশে কোন্ কালে কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া বিশেষ ফলোদয় কি আছে? আমাদের পিতামহ প্রপিতামহদিগের নাম স্মরণ রাখিলে বরং ফল আছে। অবশ্যই পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম ভক্তিসহকারে স্মরণ রাখা সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় কি স্বদেশীয় ইতিহাস পাঠ এবং আয়ত্ত করিতে হইলে, এই সামান্য বিষয় করিতে পারা যাইবে না, ইহার কোন অর্থ নাই। তবে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কি, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অধুনা যে প্রণালীতে বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাস শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ উপকার লক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। ইতিহাস পাঠে সাহিত্য-শিক্ষার সহায়তা হয়, এই কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহাতে স্মৃতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, কল্পনা শক্তি বিকাশ পায়, কার্য্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ সম্যক উপলব্ধি করা যায়, এবং বিচারশক্তি প্রস্ফুটিত হয়। ইতিহাস মানবচরিত্রের বিভিন্ন প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া চরিত্র গঠনের সহায়তা করে। ইতিহাস পাঠের যে কেবল ইহাই উপকারিতা, তাহা নহে। যে সমস্ত ঘটনা নিচয় বর্ত্তমান জাতীয় অবস্থাকে গঠিত করিয়াছে, ইতিহাস পাঠে তত্তাবৎ অবগত হওয়াতে সমাজের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি জন্মে এবং দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

ইতিহাস উদাহরণ-সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র।* আরও একটা কথা আছে "Example is better than precept" উদাহরণ উপদেশ হইতে মূল্যবান; কেবল শাস্ত্রোপদেশ শিক্ষা করিয়া আমাদের যত উপকার না হয়, জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তগুলি দেখিয়া আমাদের ততোধিক উপকারের সম্ভাবনা। যে সত্যের কথা শাস্ত্রাদিতে কেবলমাত্র বিবৃত হয়,তাহার উদাহরণ যদি স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করি, তবে

* "History is philosphy teaching by example."

কেমন করিয়া ঐ সত্যে সন্দিহান হইব? দৃষ্টান্ত সত্যের প্রমাণ চক্ষের সমক্ষে জলন্ত ভাবে উপস্থিত করে বলিয়া, হৃদয় মধ্যে তাহার সংস্কার বদ্ধমূল হয় এবং ভুলিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা ভুলিতে পারি না। যে সত্য পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতে দেখিলাম, তাহা অবিশ্বাস করিবারও উপায় নাই।

আবার যাঁহারা কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা তাহাদের নিজ কার্য্যাবলী হইতে যত শিক্ষা না করেন, দূর হইতে যাঁহারা তৎসমুদয় সন্দর্শন করেন,তাঁহারাই অধিক শিক্ষা পান। যেহেতু কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিলে কার্য্যের ফলাফল নিয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবার অবকাশ কম। কি কি কারণে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব ঘটিল, যে সকল লোক তন্মধ্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা তত বুঝিতে পারে নাই। তৎকালে যাঁহারা ভিন্ন দেশ হইতে সে সকল কারণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, পশ্চাতে যাঁহারা তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বার্ক (Edmond Burke) ইংলণ্ড হইতে উক্ত বিপ্লব সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উহার ফলাফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বোধ হয়,তাৎকালীন কেহই ঐরূপ পারেন নাই। অল্প কতক দিন হইল আমি 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি' নামক মাসিকপত্রে দেখিয়াছি, একজন লেখক এত দীর্ঘকাল পরেও উক্ত ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফ্রুড (Froude) বলিয়াছেন, "Outsiders sometime see deeper into a game than those who are engaged in playing it," যাহারা প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়াতে লিপ্ত রহিয়াছে, তাঁহারা ক্রীড়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা যতদূর লক্ষ্য না করেন, অনেক সময় দর্শকবৃন্দ তাহা হইতে অধিক নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। যাঁহারা 'দাবা' খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই কথা অস্বীকার করিবেন না। যেমন শৈলোপরি আরোহণ করিলে বহু দূর বিস্তৃতা প্রবাহিণী দৃষ্টিগোচর হয়, তরঙ্গরাশি নয়ন ও মনকে আকৃষ্ট করে, তদ্রূপ ইতিহাস আমাদের দৃষ্টি বহুদূর আনয়ন করে। আমরা জাতীয় উত্থান ও পতন প্রভৃতি ঘটনারূপ তরঙ্গ দৃষ্টে মোহিত হই। ইতিহাস সমস্ত জাতীয় পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ। পূর্ব্বপুরুষগণ নানা বিষয়ে কি উন্নতি করিয়াছেন, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠে তাহা জানা যায়।

মনুষ্যজাতি উন্নতিশীল (progressive), কিন্তু সকল বিষয়েরই ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া যে কোন বিষয়েরই হউক, অধিকতর উন্নতি করা যাইতে পারে। যাঁহারা রীতিমত ইতিহাস অধ্যয়ন না করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা থাকেনা, এবং যাহাদের পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি অল্প, তাহারা ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবিবে, এরূপ আশা করা যায় না। Burke বলিয়াছেন—

"People will not look forward to posterity, who never look backward to their ancestors."

যেমন কোন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে সকলেই যদি কেবল ভিত্তি স্থাপন করে, এবং পূর্ব্ব ভিত্তি উৎপাটন করিয়া ফেলে, সে প্রাসাদ কোন কালেও সম্পূর্ণ হয়

না, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল যদি সামান্য আয়াস করিয়া আমরা গ্রহণ না করি, তবে আমরা পুনঃ পুনঃ ভিত্তি স্থাপনই করিব, উন্নতিরূপ প্রাসাদ আর সম্পূর্ণ হইবে না।

জন মর্লি (John Morley) প্রবাদ বাক্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের সাধারণ জ্ঞান বহুকাল হইতে প্রায় একরূপই আছে; দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আধুনিক লোক উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান এখনও মনুষ্যের যেরূপ, বহুকাল পূর্ব্বেও তদ্রূপ ছিল।

"The road has been so broadly trodden by the hosts who have travelled along it, that the main rules of the journey are clear enough and we all know that the secret of breakdown and wreck is seldom so much insufficient knowledge of the route as imperfect discipline of the will."

(John Morley on Aphorisms.)

বহুসংখ্যক লোকের গতায়াতে রাস্তা এতদূর পরিসর হইয়াছে যে, যাত্রার পথ পরিষ্কার, তবে যে বিপদ ঘটে ও মানুষ অকৃতকার্য্য হয়, তাহা নিয়মের অজ্ঞতা নিবন্ধন নহে, মানবীয় ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির অপরিপক্কতা হেতু। কাজেই দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জ্ঞান ও উন্নতিকে আমরা কোনও ক্রমে অবহেলা করিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানুষ উন্নতিশীল। কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জ্ঞান লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না, তাঁহাদের জ্ঞান লইয়া আমরা ক্রমোন্নতি করিব। প্লুতার্ক (Plutarch) বড় সুন্দর একটী কথা বলিয়াছেন—

"It is well to go for a night to another man's fire but by no means to tarry by it instead of kindling a torch, of our own."

অর্থাৎ আমরা আলোর জন্য অন্যকর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখীন হইব, কিন্তু ঐ অগ্নির নিকটই দাঁড়াইয়া থাকিব না, আমরা নিজের মসাল জ্বালিয়া সঙ্গে নিয়া আসিব। ইতিহাস পাঠেও আমাদিগকে এই নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানালোকের সহায়তা লইয়া আমরা নিজ জ্ঞান প্রদীপ্ত করিব। আমরা নিজ জ্ঞানের উন্নতি করিব বটে, কিন্তু প্রথমতঃ অপরের জ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বঙ্গের বৈষ্ণব কবি। (২)

কবিকর্ণপুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

মহাত্মা কবিকর্ণপুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ব্বাবতারে শ্রীগুণচূড়া সখী। যথা বৈষ্ণবাচার দর্পণে;—

"গুণচূড়া সখী হন, কবিকর্ণপুর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্য শাখা শূর॥"
"বৃদ্ধ পাদাঙ্গুষ্ট প্রভু, যার মুখে দিলা।
পুরীদাস নাম বলি, শক্তি সঞ্চারিলা॥"

ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত এবং তদীয় কৃপাপাত্র। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের ৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৪৯ শকে কাঞ্চনপল্লী অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় অম্বষ্ঠকুলে সেন শিবানন্দ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫০ পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃক্রম কালে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইনি যখন বালক, অর্থাৎ ইঁহার বয়স যখন ৭ বৎসর; সেই কালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহার বদন হইতে (বিনাধ্যয়নে) এই নিম্নোক্ত শ্লোকটী স্ফূরিত হয়;—

"শ্রবণোঃ কুবলয় মক্ষ্ণো, রঞ্জন মুরসো মহেন্দ্র মণিদাম,
বৃন্দাবন রমণীনাং মণ্ডন মখিলং হরির্জয়তি ॥"

"সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐ যে শ্লোক করে লোকে চমৎকার হন ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ইনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার প্রসাদাৎ বাল্যকাল হইতেই কবি,এবং কবি নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা (১) আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু (২) বৈষ্ণবাভিধান (৩) শ্রীচৈতন্য-চরিত কাব্য (৪) শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক (৫) শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা (৬) শ্রীচৈতন্য শতক ও স্তবাবলী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত সকল গ্রন্থেই শক সংখ্যা আছে। যথা, প্রথমতঃ

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ;—

"শাকেচতুর্দ্দশ শতে রবিবাজিযুক্তে ;
গৌরহরিধরণিমণ্ডলে আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি, তদীয় লীলা ;
গ্রন্থোঽ মাবির ভবতঃ কথমস্য বক্তাৎ ॥"

দ্বিতীয় গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকায় ,—

"শাকে বসু গ্রহ মৃতে, মনুনৈব যুক্তে ;
গ্রন্থোঽ মাবির ভবতঃ কথম সমস্তাৎ।
চৈতন্যচন্দ্র চরিতামৃত, মগ্ন চিত্তে ;
সোধাঃ সমাকলিত, গৌর গণাখ্য এষঃ ॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থেই প্রকাশ যে, কবি ১৪৯৪ শকে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক এবং ১৪৯৮ শকে শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা লিখিয়াছিলেন। ভক্তদিক্ দর্শিনীর প্রমাণানুসারে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীকবিকর্ণপুর অপেক্ষা বয়সে বেশী ছিলেন। কিন্তু তা হইলে কি হয়? কবি কর্ণপুর কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি প্রকাশ হইবার বহুদিন পরে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের অনেক শ্লোক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ব্যক্ত আছে।

শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিবার প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্ম শক এবং গ্রন্থ পূর্ণ হইবার কাল যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও সেই ভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিবার প্রারম্ভেই সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম শকের উল্লেখ ও গ্রন্থ পূর্ণ করিবার কাল লিখিয়াছেন। ফলতঃ এই বঙ্গভূমে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হস্তাক্ষরী এবং ছাপার গ্রন্থ অনেক স্থানে অনেক আছে বটে, কিন্তু কবিরাজের কৃত প্রথম ও শেষ শ্লোক এক স্থানে ভিন্ন অন্য কোন স্থানে কোন গ্রন্থে দেখি নাই। বনবিষ্ণুপুর মল্ল রাজ্যের এক অংশ রাইপুরস্থ রাজধানীর গ্রন্থভাণ্ডারে যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ আছে,তাহার আদি লীলার প্রথমে ও অন্ত্যলীলার শেষ ভাগে পশ্চাৎ লিখিত ২টী শ্লোক আছে, সেই গ্রন্থখানি ১৫০৫ শকের লিখিত। অর্থাৎ যৎসময়ে শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে যাবতীয় গ্রন্থ বঙ্গে আনিয়াছিলেন, যৎসময়ে দস্যু কর্ত্তৃক সমস্ত গ্রন্থ লুঠ ও বিষ্ণুপুর রাজভাণ্ডারে সুরক্ষিত হইয়াছিল,সেই সময়ে মুল গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রীআচার্য্য প্রভুর আদেশে রাজ সভাপণ্ডিত শ্রীব্যাসাচার্য্য স্বয়ং ঐ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এক সময়ে ঐ গ্রন্থখানি চাক্ষুষ দর্শন করিয়া নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছি। গ্রন্থের প্রথমেই আছে ;—

"শাকে মুনির্ব্বোম, যুগেন্দু গণো,
পুণ্যে তথা ফাল্গুনি, পৌণ্য মাস্যাং ;
ত্রৈলোক্য ভাগ্যোদয়ে, পূর্ণকীর্ত্তি ;
প্রভুঃ শচীমন্দির, আবিরাসীৎ ॥"

আবার অন্ত্যলীলার শেষ পৃষ্ঠায় আছে ;

"শাকাগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ, জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽং পূর্ণতাং গতা ॥"

ইহার প্রথম শ্লোকের অর্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম কাল ১৪০৭ শক, দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থে গ্রন্থ পূর্ণ হইবার কাল ১৫০৩ শক। এই ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের অসিত পক্ষের পঞ্চমী দিবসে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন।

আজ কাল কোন কোন মহাত্মা মুদ্রা যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল অর্থাৎ পরিশুদ্ধ বলিয়া টীকা টিপ্পনী ও শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সহিত যে চরিতামৃত গ্রন্থপ্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার ভিতর শেষের শ্লোকটী এইভাবে লেখা আছে, যথা,—

"শাকে সিন্ধোগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

ইহার অর্থে গ্রন্থ পূর্ণ হইবার কাল ১৫২৭ শক। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। দুই এক বৎসর নয়, একবারে ৩৪ বৎসরের সহিত দলাদলী।

এদিকে, ভক্ত দিক্‌দর্শিনী তালিকায় (অর্থাৎ যাহারে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুত্রয়ের এবং শ্রীপাদ সনাতন শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুবর্গের এবং প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দের প্রকট ও অপ্রকটাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে, যদ্দৃষ্টে মাস তিথি ধরিয়া বৈষ্ণব পর্ব্বাহ নির্ব্বাহ হয়, তাহাতে দেখা যায়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী দিবসে, একটী আকস্মিক দুর্ঘটন সংবাদে অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে গুপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহাতে যখন ১৫০৪ শকে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কথা, তখন ১৫৩৭ শকে কিরূপে গ্রন্থ পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে? তবে এ ভুলের উৎপত্তি কোথায়? (১) অগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ, (২) সিন্ধোগ্নি। বিবাদ এই শব্দ অঙ্ক লইয়া। ফলতঃ উভয় কবিতার ভিতর এমনই শব্দ অঙ্ক স্থাপন হইয়াছে যে, সহজে সে ভুল ধরিবার যো নাই ও এ পর্য্যন্ত কেহ তা ধরেন নাই। বস্তুতঃ কোন্ লেখা ঠিক? রাজবাড়ীর সংস্থিত গ্রন্থ আধুনিক অথবা যেন তেন লোকের হাতের লেখা নহে। তাহাতে বড় একটা ভুল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভুল থাকিলে অবশ্যই দিক্‌দর্শিনী তালিকার সহ অমিল হইত। যখন তাহা দিক্‌দর্শিনীর সহিত ঐক্য আছে, তখন "সিন্ধোগ্নি" এ অঙ্ক ভুল বলিতে হইবে, এবং সে ভুলের কারণ এই হইতে পারে যে, কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত গ্রন্থ নকল করিবার কালীন ভ্রমে পড়িয়া অথবা কোন প্রমাদজনিত অঙ্ক নির্ণয় করিতে না পারিয়া "অগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ" শব্দ অঙ্কের স্থলে "সিন্ধোগ্নি বাণেন্দৌ" শব্দ অঙ্ক স্থাপন করায় শক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা, অগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ, এই অঙ্ক অর্থাৎ শ্রীশ্রীব্যাসাচার্য্য দেবের লেখাই ঠিক্। যথা, অগ্নি (৩) বিন্দু (০) বাণ (৫) ইন্দু (১) অঙ্কস্য বামাগতিঃ রীতিতে ১৫০৩।

কথিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সংশোধনার্থ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সময়ান্তরে গ্রন্থ খানি দেখিবার ইচ্ছায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু নিজ গ্রন্থভাণ্ডারে সকল গ্রন্থের নীচে রাখিয়াছিলেন। পর দিনে দেখেন, গ্রন্থ খানি সকল গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শেষে

গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু কাহারও নিকট মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। এক দিন ব্রজবাসী ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইষ্টগোষ্ঠি করিতে ছিলেন, এমন কালীন শ্রীকবিরাজ উপস্থিত হইবা মাত্রই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া (ভাষা গ্রন্থ কোন কার্য্যের নহে) এইরূপ বলিয়া সকলের সম্মুখে গ্রন্থখানি যমুনার মধ্য জলে নিক্ষিপ্ত করেন। তদ্দর্শনে কবিরাজ গোস্বামী যার-পর নাই দুঃখিত হন্। কিন্তু গ্রন্থের অদ্ভুত শক্তি। নিক্ষিপ্ত মাত্র নিমগ্ন অথবা স্রোতমুখে ভাসমান না হইয়া বিপরীত দিকে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর ঘাটে লগ্ন হয়। তদ্দৃষ্টে কবিরাজ গোস্বামী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গ্রন্থখানি যেমনি ধরিতে যাইবেন, অমনি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বাধা দিয়া, তদনন্তর নিজেই ঘাটে গিয়া সমাদরপূর্ব্বক গ্রন্থখানি জল হইতে উঠাইয়া মস্তকোপরি ধারণকরতঃ কবিরাজের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে (গ্রন্থখানি) গৌড়াদি দেশে প্রচারের নিমিত্ত নিজ গ্রন্থভাণ্ডারে রাখিয়া দিলেন।

বিদিত আছে যে, কিছুদিন পরে শ্রীজীব গোস্বামী ১৫০৪ শকে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে যখন গৌড়ে বিদায় দেন, সেইকালে অন্যান্য গ্রন্থের সহিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ (গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত) শ্রীআচার্য্য প্রভুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীআচার্য্য প্রভু সম্পুটাবদ্ধ গ্রন্থ সকল শকট পূর্ণ করিয়া তিন জন শকটচালক ও দ্বাদশজন ব্রজবাসী (প্রহরী) এবং শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় আর শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ পুরী গোস্বামী সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড় বঙ্গে আগমন করিবার কালে, মধ্যরাঢ় দেশের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজধানী মধ্যে মল্ল ভূম্যধিকারে, দস্যু কর্ত্তৃক যাবতীয় গ্রন্থ লুঠ হয়। শ্রীআচার্য্য প্রভু সেই বিপদে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ শকটচালক ও প্রহরীদিগকে শ্রীবৃন্দাবনে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় ও পুরী গোস্বামীকে খেতুরীতে বিদায় দেন্। আর শ্রীজীব গোস্বামীকে পত্র লিখিয়া স্বয়ং গ্রন্থানুসন্ধানে বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করেন। এদিকে, ব্রজবাসীগণ সত্বরে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীআচার্য্য দত্ত পত্রিকা শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু হস্তে সমর্পণ করিয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত ও দুর্ঘটন বার্ত্তা নিবেদন করেন। "মণি গেলে কখন কি ফণী বাঁচে না স্থির হয়? এ স্থলে, কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লেখা উচিত নহে, এবং আমাদিগকে তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক ফাটে, তবে প্রেমবিলাস গ্রন্থকার এইমত লিখিয়াছেন;—

"শ্রীজীব পড়িল পত্র, কারণ বুঝিল।
লোকনাথ গোঁসাই স্থানে সকল কহিল॥
শ্রীভট্ট গোঁসাই শুনিলেন সব কথা।
কাঁদিয়া ব্যাকুল অতি, মনে পাই ব্যথা॥
রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে, লোটাইয়া ভূমে॥
বৃদ্ধকালে কবিরাজ, না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন, দুঃখের সহিতে॥" *

সে যাহাই হউক, আমরা বলিব, কবিরাজ অমর। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতা-

---

* প্রেমবিলাস গ্রন্থকারের এই মত। কিন্তু 'কর্ণানন্দ রস' এবং 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থকর্ত্তারমত তাহা নহে। শ্রীশ্রীজাহ্নবী দেবী এবং শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনও কবিরাজ গোস্বামী জীবিত ছিলেন। এবং তাঁহাদের সহিত কবিরাজের সাক্ষাৎ সন্দর্শন ও পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। এ স্থলে ইহার ইহাই মীমাংসা যথা;—
"তর্ক প্রতিষ্ঠা শ্রুতয়ো বিভিন্না বিভাঙ্গ।"

মৃত গ্রন্থ যতকাল সংসারে দেদীপ্যমান থাকিবে, তিনি ততকাল জীবিত। তিনি কে? এখন সে কথা বলিতেছি;—

"কস্তুর্য্যা নন্দদো নর্ম্মা সুদেব্যাঃ কুঞ্জকোত্তরে।
শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজাখ্যাং প্রাপ্ত গৌর রসেৎকবো॥"

কবিরাজ, গতযুগে শ্রীবৃন্দাবনের কস্তুরি মঞ্জরী সখী। ইহযুগে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ নামে বিখ্যাত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার কালে ইনি, রাঢ় দেশের অন্তর্গত নৈহাটীর নিকট ঝামটপুরে অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমুকুন্দ দেব গোস্বামী নামে এক মহাত্মা, (ইনি শ্রীকবিরাজের শিষ্য এই পরিচয় দিয়া) অমৃত রত্নাবলী, রসতত্ত্বসার, রাগরত্নাবলী, আদ্য সারস্বতকারিকা, এবং আনন্দরত্নাবলী প্রভৃতি (সাধন তন্ত্রোপযোগী অনেকগুলি) ভাষাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। সহজ সম্প্রদায়ীগণ সেই সমস্ত গ্রন্থ বহু মান্য করেন। গ্রন্থোদ্ভূত ভজন সকল তাঁহাদের পক্ষে অমৃত তুল্য। কিন্তু অন্যের পক্ষে বিষবৎ। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাই, উক্ত গ্রন্থকার নিজ গুরু শ্রীকবিরাজ সম্বন্ধে "আনন্দরত্নাবলীতে" যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার সেই অমৃতবাণী এ স্থলে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ লিখিতেছি;—কবিরাজের মাতার নাম সুনন্দা, পিতার নাম ভগীরথ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যামদাস। ভগীরথের কিছুমাত্র বিষয় বিভব ছিল না, বড় গরিব ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে কষ্টে স্বষ্টে কালাতিপাত করিতেন। কবিরাজ তাঁহার প্রথম পুত্র। কবিরাজের বয়স যখন ৬ বৎসর, আর শ্যামদাসের বয়স যখন ৪ বৎসর, তখন ভগীরথের মৃত্যু হয়। আবার কিছুদিন পরেই ভাগ্যবতী সুনন্দা পতির অনুগামিনী হন। কাজেই পিতৃমাতৃ বিয়োগজনিত কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস অসহায় ও অনাথ হইয়া পড়েন। একটা কথা আছে,—"অনাথের দৈব সখা।" কবিরাজের একমাত্র পতিপুত্রবিহীনা পিতৃস্বসা নিকটে বাস করিতেন। স্বামী-ত্যক্ত তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তাঁহার বেশ গুজরাণ চলিত। অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল না। তিনি নাবালক ভ্রাতষ্পুত্র দ্বয়কে পাইয়া প্রযত্নের সহিত অপত্যস্নেহে লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত উভয়কেই গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রথম নিযুক্ত করেন। কবিরাজ নিজ মেধাশক্তিবলে অল্পকাল মধ্যেই উত্তমরূপে বর্ণ পরিচয়াদি শিক্ষা করিয়া পশ্চাৎ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণাদি বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত হন। কবিরাজ, বড়ই বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার বিনয়াদিতে অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত বাধ্য হইয়া প্রযত্নের সহিত কবিরাজকে শিক্ষা দিতেন, এবং অধিক ভালবাসিতেন। কবিরাজের বয়স যখন ১৩ বৎসর এবং পূর্ণ পঠদ্দশা, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন ও ১৮ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কবিরাজের পিতৃস্বসা তখন অতিশয় বৃদ্ধা। স্নেহ ও মমতাবশতঃ কবিরাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। কবিরাজের বয়স যখন ২৬ বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃস্বসার মৃত্যু হয়। কবিরাজ পিতৃস্বসার স্বর্গার্থে যাবতীয় কার্য্য সমাধান এবং সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার ভ্রাতা শ্যামদাসের উপর ন্যস্ত করিয়া, সর্ব্বদা হরিসাধন ও হরিভজন এবং শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। ৫০ পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলেই বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন, মনে মনে তাঁহার এই

ইচ্ছা ছিল। এইজন্য তিনি বিবাহ করেন নাই। সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, শ্রীকবিরাজের সেই মনোবৃত্তি শেষে জানিতে পারিয়া, জনৈক ভৃত্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং ঝামটপুর গ্রামে উপনীত হইয়া কবিরাজকে সাক্ষাদ্দর্শন দেন, এবং কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্ত আজ্ঞা করেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে তৎপ্রসঙ্গ এইরূপ বর্ণন আছে। যথা ;—

"এক দিন সেই ঝামটপুর নামে গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে, বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাসের, আনন্দ অন্তর॥
প্রণাম করিলা বহু, করিলা স্তবন।
আজ্ঞা হেলা সর্ব্বসিদ্ধি, যাহ বৃন্দাবন॥"

যে ভৃত্যটী সঙ্গে ছিলেন, তিনি কে? যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"অবধূত প্রভুর এক, ভৃত্য প্রেমাধাম।
মীনকেতন রামদাস, হয় তাঁর নাম॥"

এই মীনকেতন রামদাসের বাড়ীও ঝামটপুর। একদিন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব লইয়া রামদাসের সহিত শ্যামদাসের বহু বিতণ্ডা হয়। শ্যামদাস শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহাতে রামদাস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া "বংশ রহিত হও" এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কবিরাজও নিজানুজের দুর্ব্বৃত্ত ব্যবহারে এবং অর্দ্ধকুক্কুটীবৎ আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই দিন গৃহত্যাগের ইচ্ছা করেন। এমন কালীন আকাশবাণী হয়। কবিরাজ সেই বাণীতে আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া মাঘমাসে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

সারাবলী গ্রন্থে আছে ;—

"আকাশ বাণীতে চিত্তে, পাইয়া আশ্বাস।
যাত্রা করিলন ব্রজে, শুভ মাঘ মাস॥"

কবিরাজ বিনা সম্বলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা নানাদেশ নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে বহু কষ্টে শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইয়া শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুবর্গের শ্রীচরণাশ্রিত হন্। পশ্চাৎ শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার উপদেশে বহু শিক্ষা লাভ করেন। কবিরাজ নিরন্তর প্রভু পাদগণের নিকটে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র দর্শন করিতেন। প্রধান ছয় গোস্বামীর কৃপানুগ্রহে শ্রীকবিরাজ নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত এবং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লেখেন। তদ্দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীঅনন্ত আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া কবিরাজকে বড়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ লীলা প্রকাশ নাই। তন্নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় ভক্তগণ সমবেত হইয়া প্রভুর শেষ লীলা ভাষায় প্রকাশ করিবার কারণ শ্রীকবিরাজকে অনুরোধ করেন। এবং সেইকালে কবিরাজের প্রতি শ্রীবৃন্দাবনের রত্ন পাঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীমদনমোহন জীর স্বপ্নাজ্ঞা শেষে কণ্ঠমালা প্রদত্ত হয়। কবিরাজ সেই প্রসাদী মালা লাভ করিয়া শ্রীগুরুবর্গের উপদেশে এবং ভক্তগণের পরামর্শে গ্রন্থ লিখিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না। কারণ, একে বৃদ্ধ, তাহে জরা, বিশেষতঃ প্রভুর লীলা চাক্ষুষে দর্শন করেন নাই। লিখিতে কর কম্পিত হয়, তায় আবার দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। কেমন করিয়া লিখিবেন, কেমনেই বা সুসম্পন্ন হইবে, দিবা নিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অমনি আকাশবাণী হইল ; চিন্তা কি ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব কড়চা দেখিয়া সমস্ত লীলাবর্ণন কর। কোন বিঘ্নোৎপাদন হইবে না। সেই বাণী অন্য কাহারও নয়, পতিতপাবন শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা ।

কবিরাজ সেই আজ্ঞা বলবান করিয়া শ্রীমুরারি গুপ্তের এবং শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা,এবং নানা পুরাণ ও ইতিহাস সমুচ্চয়ে এবং শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আর শ্রীকবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক দেখিয়া এবং শ্রীশ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতির মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া,১৪৯৪ শক হইতে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া, ৯ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৫০৩ শকে গ্রন্থ শেষ করেন। কবিরাজ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল দৈন্যোক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার কালে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়, সত্য সত্যই তিনি গরিবের ছেলে ছিলেন। কিন্তু নিজে কাঙ্গাল ছিলেন না ; বিদ্যাধনে ধনী এবং ভক্তমুকুটমণি ছিলেন। তাদৃক রত্ন আর জগতে নাই। কে বলেন,তিনি গুপ্ত হইয়াছেন ? তিনি গুপ্ত হইবার ব্যক্তি নহেন। তিনি অমর ; তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে দিন পাঠ না হয়, সেই দিন বিফল। সংসারে যত দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ থাকিবে,তত দিনই তিনি জীবিত। কবিরাজ সকল গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার কৃত পদ পদাবলী ও স্তব স্তবাবলী বড়ই সুমিষ্ট। তাঁহার উপাধির আবার এমনি আকর্ষণশক্তি যে,কৃষ্ণদাস নামটী বলিয়া লোকমণ্ডলে পরিচয় দিতে হয় না। কবিরাজ বলিলেই আপনা হইতে নামটী বুঝায়। তিনি যথার্থই কৃষ্ণদাস, নামেও যা, কাজেও তা। তাঁহার কৃত পদ হইতে এ স্থলে একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিতেছি। যথা—

রাগ ভৈঁর—একতাল ।

"যোড়র নব, গোউর সুন্দর, নাগর বনয়ারি ।
নদীয়া ইন্দু, করুণাসিন্ধু, ভকতবৎসলকারি ॥
বদন চন্দ্র, অধরকন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি, ভানুমুখ, শোভা নিছুয়ারী ॥
কুসুম শোভিত চাঁচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উপর
দশন মতিম, অমিয়া হাস, দামিনী ঘনয়ারি ॥
মকরকুণ্ডল, ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তুভ দীপ্তকণ্ঠ,
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি ॥
মালা চন্দন, চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয়া, রতন নুপুর, যজ্ঞসূত্রধারি ॥
ধরেন্দ্র গাওয়ত, যশোক্তবৃন্দ কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ,
ঠমকে চলত, মন্দ মন্দ, যাহু বলিহারি !
কত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ,
পতিতপাবন, নিতাই চাঁদ, প্রেমদান কারি ॥" (পদসমুদ্র) ১২২৪ ।

শ্রীহারাধন দত্ত।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ । (৫)

ব্যষ্টি ও সমষ্টি ।

ব্যষ্টি শব্দে পৃথক, ভিন্ন ভিন্ন; সমষ্টি শব্দে সম্যক ব্যাপ্তি-সংথীভূত সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ এক। ব্যষ্টি,সাকার, দ্বৈত ও সমষ্টি নিরাকার,এক,অদ্বৈত। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি লইয়া সাকার ও নিরাকারবাদীদিগের মধ্যে আবহমানকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। সাকারবাদী বলেন যে, আমি সাকার ব্রহ্মকেই মানি, নিরাকার ব্রহ্মকে মানি না, কেন না, নিরাকারের রূপ লক্ষণ নাই, উহা মন বাণী অতীত, ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য। মনে উহার ধারণা

হয় না, সুতরাং উহাতে ভক্তি প্রীতি কিছুই আসে না। এ জন্য উপাসনা ও মান্য করিবার অযোগ্য। নিরাকারবাদী বলেন, সাকার মাত্রেই অনিত্য, সুতরাং মিথ্যা। ব্রহ্ম কখন মিথ্যা হইতে পারেন না; বিশেষতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুই নাই, সুতরাং সাকার ব্রহ্ম কিছুই নহেন, কেবল কল্পনা মাত্র, অতএব উহা উপাসনার অযোগ্য। আজকাল এই বিবাদ ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, প্রকৃত পক্ষে ইহারা কেহই উপাসক নহেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতই সাকার ও নিরাকারের সাধক হইতেন, আর তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধন বল থাকিত,তাহা হইলে তাঁহাদের কখনই এই অজ্ঞানতা ও অশান্তি থাকিত না; কখনই তাঁহারা পরস্পর বাদ বিসম্বাদ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের অবমাননা ও নিন্দা করিতেন না। সাকার ও নিরাকারবাদী উভয়েই পরস্পর পরস্পরের ইষ্টদেবকে "পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দে অভিহিত করেন। কিন্তু এই পূর্ণপরব্রহ্ম শব্দের যে কি অর্থ, তাহা যদি তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই অজ্ঞানতা লয় হইয়া মনে শান্তি আসে। পূর্ণ পরব্রহ্ম, অখণ্ডাকার, অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি শব্দ সাকার ও নিরাকার উভয়কেই লইয়া। সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ছাড়িয়া পূর্ণ হইতে পারেন না, আবার নিরাকার ব্রহ্মও সাকার ছাড়িয়া পূর্ণ হইতে পারেন না। পূর্ণ বলিতে হইলে নিরাকার সাকার উভয়কে এক সঙ্গে বুঝায়; কেবল মাত্র নিরাকারকে কিম্বা সাকারকে পূর্ণ বুঝায় না। ইহারা পরস্পর পৃথক একদেশী ধ্যাষ্টি হয়েন। যেমন একটি পূর্ণ বৃক্ষ বলিতে গেলে ঐ বৃক্ষের মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল, ছাল, ডাঁটা সমস্তই লইয়া পূর্ণ বৃক্ষ হয়, যদি উহার একটী শাখা কি একটী পাতা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে যেমন কখনই পূর্ণ বৃক্ষ বলা যায় না, সেইরূপ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে বৃক্ষস্বরূপ অখণ্ডাকার বিরাজমান আছেন, তাঁহার একটিকে ছাড়িয়া আর একটি কখনই পূর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং একদেশী উপাসনা কখনও পূর্ণ উপাসনা হয় না; এজন্য একদেশী সাধকের মনেও শান্তি আসে না। যিনি নিরাকার ও সাকার অখণ্ডাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসক, আর তাঁহার উপাসনাই পূর্ণ। নতুবা কেবল সাকার ও নিরাকারের পৃথক উপাসনা কখনই পূর্ণ নহে; উহা অনর্থক মনের কষ্ট ও ভ্রম। প্রত্যেক উপাসকের কর্ত্তব্য সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে মনে কোন ভিন্ন ভাব না রাখিয়া পূর্ণরূপের উপাসনা করেন; তাহা হইলে, মনের ভ্রম দূর হইয়া সহজেই শান্তি আসিবে। সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম উভয়ই তোমাদের মাতা, পিতা, গুরু ও আত্মা ও কল্যাণদাতা। নিরাকার ব্রহ্মই এই সাকার জগৎস্বরূপে বিস্তার আছেন। এই জন্য শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

নিরাকার ও সাকারবাদীগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, বিচারপূর্ব্বক দেখেন যে, তাঁহাদের মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য তাহাকে গ্রহণ করিলেই সহজে মনে শান্তি আসে। কিন্তু ইহাও বলি, তাঁহারা যেন স্বার্থত্যাগ করিয়া বিচার করেন। নতুবা সমস্ত পণ্ডশ্রম হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তিকথা।

৪০৫। যে শক্তি দ্বারা আমরা পরমেশ্বরকে পিতা মাতা ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের দেহ মন প্রাণকে তাঁহার নিয়মরূপ আজ্ঞাধীন করিয়া চলি ও তাঁহার পূজা অর্চনাদি করিতে থাকি, সেই শক্তিকেই ভক্তি বলে।

৪০৬। নিম্নলিখিত মহাত্মাদিগের সদ্‌গুণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রতি ব্রাহ্মেরই প্রাণপণে অনুকরণ করা উচিত।

শাক্যসিংহ—নিষ্কাম হইয়া আত্মসংযম করা, নীতি ও ধ্যান পরায়ণ হওয়া এবং পরহিতৈষী হওয়া।

শঙ্করাচার্য্য—জ্ঞান ও ভক্তির বলে অদ্বৈতবাদী হওয়া অর্থাৎ অনিত্য সংসারে সম্পূর্ণ রূপে বিরাগী হইয়া নিত্য সত্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে কায়মনোবাক্যে অনুরাগী হওয়া।

মহম্মদ—আধ্যাত্মিক উপায়াবলম্বনে অপ্রতিম একমাত্র ও অদ্বিতীয় স্বরূপের উপাসনা প্রচার করা।

ঈশা ও চৈতন্য—বিশ্বাস, বৈরাগ্য, বিশুদ্ধ প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের জলন্ত জীবন।

৪০৭। যদি পরের মঙ্গল করিতে চাও, তবে তজ্জন্য নানারূপ কষ্ট বহনে কাতর হইওনা। যে যত কষ্ট সহিষ্ণু, সে তত পরহিত সাধনে সক্ষম।

৪০৮। প্রেমবিহীন কার্য্যই শ্রীহীন। যে কার্য্যের মূলে প্রেম নাই, তাহাতে বিরক্তি প্রবেশ করিয়া তাহার শ্রী নষ্ট করে। সামান্য আহারাদি হইতে সর্ব্বোচ্চতম ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত বিহিত কার্য্য প্রীতি সহকারে সম্পাদন করিবার অভ্যাস কর। জীবনকে প্রীতিময় ও সরস করিবার এমন উপায় আর নাই।

৪০৯। অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্মের সকল সন্তানকে দেখিবে, কিন্তু আবশ্যকমত পাপীদিগের সহবাস ভোগ করিবার সময়ে সাতিশয় সাবধান ও সতর্ক হইবে যেন তাহাদিগের পাপ তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাতে প্রবেশ না করে। হীনতা তাড়াইতে গিয়া আপনি হীন হইও না।

৪১০। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সেই মঙ্গলপূর্ণ মহেশ্বরের আদেশ পালনার্থ সম্পাদন করিতে না পারিলে, মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। এই অবধারিত সত্যানুসারে সাধক যতই ঐ মহান্ ভূমার নিষ্কাম ও অনাসক্তি গুণ স্মরণ, মনন করিতে থাকিবেন, ততই তিনি তাহা তাঁহার জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন।

৪১১। মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন—মনের অবস্থা ৪ প্রকার—সুস্থ, অলস, রুগ্ন এবং মৃত। যাঁহারা সতত সাধন ভজনায় লিপ্ত থাকেন, সংসারে থাকিয়াও অনাসক্ত চিত্ত, সুখ দুঃখে যাঁহাদের মনোবিকার জন্মাইতে পারে না, তাঁহাদের মন সুস্থ। লোভী ও ঔদরিকদিগের মন অলস, কেন না তাহাদের মন কখনই পার্থিব চিন্তা ছাড়াইতে পারে না। ঈশ্বর আরাধনা তাহাদিগের নিকট আগ্রহের বিষয় নহে। পাপীর মন রুগ্ন। পাপকার্য্য তাহার সতত অভ্যস্ত হইলেও সে সর্ব্বদা ভীত। তাহার মন নিতান্ত দুর্ব্বল। অবিশ্বাসীর মন মৃত। অবিশ্বাসী নিরন্তর সন্দিগ্ধ, তাহার মনের সজীবতা নাই।

৪১২। যিনি সেই ভূমা মহান্ ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করিয়া ইহ জীবনের সমস্ত কার্য্য তাঁহারই প্রীতির জন্য অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত

রূপে করিতে ও তাঁহার অনন্ত সত্তাসাগরে আপনার দেহ মন প্রাণ সদা মগ্ন রাখিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ যিনি গৃহী হইয়াও নিরন্তর কায়মনোবাক্যে তাঁহার পবিত্র সহবাস ভোগে সমর্থ, তিনিই জীবন্মুক্ত। আরো সহজ করিয়া বলি, যে ব্যক্তি এই অনিত্য সংসার হইতে সেই নিত্য পূর্ণ মঙ্গলময়ের চরণে আপনার দেহ মন প্রাণকে সদা ফেলিয়া রাখিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

৪১৩। ধর্ম্মভিত্তি নিম্নলিখিত চারিটী উপাদানে নির্ম্মিত—১। স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস (Intuition) ২। প্রত্যাদেশ অথবা দৈববাণী (Revelation through inspiration)। ৩। বিজ্ঞান (Science) ৪। ভক্ত ও মহাপুষদিগের জীবন। (Lives of the prophets)

৪১৪। ব্রাহ্মগণ সামাজিক জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক জাতিভেদ কবে নিবারিত হইবে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞপুরুষই জানেন। সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণ হইতে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির উৎপত্তি। মনুষ্যমাত্রেই ঐ তিনগুণ বিশিষ্ট। অতএব ব্রাহ্মগণ যতদিন না কেবল সত্ত্বগুণে শোভিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ঐ ত্রিগুণভেদী আধ্যাত্মিক জাতিভেদ নষ্ট হইবে না। এজন্য সামাজিক সংস্কার অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রতি তাঁহাদিগের অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

৪১৫। যতদিন না দেবজীবন পাশবজীবনের সঙ্গে একাধারে বাস করিবে, ততদিন ঐ নিত্যতা ও অনিত্যতার বিবাদ চলিবে। দেবজীবন সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হইলে এ বিবাদের শেষ হইবে না। ব্রহ্মকৃপায় ও অপ্রতিহত প্রেমযোগ সাধনে ঐ পার্থক্য-ক্রিয়া ইহলোকে বহুল পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া পরলোকে নিঃসংশয় পূর্ণ হইবে। অতএব কেহ যেন ব্রহ্মসাধনে অবহেলা না করেন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ ও সিদ্ধান্ত দর্পণ।(১)

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বিবিধ, ফলিত ও গণিত। ইষ্টকালে গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থানভেদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের ইষ্টানিষ্ট সম্পাদিত হয়, এ সমুদায় ফলিত জ্যোতিষের বিবেচ্য। পরিদর্শন ও গণিত সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি ও স্থিতি প্রভৃতি বিষয় গণিত জ্যোতিষের বিবেচ্য।

ফলিত জ্যোতিষ আবার দুই প্রকার (১) সংহিতা এবং (২) হোরা বা জাতক। যে শাস্ত্র দ্বারা গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে সুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ, সুবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, রাজকীয় উপদ্রব প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের শুভ বা অশুভ ফল জানা যায়, তাহার নাম সংহিতা এবং যে শাস্ত্র দ্বারা কোন প্রাণীর জন্মকালে গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে তাহার জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম জাতক বা হোরা।(১)

(১) জ্যোতিষাচার্য্য বরাহমিহির জ্যোতিঃশাস্ত্রকে তিন স্কন্ধে বিভক্ত করিয়াছেন। যে শাস্ত্র দ্বারা গ্রহগতি সিদ্ধ হয়, তাহার নাম তন্ত্র বা গণিত (Astronomy)। যে শাস্ত্র দ্বারা লগ্ন ও গ্রহদিগের স্থিতি হইতে জন্মযাত্রা প্রশ্ন বিবাহাদি শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করা যায়, তাহার নাম হোরা স্কন্ধ (Horoscopy)। সংহিতায় ভূ ও নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থের শুভাশুভ ফল প্রদানশক্তির

গণিত জ্যোতিষকেও প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় ; (১) সিদ্ধান্ত ও (২) করণ। কল্পাদি বা কোন যুগাদি হইতে গ্রহাদির স্থিতি গণনা করিবার বিধি, সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং শ্রমলাঘব হেতু কোন শকাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সারণী প্রভৃতির সাহায্যে গ্রহগণের স্থিতি নিরূপণের নিয়মাদি করণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গণনা সুগম করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্ষুদ্রাংশগুলি করণ গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রন্থই মূল, করণ তাহার সংক্ষিপ্ত সার। সুতরাং করণ গ্রন্থে প্রদত্ত কোন ক্রিয়ার উপপত্তি বুঝিতে হইলে সিদ্ধান্তের আশ্রয় লইতে হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিদর্শন দ্বারা তাহাদিগের স্থান নির্ণয় প্রভৃতি জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ। ইহার নাম গোলাধ্যায়। (২) বেধযন্ত্র নির্ম্মাণ, যন্ত্রের ব্যবহার, ভূসংস্থান, গ্রহগতি প্রভৃতি পরিদর্শন সাপেক্ষ বিষয় ও জ্যোতিষের মূলতত্ত্ব প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হয়। গণিতাধ্যায়ে (৩) কেবল গণনা থাকে। ইহাতে পরিদর্শন বা উপপত্তির তাদৃশ প্রয়োজন হয় না। তবে গোলাধ্যায় সম্যক্ না বুঝিলে গণিতাধ্যায় বুঝিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। বস্তুতঃ

"ভোজ্যং যথা সর্ব্বরসং বিনাজ্যং
রাজ্যং যথা রাজবিবর্জ্জিতং চ।
সভা ন ভাতীব সুবক্তৃহীনা
গোলানভিজ্ঞো গণক স্তথাচ।"

কিন্তু গোলজ্যোতিষে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতের সমুদায় শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। নতুবা যোগ বিয়োগ গুণন হরণাদি ক্রিয়া দ্বারা গ্রহগণের স্থিতি ও গতি নির্ণয় করিতে পারিলেও, গণককে শর্করবাহি বলীবর্দ্দের অবস্থাপন্ন হইতে হয়।

জ্যোতিষিকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, বরাহমিহির তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় এক স্থানে লিখিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত ভেদেহ প্যয়ন নিবৃত্তৌ
প্রত্যক্ষ সমমণ্ডল রেখা সংপ্রয়োগা
ভ্যুদিতাং শকানাং ছায়াযন্ত্র দৃগ্
গণিতসাম্যেন প্রতিপাদন কুশলঃ॥

বাস্তবিক, গণিত দ্বারা আগত স্পষ্ট গ্রহাদি শঙ্কুচ্ছায়া অথবা যন্ত্রবেধ দ্বারা যিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে কুশল, তিনিই যথার্থ জ্যোতিষিক।

যে কোন জ্যোতিষই হউক, গণিতের জ্ঞান সকলেতেই প্রয়োজন। ভাস্করাচার্য্য সুন্দর বলিয়াছেন ;—

"প্রাচীন গণকেরা বলিয়াছেন যে, ভুত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের শুভ বা অশুভ ঘটনা ব্যক্ত করিবার জন্যই জ্যোতিঃ শাস্ত্র। কিন্তু লগ্নবল অবগত না হইলে শুভাশুভ জ্ঞান হয় না। ঐ লগ্ন গ্রহাদিগের স্পষ্ট স্থান (১) হইতে, স্পষ্ট গ্রহ গোল হইতে জানা যায়, আর গণিত বিনা গোল বুঝা যায় না। অতএব যে গণিত জানে না, সে কিরূপে গোলাদিক জ্যোতিঃশাস্ত্র বুঝিবে ?"

এদেশে গোলাভিজ্ঞ গণকের নিতান্ত প্রয়োজন। সারণী সম্বলিত করণ গ্রন্থের সাহায্যে পঞ্চাঙ্গ প্রস্তুত করা সহজ। কিন্তু পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে পারিলেই জ্যোতির্ব্বিদ্ হওয়া যায় না। ভারতে প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্ এক্ষণে অতি বিরল। লগ্ন স্থির করিয়া কিম্বা প্রশ্নাক্ষর গণনা দ্বারা মনোভাব বা

বিষয় বর্ণিত থাকে। ইহার আর এক নাম অঙ্গবিনিশ্চয় শাস্ত্র এবং ইহাকে ইংরাজিতে Natural astronomy বলা যাইতে পারে।

(১) Tables. (২) practical astronomy. (৩) Mathematical astronomy.

(১) Observed place of planet.

প্রশ্ন গণনা করিতে অনেক ব্যক্তি পারেন সত্য; তাঁহারা প্রকৃত গণক নহেন, কেবল গণক নামধারী মাত্র।

অন্যান্য শাস্ত্রে যাহাই হউক, জ্যোতিষ এই বিষয়ে পৃথক যে ইহার গনণা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। গণনার কোন ভ্রম হইলে তাহা দৃক্‌সিদ্ধ হইবে না। বস্তুতঃ দৃগ্ গণিতের ঐক্যই জ্যোতিষের প্রধান পরীক্ষা।

গণিতে গণকের ব্যুৎপত্তি থাকিলেই গোলে অভিজ্ঞতা জন্মে না। পরিদর্শনই জ্যোতিষের মূল, তাহাতে অনভিজ্ঞ হইলে জ্যোতিষের গণনার সত্যাসত্য কিরূপে নিরূপিত হইবে?

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশ আমাদের দেশের ঠিক্‌ বিপরীত। জ্যোতিষ যাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা, তাঁহারা ব্যতীত শত শত নরনারী নানাবিধ কার্য্য স্বত্বেও জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা করেন। সুবিধা পাইলেই তাঁহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। অনেক শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় আবাস গৃহের সন্নিকটে এক একটা মাণমন্দির (১) আছে। আমোদ প্রমোদ করিতে হইলে আলোক সাহায্যে গ্রহাদির প্রতিরূপ দেখাইয়া তাহাদের সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য বড় বড় সভা সমিতি আছে। সেখানে জ্যোতিষের সামান্য ঘটনাটি পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হয়। যে দেশে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মাণমন্দির স্থাপন বা জ্যোতিষ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিবার নিমিত্ত অকাতরে প্রচুর অর্থ দান করেন, যে দেশের লোকেরা মৃত্যুকালে বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত ধন "উইল" করিয়া থাকেন, যে দেশে রাজা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সহায়, সে দেশে যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বহুল প্রচার ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। দূরবীক্ষণ ও বর্ণবীক্ষণ (১) যন্ত্রের প্রচুর ব্যবহার দ্বারা গণিত জ্যোতিষের পূর্ব্বোক্ত দুইটী অঙ্গ ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশে আর একটী প্রকাণ্ড অঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক ব্যক্তি এই প্রাকৃতিক জ্যোতিষানুশীলনে (২) সতত রত রহিয়াছেন। সূর্য্যাদি গ্রহগণের উপাদান কি; তাহাদের প্রাকৃতিক ভূগোল কিরূপ; নক্ষত্রদিগের মধ্যে কোন্ নক্ষত্রটি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; চন্দ্রের অমুক কলঙ্কের অমুক অংশটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইবার কারণ কি; এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কি সকল স্থানই সমসংখ্যক নক্ষত্ররাজ্যে পরিব্যাপ্ত; কোথায় নূতন আদিত্যের আবির্ভাব, কোথায় বা তাহার তিরোভাব ঘটিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে। এদেশে পূর্ব্বে দূরবীক্ষণ ছিল না, সুতরাং পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যতীত জ্যোতিষের এই তৃতীয় শাখাটি এ দেশে আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। এক্ষণেও যে ইহা অঙ্কুরিত হইবে, এমন আশাও করা যায় না।

আর কোন্ শাখাটিই বা এদেশে পরিস্ফুট হইতেছে? নানা কারণে কোন বিদ্যারই প্রভূত চর্চ্চা হইতেছে না। অর্থকরী বিদ্যারই এক্ষণে সমাদর, জ্ঞানদায়িনী ও নবশক্তিসঞ্চারিণী ভারতীর এদেশে অবতীর্ণ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন; যাঁহাদের ইচ্ছা ও যত্ন আছে, তাঁহারা অন্ন চিন্তায় কাতর। এদেশের অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তাই আছে।

(১) Observatory.

(১) Spectroscope. (২) Physical astronomy

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য বিদ্যা যেরূপভাবে বিদ্যালয়ে শিখান হইতেছে, তাহাতে উহা দেশীয় মস্তিষ্কে ঠিক যোড় লাগিতেছে না। দেশ কাল পাত্রের বিস্তর প্রভেদ। শ্রীহট্টের কমলার বীজ যে কোন স্থানে রোপিত হইলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে বৃক্ষটি বড় হইলেও, প্রকৃত রস ও জল বায়ুর অভাবে বৃক্ষটী পরিপুষ্ট হয় না।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার এইরূপ অবস্থা। শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের মৌলিকতা বা উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিহীন দুই একটী লোক এখনও আছেন। তাঁহারাই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি কথঞ্চিৎ জাগরিত রাখিয়াছেন।

এখানে এইরূপ একটী মহানুভবের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া যাইতেছে। যাঁহার কথা এখানে বলা যাইতেছে, তিনি মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষাই জানেন না। উড়িষ্যার অরণ্য শৈলময় দুর্গম দেশে, আধুনিক সভ্যতার বহুদূরে, ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাত্মার নাম শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর সিংহ। ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত খণ্ডপাড়া নামক করদ রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজবংশ সম্ভূত। কটক হইতে খণ্ডপাড়া প্রায় ২০।২২ ক্রোশ ব্যবধান। ইঁহার পিতা ৺ শ্যামসুন্দর সিংহ। শ্যামসুন্দর সিংহ উক্ত রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর। ৺নৃসিংহ মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর সামন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। খণ্ডপাড়ার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত নটবর সিংহ মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর রায় সামন্ত, চন্দ্রশেখরের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের পুত্র।

চন্দ্রশেখর সিংহের পূর্ণ নাম, চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত। হরিচন্দন ও মহাপাত্র উপাধি পুরীর রাজার নিকট প্রাপ্ত। রাজবংশ সম্ভূত বলিয়া সামন্ত, সম্প্রতি ইংরাজ গভর্মেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ইঁহাকে ভূষিত করিয়াছেন। (১)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

অদৃষ্ট। (৬)

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের কার্য্যও যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বাঁধা আছে, তাহা দেখান হইয়াছে; বহির্জগতের সমুদয় কার্য্য এক নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়াছে।

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এক দুশ্ছেদ্য নিয়মের অধীন হইয়া চলা ফেরা করিতেছে, পর্য্যায় ক্রমে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হইতেছে। প্রতিদিন এক এক কলা করিয়া চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, ছয় ঋতু পর পর যাওয়া আসা করিতেছে, শীত ঋতুতে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, আবার বসন্ত সমাগমে বনরাজি ফল ফুলে সুশোভিত হইতেছে। কোন্ দিন সূর্য্য গ্রহণ,

(১) উড়িষ্যার সর্ব্ব সাধারণের নিকট ইনি আর একটী নামে খ্যাত। জ্যেষ্ঠ দুই একটি পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে বঙ্গদেশের পিতা মাতা যেমন পরবর্ত্তী পুত্রগণের কুড়োরাম প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন, চন্দ্রশেখরেরও তেমনই একটি নাম "পঠানী সান্ত"। পাঠান হইতে পঠানী এবং সামন্ত হইতে সান্ত নাম হইয়াছে।

চন্দ্র গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতু উঠিবে, কবে ঝড় হইবে, জল হইবে, তাহা স্থির হইয়া আছে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই এক নির্দ্দিষ্ট গতি আছে; মাথার উপর নক্ষত্রটী ফুটিলে তাহার আলোক নির্দ্দিষ্ট গতিতে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে, উত্তাপের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গাছের ফলটী পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ বলে নির্দ্দিষ্ট গতিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। এ জগতের বাহ্য সমুদয় ঘটনাই যদি নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হয় এবং আলোক উত্তাপ হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এক নির্দ্দিষ্ট গতি থাকে, তাহা হইলে মানুষ যে সে নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা করিতে সক্ষম হইবে এবং তাহাদের জীবনের গতি অনির্দ্দিষ্ট থাকিবে, ইহা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

মানুষ ঘটনার অধীন, ঘটনা নিয়মের অধীন; সুতরাং মানুষও যে নিয়মের অধীন, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আরও অন্য প্রমাণ আছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়া আবহমান কাল একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, কখন সে ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, সূর্য্যদেবের কোন দিন উদয় হইতে বা অস্ত যাইতে ভুল হয় নাই; পক্ষান্তে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বৃক্ষের ফল মাটীতে না পড়িয়া কখন উর্দ্ধে উঠে নাই, শীতে বসন্ত বা বসন্তে কখন বর্ষা সমাগম হয় নাই, ঘৃতে অগ্নি প্রজ্বলিত ভিন্ন কখন নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই সমস্ত ক্রিয়ার একীভাব লক্ষ্য করিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে যে, বাহ্য ঘটনা এক অনতিক্রমণীয় নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়াছে। উপরোক্ত কোন ক্রিয়াই যদি আকস্মিক না হয়, আজ হইল কাল নাও হইতে পারে, একথা বলিবার যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে মানুষের ক্রিয়া কেবল আকস্মিক, তাহার খেয়াল অনুসারে যা হয়, একটা যখন তখন ঘটিয়া পড়িতেছে, একথা বলিবারও কাহারও সাধ্য নাই। আমরা বৃত্তান্তের দ্বারা অঙ্কপাত করিয়া দেখাইব যে, মনুষ্য সমাজেও যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে, মনুষ্যও সেই এক দুশ্ছেদ্য নিয়মের অধীন থাকিয়া যেন কলের মত কাজ করিয়া যাইতেছে।

মনুষ্যের কাজ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে, সৎ এবং অসৎ। এই অসৎ কাজ নিবারণ করিবার জন্য এক দিকে ধর্ম্ম প্রচারকগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ লোকের বাড়ী বাড়ী কত সৎ কথা, কত সদুপদেশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, অন্যদিকে রাজা কত আইনকানুন করিতেছেন, অপরাধীগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের উপর কঠোর দণ্ড বিধান করিতেছেন, কিন্তু ফলে যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে। ধর্ম্মের কাহিনী না মানিয়া এবং রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে চুরি করিবার, সে চুরি করিতেছে এবং যে খুন করিবার, সে খুন করিতেছে। ফরাসীদেশীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত কুইটিলেট নানা দেশের এবং নানা রাজ্যের অসৎ কর্ম্মের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চুরি ডাকাতি খুন জখম প্রভৃতি অপরাধের কার্য্য প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক রাজ্যে একভাবে সম্পন্ন হইতেছে—অপরাধের মোট সমষ্টি যে এক হইতেছে, তাহা নহে, প্রত্যেক অপরাধের সংখ্যা এবং প্রত্যেক অপরাধে মোট অপরাধীর সংখ্যা প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি বৎসর এক হইতেছে। নর হ-

ত্যার তুল্য পাপ নাই। রাগারাগি মারামারি হইলে,পরিণাম ফল চিন্তা না করিয়া,ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রায় লোকে হঠাৎ নরহত্যা করিয়া থাকে। ইহা একটী আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য,এই নরহত্যাও প্রত্যেক দেশে প্রতি বৎসর একভাবে সংঘটিত হইতেছে, কেবল যে হত্যার সংখ্যা এবং হত্যাকারীর সংখ্যা এক হইতেছে, তাহা নহে,যত প্রকার অস্ত্রের দ্বারা হত্যা হইতে পারে, তাহার প্রত্যেক অস্ত্রের সংখ্যাও মিল হইতেছে। (Vide Buckle's History of civilization, Vol. I, page 257).

কুইটিলেট কর্ত্তৃক এই সত্য আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে এ যাবৎ সভ্যসমাজে অপরাধের যে সমস্ত তালিকা লওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রতি সন প্রত্যেক অপরাধের কার্য্য যে একীভাবে সম্পন্ন হইতেছে,ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি বাস্তবিক তাহাই হইয়া থাকে, চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধের কার্য্যে কত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা; যাহার বাড়ী চুরি বা ডাকাতি হয়, বা হত্যা করিবার জন্য যাহার উপর আক্রমণ হয়, তাহারা বাধা দিতে পারে, তাহাদের আত্মীয় স্বজন বা পাড়াপ্রতিবেশীরা বিঘ্ন জন্মাইতে পারে; পুলিশের লোকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যদি ঐ সমস্ত অপরাধের কার্য্য এ যাবৎ প্রতি সন এক নিয়মে এবং একীভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে,তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে কখন এ নিয়মের ব্যতিক্রম বা এ ভাবের ব্যত্যয় ঘটিবে, ইহা মনে করা যায় না। সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রত্যূষে উদয় হইতেছেন সত্য, কিন্তু আজ রাত্রিশেষে আর উদয় নাও হইতে পারেন, এ সন্দেহ, সূর্য্যের কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালনে এ প্রকার অবিশ্বাস যদি কাহারও না জন্মায়; তাহা হইলে অপরাধের কার্য্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত হইবে না। তাহা না হইলে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক বৎসর কত জন চুরি করিবে, কত জন ডাকাতি করিবে, কত জন বা নরহত্যা করিবে, বাঁশের বাড়িতে কত জনের প্রাণ যাইবে, তলওয়ারের কোপেই বা কত জনের গলা কাটা পড়িবে, তাহা স্থির হইয়া আছে। অপরাধের কথা ছাড়িয়া একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি—লণ্ডন এবং পারিস সহরের ডাকঘরে শিরোনাম না লিখিয়া কত চিঠী যে ডাকবাক্সতে দেওয়া হয়, প্রতি বৎসর তাহার তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, উক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রতি সন শিরোনামশূন্য চিঠীর সংখ্যাও ঠিক এক হইয়া থাকে, শিরোনাম লিখিতে ভুলিয়া যাওয়া, অতি সামান্য ঘটনা, কিন্তু ইহা দ্বারা বুঝা যায়, প্রতি সন কত লোক যে চিঠীর শিরোনাম লিখিতে ভুলিয়া যাইবে, তাহাও স্থির হইয়া আছে।

সমাজ বলিতে সমাজস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্য গড় করিয়া যাহা হয়, তাহারই নাম সমাজের কাজ—কোন্ সমাজে বৎসরে কত চুরি ডাকাতি ও নরহত্যা প্রভৃতি অসৎ কার্য্য হইবে, তাহা স্থির আছে বলিলে বুঝিতে হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অসৎ কার্য্য স্থির আছে; তাহা হইলে কে চুরি করিবে, কাহার চুরি যাইবে, কে হত্যা করিবে, কাহার বা প্রাণ যাইবে,তাহাও স্থির আছে। কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত;—সৎ ও অসৎ। অসৎ কাজ বাদে

অবশিষ্ট সমুদয় কাজই সৎ, যদি অসৎ কাজ স্থির থাকে, তাহা হইলে, যদিও সৎ কাজের কখন তালিকা সংগ্রহ করা হয় নাই, কিন্তু কার্য্যের এক ভাগ স্থির থাকিলে নিঃসন্দেহ একথা বলা যাইতে পারে যে, অপর ভাগও স্থির আছে। দোল, দুর্গোৎসব,ব্রাহ্মণভোজন দান ধ্যান হইতে নরহত্যা, আত্মহত্যা, চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত কে কবে কি করিবে, তাহা সমস্তই যদি স্থির থাকিল, এমন কি, কে কবে চিঠীর শিরোনামটী পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া যাইবে, তাহাও যদি স্থির হইল, তবে আর আমাদের জীবনের কার্য্য স্থির করিতে বাকী কি থাকিল ?

নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু উপরে আমরা মনুষ্য সমাজের যে একটী কার্য্যের একীভাব দেখাইয়াছি, তাহা বহির্জগতের কোন কার্য্য অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে। সূর্য্য প্রতিদিন প্রাতে উদয় হইয়া সন্ধ্যাকালে অস্ত যাইতেছে, তাহার দৈনিক কার্য্যে কেহ কখনও প্রতিবন্ধক হয় নাই বা বাধাও দেয় নাই, এ অবস্থায় তাহার গতি অপ্রতিহত থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু মনুষ্যকে প্রতিনিয়তই যেন বিঘ্ন বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। অথচ মনুষ্যসমাজের ক্রিয়া যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে, সমাজের এ অবস্থা স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়, মনে হয় মানুষও নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নৈসর্গিক নিয়মের অধীনে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিয়াছে, যে যাহা করিবার সে তাহাই করিতেছে, তজ্জন্য কাহারও যশ কাহারও বা নিন্দা হইতেছে, অবশেষে সকল লোকের সকল কাজ গড় করিয়া দেখা যাইতেছে, সমাজের কাজ যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। আমরা নিয়মাধীনে কাজ করিতেছি, এ কথা বলিলে আর কাজের উপর আমাদের দায়িত্ব থাকে না, দায়িত্ব বোধ না থাকিলে পাপ পুণ্য উঠিয়া যায়—ইহা অতি সর্ব্বনাশের কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু পাপ পুণ্য কি ? পরে এবিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মতামত বা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। উনসিয়া (কোটালিপাড়া) আর্য-বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র।—আমরা এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান পত্র পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। এদেশে স্কুলের ধরণে ক্লাসে ক্লাসে সংস্কৃত অধ্যাপনার চেষ্টা এই নূতন। ইহা অতি পবিত্র এবং মহৎকার্য্য। আমরা এ বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা অনুষ্ঠান পত্র এখানে তুলিয়া দিলাম।

"কোটালিপাড়া বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহারা চিরদিন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গৌরবের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালপাত করিতেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সংস্কৃতভাষা একরূপ হীনপ্রভ হইয়াছিল বলিয়াই আমাদিগের সংস্কৃত চর্চ্চাও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিক্রমপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিত সমাজের অধ্যাপকগণ ছাত্রাধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ

শিথিল হইয়াছেন বলিয়া ছাত্রদিগের অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষাপ্রধান দেশে শিক্ষার অভাবে ধর্ম্মবিপ্লব, পারিবারিক অর্থ ক্লেশ দিন দিন উপস্থিত হইতেছে।

এই সকল অভূতপূর্ব্ব উপপ্লবের অপনোদন বাসনায়, বিগত বৈশাখ মাসে (১৩০০) উনসিয়া গ্রামে আর্য্য-শিক্ষাসমিতি নামে একটী সভা, স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাটীতে সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের ১৩২ জন ছাত্রের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। সমিতি সমাগত ছাত্রমণ্ডলীর উৎসাহ দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের বাটীতে আর্য্য-বিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত ৫ জন ও বঙ্গভাষার শিক্ষক ১ জন বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আজ পর্য্যন্ত করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় ১২৫ একশত পঁচিশ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়া যথা নিয়মে স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও বাঙ্গালা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ভদ্র সন্তান সকলেই বিদ্যালয় রক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু ধনহীন দেশ এই গুরুকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। দরিদ্র-সন্তান ছাত্রগণ উপযুক্ত বেতন দিতে পারে না; এমন কি, স্ব স্ব পাঠ্য পুস্তক অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে না পারিয়া কঠোর পরিশ্রমে পুস্তক লিখিয়া অধ্যয়ন সম্পন্ন করিতেছেন। ধনহীন সম্পাদকগণ বিদ্যোৎসাহী মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্যলাভ করিতে না পারিলে বিদ্যালয় স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিবে না। দয়ার্দ্রহৃদয় শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগের মনোরথ সফল করুন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক।—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কালিদাস তর্করত্ন। বঙ্গভাষার শিক্ষক, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ঠাকুর। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ, শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী। সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্করত্ন। সমিতির সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হিরালাল চক্রবর্ত্তী।"

এই অনুষ্ঠান পত্র পাঠে পাঠকগণ সমস্ত অবগত হইলেন। এরূপ কার্য্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যতীত কখনও দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। এজন্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়। এই পবিত্র কার্য্যে যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। বঙ্গদেশের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় এ কাজের প্রধান উদ্যোগী এবং সভাপতি। তিনিই সাহায্যের টাকা গ্রহণ করিবেন। স্থানান্তরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামে পশ্চিমপাড়, কোটালিপাড়া পোষ্ট, ফরিদপুর, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। আর্য্য ভাষায় অনুরাগী ব্যক্তিগণ যে মুক্তহস্তে এ কার্য্যের সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। সকলে তৎপর হইয়া বিদ্যালয়টীর জীবন রক্ষা করুন, ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা। কাশীর বেদ-বিদ্যালয়ের ন্যায় ইহাও সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য পাইবার একান্ত উপযোগী।

২। কুন্তলীন।—আমরা এক শিশি কুন্তলীন উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহা ব্যবহার করিয়াছি। আমরা দেশের সমস্ত সুবাসিত নারিকেল তৈল ব্যবহার করি নাই, সুতরাং তুলনা করিতে পারিলাম না। কেশ সংরক্ষণ এবং মস্তক শীতল করার ইহার কতদূর ক্ষমতা আছে, দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিয়া সে সম্বন্ধে মত দেওয়া কঠিন। তবে এ কথা বলিতে পারি, তৈল খুব সুপরিস্কৃত এবং সুগন্ধ-যুক্ত হইয়াছে।

৩। হিন্দু-বিস্কুট।—কে, সি, বসু এণ্ড কোং নিকট হইতে আমরা একটিন বিস্কুট উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছি। টিনে ৩ রকম বিস্কুট ছিল, আমরা আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি, ইহা বিলাতী বিস্কুটের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হইলেও কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে। বিস্কুটগুলি দেখিতে সুন্দর। স্বাদ অতি মধুর। দেশীয় লোকের দ্বারা দেশী কারখানায় এরূপ জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা সহজে সকলে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমাদের কোন কোন বন্ধুও এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানিয়াছি, ইহা দেশীয় লোকের দ্বারা প্রস্তুত। এ জিনিষ বাঙ্গালার স্বদেশপ্রাণতাময় এই উন্নতির যুগে খুব আদৃত হইবে, আশা করি।

৪। বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর মুদ্রা যন্ত্রের সচিত্র আদর্শ পুস্তক।—মুদ্রাঙ্কণ ও রবারশীল প্রভৃতির নিয়মাদি সম্বলিত। মূল্য ।৵০। বি, কে, দাসের কারবার বাঙ্গালীর আদর্শ। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহাদের কার্য্যাদি দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, এই কারবারের ভিতরে এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মস্তিষ্ক পরিচালনা হইতেছে, যিনি কর্ম্মদক্ষতায় বাঙ্গালীর আদর্শ এই আদর্শ পুস্তকখানি দেখিলেই আমাদের এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমরা আর কখনও বাঙ্গালীর কোন ছাপাখানা হইতে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সচিত্র কার্য্য-তালিকা বাহির হইতে দেখি নাই। দ্রব্যাদি যেমন পরিপাটী, ছাপা তেমনই পরিষ্কার। কেবল ছবি দেখিবার জন্যও যদি কেহ ।৵০ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক ক্রয় করেন, পয়সা ব্যর্থ হইবে না। যাঁহারা কার্য্যাদি করাইতে ইচ্ছা করেন, এ আদর্শ পুস্তক তাঁহাদিগকে অনেক শিক্ষা দিবে। বাঙ্গালীর দ্বারা এরূপ একখানি "ক্যাটালগ" প্রস্তুত হওয়া খুব গৌরবের বিষয়।

৫। লুপ্ত রত্নোদ্ধার—বা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী।—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরচিত ভূমিকা সহিত, মূল্য ৩৲, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরি, প্রকাশক। যোগেশ বাবু বঙ্গের এই অমূল্য রত্নোদ্ধার করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রের নিকটই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থল কত উচ্চে, বঙ্কিম বাবুর কথায় সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইবে, "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা

বাঙ্গালী দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।" প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।

গদ্য সাহিত্যে মহাত্মা রামমোহন, এবং তৎপর মহাত্মা বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার যাহা করিতে পারেন নাই, প্যারীচাঁদ তাহা করিয়াছেন। প্রকৃত বাঙ্গালার সৃষ্টি ইহা হইতে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের দ্বারা এই ভাষা সংস্কৃত, সরল, মধুরতর হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার আদি গুরু।

ইহা ভিন্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ত্তমান উন্নতিযুগ আনয়নের মূলীভূত কারণ। "তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" উৎকৃষ্ট উপন্যাস, তদানীন্তন সমাজ চিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি। পড়িতে পড়িতে লেখকের উন্নতি এবং সংস্কারপিপাসা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" ইহার দ্বিতীয় গ্রন্থ ;—ইহাতে গ্রন্থকারের সংস্কার পিপাসা কতদূর বাড়িয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি 'গরু কেটে জুতা দান' প্রসঙ্গে অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন—তিনি যখন নানা উদাহরণ প্রদানের পর রামলাল বাবুর প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"তিনি কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্ব্বক কত কত ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহাপাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রদ্ধা ও পূজার দান করিলে কি পার পাইবেন? সে কেবল গরু কেটে জুতা দান"—তখন তাঁহার অসাধারণ হৃদয় শক্তির পরিচয় পাইয়া মোহিত হইয়া যাই। তার পর স্ত্রী শিক্ষার জন্য "বামারঞ্জিকা" লেখেন। ইহাতে স্ত্রীলোকের শিক্ষোপযোগী অতি সুন্দর সুন্দর কথা আছে। তাঁহার "যৎ কিঞ্চিৎ" নামক পুস্তকের ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। অতি উদার মত, অতি উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব। তাহার 'অভেদী'—উপন্যাস সমাজ-সংস্কারের বহু কথায় পূর্ণ। "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা"য় অনসূয়া, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি আর্য্য আদর্শ মহিলাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের জন্য রচিত। "আধ্যাত্মিকা" ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য গল্পাকারে লিখিত। "ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত" ও "বামাতোষিণী" ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য রচিত হয়। "কৃষি পাঠ" জমীদার ও কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য লিখিত। "গীতাঙ্কুর"—ভগবদ্গীতে পূর্ণ। তাঁহার এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশের এক সময়ের ইতিহাস বিশেষ। তখনকার লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল, তখন কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নতির চিত্র সূচিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে অতি সুন্দররূপে বুঝা যায়। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ত্তমান উন্নতির অন্যতর অধিনায়ক। ১৮১৪ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮৭১ খ্রীঃ 'অভেদী' লেখেন, ১৮৮০ খ্রীঃ 'আধ্যাত্মিকা' প্রকাশ করেন। তিনি বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় রামমোহন রায়। অসাধারণ প্রতিভাবলে, সাহিত্যে নূতন যুগের অভ্যুদয় করিয়াছেন এবং নানাপ্রকার সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। এমন সময়

আগমন করিবে, যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের এই সকল কাজ স্মরণ করিয়া তাঁহার নামে লোকে পূজা করিবে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি উচ্চ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে মোহিত এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। আমরা তাঁহার গীতাবলীর শেষ গীতটী তুলিয়া দিলাম।

বাগেশ্রী—তাল কাওয়ালি।

প্রেমনগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই,
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃতপান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।

প্যারীচাঁদ মিত্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি;—বাঙ্গালার সেই সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথেই আমরা পাদচারণা করিয়া ধন্য হইতেছি। তিনি বঙ্গের সুসন্তান, অমূল্য সন্তান। তিনি আজ স্বর্গে, কিন্তু তিনি তাঁহার যে হৃদয়ের ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল তাঁহার আদর থাকিবে। বর্ত্তমান উন্নতিযুগের যে যে বিষয় চিন্তা করি, সকলের মূলেই তিনি ছিলেন, সকল বিষয়েই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমূহ, বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন। এ রত্ন যিনি উদ্ধার করিয়াছেন,তাঁহাকে শত শত প্রণাম। বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা আদর করেন,কণ্ঠে স্থান দিতে অপমান বোধ করেন না, লিখিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না, আশা করি, "আপন ধন আদরের ধন" মনে করিয়া তাঁহারা বঙ্গের এই অমূল্য রত্নের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া, গর্ব্বিত পৃথিবীকে দেখাইবেন যে, বাঙ্গালী প্রকৃত রত্নের আদর জানে।

৬। মন্ডেল কাকা বা বসন্ত-কুমারী—গার্হস্থ্য উপন্যাস।—ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই, নাম না দিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পুস্তক খানির ভাষা লালিত্য-বিহীন,চিত্রগুলি অসম্পূর্ণ এবং ঘটনাগুলিও সুকৌশলে সাজান হয় নাই। বঙ্গীয় উপন্যাস মণ্ডলে আজ কাল যে সকল আবর্জ্জনা পূর্ণ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, এখানি তাহারই মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত।

৭,৮,৯,১০। দারোগার দপ্তর—১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা।—শ্রীপ্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রিয় বাবু মাসে২ এক এক অংশ করিয়া তাঁহার "দারোগার দপ্তর" প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেক সংখ্যায়ই এক একটী ভিন্ন ২ ক্ষুদ্র গল্প রহিয়াছে। গল্পগুলি সরল, সরস ও সতেজ ভাষায় লিখিত। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে না। এই প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১১। পরিণয় কাহিনী।—২৬নং স্কট্‌স্ লেন, ভারত-মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার আপনার নাম পরিচয় দেন নাই – নাম না দিবার কারণ কিছু দেখি না। হিন্দু সমাজে আজ কাল কন্যাপণ, বহুবিবাহ ও বৃদ্ধের পক্ষে বালিকার বিবাহ এবং টাকা, কড়ি, মান মর্য্যাদা লইয়া যে সকল অনর্থ ঘটে ও তাহাতে যে২ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, এই পুস্তকে তারই ৫টী জলন্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাস আকারে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তেজের সহিত, সকরুণ ভাষায়, এই সকল কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যেক কাহিনীর প্রথমে "মনু" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐ সকল জঘন্য ক্রিয়া কাণ্ডের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাজে এই প্রকার পুস্তক যত প্রচারিত ও পঠিত হয়, ততই মঙ্গল।

১২। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী— শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত। বঙ্গের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন দ্বারকানাথ মিত্র। ১২৪০ সালে জন্মগ্রহণ, এবং ১২৮০ সালে তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়। ১২৯৯ সালে তাঁহার একখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা ১৩০০ সালে সমালোচনা করিতে বসিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক করেন, তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে, যে জাতির শিরোভূষণ হইয়া দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জাতি এরূপ ভূষণের সম্যক্ উপযুক্ত হয় নাই। বোধ হয় যেন এজন্যই বিধাতা এমন রত্ন অসময়ে কাড়িয়া লইয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত আগুন্সী গ্রামে হরচন্দ্রের পুত্র দ্বারকানাথের জন্ম হয়। হরচন্দ্র মাসিক ২০৲ টাকা আয়ের জনৈক মোক্তার ছিলেন, কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। দ্বারকানাথ প্রখর বুদ্ধি, মেধাবী ও কতক পরিমাণে দুষ্ট কিন্তু সরল স্বভাব বালক ছিলেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন শীর্ষ স্থানীয়। সাহিত্য ও গণিত, উভয়ে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। লুই জ্যাকসন তাঁহার ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞতার এইরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন ; যথা—

"Among his most brilliant qualities was his surprising command of the English language; the readiness, precision and force with which he used that language are not common even among those who speak it as their mother tongue and were the theme of constant admiration."

জীবনী-লেখক বলেন, দ্বারকানাথের উকীল জীবনের একটী বিশেষ সুখ্যাতির কারণ এই যে, তিনি "জানিয়া শুনিয়া কখনও কোন মিথ্যা মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিতেন না।" এই সত্যানুরাগই সম্ভবতঃ তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলীভূত কারণ। একজন বারিষ্টার বলিয়াছেন "There is no chance of getting a case against Dwarkanath." যিনি সত্য মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিবেন, তাঁহার জয়ের সম্ভাবনা অধিক না হইবে কেন? ওকালতীতে "১০ বৎসরে তিনি সাত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।" কিন্তু যে মোকর্দ্দমায় তাঁহার প্রতিপত্তির একশেষ হইয়াছিল, সেই ঠাকুরমণি দাসীর মোকর্দ্দমায়, যাহাকে বিখ্যাত রেণ্ট-কেস (Rent case) বলে, তাহাতে তিনি একটী পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। বিচারপতি হইয়া দ্বারকানাথ যেরূপ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেশের লোকের কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজেরা তাঁহার বিচার-ক্ষমতায় কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলি কেনিডি সাহেবের কথায়ই তাহা বুঝা যায়। যথা,—

"No Judge inspired us with more confidence for high intellect, for none had we a higher respect and there are few indeed, if any, who, we felt more certain would take the most accurate and at the same time, widest view of every question that was placed before him for decision."

দ্বারিকানাথ মিত্র ধর্ম্মে প্রত্যক্ষবাদী ও কর্ম্মে হিন্দু ছিলেন। উপধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মকে চিনিয়া লইতে পারিলে, কোমতের প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) হইতে উহার বড় বিভিন্নতা থাকে না। "পজিটিভিজমের প্রতি দ্বারকানাথের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি দাঁড়াইয়াছিল যে, ইনি ফ্রান্সে যাইয়া কোমতের জন্মভূমি দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।"

কায়স্থ প্রতিভা যে কতদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও দ্বারকানাথ মিত্র এবং মধুসূদন দত্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত তাহার নিদর্শন স্থল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত দুরাদৃষ্ট বশতঃ কখন দেখা হয় নাই। কিন্তু অপর তিন ব্যক্তিই যে কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহ।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনীতে অনেক শিক্ষাপ্রদ জিনিষ আছে এবং কালীপ্রসন্ন বাবু তাহা যথাযথ ভাববর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব।

১৩। জানকী বিলাপ—শ্রীরাজমোহন দত্ত প্রণীত। আমরা এ পুস্তক পড়িয়া প্রীতিলাভ

করিয়াছি। আজকাল যেরূপ চাঁদের হাসি, ফুলের কান্না ও ভাবের খেয়ালের দিন পড়িয়াছে, তাহাতে এমন প্রাঞ্জল, এমন মধুর ও এমন করুণ কবিতা অল্পই দেখা যায়। ইহার ভাষা অতি বিশুদ্ধ। যেমন জানকীর হৃদয় সরল ও অকপট সতীত্বের লীলাস্থল, তেমন রাজমোহন বাবুর কবিতা আড়ম্বর-শূন্যা ও সরলতাময়ী। ইহাতে অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা নাই বটে, কিন্তু যাহা আছে, তাহা অতি সুন্দর।

বাল্মীকির আশ্রম বর্ণনে গোল্‌ডস্মিথের হারমিটের ছায়া পড়িলেও অতি প্রাঞ্জল ও সুন্দর হইয়াছে এবং অন্যত্র অনেক প্রাঞ্জল ও সুন্দর কবিতা আছে।

১৪। আর্য্যনারী।—শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকারের মতে আর্য্য শব্দ হিন্দু-জাতির একচেটিয়া, সুতরাং "আর্য্যনারী" শব্দে পাঠকেরা হিন্দুনারী বুঝেন, সমালোচকের ইহাই প্রার্থনা। হিন্দুনারী সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে (১) অন্তর্জাতি বিবাহ (২) স্ত্রীশিক্ষা (৩) বাল্য বা যৌবন বিবাহ (৪) স্ত্রীজাতির পদ মর্য্যাদা (৫) বৈধব্য বা বিধবা বিবাহ (৬) অবরোধ প্রথা (৭) সহমরণ প্রথা। কিশোরী বাবু প্রথমোক্ত বিষয় চিন্তার অবসর প্রদান করেন নাই। মুসলমান, দেশীয় খ্রীষ্টান ও অনাচরণীয় হিন্দু লইয়া দেশের বার আনা লোক। ইহাদের সহিত আমাদের কোন সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ আবশ্যক কি না, এ বিষয়, কিশোরী বাবু কেন, কেহই চিন্তা করেন, এমন বোধ হয় না। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজেও জাতিভেদ মানিতে নাই, অথচ অদ্যাপি কোন ব্রাহ্মিকা কি কোন মুসলমানকে পাণি প্রদান করিয়াছেন? ফলে এদেশের সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদ প্রথায় অনুপ্রাণিত, তাহাতে যদি কিশোরী বাবুর ন্যায় একজন বর্ণ-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হিন্দু অন্তর্জাতি বিবাহের কথা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

অপর ছয়টী বিষয় এই পুস্তকে ধীরতার সহিত অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। তবে বিশ্বাসী যেমন স্বধর্ম্মের সকলই রঙ্গিল দেখেন, কিশোরী বাবুও সেইরূপ হিন্দুনারী চরিত্রে সকলই রঙ্গিল দেখিয়াছেন। তিনি শিশু বিবাহ সমর্থন করেন নাই বটে, কিন্তু বাল্য বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। ভূদেব বাবুর ন্যায় একজন চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ যখন শূদ্রের দাসত্বে আহ্লাদিত, (১) তখন কিশোরী বাবুর ন্যায় একজন কায়স্থ বা শূদ্র স্ত্রীজাতির দাসীত্বে আহ্লাদিত হইবেন, বিচিত্র কি? রাজত্ব ত একজনের উপর করা চাই, পদদলিত শূদ্র অবলাজনের উপর ভিন্ন এমন রাজত্বক্ষেত্র আর কোথায় পাইবে? বলা বাহুল্য, কিশোরী বাবু চিরবৈধব্যের পক্ষপাতী। ইহাতে নাকি জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগ আছে! কিন্তু এই হতভাগ্য হিন্দু সমালোচক যখন এই সমস্ত জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের বিষয় পাঠ করেন, তখন দ্বাবিংশ বৎসরের জনৈক কায়স্থের সহিত আড়াই মাস বয়স্কা এক বালিকার শুভ বিবাহের বাদ্যধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। ঈশ্বর এই যুবা ও শিশুকে দীর্ঘজীবী করুন। কিন্তু যদি দুই এক বৎসরের মধ্যে কলেরা বা মেলেরিয়া জ্বরে যুবকের জীবন শেষ হয়, তবে এই শিশু বিধবার স্বার্থত্যাগটা কি কিশোরী বাবুর না শাস্ত্রকারগণের হইবে? সহমরণ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায়, তাঁহার মতে, জ্বলন্ত সতীত্বের উদাহরণ স্থল বিরল হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ সহস্র শিশু বা বালবিধবাকে আজীবন জ্বলন্ত চিতায় উঠাইয়া দিয়া কি জ্বলন্ত সতীত্বের দৃষ্টান্ত কম প্রদর্শিত হইতেছে? ইহাতেও কি আমরা হিন্দুধর্ম্ম-জীবনের সীমায় উপনীত হই নাই? হা হতভাগ্য দেশ! যেখানে কৃতবিদ্য হিন্দুগণও শাস্ত্র ও আচরণে কত প্রভেদ, তাহা দেখেন না, তাহার অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা ভাবিতেও আমরা অক্ষম। এজন্য কিশোরী বাবুর এত গবেষণাপূর্ণ পুস্তকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আরও যে সকল কথা বক্তব্য ছিল, স্থানাভাবে হইল না।

(১) তাঁহার সামাজিক

একাদশ খণ্ড—ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা-যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত;

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২২শে আশ্বিন, ১৩০০।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲] [এই সংখ্যার মূল্য ॥৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। কার্ত্তিক মাসে প্রেস বন্ধ থাকিবে বলিয়া আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিলাম। কার্ত্তিকের বাকী ৩ ফর্ম্মা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংলগ্ন হইবে। পূজা আসিতেছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণ এই সময় দয়া করিয়া প্রাপ্য মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মফঃস্বলে যাঁহাদের নিকট স্বতন্ত্র মুদ্রিত পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহারা এজেণ্টগণের নিকট যদি কিছু দিয়া থাকেন, তবে, তাহা বাদে বাকী মূল্য পাঠাইবেন।

২। কলিকাতা-মিউনিসিপাল-কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার মহাশয়ের যত্নে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, কমিশনরদিগের জেনেরেল কমিটীতে, সম্পাদকদিগকে লাইসেন্স টেক্স দিতে হইবে না, ধার্য্য হইয়াছে। দীর্ঘকালের চেষ্টায়, অনেক ঘটনার পর, এই মীমাংসা হইয়াছে। সকল সম্পাদক এবং লেখকগণের পক্ষ হইয়া বাবু ভুবনমোহন সরকার এবং কমিসনরদিগকে এজন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সাহিত্যের সম্মান রক্ষা হইয়াছে।

৩। মূল্য প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন।

৪। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা।

১। নানা অপরিহার্য্য কারণে এবার আশ্বিন মাসে সভার পারিতোষিক না হইয়া পৌষমাসে ফরিদপুরের মেলার সময় হইবে।

২। পালং থানায় ভয়ানক ওলাউঠার প্রকোপের সংবাদ শুনিয়া, ২৭শে ভাদ্র হইতে ১৮ই আশ্বিন (১৩০০) পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট সভা ওলাউঠার ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ বিনা মূল্যে ইঁহাদের নিকট ঔষধ পাইবেন। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বেও অনেক স্থানে ঔষধ পাঠান হইয়াছে।

১। বাবু গুরুনাথ দাস, লোনসিংহ। ২। বাবু বসন্তকুমার ঘটক, রুদ্রকর। ৩। চন্দ্র মালাকর, নড়িয়া। ৫। বাবু কালীপ্রসন্ন দাস, পালং। ৬। বাবু অম্বিকাচরণ বাড়রী, তিলৈ। ৭। বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, চাকধ। ৮। বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাকদি। ৯। বাবু জানকীনাথ ঘোষ, পাইকপাড়া। ১০। বাবু কুঞ্জবিহারী বসু, মানাখান। ১১। বাবু কামিনীকুমার গুহ, এড়িকাটী। ১২। বাবু ব্রজলাল ভট্টাচার্য্য, উপসী। ১৩। বাবু দীননাথ কুশারী, আক্সা। ১৪। বাবু জয়চন্দ্র ঘোষ, চণ্ডীপুর। ১৫। বাবু অন্নদাচরণ ঘোষ, সালধ। ১৬। বাবু গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, আটপাড়া। ১৭। বাবু কালীমোহন ভট্টাচার্য্য, কাটালবাড়ী। ১৮। আনন্দচন্দ্র দে, লোনসিংহ।

প্রাচীন ভারতের অবনতি।

আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, মুসলমান অধিকার হইতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। যে কুক্ষণে অদূরদর্শী নীচমনা জয়চাঁদ দেশবৈরী সাহাবুদ্দিনের সাহায্য করিতে প্রণোদিত হইয়া শত্রু হস্তে স্বদেশ অর্পণ করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই হিন্দুর গৌরবভাতি স্তিমিত ও নিষ্প্রভ হইয়া কালের আঁধারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক মহম্মদীয় বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক কি হিন্দুর অবনতি সাধিত হইয়াছে, না, উহারা এই অধঃপতনের দূরবর্ত্তী উপলক্ষমাত্র, আজ আমরা এই প্রশ্নটীর সম্যক পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর্য্য (এরিয়ান) দিগের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য থাকিলেও, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, ভারতীয় আর্য্যগণ হিমাচলের উত্তর পশ্চিম কোণ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ প্রদেশে প্রথমে পদার্পণ করেন। যে ক্ষণে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে আজ কত দিন ? ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাই বলুন না কেন, সে কি যুগান্তরের যুগান্তর পূর্ব্বে নহে ? গ্রাম্যপশুচারণ করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সেই মহানুভব আগন্তুকেরা ক্রমে ক্রমে ভারতের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে অনার্য্য ভারতীয় আদিমবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; এ সব তত্ত্ব পুরাতন হইলেও, আমরা আর একবার এইস্থলে উহার অবতারণা করিলাম। ভরসা করি, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

ভারতে আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকালে তাঁহাদের মধ্যে যে, কোন সমাজ বিধিবদ্ধ ছিল না, তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। জগতের সর্ব্বপ্রদেশেই মানব সমাজের পূর্ব্বাবস্থায় গার্হস্থ্যশাসনবিধি অনুসারিত হইয়াছিল, পরিবারস্থ প্রাচীন ব্যক্তিই সংসার শাসন ও পরিচালনের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদেরই আদেশ স্ব স্ব কুটীরে আইনের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইত। পরিবারস্থ কেহ কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাঁহারাই যথেচ্ছ দণ্ডবিধান করিতেন। ভারতীয় আর্য্যদিগেরও প্রথমাবস্থায় এইরূপ গার্হস্থ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অত্যুচ্চ হিমশিলার পাদদেশে এক একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশে এইরূপে আর্য্যপরিবার পরস্পরে ব্যবহারসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ণ সমাজের অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেছিলেন। কালপ্রবাহের এত দূরবর্ত্তী সময়ে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি অতি সাধারণ ও স্বল্পমাত্র ছিল, এবং ঐ সকল প্রকৃতির লীলাস্থল ভারতপ্রমোদোদ্যানে স্বল্পায়াসেই প্রচুর পরিমাণে মিলিত। জীবিকানির্ব্বাহের উৎকট চিন্তা হইতে মনুষ্য পরিত্রাণ পাইলে, তাহার দৃষ্টি স্বভাবতঃই জড়জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে ধাবিত হয়। সেই জন্য, সুখ স্বচ্ছন্দ-লালিত আদিম আর্য্য হিন্দুগণ প্রকৃতির কারুকার্য্যে সমগ্র মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। যার উপরে প্রখর জ্যোতিষ্মান্ অথবা মৃদু নক্ষত্রাভাসে গাম্ভীর্য্যময় অনন্ত আকাশ ঝুলিতেছে, মধ্যে চির-নীহারাবৃত নীলিমাভেদিশৃঙ্গ বা গিরিরাজি বিচিত্র শ্বাদপসঙ্কুলে পরিশোভিত হইয়া, বিশাল তনুবরকে ঢালিয়া, মানবের নগণ্য ক্ষুদ্রত্বকে ব্যঙ্গ করিতেছে, নিম্নে পুষ্পশোভিতা শ্যামলা ধরণী কমনীয় সৌন্দর্য্যে আবৃতা থাকিয়া প্রকৃতি-

সুন্দরীর মুক্ত চিকুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সেই শান্তিনিকেতন আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুর কল্পনা যে প্রথমে বিকশিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সময়ে কল্পনায় প্রতিভা মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইল। অমনি বীণাপাণির বীণা সুমধুর লহরীতে বাজিয়া উঠিল; ঋকের মঙ্গলস্তোত্রে শান্তিনিকেতন পূরিত হইতে লাগিল। এইরূপে যুগের পর যুগ প্রবাহিত হইয়া গেল। বংশের পর বংশ বৃদ্ধি হইয়া আর্য্য সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; উপনিবেশের পর উপনিবেশ স্থাপিত করিয়া আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে মধ্যপ্রদেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাতে আদিম ভারতীয় অনার্য্যদিগের সহিত সংঘর্ষণ অধিকতর প্রখর হইয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনার্য্যদিগের পরাভব হইতে লাগিল। এই আর্য্যানার্য্য সংঘর্ষণে আর্য্যদিগের মধ্যে অস্ত্রবিদ্যার সম্যক্ আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। নিয়ত ব্যবহারে অভ্যাস-জনিত কৌশল আসিল। আর্য্যদিগের মধ্যে কিয়দংশ অস্ত্রকৌশলে কুশলী হইলেন। উঁহারাই কালে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইল।

মানবের প্রথমাবস্থায় জীবিকোপায়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্প মাত্র; কিন্তু বংশ বৃদ্ধিসহকারে ও কালধর্ম্মে বহুবিধ উপসর্গ উদ্ভূত হওয়ায় জীবিকা-আসবাবেরও বাহুল্য হইতে লাগিল। স্বভাবজাত অথবা অল্পায়াস-লব্ধ দ্রব্যে বর্দ্ধিত সংখ্যকের স্বভাব সঙ্কুলন হয় না, সুতরাং মানবীয় পরিশ্রমে ও যত্নে প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইতে লাগিয়া। এইরূপে কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রথম স্রোত প্রবাহিত হইল। জীবিকা নির্ব্বাহ উপলক্ষে কৃষি বাণিজ্য ব্যতীত আরও অনেক দৈনন্দিন কার্য্য আছে, সে সকল কার্য্য-সাধন নীচ রুচিসম্পন্ন হইলেও অবশ্য করণীয়। বলা বাহুল্য, এই সকল কার্য্যের ভার অধিকাংশ পরাজিত অনার্য্যদিগের উপরই পড়িল। জেতায় ও পরাজিতে প্রভেদ জ্ঞান চিরকালই সমভাবে বর্ত্তমান। প্রাচীন গ্রীকেরা আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া অধীনস্থ ও অপর যাবতীয় জাতি সমূহকে অসভ্য (বারবেরিয়ান) নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, গ্রীসে হারলটের অবস্থা ক্রীতদাসের অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল না, দেশের কৃষিকার্য্যাদি তাহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। রোমাণেরা অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক হইলেও স্যামনাইটস্ প্রভৃতি অধিকৃত জাতি বহু দ্বন্দ্বেও সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে সম অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু অত দূরের কথার প্রয়োজন কি? আধুনিক সভ্যতালোকে গৌরবান্বিত সমদর্শনপ্রিয় ইংরাজ বাহাদুরের বিজিত ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে ব্যবহার উল্লেখ করিলেই, আমাদের বক্তব্য সুদৃষ্টান্তের দ্বারা যথেষ্ট স্পষ্টীকৃত হয়। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যেরাও যে বিজিতদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই।

আমরা এখনও আর্য্য উন্নতির প্রথমাবস্থার কথা বলিতেছি। জাতিবিভাগ লইয়া হিন্দুর প্রকৃত সমাজ গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। জগতে সর্ব্ব সমাজেই এক প্রকার না এক প্রকার ভাবে 'জাতি' শ্রেণী বিভাগ আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ (ডিভিসান অব্ লেবার) প্রাকৃতিক নিয়ম। বর্ষার জলধারায় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া হেমন্তে সুদৃঢ় ও বসন্তের সরস সমীরে মুকুলিত এবং শ্রী-

ম্যের মধুর উত্তাপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ফল ফুল শোভী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মানব সমাজও ঐরূপ পরস্পর সাহায্যাধীন। ঐ জটিল যন্ত্র নানা অংশে সংযোজিত থাকিয়া প্রত্যেকে সুচারু কার্য্য সম্পাদনে সুশৃঙ্খল প্রথায় চলিতে থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ এই তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে তাই শ্রেণীবিভাগ বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে রক্ষার ভার বলদর্পী ক্ষত্রিয়ের উপর স্থাপন করিয়া এবং উদরের উৎকট চিন্তা বৈশ্য শূদ্রের মস্তকে রাখিয়া, শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণকুল, নিরুৎকণ্ঠে ও নির্ব্বিঘ্নে দেহীর যাহা প্রধান আহার্য্য—জ্ঞান, তদনুসন্ধানে ও তদুৎকর্ষসাধনে একাগ্রচিত্তে রত হইলেন। একাগ্রতায় প্রতিভা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। অদ্বিতীয় অধ্যবসায় প্রকৃতির প্রত্যেক স্তরের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিল। এইরূপে আর্য্য হিন্দুর যে জ্ঞান জ্যোতি ক্রমশঃ উন্মেষিত হইয়া,চিক্কণ আলোকচ্ছটায় একদা দূরদূরান্তপ্রদেশকেও উদ্ভাসিত করিয়াছিল, যন্নিঃসৃত বেদ, বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও দেহতত্ত্বশাস্ত্র আজি পর্য্যন্তও জগন্মান্য হইয়া, এই অধঃপতিত হিন্দুকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিতেছে,সেই জ্ঞানজ্যোতি কি কারণে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্শর, গভীর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মনুষ্য সমাজ চেতনাবিশিষ্ট শরীরী বিশেষ। প্রাণী দেহ যেরূপ নিয়মে বৃদ্ধি ক্রমোন্নতি প্রভৃতি স্ফূর্ত্তিলাভ করে, মনুষ্য সমাজ ঠিক তদনুরূপ নিয়মে পরিচালিত হইয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাণী দেহের প্রত্যেক অবয়ব সবল ও কর্ম্মঠ রাখিতে হইলে যেমন ধমনী বহিয়া রক্ত চলাচলের নিতান্ত প্রয়োজন,তেমনই সমাজকেও সুদৃঢ় ও সতেজ রাখিতে হইলে তদ্রূপ কোন তেজঃদায়িনী শক্তিরও প্রয়োজন। সমাজ শরীরে এই রক্তপ্রবাহ, এই তেজঃদায়িনী প্রক্রিয়া কি? প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তা। এই শক্তি, এই চিন্তার প্রবাহ,যে সমাজের সর্ব্বোচ্চস্তর হইতে সর্ব্বনিম্নস্তর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলাচল করিয়া থাকে, সেই সমাজ একটী বিশাল বটবৃক্ষ অপেক্ষাও সুদৃঢ়, তাহার ধ্বংস অতি সুদূরবর্ত্তী। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই কথাগুলির সারবত্তা শীঘ্রই অনুভূত হইবে। এখন দেখা যাউক, ঐ প্রাচীন হিন্দুসমাজ এই প্রাকৃতিক নিয়মের কতদূর অনুকূল বা কতদূর প্রতিকূল ছিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ হইতে যে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অবতারণা হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৎকালীন যাঁহারা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে স্ব স্ব কর্ম্মে আবদ্ধ করার উপর সমাজের শৃঙ্খলতা নির্ভর করে। তাই তাঁহারা শাস্ত্রের কূটজাল বিস্তার করিয়া, বর্ণভেদের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা জনসমাজে প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু ঐ মহামান্য আর্য্য ঋষিদিগের গৌরবার্থে ইহাও কথিত হউক যে, তাঁহারা যে এইরূপ প্রথার সম্বন্ধে কোনই অনিষ্টের আশঙ্কা করেন নাই, এইরূপ সন্দেহ আমরা করিতে পারি না। যেহেতু সে সময়ে আধুনিক মত জাতিভেদের দুর্লঙ্ঘনীয় পার্থক্য ছিল না, তাই

সমাজের নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে উঠিবার জন্য ব্রাহ্মণত্ব গুণের তালিকা হইয়াছিল। যে গুণে সেই সকলের সমতুল্য হইত, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। আবার কুৎসিদাচরণে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণও চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতিত্বে পতিত হইত। সমাজে এইরূপ জাতি পরিবর্ত্তন যে অতি প্রাচীন কালেই অনুমোদিত হইত, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু যতই যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইল, ততই বর্ণবিভাগ রূপ স্তর ঘনীভূত হইয়া দৃঢ়তর হইয়া গেল। গুণমাহাত্ম্যের একটী প্রবল শক্তি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল। উন্নতি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তেজক যে গুণাধিক্য, তাহার অনাদরে সমাজের ঊর্দ্ধ গতি যে শীঘ্রই স্থগিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

এতদিনে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রশস্ত হইল। এখন প্রত্যেকের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। বিশাল হিন্দু সমাজের যে চারি অংশ হইল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি জ্ঞানানুশীলনে রত রহিলেন, ক্ষত্রিয়কুল দেশ রক্ষণে ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান শিক্ষায়ও ব্রতী হইলেন। বৈশ্য কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতি স্থূলতর কার্য্যে নিয়োজিত হইল, আর শূদ্রের পক্ষে দাসবৃত্তি বিধিবদ্ধ হইল। অর্থাৎ একটী পূর্ণ শরীরীর যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাই যথাযথ সংযোজিত হইল। কিন্তু পূর্ণ শরীরীর যে টুকু জীবনীশক্তি,সে টুকু ত রহিল না। জ্ঞানানুশীলনে ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতিভা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু উহার আনন্দময়ী স্ফূর্ত্তি ত সমাজের সর্ব্বস্তরেই প্রতিফলিত হইল না। জলপ্রপাতের প্রবলশক্তি গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়া বিলীন হইয়া গেলে, যেমন গিরিতল পাদপনিচয়ের সৌষ্ঠব সাধিত হয় না, তেমনই ব্রাহ্মণ-প্রতিভা জাতিভেদরূপ সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিয়া অপর ব্যক্তিদিগের কোন উপকারেই আসিল না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রাজবংশীয়গণ বিশেষে যাঁহারা রাজা, তাঁহারাই শাস্ত্রাদি জ্ঞাত হইতেন ও আলোচনা করিতেন, কিন্তু সাধারণ ক্ষত্রিয়বর্গ সামরিক শিক্ষা ব্যতীত যে অন্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত, তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শূদ্র বৈশ্যের কথা ত উল্লেখের প্রয়োজনই নাই। ফলতঃ সাধারণ শিক্ষা (মাস্‌-এডুকেশন) হিন্দু সমাজে কখনই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং সমাজে বেশীর ভাগ ঘোরতর মূর্খ হইল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি অনুশীলিত না হওয়ায় হৃদয়ের অনেক উচ্চবৃত্তি আদৌ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাই দেশহিতৈষিতা, স্বজাতি-অনুরাগ, একতা নিবন্ধন মহাশক্তি প্রভৃতি মহৎ ও পরম কল্যাণকর তত্ত্ব উহাদের মস্তিষ্কে কখনই উদিত হইতে পারে নাই।* ইহার উপর আবার শাস্ত্রীয় ঔদাসীন্য হিন্দু জীবনকে পদে পদে শাসিত করিতেছিল। বেদ বেদান্তের সূক্ষ্ম দৃষ্টি জড়জগতের স্থূল তত্ত্বকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবের উপর বিন্যস্ত। ইহজীবন অসার, হেয়, এ দৃশ্যমান জগৎ মায়াময়, জীবের মায়াতে মুগ্ধ হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত, ইহজীবন স্বল্পস্থায়ী, দুঃখময়, অনন্তজীবন

* "Another element of such an advance, co-operation, has been equally unknown. Division of labor in its literal sense of giving to every man a separate employment, has indeed been carried to its utmost length, but the division of labor, in its economical signification as a method of co-operation has been rendered impossible by the contempt which divides man from man." *W. W. Hunter.*

অনন্ত সুখ লইয়া সাধুগণের জন্য তিষ্ঠিতেছে। এমন মহান্, এমন বিশাল ভাবাত্মক বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা নিতান্ত সহজ নহে। অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সাধারণ হিন্দুসমাজ, অনেক স্বল্পশিক্ষিত উপদেষ্টাও ইহার সারতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া সংসারে একটী অপ্রশংসনীয় উদাসীনতা আনিয়া দিল। সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া, মহান্ উচ্চভাব সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নির্লিপ্ততায় ও সাধারণ উদাসীনতায় বহু প্রভেদ। এ কথা সমাজের বেশীরভাগ বুঝিতে অক্ষম, তাই ইহাদের কাছে জড়জগৎ একেবারেই উপেক্ষনীয় হইয়াছিল। জীবের আত্মার উৎকর্ষ সাধন যেমন ধর্ম্ম, আত্মার আধার, দেহেরও উন্নতি সাধন করা তেমনই ধর্ম্ম। কারণ যতক্ষণ জীবনধারণ করিতে হইবে, ততক্ষণ সমাজে থাকা জ্ঞানানুমোদিত। সুতরাং অন্তর্জগতের অনুষ্ঠেয়গুলি উচ্চ হইলেও বহিঃস্থ জড়জগতের অনুষ্ঠেয়াদি অবশ্য পালনীয়। এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব সমাজে যখন এইরূপ ভাব প্রশংসনীয় রূপে প্রশ্রয় পাইয়াছিল, তখন লোকে যে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত থাকিবে, ইহা আশা করা যায় না।

উপরোক্ত কথাগুলি একবার সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১ম। কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ সূত্র হইতে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে দুর্লঙ্ঘনীয় পরিবেষ্টকে পরিণত হইল। এক পরিবেষ্টকস্থ ব্যক্তি অপর পরিবেষ্টকস্থ ব্যক্তির কর্ম্ম করিতে অক্ষম। করিলে শাস্ত্রানুসারে সমাজ মধ্যে দণ্ডার্হ।

২য়। এই বিশাল হিন্দুসমাজের এক মুষ্টিমেয় মাত্র অংশ ব্রাহ্মণজাতিই কেবল জ্ঞানানুশীলনে রত। অবশিষ্ট সমগ্র সমাজ ঘোরতর মূর্খ হইল, সুতরাং হৃদয়ের অনেক উচ্চ বৃত্তিগুলি অপরিস্ফুট রহিল।

৩য়। জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের সম্যক সামঞ্জস্যেই যে—একের অনুশীলনে নয়—মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি সম্পাদিত হয়, এই মহান্ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিতে না পারায়, সমাজ মধ্যে একটী অনিষ্ট সূচনা হইয়াছিল। লোকের বাহ্যজগতের প্রতি অনাস্থা, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি দেশীয় ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধকের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছিল।

প্রাচীন হিন্দুজাতির এই অপূর্ণ সংক্ষিপ্ত চিত্রখানি আমরা যথাসাধ্য পাঠক মহোদয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, এই হিন্দুসমাজ শরীরী একটী প্রকাণ্ড শোভাময় বটবৃক্ষ তুল্য হইলেও, উহার অভ্যন্তরে ধ্বংসের প্রবল কীট সকল আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। যে উপাদানে এই বিশাল সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার অন্তরে ধ্বংসের বীজ প্রোথিত। কালধর্ম্মে সেই কীট দশনযুক্ত হইল। বীজ অঙ্কুরিত হইল।

কথাটী আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। হিন্দুস্থান কেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ ঠিক্ নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পুরাকালে যিনি সাধারণ অপেক্ষা একটু বিশেষ ক্ষমতাশালী হইতেন, তিনিই রাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই প্রথা হইতে বোধ হয় হিন্দুবীরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। সূর্য্যবংশ কি চন্দ্রবংশের ন্যায় প্রতাপশালী রাজা, সময়ে সময়ে রাজাধিরাজ হইলেও, ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে এতগুলি প্রবল ব্যক্তি,

কোন প্রকার একতা সূত্রে আবদ্ধ না থাকিয়া, পার্শ্বাপার্শ্বি অবস্থিতি করিতেছিল, তখন যে উহাদের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষণ হইত না, ইহা কে বলিতে পারে? এইরূপ অবস্থায় একটী সাধারণ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কুরুক্ষেত্র সেই মহাবিপ্লব স্থল। কুরু পাণ্ডবের সংঘর্ষণে ভারতভূমে যে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, উহা হিন্দুর সমগ্র বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাপিত হয়। হিন্দুর দুর্দ্দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে সূচিত হইল।

বিজ্ঞানের একটী প্রধান মত এই যে, মস্তিষ্কের শক্তি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ রাখিতে হইলে, শরীরের বলের প্রতি বিশেষ আস্থাবান হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের কথা ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টির প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এবং তাহার পরে, যদুবংশ ধ্বংসে ভারত প্রায় নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় জাতিই হিন্দুর একমাত্র বল, সুতরাং ক্ষত্রিয়বর্ণ নিধনের সহিত হিন্দু বল-শূন্য হইল। বর্ণ ভেদের দৃঢ় বন্ধন, এই দারুণ জাতীয় ক্ষতিপূরণ করিবার অন্তরায় ছিল। দেশানুরাগশূন্য সাধারণ ব্যক্তি সমূহ, এই ভয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লবের ফল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে যে কতদূর শোচনীয় ও দূরব্যাপী, তাহা সম্যক বুঝিতে সক্ষম ছিল না। সুতরাং এ ক্ষতি আর পূরিত হইল না। সত্য বটে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরও হিন্দু প্রায় দুই হাজার বৎসর নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে তৈলহীন দীপশিখার ন্যায়। মহাতেজে আবর্ত্তিত চক্র তেজঃসংস্পর্শ রহিত হইয়াও যেমন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব স্বভাবানুগত শক্তি (ইনার্সিয়া) প্রভাবে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, হিন্দুসমাজও তদ্রূপ পূর্ব্বস্বভাবানুগত শক্তি দ্বারা পরিচালিত ছিল। শক, যবন, সর্ব্বশেষে মুসলমান, বল ও বুদ্ধি-শূন্য মৃত হিন্দুজাতির উপরে আপতিত হইয়া সেই শক্তিটুকু মোক্ষণ করিয়া দিল। হিন্দুর অধঃপতনের এই স্থানেই চরম।

কিন্তু হিন্দুর জীবনীশক্তি এখনও হৃদয়ের অতি গভীর কন্দরে অসারভাবে বিদ্যমান আছে। বাহ্য তেজঃপ্রয়োগে এখন ইহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই বাহ্য তেজ, পাশ্চাত্য শিক্ষা। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষায় কেবলমাত্র কুফল ফলিতেছে বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করেন, তাঁহারা আত্মপ্রতি দৃষ্টিশূন্য। শ্রীদাশরথি ঘোষ।

যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয়।

প্রথম নন্দের রাজ্যকাল, ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব-নক্ষত্র স্বরূপ, এবং প্রাচীন ইতিহাস-তরীর বন্ধন-রজ্জু। এই ধ্রুব-নক্ষত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইলে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-ঘটিত অনেক বিষয় সুন্দররূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে, এবং সে জন্য কেবল শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস ও যুক্তির আশ্রয় লইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। আধুনিক প্রামাণিক ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই, নির্ণীত বিষয় গুলির সত্যাসত্য সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আজকাল প্রাচীন মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মত সংস্থাপনের চেষ্টা কেমন একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রীয়

বচনের যথোচিত কূটার্থ করিয়া নূতন আবিষ্কার করিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইতেছে। পূর্ব্বে কেবল বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতাবলম্বী পুরাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই এরূপ করিতে চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও তাহাই লক্ষ্য হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা শাস্ত্রের সরল ও প্রামাণিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল কূটার্থই গ্রহণ করিতেছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তাঁহাদের অনধীত, অপরিচিত পাশ্চাত্য ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া শাস্ত্রীয় বচন গুলির "অর্থের মারপেঁচ"ও করিতেছেন, সকল নূতন মতে যদিও সহজে কেহ আস্থা স্থাপন করেন না, তথাপি ঐ সকল মতে যে সকল দোষ আছে,তাহা দেখাইয়া দিলে সাধারণেরই উপকার হইয়া থাকে; যেহেতু বাদ প্রতিবাদ হইতে তাঁহারা সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় লইয়া এইরূপ একটু গোল উঠিয়াছে। শাস্ত্রের ও ইতিহাসের উপর নির্ভর করিলে,কোন কথা থাকেনা। কিন্তু যাঁহারা পৌরাণিক বচনের কূটার্থ ও অর্থের মারপেঁচ করিবেন, তাঁহাদের তৃপ্তি হইবে কেন? তাঁহারা সত্য নির্ণয় অপেক্ষা নিজেদের বাহাদুরী দেখানই আবশ্যক মনে করেন। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিবার যে কয়টী পন্থা আছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে (প্রথম) নন্দের রাজ্যাভিষেক সময় পর্য্যন্ত ১০১৫ এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর গত হইয়াছিল।

এক্ষণে নন্দাভিষেক কাল স্থির করিতে পারিলেই,পরীক্ষিতের জন্ম সময় ঠিক করিতে কোন কষ্ট নাই, এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কালও নির্ণীত হয়। এ কারণ দেখা যাউক, নন্দাভিষেক কাল স্থির করিবার উপায় আছে কি না, কুমারিকা খণ্ডের যুগ-ব্যবস্থাধ্যায়ে দেখা যায়—

ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতেষু দশন্যূনেষ্বস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রক — ... ...
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিক-শতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥

অর্থাৎ কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইবার তিন শত দশ বৎসর ন্যূন থাকিতে (৩০০০—৩১০ = ২৬৯০) শূদ্রক বা প্রথম নন্দ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ২০ বৎসর পরে অর্থাৎ (৩০০০—২৯০ = ২৭১০) কলির গতাব্দে নন্দরাজ্য হইয়াছিল। ৩১০২ কল্যব্দে খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ (৩১০২—২৬৯০ = ৪১২) খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে শূদ্রক রাজা হন। এবং (৩১০২—২৭১০ = ৩৯২) খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে নন্দরাজ্যকাল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের লিখন-ভঙ্গী দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শূদ্রকই প্রথম নন্দ বা মহাপদ্ম। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিলে জানিতে পারা যায়, নন্দের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৪১২ + ১০১৫ = ১৪২৭ কিংবা ৩৯২ + ১০১৫ = ১৪০৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে পরীক্ষিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। রাজাবলীর মতে, তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ৯০ বৎসর। অতএব খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৫১৭ অব্দে বা ১৪৯৭ অব্দে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলির ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

২। বিষ্ণুপুরাণে আরও দেখা যায় যে, (যুধিষ্ঠির ও) পরীক্ষিতের সময় যে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, নন্দের সময়ে তাঁহারা পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করেন। সপ্তর্ষি-মণ্ডল এক এক নক্ষত্রে এক শত বৎসর করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় আসিতে তাঁহাদের এক সহস্র বা এগার শত বৎসরই লাগিতে পারে। এ প্রমাণ অনুসারেও নন্দরাজ্যকাল খ্রীঃ পূঃ ৪১২ ধরিলে যুধিষ্ঠির ১৫১৭ বা ১৬১৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মিয়াছিলেন,জানা যাইতেছে।

৩। ভাগবতেও দেখা যায়—

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং॥

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের রাজ্যাভিষেক সময় পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর গত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ব মত ইহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। মৎস্যপুরাণেও এই কথা উক্ত হইয়াছে।

৪। বেণ্ট্‌লি সাহেব স্বয়ং গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময় যে সকল গ্রহের যে যে স্থানে থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়, ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই সেইরূপ থাকা সম্ভব, অন্য সময়ে নহে।

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে, নিশ্চিতই যুধিষ্ঠিরকে ১৫১৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের লোক বলিতে হয়, কিন্তু কূটার্থবাদীরা ইহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারে না। নব্যভারত-পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত চৈত্র সংখ্যায় পত্রে পণ্ডিতবর মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ২য় বর্ষের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত জন্মভূমির "পুরাবৃত্তম" প্রবন্ধলেখকের যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল সংক্রান্ত মতটি প্রমাণিত হয় নাই। "সাহিত্য-কল্পদ্রুমে" চারুচন্দ্র বাবু ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এই কথা লিখিবার পরে জন্মভূমির উক্ত প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়াছেন। গত বৈশাখ সংখ্যায় জন্মভূমিতে তিনি মাস ও বৎসর প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও অধীর-রতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার যুক্তি-তর্কের কোনরূপ খণ্ডন না করিয়া কেবল বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার লেখা বুঝিতে পারি নাই ও আত্মমত-সমর্থনার্থ মাঝে মাঝে চাতুর্য্য প্রকাশও করিয়াছেন। ইহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই। তর্করত্ন মহাশয় যে ধৈর্য্যচ্যুতি দেখাইয়াছেন, বিচারকালে পণ্ডিতগণ এইরূপই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যে কয়টি বিষয় তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল। তিনি মিলাইয়া দেখিবেন।

(১) তর্করত্ন মহাশয়ের কথা এই যে, বিষ্ণুপুরাণের এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ বচনার্দ্ধের অর্থ ১০১৫ বৎসর না হইয়া ১৫০০ বৎসর হইবে। তাঁহার অন্যতর প্রতিবাদী শ্রীমান্ সখারাম গণেশের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া তর্করত্ন মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেউস্কর মহাশয় বলেন—"বিষ্ণুপুরাণের ......বংশতালিকানুসারে মহারাজ পরীক্ষিতের সমসাময়িক জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপির ১৫ শত বৎসর পরে মহারাজ নন্দ মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।"

"ভাগবতের......বংশতালিকানুসারেও পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫০০ বৎসরের অন্তর প্রমাণিত হয়। মৎস্যপুরাণ অনুসারেও পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫০০ বৎসরের অন্তর ছিল। "এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং" স্থলে লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং হইয়াছে।"

সাহসের কথা সন্দেহ নাই! যাহা বুঝি না, তাহাই লিপিকর-প্রমাদ! বলি, যদি লিপিকর প্রমাদ হইল, তবে প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর স্বামী এ পাঠ কোথায় পাইলেন? যদিও শ্রীধর স্বামীর মনে তর্ক উঠিয়াছিল যে, "পঞ্চদশোত্তরং" "পঞ্চশতোত্তরং" হইলে, হিসাবে মিলিয়া যায়; তথাপি সাহস করিয়া তিনি এ কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি ইহাকে "একটা মাঝামাঝি কাল-সংখ্যা কথন মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী যাহা বলিতে সাহসী হন নাই, তাহা তর্করত্ন ও দেউস্কর মহাশয় অবাধে বলিয়া গেলেন! যদি তাঁহাদের ইতিহাস জানা থাকিত, বিশেষতঃ যুক্তিমূলক ইতিহাসে যদি উভয়ের অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সহসা একথা বলিবার অগ্রে তাঁহাদের একটু বিশেষ ভাবিতে হইত। বিচারকালে গোঁজামিলন দিবার চেষ্টা বাহাদুরী বটে। মৎস্যপুরাণ যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া মানিতে চাহেন, তাঁহাদের বলা উচিত, কয়খানি মৎস্যপুরাণে কিরূপ পাঠ আছে। তাঁহারা কি দেখেন নাই যে,কেবল একখানি ভিন্ন সকল মৎস্যপুরাণের পুঁথিগুলিতেই অতি পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দ রাজ্যকাল ১০১৫ বৎসরের অন্তর।

না হয় মানিলাম, ইহা লিপিকর-প্রমাদ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে যে আছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে নন্দের সময় যাইবেন। মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় যাইতে কি ১৫০০ শত লাগে? মৎস্যপুরাণ অনুসারে নন্দ হইতে অন্ধ্র রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে কৃত্তিকায় যাইবেন, তাহাই বা কি করিয়া সঙ্গত হইবে?

তদনন্তর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমি 'কিঞ্চিৎ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া' বলিয়াছি যে, বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের কাল নির্ণয় লইয়া গোল আছে।

২। বিষ্ণুপুরাণে বৃহদ্রথ-বংশীয় ও মগধ-রাজগণের বংশ-তালিকা দেওয়া আছে। জরাসন্ধ হইতে নন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত রাজগণের রাজ্যভোগকাল পাওয়া যায়। জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। সুতরাং তর্করত্ন মহাশয় বলেন যে, জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপি হইতে নন্দ পর্য্যন্ত যত বৎসর অতীত হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির হইতেও তত বৎসর গত হইয়াছিল। এক্ষণে বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের রাজ্যকাল ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোত বংশের ১৩৮ বৎসর, শৈশুনাগ বংশের ৩৬২ বৎসর,সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। সুতরাং এ প্রমাণ আনুষঙ্গিক প্রমাণ হইলেও তর্করত্ন মহাশয়ের বিশেষ বলবৎ প্রমাণ। এই লেখা দেখিয়াই শ্রীধর-স্বামী ১১১৫ বৎসরের স্থানে ১৪৯৮ বৎসর হইবে, অনুমান করিয়াছিলেন; সুতরাং ইতিহাসানভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে ইহাতে ভ্রান্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, তর্করত্ন মহাশয়কে বলিতেছি যে, এ সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া আমি চাতুর্য্য প্রকাশ করি নাই। আমি দেখাইতে চাই যে, এ প্রশ্নের ঐতিহাসিক মীমাংসাই এই খানে হইবে। যেরূপ ভাবে তর্করত্ন মহাশয় এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের কাল-নির্ণয়-কালে কি বুঝিতে হইবে না যে, বংশের আদিপুরুষ বৃহদ্রথ অন্ততঃ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন? জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি হইতেই বর্ষ গণনা করিতে

হইবে কেন? কোন্ যুক্তিবলে বৃহদ্রথ হইতেই কয়েক পুরুষ পরে বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের রাজ্যারম্ভ? বাস্তবিক জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব হইতেই এই বংশ রাজত্ব করিতেছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের সমসাময়িক সোমাপি হইতে সহস্র বৎসরের ভুক্তাবশিষ্ট কয়েক শত বৎসরই ধরিতে হইবে না কি? সোমাপির পরে যে ১৮ জন রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্যকাল মোট ৫।৬ শত বৎসরের অধিক নহে। যেহেতু বৃহদ্রথের সময় হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত যত বৎসর গত হইয়াছিল, বৃহদ্রথ হইতে জরাসন্ধ পর্য্যন্তও তত বৎসর গত হইয়াছিল। সুতরাং সোমাপি হইতে এই সহস্র বৎসরের ভুক্তাবশিষ্ট কয়েক শত বৎসরই ধরিতে হইবে। অন্য দিকে দেখিলেও তাহাই হয়। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরা নিয়ম। অতএব সোমাপির পরবর্ত্তী ১৮ জন রাজার রাজ্যকালও শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না। এক্ষণে এই ৬ শত, প্রদ্যোত বংশীয়দিগের ১৩৮ ও শৈশুনাগদিগের ৩৬২ বৎসর যোগ করিলে, প্রায় এগার শতই হয়; সুতরাং পুরাণের সহিত ইতিহাসের আর গোল থাকে না। অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় বুঝিবেন, এ কথার অবতারণায় যুক্তি আছে কি না। নিজে তলাইয়া বুঝিবেন না, অথচ বলিবেন—আমি চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছি—এ কথার উত্তর আমি দিতে চাহি না। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, এ তর্ক কোন কাজের কি না?

স্থানান্তরে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "ভাগবতাদি বচনের অর্থ অন্যবিধ। নচেৎ ভাগবত প্রভৃতির অনেক কথাই একেবারে অসঙ্গত হইয়া পড়ে।" অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের লিখনানুসারে সপ্তর্ষিমণ্ডল নন্দরাজ্যকালে পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন না, সম্ভবতঃ পূর্ব্বভাদ্রপদে ছিলেন।"

আমি হয় তো, ভাগবতাদি বচনের অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই, তাই তর্করত্ন মহাশয়ের কথায় বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভাগবতাদি বচনের অর্থ কিরূপ, তর্করত্ন মহাশয় স্পষ্ট করিয়া লিখিলে, সকলেই উপকৃত হইতেন। কোন্ পণ্ডিতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে পূর্ব্বাষাঢ়া স্থানে পূর্ব্বভাদ্রপদ হয়, তাহা লিখিয়া দিলে তর্করত্ন মহাশয় ভাল করিতেন। না হয়, যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও কিছু থাকে, তাহাও বোধ হয় জানিতে পারিলে অনেকে সুখী হইবেন। আজকাল বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির অবস্থা কি না, তাই বোধ হয়, আষাঢ় ভাদ্র হইয়া যাইবে। যাহা হউক, সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, উত্তম পণ্ডিতের ছাত্র ডাক্তার রামদাস সেন এই বচনার্দ্ধের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেছি। "প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ" অর্থাৎ যখন সপ্তর্ষি মণ্ডল, পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন ইত্যাদি। ('বুদ্ধদেব' ৪র্থ পৃষ্ঠা, শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল)। এক্ষণে এস্থলে ভাগবত বচনের কূটার্থ করিবার আবশ্যকতা আছে কি? যাহা হউক, তর্করত্ন মহাশয় যে "উত্তম পণ্ডিতের" নিকট এই বচনার্দ্ধের এরূপ বৈজ্ঞানিক অর্থ পাইয়াছেন, তাঁহার নামটী বলিয়া দিলে বিশেষ বাধিত করিতেন, সন্দেহ নাই।

কোনও স্থানে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "পরিশেষে চারু বাবুকে বলিতেছি, কুমারিকা খণ্ডের কোন্ শ্লোকগুলি আমার মতের প্রতিকূলে, তাহা তাঁহার দেখাইয়া দেওয়া উচিত।" তর্করত্ন মহাশয় কি জানেন

না যে, তিনি নিজে যে শ্লোকটী কুমারিকা-খণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ হয় না। বাস্তবিক তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকটীর তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। "ততোঽপি ত্রিসহস্রে তু শতাধিক-শতত্রয়ে" অর্থ কি ত্রিসহস্রের শতাধিক শতত্রয় অতীত হইল, (৩৪১০) নয় কি? বলিলেন, "শতাধিক শতত্রয়" অর্থ করিলেন, ২৬৯০। কোন্, হিসাবে এ অর্থটী আসিল, বুঝাইয়া দিবেন কি? যথোচিত কূটার্থ করিলেও, এ অর্থ সংস্থান হয় কি? তাই বলিয়াছিলাম "পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলি লইয়া মীমাংসা না করিলে, যথার্থ মীমাংসা হইবে না।" আর একটী কথা, তর্করত্ন মহাশয় যে পাঠ বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে "ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে" এই পাঠ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যদর্শনে ও পতাকায়ও এই পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তর্করত্ন মহাশয় যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত পাঠ নহে; এবং উক্ত বচনার্দ্ধ হইতে যে অর্থ করিতে চাহেন, তাহাতে ২৬৯০ আসিতেই পারে না। নিজে না বুঝিলে, জনৈক পণ্ডিতের সাহায্য লইলেই তর্করত্ন মহাশয় আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তর্করত্ন মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন, "এক শতাব্দীর মধ্যে যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিতের রাজ্যশাসন, কে অস্বীকার করিবে?" আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার লেখার কোন্ স্থলে আমি বলিয়াছি যে, যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিৎ এক শতাব্দীতে রাজ্যভোগ করিতে পারেন না। না দেখিয়া, না পড়িয়া, যাহা তাহা বলিলেই, নিজের তর্কপ্রিয়তা দেখান হইতে পারে বটে, কিন্তু ফল কি হইয়া থাকে? এরূপ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া যিনি উত্তর দিতে যা'ন, তাঁহার যে কি লাভ হয়, বলিতে পারি না।

তর্করত্ন মহাশয়ের মাস ও বৎসর প্রবন্ধের আর একটী স্থান পড়িয়া আমি হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই। পুরাতত্ত্বামোদী পাঠকও বোধ হয় পারিবেন না। পৌরাণিক প্রমাণ অনুসারে যুধিষ্ঠির যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। এজন্য বরাহ-মত পুরাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া, আমি শাকল্য গণনার উল্লেখ করি। বরাহের মতে কলি প্রারম্ভের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিলেন। শাকল্যের মতে কলির আরম্ভকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিলে, তাহার ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক শ্রবণা নক্ষত্রে থাকিবারই কথা। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল শতবর্ষ করিয়া এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তর্করত্ন মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, যদি শাকল্য গণনানুসারে সপ্তর্ষিমণ্ডল, কলির প্রারম্ভের সময় শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন, তবে "যুধিষ্ঠিরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা পরীক্ষিতের সময়ে তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে আসিলেন কিরূপে?" অর্থাৎ যুধিষ্ঠির কলির প্রথম শতাব্দীর মানুষ হইলে পরীক্ষিৎ তাঁহার ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইলেন, কিরূপে? আমি কি কোথাও বলিয়াছি যে, কলির প্রথম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠির নিশ্চিতই বিদ্যমান ছিলেন? আমি বলিয়াছিলাম, আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতা-

নুসরণ করিলে, যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কাল কলির প্রথম শতাব্দীতেই রাখিতে হয়। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে যে, ধর্ম্মরাজ ১০৭৫ কল্যব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং যে সময়ে পরীক্ষিৎ রাজত্ব করিতেছিলেন, সে সময় সপ্তর্ষি মণ্ডলের মঘা নক্ষত্রে অবস্থান, ও সেই শতাব্দীর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য করা অসম্ভব হইতেছে কিরূপে? যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল শ্রবণা নক্ষত্রে, তখন কলির প্রারম্ভ হইল, আর যখন তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে, তখন যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিৎ উভয়েই ক্রম প্রাপ্ত সিংহাসন ভোগ করিলেন! যুধিষ্ঠির শতবর্ষ রাজত্ব করেন নাই বা তিনি কলির ১ম শতাব্দীতে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা লিখিয়া কেহ লোক-বিমোহনের চেষ্টা করেন নাই। শাস্ত্রীয় বচনের কূটার্থ করিতে হইলে কি এইরূপ সকল কথারই অত্যতিকূটার্থ করিতে হয়? ইহাকেই কি জবাবের জবাব দেওয়া বলে? বিচারকালে যাঁহারা এইরূপ বুদ্ধি প্রকাশ করেন, তাঁহারাও প্রতিবাদীকে চাতুর্য্য প্রকাশের দোষ দিয়া থাকেন। অহো বৈদগ্ধী তর্করত্নানাং।

বরাহাচার্য্য-সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন,—অধুনা "বৃহৎসংহিতার সময় হইতে প্রায় ২১ অয়নাংশ অন্তর হইয়াছে, তাহাতে ১৩৯২ বৎসর পূর্ব্বে বৃহৎসংহিতা রচিত হইয়াছে, এইরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আধুনিক সূক্ষ্ম-গণিতবেত্তা মাধব চট্টোপাধ্যায়ও ৪২৭ শকে বরাহের স্থিতি স্থির করিয়াছেন।"

বরাহাচার্য্যের স্থিতিকাল ৪২৭ শকে নির্ণীত হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু বৃহৎসংহিতা কি ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল? ৫০৫ শকে বরাহাচার্য্য স্বর্গগমন করেন। ডাক্তার ভাওদাজী ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং প্রবাদ আছে, বরাহাচার্য্য ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহা হইলে ৪২৭ শকাব্দ বরাহাচার্য্যের আবির্ভাবকাল, কি বৃহৎসংহিতা-রচনাকাল? ৪২৭ ও ১৩৯২ যোগ করিলে, কত হয় দেখা যাউক। ৪২৯ + ১৩৯২ = ১৮১৯ শকাব্দ। বর্ত্তমান শকাব্দ তাহা হইলে ১৮১৯ হওয়া উচিত। কিন্তু এখন শকাব্দ ১৮১৫ নয় কি? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইলে বারান্তরে বলা যাইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধ, সংকল্পাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সামান্য এক আধটী কথার উত্তর দেওয়া হইল না। তাহাতে বিশেষ ক্ষতিও নাই। এক্ষণে বোধ হয়, তর্করত্ন মহাশয় বুঝিবেন, তাঁহার মতটী কেন প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* প্রবন্ধটী ভাদ্র সংখ্যার জন্য প্রস্তুত হইয়া যথা সময়ে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সংখ্যায় স্থানাভাব হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। ন, স।

A new beginning for

তিলোত্তমা।

কোথা, মিশ্রকেশী, যার কেশদিয়া গড়ি
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গবাসিজনে ?
অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধর যত ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী
কামিনীর মনোরথ, চির-অরি-দমী
দৈত্যরণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,
যার দ্রুত ইরম্মদে গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি,
ভূধর অধীর সদা, ভুবন চমকে
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনু, ধনুকুলমণি
আভাময়, যার চারু রত্নাবলী-ছটা
নবনীরদের শিরে শোভেরে যেমতি
শিখির পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে !
কোথায় পুষ্কর ? কোথা, আবর্ত্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর ! কোথা কহ, সারথি মাতলি ?
কোথা সে সুবর্ণরথ, মনোরথ-গতি,
যার স্থিরপ্রভা দেখি, ক্ষণপ্রভা লাজে
অস্থিরা, লুকায় মুখ ক্ষণ দিয়া দেখা
অম্বরে ? কোথায় কহ, ঐরাবত বলী
গজেন্দ্র ? কোথায় হয়, উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলমী সতী, অনন্ত যৌবনা,
দেবেন্দ্র হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত লোচনা
রূপসী ? কোথায়, কহ, স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পদতলে,
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন সুপ্রবাহিনী কল কল রবে ?
কোথা মূর্ত্তিমান রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী ; নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ?
সে দেব-বিভব সব কোথা কহ, আজি
কোথা সে দেব-মহিমা, দেবি, বীণাপাণি ?

দুরন্ত দানব আজি, দৈব বলে বলী,
বিমুখি সম্মুখ রণে, দেব দেব-রাজে,
পুরি দেবরাজপুরী, ঘোর কোলাহলে,
লুঠি লোভে দেবরাজ বিভব-বিনাশি,
দ্বেষ-বিষে জ্বলি, হায়, দেবরাজপুরে,
সে পুরের অলঙ্কার ;—অহঙ্কারে আজি
বসে দেবরাজাসনে দেবরাজধামে
পামর ! রুদ্রের শ্বাস যেমতি প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
প্রবল তরঙ্গবৃন্দ, অবহেলি রোধে,
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুমদাম ; যে সুন্দর বপু
আনন্দে মদন-সখা, সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুলসাজ ; সে সুন্দর বপু
ফুলসাজ শূন্য বন্যা করে অনাদরে,
গম্ভীর হুঙ্কারে পশে রম্য বনস্থলে !
দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,
প্রচণ্ড দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া,
(হীনবল দৈত্যরণে) ভঙ্গ দিলা ভয়ে
সংগ্রামে,—পাবক যথা বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে গহনকাননে,
হেরি শিখাপুঞ্জে ঘোর ধূমপুঞ্জমাঝে,
রক্তে রাঙ্গা উলঙ্গার লোলজিহ্বা যেন
রক্তবীজকুল কাল ; পলায়, তরাসে
আকুল, সে বন-পতি মৃগেন্দ্র কেশরী ;
মদকল নগ-দল, সচঞ্চল মনে,
করভ, করভী ছাড়ি পলায় অমনি
প্রাণলয়ে ; মৃগাদন ধায় বায়ুবেগে,

শার্দ্দুল, ভল্লুক খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধর মৃগ, ভুজঙ্গ, চৌদিকে
পলায়, পলায় শূন্যে বিহঙ্গম-পতি,
কোলাহলে পূরি দেশ, ক্ষিতি টলমলি ;—

(Evening.)

এবে দিনমণি দেব, দিবা-অবসানে,
গেলা চলি অস্তাচলে স্বর্ণচক্ররথে
মন্দগতি। নলিনীর মুখ শুখাইল,
দুরূহ বিরহ-কাল কালসম দেখি
সম্মুখে ; মুদিলা আঁখি ভানুর ভামিনী,
সপত্নী ছায়ার সুখে দুখিনী হৃদয়ে !
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্, আইল
তরুকুল রাজকোলে ; ভাসি চক্ষুজলে,
একাকিনী,—বিরহিনী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যথা জনকের গৃহে,
কিম্বা দময়ন্তী যথা, হায়, কান্তহারা
অরণ্যে, আইলা কাঁদি বিদর্ভ ভবনে।
মৃদুহাসি শশাঙ্কের সঙ্গে নিশাদেবী,
পরি তারাময় সিঁথি সিমন্তে সুন্দরী,
উতরিলা ; শৈলে, সরে, জলাশয়ে, বনে
উজ্জ্বলা চন্দ্রিমা পশি কেলি আরম্ভিলা।
ফুটিলা কুমুদী জলে কুমুদ বাসনা
চাঁদেরে আকাশে হেরি ; শোভিল ধুতুরা
ধরি শুভ্র-বেশ স্থলে ;—ধুতুরা, কিঙ্করী
শঙ্করের তপস্বিনী, অলি, ফুলসখা,
না চুম্বয়ে কভু যার অধর তরাসে !
পরিমল বহি বায়ু বহিল সুস্বনে ;
পড়িল শিশিরবিন্দু, চিতায়ে চৌদিকে
প্রখর তপনকরে দগ্ধফুলকুলে ;
নূতন জীবন যেন পাই পাতা যত
নাচিল মর্ম্মরি সুখে বৃক্ষশাখাদলে !
উতরিলা এবে নিদ্রা—বিরাম-দায়িনী—
স্বপ্নদেবী, কুহকিনী সজনীরে লয়ে
সঙ্গে রঙ্গে। বসুমতী নিদ্রার চরণে,
জীবকুল সহ নমি নীরব হইলা। *

পঞ্চনদ প্রদেশ। (১)

ভারতবর্ষ মহাদেশের উত্তর প্রান্ত-স্থিত যে সুবিশাল প্রস্তরময় ভূমিখণ্ডকে, শতাদ্রি, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি পঞ্চ মহানদী, তীব্র বেগে আপন আপন উর্ম্মিমালায় বিধৌত করিয়া, এক দিকে কৈলাস গিরির পাদ দেশকে স্পর্শ করতঃ তিব্বতাভিমুখে পলায়ন এবং আর একদিকে নদ-গুরু সিন্ধুর সুন্দর সলিল রাশির সহিত মিশ্রিতা হইয়া ভারতকে বিদেশীয় বীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, প্রাচীন সংস্কৃত ভূগোলে তাহারই অন্যতম আখ্যা পঞ্চনদ। পারস্য ভাষায় এই মহাপ্রদেশ পঞ্জাব নামে অভিহত। পনৃজ্ শব্দের অর্থ পাঁচ, আব্ শব্দের অর্থ জল (নদ)।

মানব জাতির প্রসূতি স্বরূপা ককেশী গিরি (কশ্যপ পর্ব্বত অথবা ককেশশ গিরির) সম্মুখস্থ মধ্য আসিয়ার ইন্দ্রাবতী ভূমি হইতে প্রাচীন আর্য্যজাতি গৃহবিচ্ছেদ দোষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীনা পৃথ্বীর বিভিন্ন বিভিন্ন অংশাভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইয়া যে বংশ

* কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তজের তিলোত্তমার নূতন সংস্করণের যে অংশ লিখিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ নব্যভারতে তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তাঁহার রচিত ও স্বহস্তলিখিত আরও বিভিন্নরূপ বিস্তর কবিতা আমার পুস্তকালয়ে অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত পুস্তকে ঐ সকল কবিতা সামাজিকেরা পাঠ করিতে পারিবেন।

খুলনার নৈহাটী, শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

সর্ব্ব প্রথমে হিমগিরির নীহার কলেবর অতিক্রম করিয়া সিন্ধুবক্ষ পার হওনান্তর ভারত খণ্ডে উপনীত হয়েন, পঞ্জাব তাহাদিগের—অর্থাৎ হিন্দুআর্য্য বংশজের পিতৃ পুরুষদিগের প্রথম উপনিবেশ ক্ষেত্র। সুতরাং প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে পঞ্জাব এক পবিত্র মহাক্ষেত্র। যে কল্লোলিনী সরস্বতী নদীর তটদেশে বসিয়া ধ্যান-নিরত তপ্তকান্তি যোগ-প্রভাবশালী আর্য্য ঋষি ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করিয়া মানব জাতির আদিম ইতিহাসের ক্ষীণ চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পঞ্জাবের বিশাল বপু সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা সরস্বতীর নির্ম্মল সলিল রাশিতে নিত্যই বিধৌতা হইতেছে। যে বিপাশা নদী তটে আর্য্য ব্রাহ্মণ সামবেদের কুথুম শাখা পাঠ করিয়া সমগ্র ভারতকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই হতভাগিনী বিপাশা সুন্দরী আজও পতিত পঞ্জাবের কক্ষে বিধবা হিন্দু কন্যার ন্যায় বর্ত্তমান। বাস্তবিক পঞ্জাব প্রদেশ, ভারতীয় আর্য্য জাতির—জগতের সভ্যতার ইতিহাসের এক সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। একহস্তে শাণিত তরবারী এবং আর একহস্তে কোরাণ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া রাক্ষস-পাদবিক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্ত পঙ্গপাল শ্রেণীর ন্যায় যে যমসদৃশ যবন জাতি আটক পার্শ্বে শিবির স্থাপন করতঃ সর্ব্ব প্রথম হিন্দু গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই আটক নগর মুসলমানের মন্দভাগ্যের পূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য পঞ্জাব পার্শ্বে এক সব্‌ডিবিজান রূপে এখনও সিন্ধুতটে বর্ত্তমান। মহম্মদীয় বীরের সপ্তশত বর্ষের ভারত-শাসন এবং "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" উপাধির মূল—পঞ্চনদ প্রদেশ। রঘুবংশাবতংশ দিলীপ, যবন আক্রমণের প্রথম সমসাময়িক অনঙ্গপাল, জয়পাল, বাদল প্রভৃতি পঞ্জাবেই হিন্দুবল বিক্রমের পরিচয় দেন; রাজা পুরু, রাজা তক্ষশীল, থানেশ্বরাধিপতি, জোয়ালাধীশ্বর প্রভৃতি পঞ্চনদেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বীর কেশরী রণজিৎ, রমণী কুলগৌরব ঝিন্দ বাই এবং সমর কুশল ছত্রসিংহ পঞ্জাবেই অভ্যুদিত হয়েন, এবং যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিলিয়া-নালা, শোব্‌রাঁও, মেথল, জেৎলা এবং লালামুশা নামক বিশাল ক্ষেত্রে শিখজাতি, মুসলমান ও বৃটীশ বিক্রম পর্য্যুদস্ত করিয়া ভারতে হিন্দু গৌরব পুনঃস্থাপনের প্রয়াস পায়, তাহাও পঞ্জাবের বক্ষদেশে বর্ত্তমান। ভক্তাধিক ভক্ত রামদাস, সাধক-শিরোমণি দাদু, কবিকুল-গৌরব কুবেরদাস, ধর্ম্ম-প্রচারক কবির, রাজনীতি কুশল গুরুগোবিন্দ এবং গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষক অমর সিংহ, এই সুবিশাল পঞ্জাব প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক পঞ্জাব আমাদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান গৌরবের এক পবিত্র স্থল, ইহা আর্য্যজাতির প্রাচীন মহিমার এক বিশাল ক্ষেত্র। আমাদিগের আদি পুরুষদিগের ইহা প্রথম উপনিবেশ; ঋষি দিগের ইহা আশ্রম-ভূমি। ইংলণ্ডের ইতিহাস কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে গুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পঞ্জাবের কর্ণাল এবং থানেশ্বর (কুরুক্ষেত্র) জগতে কখনও অবিদিত থাকিতে পারিবে না। কুরু পাণ্ডবের মহাসমর, মহাভারতের কথা, ব্যাসের পঞ্জাব ভ্রমণ, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, গীতার ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রীয় মহাব্যাপার লুপ্ত বা গুপ্ত হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভব; তাই বলিতেছি, পঞ্জাব নানা কারণে চির স্মরণীয়। সে দিন যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্প-

ন্ন, শৌর্য্যবীর্য্য-শালী, শার্দ্দূল-বিক্রম-সমন্বিত, সমরকুশল শিখ জাতি ভারতবর্ষে নবযুগ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, তাহাদের আদি পুরুষ জগদ্প্রসিদ্ধ নানক পঞ্জাব ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হয়েন। ধর্ম্ম ও রাজনীতির একত্র সমন্বয় নানক ভিন্ন জগতে আর কখনও কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কিনা, সন্দেহ। তাহাতেই বলিতেছি, প্রকৃত আর্য্যবংশজ "হিন্দু" কি কখনও পঞ্জাবের পবিত্রতা বিস্মৃত হইতে পারে? ভারতের আদিম ইতিহাস, ভারতের পূর্ব্ব মহিমা, হিন্দু জাতির অধঃপতনের কারণ যদি অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী হও, তবে, আইস, আমরা একবার পঞ্চনদ-বাহিনী বিশালা পঞ্জাব-ভূমিতে অবতরণ করিয়া মনের সাধ মিটাই। হিন্দুর দুঃখে যদি এক বিন্দু অশ্রু কখনও তোমার নয়ন প্রান্তে নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সিন্ধুতটের মহিমা একবার স্বচক্ষে আসিয়া নিরীক্ষণ কর। সিন্ধুর বিশাল বপু আজি হিন্দুর অশ্রু-সলিলে পরিপূর্ণ; পতিতপাবন জগৎপতিই জানেন, এই অশ্রুময়ী আঁখি কখনও স্বাধীনতার হাসিতে পদ্মপলাশের কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে কিনা!! কে বলিতে পারে, করিবে না? যে আকাশ আজি প্রাবৃটের নিশাময়ী মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, শরতের মনোহর পূর্ণ চন্দ্রকিরণে কি তাহা দর্শকের মনঃপ্রাণ হরণ করে না? পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যদি চলিতে পার, যদি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলে আবার বলীয়ান হইতে পার, জননী স্বর্গভূমি ভারত আবার তোমাকে মাতৃবৎসল সন্তান বলিয়া সহাস্য বদনে ক্রোড়ে স্থান দিবেন, আবার তোমার যশঃসৌরভ হিমালয় অতিক্রম করিয়া আসিয়া খণ্ড এবং ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া দূর দেশও বিস্তৃত হইবে।

দুঃখের বিষয়, পবিত্র পঞ্জাবের পুরাতত্ত্ব লিখিতে আমরা প্রয়াসী হই নাই। পতিত জাতি চিরদিনই পরান্ন-ভোজন প্রিয়, তাই ইংরাজ ঐতিহাসিকের উৎ-ময়ী উচ্ছিষ্টেই আমরা আমাদিগের ঐতিহাসিক জ্ঞানের গৌরব দেখাই। আজি আমরা পঞ্জাবদেশে অবস্থান করিয়া ইহার এক বিশাল ইতিহাস সংগ্রহে নিযুক্ত; "নব্যভারতে" সেই বিশাল গ্রন্থের স্থান হওয়া অসম্ভব। আমরা বর্ত্তমান সময়ে কেবল কয়েকটি প্রস্তাব দ্বারা পঞ্জাব সম্বন্ধে কতকগুলি সার এবং নূতন কথা লিপিবদ্ধ করিব।

ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকদিগের অনেকেই পঞ্জাবের ভৌগলিক বিবরণে অনভিজ্ঞ নহেন। পঞ্জাবের ভৌগলিক বিবরণ আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

বৃটীশাধিকৃত পঞ্জাবের লোক সংখ্যা ১৯, ৮৯৬,৯১২; পরিমাণ ১৮৯,০২০ বর্গ মাইল; এবং পঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৯৬৩,৮৬০ জন। সিন্ধু-নদের দৈর্ঘ্য আনুমানিক দুই সহস্র মাইল। পঞ্জাবের উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে যমুনা নদী, দক্ষিণে রাজপুতনা এবং পশ্চিমে সলিমান পর্ব্বতমালা। কার্পাস, রেসম, তুঁত, পশম, ফটকিরি, লবণ, নানা জাতীয় ফল, সাল, ছাগ, ঘোটক এবং গালিচা প্রচুর পরিমাণে এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র অধিবাসীর অর্দ্ধেক প্রায় মুসলমান; বাকী অর্দ্ধেকের অধিকাংশ শিখ এবং অল্পাংশ হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতম। খ্রীষ্টীয় ১৮৫০ অব্দে, রণজিতের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে, স্বাধী-

ন পঞ্জাব ইংরাজের অধীনতায় বদ্ধ হয়। লো-হার পঞ্জাবের রাজধানী, ইহা রাবী নদীর উপরে অবস্থিত। গুজারাম্বালা, ফিরোজপুর, অমৃতসহর, সিয়ালকোট, গুরুদাসপুর, জলন্দর, হোশীয়ারপুর, কাংগারা, অম্বালা, লুদীয়ানা, সিমলা, দিল্লী, গুরগ্রাম, কর্ণাল, পানীপথ, কুরুক্ষেত্র, হিসার, রোটাক, সীর্সা, মুলতান, জং, মণ্টোগামারী, মজফরগড়, দেরাজাৎ, দেরাইস্মাইলখাঁ, দেরাগাজিখাঁ, বন্নু, পেশোয়ার, কোহাট, হাজারা, রাউলপিণ্ডী, জেলাম, সাপুর প্রভৃতি পঞ্জাবের প্রধান নগর। ফিলোর, লাহোর, রাউলপীণ্ডী, লুধিয়ানা, অমৃতসহর, কাংগারা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু দুর্গের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। দিল্লীতে যবনের কীর্ত্তি এখনও ভগ্ন হয় নাই। লোকসংখ্যা—লাহোর ১৬৭,০০০, দিল্লী ১৯৯,০০০, অমৃতসহর ১৯৭,০০০, পেশোয়ার ৮৭,০০০, মুলতান ৭২,০০০, অম্বালা ৮১,০০০, রাউলপীণ্ডী ৮২,০০০ এবং জলন্দর ৬৯,০০০ জন। পঞ্জাবে ৩৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে। কাশ্মীর, ভাবলপুর, পাতিয়ালা, জীন্দ্, নাবা, কর্পূরতলা, মন্দি, ফরিদকোট্, পুঁজ্, চম্বা, বুশাহীর এবং দপ্‌জং, এই গুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। কারাকোরম্ পর্ব্বত প্রায় ২৯ সহস্র ফিট উচ্চ এবং "কে" পাশ্ (পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থ ভয়ানক পথ) প্রায় বিংশ সহস্র ফিট্ উচ্চ এবং একাদশ মাইল দীর্ঘ। সিন্ধুতটে আটক, কালাবাঘ, দের। গাজি খাঁ, দেরাইস্মাইল খাঁ, মীঠানকোট্, শক্কর, রোড়ী, লার্খানা এবং কোট্ এই নগরীগুলি অবস্থিত। নর্থ ওয়েশ্‌টারণ্ রেলওয়ে পঞ্জাবের একমাত্র লৌহবর্ত্ম। মুসলমান (সুন্নী), শিখ এবং হিন্দু ধর্ম্ম এখানে প্রচলিত; খ্রীষ্টানের সংখ্যা খুব কম; জৈনের সংখ্যা সামান্য এবং বৌদ্ধ মোটেই নাই। শিখেরা খুব প্রবল, ইহাদের অপর নাম "খাল্‌সা" (অর্থাৎ পবিত্র)। নদী এবং পর্ব্বত প্রায় সর্ব্বত্র; পঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ সাহসী, স্বদেশীয় প্রিয়, সবল, সুন্দর মূর্ত্তি, পরিশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষায় অলস। হিন্দুগণ নিতান্ত ধর্ম্ম প্রিয়, মুসলমানেরা বিলাসী, ধনপ্রিয়, ঘোরতর সাংসারিক এবং বিবাদতুষ্ট। অন্যান্য দেশাপেক্ষা এখানে হিন্দু ও মুসলমানে বিশেষ প্রীতি দেখা যায়, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শিখ ধর্ম্ম হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় মাত্র, সুতরাং দুই দলেরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি, এই নবধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। নানকের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় শিখধর্ম্ম গ্রন্থ সমূহে সম্যকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা প্রথমে ভাষা সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিব। "পশ্‌তু" এবং "পঞ্জাবী" এই দুই ভাষা পঞ্জাবের লোকের মাতৃভাষা। পেশোয়ার এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন সমগ্র পঞ্জাবে "পঞ্জাবী" ভাষাই প্রচলিত। হিন্দী এবং পারস্য এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে পাঞ্জবী ভাষার সৃষ্টি। এই ভাষার অপর নাম "গুরুমুখী" ভাষা; নানক ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখ, সকলেই এই ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। নিম্নে এই অপরূপী ভাষার কিছু পরিচয় দিতেছি। হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কে এক সাধারণ ধর্ম্মভূমিতে আনয়ন করিয়া একসূত্রে বদ্ধ করা নানকের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতেই তিনি শিখের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, বেশ, ভূষা, ভাষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই অর্দ্ধ-হিন্দু-অর্দ্ধ-মুসলমান ভাব রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাষার কথা বলিতেছি।

"পঞ্জাবী" ভাষা।

(বঙ্গানুবাদ সহ)

তুষী—আপনি
হুণ্—এক্ষণে
তিলী—দেশালাই
তির্থা—অবিলম্বে
পুৎতর্—বেটা
মেরু—দাসী
লক্কড়্—কাষ্ঠ
তুষীনু—আপনার
সবক্—পাঠ
পেঠা—কুষ্মাণ্ড
কুড়্—গোপনীয়
মোড়্না—নিবারণ
চূড়া—মেথর
টোপী—হুঁকার ঝিলাম্ (কল্কে
কাচু—ছুরী
শিশা—দর্পণ
উরে—এখানে
অথে—ওখানে
মেজমাণ—কুটুম্ব
মঞ্জী—পালঙ্ক
কণক—গোধূম
কো—ক্রোশ
পড়া—প্রহর
টুক্রা—রুটি
পিণ্ড্—গ্রাম
বাট্টা—প্রস্তর
কাটুই—হাঁড়ী
বুটা—বৃক্ষ
শিরাঁধাঁ—তাকিয়া (বালিষ)
চাক্কি—কুস্তী (ব্যায়াম)
বুয়া—দ্বার
তাকী—জানালা (গবাক্ষ)
বিঞ্জেয়া—গমন
োয়ো—উনি
তেরামা—তাম্র
মার্—বন্ধকর (ইত্যাদি)

প্রস্তাবান্তরে এই ভাষা সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্জাবের হিন্দুর ব্যবহার মুসলমানেরা অনুকরণ করিয়া থাকে। পঞ্জাবের হিন্দু-রমণী আজিও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ভূলিতে পারেন নাই, তাঁহারা আপনা-দিগকে কৃষ্ণের গোপিণী বলিয়া বিশ্বাস করেন। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী, সাহসী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং বলবতী। ইঁহাদের শতকরা ৯৯ জন গৃহের বাহিরে কোনও নদ নদী বা সরোবরে স্নান করেন, স্নানের সময়ে গোপিণীর ন্যায় তটদেশে বস্ত্র রাখিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ্য ভাবে স্নান করিয়া থাকেন। হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানী, সকলেই এই কুপ্রথার অনুগামিনী। এই প্রথার বিরুদ্ধে কাহারও বাক্যব্যয়ের অধি-কার নাই। মহারাণী হইতে সামান্য কুলী-কন্যা পর্য্যন্ত এই কুপ্রথার পক্ষপাতিনী।

গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ। (২)

আমরা এখন কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের সম্ব-ন্ধে কিছু বলিব। ইহারা প্রথমে উত্তর কোকনে অবস্থিতি করিতেন। এই নিমিত্ত ইহারা কোকনস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামেশ্বর

হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরস্থ ভূমি কোকন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের আর একটী নাম চিতপাবন। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তি আছে। প্রথমটী এই যে, যখন পরশুরাম সমুদ্র তীরে ব্রাহ্মণগণকে স্থাপন করেন, তখন তিনি দেখিলেন, অনেকগুলি মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে জীবন দান করতঃ গলায় উপবীত দিয়া, এই স্থলে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চিতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ইহারা চিতপাবন আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় কিম্বদন্তিটী এই যে, যখন পরশুরাম স্নানার্থে সমুদ্র তীরে গমন করিলেন, তাঁহার কতকগুলি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন যে, তাহারা মৎস্যজীবী। তাহাদের সহিত যে মাছধরা সূতা ছিল, পরশুরাম তাহাদের নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহার দ্বারা উপবীত প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গলায় দিলেন। পরে তাহাদিগকে পবিত্র করতঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করিলেন। ইহাদের চিত্ত পবিত্র হইল বলিয়া, ইহারা চিতপাবন নাম ধারণ করিল। ফল কথা এই যে, প্রাচীনকালে পরশুরাম সমুদ্র তীরে যে সকল ব্রাহ্মণদের স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কোকনস্থ বা চিতপাবন নামে অভিহিত। প্রথমে, ইঁহারা গণনার মধ্যে আসেন নাই। দেশস্থ ব্রাহ্মণদের নিকট ইহারা ঘৃণার পাত্র হইলেন। কথিত আছে যে, মুসলমানদের আধিপত্যের সময়ে ইহারা অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছিলেন; এমন কি, অনেককে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জিঞ্জিবার হাবশীগণও তাঁহাদের উপর বিশেষ উপদ্রব করিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বালাজি বিশ্বনাথ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সেতারায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় শাও মহারাজার অধীনে কার্য্য করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার প্রতি এতদূর পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের উন্নতি হইতে লাগিল। তাহারা কোকন ত্যাগ করিয়া দলে দলে মহারাষ্ট্রদেশে আগমন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ উচ্চ পদ পাইল, এবং যতকাল পেশোয়াদের প্রভুত্ব ছিল, তাহারা মনের আনন্দে কালযাপন করিয়াছিল। কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে, এতদঞ্চলের একজন বিদ্বান ও গণ্য ব্যক্তি* এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—"মহারাজ শিবজীর সময়ে দেশস্থ ব্রাহ্মণ এবং পরভুগণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণ অতিশয় মূঢ় ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। এজন্য সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। পরে, শাও মহারাজার সময় হইতে ইহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল। একদা বালাজি বিশ্বনাথ পেশোয়া একদল দেশস্থ কর্ম্মচারীকে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তর যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এ আদেশ পালন না করাতে, বালাজি বিশ্বনাথ একজন কোকনস্থ ব্রাহ্মণের দ্বারা কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া লয়েন। তখন তিনি কোকন হইতে দুইশত ব্রাহ্মণ বালক আনাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বালকগণ সুশিক্ষা পাইয়া যেমন উপযুক্ত হইতে লাগিল, পেশোয়ার তাহাদিগকে রাজ্য মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদ দিতে লাগিলেন।"

ইহার পর, মহারাষ্ট্র দেশে ইংরাজদিগের অধিকার সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক

---

* ৺ রাও বাহাদুর গোপাল হরি দেশমুখ।

যখন পুনাতে একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কোকন হইতে অনেকগুলি-ব্রাহ্মণ অধ্যয়নার্থে পুনায় আগমন করিল। এইরূপে কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্র দেশে এবং অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। এমন কি, নাগপুর, ইন্দোর, কাশী প্রভৃতি অতি দূর দেশেও তাঁহারা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যে সকল কোকনস্থ ব্রাহ্মণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল, তাহারা প্রধানতঃ বিষয় কর্ম্ম করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। যাহারা কোকন প্রদেশে রহিল, তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহারা ইনামদারদের নিকট হইতে জমি লইয়া আবাদ করিত, এবং যাহা উৎপন্ন হইত, তাহার অর্দ্ধ অংশ ইনামদারকে দিত এবং অপর অর্দ্ধ অংশ তাহাদের নিজের থাকিত। কতকগুলি কোকনবাসী সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল, এবং কতকগুলি কারকুনের কার্য্য করিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। ইহারা বর্ষাকালে স্বদেশে থাকিত, এবং বৎসরের অবশিষ্ট অংশ নানাস্থানে গমন করিত, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া প্রত্যাগমন করিত। যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ছিল, তথাপি কয়েক জন বৈদিক,পৌরাণিক এবং হরিদাস (১) এই সম্প্রদায়টীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে চতুর্দ্দশটী গোত্র দেখা যায়, যথা,—অত্রি, কৌণ্ডিল্য, জামদগ্ন্য, বাৎস্ত, বিষ্ণুবৃদ্ধ, কৌশিক, নিত্যানন, বশিষ্ঠ, কপি, বাভ্রব্য, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভার্গব এবং ভরদ্বাজ। ইঁহাদের মধ্যে, কতকগুলি ঋক্‌বেদী এবং কতকগুলি যজুর্বেদী। ইঁহাদের অধিকাংশই স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত(২)। অবশিষ্ট অংশ মধ্বাচার্য্যের (৩) মতাবলম্বী। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ইঁহারা প্রথমে, কাশী, নাসিক এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ক্ষেত্রের পণ্ডিতগণের মত আনয়ন করেন। পরে তাহা জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার মীমাংসাই চূড়ান্ত, এবং তদনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন।

যে সকল কোকনস্থ ব্রাহ্মণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ উন্নতির চিহ্ন দেখা যায়। কোকন ত্যাগই তাঁহাদের অভ্যুদয়ের কারণ বলিতে হইবে। ইঁহারা উদ্যোগী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইঁহাদের মধ্যে, কেহ কেহ ভোজন-গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, কেহ কেহ দুগ্ধ ও দধির দোকান খুলিয়াছেন, কেহ কেহ পাগড়ী ও বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেছেন, এবং কেহ কেহ শূদ্রদের বাড়ীতে পাবক এবং জলবাহকের (৪) কার্য্য করিতেছেন। এই সকল কার্য্য শাস্ত্র এবং আচার-বিরুদ্ধ বলিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ দোষ দেওয়া উচিত নহে। যখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নির্দিষ্ট

(১) এতদঞ্চলে যাঁহারা কথকতা করেন, তাঁহারা হরিদাস নামে অভিহিত।

(২) স্মার্ত্তগণ প্রথমে শিব উপাসক ছিলেন, কিন্তু এখন ইঁহারা পঞ্চোপাসক।

(৩) ইঁহারা বৈষ্ণব।

(৪) দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের হাতের জল ব্যবহার করেন না। এজন্য, দীন ব্রাহ্মণগণ জল আহরণ করতঃ গৃহস্থের বাটীতে প্রদান করিয়া থাকে।

কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তখন অলসভাবে দিন যাপন না করিয়া কোন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাও তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। শাস্ত্রে আছে যে, আপৎকাল উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আর ব্রাহ্মণদের দুর্দ্দিন কি হইতে পারে? সমগ্র হিন্দুমণ্ডলী এখন বিজাতীয় ভাবে অনুরঞ্জিত। প্রাচীনকালের ন্যায় ষট্-কর্ম্মনিরত থাকিলেই বা ব্রাহ্মণদের চলে কৈ? এখন তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়াছে। কে বা অর্থ দিয়া তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট দূর করেন, আর কোন্ ভূস্বামী পূর্ব্বকার রাজাদিগের ন্যায় নিষ্কর ভূমি দান করতঃ তাঁহাদের দুঃখ মোচন করে? কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণ যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহা তাঁহাদের নিম্নলিখিত কার্য্যটীর দ্বারা উপলব্ধি হয়। একদা নাপিতগণ ধর্ম্মঘট করিয়া ক্ষৌর কার্য্যের দাম বাড়াইয়াছিল। কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিবেন, নাপিতদিগকে কোন মতেই প্রশ্রয় দিবেন না। নাপিতগণ দেখিল যে, তাহাদের উপার্জ্জনের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাহারা দাম কমাইয়া দিল।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি বড় লোক ছিলেন এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন। মারহাট্টাদের রাজত্বকালে, কয়েক জন কোকনস্থ ব্রাহ্মণ পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং কেহ কেহ মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সার রাজা দিনকর রাও, মহারাজা সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী, কোকনস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তাও ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণে এবং ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় কয়েক জন বিদ্বান এই সম্প্রদায়টীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা রাও বাহাদুর কেরো লক্ষণ ছাত্র, গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক দাজী নীলকণ্ঠ নগরকর, উপস্থিত বক্তা মহাদেব গোবিন্দ শাস্ত্রী কলটকার, রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, রাও বাহাদুর গোপাল রাও হরি দেশমুখ, রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বামন আবাজি মোড়ক এবং সুবক্তা মহাদেব মুরেশ্বর কুণ্টে বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোকনস্থ সম্প্রদায় হইতে কয়েক জন উত্তম চিকিৎসকও প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের ভাষা মারহাট্টি। কিন্তু যাঁহারা কোকন প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের সহিত মহারাষ্ট্র দেশবাসীদের ভাষায় অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়,যথা—

বাঙ্গালায়	কোকনে	মহারাষ্ট্র
পুত্র	বোটিাও	মুলগা
কন্যা	চেড়ি	মুলগী
ঝাঁটা	ওয়াডওয়ান্	কেরসনী
ক্ষৌর	কাপ্নি	হাজামৎ
ধাপ	পাউঠন্	পাইরি
পূর্ব্বে	পেলতড়ি	পলিকড়ে
কখন	কেঢলা	কেম্হা

কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কন্যা বিক্রয় প্রথাটী প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনের লোভে অল্প বয়স্কা কন্যাকে অশীতি বৎসর বয়স্ক পুরুষের হস্তে অর্পণ

করিয়া থাকে। এই সকল বৃদ্ধ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত দিয়া কন্যা গ্রহণ করে।

আমরা মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণদের বিবরণ পাঠকের সমক্ষে ধারণ করিলাম। এক সময়ে যাঁহারা ভারতের চারিদিকে তাঁহাদের আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। নানাদলে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের বল হারাইয়াছেন। তাঁহাদের আর এখন পূর্ব্বকার তেজ নাই, পূর্ব্বকার উদ্যম নাই। এখন এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দায় কালাতিপাত করিতে দেখা যায়। স্বকার্য্য সাধন জন্য তাঁহারা যেভাবে ইংরাজদিগের তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বর্ত্তমান ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভেও যাঁহারা স্বাধীন ছিলেন, তাঁহারা যে কি প্রকারে এত হীনচেতা ও অসার হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নানা দলে বিভক্ত হওয়াই যে তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার একটী প্রধান কারণ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যদ্যপি তাঁহারা উন্নতি লাভের আশা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিচ্ছিন্নভাবে থাকা উচিত নহে; যাহাতে কয়েকটী সম্প্রদায় এক হইতে পারে, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অতীশ বা দীপঙ্কর

"In 1042 the famous *Atisha* native of Bengal, who is known in Tibet as *Jororje* or *Jo-vortish* also came there. He wrote a great number of works which may be found in the Bstan-hgyur, and translated many others, relating principally to tantrik theories and practices."

Rockhill's Life of Buddha. p. 227.

তিব্বত দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বাবু শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় "বঙ্গের আদি গৌরব দীপঙ্কর" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মার যে সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, সেই প্রবন্ধটী আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। যিনি ইচ্ছা করিলে "অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা" দান করিতে পারেন, তাঁহার নিকট মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। শরত বাবু তিব্বতের ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্ম মূলক অনেকগুলি উপাদেয় প্রবন্ধ ইংরেজি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে তিনি বিশেষ রূপে পরিচিত হইয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধে আমরা যেরূপ তাঁহার গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, মাতৃ ভাষায় তল্লিখিত প্রবন্ধ সমূহে তাঁহার তদ্রূপ পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও নিদর্শন প্রাপ্ত না হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি, বিবিধ অমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রাজভাষাকে দুই একখানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া শরত বাবুর যে কি লাভ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু নিরাভরণা মাতৃ ভাষাকে সামান্য একখানি অলঙ্কার প্রদান করিলেও শরত বাবু অনন্তকালের তরে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন। বিজাতীয় ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষমতা মধুসূদনের প্রচুর পরিমাণে ছিল, তথাপি তিনি সেই ক্ষমতার ব্যব-

হার না করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মাতৃ ভাষার সেবা করিয়া শ্রীমধুসূদন অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, যত দিন জগতে বাঙ্গালি-জাতি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার নহে। কিন্তু শত সহস্র বৎসর অন্তে হইলেও, এমন এক দিন আসিবে, যে দিন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। মুসলমান শাসনকালে যে সকল হিন্দু পারশি ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহারা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু তৎকালে যাঁহারা মাতৃ ভাষায় সামান্য কোন চটি পুস্তকও রচনা করিয়াছেন, অদ্য আমরা গৌরবের সহিত তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া থাকি।

যদিচ আমরা দীপঙ্করকে বঙ্গের আদি গৌরব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, * তথাপি বঙ্গের অন্যতম গৌরব দীপঙ্কর ও অভয়াকর গুপ্তের † জীবনচরিত বঙ্গভাষায় উপযুক্ত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক দিগকে উপহার অর্পণ করা শরত বাবুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। তিনিই আমাদের এই আবদারের উপযুক্ত পাত্র, এজন্য অদ্য এসকল কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শরত বাবু তিব্বতাধিপতি ছুব-হৃদ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"He became an illustrious personage in Tibet. Being greatly interested in the restoration of Baddhism to its former glory, he thought it urgently necessary to invite an eminent Indian Pandit who should be profoundly versed in all the Sastras and particularly qualified in the three branches of Buddhism, *viz*, theory meditation, and practice of rites and observances, besides possessing a thorough acquaintance with the fine Buddhist learnings. He sent emissaries to India to see if such a man was to be found in Aryavarta. Being informed by some of his ministers of the great fame of Lord Atish, the King became anxious to invite him into Tibet. Accordingly he equipped an expedetion under the leadership of Nagtsho Lochava. He sent large quantities of gold and other valuable presents for this celebrated Pandit, in charge of his envoys. The party safely reached their destination, the city of Vikramasila, then the head-quarter of Buddhism in Aryavarta, where they obtained an audience with the ruling King called in Telleetan Gya-Sson-senge. After prostrating themselves, they laid their master's presents before Lord Atish, and related to him the history of the rise, progress and downfall of the Buddhism in their mother country and its recent revival therein. Under such circumstances, they represented, the cause of Dharma could not be promoted by any other Pandit than himself. They exhorted him to accept the invitation. The Lochavas became his pupils and waited upon him as his servants. At last after a long and careful consideration Atish consented. Having consulted his tutelary deities, and the divine mother Tara; and believing that if he went to Tibet. he would render valuable service for the diffusion of Bud dhism, more particularly because it was predicated of him that he would be of

---

* কারণ, সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের গুরু, তদানীন্তন বৌদ্ধজগতের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত স্থবিরশ্রেষ্ঠ শীলভদ্র একজন বাঙ্গালী। দীপঙ্করের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের রাজধানী সমতট নগরে শীলভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

† শরত বাবু লিখিয়াছেন,—

"Abhayakar Gupta was born in middle of the 9th century after Christ in Eastern India near the city of Gour. When he grew up to youth, he went to the central country of Magadha, where learned the five sciences and became well known as a pandit. It was here that he entered the priesthood. During his time there reigned in Magadha King Rampala, in whose palace he was appointed to conduct the religious ceremonies. * * * During the reign of Rampala, under the leadership of Abhayakar

the sacred religion of Buddha received a fresh impulse."

Sarat Chandra Das' Contributions on Tibet. (J. A. S. B. Vol. LI. pp. 16, 18,)

great service to a certain great Upasaka. * Although the journey would be beset with dangers to his life, yet the aim of that life being devotion to the cause of religion and the welfare of living beings, he quitted his monastery Vikrama Sila, for Tibet, in the year 1042 A. D. at the age of 59. Arrived in Nah-ri he took his residence in the great Lamasery of Tho-ding. He instructed the King in aphorisims and tantras. Then gradually he visited U and Tsan where he turned the wheel of Dharma (preached religion). He wrote many useful sastras, such as Lam Don, "the lamp of the true way" He died at the age of 73, in 1055 A. D.

(Sarat Chundra Das' Contributions on Tibet.-J. A. S. B. Vol. L. P. 237).

ইহা আমাদের নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, শরত বাবু অতীশের গ্রন্থ সমূহ সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই, যাহাকে তিনি বঙ্গের "আদি গৌরব" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাহার গ্রন্থ সমূহ ও ধর্ম্মমতের স্থূলমর্ম্ম জানিবার জন্য বঙ্গীয় পাঠকগণ শরত বাবুর নিকটই আবদার করিতে পারে।

ইংরেজিতে তিনি তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অতীশের সমসাময়িক এদেশীয় নরপতির নাম Gya-Tsan-senge লিখিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা প্রবন্ধে তিনি এই নরপতিকে নয়পাল (ভ্রমক্রমে ন্যায়পাল) লিখিয়াছেন। তিব্বত দেশীয় বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থকার তারানাথের মতানুসারে অতীশ মহারাজ নয়পালের পিতার সমসাময়িক। তারানাথ বলেনঃ—

Bheyapala (বিগ্রহ পাল?) reigned thirty-two years, and preserved his kingdom in its previous extent (he had with him Jo Adish, the real propagator of Buddhism in Thebet. (Taranath's Magadha kings. By Miss E. Lyall.)

শরত বাবুর বাঙ্গলা প্রবন্ধে তিনি বিক্রম শীলকে নয়পালের রাজধানী লিখিয়াছেন। আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি, বিক্রমশীল একটি বৌদ্ধ বিহার, এই স্থানে পাল রাজগণের রাজপাট সংস্থাপিত হওয়ার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন ক্ষোদিত লিপিতে ইহার উল্লেখ নাই। তারানাথ উদানন্দপুর ও বিক্রমশীলকে দুইটি প্রধান বৌদ্ধ বিহার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তারানাথ বলেন, মগধবিজেতা তুরকী সেনানী (মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী) শ্রমণ কুল নির্ম্মূল এবং উদানন্দপুর ও বিক্রমশীল নামক বৌদ্ধ বিহার বিনষ্ট করিয়াছিলেন। exterminated the priests, and destroyed the celebrated monasteries of Otantapur and Vikramasila.)

কোকৌকি * কিম্বা সিউকী † গ্রন্থে উদানন্দপুর কিম্বা বিক্রমশীলের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিজ্ঞবর ব্রডলি সাহেব "The Buddhistic Remains of Behar" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে উক্ত বিহার দ্বয়ের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শরত বাবু The sacred and ornamental Characters of Tibet নামক উপাদেয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন,—

"সুবিখ্যাত তিব্বতাধিপতি খিসরণ, সান্তরক্ষিত এবং পদ্মসম্ভবাচার্য্য নামক ভারতবর্ষের দুই জন পণ্ডিতের সাহায্যে উদানন্দপুর বিহারের আদর্শ অনুসারে (লাসা নগরে) সাম-ইয়ে নামক বিখ্যাত বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। With the help of this two Indian pandits the King founded the famed monastery of Sam-yea after the model of the monastery of Uddanadapuri of Magadha. He richly endowed this monastery, and provided it with spacious accommodation in buildings designed in the Indian

* This was the celebrated Brom-tan-Gyalwai Junne, who succeeded Atisa in the Pintifical chair of Tibet.

* ফাহিয়াণের তীর্থ যাত্রা।

† হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

fashion for the residence of one hundred and eight Indian Pandits.)*

রথ্‌হিল সাহেব বলেন, "নালন্দা বিহারের আদর্শ অনুসারে সামই-বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।" The celebrated teacher (পদ্মসম্ভব) sperintended the building of the famous Hsam-yas (pr. Samye) monastery at Lasha, which is supposed to be a copy of the Nalanda monastery in Magadha·) শরত বাবু এবং রথহিল সাহেবের পরস্পর বিরোধী মতের মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা হউক, আমরা শরত বাবুর মতগ্রহণ করিলাম। সাম-ইয়ে বিহার খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং উদানন্দপুর নামটী তদপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে।

বেগলার সাহেব বলেন, অধুনা যে স্থান বিহার নামে পরিচিত, তাহার প্রকৃত নাম উদানন্দপুর।† এই স্থানে একটি প্রধান বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া ইহাকে "উদানন্দপুর বিহার" বলিত। বিজয়ী মুসলমানগণ জটিল উদানন্দপুর শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র বিহার আখ্যা দ্বারা ইহাকে পরিচিত করেন। পাঠান শাসনকালে উল্লিখিত উদানন্দপুর মগধের রাজধানী ছিল। তদনুসারে সমগ্র মগধ ও মিথিলা রাজ্য সুবে বিহার আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে সের সাহ প্রাচীন পাটলিপুত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটনা নগরী নির্ম্মাণ করেন।§ তদবধি (উদানন্দপুর) বিহারের সৌভাগ্য-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সেই বিহার অধুনা পাটনা জেলার অন্তর্গত স্বনামখ্যাত সবডিবিসনের প্রধান নগর।

নালন্দার ৩ মাইল দক্ষিণে "শীলাউ" নামে এক প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। বেগলার সাহেব বলেন, ইহাই প্রাচীন বিক্রমশীল। এই স্থানে পারস্য ও আরবি ভাষায় ক্ষোদিত লিপিসংযুক্ত প্রস্তরনির্ম্মিত অনেকগুলি সমাধি মন্দির ও মসজিদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানগণ বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিকলাপসমূহ বিনষ্ট করিয়া তাহার ভগ্নাবশেষ দ্বারা এই সকল মসজিদ সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে বিক্রমশীলের "বিক্রম" শব্দ বিলুপ্ত হইয়া কেবল শীল শব্দ বিকৃতভাবে বর্ত্তমান আছে।

নালান্দা ও বিক্রমশীলের স্থিতি স্থান অনুসারে,বোধ হয়,পরিব্রাজক বিক্রমশীলকে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিয়োনসাঙ বলেন, তিনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের নির্ম্মিত পিত্তল বিহার হইতে ২০০ কদম (Paces) গমন করিয়া মহারাজ পূর্ণবর্ম্মের নির্ম্মিত ৪৩ হস্ত উচ্চ এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করেন। তথা হইতে ২।৩ লি উত্তরদিকে গমন করিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত এক বিহার দর্শন করেন। এই বিহার মধ্যে তারাবোধিসত্ত্বের এক প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসরের প্রথম দিবসে এই স্থানে একটি উৎসব হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের অধিপতি, মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া তারামূর্ত্তির পদে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। রত্নখচিত পতাকা উড্ডীন ও চন্দ্রাতপ দ্বারা সজ্জিত

* এই বিহার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত নয়ান সিংহ এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিহারস্থিত দেবমূর্ত্তিগুলি বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত। এই বিহারে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পুস্তকালয় আছে। (Markham's Tibet. p.CXX.)

† Arch. Survey Report. Vol. VIII. p. 75.

§ Elliot's India. Vol. IV. p. 477.

হইয়া থাকে। ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্র পর্য্যায়ক্রমে নিনাদিত হয়, তৎসহ সুমধুর বীণা ও বংশী বাদিত হইতে থাকে। *

পালবংশীয়দিগের শাসনকালে বিক্রমশীলের বিহারই বোধ হয় পূর্ব্বভারতে সর্ব্বপ্রধান ছিল। মহাত্মা অভয়াকর গুপ্ত যৎকালে পূর্ব্বভারতের বৌদ্ধদিগের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় বিক্রমশীলের বিহারে ৩০০০ এবং বজ্রাসন (বৌদ্ধগয়ায়) বিহারে ১০০০ এবং উদানন্দপুর বিহারে ১০০০ শ্রমণ বাস করিতেন।

প্রবাদ অনুসারে বিক্রমাদিত্য নামক জনৈক নরপতি বিক্রমশীল নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেগলার সাহেব বলেন ঃ—

"The Foundation of the Sitao is ascribed to Vikramaditya even by the Muhammadans of the place."

ইনি কোন্ বিক্রমাদিত্য, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু বোধ হয়, হিয়োনসাঙের পরবর্ত্তী মগধের কোন নরপতি হইবেন।

শরতবাবুর মতানুসারে দীপঙ্কর, অভয়াকর গুপ্তের পরবর্ত্তী হইতেছেন। কিন্তু শরত বাবু ইহাও বলেন যে, অভয়াকর মহারাজ রামপালের এবং দীপঙ্কর মহারাজ নয়পালের সমসাময়িক। ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রামপাল নয়পালের পরবর্ত্তী নরপতি। সুতরাং নয়পালের সমসাময়িক দীপঙ্কর রামপালের সমসাময়িক অভয়াকর গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। ভরসা করি, শরতবাবু এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আলোচনা করিবেন।

এক্ষণে আমরা নয়পাল ও দীপঙ্করের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শরতবাবু বলেন, দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে (৯০২ শকাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে (১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি কৃষ্ণগিরিস্থ * আচার্য্য রাহুলগুপ্তের নিকট অধ্যয়ন করিয়া "গুহ্যজ্ঞান বজ্র" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপর "ওদন্তপুরের" (উদানন্দপুরের) মহাসঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট "শ্রীজ্ঞান" নামপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ভিক্ষুকাশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করত বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে তিনি (সুবর্ণভূমি প্রাচীন হংসাবতী আধুনিক রেঙ্গুন) গমন করেন। যে পোতারোহণে তিনি তথায় গমন করেন, ত্রয়োদশ মাসে সেই নৌকা সুবর্ণদ্বীপে উপনীত হইয়াছিল। তথায় তিনি দ্বাদশ বৎসর বাস করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও বোধ হয় এক বৎসর অতীত হইয়াছিল। মগধবাসী বৌদ্ধগণ তাঁহাকে ধর্ম্মপাল রূপে মনোনীত করেন। তদনন্তর তিনি রাজা নয়পাল কর্ত্তৃক বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

এবম্প্রকার সময়ের তালিকা ধরিয়া গণনা করিলে, দীপঙ্কর অন্ততঃ ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমে (১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে) নয়পাল কর্ত্তৃক বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন, লেখা যাইতে পারে।

---

* Beal's Si-Yu-ki. Vol. II. pp. 174,175.

* কৃষ্ণগিরি কোথায়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। ইহার সহিত হিয়োনসাঙ-লিখিত কালপিনাকের কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা স্থিররূপে বলা যাইতে পারে না।

শরত বাবুর লিখিত বাঙ্গালা প্রবন্ধের মতানুসারে দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে উপনীত হন, এবং ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। শরতবাবুর প্রকাশিত "রিউমিগ" (Chronological Table) গ্রন্থের মতানুসারে দীপঙ্কর ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে উপনীত হন এবং ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। শরতবাবুর লিখিত এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাসের মর্ম্মানুসারে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরত বাবুর লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে দীপঙ্করের সময় সম্বন্ধে এইরূপ গণ্ডগোল দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তারানাথের মত পরিত্যাগ করিলে মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে,১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্কর নয়পাল কর্ত্তৃক বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১০৩৮—১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার মিত্র, ডাক্তার হারনলি এবং জেনারল কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পালরাজগণের বিবরণ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক দ্বারা ১২৯৪ বঙ্গাব্দের নব্যভারতে "পালরাজগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

জেনারল কনিংহাম পাল নরপতিদিগের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নয়পালের নাম দৃষ্ট হয় না। ডাক্তার হারন্‌লি এক অদ্ভুত মত উদ্ভাবন করিয়া দেবপাল ও নয়পালকে অভিন্ন ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের নয়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এমতাবস্থায় তাঁহার ১৬ বৎসর পূর্ব্বে দীপঙ্কর কিরূপে নয়পাল কর্ত্তৃক বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু এস্থলে তারানাথের মতানুসরণ করিলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। কারণ তারানাথ বলেন, নয়পাল যে বৎসর পৈত্রিক সিংহাসন আরোহণ করেন, সেই বৎসর অতীশ তিব্বতে উপনীত হইয়াছিলেন।

"He was succeeded by his son Neyapala, who reigned thirty five years (the year of his accession was that in which Jo-Adish arrived in Thibet:)"

আমরা তারানাথের গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদের অনুবাদ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার বলে কোন তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

পাল নরপতি বর্গের তালিকা প্রস্তুত কালে আমরা বলিয়াছি যে,—"পাল রাজগণ কে কোন্ বৎসর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ৭৩০ শকাব্দে কিম্বা শকাব্দের অষ্টম-শতাব্দীর প্রথম ভাগে পালদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। শকাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে ইহাঁদের শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিঞ্চিৎদুন সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর দ্বাদশ জন পাল নরপতি বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত আর কিছুই স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। কিন্তু মিত্র মহাশয় কিম্বা কনিংহাম সাহেবের ন্যায় একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে,

আমরাও নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।"*

উক্ত আনুমানিক সময় সম্বন্ধীয় তালিকায় আমরা নয়পালের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাও শরত বাবুর লিখিত সময়ের সহিত ঐক্য হইতেছে না। দীপঙ্কর এবং নয়পালের সময় সম্বন্ধে গণ্ডগোল হইতেছে বলিয়া আমরা শরত বাবুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি মূলগ্রন্থ সমূহ দর্শন করিয়া, রাজার নাম ও দীপঙ্করের জীবনের প্রধান ঘটনা সহ বিশুদ্ধ সময়ের তালিকা প্রকাশ করিলে বাঙ্গলার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। তারানাথের গ্রন্থের অনুবাদের জন্য আমরা শরত বাবুকে অনুরোধ করিতে পারি কি? তারানাথের গ্রন্থের কিয়দংশ বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বিশেষ সম্পর্ক-বিশিষ্ট। তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত বাবু শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ই এই সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অন্য কোন বাঙ্গালীদ্বারা ইহা হইবার নহে?

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* নব্যভারত, পঞ্চমখণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা।

ফুলরেণু।

পুতুল খেলা।

সেযে গো আপন মনে আপনিই খেলে,
ইট কাঠ মোম মাটী পুতুল তাহার,
থেঁতালে আছাড়ে সব ভেঙ্গে চুরে ফেলে,
নাই শোক, নাই দুঃখ, নাই হাহাকার!
সে ত গো ব্যথিত জন দেখেনি কখন,
কেমনে বুঝিবে তবে ব্যথা কারে কয়?
জড়ের মিলনে তার জড়ের জীবন,
ইট কাঠ পোড়ামাটী তাহারো হৃদয়!
আপনি সাধিয়া নিয়া দিয়াছ পরাণ
খেলিতে তাহারে, সেত চাহেনি কখন;
অনাদরে কেন তবে ভাব অপমান?
প্রাণ কি পুতুল বড় জানেনা সেজন!
হৃদয় কি—বেদনা কি, সে বোঝেনা হায়,
সেযে গো সকলি দিয়া পুতুল খেলায়!

কিশোরী।

১

বুক ভরা দ্রবহ্নি করে আস্ফালন,
আপনার তেজে ধরা আপনি চঞ্চল,
সে তীব্র আগ্নেয় দন্তে জাগিছে যৌবন,
কিশোরী কোমলচিত্ত শিহরে কেবল!
নিরুদ্ধ-বাসনা দগ্ধ-ধাতব নিঃস্রাবে,
প্রধূমিয়া নেত্রে, করে শকতি সঞ্চয়,
অপাঙ্গে ধ্বংসের দীপ্ত ধারা ব'য়ে যাবে,
ইঙ্গিতে মুমূর্ষু লজ্জা দেয় পরিচয়!
মুহুর্ম্মুহু ভূমিকম্প—পর্ব্বত উত্থান,
অগ্নিময় মহাযুগ করে নিমন্ত্রণ;
অনাদরে ভুলে দেয় এক কণা প্রাণ,
স্নেহে ফুটে সীতাকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণ!
বহিলে বিমনা গঙ্গা আবিল প্রবাহে,
প্রীতির সুবর্ণকণা তবু আসে তাহে!

কিশোরী আকাশে আঁকা মহা নীলিমায়,
অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তা'তে,
শরতের রৌদ্র জ্বলে হেমন্ত সন্ধ্যায়,
বসন্ত রয়েছে পথে শীতের পশ্চাতে!
কি সুন্দর শ্যামসন্ধ্যা—মহা সন্ধিস্থল,
এক পারে রাগরক্ত ডুবে রোষমান,

ছড়া'য়ে অপর তীরে অমৃত উজ্জ্বল,
প্রেমপূর্ণ চন্দ্রমার উদয়—উত্থান!
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে হেন মহাসন্ধি-পূজা—
আত্মবলি মহাদেবী করেন গ্রহণ,
মানবীয় রক্তমাংসে—গায়ত্রী-দ্বিভুজা—
বিদারিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র অবতীর্ণ হন!
মহাভক্ত! মহাকামি! হে মহাস্থবিরথ!
প্রণয় প্রণবে পূর্ণ কর মনোরথ!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কনকের কাঁচমেঘ 'কিশোরী'র রূপে,
ব্যাপিয়া বসন্ত গ্রীষ্ম বাড়ে পরিমাণ;
অগ্নিময় দাহতৃষ্ণা প্রতি রোম কূপে,
অযুত অতৃপ্তি দিয়া জাগায় পরাণ!
অনন্ত ভাবের রাজ্য—চিন্তার কানন,
ধুইয়া কল্পনা বহে—পবিত্র জাহ্নবী,
করিতে সে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ,
আবিল প্রবাহে ভুলে ডুবিলেন কবি!
কত কি কলঙ্কদাগে শুভ্র পরিচ্ছদ
মলিন হইল তার—অজানা—অজ্ঞাতে:
বিদ্রূপের বিশেষণ "হাস্যের আস্পদ"
"অনুকরণের" দিয়া ক্ষারজল ত'াতে,
আছাড়ি সাহিত্য-পাটে সম-আলোচক,
বিনামূল্যে ধুয়ে দিলে কবির রজক!

রুচি-ফোবিয়া।

কল্পনা-কমলবনে মানসের সরে,
কৌতুকে কবিতা বালা খেলিছে বসিয়া,
কখনো পুতুল গড়ে যতনে আদরে,
পরীর বসন্ত-বক্ষে পারিজাত দিয়া!
প্রেমের প্রথম মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষিয়া,
হাতে তার দেয় শর—গরলের জ্বালা,
বিদায়ের শেষসিক্ত চুমো খেতে দিয়া,
বিরহীর অশ্রুজলে গেঁথে দেয় মালা!
কুরুচি-আতঙ্কে ক্ষিপ্ত সুরুচির শ্বান,
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন,
গর্জ্জনে কাঁপায় বঙ্গ কাব্যের উদ্যান,
সশঙ্কে কবিতাবালা সংকুচিত মন!
কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দূর,
রুচি-ফোবিয়ার আমি ফরাসী পাস্তুর!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ব্রাহ্মসমাজের মতবিকৃতি

প্রকৃতির গতি যেমন অপ্রতিবিধেয়, তাহার বিকৃতিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য শিক্ষা, সংস্কার, শাসন প্রতিনিয়ত সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া প্রকৃতির পরিচর্য্যা করিতেছে। একদিন অবহেলা করিলে শরীরের ইন্দ্রিয়দ্বার সকল যেমন ক্লেদদূষিত হয়, ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মমত সকল তেমনি সংস্কারদৃষ্টির অন্তরাল হইলে, অলক্ষিত ভাবে বর্ষে বর্ষে বিকৃত হইয়া উঠে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস ইহার প্রমাণস্থল। এইজন্য, খ্রীষ্টীয় সমাজের তৃতীয় শতাব্দী হইতে ক্রমাগত প্রায় প্রতি শতাব্দীতে ইয়োরোপ, আসিয়ার নানাস্থানে প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ প্রতিনিধি সভাদ্বারা মতবিবাদ এবং মতবিকৃতির প্রতিবিধান করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণও সময়ে সময়ে মহাসঙ্ঘ আহ্বান করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র স্থির করিয়া লইতেন। কালসহকারে যেমন ঐ সকল পুরাতন ধর্ম্মবিধানের মধ্যে

বিশেষ মতভেদ জন্য নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হইয়াছে, তেমনি সেই সঙ্গে কেহ পুরাতন কেহ আধুনিক সাম্প্রদায়িক নাম গ্রহণপূর্ব্বক আপনাপন বিশেষ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। মানবের জীবনগতি যেমন স্রোতঃস্বতীর ন্যায় চঞ্চল, বিচিত্র, ধর্ম্মমতের গতিও তদ্রূপ। কেহ ইহাকে নিবারণ করিয়া এক অবস্থায়, এক নিয়ম বা শাসনবিধির অন্তর্গত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এই কারণে, এক এক সম্প্রদায় হইতে শত শত শাখা, উপশাখা, সম্প্রদায় হইয়া ধর্ম্মসমাজকে যুগে যুগে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে বিভিন্ন মতের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে, ইহা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা প্রাচীন ইতিহাসে সংঘটিত হইয়াছে, নবযুগ বর্ত্তমানেও ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু ইহার সংশোধন আবশ্যক।

গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মত বিশ্বাস, সাধ্য সাধনতত্ত্ব, সামাজিক, পারিবারিক এবং সাধারণ নৈতিক বিধি সমস্ত সুপ্রণালীশুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। নূতন ধর্ম্মবিধানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময়োপযোগী যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার মূলভিত্তি একপ্রকার গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক গুরুতর মত এখানে আলোচিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে; ভবিষ্যতে সে সমুদয়ের উন্নতি এবং বিকাশ সাধনের পক্ষে যেরূপ মুক্তক্ষেত্র প্রয়োজন, তাহারও অভাব রাখা হয় নাই। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তি; আধ্যাত্মিক যোগের সহিত সদনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য,এ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য; অল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে যত দূর সম্ভব,তাহা এখানে হইয়াছে। এ ধর্ম্মের বিস্তৃত উদার অথচ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং স্থানীয় জাতীয় বিশেষত্ব, উভয়ের সমাবেশ হইয়াছে। পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ, গুরু এবং অবতারবাদ, বাহ্যভক্তি, বিভূতিযোগ, হটযোগ, প্রেততত্ত্ব, নরপূজা, প্রভৃতি যত কিছু ভ্রান্ত মত পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তাহাদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি, এ সকলও এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্ব্বাণ সমাধি, বৈরাগ্য, ভক্তি, মহাভাব, মহাযোগ, জ্ঞান, নীতি, গার্হস্থধর্ম্ম কিছুই আর আলোচিত এবং অনুষ্ঠিত হইতে বাকী নাই। কোন্ ভাবে কোন্ মত গ্রহণ করা উচিত, কোন্ অনুষ্ঠানের সঙ্গে কত দূর যোগ দেওয়া যাইতে পারে, এ বিষয়ে প্রতিজনের বিবেক সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। মতের তালিকা ধরিয়া, কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুগমন করিয়া এ সকল কর্ত্তব্য বুঝিতে হয় না, কিন্তু শিক্ষিত বিবেক, বিশুদ্ধ জ্ঞানসংস্কার, কখন কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেয়। এতদূর উচ্চতর সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহারা এক্ষণে সাধনের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা মূল মতের মূলে কুঠার আঘাত করিতেছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া আমরা বড়ই বিস্মিত হইতেছি। এ সম্বন্ধে কিছু আন্দোলন প্রার্থনীয়।

আমাদের একটা দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, এ যুগের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ পুনরায় ভ্রান্তি কুসংস্কার অন্ধভক্তি পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত হইতে পারেন না। ইহা

অসম্ভব মনে হইত। কিন্তু আজ কাল ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভূতপূর্ব্ব প্রচারক এবং তাঁহাদের অনুগামী ব্রাহ্মদল গুপ্ত এবং প্রকাশ্য ভাবে যে সকল উপধর্ম্ম, কুধর্ম্ম আচরণ এবং প্রচার করিতেছেন, তাহা দেখিলে আর কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে বসিয়া, গুরুসত্য, প্রেততত্ত্ব, রহস্যবাদ, নরপূজা, পৌত্তলিকতা, অন্ধভক্তি, জঘন্য কুসংস্কার সকল পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাঁরা কেহ পনর, কেহ বিশ, কেহ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বহু বহু বক্তৃতা, পুস্তক, পত্রিকা, উপদেশ দ্বারা যে যে কার্য্যে এত দিন বিধি দিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখন নিষেধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বকার লিখিত বাক্য সকল অদ্যাবধি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনচরিতও আমাদের চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান। অবশ্য এ সকল ব্যক্তি এক্ষণে লজ্জা ভয় লোকনিন্দার অতীত। কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন, না বিকৃতি? কোন্‌টী তাঁহাদের সত্য মত? হয়তো নবানুরাগী অন্ধানুগামী অনুচরবৃন্দ বলিবেন, "ইহাঁরা আগে ছিলেন মত-প্রচারক, জ্ঞান-বিচারক, তার্কিক, সাম্প্রদায়িক; তখন ইহাঁরা ভগবানকে দেখিতেও পাইতেন না, অমরাত্মা দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করা কি অলৌকিক কর্ম্ম করা, কি শক্তি সঞ্চার করা, এ সকল কিছুই জানিতেন না; কেবল চালভাজা চিবাইতেন, পরের মুখে ঝাল খাইতেন, আর চক্ষু বুজিয়া বকিয়া বকিয়া হয়রাণ হইতেন; এইক্ষণে উদার, অসাম্প্রদায়িক সাধক এবং সিদ্ধ হইয়াছেন, শক্তিসঞ্চার ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে পারেন। যাঁহারা বহুকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া শান্তি পান নাই, তাঁহাদিগকে মন্ত্র বলে ইহাঁরা শান্তি দিতেছেন। হিন্দু সমাজের কত নরনারী সধবা বিধবা বালক বালিকা পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে সাক্ষাৎ অবতাররূপে দর্শন করত কৃতকৃতার্থ হইতেছে। অতএব ইহা কি উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন নহে? কেবল পরিবর্ত্তন কেন? ইহা সিদ্ধাবস্থা।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, এত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ কিরূপে হইল? পনর বিশ বৎসরের সাধন সিদ্ধিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যদি মিথ্যা ভ্রান্তি হইতে পারে, তবে আবার যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ কি? মানবের ধর্ম্মবিশ্বাসও কি জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী? অন্ধ অনুচরগণ সাবধান! আত্মঘাতী, অস্থির মতি ভ্রান্তগুরুর শিষ্য হইয়া শেষ যেন তোমাদিগকে অন্ধকার কণ্টকবনে পড়িয়া ভ্রষ্ট হইতে না হয়! কি দেখিয়া এত বিশ্বাস তোমাদের হইল যে, ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া পুনরায় অজ্ঞান অন্ধকারমধ্যে তোমরা প্রবেশ করিতেছ? অজ্ঞানতা, কল্পনা এবং অন্ধ বিশ্বাসে এক প্রকার শান্তি আছে, সেই জন্য কি? না, হতচৈতন্যাবস্থা, স্বপ্নদর্শন, এবং মূর্চ্ছাকে সাধনের পরাকাষ্ঠা মনে কর? এই ভ্রান্তির নেশা যখন ছুটিয়া যাইবে, তখন তোমরা যে দুকূল হারাইবে। অথবা এ পন্থা দুকূল রক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা বলিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট আছ! দুর্ব্বল ভীরু অলস ভাবান্ধের পক্ষে ইহা একটী প্রলোভন বটে!

হয়ত অনেকের সংস্কার আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মত বিশ্বাস সাধন প্রণালী, তাহা ঐ সকল শিষ্যবৃদ্ধিকারী মন্ত্রদাতা গুরু এবং যোগগৃহীতা শিষ্যগণ পরিত্যাগ করেন নাই। সে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর সাধকের প্রাথমিক শিক্ষা, আর এখন যে সমস্ত "যোগগ্রহণ" "মন্ত্রগ্রহণ" 'শক্তিসঞ্চার" ইহা অনেক উপরের সাধন।

বোধ করি, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কোন কোন ব্রাহ্ম কর্ত্তাভজা গুরুর নিকট প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-ত্যাগী গুরুর নিকট মন্ত্র এবং যোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকাশ্যে এ সকল অদ্ভুত মত, দুর্ব্বোধ্য অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের ভিতর তাঁহারা এখনও চালাইতে পারেন নাই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গোপনে বা অর্দ্ধ গোপনে এ সকল চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ! তুমি কি এখন বৃদ্ধ হইয়া ক্রমে ভীরু হইতেছ? তোমার সে উষ্ণ শোণিত কোথা? সকল প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ও অস্বাভাবিক সাধনের আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, তাহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কালী পূজা, গাঁজাখোর গুলিখোরের স্বপ্ন কল্পনা মিশিয়া যাইবে? ভক্তির সাধনে কতক কতকবাহ্যাড়ম্বর স্বাভাবিক, তাহাও মানি, কিন্তু সেই সঙ্গে গোলেমালে কি জড় এবং নরপূজা গ্রহণ করিতে হইবে? জাতি কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আবার সেই উপবীত ধারণ, পৌত্তলিক ক্রিয়া? ভক্তির অনুরোধে অসত্য ভ্রান্তির সেবা? এমন কি সূক্ষ্ম নবীন ব্যাখ্যা ইহার ভিতর লুকাইয়াছিল, যাহা এত দিন কেহ দেখে নাই, ভাবে নাই? ব্রাহ্মসমাজের মতের কি এতই অরাজকতা ঘটিয়াছে যে, যাঁহার যাহা ভাল লাগিবে, তিনি তাহা ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন? এ কি খেয়ালীদিগের খেয়াল? গুরুগিরির যে সকল দোষ, অন্ধবিশ্বাস, স্বপ্ন কল্পনার যে সকল কুফল, তাহা কি পুনরায় দেখা যাইতেছে না? তাই বলিতেছি, হে ভীরু, কেমন করিয়া তুমি নীরবে এ সকল গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছ, মুখে একটী প্রতিবাদও নাই? মানুষ কি করে, শান্তি পায় না, আমোদ পায় না, চিত্ত স্থির হয় না, কাজেই এ সব অদ্ভুত সাধন ধরিতে যায়। কিন্তু ইহারও পরিণাম কি মৃত্যু,—নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, আত্মপ্রবঞ্চনা, কৃত্রিম ধর্ম্মামোদ নহে? আশ্চর্য্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মসমাজের অধিকার মধ্যে অবাধে এই সকল পৌত্তলিকতা, অন্ধ বিশ্বাস, বহুদিনের উচ্ছিষ্ট অর্থহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান চলিয়া যাইতেছে। আরো আশ্চর্য্য এই, যে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মান্য গণ্য, তাঁহারাই এই মতবিকৃতির প্রধান সহায়। ভিতরে ভিতরে ইহাঁরা গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোপনে গুপ্ত সাধন করেন। তাহার ফল কেবল কৃত্রিম আনন্দ, মূর্চ্ছাযোগ, সাময়িক মত্ততা, আর আউলে বাউলে ব্যবহার; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সার চরিত্র কৈ? কয়টী চরিত্র এই পথে আসিয়া জ্ঞান প্রেম উচ্চ নীতিতে ভালরূপে গঠিত হইয়াছে, কেহ কি বলিতে পারেন? কতকটা যেন ফ্রিমেসন, কতকটা কর্ত্তাভজার মত দাঁড়াইতেছে। যদি বল, মূল মত ঠিক আছে, সাধনের প্রণালী কেবল নূতন। এ কথা বলা কেবল চক্ষে ধূলি দেওয়া মাত্র। অনেক পুরাতন হাফ ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে নবীনভাবে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাস্তবিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ। এক শ্রেণীর অল্পবিশ্বাসী অবিশ্বাসী ধর্ম্মহীন শিক্ষিত লোক এক্ষণে বয়োধর্ম্মগুণে নানারোগে আক্রান্ত হইয়া শেষ বয়সে এই উপধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতেছেন। কিছু বুঝা যায় না, অথচ দেখিতে শুনিতে বেশ আশ্চর্য্য; কিছু করিতে হয় না, কোন ত্যাগস্বীকার কিম্বা নৈতিক শাসনের পীড়াপিড়ি নাই, অথচ ধর্ম্ম; এইরূপই এখন অনেক লোক চায়। সুতরাং এরূপ মতের গুরু

যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ধুরন্ধরেরা হইতে পারেন, এমন আর কেহ পারিবে না। কিন্তু বলিহারি ভারতের অল্পবিশ্বাসী তরলমতি লোকদিগকে! কোন প্রকার একটু নূতন-তর অদ্ভুত দেখিলেই তাহারা সহজে মোহিত-হয়। বড় আক্ষেপের বিষয় যে, ইহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত বিশুদ্ধ শিক্ষাকেও কলঙ্কিত করিতে চলিল। যে রোগ ভাল করিতে পারে, ভবিষ্যৎবাণী বলে, মূর্চ্ছা যায়, অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে, এবং দেখায়, স্বভাবের বিপরীত নিয়মে চলে, ভড়ং করে, বুজরুকি দেখায়, এবং তৎসঙ্গে প্রচলিত সাধারণ লোকাচার দেশাচারকে মিলাইয়া দেয়, সে-ই এখন জ্ঞানাভিমানীদিগের গুরু!

এক্ষণে ব্রাহ্মসাধারণ একটু জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের মূল মতগুলি ঠিক করিয়া লউন। ধর্ম্মমত অবিকৃত না থাকিলে সামাজিক এবং পারিবারিক নীতি পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া যাইবে। এ সকল ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা নহে, বর্ত্তমানেরই। মুষার বিধিকে এখন পুনরায় জীবিত করা আবশ্যক। অপরিবর্ত্তনীয় মূল মতের উপর দাঁড়াইয়া যাবতীয় মত অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ কর, কিন্তু বাহিরের দিকে অধিক চলিয়া পড়িও না। ভক্তি বিশ্বাস যদি থাকে, ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনেই প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে। পৌত্তলিকতা আর ব্রহ্মজ্ঞান, এ দুইয়ের সীমা নির্দ্ধারিত আছে এবং থাকিবে। বাহ্যাবলম্বনের উপর কোন অলৌকিক দেবত্ব স্থাপন করিও না। এইটী চাই নতুবা হবে না, এরূপ কোন বাহ্য পদার্থ নাই। প্রেমে মত্ত হও, আর নৃত্যই কর, কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য হারাইও না। চেতনারহিত হইলে তুমি জড়পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহ। মহাসমাধি মহাযোগে মগ্ন হও, তথাপি আধ্যাত্মিক চেতনা, নির্ম্মল বিবেক ব্যতীত তাহার কোনই সার্থকতা নাই। মত্ততা লাভের জন্য কি তুমি জড়পুত্তলিকার পায়ে অঞ্জলি দিবে? না কাল্পনিক জড়মূর্ত্তি ধ্যান করিবে? তাহা পার না। গুরুর যদি কোন বিশেষ গুরুত্ব থাকে, তাহা ভক্তির আস্পদ, সাধনের সহায়, কিন্তু কেবল তাঁহাকে প্রভু প্রভু বলিয়া অশ্রুপাত করিলে কি হইবে? মহা-প্রভু পরমপ্রভুর ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিলাও। নিশ্বাসকে রুদ্ধ না করিয়া তাহার মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ জীবন্ত লীলা দেখ। স্বভাবকে নষ্ট করিয়া অস্বাভাবিক হইও না, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনে নিয়মিত কর। ঐকান্তিক অনুরাগ, একাগ্রতা, শম এবং দম, সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় পরব্রহ্মের বহুরূপী সত্তার সহজ ধারণা, তাঁহার বিধাতৃত্বের বিচিত্র ক্রিয়ার অনুভূতি, নাম গান, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তৎসঙ্গে সাধুসঙ্গ, জীবসেবা। ইহাতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম সাধিত হয়। বুজরুকির বৈরাগ্য বা কর্ত্তব্যের বিলাসাসক্তি, উভয়ই পরিত্যাজ্য। এই সহজ পথে স্বাভাবিক নিয়মে সাধন না করিয়া কোন কৃত্রিম কৌশল যদি ধর, তাহা হইলে আত্মপ্রবঞ্চিত হইবে। যাঁহারা মধ্য পথ অবলম্বন না করিয়া এক সময় অতি বেগে শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমির দিকে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন অন্ধভক্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন কণ্টকবনে পড়িয়া বৃথা ধর্ম্মাড়ম্বরে লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত হইতেছেন, এবং অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে ডুবাইতেছেন। বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িলে এই দশাই হয়। ইহা যাঁহারা এখনও দেখিয়া দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, তাঁহারা নিতান্ত কৃপাপাত্র,

সন্দেহ নাই। এত দিন অহঙ্কার বশতঃ যাঁহারা সর্ব্বসামঞ্জস্যের পথ ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও এই সকল উপসর্গ বিকৃত মত অনুষ্ঠান দেখিয়া সাবধান হউন, এবং নিরাপদ স্থান অন্বেষণ করুন। পৌত্তলিকতা, গুরুবাদ, এবং যোগভক্তির যথার্থ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে আর তৎসংক্রান্ত কুসংস্কারভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে না। ব্রাহ্মগণ! সত্যের ভূমিকে দৃঢ় ধারণ করিয়া থাক, সেই আলোকে সমস্ত সাধন প্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব দেখিয়া লও; নতুবা উচ্ছৃঙ্খল উদার ব্যাখ্যার স্রোতে পড়িয়া পরিমার্জ্জিত পৌত্তলিকতা ও মনোমুগ্ধকর কুসংস্কারের আবর্ত্তে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবে। কেবল গুটিকতক বৈজ্ঞানিক মত লইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না সত্য, তাহা স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসঙ্গত উপায়ে সাধন ও সিদ্ধিতে পরিণত করা চাই; কিন্তু মূল মতের বিকার উপস্থিত হইলে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। অতএব ধর্ম্মমত, নৈতিক নিয়মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ভবিষ্যদ্বংশের মাথা রাখিবারও আর স্থান থাকিবে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

ঈশ্বর, আত্মা ও নির্ব্বাণ।

বেদ পড়িয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। সেইরূপ আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করা যাইবে।

সাধারণতঃ ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার আলোচনা নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, আত্মসংযম ও পরোপকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। সে জন্য কেহ কেহ শাক্যের শিক্ষাকে ধর্ম্মশিক্ষা না বলিয়া নীতিশিক্ষা বলিয়া থাকেন। যাগযজ্ঞ নাই, পূজা প্রার্থনা নাই, স্বর্গনরক নাই, দেবদেবী নাই, আত্মা নাই, অমরত্ব নাই, ইহাকে ধর্ম্ম বলা সহজ নহে। অথচ ইহাই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অধিক। কেহ কেহ বলেন, ভক্তি প্রীতি-দয়া দাক্ষিণ্যাদি কমনীয় বৃত্তির উৎকর্ষসাধন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সকল প্রবৃত্তির নিরাকরণ বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা। সমাজসংস্কার, সমাজের শৃঙ্খলা ও স্থিতিবিধান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া কখন কখন আরোপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সংসারীর ধর্ম্ম নহে, সংসারভীত ভিক্ষুর ধর্ম্ম। সুতরাং সাধারণ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

শাক্যসিংহ ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করিতেন না। নির্ব্বাণলাভের পথে, বিশুদ্ধিমার্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা নাই। এজন্য তিনি ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি বুদ্ধির অনধিগম্য কোন বিষয়ের বৃথা আলোচনার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে আনন্দ, শাক্যসিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর ও আত্মা আছে কি না। তদুত্তরে শাক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি কি কখন বলিয়াছেন, উহারা নাই? ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া-

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উহারা কি নাই? তদুত্তরে শাক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি কখন বলিয়াছেন, উহারা আছে? আনন্দ মহাগোলে পড়িলেন। তাঁহার সংশয় দূরীভূত না হইয়া আরো ঘনীভূত হইল। তিনি কাতরদৃষ্টিতে আচার্য্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন সম্মুখস্থ একটী শিংশপা বৃক্ষ দেখাইয়া আচার্য্য আনন্দকে সেই বৃক্ষের কয়েকটী পত্র আনিতে বলিলেন। আনন্দ পত্রমুষ্টি আনয়ন করিলে শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,আনন্দ তোমার হাতে বেশী পত্র কি গাছে বেশী পত্র? আনন্দ বলিলেন, গাছে। "এইরূপ, আনন্দ, আমি তোমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছি,তাহা তোমার হাতের পত্রের মত মুষ্টিমেয়, যাহা শিখাই নাই, তাহা বৃক্ষস্থ পত্রের মত অগণ্য।" বিশুদ্ধিমার্গে অনাবশ্যক বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার আশ্রয় কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে শাক্য সেরূপ প্রশ্নের প্রশ্রয় দিতেন না এবং শিষ্যদিগকে সে সকল বৃথা আলোচনা নিষেধ করিতেন। কিরূপে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহাই তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল। সংসার অসত্য, জীবন যন্ত্রণাপূর্ণ ও জন্ম অনন্ত, কিরূপে এই অসত্যকে সত্যভ্রম বা অবিদ্যা হইতে, এই নিরন্তর যন্ত্রণা হইতে, এই জন্মের অনন্ততা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়; এই অবিদ্যা যন্ত্রণা ও জন্মের কারণ কি এবং ইহাদিগের হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি; এতদ্ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহার ছিল না এবং অপ্রাসঙ্গিক অন্য চিন্তা করিতে তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্রয় দিতেন না।

শাক্যের অনতিপূর্ব্বে উপনিষদে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নির্গুণ ব্রহ্ম সাধকের সামান্য সহায়। অথচ তাঁহার নামরূপ, সগুণত্ব বা নির্গুণত্ব সম্বন্ধে বিচার বিতণ্ডার অভাব ছিল না। এবং সে বিচারে সাধনার অন্তরায় ঘটে। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ লাভে নির্গুণের সার্থকতা নাই বলিয়া শাক্য হয়ত সে কথার উল্লেখ করেন নাই। সাধনপথে নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁহার নিকট অনাবশ্যক, সাধারণ প্রচলিত অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মা,সহাম্পতি, শক্র প্রভৃতি অনেকগুলি দেবদেবীর নাম শাক্যের মুখে শুনা যায়। তাঁহাদের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ বলিয়া কোথায় কোথায়ও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও মনুষ্যের ন্যায় জরামরণশীল। সুকৃতির উপভোগ পরিসমাপ্ত হইলে দুষ্কৃতি ভোগের জন্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগকেও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সাধু সংযত নির্ব্বাণ প্রয়াসী ভিক্ষুর তাঁহারা বন্দনা করেন। তাঁহাদের বন্দনায় মনুষ্যের কোন উপকার নাই। সুতরাং জীবপর্য্যায়ে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে একজাতীয় জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পশুপক্ষী মনুষ্য দেবতা হইতে পারে। দেবতাও নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। নির্ব্বাণপ্রয়াসী সকলেই। কর্ম্মফলে সকলেই আবদ্ধ।

জগত অনাদি, ইহা সৃষ্ট হয় নাই, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। পরিত্রাণকর্ত্তা বা ধর্ম্মপথের সহায় কেহ নাই। মনুষ্য আপন কর্ম্মে আপনি বদ্ধ, আপনি আপন গুণে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পাপ পুণ্য নাই, স্বর্গ নরক নাই। আজ্ঞাদাতা কেহ নাই, সুতরাং বাধ্যবাধকতা নাই। জন্ম জরা মৃত্যু সকলকে ভোগ করিতে হয়, জন্মে জন্মে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, নির্ব্বাণলাভে

পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি ঘটে। জন্মে জন্মে জরা মৃত্যু ভোগকে নরকযাতনা ভোগ বলিতে হয় বল। অজ্ঞানতা কর্ম্মের জননী, অজ্ঞানতা বা কর্ম্মকে পাপ বলিতে হয় বল। নির্ব্বাণ-প্রয়াসী ভিক্ষুর পক্ষে স্বর্গ অতি অকিঞ্চিৎকর। গৃহস্থ স্বর্গের প্রত্যাশী হইতে পারেন। কিন্তু সে অনিত্যসুখে ভিক্ষুর লোভ নাই। নির্ব্বাণ—ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, ভিক্ষুর চরম কামনা। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা নির্ব্বাণ লাভের উপায়। জরাজন্মমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এইরূপে সকলকে সাধনা করিতে হইবে। যাহা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাকে পুণ্যনামে অভিহিত করা নিষ্প্রয়োজন। আপনার মুক্তির জন্য অনন্য-সহায় হইয়া আপনি ইহা করিতে হইবে। নিন্দা বা তাড়না, পুরস্কার বা প্রশংসার সার্থকতা নাই। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, ইহা পুণ্য নহে, নিন্দা বা প্রশংসায় সে স্বাভাবিক নিয়মের রেখামাত্র বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শীল সমাধি প্রজ্ঞা-মার্গে বিশুদ্ধি বা নির্ব্বাণলাভ স্বাভাবিক নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম নাই। রেখামাত্র সে নিয়মের কোনও রূপে ব্যতিক্রম হয় না, ভয় ভাবনা ক্রন্দন প্রার্থনা সহায় সম্বল ভিক্ষুর উপেক্ষিত। ব্রহ্মা, সহাম্পতি বা মার পিশুন, কৃচ্ছ্রসাধন বা হোমযাগ সকলই অকিঞ্চিৎকর। যতদিন সৌরমণ্ডল, ততদিন মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণের কার্য্যকারিতায় ঈশ্বরের সার্থকতা নাই। ভিক্ষা করিয়া দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আত্মসংযম সুখের একমাত্র কারণ। আত্মসংযমে অক্ষম হইলে জন্ম জরা মৃত্যু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। পুরুষকারে তোমাকে তোমার দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে হইবে। এক জন্মে না পার জন্মজন্মান্তরে করিও। ঈশ্বরের সাধ্য নাই, এ নিয়মের ব্যাঘাত করেন। জন্মজন্মান্তরেও অজ্ঞানতা বাসনা সংস্কার বা ভয় তুমি ঘুচাইতে না পার, তুমি দুঃখ পাইবে। তোমার মর্ম্মভেদী যাতনা দেখিয়া কাহার সাধ্য নাই তোমাকে সান্ত্বনা দিবে।

ভাব প্রকাশ করিতে ভাষার আবশ্যক। কিন্তু ভাবের ভিন্নতা যেখানে নাই, সেখানে ভাষার ভিন্নতা আছে। এজন্য ভাব প্রকাশ করিতে অতি সাবধানে ভাষার নির্ব্বাচন করিতে হয়। "তুমি দুঃখ পাইবে, আমি দুঃখ পাই, আপন পুরুষকারে আপনি আপনার অবিদ্যা বিনাশ করিতে পার" ইত্যাদি বাক্যে বুঝা যায়, তুমি আমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু তুমি কে? তোমার দেহ? তোমার মন? আত্মা? না এ তিনের সমষ্টি? ধর যেন এ তিনের সমষ্টি হইল। তবে তুমি আমি বলিলে এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দুটী স্বতন্ত্র ব্যক্তি বুঝাইল। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে কাহারও নিত্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। মিলিন্দ প্রশ্ন বা পহ্ন নামক গ্রন্থে এ প্রশ্নের যে সুন্দর মীমাংসা করা হইয়াছে, এখানে আমরা সংক্ষেপে তাহার সার কথার উল্লেখ করিলাম। মিলিন্দকে নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি? নাগসেন বলিলেন, পিতামাতা বন্ধুবান্ধব আমাকে নাগসেন বা নাগার্জ্জুন বলেন, কিন্তু নাগসেন কোন ব্যক্তি নহে। রাজা এ উত্তরে বিস্মিত হইলে, নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিসে করিয়া এখানে আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন, রথে। তখন আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্র নেমী বা

যুপ কাহার নাম রথ? অথবা এ সকল একত্র স্তূপাকারের নাম রথ? রথ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই সকল অংশ এ-কটী বিশিষ্ট আকারে সজ্জীভূত হইলে লোকে তাহাকে রথ বলে। তেমনি রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ একটী বিশিষ্টভাবে পুঞ্জীভূত হইলে লোকে তাহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। স্কন্ধসকল অপরিবর্ত্তনীয় নহে ও তাহাদের সমাবেশ প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন হইতেছে। ব্যক্তিত্ব কাহারও নাই। অথচ সকলে আমি ও আমার বলিয়া অহঙ্কার করেন। এই অহংজ্ঞান অবিদ্যামূলক। ব্রহ্মজালসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মবাদ ও দেবতার অমরত্বে বিশ্বাস গৌতম ভ্রান্তিমূলক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বা বিজ্ঞানে বা তাহাদের সমষ্টিতে ভ্রান্তিক্রমে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া জীব আমি আছি বলিয়া অহংকার করে। অহংজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। অহংজ্ঞান, আত্মবাদ, যজ্ঞফলে বিশ্বাস ও বিলাস চারিটী বিষম দোষ বা উপাদান বা সংযোজনা বলিয়া বৌদ্ধদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে। সংযোজনা বা উপাদান জন্মজরা মৃত্যুর কারণ।

জীবের সংস্কার সকল উপাদান বা কর্ম্মফলবশাৎ নূতন সমষ্টি বা পুনর্জীবন-গঠন-প্রবণ। এজন্য মৃত্যুর পরেই পুনর্জীবন লাভ হয়। এই উপাদান বা কর্ম্মফলের অবসান না হইলে পুনর্জীবনের অবসান হয় না। এই উপাদানের অবসানের নাম নির্ব্বাণ। পুরুষকারে শীল সমাধি প্রজ্ঞা লাভ হইলে উপাদানের অবসান বা নির্ব্বাণ লাভ হয়, সেই সঙ্গে চিরমৃত্যু ঘটে।

দেহ মন ও আত্মার সমষ্টিকে দেবদত্ত বলিতে আজকাল অনেকে স্বীকার করিবেন। কিন্তু দেহ যখন বিনষ্ট হয়, তখনও দেবদত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সুতরাং দেবদত্তের হিসাবে দেবদত্তের দেহ নগণ্য, এইরূপে দেবদত্তের মনও নগণ্য হইয়া শেষে একমাত্র আত্মা গণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তুমি আমি প্রভেদ করিবার কালে আত্মা অপেক্ষা দেহ মনের গণ্যতা বিশিষ্ট হয়। পরন্তু দেহের সহিত আত্মার আধারও আধেয় সম্বন্ধ। দেহশূন্য আত্মার অবস্থান কল্পনাতীত।

আধারের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত আধেয়ের পরিবর্ত্তন হয়। আত্মার উন্নতি অবনতি দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি দেহের অনুরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। তাহা হইলে, দেহ বিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ সম্ভাবনা করিতে হয়, অথবা ঘটবিচ্যুত আকাশের ন্যায় দিগন্ত প্রস্থায়ী কল্পনা করিতে হয়, অর্থাৎ দেহের সহিত আত্মা নিঃসম্পর্ক বলিয়া অনুমান করিতে হয়। পরন্তু হস্ত পদ এক একটী অঙ্গকে দেবদত্তের হস্ত, দেবদত্তের পদ বলা হয়। কিন্তু এ সকল অঙ্গ সরাইয়া লইলে দেবদত্তের কিছু কি অবশিষ্ট থাকে? না থাকিলে "দেবদত্তের" এ সম্বন্ধ বাচক শব্দের উল্লেখ করা হয় কেন? যদি দেবদত্ত অবশিষ্ট থাকে সে কি?

পঞ্চমবর্ষ বয়সে যাহাকে দেবদত্ত বলিতে, তাহার দেহ মনের লেশমাত্র অশীতিপর দেবদত্তের দৃষ্ট হয় না। অথচ সেই দেবদত্ত ও এই দেবদত্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিতেছ। প্রথম রাত্রের দীপশিখা মধ্য রাত্রের শিখা হইতে ভিন্ন, মধ্য রাত্রের শিখা শেষ রাত্রের শিখা হইতে ভিন্ন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিখা ভিন্ন, বর্ত্তিকা ভিন্ন, তৈল ভিন্ন; তথাপি লোকে বলে প্রদীপটী সারা রাত্রি ঘরে জ্বলিয়াছে। সুতরাং দেহ মন বা আত্মা

একা এক বা ইহাদের সমষ্টি সাধারণ ভাষায় ব্যক্তি বা সত্ত্ব রূপে উল্লিখিত হইলেও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তিত্বের কারণ হইতে পারে না। যেখানে অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তিত্বের স্বীকার নাই, সেখানে নিত্য অমরাত্মার সত্ত্বায় যে বিশ্বাস নাই, উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তিগত আত্মার সত্ত্বায় বিশ্বাস বৌদ্ধ শাস্ত্রে দশটী সংযোজনা বা পাপের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেছে। এবং কোনও আকারে, স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরূপে, জীবনের বাসনা করা রূপরাগ ও অরূপরাগ সংযোজনা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম লোক বা অন্য কোন লোকে জীবিত থাকিবার বাসনা নির্ব্বাণের ব্যত্যয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এক একটী সতত পরিবর্ত্তনশীল রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকে জীব বলা হয়। অবিদ্যাবশতঃ ইহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। এই নিত্য নূতন সমষ্টির বিয়োজনকে মৃত্যু বলে, সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু উভয়েই, নিত্য ও কল্পনার অতীত। দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতিরূপ মৃত্যু বৌদ্ধ দর্শনে নাই। মৃত্যুর পরে কেবল কর্ম্মফল থাকে, আর কিছু থাকে না।' সেই কর্ম্মফল পুনর্জীবনের কারণ।

যখন কাহারও ব্যক্তিত্ব নাই, তখন পুনর্জন্মে ব্যক্তিত্ব কিরূপে ঘটে, অনুমান করা সহজ নহে। যখন দেবদত্তে দেবদত্তত্ব নাই, উহা একটী নাম মাত্র, উহার কোন বস্তু নাই অর্থাৎ দেবদত্ত নাম হইলেও কাহারও নাম নহে, তখন কোটী কোটী জন্মে সেই দেবদত্ত কি করিয়া দেবদত্ত থাকিয়া যায়, অর্থাৎ রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান যাহা লইয়া একটী পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহার বিয়োজনে সে পদার্থটী লোপ পায়, অন্য লোকে বা অন্য সময়ে রূপ বেদনা সংজ্ঞাদির নূতন সমষ্টি হইলে একটী নূতন জীব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব উৎপন্ন হয়, তবে এই দ্বিতীয় জীবটী যে দেবদত্ত পুনর্জন্মের দেবদত্ত, ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? বৌদ্ধদর্শনে বলে, একটী সমষ্টির সহিত অন্য সমষ্টির কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নাই। মুক্তামালায় একটী মুক্তার সহিত যেমন অন্য মুক্তার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সকলেই স্বতন্ত্র স্বস্ব প্রধান—জন্মে জন্মে দেবদত্ত তেমনি স্বতন্ত্র ও স্বপ্রধান। কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও মুক্তা যেমন সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী কৃত্রিম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, সকলে মিলিয়া সমবেত যত্নে একটী মুক্তমালা উৎপাদন করে—জন্ম জন্মের দেবদত্ত তেমনি কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া জন্ম জন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন মুক্তামালার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, কর্ম্ম সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে তেমনি জন্মজন্মান্তর গ্রহণ লোপ হয়।

বেদান্তদর্শনে লিখিত হইয়াছে, জীবের দুইটী রূপ—স্বরূপ রূপ ও প্রবাহরূপ। 'কাল আমি এই মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলাম' একথাটী সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে। কাল অতীত হইয়াছে, সে আমি আজ নাই, সে মণিকর্ণিকা আজ নাই, কালিকার সে গঙ্গা কত দূরে বহিয়া গিয়াছে, সুতরাং কথাটী মিথ্যা। কিন্তু সেই কাল সেই আমি সেই মণিকর্ণিকা ও সেই গঙ্গা প্রবাহ রূপে অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহার মধ্যে কাহারও সম্পূর্ণ অবচ্ছেদ হয় নাই। গঙ্গার এক অংশও গঙ্গা, সমুদয়টীও গঙ্গা। কারণ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে উহা বিদ্যমান। বেদান্তদর্শনে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, স্বরূপ রূ-

পের আমাদিগের কোন অভিজ্ঞতা নাই— আমরা যাহা কিছু দেখি, উহা উহার প্রবাহ-রূপ মাত্র। বৃক্ষের স্বরূপতত্ব আমরা কিছুই জানি না। বীজ অঙ্কুর পত্র পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ এক প্রবাহরূপে, একটী পদার্থরূপে দেখিতে পাই। রূপরসগন্ধস্পর্শের অতীত বৃক্ষের একটী স্বরূপরূপ আছে, উহা আমাদিগের অবিজ্ঞাত। এই কল্পনা গ্রাহ্য স্বরূপ রূপ বৌদ্ধদর্শনে স্বীকার করা হয় না। প্রবাহ-রূপ মাত্রই বৌদ্ধদর্শনের গ্রাহ্য। প্রবাহরূপে গঙ্গার কোন ব্যক্তিত্ব নাই। এক বিন্দুও গঙ্গা, সমগ্র রাশিও গঙ্গা, একাংশও গঙ্গা সমস্ত নদীও গঙ্গা। স্বরূপরূপ উপেক্ষিত হইলে ব্যক্তিত্ব সেই সঙ্গে অন্তর্ধান করে।

পঞ্চমবর্ষের দেবদত্তের লেশমাত্র অশীতি-পর দেবদত্তে নাই, অথচ প্রবাহরূপে এই দে-বদত্ত সেই দেবদত্ত একই পদার্থ। মৃত্যুর পরে ও জন্মজন্মান্তরে এইরূপে এই দেবদত্ত জীবিত থাকে। প্রবাহরূপে জীব অমর। জন্মজন্মান্তরে এক কর্ম্মফল ভোগ সূত্রে প্রবাহরূপে জীব নিত্য বিরাজিত। পঞ্চম বর্ষের দেবদত্তের লেশমাত্র অশীতিপর দেবদত্তে না থাকিলেও পঞ্চমবর্ষের দেবদত্তের কর্ম্মফল অশীতিপর দেবদত্ত ভোগ করিয়া থাকে। বিভিন্ন কু-সুম এক সূত্রে গাঁথিয়া একটী মালা হয়, এ-কটী ফুল হইতে আর একটী ফুল স্বতন্ত্র, কিন্তু এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া মালা উৎপাদন ক-রিয়াছে। হরিণ জীবনের শাক্য সিংহও শুদ্ধোদন পুত্র শাক্য গৌতম স্বতন্ত্র হইলেও কর্ম্মফলরূপ সূত্রে উভয়ে গ্রথিত। অশীতি-পর দেবদত্ত পঞ্চমবর্ষের দেবদত্তের কার্য্য-কলাপ স্মরণ করিতে পারে, মনুষ্যও শীল-সমাধি প্রজ্ঞা পরায়ণ হইলে, পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে।

এইরূপে আত্মার সত্বা স্বীকার না ক-রিলেও অনিত্য সংস্কার ও সমষ্টি জীবের অ-নন্ত জীবন বিশ্বাস করিতে বৌদ্ধের কোনও দ্বিধা হয় না।

জীবন অনন্ত, একথাও ঠিক হইল না। দুষ্কৃতের জীবন অনন্ত। কিন্তু জীবন মাত্রই আধি ব্যাধি পরিপূর্ণ। এজন্য জীবন লো-ভনীয় নহে, পরিহর্ত্তব্য। সাধু শীল সমাধি প্রজ্ঞা বলে কর্ম্মফল বিনাশ করিয়া জীবনের শেষ করিতে পারেন। আত্মহত্যায় জীব-নের শেষ ঘটে না, পুনর্জ্জন্ম হয়। নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলে জীবনের বিনাশ হয়। বিশুদ্ধি মার্গে লিখিত আছে, তৃষ্ণাজটাজড়িত জীবনে ক্লান্ত হইয়া এক দেবপুত্র গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

> অন্তর্জটা বহির্জটা জটয়া জটিতা প্রজা
> তং ত্বাং গৌতম পৃচ্ছামি ক ইমাং বিজটয়ে জটাং

গৌতম শাক্যসিংহ তাহার উত্তর দিয়া-ছিলেন,

> শীলে প্রতিষ্ঠায় নরঃ সপ্রজ্ঞঃ চিত্তং প্রজ্ঞাঞ্চ ভাবয়ন্
> আতাপী নিপকোভিক্ষুঃ স ইমাং বিজটয়ে জটাং

নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ লইয়া আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, নির্ব্বাণ অর্থে ত্রিতাপের মোচন, মোক্ষ; কেহ বলেন, বিনাশ। আমরা দেখাইলাম, নির্ব্বাণ বিনা-শের কারণ। অর্থাৎ জীব নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম, ইহ-লোকে বা পরলোকে অর্থাৎ পুনর্জীবন হয় না। নির্ব্বাণ, বিনাশের সোপান বা কারণ। জীবনে লোক নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ অনেক দিন জীবিত ছিলেন। অন্যান্য বোধিসত্ব স-ম্বন্ধেও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার

আর পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই। কখন কখন মৃত্যু অর্থে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। বিনয় পিটকে বুদ্ধের মৃত্যু, নির্ব্বাণ লাভ বা পরিনির্ব্বাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণ লাভের পরে পুনর্জ্জন্ম, এ বিশ্বাস বৌদ্ধ মতে একটী গুরুতর ভ্রম। কিন্তু মৃত্যু, বৌদ্ধের আকাঙ্ক্ষিত নহে। যন্ত্রণা ও পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি তাহার সাধনা। সে নিষ্কৃতি লাভ করিলে তাহার কি হয়, জানিবার জন্য কাহারও কাহারও ঔৎসুক্য থাকিলেও সাধারণের ঔৎসুক্য ছিল না। কেহ কেহ নির্ব্বাণের অর্থ বিনাশ কি না, তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি তাহার উত্তর দেন নাই। নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে সে জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, যাহা জ্ঞাতব্য তিনি শিখিইয়াছিলেন। যাহা জ্ঞাতব্য নহে, তাহা শিখাইবার আবশ্যক নাই, এইরূপ উত্তর দিয়া তথাগত অনুসন্ধিৎসু শ্রমণগণকে নিবারণ করিতেন। গৃহ দারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করাই অনেকের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। তাহার উপর নির্ব্বাণ লাভে চিরমৃত্যু, এ সম্বাদ অনেকের পক্ষে অসহনীয় হইত। অনেকে চিরমৃত্যু অপেক্ষা সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ অর্থাৎ পাপের কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিয়া স্বর্গে জীবন পাত মনোনীত করিতে পারিত। এজন্য নির্ব্বাণের অর্থ পাপের নির্ব্বাণ বলিয়া, যন্ত্রণা পুনর্জ্জন্মের নির্ব্বাণ বলিয়া শাক্য শিষ্যগণকে নিরস্ত করিতেন। এইজন্য বৌদ্ধ সঙ্ঘে নির্ব্বাণের অর্থ সুখের অবস্থা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উপাধি বা পাপের শেষ হইলে জন্ম যন্ত্রণার সহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ চিরমৃত্যু। তৃণের সহিত অগ্নির নির্ব্বাণ, তৈলের সহিত প্রদীপের নির্ব্বাণ, উপাধি উপাদান সংযোজনা বা পাপ বা কর্ম্মফলের সহিত জীবনের নির্ব্বাণ।

কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ সহজ নহে। লক্ষ লক্ষ জন্মে কাহারও নির্ব্বাণ লাভ ঘটে না। অবিদ্যা জীবের এমনি মজ্জাগত যে, পরিহার করিতে কোটি কোটি বৎসর কাটিয়া যায়। রেখামাত্র ধর্ম্মের পিচ্ছিল পথ বিচ্যুত হইলে জন্মজরা মৃত্যু পরিহার করা যায় না। সাধারণ ভাষায় জীবন অনন্ত বলিলে এজন্য অত্যুক্তি হয় না।

জীবনের আদি ও অন্ত নাই। যখন মালুঙ্ক গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জীবন আদি কি অনাদি, গৌতম কোন উত্তর দেন নাই, কারণ এরূপ প্রশ্নের মীমাংসায় ভিক্ষুর কোন স্বার্থ নাই। সাধারণের পক্ষে জীব ও জগৎ অনাদি ও অনন্ত জানিয়া রাখিলেই হইল। পরিবর্ত্তন হয় না, এমন স্থান ও পাত্র নাই। দেবতা আছে, কিন্তু তাহাদেরও মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম হয়, স্বর্গ আছে যেখানে পুণ্যবান লোকে পুণ্য ভোগ কালে অবস্থিতি করে, কিন্তু সে স্বর্গেরও পরিবর্ত্তন ও বিনাশ আছে এবং পুণ্যভোগ সমাপ্ত হইলে সেখান হইতে দেবতা অপর লোকে চলিয়া যায়। নরক আছে, কিন্তু তাহারও পরিবর্ত্তন ও বিনাশ আছে এবং কর্ম্মফল ভোগ পরিসমাপ্ত হইলে জীব সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। যে গুণসমষ্টিকে স্থান বা পাত্র বলা যায়, তাহার কোন একটী বা সমগ্র সমষ্টি পরিবর্ত্তনের বা বিকৃতির হ্রাস বৃদ্ধি বিনাশের অতীত নহে। অনিত্য জলবিম্ব পুঞ্জীকৃত হইলেও তাহাদের যোগ বিয়োগে নিত্যত্বের সম্ভাবনা নাই।

মরুভূমে মরীচিকার আকৃতি বিস্তৃতি দৃ-

শুমান হইলেও তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যত দিন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণীত না হইবে,ততদিন ইহা বলা দুষ্কর যে, গৌতম কোন্ কোন্ মত নিজে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, আর অন্যের নিকট হইতে কিবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ মনে করেন, সাংখ্যদর্শন হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান মত গুলি গৃহীত হইয়াছিল, কেহ বলেন,পাতঞ্জল হইতে। আবার অনেকে অনুমান করেন, শাক্যের মত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন রচিত হয়। পতঞ্জলির যোগভাষ্যের সহিত আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক একতা আছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য অতি সামান্য। পক্ষান্তরে সাংখ্যদর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক অধিক।

পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যক ও কেন এবং তবলকার উপনিষদে কোন বিশেষ মতামত পাওয়া যায় না। এ গুলি অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সকলে সম্মান করেন। প্রাচীন তৈত্তিরীয় ও প্রশ্নোপনিষদে আত্মা, পরকাল ও পুনর্জন্মের বিচার করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৃহদ্ আরণ্যক, কৌশিতকী ও ছান্দোগ্য উপনিষদে এতৎ সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে ছান্দোগ্য উপনিষদ শাক্যগৌতমের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। আধুনিক্ মুক্তিক,শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদে এই সকল প্রশ্নের বিচার আশানুরূপ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সময়ানুসারে গ্রন্থের পর্য্যায় এইরূপে নিরূপণ করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আত্মা ও স্বর্গে বিশ্বাস বৈদিক কাল হইতে আর্য্য জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে দুই আত্মা ও জন্মজন্মান্তরবাদ শাক্যের দুতিন শত বৎসর পূর্ব্বে দার্শনিকগণের মনে প্রথম বেদবহির্ভূত নূতন চিন্তার সঞ্চার করিয়া দেয়। যে সময়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও শাক্যগৌতমের আবির্ভাব হয়, তখন কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ সাধারণে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মফল ও জন্মান্তর-বাদের কথা সময়ভেদ বশতঃ তত উৎপন্ন হয় নাই, স্থানভেদে যত হইয়াছিল। প্রাচীন ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে পঞ্চনদ ও দৃষদ্বতী কূলে আর্য্যপ্রকৃতির যে পবিত্রতা প্রফুল্লতা ও সরলতা ছিল,কীকট ও মিথিলা প্রদেশে গণ্ডকী ও সরয়ূ-কূলে সে পবিত্রতা কলুষিত, সে প্রফুল্লতা উচ্ছ্বাসশূন্য ও সে সরলতা দার্শনিক তত্ত্বের জটিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। অনার্য্যভূমে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যসঙ্গমে আর্য্য প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠিলে দুঃখজরাবিপদে মুখের হাসি চোখের জলে পরিণত হইলে, জন্মজন্মান্তরে অনন্ত দুঃখভোগ জীবের নিত্যনিয়মিত, এই নিরাশা-পূর্ণ ভীষণ কাতর ধ্বনি স্বতঃই আর্য্য হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হয়। মিথিলায় জনক রাজার সভায় ছান্দোগ্য উপনিষদের উৎপত্তি। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সকল বিচারের এত আধিক্য দৃষ্ট হয়। কীটকে শাক্যগৌতমের জন্ম। কীটক ও মিথিলা দেশে, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী ও রাজগৃহে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম বিশিষ্ট প্রচার। মগধের আর্য্য অনার্য্যমিশ্রিত ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপত্তি ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। ব্রহ্মর্ষি বা মধ্যদেশে শাক্যসিংহ

প্রবেশমাত্রলাভ করিতে পারেন নাই।

তথাপি ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও বৌদ্ধ-দর্শনের মত এক নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "জগতের কারণীভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতি দর্শন করিবে। অহরহঃ ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। যাহাদের চক্ষু বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মবিজ্ঞানীরাই সেই জ্যোতি দর্শন করিতে পারেন। এই পরম জ্যোতি সেই পরমব্রহ্মেতেই আছে, সেই জ্যোতি দ্বারাই সবিতা জগত তাপিত করেন, চন্দ্রমা প্রকাশিত হয়, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রদীপ্ত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের উপর বিদ্যমান আছে। আদিত্যস্থ জ্যোতি উৎকৃষ্টতর ব্রহ্মজ্যোতির অপেক্ষা করে। সেই জ্যোতিই সর্ব্বপ্রকার দেবগণের মধ্যে সূর্য্যরূপে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মজ্যোতিই সর্ব্ব-প্রকার জ্যোতির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।"

মনোময় প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাকানাদরঃ এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽনীয়ান ব্রীহির্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাক-তণ্ডুলাদ্বা এষম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান পৃথিব্যাজ্যায়ানন্তরীক্ষা জ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্য লোকেভ্যঃ। ৩।১৪।৩

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদের সূচনা-ছান্দোগ্য উপনিষদে তাহার পরিণতি। সুতরাং ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম নহে।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ লিখা হইয়াছে;—"পৃথিবীতে যে যাহা ইচ্ছা করে, মৃত্যুর পরে সে সেইরূপ জন্মপ্রাপ্ত হয়। যাহারা দেবযাজী, তাহারা দেবলোকগমন করে এবং আদিত্যান্তর্গত পুরুষের ধ্যান করিলে তৎস্বরূপ দেবলোক ভোগ হয়। আর যিনি পরব্রহ্ম, তাঁহার ধ্যানে কোন লোক প্রাপ্তি হয় না, তৎস্বরূপ হইতে পারে। ব্রহ্মলোকে পৌছিলে আর জন্মমৃত্যু ঘটে না। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈত-মিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্যাস্যাদদ্ধান বিচিকিৎসা স্তীতিহস্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। যিনি এইরূপে ব্রহ্মধ্যান করেন, নিশ্চয় তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মলাভ হইলে আর মানবজন্ম হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মা, যজ্ঞ, স্বর্গ, ঈশ্বর ও পুনর্জন্ম এখনকার হিন্দুধর্ম্মের সকলি আছে। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ বা ব্রহ্মলাভ, ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মোক্ষ। বাসনার নিবৃত্তি করিয়া জন্ম হইতে নিষ্কৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের মোক্ষ। দেবরূপে বা ব্রহ্মরূপে, জন্ম যেরূপেই হউক বৌদ্ধের অনভিপ্রেত। কর্ম্ম,সৎকর্ম্ম, যজ্ঞকর্ম্ম ছান্দোগ্যের উপদেশ। কর্ম্মে প্রবৃত্তির অনুশীলন হয়, প্রবৃত্তির অনুশীলনে সৎ কর্ম্মই হউক বা অসৎকর্ম্মই হউক, পুনর্জন্ম। শৃঙ্খল আয়স বা সুবর্ণ দেখিবার প্রয়োজন নাই। শৃঙ্খল মাত্রেই বদ্ধ করে। এজন্য প্রাচীন উপনিষদ ও বেদান্তের ন্যায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ঈশোপনিষদে অবিদ্যা অপেক্ষা বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু বিদ্যা বা জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমাবস্থায় কর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে নরক লাভ হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় যে কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছিল, উহা নিষ্কাম কর্ম্ম। বাজসনেয় উপনিষদে পুনর্জন্মের আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু কর্ম্মের অতিকর্ত্তব্যতা সর্ব্বথা স্বীকৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদ শাক্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বতন বা সমসাময়িক হইলেও ছান্দোগ্য উপনিষদের মত শাক্যসিংহের মত নহে। পুনর্জন্ম মত মগধে আর্য্যবাসের পরেই উত্থিত হয়। পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোন কোন ঋষি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া

স্বর্গ বা দেবত্বলাভের প্রয়াসী হন। অন্যে সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া বাসনার নিবৃত্তি করিয়া পুনর্জন্ম হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি লাভের বাসনা করেন। শাক্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। এ মতটী শাক্যের স্বকপোল কল্পিত নহে। বৌদ্ধদর্শন শাক্যসিংহের পূর্ব্বতন, শাক্য তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এক শাক্য সহস্র শাক্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি না জন্মিলে তাঁহারা অস্ফুট রহিয়া যাইতেন।

জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনে পঞ্চলোকের উল্লেখ পাওয়া যায়,—স্বর্গলোক, নরলোক, প্রেতলোক, জীবলোক ও অবীচী। পাপীকে যমদূত যমের সমক্ষে উপস্থিত করিলে তিনি পাপীকে জিজ্ঞাসা করেন, দেবতাদের পঞ্চদূতের সহিত তাহাদের কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে কিনা? তাহারা জীবনে কি কখন শিশু বৃদ্ধ পীড়িত দণ্ডিত অপরাধী ও মৃত ব্যক্তি দেখে নাই? দেখিয়া থাকিলে তাহাদের মনে কি কখন হয় নাই যে তাহারাও জন্মজরা মৃত্যুর অধীন? তাহার পাপের জন্য তাহার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু আর কেহ দায়ী নহে। তাহার পাপের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর যমরাজ তাহাকে কর্ম্মফল ভোগের জন্য বিহিত স্থানে প্রেরণ করেন।

নির্ব্বাণ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বৌদ্ধেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রথম শ্রেণী, তাহাদের নাম ভিক্ষু, আর যাহারা গৃহস্থ থাকিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের সেবা করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী, তাহাদের নাম উপাসক। উপাসকদিগের কর্ম্ম আছে, ভিক্ষুর কর্ম্ম নাই। উপাসকের প্রবৃত্তি আছে, সুতরাং বন্ধন আছে, ভিক্ষুর প্রধান কর্ত্তব্য প্রবৃত্তির নিরশন। ভিক্ষুর পুরস্কার নির্ব্বাণ, উপাসকের পুরস্কার স্বর্গ। পুণ্য কর্ম্মে স্বর্গ। শীল সমাধি প্রজ্ঞায় নির্ব্বাণ।

ভিক্ষু সকলেই এক নহে। তথাগত ও আনন্দ এক শ্রেণীর ভিক্ষু নহেন। এজন্য কালক্রমে ভিক্ষুসমাজে শ্রেণীভেদ হইয়াছিল। স্রোতপন্ন, শকদাগামী, অনাগামী ও অর্হত। ক্রমে ইহার উপর বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধদেব স্থাপিত হইয়াছিলেন। তথাগত ভিক্ষুক রাজ্যের রাজা। যিনি মুক্তির পথে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মচারী স্রোতপন্ন। স্রোতপন্ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে অবীচী জীবলোক ও প্রেতলোকে পুনর্জন্ম হয় না। উচ্চলোকে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া কালক্রমে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ নিশ্চয়। তিনি অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। বুদ্ধ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার আর সংশয় নাই। যাগ যজ্ঞের অনাবশ্যকতা তিনি বুঝিয়াছেন। তাহার উপর শকদাগামী। তাহার ত্রিবিধ অকুশলমূল নির্ব্বাণঅন্তরায় লোভ মোহ ও দ্বেষ অপনীত হইয়াছে, তাঁহাকে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহার দুঃখের নির্ব্বাণ হইবে। তাঁহার উপরে অনাগামী। তাঁহার পঞ্চস্কন্দ অপসারিত হইয়াছে, রূপস্কন্দ, বেদনাস্কন্দ, সংজ্ঞাস্কন্দ, সংস্কার স্কন্দ ও বিজ্ঞানস্কন্দ আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। তাঁহার নরলোকে আর জন্ম হয় না। গর্ভবাস ও প্রসববেদনা আর তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না। দেবতার ন্যায় স্বয়ম্ভু হইয়া তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। দেবলোক হইতে নিম্নতর লোকে আর তাঁহাকে আসিতে হয় না। দেবলোক হইতেই

তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন। উপাসক দিগের এই পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ হইতে পারে। ভিক্ষুদিগের চতুর্থ শ্রেণী অর্হত। রূপাবতর বা অরূপাবতর কোন জন্মে অর্হতের আকাঙ্ক্ষা নাই। অবিদ্যা, অহঙ্কার ও বিজ্ঞান হইতে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি পাপনির্মুক্ত, জীবনের অসারতা তাঁহার ধারণা হইয়াছে, প্রবৃত্তি মাত্র তাঁহার হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে হিন্দুদেবতার ন্যায় অনেক বুদ্ধ কল্পিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি আদিবুদ্ধ। তিনি অনাদি ও সকলের কারণ। তাঁহা হইতে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ১ বৈরোচন, ২ অক্ষোভ্য, ৩ রত্নসম্ভব, ৪ অমিতাভ, ৫ অমোঘসিদ্ধ। ধ্যানী বুদ্ধেরা পঞ্চভূতাদির কারণ। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের একএকটী বোধিসত্ব বা বোধিভাব প্রাপ্ত অলৌকিক রূপ আছে, যথা ১ সমন্ত ভদ্র, ২ বজ্রপাণি, ৩ রত্নপাণি, ৪ পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর ৫ বিশ্বপাণি। বোধিসত্ত্বেরা জীব ও নরলোকের কারণ। ধ্যানী বুদ্ধগণের মানুষীরূপ পাঁচটী, যথা ১ ক্রকুচন্দ, ২ কনকমুনি, ৩ কাশ্যপ, ৪ গৌতম, ৫ মৈত্রেয়। অমিতাভ, পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর, এবং গৌতম বুদ্ধের তিন বিভিন্নরূপ। মৈত্রের বুদ্ধ ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন। বুদ্ধ অপেক্ষা বোধিসত্ত্বে এখনকার বৌদ্ধের অধিকতর অনুরাগ। মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ অপেক্ষা বৌদ্ধসমাজে অধিক আদৃত। সত্য অপেক্ষা কল্পনা মানুষের এতই মনোরম।

বৌদ্ধদেবতাগণও কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর প্রভৃতি নামে চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত। সুখাবতীর বোধিমূলে আদিবুদ্ধ ধ্যানসমাহিত। এই চারি শ্রেণী দেবতার জন্য মহেন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর্গের নির্দেশ হইয়াছে। এক এক শ্রেণীতে বিভিন্ন জাতীয় অনেক প্রকার দেবতা আছেন। মহারাজিক, তুষিত প্রভৃতি ছয় প্রকার দেবতা কামাবচর, ব্রহ্মকায়িক, ঋভব, প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দেবতা রূপাবচর, অচ্যুত শুদ্ধনিবাস প্রভৃতি চারি প্রকার দেবতা অরূপাবচর। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে এইরূপ অবৌদ্ধ সহস্র প্রকার নূতনমতের উদয় হয়। সে সকল কথার এখানে পর্য্যালোচনা করিবার আবশ্যক নাই। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে যে অনেক প্রকার মিল আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বিচারে বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মমত বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিলাতযাত্রা ও ভূদেববাবু। (১)

ভূদেববাবু জ্ঞানী, চিন্তাশীল, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-রক্ষণপ্রয়াসী নবরচিত (হিন্দু) ধর্ম্মমণ্ডলীর শিরোমণি। তিনি জাতীয় ভাবপূর্ণ, বিদেশীয় ভাববিরোধী। সাহেবিয়ানাতে তাঁহার প্রগাঢ় ঘৃণা। আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই ভূদেব বাবু বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে কি বলেন, প্রাচীন এবং নব্য হিন্দু, সকলেরই শ্রোতব্য। তিনি তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক সারবান গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে

হইতে পারে। এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কল-কারখানার প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহাতে বেতনভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকদ্বারা দেশীয়দিগের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্পশিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে জাপানীয়েরা স্বদেশে দ্বিতীয় পথটী লইয়াছে, চীনিয়েরা কিয়ৎপরিমাণে প্রথম পথটী অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয় পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত"। (পৃ ৩০১)।

ইহা পড়িয়া কি বোধ হয়? হিন্দুর পক্ষেও বিলাত যাওয়াতে দোষ নাই, বরঞ্চ বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ভূদেব বাবুর মত বলিয়া বেশ অনুভব হয়। স্বদেশপ্রিয়, প্রাজ্ঞ ভূদেব বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রতি হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মমণ্ডলী প্রণিধান করুন। এবং দেশের উপকারের জন্য যে বিলাত যাওয়া যাইতে পারে, তাহা অম্লানমুখে স্বীকার করুন।

ভূদেব বাবু যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা অম্লানমুখে স্বীকার করুন। ভূদেব বাবু যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা সত্যকথা ও অতি সোজা কথা। কিন্তু ভূদেব বাবু সমাজজ্ঞ। তিনি জানেন, সমাজে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সংস্কার দোষে অতি সোজা কথাও শীঘ্র বুঝেন না, অথবা স্বভাবদোষে বুঝিয়াও স্বীকার করেন না। প্রথাবিরুদ্ধ অমিশ্রিত সত্য কথা এই সকল লোকের নিকট বড় তিক্ত ও অসহনীয়। প্রিয় উপকথা অপ্রিয় সত্যকথার সহিত dilute বা মিশ্রিত করিয়া না দিলে তাহারা তাহা সেবন করিতে চাহেন না। তাই, বোধ হয়, এই সকল লোকের মন রক্ষা করিবার জন্য, ভূদেব বাবু বলিতেছেন ;—

"আমোদ, প্রমোদ, বাহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প বিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে" (পৃ ৩০১)।

সভা স্থাপন বা বক্তৃতা করিবার জন্য বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ, আর, শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থাটুকু ভূদেববাবু হিন্দুশাস্ত্রের কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার ব্যবস্থার কোন প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার বাক্যমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আধখানা বিলাত যাওয়া আধখানা বিলাত না যাওয়ার কথঞ্চিৎ অশ্রুতপূর্ব্ব মতটী আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন ;—

"হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোনপ্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন।"

বোধ হয় এইটী তাঁহার যুক্তি।—কিন্তু এই যুক্তি বড়ই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। যুক্তিটী বিস্তৃতভাবে লিখিতে যাইলে এইরূপ হয় ;—(১) "হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোনপ্রকার-প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন"। (২) "শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা" "প্রকৃত সৎকার্য্য"। (৩) অতএব হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রার ব্যাঘাতক নহে। এই যুক্তির দোষ এই যে, ইহার প্রথম অঙ্গ সত্য হইতে পারেনা। মনুষ্য যতদিন দেবতা না হইবে, যতদিন সকল বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সকল শাস্ত্র, সকল

সমাজ, কোনও না কোনও সময়ে প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হইবেই হইবেই। যদি বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য, অতএব তাহা অভ্রান্ত, সুতরাং তাহা প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হইতে পারে না। আমি তাহার এই উত্তর দেই, হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য হইলেও তাহা মনুষ্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ, মনুষ্যদ্বারা প্রচারিত। যাঁহারা শাস্ত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কখন কখন বুঝিতে বা লিখিতে ভুল করেন নাই তাহা কেমন করিয়া জানিব? যদি বলেন, তাঁহারা মুনিঋষি, তাঁহারা দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন, তাঁহারা কি ভুল করিতে পারেন? তাহাহইলে বলি "মুণীনাঞ্চমতিভ্রমঃ" আমাদিগের মধ্যে এই কথা চলিত হইল কেন? আর, আপনি যদি পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা সকল বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে বেদব্যাস, শকুন্তলা ইত্যাদির বিজাতোৎপত্তিতে পরাশর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহা মহা ঋষির ধর্ম্মচ্যুতির ও চিত্তভ্রান্তি আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে। যে মহর্ষিগণ কার্য্যকালে শোচনীয় মোহে পতিত হইয়া বিজাত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে রচনাকালে মোহপ্রমাদে পতিত হইয়া কখন কখন ঈশ্বরবাক্যস্বরূপ ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ না করিয়া ভ্রান্ত কল্পনার গর্ব্ভে যে জারজমানস সন্তান উৎপাদন করেন নাই, তাহা কেমন করিয়া জানিব? বেদব্যাস প্রভৃতি জারজসন্তান হইয়াও যেমন সমাজে পূজিত হইতেছেন, তেমনি শ্রুতি বা স্মৃতির কোন ভাগ জারজ বা স্বকপোল-কল্পিত হইয়াও যে পূজিত হইতেছে না, তাহা কিরূপে প্রমাণ হইবে? তাহার পর, কখন কখন আমাদিগের শাস্ত্রের এক ভাগের সহিত অপর ভাগের অসঙ্গতি বা বিরোধ দেখা যায়। জানি, ব্যবস্থা আছে, যেখানে পুরাণে স্মৃতিতে বিরোধ, সেখানে স্মৃতি মানিতে হইবে, যেখানে স্মৃতিতে শ্রুতিতে বিবাদ, সেখানে শ্রুতিবচনই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে স্মৃতিতে স্মৃতিতে বিবাদ, যেখানে মনুতে ও পরাশরে বিবাদ, যেখানে পরাশরের ও বৃহস্পতির মধ্যে মতভেদ, সেখানে কি বলিবেন?

পরস্পর বিরোধী দুইটী কথাই সত্য, একটীও ভ্রান্ত নহে, ইহাই কি বলিবেন? ইহার মধ্যে যদি কোনটী ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমাদিগের শাস্ত্র এককালে ভ্রান্তিশূন্য নহে, অথবা, যদি বলেন, আমরা অর্থ ঠিক বুঝি না, ভাষ্যকার বা টীকাকারের ভ্রম অর্থাৎ অশুদ্ধ ব্যাখ্যা বা লিপিকরের লেখনীচ্যুতি বা অশুদ্ধ পাঠ ঘটিয়াছে, তাই অর্থবিরোধ অনুভব হয়; তাহা হইলেই প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের আর দুইটী ভ্রমের কারণ পরিলক্ষিত হইল—টীকাকারের ভুল ও নকলনবিশের ভুল। তাহার পর, শাস্ত্রের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিশ্চিত ঠিক, এইধ্রুব বিশ্বাস বা কেমন করিয়া হয়? তবেই, দেখা যাইল, হিন্দুশাস্ত্র (সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই) মূলে ঈশ্বরবাক্য স্বীকার করিলেও কতগুলি ভুলের সম্ভাব্য হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে; (ক) ঈশ্বরবাক্য প্রকাশক ঋষিদিগের ভুল (খ) ভাষ্যকার বা টীকাকারের ভুল (৩) লিপিকরের ভুল (৪) আপনার বা আমার অর্থাৎ পাঠকের ভুল। ইহার উপর আজি কালি বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণ স্বীকার করেন, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত বা মেকি। কিন্তু

এ কথা স্বীকার না করিলেও, ঈশ্বরবাক্যের স্বরূপের উপলব্ধি পক্ষে চতুর্ব্বিধ ব্যাঘাত রহিয়াছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কক্ষের বাতায়ন যেন এই চারিপ্রকার সত্য ব্যাঘাতক রঞ্জিত-কাচে ঢাকা। তাহা ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ শুভ্র ভগবদ্বাক্য যে অরঞ্জিতভাবে স্বরূপতঃ আমাদিগের মানসচক্ষে উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ? সুতরাং ইহা সহজ কথা যে, ঈশ্বরবাক্য অভ্রান্ত। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্তভাবে কোন জাতির নিকট উপস্থিত হইবার উপায় আজিও হয় নাই। যে জাতির বা যে ব্যক্তির যতদূর জ্ঞান ও যতদূর চরিত্রের নির্ম্মলতা যত অধিক হইয়া থাকে, সেই জাতির সেই ব্যক্তির ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সকল সমাজেই ভ্রান্তি কম বা বেশি মাত্রায় আছে। সকল সমাজই সময় সময় ভ্রান্ত হন, সময় সময় ভ্রান্ত হইয়া সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হন। "হিন্দুসমাজ বা হিন্দুশাস্ত্র (কখন কোন সময়) সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন" ইহা পক্ষপাতী, অসম্ভব ও অশ্রেদ্ধেয় কথা। ভূদেব বাবু যদি বলিতেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের ও সমাজের কখন প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হওয়া উচিত নহে, কেননা ধর্ম্ম সমাজ রক্ষার জন্য, তাহা হইলে তাহার কথা আমরা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু "হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোনপ্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন" এই কথা সহজ সত্যবিরোধী ও অলীক। সুতরাং ভূদেববাবুর যুক্তির প্রথম ভাগেই প্রধান অঙ্গেই প্রমাদ ঘটিয়াছে। তাহার পর, যদি তাহা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সৎকার্য্য মাত্রই হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এখন, কোন্ কার্য্য সৎকার্য্য, আর কোন্ কার্য্য সৎকার্য্য নহে, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধিমান লোকেরও মতভেদ হয়। কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্রা ভূদেববাবুর মতে বোধহয় সৎকার্য্য নহে। কারণ তাহা "বক্তৃতাদির" অন্তর্গত কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীমান্ ও স্বদেশহিতশ্রমী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর মতে তাহা সৎকার্য্য। আর বাক্যবল যে একটা প্রকৃতবল, তাহা বঙ্কিমবাবু তাঁহার "বাহুবল ও বাক্যবল" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। গতবৎসর কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত "হিতবাদী" সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমবাবু অকুণ্ঠিত ভাবে অসংশয়িত ভাষায় বিলাত যাত্রাপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্রা যে সৎকার্য্য নহে, এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ কংগ্রেসের জন্য যাওয়া ভাল, এই তাঁহার মত, তাহাই বোধ হইয়াছিল। বিদেশে যাওয়ায় একটা বহুদর্শন হয়। এমন কি, যে জাতি সভ্য ও দিন দিন শ্রীলাভ করিতেছে, তাহার পক্ষেও বিদেশ দর্শন উপকারী, উৎসন্ন, পদাবনত আধুনিক হিন্দুদিগের ত কথাই নাই। ধনবৃদ্ধির জন্যই লোকে বাণিজ্য করে। কিন্তু এই বাণিজ্য হইতে ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা একটা মহত্তর উপকার হইয়া থাকে। বাণিজ্য করিতে গিয়া লোকে বিদেশীয় আচার ব্যবহার দেখিতে পায়, তাহা স্বদেশের আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে। অন্যদেশের আচার ব্যবহার দর্শন, উন্নতির উৎস খুলিয়া দেয়।

এমন কোন দেশ নাই, যাহার অন্যদেশের নিকট কিছু শিখিবার নাই। এমন কোন সমাজ নাই, যাহার চরিত্রের কোনও না কোনও অংশ অন্য সমাজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অন্যসমাজের দৃষ্টান্তদ্বারা সংশোধনার্হ নহে। আমরা যাহা বলিতেছি, যদি তাহা মনে স্থান না পায়, মহামতি মিল যাহা বলিয়াছেন, শুনুন ;—

"But the economical advantages of commerce are surpassed in importance by those of its effects which are intellectual and moral. It is hardly possible to overrate the value, in the present low state of human improvement of placing human beings in contact with persons dissimilar to themselves and with modes of thought and action unlike those with which they are familiar * * Such communication has always been, and is peculiarly in the present age, one of the primary sources of progress. To human beings, who, as hitherto educated can scarcely cultivate even a good quality without running it into a fault, it is indispensable to be perpetually comparing their own notions and customs with the experience and examples of persons in different circumstances from themselves; *and there is no nation which does not need to borrow, not merely particular arts or practices, but essential points of character, in which its own type is inferior.*"

সুতরাং যে উপলক্ষেই হউক, অন্যকোন সুসভ্য দেশের সহিত বুদ্ধিমান ও নির্দ্দিষ্ট চরিত্র ব্যক্তির পরিচয় হইলে তাহাতে সেই ব্যক্তির উপকার আছে, সুতরাং দেশেরও তাহাতে উপকার আছে। সুতরাং আমাদের দেশের কোন বিজ্ঞব্যক্তি সুসভ্য বিদেশে যদি কেবলমাত্র বেড়াইতে যান, যদি কেবলমাত্র সেই দেশের আচার ব্যবহার দেখিতে যান, তাহা হইলেও দেশের তাহাতে উপকার বই অপকার নাই। তজ্জন্য বিলাত যাত্রার পথে কাঁটা দেওয়াতে যে কি দেশহিতৈষিতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দুজাতি অনেকদিন হইতে একতা-বর্জ্জিত। অনেকদিন হইতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাহার উপর আবার বিলাতপ্রত্যাগত যুবকদিগকে পীড়ন করিয়া, সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া, বিচ্ছিন্ন সমাজকে কেন আরও ছিন্নভিন্ন করি, দুর্ব্বল সমাজকে কেন আরও দুর্ব্বল করি, হৃদয়ের শোণিতকে কেন বাহির করিয়া দেই ?

যাঁহারা অকৃত্রিম ধর্ম্মবিশ্বাস হেতু বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত আহারাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বলিবার নাই ; বরঞ্চ আমরা তাঁহাদের ভক্তি করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারা ভিতরে কিছুই মানেন না, নিশীথে মদিরা ও কুক্কুট মাংসে উদরপূর্ণ করেন, গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে যবনান্ন আহারে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা যখন বিলাতপ্রত্যাগত যুবককে সমাজচ্যুত করণার্থ বদ্ধপরিকর হন, ঈর্ষাদগ্ধ, অর্থমুগ্ধ, পরপীড়নপুষ্ট, মিত্রদ্রোহী কৃমিকীটবৎ হেয়াদপি হেয় ব্যক্তিগণের সহিত মিশ্রিত হন, তখন হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্ষোভ রাখিবার স্থান থাকে না।

ভূদেব বাবু বলেন ;—

"বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য ভক্তিভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গলা প্রদেশেও কয়েক স্থলে ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে।"

ভূদেব বাবু "দীনতা প্রকাশ" কি অর্থে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্ত, না ইহার অর্থ গলায় কাপড় দিয়া প্রত্যেকের পায় ধরা, না ইহার অর্থ গোময় ভক্ষণ করা, না, ইহার অর্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে উৎকোচ দেওয়া ? প্রায়শ্চিত্ত ? পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। প্রায়শ্চিত্ত সামাজিক দণ্ড বা অপমান

প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা বই আর কিছু নাই। যিনি নিজে জানেন, পাপ করেন নাই, তিনি কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? যিনি অপরাধী নহেন, তিনি কেন অপরাধ স্বীকার করিবেন? আর ভূদেব বাবু বলিতেছেন যে—"যাঁহারা শিল্পবিদ্যাদি সমানয়ের জন্য বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহাদের বিলাত যাত্রা হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে।" যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে, তাঁহারা তজ্জন্য কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে যে হিন্দুসমাজ বিলাত-ফেরত বঁধুকে আদৌ গ্রহণ করেন না, তাহার উপায় কি? আর, সমাজের ভয়েই হউক, আর রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, যাহাতে বিশ্বাস নাই, তাহাতে বিশ্বাসের অভিনয় করা কি অধর্ম্ম নহে? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে উৎকোচ দিয়া জাতি ক্রয় করা কি অধর্ম্ম নহে? অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা কি রক্ষণীয়, তাহা কি (হিন্দু) ধর্ম্ম? এবম্বিধ "দীনতা" প্রচার করা কি অধর্ম্মপ্রচার করা নহে? কাপুরুষ বাঙ্গালীকে আরও কাপুরুষ করিয়া ফেলা নহে কি? সত্যকে দুর্ব্বল করিয়া অসত্যের প্রতাপ পরিবর্দ্ধন করা নহে কি? সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করি, শতবার স্বীকার করি। কিন্তু সমাজের ভয়ে সমাজের খাতিরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের খাতিরে কণামাত্র মিথ্যার অনুষ্ঠান বা সত্যের লোপ করিবার জন্য কাহাকেও বলিতে পারি না। কেন না

> সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমংতপঃ।
> সত্যমূলাঃক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃসত্যাৎ পরতরোনহি॥

"দীনতা প্রকাশ"? কেন? বিলাত গিয়াছিলাম বলিয়া? জীবিকা নির্ব্বাহের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য, বা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিলাত গিয়াছিলাম, তজ্জন্য "দীনতা প্রকাশ" করিতে হইবে? যদি নিতান্ত চাকুরী করিতে হয়, যাহাতে চাকুরীর নিম্ন-শ্রেণীর লাঞ্ছনা অতিক্রম করিয়া সাহেবদিগের একচেটিয়া ভাঙ্গিয়া, সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া, শাসয়িতৃবর্গ মধ্যে যথাসাধ্য বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি বলিয়া, "দীনতা প্রকাশ" করিতে হইবে? বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল জলধি পার হইয়া, পরিবার ও বন্ধুবর্গের বিয়োগে ক্লিষ্ট হইয়া, দুঃসহ প্রবাস-কষ্ট সহ্য করিয়া বিলাত গিয়াছিলাম বলিয়া, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, দেশে প্রত্যেকের পদপ্রান্তে প্রণত মস্তকে "দীনতা প্রকাশ" করিতে হইবে? কি দয়া! কি সুবিচার! কি কৃতজ্ঞতা! মস্তক মুণ্ডন করিয়া গোময় ভক্ষণ করিতে হইবে, জাতিবিক্রেতা স্বধর্ম্মচ্যুত অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ দিতে হইবে? হিন্দু-সমাজের পাপের ভার আরো বৃদ্ধি করিতে হইবে? যদি এইরূপ "দীনতা প্রকাশ" না করিলে হিন্দুগণ আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, দিন্; কি করিব? মন্দভাগ্য আমি, আর কি বলিব? কেবল বলিব;—

"হিন্দুসমাজ, তোমার ক্রোড়ে আমি লালিত ও পালিত। আমি যাহাদের শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, স্নেহ করি, আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে তুমি আজিও হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছ—তোমার প্রতি অভক্তির বা অস্নেহের কথা আমি মুখ দিয়া বাহির করিব না। তোমার নিন্দা করিতে বুক ফাটিয়া যায়। কেবল এই বলি, তুমি নির্দ্দোষে অবিচারে তোমার স্নেহময় সন্তানকে নির্ব্বাসিত করিলে; সমাজের স্বজন স্নেহশীতল সুখ সচ্ছন্দময় উপকূল হইতে, স্বজনবর্জ্জিত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখ-

সাগরে আমাকে ভাসাইলে। বিদেশে আমার যদি কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তোমারই মঙ্গল জীবনের ধ্রুব তারা করিয়া জীবনতরী চালাইব। যদি ধরাতলে ধর্ম্ম ও স্নেহ থাকে, একদিন তুমি সন্তপ্তহৃদয়ে, বাষ্পাকুললোচনে তোমার নির্ব্বাসিত সন্তানকে সাদরে ফিরাইয়া আনিয়া হৃদয়ে তুলিয়া তাহার মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদময় স্নেহ বর্ষণ করিবে।"

আমরাও বলি,—

"হিন্দুগণ, এরূপ ভক্তসন্তানকে গোময় ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্তযুক্ত "দীনতা প্রকাশ" করিতে বলার কথা মুখে আনিবেন না। না। দীনতা দূরে থাকুক, আমরা বলি. এরূপ ভক্ত সুপুত্রকে, নিশান উড়াইয়া, দুন্দুভি বাজাইয়া, মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে, গৌরবের রাজ-বর্ম্ম দিয়া, সমাজ-নিকেতনে আনয়ন করিয়া, হিন্দুগণ, আপনাদিগের বর্ত্তমান কলঙ্ক অপনয়ন করুন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (৬)

পাঠকগণ, আপনারা সর্ব্বদা পূর্ণ-পর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা-তে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখিবেন। এবং চরাচর রাজা প্রজা যাহাতে পরমানন্দে থাকিতে পারেন, বিচারপূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তভাবে সেইরূপ ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সতত পরোপকারে রত থাকিবেন। নিজের আত্মা ও অন্যের আত্মা অভেদ জ্ঞান করিয়া তাহাদের দুঃখ ও অ-ভাব মোচন করিতে সতত যত্নবান হইবেন। জীব মাত্রেই আপনার আত্মা পরমাত্মাস্বরূপ। আত্মা এক বই দুই নহেন; এজন্য তিনি অদ্বিতীয়। সকল দেহেই সেই একই আত্মা সমভাবে বিরাজমান আছেন। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন:—

"সেই ইন্দ্রিয় মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাশী ও নিত্য সত্তাস্বরূপ পদার্থই সমস্ত দেহের আত্মা, তাঁহার এই দেহ সকল, মৃগ তৃষ্ণার জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদি পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়।" (গীতা—২য় অধ্যায় ১৮শ শ্লোক) "হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের অন্ত হৃদস্থিত যে প্রত্যেক চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তাহাই আমি।" (গীতা দশম অধ্যায় ২০শ শ্লোক)।

"প্রাণীর মধ্যে চেতনা আমি।" (গীতা ২২শ শ্লোক)

বস্তুতঃ আত্মা যে একবই দুই নহেন, আর সেই এক আত্মাই যে সর্ব্ব প্রাণীর দেহে বিরাজমান আছেন, এবং সেই আত্মাই যে পরমাত্মাস্বরূপ, তাহার প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। অতএব সর্ব্বজীবকে আপনার ন্যায় ভাবিয়া কার্য্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কথা অতি অল্প লোকেই বুঝেন। শিক্ষা অভাবে "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কথাটা সকলে একে বারে ভুলিয়াগিয়াছেন। সেইজন্য কি সাং-সারিক, কি পারমার্থিক, উভয় বিষয়েই ভা-রতবর্ষের আজ এই দুর্গতি উপস্থিত হইয়া-ছে। লোকের কষ্টের আর অবধি নাই। যে ধর্ম্মবলে ভারতবর্ষ এক সময়ে বলীয়ান ছিল, যাহার তেজবল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হই-য়াছিল, সে ধর্ম্মবল আজ কোথায়? আজ কাল কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই এক কাল্পনিক ধর্ম্ম লইয়া, অশিক্ষিতের ধর্ম্ম লইয়া উপাসনা করিতেছেন, ভ্রমে কাঞ্চন বলিয়া কাচ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহা-দের তৃপ্তিও হইতেছে না এবং অশান্তিও দূর হইতেছে না। যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা পদে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহাদের নিকট উপদেশ

লইয়া লোকে ধর্ম্মজীবন লাভ করিবে, তাঁহারাই লোককে (কেহ জানিয়া শুনিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেহ বা অজানিত) সত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া কাল্পনিক ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন, এবং নানাপ্রকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ঘোর অশান্তির আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু ও জগদাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া লোকের আর দুর্দ্দশার অবধি নাই, তথাপি চৈতন্যও হয় না। কুশিক্ষা প্রভাবে লোকে এমনই পশুপ্রকৃতি হইয়াছে যে, অপরের সাহায্য করা দূরে থাকুক, নিজের পিতা মাতাকে পালন করিতেও কুণ্ঠিত। এই যে দুর্ভিক্ষের উৎকট পীড়নে পীড়িত হইয়া লোকে উদরান্নের জন্য পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে, জঠরানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য কত লোক গাছের গোড়া পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেছে, বলুন দেখি কয়জন ধনী, কয়জন জমীদার, কয়জন রাজা তাহাদের তত্ত্ব লইয়াছেন? যাঁহাদের উপর সমাজ, দেশ ও লোক রক্ষার ভার, তাঁহারা ইহার কি প্রতিকার করিয়াছেন? দেশে যে সকল ধনী লোক আছেন, তাঁহারা মনে করিলে, অনায়াসে এক একজনে এক একটা পরগণার অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পারিতেন। জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব প্রজাকে এবং রাজা সমগ্র দেশ রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সে শিক্ষা নাই, সে দীক্ষা নাই, কাজেই তাঁহারা আপন আপন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দেশের কথা, প্রজার কথা, প্রতিবেশীর কথা একবারও ভাবেন না। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন যে, আমাদের কিসের গর্ব্ব? যখন আমাদের এক গাছি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমরা কিসের গর্ব্ব করি! এই যে ধন, এই যে জমীদারী, এই যে রাজ্য, এ সকল কাহার? কোথা হইতে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কেই বা তাঁহাদিগকে দিয়াছে? এবং তাঁহারাই বা কে, কোথা হইতে আসিলেন, আর কোথাই বা যাইবেন, এ সকল বিষয় কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যদ্যপি এই সকল বিষয় বৈভবাদি তাঁহাদের হইত, তাহা হইলে মরিবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন নিশ্চয়। তাঁহারা "আমার" "আমার" করিয়া মরিতেছেন, কিন্তু কোন্ বস্তুটা তাঁহাদের, তাহা আমাকে বলিয়া দিতে পারেন কি? অন্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, এই যে ভোগযুক্ত দেহ, যাহাতে একটা কাঁটা ফুটিলে কতই না কষ্ট হয়, যাহার তুল্য প্রিয়বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, মৃত্যুকালে সেই দেহ পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে যখন পারেন না, তখন তাঁহাদের নিজের বলিতে কোন্ বস্তু আছে? যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোন বস্তুই তোমাদের নিজের নহে, কেন না তোমরা ইহার কোনটাই উৎপত্তি কর নাই, তখন তোমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত, তোমরা এ সকল কোথা পাইলে। অবশ্য এমন কেহ আছেন, যিনি তোমাদের সুখ সচ্ছন্দের, চরাচর জীবের জীবন রক্ষার নিমিত্ত এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সুনিয়মের সুশৃঙ্খলে কালাতিপাত করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষের উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি জগতের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল তোমার আমার জন্য যে করেন নাই, ইহা নিশ্চয়। তবে যদি বল যে, শুদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের ভোগ

বিলাসের জন্য যদি সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে সকলকেই সমান ক্ষমতা দেন নাই কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলি যে, সকলকেই তিনি যদি ধনী, জমিদার কি রাজা করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে সংসার চলিত কি প্রকারে? কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, সেবা প্রভৃতি কার্য্য কে করিত? তিনি জগৎ-সংসার সুনিয়মে সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য কাহাকে রাজা, কাহাকে প্রজা, কাহাকে ধনী, কাহাকে বা জমিদার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর দিনযাপন করিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এ সকল কথা একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তোমার আমার ভোগবিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য বিষয় সম্পদ দেন নাই, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু বলদেখি, তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তার সে উদ্দেশ্য কয়জন সাধন করিতেছ? ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় তোমরা লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল সঞ্চয় করিতেছ, আপনিও ভোগ করিতেছ না এবং অপরকে, যাহার অভাব আছে, তাহাকেও দিতেছ না। ইহাতে তোমাদের যে কি ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে যে তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছ না ইহা নিশ্চয়।

হে রাজন্, হে ধনি, হে জমিদার, হে বাদসাহ, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনারা যে আপন আপন পদ মর্য্যাদায় স্ফীত হইয়া জগতকে তৃণ জ্ঞান করেন, তাহার অর্থ কি? আপনারা কাহাকে রাজা, ধনী, জমিদার বা বাদসাহ বলেন, তাহা বলিতে পারেন কি? শরীরের মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহাকে আপনারা রাজা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন? যদি স্থূল শরীর হাড়-মাসকে রাজা বলেন, তাহা হইলে সকল লোকেরই হাড় মাস আছে, অতএব সকলেই রাজা; কিম্বা যদি ইন্দ্রিয়াদিকে রাজা বলেন, তাহা হইলে সকলেরই ত ইন্দ্রিয় আছে, সুতরাং সকলেই রাজা। যদি জীবাত্মাকে রাজা বলেন, তাহা হইলে সকলেরই জীবাত্মা আছে, তবে সকলেই রাজা। ধন সম্পত্তি থাকিলে যদি রাজা বলা যায়, তাহা হইলে আপনারা রাজা নহেন, ধন সম্পত্তিই রাজা। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন যে, রাজা কাহাকে বলা যায়। রাজা তাঁহাকেই বলা যায়, যাঁহার উত্তম শ্রেষ্ঠ গুণ আছে। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই রাজা। উত্তম শ্রেষ্ঠ গুণ সকল যাহাতে আছে, তিনিই যখন রাজা, তখন আপনারা দেখুন যে, আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ আছে কি না? যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে আপনাদের সম্মুখে প্রজা লোকের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না। আপনাদিগকে ধিক্! আপনারা মুখে আপনাদিগকে রাজা বলেন, কিন্তু কাজে আপনারা রাজা নহেন।

এস্থলে ধনীগণকেও কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহারা অসার উপাধি লইবার জন্য কত না অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু বলুন দেখি, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, অপরিমিত তোষামোদ করিয়া যে উপাধি লাভ করিলেন, সে উপাধি পাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, উপাধি পাইবার পরে তাহা ছাড়া আর কিছু নূতন রকমের হইলেন কি? যদি তাহা না হইয়া থাকেন, তবে উপাধির জন্য এত লালায়িত কেন? যে অর্থ ব্যয় করিয়া রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর হইলেন, সে অর্থ দেশের জন্য ব্যয় করিলে যে আপনার নাম দেশে চির-

স্মরণীয় হইত। মানুষ এমনই নির্ব্বোধ যে, একজন লোকে তাহাকে বলিয়া দিল যে আজ হইতে তুমি রায় বাহাদুর কি রাজা বাহাদুর হইলে; সে সেই কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইল এবং অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা সম জ্ঞান করিল,কিন্তু একবারওবিচার করিয়া দেখিল না যে ইহাতে তাহার কি লাভ হইল! তুমি ভাবিলে না যে,আমি মানুষ ও ব্যক্তিও মানুষ। ও আমাকে রায় বাহাদুর বলিল, তবে আমি রায় বাহাদুর হইলাম, নচেৎ আমি হইলাম না। তুমি বুঝিলে না যে মানুষের কথায় কিছুই আসিয়া যায় না। অতএব কি কি কার্য্য করিলে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর হওয়া যায়, তাহা বিচার করিয়া দেখ; লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আত্মহারা হইও না।

হে ভোগবিলাসী ধনি, জমিদার, রাজা, ও বাদসাহ, যদি আপনাদিগকে ২।৩ দিবস অনাহারে রাখা যায়, বলুন দেখি, তখন আপনাদের কিরূপ অবস্থা হয়। একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, সে সময়ে আপনাদের রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় প্রবৃত্তি হয় কিনা? ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যার মাংস খাইতে কি কুণ্ঠিত হন? কখনই না। তাই বলিতেছি, জীবমাত্রকেই আপনার আত্মা ভাবিয়া তাহাদের দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করিবেন। সৃষ্টিকর্ত্তা আপনাদিগকে রাজপদ, ধন, ঐশ্বর্য্য, তেজ বল ও বুদ্ধি কি জন্য দিয়াছেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি, তাহা মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন এবং দেখিয়া কার্য্য করুন।

হে রাজন্, সেই পরমাত্মা আপনাকে উপযুক্ত দেখিয়াই রাজপদ দিয়াছেন। আপনার কর্ত্তব্য প্রজাপালন করা। প্রজাগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে,নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে, দুর্ব্বলের প্রতি কোন বলবান অত্যাচার করিতে না পারে,অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে কোন প্রজা কষ্ট না পায়, এক কথায়, তাহাদের সমস্ত অভাব কষ্ট নিবারণ করা, প্রজাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়া, এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিয়া গম্ভীর ও শান্তিঃ স্বরূপে সমাধা করত পরস্পরে পরমানন্দে থাকিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। আরও কর্ত্তব্য আপনার ন্যায় অন্যান্য রাজার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া পরস্পর পরস্পরের রাজ্যের অভাব মোচন করা। ফলকথা, যাহাতে জগতের কল্যাণ সাধিত হয়, সমস্ত জগতে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা সকল দেশের সকল রাজারই একান্ত কর্ত্তব্য। প্রজাগণ, রাজার পুত্র কন্যার তুল্য, রাজা পিতার স্বরূপ। রাজা যেরূপ পুত্র কন্যাগণকে লালন পালন করেন এবং পুত্র যেমন পিতামাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে,তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করে, রাজাও প্রজায় সেইরূপ ভাবে কার্য্য করা উচিত। যেমন পুত্রকন্যার অপেক্ষা পিতা মাতার দায়িত্ব অধিক, তদ্রূপ প্রজার অপেক্ষা রাজার দায়িত্ব অধিক। সন্তান সন্ততিগণ কোথায় কি ভাবে দিন যাপন করিতেছে, তাহারা খাইতে পাইতেছে কি না,তাহাদের অভাব দুঃখ কিছু আছে কি না, দেখা যেমন পিতামাতার কর্ত্তব্য, রাজারও কর্ত্তব্য যে, তাঁহার প্রজাগণ কি ভাবে আছে, তাহাদের কাহারও কোন অভাব আছে কিনা, তাহারা সৎপথে কি অসৎপথে চলিতেছে, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা হইতেছে কি না, তাহারা উদর পুরিয়া খাইতে পাইতেছে কি না,প্রভৃতি তদন্ত করা।

পুত্রকন্যার দেখা উচিত, পিতামাতা কিসে সুখে সচ্ছন্দে থাকেন, কি করিলে তাহাদের প্রিয় হইতে পারি, কিসে তাঁহাদের মনোকষ্ট না হয়। প্রজাগণেরও সেইরূপ রাজার প্রতি করা উচিত। রাজভক্ত হওয়া প্রজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপভাবে কার্য্য করিলে, রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল, উভয়েই শান্তি ও পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন, অন্যথা কাহারই মঙ্গল নাই।

ধনী ও মহাজনদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যথাশক্তি দরিদ্রদিগকে পোষণ করেন, যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহারা সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করেন। তাহা হইলে, তাহাদের জীবন, ধন, সম্পদ, রাজ্য ও ক্ষমতার সার্থকতা হয়, অন্যথা সমস্তই বৃথা। এমন কি, তাঁহাদের জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

পাঠকগণ, আপনারা স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন যে, জগতে বারম্বার দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক হইবার কারণ কি? প্রতি বৎসরেই যদি এইরূপ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা প্রজার ত বাঁচা ভার দেখিতেছি। অতএব ইহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না; যদ্যপি থাকে, তাহা হইলে তাহা নির্দ্ধারণ করা আপনাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, সে উপায় কি? কি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

প্রথমে দেখুন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি না, যাঁহা দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি এই বিশ্বের রাজাধিরাজ কি না, এবং এই ত্রিবিধ পাপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে কি না? যদি তিনি এই বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা হন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সকল প্রকার ক্ষমতাই তাঁহাতে আছে, সৃষ্টি স্থিতি নাশ তাঁহারই ইচ্ছায় হয়; সুতরাং জগতের কল্যাণ সাধন তাঁহার ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন। আর যদি তিনি এই বিশ্বরাজ্যের রাজা না হয়েন, তাহা হইলে জগতের এই সকল দুঃখ কষ্ট নিবারণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই।

কুম্ভ দেখিয়া কুম্ভকারের—ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ, এই জগৎ দেখিয়া জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্বও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ। কোন বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিলে তন্নির্ম্মাতার যেমন প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতা দেখিলে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কুম্ভের ভাল মন্দ যাহা কিছু যেমন কুম্ভকারের হাত, সে কুম্ভকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিতে পারে, অর্থাৎ কর্ত্তার হাতেই যেমন কার্য্যের ভাল মন্দ নির্ভর করে, সেই বিশ্ব স্রষ্টার হস্তে এই বিশ্বের ভাল মন্দ যাহা কিছু সমস্তই নির্ভর করে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, এই জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকট প্রেমভক্তি সহকারে প্রার্থনা করা। একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, জগতের কল্যাণ করিবেন। সুখের সময়ে কাহাকেও চেনা যায় না, সে সময়ে সকলেই আপন হয়, কিন্তু দুঃখের সময়ে সকলকেই চেনা যায়, সে সময়ে আপনও পর হয়, অতএব আসুন, আমরা আমাদের এই দুঃখের সময় তাঁহাকে

ডাকি, দেখি তিনি আমাদের দুঃখ নিবারণ করেন কি না। দেখি, তিনি আমাদের আপনার কি না? আরও দেখিব যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান রাজরাজেশ্বর মহেশ্বর, জগৎ পিতা, জগন্মাতা জগদগুরু ও জগদাত্মা কি না?

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, যিনি এই বিশ্বের ঈশ্বর, যিনি আপনাদের ইষ্টদেব, তিনি সাকার কি নিরাকার। যদি তিনি নিরাকার হয়েন, তাহা হইলে মন বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়-অগোচর হইবেন, তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ভাবিলে তিনি শুনিতেছেন কি, না কার্য্যের ফল ব্যতীত তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি করিবেন? যদি তিনি সাকার হন, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। আমাদের শাস্ত্রে বেদেতে বিরাট ভগবানের রূপ এইরূপ লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার নেত্র, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার মস্তক, জল তাঁহার নাড়ী, পাহাড় পর্ব্বত তাঁহার হাড় ও পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই সমষ্টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া তিনি প্রত্যক্ষ সাকাররূপে বিরাজমান আছেন। ইহা ব্যতীত সাকাররূপে আর কেহ ইষ্টদেব নাই, হয়ও নাই, হইবেও না, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। আপনারা প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতে পাইতেছেন, তবে কেবলমাত্র অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অহংভাবে মত্ত হইয়া ঘৃণা ও অবিশ্বাস করেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন এবং তাঁহাকে চিনিয়া লউন। আরও খুঁজিয়া দেখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন কাহার দ্বারা হইতেছে। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, যজ্ঞাহুতি প্রদান করিলে মেঘ হইয়া সময়ানুযায়ী বৃষ্টি হয়, ও সেই বৃষ্টি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রজাগণকে পালন করে; প্রজাগণও দেবের ভাগ যজ্ঞাহুতিতে প্রদান করেন, এবং দেবও প্রসন্ন হইয়া সময় মত জল দেন। যদি প্রজাগণ দেবের ভাগ যজ্ঞাহুতিতে প্রদান না করেন, তাহা হইলে প্রজাদের নানা-প্রকারে কষ্ট হয়। প্রজা যদি রাজাকে রাজকর না দেয়, রাজা যেমন তজ্জন্য প্রজাকে বিধিমতে কষ্ট দেন, তাহার বিষয় আশয় নিলাম করিয়া লয়েন, সেইরূপ, দেবের ভাগ যজ্ঞাহুতিতে প্রদান না করিলে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে অর্পণ না করিলে নানাপ্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে। আমরা সেই রাজকর, সেই দেবের ভাগ দিই না, যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তাঁহাকে মানি না, তাঁহাকে চিনি না, সুতরাং আমাদের দুর্গতিও ঘুচিতেছে না। অতএব আসুন, আমরা তাঁহার প্রাপ্য কর তাঁহাকে দিই, তিনি যে কে, তাঁহাকে জানি এবং কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের মাতা পিতা গুরু ও আত্মা, তিনি আমাদের অবশ্যই মঙ্গল বিধান করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ ও সিদ্ধান্তদর্পণ। (২)

শক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য নাটক অলঙ্কার ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তখন হইতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিবার লালসা জন্মে। দেশে তাদৃশ শিক্ষক ছিল না। তাঁহার এক পিতৃব্য কিঞ্চিৎ

জ্যোতিষ জানিতেন, তাঁহার নিকট চন্দ্রশেখর জ্যোতিষ শিক্ষা আরম্ভ করেন। দীপিকা জাতকালঙ্কার প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষ ও শ্রীপতি, ভাস্বতী সিদ্ধান্ত শিরোমণি সূর্য্য-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গণিত জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃত ও মাতৃভাষা উড়িয়া ভিন্ন ইনি অন্য কোন ভাষা জানেন না। ইংরাজী হইতে উড়িয়া ভাষায় অনুবাদিত ভূগোলসূত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ প্রভৃতির ন্যায় উড়িয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ জ্যোতিষশাস্ত্রান্তর্গত বিষয় লিখিত আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্র চন্দ্রশেখরের ততটুকু জানা আছে। ইহা হইতে তিনি জানিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য মতে সূর্য্য সম্বন্ধে পৃথিবী এক গ্রহবিশেষ ও অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম ২৩।২৪ বৎসর হইতে, সিদ্ধান্তানুযায়ী গণনা করিলে সেই সেই গণনা দৃক্ সিদ্ধ হয় কি না, নিরূপণ করিবার জন্য, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ণিত কয়েকটী যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া অবিরত গ্রহনক্ষত্রাদি বেধ করিতে লাগিলেন। গণিতের সহিত গোলের সমাবেশ হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিয়া দেখিলেন যে প্রাচীন সিদ্ধান্তাদিতে গ্রহাদির যে সকল ধ্রুব (১) প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কোন কোনটীতে সংস্কারের প্রয়োজন। শলাকানির্ম্মিত বেধযন্ত্র (২) সাহায্যে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কত কত রজনী প্রভাত হইয়াছে। দুই তিন বৎসর এইরূপ গভীর পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত হইলে তিনি পর্য্যবেক্ষণের ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সমুদায় ধ্রুবাঙ্ক নিরূপিত হইলে, সিদ্ধান্তশিরোমণির ন্যায় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই পুস্তকের নাম সিদ্ধান্তদর্পণ রাখিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইবার পূর্ব্বেই ঐ পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয়। তদবধি তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণের গণনা সত্য হইয়াছে কি না, গ্রহাদি প্রত্যক্ষ করিয়া নিরূপণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। বাল্যকালের নিরতিশয় পরিশ্রমে অজীর্ণাদি রোগ সঞ্চার হেতু চন্দ্রশেখরের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। অজীর্ণরোগ বশতঃ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে প্রায়ই দিনাতিপাত করিতে হয়।

উড়িষ্যার অন্তর্গত অধিকাংশ রাজ্যের ন্যায় খণ্ডপাড়া রাজ্যের আয় যৎসামান্য। রাজার নিকট হইতে চন্দ্রশেখর যে দুই একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাতে অর্থের সচ্ছলতা নাই। প্রাচীন রীতি উড়িষ্যায় সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। রাজপরিবারের অন্তর্গত হওয়াতে প্রাচীন কালের পদ্ধতি অনুসারে চন্দ্রশেখরের অনেক গুলি অনুচর পোষণ করিতে হয়।

খণ্ডপাড়ার বর্ত্তমান রাজা তাদৃশ বিদ্বান নহেন এবং তিনি বিদ্বানগণের সমুচিত সমাদরও করেন না। অধিকন্তু রাজ্যমধ্যে কেহ পণ্ডিত হইলে তাঁহার নিজ যশের খর্ব্বতার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। ইচ্ছা করিলেই চন্দ্রশেখর খণ্ডপাড়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন না। কোথাও যাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, রাজার অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। এজন্য প্রায় জন্মাবধি তিনি খণ্ডপাড়ায় অতিবাহিত করিয়াছেন।

(১) Elements.
(২) Astronomical instruments.

অনেক দিন হইল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জন্মে। তাঁহার শলাকা নির্ম্মিত বেধযন্ত্র, বৃত্তাঙ্কিত মৃণ্ময় গোলক প্রভৃতি দেখিবার নিতান্ত বাসনা ছিল। খণ্ডপাড়া প্রায় দুর্গম স্থান বলিয়া তাঁহার বেধযন্ত্রালয় দর্শন বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আহ্বানে তিনি বিগত মাঘ মাসে কটকে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার রচিত গ্রন্থপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িকতা, শিষ্টাচার ও পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়াছেন।

তিনি কখনও দূরবীক্ষণ দেখেন নাই। দূরবীক্ষণ সহযোগে চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ দেখিবার নিমিত্ত একদিন সন্ধ্যাকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। বড় দূরবীক্ষণ দ্বারা গতিশীল গ্রহাদি দর্শন করিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষার প্রয়োজন। বৃহস্পতির প্রতি দূরবীক্ষণ ঠিক করিয়া দেওয়া গেল, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হওয়াতে, তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া স্বয়ং দূরবীক্ষণ ঠিক করিয়া লইলেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পর অন্তর পরিমাণ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার এতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, দেখিবামাত্র তাহাদের পরস্পর অন্তর অংশাদি দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন। দূরবর্ত্তী উচ্চ বৃক্ষ বা অট্টালিকার উচ্চতা কত অংশ, তাহা দেখিবামাত্র বলিতে পারেন। তৎসমুদায় যন্ত্রাদির সাহায্যে পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার কথিত পরিমাণে কখনও ১ অংশের অধিক ভ্রম হয় নাই।

একদিন দূরবীক্ষণ সহযোগে চন্দ্র দেখিবার সময় উক্ত দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট বস্তু কত গুণ বর্দ্ধিতায়তন হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০০ গুণ বর্দ্ধিত করিবার জন্য সেই দূরবীক্ষণ তখন সজ্জিত ছিল। বাস্তবিক একশত গুণ কি না, বুঝিবার নিমিত্ত চন্দ্রবিম্বের (১) কলা ও প্রতিরূপের কলা মনে মনে পরিমাণ করিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন যে, উক্ত দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরবর্ত্তী চন্দ্র ৮০ হইতে ১০০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য। যিনি দূরবীক্ষণ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার পক্ষে উক্ত প্রণালীতে দূরবীক্ষণের বিপুলীকরণ ক্ষমতা পরিমাণ করা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিগত ২৪এ মাঘ দিবসে সন্ধ্যাকালে মঙ্গল ও বৃহস্পতির অন্তর ইংরাজী মানযন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত চন্দ্রশেখর আমাকে অনুরোধ করেন। উভয়ের মধ্যে তখন কত অন্তর, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন, স্থূলতঃ ৬ অংশ। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি কতদূর, তাহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কথায় যেন আমি বিশ্বাস করিলাম না, এরূপভাব দেখাইলাম। তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ করিয়া দেখিতে বলেন। কোন উপায়ে উভয়ের দূরত্ব পরিমাণ করিয়া দেখাইতে আমি অনুরোধ করিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ৪২ আঙ্গুল দীর্ঘ একটি কাঠির প্রান্তে ৪॥০ আঙ্গুল দীর্ঘ একটী সূক্ষ্ম শলাকা সমকোণে রাখিয়া বদ্ধ করিলেন। উক্ত ৪২ আঙ্গুল কাঠির ঠিক উপর দিয়া একটি গ্রহ এবং ৪॥০ আঙ্গুল দীর্ঘ সমকোণস্থিত শলাকার অগ্রভাগ দিয়া আর একটি গ্রহ

(১) Disc.

দেখিতে বলিলেন। তথায় সেদিন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও আর দুই একটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের ত্রিকোণমিতির অন্তর্গত সারণী গুলি কণ্ঠস্থ থাকে। ৬ অংশের জ্যা (১) ও লম্বজ্যা (২) স্থির করিয়া তদনুরূপ অনুপাতানুসারে শলাকাদ্বয় সাহায্যে কোণ পরিমাপক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে সৌরকলঙ্কের বিষয় উঠিল। সমুদায় কথা শেষ হইতে না হইতে কলঙ্ক প্রত্যক্ষ করাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্য বিশ্বাস করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলে তিনি কাহারও কোনও কথায় বিশ্বাস করেন না। তদুত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ভূমণ্ডলের চারিদিকে আবহ প্রবহাদি যে সপ্ত প্রকার বায়ুর বিষয় সিদ্ধান্তগ্রন্থে লিখিত আছে, তৎসমুদায়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কি? ইহাতে তিনি বলিলেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি না থাকিলে অনুমান চলে না। পৃথ্বী সংলগ্ন আবহ ব্যতীত অপরাপর বায়ুর অস্তিত্বের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতামত কিছুই নাই। পরে দূরবীক্ষণ সহযোগে সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গ্রহ পরিদর্শন সময়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য পান নাই স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ফলিত জ্যোতিষের সত্যাসত্য সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করি। তিনি কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইলেন। তাঁহার নিজের মত কি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, যে কারণেই হউক, সমুদায় ফল যখন মিলে না, তখন ফলিত জ্যোতিষের প্রতি তাঁহার সন্দেহ আছে। একদিকে ঋষিবাক্য, অন্য দিকে প্রমাণাভাব, এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বঙ্গদেশে তিথি নিরূপণ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, প্রসঙ্গক্রমে তদ্বিষয় উঠিল। তিনি শুনিয়া কিঞ্চিৎ অধীরভাবে বলিলেন যে, যখন চন্দ্রসূর্য্যের অন্তর ইচ্ছা করিলেই পরিমিত হইতে পারে, তখন পঞ্জিকায় প্রদত্ত তিথি ঠিক কি না, তাহা দেখিলেই ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। "প্রত্যক্ষানুভবং ন লুম্পতি বচো যুক্তি যতঃ" আবৃত্তি করিলেন। তিনি জানেন না যে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ গণক মহাশয়েরা মানযন্ত্র ব্যবহার করা দূরে থাকুক, কখনও মনে কল্পনাও করেন না।

চন্দ্রশেখর দৃক্‌সিদ্ধির কতদূর পক্ষপাতী, তাহা উল্লিখিত কথা হইতে অনায়াসে বুঝা যায়। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় নানাবিধ ঘটনাতে পাইয়াছি। ইদানীন্তনের পাশ্চাত্য বহুবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রসজ্জিত মানমন্দিরে বসিয়া পরিদর্শন করিতে পারিলে, তাঁহার দ্বারা হিন্দুজ্যোতিষের কতদূর উন্নতি হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অপরের সাহায্য বা উপদেশ না পাইয়া স্বীয় উদ্যমে ও যত্নে অপেক্ষাকৃত স্থূলযন্ত্র সহযোগে পরিমাণ বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

কালনির্ণয় ও গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পর অন্তর নিরূপণ, এই দুইটীই গণিত জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ। উক্ত বিষয়ক যন্ত্রগুলি

(১) Sine.

(২) Cosine.

যতসূক্ষ্ম হইবে, ফলও ততদূর সূক্ষ্ম হইবে। ঘটিযন্ত্র (তাঁবি ঘড়ি) ও রাজবাটির এক ক্লকঘড়ি, তাঁহার কালপরিমাপক যন্ত্র ছিল। শলাকা সম্বলিত চক্রযন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্মরূপে কোণ পরিমাণ করা বিশেষ পরিশ্রম ও সময়ের আবশ্যক। স্থূলযন্ত্র সাহায্যে জ্যোতিষিক গণনায় তিনি যে এতদূর সফল হইয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, তাঁহার গবেষণায় হিন্দু জ্যোতিঃ শাস্ত্রের বিশেষ উপকার হউক বা না হউক, এখনও যে ভারতে পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তকারগণের ন্যায় মনুষ্য স্বাধীনভাবে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারেন, চন্দ্রশেখরের জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণ পাঠ করিয়া উড়িষ্যাবাসী সদাশিব খড়িরত্ন উৎকল পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছেন। বঙ্গদেশের ন্যায় উড়িষ্যাতেও তালপত্রের পঞ্জিকা গণক মহাশয়গণ প্রস্তুত করিতেন। এক্ষণে খড়িরত্ন কৃত পঞ্জিকা উড়িষ্যায় প্রচারিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার রুদ্রনারায়ণ নামক চন্দ্রশেখরের জনৈক ছাত্র বঙ্গদেশে রুদ্র নামক এক পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেছেন। সিদ্ধান্তদর্পণ যখন প্রথমে রচিত হয়, তখন রুদ্রনারায়ণ চন্দ্রশেখরের ছাত্র ছিলেন। তখন সিদ্ধান্তদর্পণের কোন কোন অংশের সংশোধন সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসংস্কৃত সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে রুদ্রপঞ্জিকা প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য রুদ্রপঞ্জিকার সহিত চন্দ্রশেখরের গণিত কালাদিতে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

প্রায় ১৮।১৯ বৎসর হইল, শ্রীক্ষেত্রে মুক্তি-মণ্ডপে উৎকল দেশস্থ জ্যোতিঃ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্‌গণের এক সভা আহুত হয়। কোন পঞ্জিকানুসারে ৺জগন্নাথদেবের ক্রিয়াকলাপাদি নির্ব্বাহ করা উচিত, তাহারই বিচার করা ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভাতে চন্দ্রশেখর কৃত পঞ্জিকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে, তদবধি জগন্নাথদেবের সমুদায় কার্য্য তদনুসারে সম্পাদিত হইতেছে।

এক্ষণে তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।

সিদ্ধান্তদর্পণ একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। (১) নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দে জ্যোতিষের যাবতীয় বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ এক্ষণে ২৫০০ শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ২২৮৪ টি শ্লোক চন্দ্রশেখরের রচিত ও ২১৬টি শ্লোক গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত। অনেক শ্লোক দীর্ঘচ্ছন্দে রচিত। এজন্য সমুদায় গ্রন্থ অনুষ্টুপছন্দে রচিত হইলে শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হইত।

সিদ্ধান্তদর্পণ ২৪ প্রকাশ বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। পুরাতন সিদ্ধান্তের ন্যায় ইহার বিষয়গুলি মধ্যাধিকার, স্ফুটাধিকার, ত্রিপ্রশ্নাধিকার, গোলাধিকার ও কালাধিকার এই পঞ্চাধিকারে বিভক্ত। সমুদায় ২৪ প্রকাশে বর্ণিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত নাম এই। (মধ্যাধিকারে) (১) কাল (২) ভগণাদি (৩) গ্রহানয়ন (৪) নানাবিধ সংস্কার পদক। (স্ফুটাধিকারে) (৫) সখণ্ড ফল গ্রহস্ফুটীকরণ (৬) সূক্ষ্ম পঞ্জিকা ক্রান্ত্যাদি। (ত্রিপ্রশ্নাধিকারে) (৭) শঙ্কুচ্ছায়া (৮)

(১) উহা তালপত্রে উড়িয়া অক্ষরে লিখিত। গ্রন্থখানি যাহাতে সত্বর দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। এই পুঁথি দুই খণ্ড মাত্র আছে। তন্মধ্যে একখণ্ড পুঁথী হইতে এ প্রবন্ধের সমুদায় বিষয় গৃহীত হইল।

চন্দ্রগ্রহণ (৯) সূর্য্যগ্রহণ (১০) পরিলেখ (১১) গ্রহযুতি (১২) ভগ্রহযোগ (১৩) গ্রহক্ষোদয়াস্তং (১৪) চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতি (১৫) বৈধৃতি ব্যতিপাতযোগাদি মহাপাত। (গোলাধিকারে) (১৬) গ্রহসংস্থান প্রশ্ন, (১৭) ভূগোলস্থিতি (১৮) ভূগোল বিবরণ (১৯) ভূগোল খগোল বর্ণন, (২০) গোলাদি যন্ত্র (২১) নানা শেষ রহস্য। (কালাধিকারে) (২২) সম্বৎসরাদি (২৩) পুরুষোত্তমস্তব, (২৪) বিশুদ্ধ পঞ্জিকা ও উপসংহার।

প্রথম প্রকাশের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া লিখিতেছেন।

শ্রীভাস্কর প্রভৃতি খেচর চক্রবালং
নত্বা গুরুং স্বাপিতরৌ তদনুগ্রহাঢ্যাঃ।
মূঢ়োঽপ্যগাঢ় গণক প্রতিপত্তয়েঽহং
সিদ্ধান্তদর্পণ ইতি প্রথয়ামি শাস্ত্রং। ৪।
গ্রন্থেঽস্মিন্নধিকার পঞ্চকমহং বক্ষ্যামি মধ্যস্ফুটং
ত্রিপ্রশ্নাতীত গোলকালসংহিতং সঙ্গ সবক্ষ্যোদ্ গতিঃ,
বাকৈাঃ কাপি দিবাকরাংশ গদিতৈ গ্রন্থান্তরো স্থাপিতৈ
রৈকার্থ্যাৎ কচিদন্বিতে সুবিততে বোধায় বালাবলেঃ। ৫।

অধিকাংশ শ্লোকই সরল সংস্কৃতে রচিত। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহাতে এমন দুরূহ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে "বোধায় বালাবলে" এই পদদ্বয় প্রয়োগ করা অসঙ্গত বোধ হয়।

কোন্ গ্রহ কতদিনে একবার পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ গ্রহদিগের পরিভ্রমণ বা ভগণ কাল গণিত জ্যোতিষের একটি প্রধান অঙ্গ। এই ভগণকালের সাহায্যে গ্রহগতি ও স্থিতি নিরূপিত হয়। নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্তদর্পণ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে গ্রহদিগের পরিভ্রমণ কালের একটা তালিকা দেওয়া গেল। ইংরাজী জ্যোতিষ মতে গণিত ভগণদিগের সহিত অন্যান্যগুলির কত প্রভেদ, তাহাও দেখান গেল।

গ্রহ	ইংরাজী জ্যোতিষ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত		সিদ্ধান্ত শিরোমণি		সিদ্ধান্তদর্পণ	
	ভগণ দিন	ভগণ দিন	প্রভেদ	ভগণ দিন	প্রভেদ	ভগণ দিন	প্রভেদ
রবি ...	৩৬৫.২৫৬৩৭	৩৬৫.২৫৮৭৫	+.০০১৩৮	৩৬৫.২৫৮৪৩	+.০০২০৬	৩৬৫.২৫৮৭৫	+.০০১৩৮
চন্দ্র ...	২৭.৩২১৬৬	২৭.৩২১৬৭	+.০০০০১	২৭.৩২১১৪	–.০০০৫২	২৭.৩২১৬৭	–.০০০১
মঙ্গল ...	৬৮৬.৯৭৯৪	৬৮৬.৯৯৭৫	+.০১৮১	৬৮৬.৯৯৭৯	+.০১৮৫	৬৮৬.৯৮৫৭	+.০০৬৩
বুধ ...	৮৭.৯৬৯২	৮৭.৯৫৮৫	–.০১০৭	৮৭.৯৬৯৯	+.০০০৭	৮৭.৯৭০১	+.০০০৯
বৃহস্পতি ...	৪৩৩২.৫৮৪৮	৪৩৩২.৩২০৬	–.২৬৪২	৪৩৩২.২৪০৮	–.৩৪৪০	৪৩৩৩.০৯১৫	+.৫০৬৭
শুক্র ...	২২৪.৭০০৭	২২৪.৬৯৮৫	–.০০২২	২২৪.৬৯৭৯	–.০০২৮	২২৪.৭০২৩	+.০০১৬
শনি ...	১০৭৫৯.২১৯৭	১০৭৬৫.৭৭৩	+৫.৫৫৬	১০৭৬৫.৮১৫২	+৬.৫৯৫৫	১০৭৫৯.৭৬০৫	+.৫৪০৮

উপরের তালিকা হইতে সিদ্ধান্তদর্পণের গ্রহভগণের সহিত ইংরাজি জ্যোতিষের ও এ দেশীয় প্রসিদ্ধ দুইখানি সিদ্ধান্তোক্ত গ্রহভগণের ঐক্যানৈক্য সহজেই দেখা যাইবে।

তৃতীয় প্রকাশে কলিযুগের আরম্ভকালে গ্রহগণের রাশ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, কল্যব্দ ৪৯১৭ কে করণাব্দ ধরিয়া গ্রহমন্দ তুঙ্গপাত রাশ্যাদিগণ যোগোপযোগী বিষয়গুলি প্রদত্ত হওয়াতে গণনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তদর্পণে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সারণী থাকায় এখানি একাধারে সিদ্ধান্ত ও করণ দুইই হইয়াছে।

প্রাচীন সিদ্ধান্ত সকলের ন্যায় ইহাতে পৃথিবীর মধ্যব্যাস ১৬০০ যোজন স্বীকৃত হইয়াছে। (৪র্থঃপ্রঃ)। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে গ্রহগণের গতির কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"প্রবহাখ্যো মরুদ্ভূমিং পরিক্রামতি সর্ব্বদা।
পশ্চিমাভিমুখ স্তেনাকৃষ্টো জ্যোতির্গণোঽম্বহঃ॥
যাতি যৎ পশ্চিমামাশা মুদিতা সাহ্নিকী গতিঃ।
তাং ভিত্বা যদ্‌গ্রহগণঃ স্ব স্ব শক্ত্যনুসারতঃ॥
স্তোকেন যাতি পূর্ব্বাশাং সোক্তা স্বাভাবিকীগতিঃ।
শীঘ্র মন্দবশাদ্ ভিন্না দৃশ্যন্তে স্ফুট খেরোঃ॥

(৫ম প্রঃ)

"তত্র মধ্যম মার্ত্তণ্ডঃ পরিতো মণ্ডলং ভুবঃ।
ভ্রমন্ তারা খেচরাণাং কক্ষামধ্যস্থ উচ্যতে।
তং ভ্রমন্তো মহীজাদ্যা স্তৎসঙ্গেন ভুবং পুনঃ।
পরিক্রামন্তি যৎ তস্মাৎ স প্রোক্ত সর্ব্বকর্ষকঃ॥"

(৫ম প্রঃ)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সিদ্ধান্তদর্পণ ও ইংরাজি জ্যোতিষ মতে চন্দ্রাদির পরম বিক্ষেপের একটা তালিকা দেওয়া গেল।

ষষ্ঠ প্রকাশে তিথিগণনা ও চন্দ্রের সংস্কার সকল বিবৃত হইয়াছে। তিথির "বাণ

পরম বিক্ষেপ কলাদি।

গ্রহ	সূঃ সিঃ	সিঃ শিঃ	সিঃ দঃ	ইঃ জ্যোঃ
চন্দ্র	২৭০	২৭০	৩০৯	৩০৯
কুজ	৯০	১১০	১১১	১১১।৬
বুধ	১২০	১৫২	১৬৪	৪২০।৫
গুরু	৬০	৭৬	৭৮	৭৮।৫২
শুক্র	১২০	১৩৬	১৪৮	২০৩।২৯
শনি	১২০	১৬০	১৪৯	১৪৯।৩৬
রবির পরম ক্রান্ত্যংশাদি	২৪।	২৪।	২৩।৩০	২৩।২৭

বৃদ্ধী রসক্ষয়ঃ" যে পরিমাণ প্রাচীন প্রবাদ আছে, তৎসম্বন্ধে লিখিতেছেন ;—

"বৃদ্ধৌ পঞ্চ তিথেঃ ক্ষয়ে রসমিতা নাড্যঃ পুরাণের্মতা।
নিত্যং যৎ পরমাস্ততো ব্যবহৃতৌ স্থূলেষাতে পঞ্জিকা॥
প্রত্যক্ষানুভবং ন লুম্পতি বচো যুক্তি র্যতস্তন্ ময়া।
তৎ সাক্ষাৎ করণায় কাম্যবিধয়ে সূক্ষ্মাপরাতন্যতে॥"

স্ফুট সূর্য্যগণনা করিয়া তাহাতে লম্বন সংস্কার করিতে হইবে। পরে স্ফুটচন্দ্রে কয়েকটি সংস্কার প্রয়োগ আবশ্যক। সংস্কারগুলি এই।

তুঙ্গান্তরং পাক্ষিক নামধেয়ং ফলং দিগং শাখ্যমদন্তরীয়ং
ক্রমেণ বক্ষ্যামি নিরীক্ষ্য যত্নাচ্চিত্রাঙ্গতিং রাত্রি-
পতেশ্চিরায়॥

চন্দ্রস্ফুটে তুঙ্গান্তর পাক্ষিক ও দিগংশ নামক সংস্কারত্রয় চন্দ্রশেখর স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়াছেন। এগুলি পুরাণ সিদ্ধান্তে নাই।

ষোড়শ প্রকাশে গোলানভিজ্ঞ গণকের নিন্দা করিয়া লিখিতেছেন ;—

নিরাশায় পুরাস্যাকং যা সৃষ্টা বিষ্ণুনা ধরা।
যুজ্যতে প্রথমং তস্যাঃ স্বরূপং পরিশীলিতুং॥

অনন্তর নানাবিধ মতের উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন ;—

ইংলণ্ড পণ্ডিতা সূক্ষ্মমতয়ঃ কথয়ন্তি চ।
ভূগোলো বর্ত্তুলঃ ক্ষুদ্রো ভৌমাদি গ্রহবদ্দিবি॥
খমধ্যস্থ বৃহৎ সূর্য্যবিম্ব সাবয়ব ভ্রমৈঃ।
আকৃষ্ট চক্রবৎ ভ্রাম্তিং ক্রান্তিবৃত্তে ব্রজেত্যমৌ॥

*　　*　　*

ন পতন্তি জনা ভূমে মধ্যাকর্ষণ শক্তিতঃ।
পশ্বস্ত্যর্কাদিকান্ ভ্রান্তান্ নাবিকা হি নগানিব॥

ষোড়শ-প্রকাশে ভূগোল সম্বন্ধে প্রশ্ন সপ্তদশ প্রকাশে নানাবিধ মতের খণ্ডন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তদর্পণের সমুদায় বিষয় গুলি দুই এক কথায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন, গণিত জ্যোতিষ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনাও নাই। এজন্য পুস্তকের কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াই প্রবন্ধটি শেষ করিতে হইল। সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে গণিত রব্যাদি গ্রহ পাশ্চাত্য পঞ্জিকায় প্রদত্ত গ্রহের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম। যে যে দিবসের স্ফুটগ্রহ মিলাইয়া দেখিলাম, তৎসমুদয়ের কোথাও উভয়ের মধ্যে এক অংশ পর্য্যন্তও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। নানা কারণে যে কলার প্রভেদ ঘটিবে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষানুসারে স্ফুটগ্রহের আলোক ঘটিত ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্কার প্রদত্ত হয়। সুতরাং সিদ্ধান্তদর্পণের নিয়মানুসারে গ্রহস্থিতি সাধন ঠিক হইলেও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে গণিত গ্রহস্থিতির সহিত নূন্যাধিক প্রভেদ ঘটিবে। কয়েক দিবসের রব্যাদি গ্রহের স্ফুট গণনা করিতে সামন্ত মহাশয়কে অনুরোধ করি। তাঁহার প্রদত্ত গণনা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। বিগত ৩১শে জানুয়ারি দিবসের সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় রব্যাদি সপ্তগ্রহের ক্রান্ত্যংশাদি এবং নিরয়ণ ও সায়ণ স্ফুট প্রদত্ত হইল। গুপ্তপ্রেস মতে সায়ণস্ফুট গণনায় ২০।৫৪ অয়নাংশাদি এবং গ্রীনিচ হইতে কটকের ৫ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ও কলিকাতার ৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট দেশান্তর কাল ধরা গেল।

বিগত ৩১ জানুয়ারী দিবস কটক সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

গ্রহ	ইংরাজি পঞ্জিকা মতে	সিদ্ধান্তদর্পণ মতে		গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে		ইংরাজি পঞ্জিকা মতে	সিদ্ধান্তদর্পণ মতে
	সায়ণ স্ফুট	নিরয়ণ স্ফুট	সায়ণ স্ফুট	নিরয়ণ স্ফুট	সায়ণ স্ফুট	ক্রান্ত্যংশাদি	ক্রান্ত্যংশাদি
রবি	১০।১১।৫৪	৯।১৯।৩১	১০।১১।৫৬	৯।১৯।৪০	১০।১০।৩৪	১৭।১৪ দঃ	১৭।১৫ দঃ
চন্দ্র	৪।৪ ২৬	৩।১২।১৬	৪।৪।৪১	৩।১২।১	৪।২।৫৫	২৪।১ উঃ	২৪।১৫ উঃ
মঙ্গল	০।২২ ৪৮	০।০।৭	০।২২।৩২	১১।২৯।৪৩	০।২০।৩৭	৯।১৪ দঃ	৯।৭ উঃ
বুধ	১০।০।৩৩	৯।৮।২৩	১০।০।৪৮	৯।১২।১৬	১০।৩।১০	২১।৪৫ দঃ	২১।১৫ দঃ
বৃহস্পতি	০।১৯।২৭	১১।২৬।৪৩	০।১৯।৮	১১।২৭।৬	০।১৮।০	৬।৩২ উঃ	৬।৫০ উঃ
শুক্র	৯।১৯।১৯	৮।২৬।৪৮	৯।১৯।১২	৮।২৭।৪৬	৯।১৮।৪০	২২।৭ দঃ	২২।১ দঃ
শনি	৬।১২।৪৩	৬।২০।৩৮	৬।১৩।৩	৫।২২।১৪	৬।১৩।৮	২।৪১ দঃ	৩।০ দঃ

সিদ্ধান্তদর্পণের গণনার শুদ্ধতা নিরূপণ নিমিত্ত নিম্নে আর দুই দিবসের সায়ণস্ফুট গ্রহ দেওয়া গেল। উভয় দিবসেই কটকের সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার গ্রহ প্রদর্শিত হইল।

গ্রহ		বিগত ২০ ফেব্রুয়ারী		বিগত ১ মার্চ্চ।	
		ইং রাঃ মতে	সিঃ দঃ মতে	ইং রাঃ মতে	সিঃ দঃ মতে
রবি	...	১১।২।৮	১১।২।৯	১১।১১।১০	১১।১১।১১
চন্দ্র	...	০।২১।৪০	০।২১।৪৬	৪।২৭।৭	৪।২৭।৪
কুজ	...	১।৬।৫	১।৫।৩০	১।১২।৩	১।১১।২৭
বুধ	...	১১।৫।১৪	১১।৪।৫৭	১১।২২।১৪	১১।২২।৩৯
গুরু	...	০।২২।৫৮	০।২২।৩৪	০।২৪।৪৬	০।২৪।২১
শুক্র	...	১০।১৪।১৬	১০।১২।৪২	১০।২৫।২৮	১০।২৫।২৫
শনি	...	৬।১২।১ ব	৬।১২।২৩ ব	৬।১১।১৩ ব	৬।১১।৫৬ ব

উপরের কয়েকটি তালিকা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন, গ্রহস্থিতি গণনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তদর্পণ কতদূর উন্নতি করিয়াছে। বাস্তবিক, সিদ্ধান্তদর্পণ প্রাচীন হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ সংস্কার সম্পাদন করিয়া হিন্দু জ্যোতিষের মৌলিকতা ও শুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতি। (৪)

ব্যবস্থা দ্বারা উন্নতি। (২)

সার সমুদায়ের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন (যবক্ষারজান), পট্যাস (ক্ষার) ও ফসফরিক এসিড। ব্যবস্থা দ্বারা কিরূপে ভূমির ফসফরিক্ এসিড্ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই উপায় দ্বারা কিরূপে যবক্ষারজান ও পট্যাসের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে। ইংলণ্ডের কৃষি ব্যবসায়িগণ ভূমিতে যবক্ষারজানের বৃদ্ধি যাহাতে সংসাধিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট। ফলতঃ যে সকল দ্রব্যে যবক্ষারজান ও ফসফরিক এসিড্ প্রচুর পরিমাণে আছে,এমন সকল দ্রব্যই তাঁহারা সাররূপে ক্রয় করেন। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পট্যাস বিশেষ আবশ্যক বটে, কিন্তু পট্যাসের অভাব প্রায় স্বভাবতঃ কোন জমীতেই নাই; এজন্য পট্যাসযুক্ত সার ক্রয় করার প্রতি তাঁহাদিগের আস্থা কম। ফসফরিক এসিডের বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় কৃষকগণের কিরূপ আগ্রহ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যবক্ষারজান যাহাতে ভূমিতে বৃদ্ধি হয়, এবিষয়ে তাঁহাদের আরও অধিক আগ্রহ। আমাদের দেশে যবক্ষারজানের তাদৃশ অভাব আছে কি না ও ইহার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য তাদৃশ আগ্রহ আবশ্যক কিনা, এবিষয়ে কিছু মতামত আছে। সৌভাগ্য ক্রমে ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবের মত এবিষয়ে সুদৃঢ় এবং সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির অনুকূল। ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব ভারতবর্ষের যে সমুদয় স্থলের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,ঐ সমুদয় স্থলে যবক্ষারজানের নিতান্ত অভাব। ভলকার সাহেব মান্দ্রাজের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার ভান্ গেজেল সাহেবের পরীক্ষা সমর্থন করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের ভূমিতে আকাশ হইতে বৃষ্টি সংযোগে যে পরিমাণ যবক্ষারজান আসিয়া মিশ্রিত হয়, তাহা অপেক্ষা ইংলণ্ডের ভূমিতে অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান আসিয়া থাকে। ফলতঃ তাঁহার মতে সকল প্রকার সারবান পদার্থ অপেক্ষা যবক্ষারজান প্রধান সারগুলির উপকারিতাই ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক।

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ডাক্তার ভলকার সাহেবের পোষকতা দ্বারা হইলেও, অন্য পক্ষের মত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অপর পক্ষের মতে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ যবক্ষারজান আকাশ হইতে বৃষ্টির সহিত আসিয়া পড়ে, তাহাই সাধারণতঃ উদ্ভিদের পোষণার্থ যথেষ্ট। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জলের সহিত কি পরিমাণ যবক্ষারজান ভূমিতে আসিয়া থাকে, এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় পরীক্ষা কিছুই হয় নাই। মান্দ্রাজের গভর্ণমেণ্ট রাসায়নিক পরীক্ষকের মতে ১৮-

৮৫ সালে একার প্রতি ৫২·৩৩৮ পাউণ্ড, ১৮৮৮ সালে ৩·৯৯৭ পাউণ্ড্ ও ১৮৮৯ সালে ২·১১৪ পাউণ্ড্ নাইট্রোজেন বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে। ডাক্তার ভল্কার সাহেব বলেন যে,১৮৮৫ সালের পরীক্ষা বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে। যদি ১৮৮৫ সালের পরীক্ষা ঠিক হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষের ভূমিতে যবক্ষারজান সারের সহিত দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক। প্রতি একার জমীতে ফসল জন্মিবার কারণ বৎসরে ১৩ পাউণ্ড্ মাত্র নাইট্রোজেন এমোনিয়া বা নাইট্রেট্ আকারে আবশ্যক। যদি বৃষ্টি সহযোগেই বৎসরে ৫২ পাউণ্ড্ নাইট্রোজেন আসিয়া পড়ে, তবে ভূমিতে নাইট্রোজেনের প্রয়োগ অন্যরূপে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঐ পরীক্ষা যে ভ্রমাত্মক, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সোরা প্রভৃতি যবক্ষারজান সম্বলিত সারের প্রয়োগ দ্বারা এদেশে যেরূপ উপকার সাধিত হয়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যবক্ষারজানের অভাব এদেশের জমীতে বিলক্ষণ আছে। একমাস পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ জেলার নশীপুরের নিকট এক কৃষক দশকাঠা জমী হইতে ষোলমণ ধান্য প্রাপ্ত হয়। বিঘাপ্রতি যে বত্রিশমন ধান্য হওয়া সম্ভব, ইহা ঐ কৃষক কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। ধানগাছগুলি অর্দ্ধহাত প্রমাণ হইলে সে দশকাঠা জমীতে ৫ সের সোরাগাছের গোড়ায়২ ছড়াইয়া দিয়া এইরূপ ফল পাইয়াছে। প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলিতে যে সকল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও প্রায় সোরার প্রয়োগদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের জমীতে যবক্ষার জানের বিশেষ অভাব আছে, ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে যে ১৮৮৮ ও ১৮৮৯ সালে কোন ভুল হয় নাই, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইংলণ্ডে বৃষ্টিসহযোগে একার প্রতি বৎসরে ৪॥ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এমোনিয়া ও নাইট্রেট্ অবস্থায় আসিয়া পড়ে। এদেশে যে ইহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন বৃষ্টি সহযোগে ভূমিতে পতিত হয়, একথাও বিশেষ অসম্ভব। বায়ুতে নাইট্রোজেনের অভাব নাই; ইহার তিনভাগের দুই ভাগই নাইট্রোজেন। কিন্তু বায়ুতে যেভাবে নাইট্রোজেন আছে,তাহাদ্বারা কেবল কলাই জাতীয় উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য উদ্ভিদের বোধ হয় কোন উপকার হয়না। বৈদ্যুতিক ক্রিয়ারদ্বারা আকাশের নাইট্রোজেন জলীয় বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া, এমোনিয়া ও নাইট্রিক এসিড্ আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা ব্যতীত জন্তুদিগের মলমূত্র ও মৃতশরীর পচিয়াও বায়ুর সহিত কিছু এমোনিয়া সংযুক্ত হয়। বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ও উষ্ণতার প্রখরতাদ্বারা নাইট্রিক এসিড্ ও এমোনিয়ার উদ্ভবের অধিক সুবিধা জন্মে। এই সকল কারণ বশতঃ ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে অধিক পরিমাণে নাইট্রিক এসিড্ ও এমোনিয়া জন্মে, ইহাই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত এদেশে শীম ও কলাই জাতীয় উদ্ভিদের ব্যবহার ও স্বাভাবিক উদ্ভব এত অধিক যে, আকাশের নাইট্রোজেন্ বৃষ্টিসহযোগ ভিন্ন অন্য উপায়েও মৃত্তিকার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। এদেশের মৃত্তিকায় ইংলণ্ডের মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান আসিবার স্বাভাবিক পথ থাকিলেও, এদেশে সারের ব্যবহার এত অল্প যে, অধিকাংশ স্থলেই ইংলণ্ডের মৃত্তিকা অপেক্ষা এদেশের মৃত্তিকা

র যবক্ষারজানের অভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কলাই জাতীয় উদ্ভিদের জন্য (ছোলা, অরহর, বীজের জন্য নীল, মুগ ইত্যাদি) যবক্ষারজানের সাররূপে প্রয়োগ আবশ্যক নাই। ইহার প্রয়োগ দ্বারা বরং বীজ অল্প হয়। তৃণজাতীয় (ধান্য, গোধুম, ইক্ষু প্রভৃতি) ফসলের পক্ষে যবক্ষারজান সম্বলিত সার বিশেষ উপযোগী। যে সকল ফসলে পাতা ব্যবহারে আইসে, ঐ সকল ফসলের জন্যও যবক্ষারজান বিশেষ উপযোগী। যথা তামাক, তুঁত, নীল, চা, শাক, ইত্যাদি।

কলাইজাতীয় শস্য ভিন্ন প্রায় অন্যান্য সমুদায় শস্যই যবক্ষারজান ও ক্ষার দ্বারা উপকৃত হয়। ক্ষার ও যবক্ষারজান, এই দুই পদার্থই সোরার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বস্তুতঃ হাড়ের গুঁড়া ও সোরা এই দুই বস্তুর ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন সারের ব্যবহার আবশ্যক নাই। এই দুই বস্তু যে কৃষক উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিবে, সে-ই প্রচুর শস্য পাইবে। হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার দ্বারা কখনই কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে জমীতে সোরা শতকরা এক ভাগের অধিক আছে, এরূপ জমীতে ইহা সার রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হইবে। যে জমীতে শতকরা একভাগ সোরা আছে, এরূপ জমী অতি বিরল। তথাপি সোরা প্রয়োগের দ্বারা ফসলের উপকার হইবে কি না, অর্থাৎ স্থান বিশেষে মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে যবক্ষারজান ও ক্ষার আছে কি না, ইহা একটী সামান্য পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। তৃণ বা শাকজাতীয় কোন ফসল জন্মিবার সময় বিঘা প্রতি দশ সের হিসাবে অল্পপরিমাণ জমীর উপর সোরা প্রয়োগ করিয়া, ঐ পরিমাণ আর এক খণ্ড জমীতে ঐ জাতীয় ফসল বিনা সারে রাখিয়া উৎপন্ন ফসলের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি সোরার দ্বারা অনেক অধিক ফসল জন্মে, তবে নিকটস্থ জমীতে সোরা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কৃষি কার্য্যে সোরার উপকারিতা সম্বন্ধে বাস্তবিক কাহারও সন্দেহ নাই। ইহার ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ আপত্তি এই যে, সোরা পরিষ্কৃত অবস্থায় বারুদ প্রস্তুতের একটী প্রধান উপাদান। পাছে সোরা সুপ্রাপ্য হইলে প্রচ্ছন্নভাবে লোকে বারুদ প্রস্তুত করিয়া বিদ্রোহাদি অনিষ্ট উপস্থিত করে, এ কারণ সোরা যাহাতে মাহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়, ইহা গভর্ণমেণ্টের এক প্রকার অভিপ্রায় বলিতে হইবে। কিন্তু সোরা প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্বন্ধে যাহাতে এক পক্ষে কৃষি ব্যবসায়িদিগের সুবিধা ও অন্য পক্ষে অনিষ্ট-পাতের অসম্ভাবিতা, উভয়ই সংরক্ষণ হয়, এরূপ সুব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। সোরার সংরক্ষণ ও উৎপাদন সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা গেল।

১। অন্যান্য দেশে সোরার রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফ্রান্স, চীন, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, প্রভৃতি দেশে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য হইতে বারুদ প্রস্তুত করিবার একটী উপাদান চালান হইয়া যাওয়ায় ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। এক্ষণে প্রতি বৎসরে ফ্রান্সে ন্যূনাধিক ৫০,০০০ মণ, ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে ১,৩০,০০০ মণ, চীনে ১,০০০০০ মণ, ও ইংলণ্ডে ২,৩০,০০০ মণ সোরা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়। ১৮৬৭

খ্রীঃ অঃ সোরার রপ্তানির শুল্ক উঠিয়া যায়, কিন্তু শুল্ক উঠিয়া গিয়াও রপ্তানির কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। শুল্ক উঠিয়া না যাইলে বোধ হয় সোরার রপ্তানি ভারতবর্ষ হইতে এত দিন উঠিয়াই যাইত। ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ দক্ষিণ আমেরিকায় অপর্য্যাপ্ত চিলি-সল্টপিটার বা নাইট্রেট্-অফ্-সোডা আবিষ্কৃত হয়। পরে এই পদার্থ হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়ও উদ্ভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত এক্ষণে হঙ্গেরি, স্পেন্ ও পারস্য দেশেও সোরা উৎপন্ন হইতেছে। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ সোরার একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল, তখন সোরার দাম প্রতি মণ ২০৷২৫ টাকা থাকাতে ইহার দ্বারা দেশের লাভ হইত। এক্ষণে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা দ্বারা সোরার দাম মণ প্রতি ৭৷৮ টাকা মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক বারুদ প্রস্তুতের জন্য এক্ষণে ইউরোপে সোরা এত সুপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে সোরার রপ্তানি একবারে বন্ধ হইয়া গেলে ইংলণ্ডেরও বিশেষ ক্ষতি নাই। অবশ্য ভবিষ্যতে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের এমন রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইতে পারে যে, চিলি-সল্টপিটার ইংলণ্ডের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইবে এবং কোন না কোন সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে সোরার রপ্তানি পুনঃ স্থাপন হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

২। পরিষ্কৃত সোরা প্রস্তুত গভর্ণমেণ্টের তোপখানা বা জেল ভিন্ন সর্ব্বস্থানে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে সোরাতে শতকরা ২০ ভাগের অনধিক ইতর পদার্থ মিশ্রিত ও যাহা বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাই পরিষ্কৃত সোরা বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। ঔষধার্থে বা বাজি প্রস্তুতের জন্য যে সোরা আবশ্যক, তাহা অন্যদেশ হইতে অনায়াসে আমদানি হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টও, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, অন্যদেশ হইতে আনীত সোরারদ্বারা বারুদ প্রস্তুত কার্য্য চালাইতে পারেন। এরূপ ব্যবস্থাদ্বারা যে কেবল দেশজাত অপরিষ্কৃত সোরা সমস্তই কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে এমত নহে, ইহার দ্বারা বিদ্রোহাদির আশঙ্কাও অনেক হ্রাস হইবে।

৩। পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রত্যেক জেলে অস্থিচূর্ণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সোরা প্রস্তুতের ভার প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির উপর ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। অনেক মিউনিসিপালিটি নগরের মলমূত্র প্রোথিত করিবার ভার লয়েন। সকল মিউনিসিপালিটির প্রতিই এই ভার অর্পিত হওয়া আবশ্যক। মলমূত্র প্রোথিত করা এবং উহা হইতে স্বাস্থ্যের অপকার না হইয়া বরং কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া সম্বন্ধে সকল মিউনিসিপালিটিরই বিশেষ নিয়মবদ্ধ হইয়া কার্য্যকরা আবশ্যক। এসম্বন্ধে বিশেষ কোনই নিয়ম না থাকাতে যে কত অপচয় ও স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কি নিয়মে মলমূত্রাদি নগরের আবর্জ্জনা প্রোথিত হওয়া আবশ্যক, তাহা নিম্নে বলা গেল।

(ক) মলমূত্র প্রোথিত করিবার জন্য এমন স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, যে স্থানের মৃত্তিকা আঁটিয়াল অর্থাৎ কর্দ্দমময়। আঁটিয়াল মাটিদ্বারা তিনটী সুবিধা আছে। একটী সুবিধা এই যে, আঁটিয়াল মাটী হইতে মলমূত্রের সারবান পদার্থ সকল বৃষ্টিসহযোগে ধৌত হইয়া স্থানান্তরিত হইবার

অল্পই সম্ভাবনা। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, আঁটিয়াল মাটীর মধ্যদিয়া প্রোথিত মলমূত্রের দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া স্বাস্থ্যের কোন হানি করিবে না। বালুকা বা প্রস্তরময় আবরণের মধ্য দিয়া দুর্গন্ধ একবারে বন্ধ করা তাদৃশ সহজ নহে। তৃতীয় সুবিধা এই যে, কর্দ্দমের মধ্যে অধিক পট্যাস (ক্ষার) থাকাতে প্রোথিত পদার্থের যবক্ষারজানের সহিত ঐ ক্ষার মিশ্রিত হইয়া সহজেই সোরা উৎপন্ন হইবে।

(খ) মলমূত্রাদি আবর্জ্জনা প্রোথিত করিবার সময় উহার উপর চূণ ছড়াইয়া দিয়া পরে মাটী চাপা দেওয়া উচিত। চূর্ণ ছড়াইলে চারিটি বিশেষ উপকার হইবে। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যহানি নিবারণ, দ্বিতীয়তঃ কীট নিবারণ, তৃতীয়তঃ সোরা উৎপত্তির সহায়তা, চতুর্থতঃ সারের বহুমূল্যতা সম্পাদন। (১) মলমূত্রের উপর চূণ ছড়াইলে যে দুর্গন্ধনাশ ও স্বাস্থ্যহানি নিবারণের পক্ষে সুবিধা জন্মে, তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। জন্তুদিগের মল পচাইয়া ব্যবহার না করিলে ফসল কীটে নষ্ট করিয়া থাকে। চূণ ব্যবহারের দ্বারা এই অনিষ্ট অনেক নিবারণ হয়। অর্থাৎ, চূণ ব্যবহার না করিলে মল পুতিবার পরে জমী ১ বৎসর কাল আবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু চূণ ব্যবহার করিলে জমী এতদিবস ফেলিয়া রাখিবার আবশ্যকতা নাই। (২) যে সকল উদ্ভিদাণুর (Nitrifying Bacteria) সাহায্যার্থে ক্ষার ও যবক্ষারজান রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা মিলিত হইয়া সোরা উৎপাদন করে, মৃত্তিকার মধ্যে চূণের ভাগ অধিক থাকিলে ঐ সকল উদ্ভিদাণু অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্থলে ত্রিহুতের মৃত্তিকার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রিহুতের যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়, ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকার প্রায় অর্দ্ধেক চূণ। বস্তুতঃ মলমূত্র, আঁটিয়াল মাটী ও চূণ এই তিনের সমবায়ে স্বভাবতঃ সোরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সোরার উৎপত্তি সম্বন্ধে জর্ম্মণ পণ্ডিত ডিব্যারি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"In connection with the forms which change urine into ammoniacal compounds, we may now turn to the consideration of nitrification, the oxidation of compounds of ammonium into nitrates, such as occurs on a large scale in the formation of Saltpetre, in so far as this also is due, according to the observations of Schlossing and Muntz, to the vegetation of small Bacteria. The phenomenon occurs in moist soil penetrated by air and containing compounds of ammonium with small quantities of organic matter and basic substances, for example, salts of calcium. It may be induced artificially in nutrient solutions containing compounds of ammonium, if a small quantity of soil is added at a suitable temperature, the optimum being 37°C, and with constant access of air.

"Thus the formation of Saltpetre is a result of the vegetation of Bacteria; it ceases when these are killed, it also commences when these Bacteria, artificially reared, are placed by themselves without soil in the proper nutrient solution. From this we must conclude that we have here an oxidation produced by the Bacteria which are widely diffused in the superficial layers of a moist soil."—(De Bary on Bacteria, translated by Garnsey and Balfour, 1887, pp. 85, 86).

(৪) চূণ মিশাইবার কারণ মলমূত্রের সারভাগ সমধিক বর্দ্ধিত হয় এবং সকল প্রকার ফসলের পক্ষে ইহা যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, কোন কোন ফসলের পক্ষে মলমূত্র অযোগ্য সার। যাহাদের শুঁটি হয়, (যথা কলাই, সীম ইত্যাদি) এমন ফসলে মলমূত্র সাররূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাদিগের শাখা পল্লব ও পত্রই বাড়িয়া যাইবে, এবং শুঁটি অতি অল্পই ধরিবে। ইক্ষু, বিট, ইত্যাদি ফসল যদি মলমূত্র মাত্র সার দিয়া

জন্মান যায়, তবে তাহাতে মিষ্টতা অল্প হইবে। চুণ ব্যবহার করিলে এই সকল দোষ খণ্ডাইয়া যায়, অথচ মলমূত্রের সারভাগেরও বৃদ্ধি হয়।

(গ) ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে মলমূত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রোথিত করিয়া যাওয়া আবশ্যক। যে যে ক্ষেত্রে প্রোথন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, বর্ষান্তে ঐ সকল ক্ষেত্রে ভাল করিয়া চাষ দিয়া সমস্ত গাছ মারিয়া ফেলিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে চাষ দিতে হইবে। চাষ দিবার উদ্দেশ্য, বায়ু সংযোগ দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়তা করা। পরে যে দিবস বৃষ্টি হইবে, ঐ দিবস জমীটী ভাল করিয়া লেপিতে হইবে। এই লেপন কার্য্য মিউনিসিপালিটির রাস্তা প্রস্তুতের জন্য যে "রোলার" ব্যবহার হয়, তাহা দ্বারাই অনায়াসে হইতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসে জমীটী এইরূপ লেপিয়া পরিষ্কার করিলে, শীঘ্রই দেখা যাইবে, শুভ্রবর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময় এক পদার্থ জমীতে বিস্তৃত হইয়া আছে। ঐ পদার্থই সোরা।

(ঘ) ক্ষেত্র হইতে সোরা উঠাইয়া লইতে লইতে যখন দেখা যাইবে যে, লেপা জমীর উপর শুভ্রবর্ণ লবণবৎ পদার্থ বিস্তৃত হইয়া আছে বলিয়া কোনই চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না, তখন জমী হইতে সোরা উঠান বন্ধ করিয়া দেড় বৎসর কাল পর্য্যন্ত বহুমূল্য ফসল সকল জন্মাইয়া ঐ উর্ব্বরাক্ষেত্রের ব্যবহার করিয়া লওয়া উচিত। ঐ জমীতে ইক্ষু, বেগুণ, লাউ, কুমড়া, আলু, তামাক, অহিফেন, ধান্য, গোধূম ইত্যাদি সুন্দর জন্মে। অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত যদি ক্রমাগত সোরা উঠান চলে তাহার অব্যবহিত পরেই জমীতে ইক্ষু, বেগুণ, লাউ, কুমড়া, শসা, ইত্যাদির বীজ লাগান যাইতে পারে। এই সকল ফসল উঠিয়া গেলে ঐ জমীতেই আলু, তামাক, ধান্য ও গোধূম লাগান যাইতে পারে। পরে তৃতীয় বৎসরে ঐ ক্ষেত্র পুনরায় নগরের মল প্রোথনের জন্য ব্যবহার হইয়া চতুর্থ বৎসরে উহা হইতে আবার সোরা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরই একটী ক্ষেত্রে মল প্রোথন হইবে, একটী ক্ষেত্রে সোরা প্রস্তুত হইবে, এবং অন্য একটী ক্ষেত্রে ফসল হইবে। সোরা প্রস্তুত কেবল অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। ইহার পরে বর্ষা আরম্ভ হইলে সোরা প্রস্তুতের কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ছয় মাস ঐ ক্ষেত্রেও ফসল থাকিবে। এইরূপ প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির মলপ্রোথন ক্ষেত্রগুলি ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য করিলে কৃষিকার্য্যের সমূহ উন্নতি হইবে। মিউনিসিপালিটীর উদারতার উপর নির্ভর করিলে এ কার্য্য কথমই সম্পাদিত হইবে না। যে কার্য্য স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নতির একটী প্রধান ভিত্তি, সে কার্য্য ব্যবস্থা দ্বারা মিউনিসিপালিটীকে করাইয়া লইতে হইবে। আপাততঃ বঙ্গদেশে ৮২, ৮০০ লোক সোরা প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর মধ্যে সোরা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হইলে, আরও কত সহস্র সহস্র লোক এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

সোরা প্রস্তুত করিবার একটী সরল প্রকরণ বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে।

সোরা মিশ্রিত ভূমির উপরিভাগ খোলা দ্বারা চাঁচিয়া ঐ মৃত্তিকা মাটীর কলসীর মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মে রাখিতে হইবে। মাটীর কলসীগুলির নিম্নে এক একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিবে। ছিদ্রের উপরে কলসীর নিম্নভাগে ৫।৬ স্তর খড় দিতে হইবে। খড়ের পরিবর্ত্তে 'ফেল্ট' বা অন্য কোন ছাঁকনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। খড়ের উপরিভাগে কলাপাতা বা অন্য কোন নরম ডাল ও পাতা জ্বালাইয়া যে ক্ষার হইবে, ঐ ক্ষার তিন চারি অঙ্গুলি প্রমাণ রাখিয়া তাহার উপর সোরার মাটী কলসীর উপরিভাগ পর্য্যন্ত ভরিয়া দিতে হইবে। ঐ কলসীর উপর আর একটী কলসী বসাইয়া এই কলসীটী জলপূর্ণ করিতে হইবে। এই কলসীর নিম্নেও একটী নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে, যেন এই ছিদ্র হইতে জল বিন্দু বিন্দু হইয়া নিম্নের কলসীতে পড়িয়া, নিম্নের কলসীর ছিদ্র বহিয়া, তাহার অধঃস্থ একটী পাত্রে আসিয়া পড়ে। এইরূপ জোড়া জোড়া কলসী একটী লম্বা বাঁশের মাচানের উপর পর পর সাজাইয়া রাখিলে,মাচানের নিম্নে একটী মাত্র লম্বা পাত্র রাখিলেই চলিবে, এই পাত্রটী অনতিগভীর অথচ বিস্তৃত এবং ধাতুনির্ম্মিত হইলে ভাল হয়। পাত্রটী বালুকারাশির উপর বসান উচিত। বালুকা রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া পাত্রের জল শুখাইবার অনেক সহায়তা করিবে। যেরূপ পাত্রের কথা বলা হইল এরূপ পাত্রে রৌদ্রের দ্বারাই জল শুখাইয়া গিয়া অল্পদিনের মধ্যে সোরা জমিয়া যাইবে। অগ্নির উপর চোঁয়ান জলটী জ্বাল দিয়া অতিরিক্ত জল অপসারিত করিয়াও সোরা বাহির করিয়া লওয়া যায়। উপরোক্ত প্রকরণে যে সোরা প্রস্তুত হইবে, তাহাতে শতকরা ২০।৩০ ভাগ খাদ মিশ্রিত থাকিবে। কৃষিকার্য্যের জন্য এই খাদের মিশ্রণ দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই খাদের অধিকাংশই নাইট্রেট-অব-সোডা ও সালফেট-অব-সোডা। উভয় পদার্থই মূল্যবান সার। ফলতঃ জল ও বায়ুতে উদ্ভিদের পোষণার্থ যে যে পদার্থ নাই,হাড়ের গুঁড়া ও অপরিষ্কৃত সোরা, এই দুই পদার্থে সেই সমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গের বৈষ্ণব কবি। (৩)

শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ।

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাস এবং ভক্তমাল গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীপ্রেমবিলাস, সারাবলী, কর্ণানন্দরস, মুক্তাচরিত, অনুরাগবল্লী এবং পদ-সমুদ্র গ্রন্থে প্রসঙ্গাধীনে শ্রীগোবিন্দ দাসের কিছু কিছু কাহিনী আছে। বলা বাহুল্য, ঐ সমুদায় গ্রন্থের মধ্যে শ্রীশ্রীজাহ্নবী দেবীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাসের কৃত শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ খানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কোন এক মহাত্মা বৈষ্ণব জগতের উপকারার্থ গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া জগতের মহোপকার করিয়াছেন ; এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যের নিন্দা করিতেছি না। তবে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বলিতেছি, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চয়িত, আমার বাড়ীতে ২০০ শত বর্ষের অধিককালের হস্ত-

লিপি গ্রন্থ যাহা আছে, তাহার সহ মুদ্রাযন্ত্রেরলিখিত গ্রন্থের অনেক স্থানে মিল নাই এবং আখ্যানেও পূর্ণ নাই। তাহা প্রকাশকের ত্রুটি নহে, বোধ হয়, সম্পূর্ণ গ্রন্থ অপ্রাপ্ত স্থলে তিনি যে পর্য্যন্ত পাইয়াছেন ও তাহার ভিতর যাহা আছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি দোষের ভাগী নহেন। আমি সেই প্রাচীন গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া শ্রীগোবিন্দ দাসের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ;—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর। নিবাস পদ্মানদীর উপকূলবর্ত্তী তিলিয়া বুধরী গ্রাম। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ যৎসময়ে আত্মাসমর্পণার্থে শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণ পান্তে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বিদিত আছে ; যথা, প্রেমবিলাসে ;—

> "রামচন্দ্র নাম মোর, অম্বষ্ঠকুলে জন্ম।
> কেবল লালসা প্রভুর, চরণ দর্শন॥
> তিলিয়া বুধরী গ্রামে, জন্ম মোর হয়।
> পিতার নাম চিরঞ্জীব, সেন মহাশয়॥
> কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম, হয় শ্রীগোবিন্দ।
> একোদরে দুই ভাই, পরম স্বচ্ছন্দ॥"

শ্রীরামচন্দ্রের এই পরিচয়ে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি, এবং শ্রীগোবিন্দ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। বস্তুতঃ দেখিতে হইবে সেই চিরঞ্জীব কোন্ চিরঞ্জীব। কারণ, একনাম এক পদবীভুক্ত জগতে বহুনাম থাকিবার সম্ভব। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় ব্যক্ত আছে ;—

> "খণ্ড বাসৌ নরহরি, সহচর্য্যাম্মহত্তরৌ।
> গৌরাঙ্গৈ কান্ত শরণৌ, চিরঞ্জীব সুলোচন॥"

ব্রজের মধুমতি, শ্রীখণ্ডের শ্রীসরকার ঠাকুর মহাশয় যেরূপ সংসার বিরক্ত ছিলেন, তৎশিষ্য চিরঞ্জীব এবং সুলোচন সেইরূপ সংসার বিরক্ত ছিলেন। চিরঞ্জীব সর্ব্বক্ষণ গুরুর নিকট থাকিতেন এবং পরিচর্য্যা করিতেন। বিদিত আছে, এই চিরঞ্জীবের বাস শ্রীখণ্ডে ;—যথা বৈষ্ণবাচার দর্পণে ;—

> "রূপকণ্ঠি সখী এবে, চিরঞ্জীব দাস।
> চৈতন্যের শাখা, শ্রীখণ্ডে যাঁর বাস॥"

প্রেমবিলাস গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাসের বাড়ীও শ্রীখণ্ডে—ইনি সেই সময়ের লোক। এমন কি, ইনি অনেক সময় শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের দক্ষিণে শ্রীচিরঞ্জীব এবং বামভাগে শ্রীসুলোচন ঠাকুরকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, এবং সে প্রসঙ্গ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীগোবিন্দ যে সেই চিরঞ্জীবের পুত্র, তিনি নিজ গ্রন্থের কোনস্থানে একথা লেখেন নাই। ইহাতে কোন কোন প্রবীণ ভক্ত বলেন, তিলিয়া বুধরীগ্রামে কেহ না কেহ চিরঞ্জীব সেন ছিলেন এবং শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীদামোদর কবিরাজ সেই চিরঞ্জীব সেনকে নিজকন্যা দান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ সেই চিরঞ্জীবের পুত্র।

আবার কোন কোন তর্কবাদী বলেন, শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য চিরঞ্জীব শ্রী চৈতন্য দেবের পরিকর, এবং চিহ্নিত ভক্তছিলেন, সে অবস্থায় বৈষ্ণবের ছেলে কখন কি শাক্ত হয় ?

স্বীকার করি, শাক্ত হয় না বটে, কিন্তু শাক্ত হইলে যে,শেষ কুলায় না, শ্রীগোবিন্দই তাঁহার প্রমাণ। এসম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ; তাহাতেই আমাদের বিশ্বাস।

গোবিন্দ প্রথমে শক্তি উপাসক ছিলেন।

যখন তাঁহার বয়স ৪০ চল্লিসের ন্যূন, তখন তিনি গ্রহণী রোগে অত্যন্ত ক্লান্ত হন। এমন কি প্রাণ যায় যায়, মৃত্যু আসন্ন। সে সময় রক্ষাকর্ত্তা কেহই নিকটে ছিল না। রামচন্দ্র তৎসময়ে জাজগ্রামে শ্রীআচার্য্য প্রভুর নিকটে। গোবিন্দ সেই বিপদে পড়িয়া পরমারাধিকা শ্রীঈশ্বরীকে স্মরণ করেন। কিন্তু ভগবতী দয়া করিলেন না। শূন্যবাণী হইল ;—

"গোবিন্দ শরণকর, পরিত্রাণ দাতা।
স্বর্গমর্ত্ত পাতালের,তিঁহহন কর্ত্তা॥" প্রেমবিলাস।
"আকাশ বাণীতে দেবী, কহে বার বার।
গোবিন্দ শরণকর, পাইবে নিস্তার॥" ভক্তমাল।
"হেনকালে অলক্ষ্যে, কহেন ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু, না ঘুচে দুর্গতি॥"
ভক্তিরত্নাকর।

গোবিন্দ সেই আজ্ঞা বলবান করিয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইবার নিমিত্ত সেইক্ষণে (নিজপুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা) শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে পত্র লেখেন। রামচন্দ্র সেই পত্র পাঠে ভ্রাতার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। ভক্তবৎসল শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীগোবিন্দকে কৃপা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বুধরীগ্রামে শুভাগমন করিয়া গোবিন্দকে দর্শন দেন। প্রভুর দর্শন মাত্রে গোবিন্দ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, পশ্চাৎ শ্রীআচার্য্য প্রভুর নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র গ্রহণ আর শ্রীআচার্য্যের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া কঠোর পীড়া হইতে মুক্ত হন। সেইকালে গোবিন্দের বদন হইতে এই নিম্নোক্ত দুইটী পদ স্ফুরিত হয়। যথা ;—

"না দেখ কামুক, না দেখ কামিনী,
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরি শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর,
কহ তহি গোবিন্দদাস॥

বস্তুতঃ এই প্রথম পদে তখনও গোবিন্দের মনের ময়লা ঘুচে নাই। পশ্চাৎ যখন দ্বিতীয় পদে ;—

ভজহুঁরে মন, নন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে।
শীত আতপ, বাত বরিখত, এদিন যামিনী যাগিরে॥
বৃথায় সেবিনু,স্বজন পরিজন, কেবল চপল সুখ লাগিরে।
আপকি দোষে,কতহুঁ ভোগিনু,গোবিন্দ করম অভাগিরে॥
(পদ-সমুদ্র)

যখন এই ভজন বাণী স্ফুরিত হইল, তখনই শ্রীআচার্য্য প্রভু হর্ষানন্দে শ্রীগোবিন্দকে ক্রোড়ে লইয়া প্রেমালিঙ্গন দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিলেন, আর বলিলেন ;—(যথা প্রেম বিলাসে)—

"গৌর প্রিয় বাসুদেব, ঘোষ মহাশয়।
নির্য্যাস বর্ণন কৈল, যতগুণ চয়॥
স্বচ্ছন্দ বর্ণনকর, রাধাকৃষ্ণ লীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, যে ভাবে রচিলা॥"

দাস গোবিন্দ, শ্রীআচার্য্যের সেই আজ্ঞা বলবান করিয়া সেইদিন হইতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আর নির্য্যাস তত্ত্ব অনুসারে সাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন। প্রশ্ন হইতে পারে, নির্য্যাস তত্ত্বের ভিতর আছে কি? সে আবার কোন্ সাধন। উত্তর, নির্য্যাস তত্ত্ব একখানি "কুলার্ণব তন্ত্র", তাহার ভিতর শ্রীগোপী ভজন আছে। অর্থাৎ সে ভজন ব্যতিরেকে ব্রজে স্থান পাইবার অধিকার নাই। সে-ই দাস্যভাব অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা অঙ্গীকার ও নির্জ্জন হইবার সাধন। শ্রীচণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীজয়দেব এবং শ্রীশ্রীরামানন্দ প্রভৃতি সেই সাধন করিয়াছিলেন। এবং সেই সাধনের বলে হৃদয়াকাশে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যে কোন লীলা সন্দর্শন করিতেন, তখনই পদ রচনা করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেন। এই-

জন্য, শ্রীগোবিন্দের প্রতি শ্রীশ্রীআচার্য্যের সেই আজ্ঞা। নির্য্যাস-তত্ত্ব গ্রন্থখানি অতি গুহ্যাতিগুহ্য। সেই তত্ত্বানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি বহুবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রশ্নোত্তরে কঠোর তপস্বী যোগিগণ, মুনিগণ, শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ, প্রভুর যে শ্রীমূর্ত্তি কখনও দর্শন করেন নাই, প্রভু কৃপা করিয়া নিজ রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীরামানন্দকে দেখাইয়াছিলেন; সে কথা পরে বলিব।

একদিন শ্রীআচার্য্য প্রভু ছলনা করিয়া শ্রীগোবিন্দের রস তাৎপর্য্য বোধ হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, যথা প্রেম-বিলাসে ;—

"রামচন্দ্র প্রতি প্রভু এই কথা কয়।
বিদ্যাপতির বর্ণন, যাহাতে আছয়॥
প্রভু কহে সেই পদ, পূর্ণ হয় নাই।
পূর্ণ করি আন গিয়া, গোবিন্দের ঠাঁই॥

"কিন্তু, পদটী কি, তা বলিলেন না?

শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী গোবিন্দকে সেই কথা বলিলেন। গোবিন্দ শ্রবণ মাত্র কালব্যাজ না করিয়া পদ্য গ্রন্থানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে,

"প্রেমকি অঙ্কুর, যাতয়াত ভেল, নাহি ভেল যুগলপলাশা।
প্রতিপদচাঁদ, উদয় যৈছে যামিনী, সুখলব ভৈগেল নৈরাশা॥
সখি হে! অবমোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল, বিছু রাই॥ ধ্রু
কো জানে চাঁদ, চকোরিণীবঞ্চব, মাধবমধুপ সো জান।
অনুভব কানু, পিরিতি অনুমানিয়ে, বিঘটিত বিহিরহুপ্রাণ
পাপ পরাণ, আন নাহি জানত, কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব!

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর বিপাকে পড়িয়া "নিকরুণ মাধব" এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া শেষ চরণ পূর্ণ করেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বচরণ "কানুকানু করি ঝুর" ইহার সহিত শেষ চরণ মিল করিবার নিমিত্ত নিকরুণ মাধব, এই শব্দের পরেই "গোবিন্দ দাস রসপুর" এই শব্দ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু তদ্দ্বারায় বুঝিলেন, গোবিন্দের রস তাৎপর্য্য বোধ হইয়াছে। ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া সেইদিনে গোবিন্দকে কবিরাজ উপাধি দান করেন, এবং গোবিন্দ সেইদিন হইতে কবিরাজ নামে অভিহিত হন্। আবার অন্যদিন, শ্রীআচার্য্য প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, গোবিন্দ! অনুপ্রাসযুক্ত দ্রুতগামী ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের রূপের পদ শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। গোবিন্দ, প্রভুর এই ঈঙ্গিত মাত্রই তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে ;—

"মুদিত মরকত, মধুর মূরতি, মুগধ মোহন ছাঁদ।
মল্লিকা মালতি, মাগে মধুব্রত, মধুপ মনপথ ফাঁদ॥
শ্যাম সুন্দর, সুঘড় শেখর, শরদ শশধর হাস ;
সঙ্গে সখাচয়, সুবেশ সমারস, সদত সুখময় ভাষ॥
চিক্কণ চিকুর, চিকুরে চুম্বিত, চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনি, চিত চৌরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরচনা, গন্ধপরভিত ভাষ।
গোপ গোপা, গুণগুণ গায়ত, কহতহি গোবিন্দদাস॥"
পদসমুদ্র।

এই পদটী রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবা মাত্রই প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, গোবিন্দ! শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার এই তোমার উপযুক্ত সময়। অতএব শ্রীসঙ্গীত মাধব নাটকখানি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর স্বাক্ষর হেতু তাহা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর, কালব্যাজ করিও না। তথায় তোমার সঙ্গীত মাধবের পরীক্ষা হইবে। কবিরাজ সেই আজ্ঞানুসারে, নিজকৃত নাটক সহিতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। প্রেমবিলাসে ব্যক্ত আছে ;—

"কতক সাধন কৈল, কতক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর, করিলা যাপন॥"

শ্রীগোবিন্দ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কৃপালা-

ভের পর পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই কালের মধ্যে তিনি সঙ্গীত-মাধব নাটক, আর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অহোরাত্র ঘটিত লীলা সংক্রান্ত ৫১ পদ এবং শ্রীগৌরলীলার বহু সংখ্যক পদ রচনা ও রসতত্ত্ব সাধনা করিয়াছিলেন।

অন্যপরে কা কথা, শ্রীগোবিন্দের পদ পদাবলী ও গান শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রী-জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীবিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের পদ ছন্দাংশে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন;—

"জয় জয়, কবিরাজ রসময়, শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐ ছন কতি হুঁ, না হেরই ত্রিভুবনে, প্রেম মুরতি পরকাশ॥
যা কর গীতে, সুধারস বরিখয়ে, কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনাইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত, ঐ পুন রসময় গীত॥"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীশ্রীপ্রভু বীরচন্দ্র গোস্বামী, এক সময়ে শ্রীগোবিন্দের কর ধারণ করিয়াছিলেন, যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
বলে তুয়া কাব্যের বালাই লয়ে মরি॥" ইত্যাদি

আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া শ্রীগোবিন্দের গুণগান লিখিতে পারি, সাধ্য কি ?

শ্রীগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে মিথিলা দেশান্তর্গত "বিসখী" গ্রামে শ্রীশ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীশ্রী-মঠ দর্শন করিয়া দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি, ভদ্রস্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতি-কৃত যে সকল প্রাচীন পদ উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন, তৎসমস্ত শ্রীশ্রীপদ-সমুদ্র গ্রন্থ মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

কবিরাজ বুধরী হইতে মধ্যে মধ্যে পক্কপল্লী শ্রীশ্রীরাজা নরসিংহের এবং যশোহরে শ্রীপ্রতাপাদিত্য রাজসভায় গমন করিতেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পদকর্ত্তা শ্রীবসন্তরায়ের সহিত তাঁহার বড়ই সদ্ভাব ছিল। উক্ত রাজসভায় উক্ত পদকর্ত্তাদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ অর্থাৎ পদের তরজা হইত। তর্জা শব্দের অর্থ উত্তর প্রত্যুত্তর স্বরূপ পদদ্বারা বাক্‌বিতণ্ডা। এক পক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীশ্রীরাধার পক্ষ হইয়া পরস্পর পদ সমর্থন করিতেন। সেই সমস্ত পদ শুনিতে বড়ই সুমিষ্ট এবং কৌতুকাবহ। এস্থলে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, বাহুল্যহেতু এবার বিশেষরূপ তাহা হইল না। না লিখিলে নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য হয়, এইজন্য কিছু লিখিতেছি। বসন্তরায় বড়ই অনুসন্ধানী ছিলেন। ভ্রমরে যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, পদ রচনা করিবার কালে সেইরূপ বিলম্বে উত্তর দিতেন। এতন্নিবন্ধন শ্রীগোবিন্দ পরিহাসচ্ছলে আপনার দৈন্যতা দেখাইয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিবার কালে বলিয়াছিলেন;—

"মরকত মঞ্জু, মুকর মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শিখিকুল পুলকিত, কালিন্দী বহয়ে উজান॥

"কুঞ্জে শ্যামর চন্দ্র। ধ্রু"

কামিনী মনহি, মুরতিময় মনসিজ, জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু অনুলেপন, ঘনসার চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত, মালতী মাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার, চরণতল শীতল, জিতল শরদরবিন্দ।
রায় বসন্ত, মধুপ অনুসঙ্গিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

* * * পদসমুদ্র।

কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের জীবনচরিতে শ্রীগোবিন্দ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪২ বৎসর বয়সে গতাসু হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রামাণিক নহে।

কারণ, বৈষ্ণব দিক্‌দর্শিনীতে ব্যক্ত আছে, শ্রীগোবিন্দ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৫৩৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে তিনি সংগোপন হন। তদনুসারে, বৈষ্ণব-জগৎ আজ পর্য্যন্ত সেই শোকের দিন পালন করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যখন তাঁহার বয়স ৪০ চল্লিশের ন্যূন, তখন তাঁহার গ্রহণীর পীড়া হয়, এবং তখন তাঁহার পুত্র দিব্য সিংহের বয়স ১৫ বৎসর। গোবিন্দ পীড়া হইতে শান্তিলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। গ্রন্থেই তাহা ব্যক্ত আছে এবং উপরেও উল্লেখ হইয়াছে। ৪০ চল্লিশ বৎসরের সহিত ৩৬ ছত্রিশ যোগ করিলে যত হয়, তাহাই জীবনের সংখ্যা।

গোবিন্দের সময়ে মিথিলা দেশে গোবিন্দদাস নামে আরো একজন গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি জাতিতে রাজভট্ট। তাঁহার কৃত পদপদাবলী হিন্দিভাষা ও দোহাছন্দের। তাই সে সকল পদ বঙ্গদেশে চলিত নাই। বিশেষতঃ সে সকল সঙ্গীতোপযোগী নহে।

মহাজন কৃত পদ সকল ব্রজভাষা মিশ্রিত। তাই মধুর হইতেও মধুর। প্রভু শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী দ্রাবিড়ী ছিলেন, তথাপি তিনি মাতৃভাষায় পদপদাবলী রচনা করিতেন না। যাহাতে সকল দেশে সমাদর প্রাপ্ত হয়, তিনি তদ্‌ভাবে সঙ্গীতোপযোগী পদ রচনা করিতেন। প্রদর্শনার্থ তাঁহার কৃত ও ভট্ট গোবিন্দ কৃত পদ, পদসমুদ্র হইতে ২টী পদ তুলিয়া দিতেছি, ভক্তগণ পরীক্ষা গ্রহণ ও রসাস্বাদন করিবেন। যথা ;—

"দেখরে সখী, কুঞ্জ নয়ন, কুঞ্জমে বিরাজে হে।
বামেতে কিশোরী গোরী, অলসে অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যাম বয়নচন্দ্রে, মন্দ মন্দ হাস হে॥
অঙ্গে অঙ্গ বাহে ভীড়, পুছত বাত, অতি নিবিড়,
প্রেমতরঙ্গে, চরকি পড়ত, কণ্ডল মধুপ সঙ্গ হে॥
শারী শুক পিক, করত গান, ভঙরা ভঙরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি উঠি বৈঠত, চোর চপল জাত হে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি, ভুলিল মন আপহে।"
শ্রীপদ সমুদ্র।

হরিজী তুম্ সব কত রঙ্গকি রাঙ্গয়া
হাসন্ত হাসায়ত, রোয়ত রোয়ায়ত, চলত কত,
রঙ্গকি ভাঙ্গয়া॥
ভাই ভেদন, পরম কারণ, পাণ্ডুভেদ করায়ে হো।
পাণ্ডু রাখো, কুরুকুলনাশো, দ্রৌপদীকো বস্ত্রা হো॥
কহিকো দিয় রাজপদ, কহিকো দিয় ইন্দ্রপদ, কহিকো
কিও জনম ভিখারী হো॥
কহি ধন লুঠত, কহি ধন বিলায়ত, গোবিন্দদাস চিত
ধন্ধা হো।"

ঐ সময়ে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে আরো একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তিনি, এবং শ্রীবসন্তরায় নামে আর একজন শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। এই বসন্তরায় ব্রাহ্মণ, আর যিনি পদকর্ত্তা বসন্ত, তিনি কায়স্থ অর্থাৎ রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীও অনেক পদ পদাবলী লিখিয়াছিলেন। সে সকল পদ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহারাধন দত্ত।

দেবতা।

খুলিয়া ভকতি-দ্বার, হৃদয়-মন্দিরে।
কি দেবতা অনিবার পূত বাসনায়

পবিত্র সংযত চিত্তে, পবিত্র শরীরে
রমণীরা গুরুমুখে, বল, দীক্ষা চায় ?
কমল-নিন্দিত কার অমল চরণ,

ভাসাতে বাসনা এত মানস সরসে,
তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্রে লভি কার দরশন,
ভাবে চিত ডুবে নিত্য-প্রগাঢ় হরষে ?
কোন্ অমরায় সেই দেবের নিবাস,
যার তরে পাতে চারু স্বর্ণ-সিংহাসন,
কি মহিমা তাঁর, তিনি পূরাণ কি আশ,
কি স্বরগ-ভাবে প্রাণ করেন মগন ?

২

আমি যে গো জ্ঞানহীনা নারী, ক্ষুদ্র অতি,
কল্পনার পক্ষে মোর নাহি এত বল,
যাহে মহাশূন্যে উঠি, ছাড়ি বসুমতী,
পশি সুর-সভা-তলে যথা দেবদল !
সহজে দুর্ব্বল মোর পার্থিব নয়ন,—
লোকে বলে দেবদেহে দামিনী ঝলসে,—
কেমনে তাহার তেজ করি সম্বরণ,
প্রশান্ত ভকতি-নেত্রে দেখিব বল সে ?
কনক-মুরতি গড়ি, কনক-আসনে
না বসাই, তাহে মন বুঝে না আমার,
সুবর্ণ বা মৃৎ-পিণ্ড বুঝিবে কেমনে
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস হৃদে ভকতি-ব্যথার ?
গঙ্গাজল, বিল্বদল, জবা, নাগেশ্বরে,
মিটেনা মুগধ মোর পূজন-বাসনা,
তারা কি পবিত্র এত, এত শোভা ধরে,
প্রাণের ভকতি মত,—অলীক কল্পনা !

৩

কেহ বলে, দেবতার তনু নিরাকার,—
নিরাকারে, ধ্যান, বল, করিব কেমনে ?
আঁধারে প্রেরিয়ে আঁখি দেখি যে আঁধার,
স্তব্ধতা হইতে গীত না ঝরে শ্রবণে !
ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে চিত্তে একাগ্রতা,
সুনিবিড় শূন্য-কোলে মুরছে চেতনা,
শুদ্ধ নিজ রুদ্ধ-বেগে বিফল ব্যগ্রতা,—
পরাণ ব্যাপিয়া শুধু অশক্তি-বেদনা !

৪

না, না,—মোর ইষ্টদেব নহে ত এমন,—
দেখি তাঁরে, পূজি তাঁরে, ভাবি তাঁরে মনে,
বিরাজেন সদা তিনি পাতিয়া আসন,
হৃদয়-মন্দিরে প্রেম-স্বর্ণ-সিংহাসনে !
ভকতির মন্দাকিনী চুমি পাদ তাঁর
বহে যায়, সেঁচি প্রাণ অমৃত-লহরে,
আনন্দ-নন্দন-মাঝে বিহ্বল মন্দার
নিন্দি স্বর্গ-পারিজাতে সুগন্ধ বিতরে !
চেতনা ত তাঁরি ধ্যান,—নিদ্রা, স্বপ্ন তাঁর,—
একে রবিকরচ্ছটা, অন্যে শশী-ভাতি,—
উজ্জ্বল প্রভায় একে দিবস আমার,
ভাসায় সুধায় অন্যে রজতের রাতি !

৫

নহেক দেবতা মোর জড়েতে রচিত,
নহেক তাঁহার তনু অদৃশ্য-আকার,
নহেক সুগন্ধ মাল্য চন্দন-চর্চ্চিত,
তাঁহার অর্চ্চন-তরে ষোড়শোপচার।
জীবন্ত দেবতা মম !—সুন্দর গঠন,
জীবন্ত জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রশান্ত নয়নে ;
জীবন্ত হৃদয় দিয়ে পূজি অনুক্ষণ,
জীবন্ত হৃদয় লভি তার প্রতিদানে !
এ আকার ছাড়ি নাহি চাহি নিরাকারে,
এ প্রতিভা বিনিময়ে, জড়ের গড়ন,
এ পূজা ত্যজি, না চাহি মন্ত্র পড়িবারে,
এ আশীষ বিনা, অন্য প্রার্থনা-পূরণ !

৬

ক্ষম গো, ক্ষম গো, মোরে স্বর্গে দেবগণ,
দীক্ষিতা রমণি, ক্ষম মর্ত্তের মাঝারে,
আমি নারী জ্ঞানহীনা,—জানে শুধু মন,
সখা, পতি, প্রিয়তম, দেব একাধারে !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

তত্ত্ববিচার।

বিগত চৈত্রমাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "তত্ত্ববিচার ও অদ্বৈত মীমাংসা" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের সহিত এই কথা ছিল যে, ইহা নব্যভারতে প্রকাশ পাইলে আমরা অবকাশ মতে তাহার সমালোচনা করিব। অদ্য আমরা সেই কথা অনুসারে উক্ত প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। আত্মতত্ত্ব।—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিহারী বাবু এই বলেন যে, "ইহা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের ন্যায় জানা যায় না। কারণ আমি যাহা জানি, তাহা আমি নহি, তাহার বিজ্ঞাতা আমি।" অতএব বিহারীবাবুর মতে আমি নিজে অনুসন্ধানকারী হইয়াছি বলিয়াই আপনাকে জানিতে পারিতেছি না; পরন্তু যদি আমি বিজ্ঞাতা না হইয়া বিজ্ঞেয় হইতাম, তবে আমি অবশ্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিতাম। এখন মনে কর, কোন্ ব্যক্তি আমার "আত্মতত্ত্ব" অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এস্থলে আমি বিজ্ঞাতা নহি, কিন্তু বিজ্ঞেয় মাত্র। তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি আমার আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না কেন? এস্থলে পাঠক বলিতে পারেন যে, "আত্মতত্ত্ব" শব্দ, স্পর্শাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে বলিয়াই এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের "আত্মতত্ত্ব" সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহা হইলে, বিহারীবাবুর যুক্তি ত্যাগ করিয়া অন্য এক যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। এখন স্বীকার করা যাউক যে, "আত্মতত্ত্ব" ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও দর্শনশাস্ত্রের আরও দুইটী প্রমাণ আছে, যাহা অনুসরণ করিয়া "আত্মতত্ত্ব" নিরূপিত হইতে পারিবে। সেই দুইটী প্রমাণের নাম, অনুমান এবং উপমান। বিহারীবাবু দর্শনশাস্ত্রের এই সকল প্রমাণ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে "আত্মতত্ত্ব" নিরূপিত হইতে পারে, এমন কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে আত্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণের উপায় অন্য প্রকার। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে এই লিখিতে দেখা যায় যে, "উল্লিখিত বিষয়ের (সম্ভবতঃ আমি আছি, এই জ্ঞানের) মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলে আত্মজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধন সাপেক্ষ। নিষ্পাপ জনগণ তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎ লাভ করে। লাভ করিয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হন।" আমরা বিহারী বাবুর এই বাক্য পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার মতে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধন দ্বারা জন্মে। সাধন কাহাকে বলে? নিষ্পাপ মনুষ্যগণ তত্ত্ব বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার অর্থ কি? আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে অনাময় পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনাময় পদ কিরূপ পদার্থ?

২। জগৎতত্ত্ব—বিহারীবাবুর মতে জগতের পদার্থ দুই প্রকার। বিজ্ঞাতা এবং বিজ্ঞেয়। তন্মধ্যে বিজ্ঞেয় পদার্থই আমরা জানিতে পারি। তাহা আবার পাঁচ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ। তিনি বলেন যে—"আমি একটী বৃক্ষ দেখিতেছি। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বৃক্ষ হইতে আলোক আসিয়া চক্ষুতে প্রতিফলিত হইতেছে ও শিরায় এক প্র-

কার অবস্থা উৎপাদন করিতেছে। সেই অবস্থার উপস্থিতি বশতঃ মস্তিষ্কে বৃক্ষের রূপ জ্ঞান হইতেছে। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি শিরার অবস্থা বিশেষ মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তবে শিরায় বা তজ্জনিত মস্তিষ্কের অবস্থারই জ্ঞান জন্মিবে; বৃক্ষ জ্ঞান জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না।"

এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, বিহারীবাবু উপরোক্ত বাক্যে কয়েকটী দার্শনিক শব্দের এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ বিশ্বাসের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু দর্শনজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করেন নাই? রূপ, রস আদি, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের কথা, আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা নহে। প্রাচীন দর্শনমতে বৃক্ষাদির যে রূপ দেখা যায়, তাহা বৃক্ষাদি হইতে প্রক্ষিপ্ত আলোকের ক্রিয়ানুভূতি। শিরায় একপ্রকার অবস্থা হওয়াতেই বৃক্ষের রূপ জ্ঞান জন্মে, যদি এই কথাই সাধারণ বিশ্বাস হয়, তবে ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানের কথা নহে। আধুনিক বিজ্ঞান মতে বৃক্ষের রূপ-জ্ঞান মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় না; কিন্তু বাস্তবিক মস্তিষ্কের মধ্যস্থ এমন উৎপন্ন ক্রিয়ার অনুভূতি, বৃক্ষ আলোক প্রতিক্ষেপণ করিয়া উৎপাদন করে। অতএব দর্শনশাস্ত্র মতে যাহাকে বৃক্ষের রূপ বলে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানমতে বৃক্ষের কোনও অবয়ব বা অংশ নহে; তাহা বৃক্ষের আলোক প্রভাবে উৎপন্ন ক্রিয়ার জ্ঞান মাত্র। এরূপ অবস্থায় বৃক্ষের রূপজ্ঞান উৎপন্ন হইতে হইলে দুইটী কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক; একটী ক্রিয়াকারী বৃক্ষ এবং অপরটী ক্রিয়ানুভাবক ব্যক্তি। যদি এই দুই কারণের কোনও একটীর অভাব হয়, তবে আর প্রকৃত বৃক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বৃক্ষের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তবে যেরূপ সেই জ্ঞান উপলব্ধিকারী ব্যক্তির বিদ্যমানতা বুঝা যায়, সেইরূপ, উক্ত জ্ঞান উৎপাদক ক্রিয়াকারী বস্তুও বিদ্যমান আছে, বুঝা যাইবে।

অপর বিহারী বাবু বলেন যে "যখন বৃক্ষজ্ঞান উদিত হয়, তখন অন্য জ্ঞান থাকে না। অহং জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়।" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, একাধিক বিষয়ের জ্ঞান এক সঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে বিহারী বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা এই যে "পারিলাম না" লিখিতেছিলাম, এসময়েই যে কেবল "পারিলাম না" লিখার কাগজ অংশ দেখিয়াছিলাম, এমন নহে, তৎসঙ্গে কাগজ খানির অবশিষ্ট অংশ এবং এমন কি, আমাদের হস্তস্থিত কলমটী, হস্তাঙ্গুলি, দক্ষিণ হস্তের নিকটস্থিত দোয়াত এবং বাম হস্তের নিকটস্থিত নব্যভারত খণ্ডও দেখিতেছিলাম। অতএব আমরা একই সময়ে একখণ্ড কাগজ, ৫টী অঙ্গুলি, একটি কলম, একটী দোয়াত এবং একখানি বহি একুনে ৬টী দ্রব্য দেখিয়াছিলাম। তবে এই সকল দ্রব্যের দর্শন মধ্যে ইতর বিশেষ ছিল, আমরা "পারিলাম না" লিখার স্থান যত স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম, অন্য বস্তুগুলি তত পরিষ্কার দেখিতেছিলাম না। এস্থলে দর্শনের আরও একটী স্থূল আলোচনা করা যাউক। আমরা এই এখনই একজন ভদ্রলোকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, তাহাতে উহাঁর দুইটী চক্ষু এবং নাসিকা পরিষ্কাররূপে দেখিলাম। ইহাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একাধিক বস্তুর সমবেত দর্শন হইতে পারে। অহংজ্ঞান সম্বন্ধেও তদ্রূপ; তাহা যে কোন দ্রব্য জ্ঞান উৎপত্তির সময়ে "লোপ পাইয়া যায়", ইহা

আমরা স্বীকার করি না। পাঠক ইহা নিজেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন; তবে তাহার পরিষ্কার নির্দ্ধারণ কিছু কঠিন বোধ হইতে পারে।

দ্রব্য জ্ঞান উপলব্ধির সময়ে অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এই কথা স্বীকার করিয়া বিহারী বাবু একটী কূট যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা এই যে, অহংজ্ঞানই দ্রব্য জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "আমিই অর্থাৎ অহং শব্দ লক্ষিত পদার্থই ঘটপটাদি রূপে পরিণত হইতেছি। তদতিরিক্ত অন্য বস্তু নাই।" কিন্তু জগত্তত্ব প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে (পারাগ্রাফে) আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি যে, প্রকৃত বস্তুর জ্ঞানোৎপত্তির কারণ দ্বিবিধ। এক, ক্রিয়াকারী বাহ্যবস্তু এবং অন্য সেই ক্রিয়া-অনুভবকারী ব্যক্তি। অতএব যখন ক্রিয়াকারী বাহ্যবস্তু বিদ্যমান না থাকিলে আমাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে না, তখন অহং পদার্থের অতিরিক্ত যে বাহ্যবস্তু আছে, তাহা নিশ্চিতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বিহারী বাবুর উপরি উক্ত কথা কূট যুক্তি মাত্র। অপর বিহারীবাবু বলেন যে—

"শরীরটীও আমার একটী জ্ঞান বিশেষ; অর্থাৎ আমি যেরূপ ঘটপটাদি রূপে পরিণত হইতেছি, সেইরূপ শরীরও আমার বিবর্ত্ত মাত্র। * * * বাস্তবিক আমি সকল পদার্থের উপাদান। যাহাকে আমরা বস্তু বা পদার্থ বলি, তাহা অহং পদার্থে পরিণত। * * * ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, পটজ্ঞানও জ্ঞান। বস্তুমাত্রই জ্ঞান বিশেষ মাত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সকল বস্তুরই উপাদান অহং পদার্থ, এখন বলিতেছি যে, সকল জ্ঞানই বস্তুর উপাদান; ইহার মীমাংসা এই যে. আমিই জ্ঞানস্বরূপ। * * * সুতরাং অহং পদার্থই জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়। এবং ইনিই বৃহৎ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মবাচ্য।"

অতএব বিহারী বাবুর মতে ঘটপটাদি আমাদের দেহ, আমাদের আত্মা ও জ্ঞান এবং ব্রহ্ম সমুদয়ই এক। তবে যে এই সকলকে নানাপ্রকার দেখিতেছি, ইহার কারণ এই যে, বস্তুমাত্রই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তদনুসারে ব্রহ্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যের জ্ঞান বা আত্মা হইয়াছে; মনুষ্যের আত্মা বা জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যের দেহ এবং ঘটপটাদি হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমার জ্ঞান এবং শরীর যে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘট বা পটের আকার ধারণ করিতে পারে, ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে পাঠক বলিতে পারেন যে, শরীর যে ঘটপটাদি রূপে পরিণত হইতে পারে, ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণই দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, ১০ বৎসর পূর্ব্বে একব্যক্তির মরণ হওয়াতে উহার মৃত দেহ মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা মৃত্তিকার সহিত লীন হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে, সেই মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করিলেই উক্ত ব্যক্তির শরীর ঘটে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলা যাইবে। আমরা এস্থলে স্বীকার করিলাম যে, মানব শরীর ঘটে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে স্বীকার করিলাম যে, উল্লিখিত উদাহরণই মানব শরীর ঘটে পরিবর্ত্তিত হইবার সাক্ষাৎ প্রমাণ। তাহা হইলেও, আমাদের জিজ্ঞাস্যের সম্যক্ উত্তর হইয়াছে, এমন বলা যাইতে পারে না। আমাদের শরীর এবং ঘটপটাদিই যে চিন্ময় এবং ব্রহ্ম, ইহার প্রমাণ কি? এস্থলে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই বিবর্ত্তনের সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ, আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, বিহারী বাবুও তদ্রূপ প্রত্যক্ষবাদী। তিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও প্র-

মাণ স্বীকার করেন না, তবে স্থল বিশেষে অনুমান স্বীকার করেন বটে, কিন্তু যে স্থলে তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত নহে, সেই স্থলে তাহা উহঁার নিকটে স্বীকৃত নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা ৬৩৫ পৃষ্টার দ্বিতীয় স্তম্ভ হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

"অহং পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশালী ব্রহ্ম নামক কোন পদার্থের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করা যায় না। যদি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা পরিজ্ঞাত কি অপরিজ্ঞাত? পরিজ্ঞাত হইলে তাহা অহং পদার্থের একটি বিবর্ত্ত, আর অপরিজ্ঞাত হইলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। যদি বল, অনুমান দ্বারা তাহার বিদ্যমানতা প্রমাণ করা যায়। তাহার উত্তর এই,—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত অনুমান জন্মে না, সুতরাং ব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত হইলে তাহাতে অনুমান প্রমাণের প্রসর নাই।"

অতএব বিহারীবাবু যেরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকাতে অহং পদার্থের অতিরিক্ত ব্রহ্ম পদার্থ স্বীকার করেন না, আমরাও তদ্রূপ সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অহং পদার্থের পরিণতিতে ঘট, পটাদি ও ব্রহ্ম হইতে পারে, একথা স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অদ্বৈত মত আলোচিত ও স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব আমাদের আলোচনা সম্প্রতি এই স্থলেই ক্ষান্ত হইল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য।

উপসংহার।

য়ুরোপীয় সমালোচকেরা কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টনের রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, অনেক শ্রেষ্ঠ কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মিল্টনের মত ওজোগুণসম্পন্ন, মধুর ও সুদূরগত ভাবময়, ঝঙ্কারবিশিষ্ট ছন্দঃ ও ভাষা কাহারও নহে। সেইরূপ আমাদের মাইকেল কবি স্বপ্রবর্ত্তিত ছন্দে যেরূপ কুশলী, সেরূপ অন্য কেহ নহেন—সমগ্র বঙ্গভাষায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। শব্দবিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশল, ছন্দের ঝঙ্কার, ভূরিতা, লালিত্য ও মাধুর্য্য, উপমার সুন্দর ও অলঙ্কার-বিশুদ্ধ প্রয়োগ, ভাষায় ভাবের অনুগামিতা, এই সকল মাইকেলের রচনার সাধারণ গুণ; এবং এই সকলের অনুকরণ অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য। মিল্টনের ভাষায় দুর্ব্বোধ ও দীর্ঘ উপমাপ্রয়োগ একটা প্রধান দোষ। মইকেলের ভাষায় অন্যান্য দোষ সত্ত্বেও এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কতকগুলি উপমার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। এগুলি আমরা বাছিয়া উদ্ধৃত করি নাই, চক্ষের সমক্ষে যাহা সুন্দর ও মৌলিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লইয়াছি।

১। ভ্রাতা মোর কুরুরাজ, ভ্রাতা পাণ্ডুপতি,
একজন জন্মে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব? আর কি কহিব,
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?

২। অপ্সরা-বল্লভ তুমি, নর নারী দাসী,
তা'বলে করোনা ঘৃণা। * *
স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে?

৩। ———কর্ম্মনাশা, পাপ-প্রবাহিনী,
কেমনে পড়িল বহি' জাহ্নবীর জলে?

৪। যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদী তীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে আসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে।

৫। এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে
মোহান্তে। ভাঙ্গিলে পাড়, মলিন সলিলা
হয়ে ক্ষীণ এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে।

৬। দেহ আজ্ঞা নরেশ্বর; সুরপুর ছাড়ি
পড়িও রাজীব পদে, পড়ে বারি ধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদ।

ভাষায় ভাবের অনুগামীতা ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে লক্ষিত হইবে। সিন্ধুনদী তীরে সুন্দরী পুরী অবস্থিত, এই কথা বলিলেই চলিত; কিন্তু তাহাতে পাঠকের মনে পুরীর অবস্থানের ওরূপ সুন্দর ছবি প্রতিবিম্বিত হইত না—তাই দর্পণে সুন্দরীর চন্দ্রবদন দর্শনের উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। সুদূর হইতে পতনের ধারণা পাঠকের মনে দিবার নিমিত্ত, মেঘক্রোড় হইতে বৃষ্টির সমুদ্রে পতন কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে। কি সুন্দর! এইরূপ শত শত দেখাইতে পারি। কালিদাসের স্বদেশীয় বলিয়াই কি মধুসূদন এই অধিকার টুকু লাভ করিয়াছেন? পাঠক মহাশয় এই উপমাগুলির সহিত "স্বর্গবিচ্যুতি"র (বিশেষতঃ দ্বিতীয় সর্গের) দুর্ব্বোধ উপমাগুলি মিলাইয়া দেখিবেন।

রচনার অনেক দোষও আছে, সংক্ষেপে সে গুলির উল্লেখ করিব। মাননীয় কবি হেমবাবু "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচনায় ইহার কতকগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাইকেল রাশি রাশি উপমা স্তূপাকার করেন এবং অনেক সময়ে উপমা উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না। কিন্তু এ দোষ সাধারণতঃ মিল্টনের যত, মাইকেলের তত নহে, এবং মেঘনাদবধে যত, তত বীরাঙ্গনায় নহে। কখনও কখনও অন্বয়ের দোষে—অর্থাৎ কর্ত্তা ক্রিয়াদির পরস্পর দূর ব্যবধানতায়, ভাষা ও ভাবের অস্পষ্টতা এবং অর্থের জটিলতা জন্মে। দ্রৌপদীর পত্র হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

পুজিতাম শিবধনুঃ। কহিতাম সাধে
ঋষিদেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে;
(জানি কামরূপ তুমি) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে;
তা হলে পাইব নাথে, বলিশ্রেষ্ঠ তিনি।

ইহার অর্থ একবারে দুর্ব্বোধ না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন করা আর একটা দোষ। হেমবাবু ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মর্ম্মরিছে' 'স্বনিয়া' প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি, আমাদের ক্ষুদ্রবোধে, শ্রুতিকটু (সুতরাং কাব্যে অনুপযুক্ত) নহে। তবে 'প্রতিবিধিৎসিতে' 'নীরসি' 'রণি' প্রভৃতি বাঙ্গালায় নিতান্ত "গুরুপাক" বোধ হয়। অনেকগুলি বিশেষণও, শুধু প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে নিষ্পাদিত, এরূপ নহে, শ্রুতিকটু ও ব্যবহারদুষ্ট। যেমন স্থানে অস্থানে 'পোড়া' শব্দের এত অধিক প্রয়োগ ভাল শুনায় না। "পূর্ব্ব পুণ্যফলে স্বেচ্ছাচার পুত্র তাঁর", এস্থলে কবি যে অর্থে 'স্বেচ্ছাচার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে। বিশেষতঃ 'পূর্ব্ব পুণ্যফলে' পাঠ করিয়া মনে সহসা বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। তাহা ছাড়া সন্ধিদোষ, বিভক্তিদোষ প্রভৃতিও আছে, কিন্তু এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় লইয়া গোলযোগ করা ভাল মানুষের উচিত কর্ম্ম নহে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

তাহার পর, ছন্দঃ। কবি হেমচন্দ্র যখন সাহসের সহিত এ ছন্দঃপ্রয়োগ সমর্থন

করিয়াছিলেন, সেদিন আর নাই। অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহুল ব্যবহার। মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত এ ছন্দঃ তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যে বিকশিত হইয়া প্রবর্ত্তয়িতার মৌলিক প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। এরূপ স্থলে এ বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র লেখনী চালনা করা নিষ্প্রয়োজন। মাইকেলের রচনাকৌশলে বিরাম-যতি স্থাপনের দোষ সম্বন্ধে হেমবাবু অনেক কথা বলিয়াছেন। "তিলোত্তমা" কবির প্রথম উদ্যম বলিয়া ইহাতে এই দোষ "বীরাঙ্গনা" বা "মেঘনাদবধ" হইতে সমধিক দেখা যায়।

কবি বর্ণনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি দৃষ্টান্তে তাহা প্রতীয়মান হইবে। তবে এখানে একথা বলা উচিত যে, বর্ণনাশক্তি "বীরাঙ্গনা" অপেক্ষা "মেঘনাদবধে" অধিকতর ফুটিয়াছে। শূর্পণখা স্বীয় সুখৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া লক্ষ্মণকে লুব্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছেনঃ—*

"———অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রানীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে শত দাস দাসী।
সুবর্ণ নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা, পদ্মরাগমণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে।
সুকল স্বর-লহরী উথলে চৌদিকে,
দিবানিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে;
সুমধুর-তর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল। শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে;
খেলে উৎস, চলে জল কলকল কলে।"

* শূর্পণখা লঙ্কার শোভাই বর্ণনা করিতেছেন; "মেঘনাদবধেও" লঙ্কাশোভা বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ, "প্রাসাদশিখরে, কনক-উদয়াচলে ভগবান দিনমণি অংশুমালী"র ন্যায় উদিত হইয়া, "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা"র শোভা দেখিতেছেন:—

"————মনোহরা পুরী;
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্প বনমাঝে;
কমল আলয় সরঃ; উৎস রজছটা;
তরুরাজি, ফুলকুল—চক্ষুঃ বিনোদন,
যুবতী যৌবন যথা; হীরা চূড়া শিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি
বিবিধ রতনে পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই সুখের সদন।"

ভাষা ও ভাবের জমাট বাঁধুনিতে ও মাধুর্য্যে দ্বিতীয়টি প্রথম বর্ণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ ভানুমতী স্বপ্নদৃষ্ট রণক্ষেত্র বর্ণনা করিতেছেন:—

"————দেখিনু তরাসে,
যতদূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি।
বহিছে শোণিত স্রোত প্রবাহিনী রূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈল শৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব,
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল-মশানে।"

ইহার সহিত 'মেঘনাদবধে"র রণক্ষেত্রবর্ণনা তুলনা করুন।

"———শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে।
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য; নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি

একত্রে ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গার, পরশু,
স্থানে স্থানে"—ইত্যাদি।

শেষোদ্ধৃত বর্ণনার কাছে বীরাঙ্গনার বর্ণনা দাঁড়াইতে পারে না।

বর্ণনার দোষও আছে—তাহা ভাবের অনুকরণ। "মেঘনাদবধ" অপেক্ষা "বীরাঙ্গনা"র ক্ষুদ্রাকারে এ অনুকরণ-বাহুল্য সহজেই নেত্রগোচর হয়। অবশ্য তিনি সামান্য তস্করের ন্যায় অন্যের ভাবরত্ন অপহরণ করেন নাই, তবে ভাবে এতদূর সাদৃশ্য যে, রচনাকালে কবি উহা স্মরণ করিতেছিলেন বলিয়াই মনে হয়। গঙ্গা শান্তনুর সহিত ভীষ্মের তুলনা করিতেছেন :—

"পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী।"

এ উপমা সুন্দর, কিন্তু মৌলিক নহে। কালিদাসও রঘুর তুলনায় অজের বীর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ন কারণাৎ স্বাদ্বিভেদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।"

জনা পত্রের শেষভাগে বলিতেছে :—

"নরেশ্বর, 'কোথা জনা' বলি যদি ডাক,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি, 'কোথা জনা' বলি।"

বাঙ্গালায় এইরূপ উক্তিতে নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু আমাদের বায়রণের অনুকরণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল—পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

Hark ! To the hurried question of despair,
'Where is my child'—the echo answers,
where ?'

কেহ বলিতে পারেন, একজন যাহা ভাবিয়াছেন, অন্যে তাহা ভাবিতে পাইবেন না, ভাবরাজ্যে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নাই। একথা সত্য, কিন্তু মাইকেল সম্বন্ধে একথা খাটে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। মিল্টনের প্রকৃতিবর্ণনা সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন—"Milton sees Nature through the spectacles of books" অর্থাৎ মিল্টন তদধীত পুস্তকের নেত্রপুটের ভিতর দিয়া প্রকৃতিকে দর্শন করিতেন। ইডেন উদ্যান বর্ণনায় কবির তাই এনার (Enna) উপত্যকায় প্রসারপাইনের (Proserpine) পুষ্পচয়ন মনে পড়ে, সয়তানের পৃথিবী অভিমুখে বেগোত্থানে সাইয়েনিয়ান (Cyanean) শৈলমালায় আর্গোর (Argo) দশা বা সিলা (Scylla) ও চারিদ্দিদের মধ্যগত রাজা ইউলিসের কথা স্মরণ হয়। সুতরাং সেখানেও বর্ণনাও অনুকৃত কবির সহিত (Virgil ইত্যাদি) প্রায় মিলিয়া যায়। উক্ত সমালোচকেরা এ দোষের সমর্থনে বলেন যে, মিল্টন যখন এই মহাকাব্য রচনা করেন, তখন প্রাচীন ও তদানীন্তন য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ কবিবর্গের কাব্য তাহার সম্যক অধীত ছিল। এই কথা আমাদের কবি সম্বন্ধেও বক্তব্য। "মেঘনাদবধ" ও "বীরাঙ্গনা"র রচয়িতার মত, দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যজ্ঞ বঙ্গকবি এ পর্য্যন্ত কেহ হয় নাই। সুতরাং এ দোষ স্বভাবতঃ তাঁহারও কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ সাদরে প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন—"উঠ প্রিয়ে, কমললোচন মেল, চিরানন্দ মোর" ইত্যাদি উক্তির সহিত, অ্যাডামের ইভকে জাগরণকালীন উক্তি—Awake my fairest, my espoused" ইত্যাদি তুলনা করিলে আমাদের পূর্ব্বের কথা আরও প্রমাণিত হইবে।

অস্থানে, অপাত্রে, আদিরসের অবতারণা সাধারণতঃ মাইকেলের প্রধান দোষ। আমরা শুনিতে পাই, মিল্টন,

সেক্ষপীয়রেও অশ্লীলতা আছে, এজন্য ভারতচন্দ্রাদির অশ্লীলতাও মার্জ্জনীয়। এ-ও কি একটা যুক্তি না কি? প্রথমতঃ, যাহা অশ্লীল – যাহাতে পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে থাকিলেও সমর্থনীয় নহে। তবে পাপের বীভৎস চিত্রে আন্তরিক ঘৃণা ও ভয়ের উৎপত্তি করিয়া পাঠকের মনকে শিক্ষা দেওয়া নাকি কবির উদ্দেশ্য, তাই একটা ফল্‌ষ্টাফ্ বা একটা ইয়াগো বা একটা মেফিস্‌টোফেলিসের চরিত্র-চিত্রণ শুধু ক্ষমার্হ নহে, আবশ্যকীয়ও বটে। কিন্তু সে চরিত্র যদি এরূপ ভাবে চিত্রিত হয় যে, তাহাতে পাপে ঘৃণা হওয়া দূরের কথা, পাপের দিকেই মন আকৃষ্ট হয়, সেস্থলে কবির সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও সে অশ্লীলতা মার্জ্জনীয় নহে। এইজন্য ভারতচন্দ্রাদি, উইকার্লি (Wycherly), জয়দেব প্রভৃতির ও আমাদের মধুসূদন কবির অশ্লীলতা অমার্জ্জনীয়।

আমরা পূর্ব্বে "আদিরস" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, (তাহার কারণ,এই অর্থেই এ শব্দ ভ্রমক্রমে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়) কিন্তু "শৃঙ্গার রস" বলিলেই ঠিক হইত। প্রাচীন কবিরা এই দুই রসের বড় একটা প্রভেদ করিতেন না, কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধান-পরিমাণে ইহাদের মানদণ্ড হয় না! সৃষ্টির প্রথমে, নন্দনকাননে মানবের আদিমাতা ইভ সুপ্তা, ঊষার প্রথম অরুণলেখা আসিয়া তাঁহার কপোলদেশ রঞ্জিত করিতেছে, সপ্তমীর চন্দ্রাকৃতি সুগঠন ললাটে স্বেদবিন্দু মুক্তার ন্যায় জমিয়া রহিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী অ্যাডাম প্রিয়ার এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া সাদরে ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিতেছেন। ক্রমে জীবজগৎ জাগ্রত হইল। ইডেন কানন সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গমগণের মধুর কাকলীতে মুখরিত হইল। মানবের আদিপিতা সপ্রেম সম্ভাষণে প্রিয়াকে জাগরিত করিতেছেন। পরে উভয়ে এই সর্ব্বসুখদাতা বিভুগুণগানে প্রবৃত্ত হইতেছেন—ইহাই আদিরসের চিত্র; কে বলিবে, ইহা দূষ্য বা কুরুচিকর? আবার প্রিয়ার মোহস্পর্শে বিহ্বলচেতন হইয়া রাম বলিতেছেন :—

> বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
> প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

বা তপোনিরতা গৌরী স্বীয় প্রণয়দেবতাকে হঠাৎ মূর্ত্তিমান দেখিয়া লজ্জারক্তিমকপোলে মধুরভাবে দণ্ডায়মান আছেন, এ সব আদিরসের চিত্র; কে বলিবে ইহা অশ্লীল? পক্ষান্তরে, বিদ্যা অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে দেখিয়া 'মদনবেদনায়' পাণ্ডুবর্ণা হইতেছেন, ও পরে অসদুপায়ে মিলন হইলে পরাজিত হইবার ছলে মনকে 'আঁখি ঠার' দিয়া সে যুবকের হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছেন, এ চিত্রাঙ্কনে কারিগরের কারিগরি, সদুদ্দেশ্য বা আধ্যাত্মিকতা থাকিলেও, ইহা দোষাবহ। আবার রামচন্দ্রের যোগ্যবংশধর অগ্নিবর্ণ যুবা ও সুন্দরী কর্ত্তৃক অহরহঃ পরিবৃত হইয়া ঘৃণিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন, কালিদাসের এ চিত্রে বিশেষ বাহাদুরী থাকিলেও, ইহা তাঁহার সুরুচির পরিচায়ক অবশ্যই নহে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রথমেই মাইকেল স্পষ্ট রাধাকে বলাইতেছেন :—

> "যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
> মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?"

ভালবাসা কি মদন রাজারই বিধি নাকি? প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে উক্ত উভয় রসে বড় প্রভেদ ছিল না। প্রভেদ ছিল না বটে, পাত্রানৌচিত্য দোষও ছিল না। আমাদের মধুসূদন কবির সে গুণও ছিল। কামদেব উমাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া, মাতার রূপমাধুরীতে পিতার মোহ বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত নহেন! রামচন্দ্রের প্রেতপুরী দর্শনকালে মর্ত্ত্যের ইন্দ্রিয়াসক্ত দুর্ম্মতিদের শাস্তির অশ্লীল চিত্র ভাস্বরবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। হেমবাবু মেঘনাদবধের এ অশ্লীলতা-সমর্থনে যাহাই বলুন, কবির উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, ফল ঠিক বিপরীত হইয়াছে।

বিভিন্ন রসোদ্রেকে কবির নিপুণতার দৃষ্টান্ত "বীরাঙ্গনা"য় অনেক আছে, বাহুল্য

ভয়ে আমরা সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যদিও কাব্যখানি প্রধানতঃ আদিরসঘটিত, তথাপি শকুন্তলা, রুক্মিণী ও দ্রৌপদীর পত্রে আদিরসের, গঙ্গার পত্রে শান্তরসের, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আদিমিশ্রিত রৌদ্ররসের, কৈকেয়ী ও জনার পত্রে ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণরসের বেশ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। জনার পত্রে এই তীব্র ব্যঙ্গরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; "কি লজ্জা, দুঃখের কথা" ইত্যাদি উক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে বলিতেছেন:—

"কেমনে তুমি, মিত্রভাবে
পরশ সে কর যাহা প্রবারের লোহে
লোহিত?"

সে উক্তি প্রথম শ্রেণীর কবির যোগ্য— উহা মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, তাহা ভয়াবহ। পুনশ্চ, অর্জ্জুনের সম্বন্ধে জনা উপহাস করিয়া যাহা বলিতেছেন, বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গরসের সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন:—

"নর-নারায়ণ-জ্ঞানে শুনিনু পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে;—একি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ-অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নর-নারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
একি লীলা খেলা তোর বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে;—আছিল মান, তাও কি নাশিলি?
নর-নারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে,
কি পুরাণে এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে;
ধীবর জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! . . .
. . . . .
. . . . কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা? কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের। তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আমরি কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধিনী,
সমীরণ প্রিয়া, ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোকমাতা রমা কি হে ভ্রষ্টা এ রমণী?"

কাব্যের নায়ক নায়িকাকে যে যে অবস্থায় ফেলিলে যে যে রসের স্ফূর্ত্তি পায়, সেই সেই অবস্থাকে সেই সেই রসের সংস্থান বলে। বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"সংস্থানরসের আকর।" বীরাঙ্গনায় "সংস্থানের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে—বস্তুতঃ সংস্থানের জন্যই কেবল উর্ব্বশী, শূর্পণখা প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা কতক অংশে মার্জ্জনীয়।"

আরও কতকগুলি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই "বীরাঙ্গনা" কাব্যের সহিত কবির অন্য দুইখানি কাব্যের তুলনা হইতে পারে, "তিলোত্তমাসম্ভব" ও "মেঘনাদবধ"। যে প্রতিভার প্রখর কিরণে বঙ্গসাহিত্য এখনও উদ্ভাসিত, সেই প্রতিভার প্রথম অরুণালোক "তিলোত্তমাসম্ভব", "মেঘনাদবধ" সেই প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি ও "বীরাঙ্গনা" সেই অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের শেষ মরীচিমালা। "তিলোত্তমা" কবির প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও, প্রথমোদ্যমের চিহ্ন তাহাতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। "মেঘনাদবধ" কবির অমর প্রতিভার পূর্ণ, প্রকৃষ্ট পরিচয় স্থল। ভাষায়, বর্ণনায় ভাবে, উপমায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, সকল বিষয়েই, কবির অপর কাব্যদ্বয়ের মধ্যে শুধু নয়, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে ইহার সমকক্ষ নাই। "বীরাঙ্গনা"য়ও সেই মহীয়সী প্রতিভার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু মিল্‌টনের Paradise Lost ও Paradise Regained এর মধ্যে যে ব্যবধান, বঙ্গকবির দুই কাব্যেও সেইরূপ। মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ উচ্চদরের ছিল, এই তিনখানি কাব্যরচনার সময়ের অল্পতায় তাহা বুঝা যায়। ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে তিনি অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত উক্ত কাব্যরত্নত্রয় বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছিলেন। মিল্‌টনের উল্লিখিত দুইখানি কাব্য রচনার মধ্যে কয়েক বৎসরের

ব্যবধান ছিল। আবার, দুইখানির শ্রেষ্ঠতর, "স্বর্গবিচ্যুতি"র রচনায় তাঁহার সপ্তবৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের কবি অন্ততঃ এই ক্ষিপ্র কার্য্যকারিতায় সেক্ষপীয়রের তুল্য; যখন এই প্রতিভার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন স্বতঃই আমাদের হৃদয় স্ফীত হয়, বঙ্গভাষায় এরূপ কাব্যরত্নের বিদ্যমানতা দেখিয়া আমাদের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের জাতীয় হীনতা বিস্মৃত হই। কিন্তু আবার যখন গ্রহবৈগুণ্য বা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বশতঃ কবির দুঃখময়, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিষময় ফল স্বরূপ কাব্যের শোচনীয় রুচিদোষ দেখি, তখন আমাদের মর্ম্মাহত হইতে হয়। যে পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, কবি মধুসূদনের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। আর যদি কখনও কালক্রমে আমাদের ভাষা বিদেশীয়ের আলোচনার সামগ্রী হয়, তবে গুণগ্রাহী সমদর্শী সমালোচকেরা অমিত্রচ্ছন্দের রচয়িতাকে, "তিলোত্তমা", "বীরাঙ্গনা "মেঘনাদবধ" প্রণেতাকে, বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালাভাষার দুর্ভাগ্যের ও বাঙ্গালী চরিত্রের গভীর কলঙ্কের কথা এই যে, এত দিন পর্য্যন্ত, বঙ্গের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। অতি আহ্লাদের সংবাদ, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি মাইকেল কবির একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। হায়, কবির জীবন যদি তাঁহার প্রতিভার মত হইত!

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

শেষ

ত্যজি আজ রমণিরে! নারীর ব্যাভার তব
সংস্কার-শৃঙ্খল
শুনিবে কি দুটো' কথা? আঁখিজল মাথাশুধু
নহে হলাহল!
রমণিরে! আছিল যে দ্বাদশ আদিত্য সম
অনলের ভয়
নিভিয়াছে আজি তাহা, নীরবে দগধ করি
পুরুষ হৃদয়।
মেদিনীর গর্ভতলে, আঁখির অতীত যথা
দীপ্ত হুতাশন
জ্বলিত হৃদয়ে শুধু, দেখেনিত কভু তারে
ও তব নয়ন!
বুঝেছিলে তবু বুঝি, রমণী-সুলভ জ্ঞানে
দাবানল ময়
পুরুষ হৃদয় মোর; তাইলো আসিতে কাছে
কাঁপিত হৃদয়।
নাহি সে উষ্ণতা বালা, নাহি সে প্রদাহ আর
সে জ্বল
হয়েছে তুষার আজ; হৃদয়-ইন্ধনে ভস্ম
করেছে অনল।
তাই আজ রমণিরে! ত্যজিয়া পুরুষ-ভীতি
শুন দুটো' কথা

ফিরাই ও আঁখিপরে, জনম জনম তরে
পাও যদি ব্যথা।
প্রিয়তমে! এ জগতে, রমণী-পুরুষ-ভেদ
মোহের স্বপন
মলিন বাসনা হায়, করেছে দেখলো চাহি
(এ) প্রভেদ বপন।
এক শক্তি রমণিরে, বিশ্ব চরাচর গ্রাসি
আপনাতে বাস
অনন্ত এ বিশ্বস্রোত কাল, দেশ, যত কিছু
তাহারি বিকাশ।
সেই এক বিশ্বরূপ আপনাতে আপনারে
দেখিয়া বিস্মিত
হয়েছিল আত্মহারা; এক ভেঙ্গে তাই পুনঃ
যুগলে মিলিত।
আধেক রমণীরূপে, আধেক পুরুষ আর,
ভুলেছে আপন।
অপূর্ণ আধেক তাই, আধেকেরে খোঁজে হতে'
একেতে মিলন।
শরীর সে আধেকের মোহের বন্ধন দৃঢ়
বাসনার ভুমি
ভেঙ্গে ফেলে সংস্কারের, দারুণ কুহক-জাল
(দেখ) সূক্ষ্ম "আমি তুমি।"

সংস্কারের বর্ণমালা, রচিয়া নূতন ভাষা,
শিখায়েছে নীতি
আত্মার বিস্তার ভুলি, হয়েছে রমণী তব,
(তাই) এ পুরুষ ভীতি।
বুঝনা রমণি তুমি, আধেকের মহাতৃষা
মহা অভিযান ;
ভেঙ্গে দেহ-বেলা ভূমি, আর আধেকের তরে
এক মহাগান।
রমণিরে ! ক্ষুদ্র এই, আঁখি যবে তব পানে
হইয়ে বিভল,
চাহিয়া মূরছা যায় ; নড়িতে পারে না যবে
নিস্পন্দ, নিচল ;
বুঝনা রমণী ওরে, স্থূলেতে হইয়ে হারা
অর্দ্ধ মহাপ্রাণ
দেহের শাসন টুটি, আধেকেরে করে সেথা
আঁখিতে আহ্বান !
তাই লো ভ্রুকুটি আসি জ্যোছনা সাগরে অই
ঢালেলো কালিমা ;
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাই বলে "নহে দেবী-মূর্ত্তি
মানবী-প্রতিমা।"
সংসারের বিদ্যালয়ে, নীতির বিঘত-মেয়
লভিয়াছ জ্ঞান
কেমনে বুঝিবে তুমি, নিয়মে আবদ্ধ নহে
এই মহা প্রাণ।
সংস্কারে হারায়ে নিজ, ভুলেছ, ভুলেছ হায়
ত্রিদিবের নীতি ;
সংসারের কোলাহলে, ফেলেছ হারায়ে বিশ্ব
সম্মিলন গীতি।
তাই বুঝ নাই মোরে, ফিরায়েছ আঁখি তাই
এজনমের তরে ;

তাই এ অনঙ্গভয়ে, আপনারে রাখ সদা
দূর হতে দূরে।
দেখাও পশ্চাৎ তবে, দিইনি, দিবনা বাধা
চাহিব না কিছু,
এ মহা প্রয়াণে কভু ফিরাও নয়ন যদি
পাবে পিছু পিছু।
সংসার ভাষায় গাঁথি, কভু ত কহিনি কিছু
কিছিল হৃদয়ে
তবুও কি জানি ভেবে, সরিতেছ দূরে, দূরে
কতই সভয়ে।
ছি ছি হায় রমণিরে, কি বুঝিতে কি বুঝিলে ?
দুঃখ কব' কায় !
কভু ও পেয়েছ কিলো, উন্মত্ত আঁখিতে মোর
বাসনার ছায় ?
স্পর্শে নাই এ হৃদয়ে, বাসনার ছায়া কভু
পৃথিবীর আশা,
কি কাজ বলিয়ে আর বুঝিবে না আজি মোর
আত্মঘাতী তৃষা।
যাও তবে চলে' যাও, আপন অভীষ্ট-পথে,—
ফিরাও নয়ন।
মনে রেখ রমণিরে ! এই শুধু নহে শেষ
মানব জীবন।
জীবনের মহা যাত্রা, চলিবে অনন্ত কাল ;
অনন্ত প্রয়াণ,
সে মহা প্রয়াণে গাবে, রমণী পুরুষ সবে
এক মহা গান।
সেই পথে চারুবালা, একদিন "কই" বলি
ফিরাবে নয়ন,
সেই সূক্ষ্ম দেহে মিশি, "প্রাণাধিক" "প্রাণ-
নাথ" হবে উচ্চারণ।
শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। কুরুক্ষেত্র।—বাবু নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র অক্ষয়কীর্ত্তি। মধুসূদনের মেঘনাদ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার আর নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র বঙ্গসাহিত্যের শিরোভূষণ। এই তিনখানি কাব্য যদি একদা যন্ত্র হইতে বাহির হইত এবং এক সময়ে পাঠ করিতাম, তবে বলিতে পারিতাম, কোন্ খানি শ্রেষ্ঠ আসনের যোগ্য। কুরুক্ষেত্রের নবীনত্ব অপসারিত হইলে, এই বিচারের সময় উপস্থিত হইবে। তাহা ভবিষ্যৎ পুরুষের হাতে।

যে কবি একদিন জাতীয় পতনের মর্ম্মান্তিক যাতনায় তারস্বরে গাহিয়াছিলেন :—

"কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
ভারতে আসিবে ঘোর বিষাদ রজনী।"

সেই কবিই আজ জাতীয়পতনের প্রকৃত ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত। বুঝি, তিনি বুঝিয়াছেন, ভারতবাসীর পতন ত পলাশীর ক্ষেত্রে নহে, কুরুক্ষেত্রে। কবির স্বাভাবিকী প্রতিভা তাঁহাকে জীবনের চরমলক্ষ্য স্থলে লইয়া গিয়াছিল—যাহা তিনি এতদিন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার নিকট তাহাকে লইয়া গিয়াছিল—জাতীয় পতনের প্রকৃত কারণক্ষেত্র তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল—কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া কি মহাস্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনিও বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ; আমরা ত বুঝি নাই। যাহা কিছু ভারতবাসীর, তাহার সম্পূর্ণ ভস্ম কুরুক্ষেত্রে,যাহা কিছু ভারতবাসীর শাস্ত্র, তাহার সম্পূর্ণ ভস্ম মহাভারতে। ইহার এক ভস্মস্তূপ আশ্রয়ে অন্য ভস্মস্তূপ হইতে রত্নোদ্ধার "কুরুক্ষেত্রের" উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা, বলিতে পারিনা, তবে তিনি যেখানেই হাত দিয়াছেন, সেইখানেই ভস্মস্তূপে কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস যাহাই হউক, নবীন বাবুর বিশ্বাস, তিনি রত্নোদ্ধার করিয়াছেন। তাহার আনন্দের সীমা নাই। পলাশীর ক্ষেত্রে বসিয়া জাতীয়পতনের দিনে "কোথা যাও ফিরে চাও" বলিয়া তিনি যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বসাক্ষী জগচ্চক্ষু দিবাকরকে অস্তগমন হইতে "বারেক" ফিরিতে বলিয়াছিলেন; কুরুক্ষেত্রের মহাপতনে তাঁহার আর সেরূপ বিষাদ নাই। তিনি কুরুক্ষেত্রের অনন্ত চিতানলের ভিতর হইতে উদীয়মান সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। সে স্থল কি মহা কবিত্বে পরিপূর্ণ। যে অবিশ্বাসী, তাহারও সেস্থলে বিশ্বাস অনিবার্য্য।

কুরুক্ষেত্র, অভিমন্যুবধ কাব্য। অভিমন্যু নিহত হইয়াছেন, তাহার পর কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অনন্ত চিতা জলিয়া উঠিয়াছে—কতক নিবিয়াছে, কতক জ্বলিতেছে। উত্তরা গর্ভবতী। পতির চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া কিছুকালের জন্য জীবন ধারণে সংকল্প; এজন্য তিনি সেই মহাশ্মশানে উপস্থিত। ভদ্রার্জ্জুনও মানবাতীত ধৈর্য্যের সহিত অভিমন্যুর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। অনার্য্যোদ্ধারব্রতা শৈলজা নিকটবর্ত্তিনী। অদূরে অশোক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ এই মহাশোক-ছবি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অভিমন্যুর চিতা যেন প্রজ্বলিত হইল,—

——নারায়ণ স্বপনে যেন নিদ্রিত
দেখিলেন কুমারের চিতাপুনঃ প্রজ্জ্বলিত
হইল, ছুঁইল অগ্নি প্রভাত নভঃমণ্ডল,
ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত চিতানল।
উঠিল সে অগ্নিহতে ত্রিভুবনআলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি--মাতা রাজরাজেশ্বরী
নবধর্ম্ম বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে, বেদিবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহা মূর্ত্তি; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম্ম মল; রক্তবর্ণ কলেবর;
অর্দ্ধেন্দু কীরিট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
—সমরাস্ত্র,শান্তনাস্ত্র—হইয়াছে শোভমান
চারিভুজে চারিদিকে,ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান!
ধর্ম্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা ছবি
ভাসিল ভারতাকাশে যেন শান্ত বালরবি।

অভিমন্যুর চিতানলে কৃষ্ণ সেই অর্দ্ধেন্দু কীরিট-শোভিত শিরঃশালিনী—শিরাস অনার্য্য চিহ্ন ধারিণী আনন্দময়ী জননী ভারতসম্রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন;—

পূর্ণ জীবনের ব্রত; মন প্রাণ উদ্বেলিত
"মামা" বলি নারায়ণ আনন্দাশ্রু বিগলিত,
পড়িলেন ধরাতলে মানব প্রেমে মূর্চ্ছিত
কুমারের চিতাপার্শ্বে, পূর্ব্বাকাশ বিভাসিত
হইল প্রভাতালোকে, বাজিয়া উঠিল ধীরে
অনন্ত মঙ্গল বাদ্য, প্লাবিয়া আনন্দ নীরে
কুরুক্ষেত্র সুমঙ্গল উঠিল আনন্দগীত
ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ্য—করি উচ্চ নিনাদিত।"

ভরসা করি,পাঠকেরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। শেষাধ্যায়ের শেষাংশের কতকাংশই আমরা সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার কারণ এই যে, এই স্থলেই কাব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত। উদ্দেশ্যটা আগেই জানা ভাল। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠের "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের মর্ম্ম মনে রাখিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র ও গীতাবিবৃতি পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিলেন,নবীন বাবুর উদ্দেশ্যে আর বিশেষ কিছু নবীনত্ব নাই। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম বাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের জীবন-ব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। আমরা মূর্খ পাঠক, কথাটা ভাল বুঝি বা না বুঝি, এজন্য তাঁহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন, "Moral and political regeneration." আমরা যখন 'কুরুক্ষেত্র' প্রথমবার পড়িয়া শেষ করিলাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম, না নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না। আবার পড়িলাম, তখন দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গ ভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাদে পড়িয়া যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী।

অভিমন্যুর চিতানলে সমগ্র ভারতের যে একতা-মূর্ত্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে, কৃষ্ণ যাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন, ইতিহাস-পাঠক দেখিবেন যে, যে শোক ও মন্যু বক্ষে লইয়া বুদ্ধদেব ভারতে নবধর্ম্ম প্রকটিত করিয়াছিলেন, এই একতামূর্ত্তি ইতিহাসতঃ কেবল তাহারই ফল। ফলতঃ নবহিন্দুধর্ম্ম বা উপবর্ণ ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী; কৃষ্ণ যদি এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন, কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই। কবি-প্রতিভা যদি ইতিহাসের মৌলিকসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলে, সত্য যদি বিপর্য্যস্ত করে, তৎসৃষ্ট পদার্থে মাদকতা থাকুক, অমৃত নাই। নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্র কতক পরিমাণে এই ধরণের হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রস্তাবে কাব্যের স্বর্গানুক্রমিক সমালোচনা করিতে বাসনা থাকিল।

২। সাথী।—বালক বালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ৸৵০, ১৭ নং মধুসূদন গুপ্তের লেন, বহুবাজার, হইতে প্রকাশিত। আমরা ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। সখা যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, সাথীও সেই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সখার কোন কোন উপযুক্ত লেখকই ইহার প্রবর্ত্তক। কাগজ উত্তম,ছাপা পরিষ্কার, চিত্রগুলি পরিপাটী ও লেখা সরল এবং মধুর। সখা অপেক্ষা কোন অংশে সাথী নিকৃষ্ট নহে,আমাদের নিকট বরং উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। সাথী স্থায়ী হইলে, দেশের খুব উপকার হইবে। কিন্তু দেশের লোক চেষ্টা না করিলে, মুক্তহস্ত না হইলে, এই বহুব্যয়-সাধ্য পত্রিকা দীর্ঘকাল চলিবে না। বালক বালিকাদের উন্নতির চিন্তা যাহাদিগের হৃদয় বিলোড়িত করে, তাঁহারা সাথীর গ্রাহক হইলে তাঁহাদিগের ছেলে মেয়েদিগেরও উপকার হইবে, পত্রিকাখানিও স্থায়ী হইবে।

৩। হিতবাদী।—সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র, ৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি, এজেন্টস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲। হিতবাদীর লেখা সরল, বিষয়-নির্ব্বাচন উৎকৃষ্ট, রুচি মার্জ্জিত। বহু কৃতবিদ্য লোকের দ্বারা এই পত্রিকাখানি পরিচালিত হইতেছে। দেশের প্রচলিত কোন কোন পত্রিকা যেরূপ ব্যক্তিগত নিন্দা লইয়া থাকিতে ভালবাসে, হিতবাদী সেরূপ নহে। দেশের কোন কোন পত্রিকা যেরূপ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধী, হিতবাদী সেরূপ পত্রিকা নহে। হিতবাদীর আমরা খুব পক্ষপাতী, ইহার দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করি। তবে "সাহিত্য সংবাদে" শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সম্বন্ধে যেরূপ লেখা হইয়াছিল, আমরা একরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব উদ্গীরিত হইতে দেখিলে খুব দুঃখিত হই। হারাণ বাবু নূতন পুস্তক লিখিতেছেন, ইহাতে তিনি কি অন্যায় করিতেছেন, জানি না। বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার কোন কোন পুস্তকের প্রশংসা করিয়াই বা যে কি অন্যায় করিয়াছেন, তাহাও বুঝি না। এরূপ শ্লেষোক্তি হিতবাদীর যোগ্য নহে। হিতবাদীকে আমরা সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ দেখিতে চাই।

একাদশ খণ্ড—অষ্টম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। অগ্রহায়ণ সংখ্যা নব্যভারত প্রকাশিত হইল। কার্ত্তিক মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা এই সংখ্যার সংলগ্ন হইল।

২। বাবু বনমালী ব্রহ্মদাস এবং বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেন্ট হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। আমার স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া এবং টাকার পরিমাণ চেকের মুড়িতে লিখিয়া দিয়া গ্রাহকগণ টাকা দিবেন। বিনা রসিদে টাকা দিলে আমরা দায়ী হইব না।

ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

ফরিদপুরের নানা স্থানে এবার দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠার প্রকোপ হওয়ায় বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল! জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ ও বেল সাহেব মহোদয়গণের চেষ্টায় দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্ট ১৩০০০৲ টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ওলাউঠার চিকিৎসার জন্যও পাংশাথানায় দুইজন ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা প্রচুর নহে বলিয়া ফরিদপুর সুহৃদ সভা এপর্য্যন্ত ৪৭টী গ্রামে ওলাউঠার ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন। এজন্য সভার অনেক ঋণ হইয়াছে। এখনও বহু স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে। বঙ্গদেশের কতিপয় মহাশয় ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ সাহায্য করিয়া সভাকে প্রকাশ করিব। বিধাতা ইঁহাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন। যিনি যাহা প্রদান করিবেন, সাদরে গৃহীত হইবে। আমরা পরদুঃখকাতর, গরীবের মা বাপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কিছু কিছু ভিক্ষা করিতেছি।

দাতাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী রায়, জমীদার পাবনা ৫০৲, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী শেরপুর জমীদার, সেরপুর ২৫৲, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ দ্বারা সংগৃহীত এবং বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত দ্বারা ভদ্রক হইতে প্রেরিত ২১৲, বাবু মহিমচন্দ্র রায়, জমীদার চৌদ্দরশি ১০৲, বাবু রামচরণ পাল, ম্যানেজার চা বাগান, গেতজগুদ ২॥০, অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল হাইকোর্ট ২৲, বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া ২৲, বাবু প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৲, বাবু মতিলাল সিংহ, মুন্সেফ চিকন্দি ২৲। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সভার বার্ষিক চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী,

সম্পাদক, ফঃ, সুঃ সভা।

বঙ্গের বৈষ্ণব কবি। (৪)

শ্রীজ্ঞানদাস।

মহাত্মা জ্ঞানদাস একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত আছে;—

"পীতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

কিন্তু অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের ভিতর এই জ্ঞানদাসের জীবনবৃত্তান্ত নাই। এতদ্দেশে মঙ্গল উপাধিধারী বিস্তর রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের বাস আছে। জ্ঞানদাস বিপ্রকুলে সেই মঙ্গল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে সকলে মঙ্গল ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি, গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী নহেন, পূর্ব্ববর্ত্তী। বিখ্যাত "বাবা আউল মনোহর দাস" এই জ্ঞানদাস মহাত্মার সঙ্গী ও সহাধ্যায়ী ও উভয়েই এক গুরুর শিষ্য ছিলেন। কোন স্থানে কোন আহ্বানে যাইতে হইলে উভয়েই একত্র গমন করিতেন ও একত্র থাকিতেন। খেতুরীর মহোৎসবে উভয়েই একত্র গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম-বিলাসে ব্যক্ত আছে;—

"শ্রীলঃ রঘুপতি, * উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

প্রকৃষ্টরূপ অনুসন্ধানে জ্ঞানদাসের যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহা এই;—আমাদের এখান হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর নামক সপ্তগ্রামে যে কয়েক ঘর গোস্বামীর বাস আছে, তাঁহারা সকলেই মঙ্গল ঠাকুরের বংশ। এই গ্রামে তাঁহাদের শিষ্য থাকায় তাঁহারা মধ্যে মধ্যে এখানে আগমন করেন।

তাঁহাদের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, বীরভূম জেলার অধীন ইন্দানী নামে দেশ, যথায় মহাভারত রচয়িতা মহাত্মা কাশীরাম দাস বাস করিতেন এবং যে স্থানের পূর্ব্ব ৪ ক্রোশ ব্যবধান একচক্রা নগর অর্থাৎ যে নগরে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিত গৃহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের পশ্চিম দুই ক্রোশ ব্যবধান কাঁদড়া ও মাঁদড়া নামে যে দুইটি পল্লী আছে, সেই কাঁদড়া পল্লীতে বহু গোষ্ঠি পূর্ণ ব্রাহ্মণকুলে মঙ্গল বংশে শ্রীজ্ঞানদাসের জন্ম হয়।

জ্ঞানদাস বাল্যকালে শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৌমারে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহ করেন নাই। পশ্চাৎ শ্রীঈশ্বরী কৃপায় জ্ঞানদাসের সমস্ত দায়াদগণ হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামী নামে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া নানা স্থানে বসতি করেন। বস্তুতঃ সকলের মূলগদি কাঁদড়া। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে;—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া গ্রামেতে নাম হয়।
তথায় মঙ্গল, জ্ঞানদাসের আলয়॥"

সেই স্থানে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানদাসের মঠ আছে। বৎসর বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় সেই স্থানে জ্ঞানদাসের মহা মহোৎসব এবং তিন দিন মেলা হয়। জ্ঞানদাস পদ্য রচনায় যেরূপ রসিক নাগর ও গুণের সাগর ছিলেন, তাহাতে তাহার পক্ষে মঙ্গল কি মনোহর উপাধি

---

* এই রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত প্রয়াগধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীচৈ, চ, ম, ১৯

অতি তুচ্ছকথা। বস্তুতঃ উপাধি একটি গৌরবের সম্পত্তি বলিয়া তিনি আচার্য্যের নিকট কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তবে এতদ্দেশে এই এক কথা প্রখ্যাত আছে যে, জ্ঞানদাসের মনোহর সঙ্গীত মনোহর-সাহী কীর্ত্তনের একটী প্রধান অঙ্গ।

জ্ঞানের পদ পদাবলীর অর্থ বড়ই কঠিন। রসিক ভক্তগণ বহুচিন্তা করিয়া পদের তাৎপর্য্য রসাস্বাদন ও অর্থ করিবেন, পদকর্ত্তা এই অভিপ্রায়ে প্রশ্নদূতিকা পদ লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কৃত একটী পদ ভক্তগণকে উপহার দিতেছি।

"সখী হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এচারু পঙ্কজ, নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর, চাঁদের উপরে গজ।
এচারু গজের, উপর শোভিত, যুগল কেশরী রাজ॥
কেশরী উপরে, এ দুই সায়র, সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এদুই তমাল, চারি শাখা আছে ধরি॥
তাহে দেখ সখী, একটী তমাল, নবঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোনার বরণ, শুন লো মরম সখী॥
তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ, এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে, নাহি তার শাখাদল॥
তা'পর এ দুই, কীরের বসতি, তা'পর চকোর চারি।
ত'াপর এ দুই, চাঁদের বসতি, পিবইতে ইহ বারি॥
তা'পর দেখহ, বিধু সে অরুণ, তা'পর ময়ুর অহি।
জ্ঞানদাসে কহে, মরমক বাত, একথা না জানে কহি॥
(পদ সমুদ্র)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ। মধ্যস্থ ২০ বিংশ শশধর অর্থে ২০ বিংশতি নখচন্দ্র। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদে ১০ আর শ্রীরাধার পাদ পদ্মে ১০। গজ অর্থে শুণ্ডাকার উরু। কেশরী উপমা কটিদেশ। সায়র অর্থে উদর। দুইজনার দুই উদর। গিরি অর্থে কুচগিরি। তমাল অর্থে ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল দেহ। চারিশাখা অর্থে চারিবাহু। "নবঘন শ্যাম" শ্রীকৃষ্ণ। "সোনারবর্ণ" শ্রীরাধা, অরুণ বরণ অর্থে "বিম্বম্বি চারি ওষ্ঠ" ফুল অর্থে হাস্য। কীরা অর্থে শুক পাখীর ন্যায় নাসা যুগল, চকোর অর্থে নয়ন। দুই চাঁদ দুই ললাটদেশ। বিধু সে অরুণ অর্থে ললাটে চন্দন ও সিন্দুর। ময়ূর ও অহি অর্থে চূড়া ও বেণী।

এখনকার সময়ে অনেকানেক শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক প্রকার পদ্য লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা আকাশ পাতাল ভাবিয়া কেহ কি এ ভাবের পদ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারেন? না করিয়াছেন? নির্য্যাস তত্ত্ব না জানিলে এ ধরণের পদ সহসা হইবার নহে।

মহাত্মা জ্ঞানদাসের অভিন্নাত্মা যে বাবা মনোহরদাসের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাশ্রম এইখানে। অর্থাৎ এই বদনগঞ্জ গ্রামে অদ্যাপি তাহার সমাধি মঠ আছে। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে মহোৎসব অর্থাৎ বৈষ্ণব সেবা হয়। বাবা মনোহর তেজঃপুঞ্জ সাধক সিদ্ধ মহাপুরুষ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যু তাহার করতলাধীন ছিল। পদসমুদ্র ও নির্য্যাস তত্ত্ব গ্রন্থ তাঁহারই সংগৃহীত। তিনি, বহুশত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের আমল হইতে তত্ত্বাবৎ আমার বাড়ীতে পূজা পাঠ হইতেছে।

নির্য্যাস তত্ত্ব গ্রন্থখানি সংস্কৃত দেবনাগরাক্ষরে লিখিত এবং তাহা প্রকাশের প্রতি একেবারে নিষেধাজ্ঞা। যে হেতু, তাহার শিক্ষা দেয়,এখনকার কালে এমন গুরু নাই। পদসমুদ্র এমন গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইহার ভিতর যাবতীয় মহাজন কৃত পদ আছে, পদ সংখ্যা কিছু কম ১৫০০ হাজার। যাহা কিছু রত্ন, ইহাতেই আছে; তাই ইহার নাম সমুদ্র। যে কিছু রত্নের আবশ্যক হয়,

এই সমুদ্রে মগ্ন হলেই সুলভে পাওয়া যায়। এতৎ গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করা হইলে সহস্রখণ্ড প্রকাশে প্রতি খণ্ডে ৫৲ টাকার অধিক ব্যয় পড়িবে। আমি কাঙ্গাল, তদ্ব্যয়ে আমার সামর্থ্য নাই। তথাপি "কাঙ্গালের উচ্চবাসনা" অনেকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিগাছেন। আমি সেই ভরসায় তাহার প্রকাশ ইচ্ছা করিয়াছি; হায়! এ দীনের প্রতি কৃপা করিয়া কি প্রভু এই ইচ্ছা পূরণ করিবেন? সে দিন কবে হবে! সারাবলী গ্রন্থে ব্যক্ত আছে;—

"আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে, স্বদেশ বিদেশ।"

ইহার আদি নাম মনোহর, চৈতন্য শেষ নাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্য গুরুর নাম বলিয়া ইনি চৈতন্য ডাকে সায় দিতেন না। মনোহর ডাকে সায় দিতেন। বাবা আউলদেব সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন সাধন করিতেন। হস্তে কাঞ্চন বলয়া পরিতেন, কর্ণে কর্ণভূষণ এবং নাসিকায় নাসাভরণ ধারণ করিতেন, মস্তকে খোপা বাঁধিতেন; অঙ্গে অবটন মাখিতেন; বক্ষে কাঁচলী আঁটিতেন, চক্ষে কাজল পরিতেন, ঘাঘরা পরিধান করিতেন, উড়ানিতে অঙ্গ ঢাকিতেন; পায়ে পাঙজোর পরিয়া নৃত্য করিতেন; আর হাতে তালি দিয়া শ্রীশ্রীমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন;—

"শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুবলী, করিলি সকল নাশ।
মোহর মিনতি, না শুনি আরতি, বাজিতে করহ আশ॥
শুন শুনরে ধরম নাশা।
দৈব আরাধিয়া, ও মুখ বাঁধিব, ঘুচাব তোমার আশা॥
আমরা অবলা, সহজে অথলা, দেখিয়া তোমার লোভ।
অলপে অলপে, সকল খাইয়া, জীবনে করহ ক্ষোভ।
এখন আমরা, সতর হইনু, তেজহ সকল আশ।
যাহার যে রীতি, না ছাড়ে কখন, কহে মনোহরদাস॥

ইনি কোন কুলে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন গ্রন্থে তাহা প্রকাশ নাই। এক সময় বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির দেশের গ্রন্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন। উক্ত রাজার অন্তর্দ্ধানের পর আউলিয়া হইয়া প্রকৃতি বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। সেই হইতে তাঁহার আউলিয়া চৈতন্যদাস নাম হয়। তিনি,সাধনবলে ২৫০ শত বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। নানাদেশ ও নানাতীর্থ পর্য্যটনের পর যখন এই স্থান বৃহদরণ্যানী মধ্যে পরিগণিত ছিল, স্থানের নামকরণ ছিল না, তখন জঙ্গলের মধ্যে একটী পত্রের কুটীর বাঁধিয়া থাকিতেন। এখান হইতে বিষ্ণুপুর রাজধানী ১২ ক্রোশ। পশ্চাৎ রাজা বীরহাম্বিরের পুত্র ধীরহাম্বির কর্ত্তৃক এই স্থানের সমস্ত জঙ্গল কর্ত্তন হইয়া জনপদ স্থাপন এবং সেইকালে হরিগঞ্জ নামান্তর বদনগঞ্জ বলিয়া গ্রামের নামকরণ হয়। ২০০ শত বৎসরের অধিককাল হইল, এই স্থান লাট হরিগঞ্জ ওরফে বদনগঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এই স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বণিক ও তন্তুবায় প্রভৃতি নানা জাতির বসতি ছিল। প্রায় সকলেই হরিপরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিন ঘরে ঘরে নাম সংকীর্ত্তন হইত; বাবা আউল দেবের কৃপায় গ্রামে কোন অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারিত না। এখন কাল প্রভাবে গ্রামের আর সে প্রভা নাই। "যদুপতে ক গতা মথুরাপুরী" এখন সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

বাবা আউল দেব সাধনবলে কখনও প্রকট,কখনও অপ্রকট হইতেন ও যখন ইচ্ছা হইত তখনই শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে গমন করিতেন। একদা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে

গমন করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু গোপাল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহ যে কিছু কথোপকথন হয়, তাহা প্রেমবিলাস গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা,—

"মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য, শ্রীচৈতন্য দাস।
আউলিয়া বলিয়া নাম, সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
দেশে হৈতে গেলা তেঁহ, শ্রীবৃন্দাবন।
প্রেমাবেশে স্থানে স্থানে দিয়া দরশন॥
"একদিন শ্রীভট্ট গোস্বামী স্থানে গেলা।
তাঁরে দেখি ভট্ট গোসাঁই, সমাদর কৈলা॥
জিজ্ঞাসিলেন, দেশের, কুশল সমাচার।
আউল বলিল যার যেই ব্যবহার॥"
"বিষ্ণুপুরে মোর ঘরে, হয় বার ক্রোশ।
রাজার রাজ্যে বাস করি, হইয়া সন্তোষ॥
আচার্য্যের সেবক রাজা, বীর হাম্বির।
ব্যাসাচার্য্যাদি, পরম সুধীর॥
সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে।
গ্রাম ভূম বৃত্তি আদি, রাজা যে দিয়াছে॥"
"এই ত ফাল্গুন মাসে, বিবাহ করিলা।
অত্যন্ত যোগ্যতা তার, যতেক কহিলা॥
মৌন হয়ে ভট্ট কিছু, না বলিলা আর।
স্খলৎ পাদ স্খলৎ পাদ, কহে বারবার॥"

শ্রীপাক ভট্ট গোস্বামী আউল দেব প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা অবগত হইয়া মৌনী হইলেন কেন? এবং স্খলৎ পাদ স্খলৎ পাদ বারম্বার এ কথাই বা কেন বলিলেন?

ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীপাদ ভট্ট গোস্বামী যৎকালে শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীভট্টের অন্তঃকরণে এ ধারণা ছিল না যে, আচার্য্য সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু যখন শুনিলেন, তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তখন অমনি অবাক্ ও আশ্চর্য্য হইয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, কি, আচার্য্য স্খলিত-পদ হইয়াছে? স্খলৎ পাদ শব্দের অর্থ, ভাষা কথায় পা হড়কাইয়া যাওয়া।

বাবা আউলের জীবনী ইতি পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০ দ্বিতীয় বর্ষের সজ্জন-তোষিণী পত্রিকার ২২৩।২২৪ এবং শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৪ দ্বিতীয় বর্ষের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ২১৭ হইতে ২৪১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত প্রকাশ আছে, কোন কথা জানিতে হয়, তাহাতেই দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রিলোচন দাস।

ঠাকুর ত্রিলোচন দাসের জীবনচরিত অন্য কোন গ্রন্থে নাই। যা আছে তা তাঁহারই কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ও দুর্লভসার গ্রন্থে। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকামতে ইনি ব্রজের শ্রীচন্দ্র শেখরা সখী। ইঁহার জনমের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীসরকার ঠাকুর মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজ গাথায় বলিয়াছিলেন ;—

"গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া কিছু রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
গৌর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥" পদ সমুদ্র।

শ্রীঠাকুরের এই পদোক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, "শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা" তিনি নিজে লিখিতে অক্ষম হইয়া এই যে লিখিয়াছিলেন "গ্রন্থ লিখিবে যে, এখন জন্মে না সে, ইত্যাদি" সে কথাটি মিথ্যা হইবার নহে। এক প্রকার তাঁহারই প্রার্থনায় শ্রীত্রিলোচন পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া

শ্রীসরকার ঠাকুরের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মঙ্গলকোটের নিকট কো গ্রামে বৈদ্যকুল সমুদ্ভব কমলাকর দাসের ঔরসে এবং সদানন্দী দেবীর গর্ভে লোচনের জন্ম হয়। শ্রীসরকার ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই শ্রীলোচনকে ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিয়া সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন। শ্রীসরকার ঠাকুরের আদেশেই শ্রীলোচন কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিত হয়। যে সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর,শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই সময়ের কিছু দিন পরেই শ্রীলোচন শ্রীগ্রন্থ লেখেন।

একদা উভয় গ্রন্থ লইয়া শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীলোচনে যে তর্ক হয়,তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের গর্ভধারিণী শ্রীশ্রীনারায়ণীদেবী মধ্যস্থ হইয়া পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া দেন। এবং শ্রীলোচনের মতে মত স্থাপন করিয়া বৃন্দাবন কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গল শব্দ রহিত করিয়া "ভাগবত" শব্দ বসাইয়া দেন।

শ্রীলোচনের পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত নাম শ্রীত্রিলোচন, পরন্তু লোচনের অল্পকালে পাড়াপড়সা সকলে (ত্রি) শব্দ লোপ করিয়া ফেলা নামে লোচন বলিয়া ডাকিত। ক্রমে সেই নাম প্রকাশ হইয়া পড়ে। পশ্চাৎ লোচন যখন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিলেন,সেই সময়ে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ জানিয়া সকলে আহ্লাদের সহিত কেহ সুলোচন,কেহ বা লোচনানন্দ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাই লোচনের নাম পরিবর্ত্তন হইবার কারণ। বস্তুতঃ লোচন সেই ফেলা নামেই নিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা;—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর, কোগ্রামে বাস।"

মাতা শুদ্ধ মতি, সদানন্দী তার নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি, করি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর, পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে গাই, গৌর গুণ গাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দ দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রী পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থ পুত তিঁহ, তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে, আমি এক মাত্র।
সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র॥
মাতৃকুল পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর, প্রেম ভক্তি দাতা॥"

"ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদ প্রতি আসে আশ।
অভাজন সাধ করে, গোরাগুণ গাইবারে,
সে ভরসা এ লোচন দাস॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীলোচনানন্দ যে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল এবং দুর্ল্লভ সার গ্রন্থ লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গীতোপযোগী বিস্তর পদ লিখিয়াছিলেন। লোচনের কৃত ধামালী পদ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাই, তাঁহাকে ব্রজের বড়াই বলিয়া কেহ কেহ সম্বোধন করিতেন। পদগুলি নিতান্ত মস্করা নহে, ভাবরসে রস্করা। এমনি রসের ভিয়ানে প্রস্তুত যে আজ পর্য্যন্ত পদের ভিতর রস ঢল ঢল করিতেছে। যতই পান কর, ততই ক্ষুধাবৃদ্ধি। আজি একটী মাত্র লোচন কৃত পদ লিখিয়া উপহার দিলাম। যথা—

"কি হল কি হল সই, জ্বালার উপর জ্বালা।
সাঁঝ সকালে, দেখা হলে, বসন টানে কালা॥
ভরম সরম, সব খুয়ালাম, বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা, ধরে আমার হাতে॥
কালার কাছে মনের কথায়, মনে পাইনু সুখ।
গুপ্তকথা ব্যক্ত হল, তাই ত মনে দুঃখ॥

চলবোলকে চতুর বলি, হেট মুড়াকে জপু।
রস্ বুঝলে রসিক বলি, না বুঝিলে ভেপু॥
লোচন বলে আলো দিদি, গাল দিলি কেনে।
কালা বৈকি! রসিক নাই,এ তিন ভুবনে॥"পদ সমুদ্র।

শেষ কথা, লোচন অল্পবয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটী গুরুতর কারণ বশতঃ একদিনও দাম্পত্যসুখাভিলাষ করেন নাই। ধন্য! তাঁহার প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার বৈরাগ্য।

কবিরাজ রামচন্দ্র ও গোবিন্দ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে ;—

"কংসারি সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ, তিন রসরাজ॥"

এই যে, কতিপয় ভক্তের নাম আছে, ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গণ অর্থাৎ নিজজন। কংসারী সেন আর রামচন্দ্র,ইঁহারা কবি, এবং শ্রীরঙ্গ, ও কুমুদ এবং গোবিন্দ, এই তিন জন রসরাজ নামে বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে কেহই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাভুক্ত নহেন। উল্লিখিত ভক্তগণের মধ্যে গোবিন্দ, শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য। যথা আদি লীলার অষ্টমে ;—

"পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, ভূগর্ভ গোসাই।
গৌরকথা বিনা যাঁর, মুখে অন্য নাই।
তার শিষ্য গোবিন্দ, পুজক চৈতন্য দাস।
কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমীকৃষ্ণ দাস।"

বলা বাহুল্য, একই নাম একই উপাধিযুক্ত জগতে বহু নাম থাকিবার সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত অনন্তকোটী, কে তাহার নির্ব্বাচনে সমর্থ? প্রভুর অবতারকালে পারিষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর সেন রামচন্দ্র, কবিরাজ রামচন্দ্র, দত্ত রামচন্দ্র, দত্ত গোবিন্দ, দাস গোবিন্দ, ঘোষ গোবিন্দ, আচার্য্য গোবিন্দ, সেবাইত গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি ছিলেন। সারাবলী গ্রন্থে আছে ;—

"শ্রীবীরহাম্বির আর, শ্রীরামচন্দ্র।
কবিরাজ কর্ণপুর, আর শ্রীগোবিন্দ॥"

ইহারা পরবর্ত্তী অবতারে শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখারভিতর নহেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রথম অবতারে আবার প্রেমাবতারে যে যে ভক্তগণ যে যে শাখা ভুক্ত ছিলেন, তাহা প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব দাস (সংক্ষেপে) নিজ কৃত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা প্রথমাবতারে ;—

(১) অবতার শ্রীগৌরচন্দ্র, সঙ্গ তার নিত্যানন্দ,
শান্তিপুর নাথ সঙ্গে আর।
পণ্ডিত গোসাঁই, শ্রীবাস রামাই,
ঠাকুর শ্রীসরকার॥
মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ,
দামোদর, বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ,
সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য রতন, সত্যরাজ খাঁন,
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত,
জগদীশ তার পাশ॥
আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ,
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান সঞ্জয়,
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
পণ্ডিত গড়ুর, শ্রীচন্দ্রশেখর,
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ, মাধব, ঘোষ বাসুদেব,
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর, দাস গদাধর,
উদ্ধারণ, অভিরাম।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস।
বৃন্দাবন অনুপাম॥
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন,
চিরঞ্জীব, সুলোচন।

কবি রামচন্দ্র, দ্বিজ হরিশ্চন্দ্র,
গঙ্গাদাস, সুদর্শন ॥
গোবিন্দ, শঙ্কর, আর কাশীশ্বর,
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ, সুত রামানন্দ,
গোপীনাথ বাণীনাথ ॥
লীলাচলবাসী, সার্ব্বভৌমকাশী,
মিত্র জগন্নাথ আর।
শ্রীশিখিমাহাতি: রুদ্র গজপতি,
ক্ষেত্র সেবা অধিকার ॥
গোঁসাই স্বরূপ, সনাতন রূপ,
ভট্টযুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভুগর্ভ, গোসাই রাঘব,
লোকনাথ আদি সাথ ॥
যতেক মহান্ত, কে করে তার অন্ত,
গৌরাঙ্গ সভার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন, সবে কৃপাবান,
প্রেম ভক্তি কর দান ॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া,
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সঙরিয়া
কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস ॥ পদসমুদ্র।

(২) প্রেম অবতারে ;—

"জয় জয়, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয়, শ্রীগতি গোবিন্দ রসময়,জয় তছু ভকত সমাজ।
জয়, কবিরাজ রাজ রসময়, শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কতিহুঁ না হেরই ত্রিভুবনে, প্রেমরমূতি পরকাশ।
জয় জয়, যুগল পীরিতিময় শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর গুণার্ণবে, ঝুরত অহর্নিশি, জনু মন্দার গিরীন্দ ॥
জয় জয়, শ্রীযুত বাস কৃপাময়, শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয়, প্রভু মোর, শ্রীরামচরণ, শরণাগত আপনার ॥
জয় জয়, রামকৃষ্ণ মুকুন্দানন্দ, দ্বিজকুল তিলক দয়াল।
জয় জয়, রূপ ঘটক ঘট রসময়, মণ্ডল ঠাকুর ভাল ॥
জয় জয়, নৃপবর, মল্ল বংশধর, শ্রীবীর হাম্বির নাম।
জয় জয়, শ্রীকবিরাজ কর্ণপুর, গোকুল শ্রীভগবান ॥
জয় জয়, শ্রীগোপীরমণ রসায়ন, উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত।
জয় জয়, শ্রীনরসিংহ কৃপাময় জয় জয় শ্রীবল্লভিকান্ত ॥
জয় জয়, শ্রীবল্লভ পরমাদ্ভুত, প্রেমমূরতি পরকাশ।
প্রভু সুতা চরণ, সরোরুহ মধুকর, জয় যদুনন্দন দাস।
জয় জয়,নৃসিংহ কবি ভুবনে বিদিত,জয় ঘনশ্যাম বলরাম
ঐ ছন দুইজন, নিরুপম গুণগণ, গৌর প্রেমময় ধাম ॥
ইহ সব প্রভুগণ, চরণ যাক ধন, তাক চরণে কর আশ।
অতিহুঁ অসত মতি, পামর দুরগতি, রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥
পদসমুদ্র।

শ্রীবৈষ্ণবদাস দাসানুদাস
শ্রীহারাধন দত্ত।

ইতিহাস শিক্ষা। (২)

অসভ্যজাতিদিগের ইতিহাস নাই, কেন না, তাহারা ইহার আবশ্যকতা বোঝে নাই ; এবং লিখিত ভাষা না থাকায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঘটনা নিচয়ের বিবরণ রাখিবার উপায়ও তাহাদের নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতি অত্যন্ত উন্নত বলিয়া পরিচিত, তাহারাও অতি পূর্ব্বকালে ইতিহাস রাখিত না; যে সময় হইতে তাহারা ইতিহাসের আবশ্যকতা বুঝিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহারা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতই জাতি সমূহ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ততই তাহারা ইতিহাসের আদর করিতে শিখিয়াছে।

মান্দ্রাজ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত H.B. Grigg এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "The ground work of all higher education must be the study of the noblest thoughts and the noblest examplar of mankind." —মনুষ্যজাতির উচ্চ চিন্তা ও আদর্শ মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার ভিত্তি।

যাহারা রাজনৈতিক বিষয়াদি অনুশীলন করেন, যাঁহাদিগের হস্তে রাজ্য শাসন প্রভৃতি কঠিন কার্য্যের ভার নিয়োজিত থাকে,

তাঁহাদের পক্ষে ইতিহাস শিক্ষা অতীব আবশ্যক। কোন্ দেশের কোন্ সময়ে কি অবস্থায় বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কি কতবার ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎদৃষ্টে মানব চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়ম কতকটা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় এবং তদনুসারে রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর সমাবেশ করা যাইতে পারে। H. B. Grigg স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "Yet who can deal satisfactorily with finance, legislation, economics, commerce, politics who has not studied history."—যিনি ইতিহাস শিক্ষা করেন নাই, তিনি কেমন করিয়া রাজস্ব, আইন, অর্থ ব্যবহার ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সন্তোষজনক রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন?

পৃথিবীতে যত বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে, যত সাধারণ সত্য (General truth) নির্ব্বিবাদে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রত্যক্ষীকৃত বিশেষ বিশেষ সত্য (individual truths) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যে ঘটনাগুলি বহুবার একই অবস্থায় একই প্রকারে ঘটিতে দেখিলাম, ঐ প্রকার অবস্থা হইলে চিরদিনই ঐ প্রকার ঘটনা হইবে, আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। এই কথাটা একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দৃষ্টান্তটা শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায়ের Logic হইতে গ্রহণ করিলাম। আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি, মনুষ্য মরিয়া থাকে; আমাদের কত পরিচিত লোক মরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বকালের কত লোক ছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে, আমাদের সমক্ষে কত লোক মরিতেছে, ইহা দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, যে মানুষ মরণশীল। আমরা যখন বলি মানুষ মরণশীল, কেহই তাহাতে সন্দেহ করে না; পাগল না হইলে সকলেই এই সত্য স্বীকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞানসমূহে আমরা যে সকল সাধারণ নিয়ম (universal law) শিখিয়া থাকি, বিজ্ঞান-কর্ত্তারা অধিকাংশ স্থলেই এবম্বিধ প্রণালীতে সে সকল সত্যে উপনীত হইয়াছেন। নিউটন গাছ হইতে আতা পড়িতে দেখিলেন, আশ্রয় শূন্য (unsupported) প্রায় বস্তুই মাটিরদিকে আসিতে চায়। এই বিষয় পর্য্যালোচনা দ্বারা 'মাধ্যাকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন; কত বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। এই সাধারণ নিয়ম অবগত হইয়া মানুষ কত কল কৌশল উদ্ভাবন করিল।

অনেক বিজ্ঞান হইয়াছে বটে, কিন্তু দিন দিনই নূতন বিজ্ঞান, নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইবে। মানুষের মনের প্রকৃতি জ্ঞাত হইয়া দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার সাধারণ নিয়ম অবলোকন করিয়া ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, অন্যান্য নৈসর্গিক ব্যাপারের ন্যায় মনুষ্যদিগের মনোভাব-ব্যঞ্জক ভাষাও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত ও সৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইতিহাস বিজ্ঞানও এক প্রকার গঠিত হইতেছে, কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। সামাজিক বিজ্ঞান (Sociology) ইতিহাস পর্য্যালোচনা ভিন্ন গঠিত হইতে পারে না।

এই বিশ্বসংসারে যে সমস্ত ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা সকলই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে সকল বিষয়েরই সাধারণ নিয়ম অবগত হওয়া যায়। কবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যাসদেবের মুখে বলিয়াছেন:—

> "স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি জানিও নিশ্চয়
> স্বেচ্ছাচারে নহে বৎস! চালিত রক্ষিত।

কিবা জন কিবা জাতি, উভয় সমান
দুর্ল্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন।"

সংসারে কিছুই বিশৃঙ্খলা নহে, সকলই দুর্ল্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। কবি ড্রাইডেন (Dryden) লিখিয়াছেন,—

"From harmony, Divine harmony the Universal frame begun,......Diapason closed in man."—"ঐশ্বরিক সামঞ্জস্য হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে; মনুষ্য সকল সামঞ্জস্যের আধার। মনুষ্যের মধ্যে সমস্ত বাহ্য জগতের প্রতিকৃতি ও নিয়মাবলীর সমাবেশ আছে।"

এই জন্যই বহির্জগৎকে 'Macrocosm' অর্থাৎ বৃহৎ জগৎ এবং মনুষ্যকে 'Microcosm' বা ক্ষুদ্র জগৎ বলে। অন্যান্য নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হওয়া যদি প্রয়োজনীয় হয়, তবে কি নিয়মে মনুষ্যসমাজ পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তদ্বিষয়ক আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়া অনুমিত হওয়া উচিত নহে। ঘটনা বিশেষের সন ও তারিখ, কি বীরপুরুষদিগের নাম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। প্রকৃতরূপে ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিচয় হইতে সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত করাই প্রধান লক্ষ্য মনে রাখিতে হইবে।

কেবল শ্রেণীবদ্ধরূপে ঘটনার বিবরণগুলি সাজাইয়া গেলে কোন গ্রন্থকে প্রকৃত ইতিহাস বলা কর্ত্তব্য নয় এবং উক্তরূপ গ্রন্থ পাঠে ইতিহাস শিক্ষা হইল, মনে করিতে হইবে না। Encyclopedia Brittanicaর লেখক লিখিয়াছেন:—"History only attains its full stature when it not only records but describes in considerable fullness social events and evolution when it marks change and growth, the movement of society from one phase to another."—"যখন ইতিহাসে সমস্ত জাতীয় ঘটনা, বিবর্ত্তন, সমাজের বিশেষ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রভৃতি লিখিত ও সম্যক প্রকারে প্রদর্শিত হয়, তখনই ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাইতে পারে।" প্রসিদ্ধ লেখক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিকের পাঠ্য অনন্ত জড়-জগৎ; কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবন রূপ মহান্‌গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে; কেহ গ্রন্থ-কীটের ন্যায় একবারে উহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন, কেহ দূর হইতে উঁকি মারিয়া একটুকু একটুকু দেখিতেছেন, কেহ বা তাহা হইতেও দূরে, করে কল্পনার কামবীক্ষণ লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া এবং কিছুই না শিখিয়া আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।" অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই মানব চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং এই গুণ থাকাতে আমরা বৈষয়িক লোকদিগকে বুদ্ধিমান বলি। ঐতিহাসিক বিশেষ ভাবে মানবজীবনের আলোচনা করিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন বাবু আরও বলিয়াছেন; "ঐতিহাসিক মানবজীবন সম্বন্ধে অংশতঃ কবি, অংশতঃ দার্শনিক; অথচ কবি ও দার্শনিক উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। কোন একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য কি কোন একটী বিশেষ সত্য তাহাকে মোহিত করিতে পারে না। কিন্তু মানব জীবনের যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য স্রোতের ন্যায় ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট হন। তিনি উৎসুকচিত্ত ও ধীরমতি পরিব্রাজকের ন্যায় কোন উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতির অবিরামবাহি জীবনস্রোতের প্রমত্ত প্রবাহ ও লহরীলীলা সমান আদরে সন্দর্শন করেন।"

আমাদের ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক ইতিহাস লেখকগণ কিছু অধিক কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; বিশেষ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কল্পনার লীলাতরঙ্গ দেখাইয়াছেন;

কখনও বা কেবল প্রকৃত ঘটনায় সন্তুষ্ট না হইয়া কল্পনার বলে ঘটনা নিচয় নিজ ইচ্ছানুরূপ অতিরঞ্জিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন।

এইজন্য কেহ কেহ পুরাণগুলির ঐতিহাসিকতা মোটেই স্বীকার করিতে চাহেন না। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাভারত সম্বন্ধে বলেন,—

"As a historical narrative of the principal incidents, of the war, the present epic is utterly valueless. For the events and incidents have been changed, and the names of the heroes are later interpolations".

—"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা সমূহের বিবরণ বলিয়া মহাভারতের কিছুই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ ঘটনাগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া লেখা হইয়াছে এবং বীরপুরুষদিগের নামগুলি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" রমেশ বাবু রামায়ণকে প্রায় বাক্যালঙ্কার বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি যে প্রণালীতে সত্য উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতানুযায়ী এবং তাহা যে একেবারে উপেক্ষা করা যায়, এমন নহে। তবে কি না, তিনি কিছু অধিক দূর গমন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

কেবল ভারতবর্ষে কেন, প্রায় সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসই কাল্পনিক বা অতি প্রকৃত কথার সহিত জড়িত রহিয়াছে। কাজেই এতদ্দেশীয় পুরাণ লেখকদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ দেখা যায়, সকল জাতিরই বিজ্ঞান দর্শনাদির উন্নতির পূর্ব্বে কবিত্বের ভাব অধিক স্ফূরিত হয়। সাধারণতঃ লোক প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যেই বিমুগ্ধ হয়। মনোমুগ্ধকরভাব স্বভাবতঃই হৃদয়ে প্রথম জাগ্রত হয়। মনুষ্য তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে অধিক ভালবাসে। যতই লোক পদার্থের প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিতে সমর্থ হয়, ততই সৌন্দর্য্যের স্পৃহা কমিয়া আইসে এবং আপাততঃ মনোমুগ্ধকর বিষয়ই কেবল আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। মেকলে বলিয়াছেন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয়। জাতি সমূহের আদিম অবস্থায়ই প্রধান কবিদিগকে জন্মিতে দেখা যায়।

প্রাচীন লেখকদিগের প্রকৃত ইতিহাস না লিখিয়া কাব্য লেখা কতক পরিমাণে উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ মনে করিলে অসঙ্গত হয়, মনে করি না। বিশেষতঃ প্রায় গ্রন্থই কবিতাকারে লিখিত, দেখা যায়। বঙ্কিম বাবু বলেন, ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রও যখন কবিতাকারে লিখিত রহিয়াছে তখন কেবল কবিতাকার দেখিয়া কাব্য মনে করা উচিত নয়। কিন্তু আর কিছু না হইলেও, পৌরাণিকেরা কাব্য লিখিতে মজবুত ছিলেন এবং তাহাই অধিক ভালবাসিতেন, এ পর্য্যন্ত বুঝা যায়। কাব্য হইলেই তাহাতে কিছুমাত্র সত্য থাকিবে না, এরূপ বলিতেছি না। বঙ্কিম বাবু মহাভারত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সত্য বটে যে মহাভারতে বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায় মিশিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাই-

য়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?" (কৃষ্ণচরিত্র)। অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রযুজ্য। অনেক পৌরাণিক কথা যে আবার বাক্যালঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। Sayce বলিয়াছেন, "A myth, as a general rule, is but a "faded metaphor" and misinterpreted expression. The living signification it once possessed has perished out of it and a new and false signification has been put into it."—"সাধারণতঃ অতি প্রকৃত উপাখ্যানগুলি পরিবর্ত্তিত রূপকালঙ্কার ও ভ্রমজনক বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোনকালে যাহা প্রকৃত অর্থ ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং নূতন ও অলীক অর্থ ইহাতে সংযোজিত করা হইয়াছে।" এই প্রকারেই অনেক অপ্রকৃত বা অতি প্রকৃত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে লোকের অসভ্যতার পরিচায়ক, তাহা নহে এবং প্রায় স্থলেই লোকে ইচ্ছা করিয়া বা জ্ঞানতঃ এইরূপ মিথ্যা কথার সৃষ্টি করে নাই। প্রাচীনকালের ভাষার সঙ্কীর্ণতা থাকায় অনেক সময় মানুষকে বাধ্য হইয়া রূপকালঙ্কারে অথবা অন্যবস্তুর সহিত তুলনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।

যে স্থলে ঘটনার সমসাময়িক লিপিবদ্ধ ইতিহাস নাই, সেই স্থলে অনৈসর্গিক ও অতি প্রকৃত অনেক কথা বংশপরম্পরা ক্রমে সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসে এবং যেখানে বিবরণটা লিখিত না হইয়া পুরুষানুক্রমে লোকের স্মৃতি অথবা শ্রুতি দ্বারা চলিত থাকে, সেইখানে এই প্রণালীতে প্রকৃত ঘটনা রূপান্তরিত হওয়ার আরও সম্ভাবনা। গ্রামের এক প্রান্তে একটা সামান্য ঘটনা ঘটিলে দুই ঘণ্টা পরে তাহার বিবরণ অপর প্রান্তে শুনিলে, দেখা যায়, এত অল্প সময়ের মধ্যে লোকের মুখে মুখে বিবরণটা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছে। একজনের ছেলে পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিল, রাস্তার একজন লোক বলিল, "গলাটা যেরূপ দেখিলাম, অবশ্যই ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া থাকিবে।" সেই কথা শুনিয়া অপর একজন বাজারে গিয়া রটাইল 'অমুকের ছেলেকে ভূতে মারিয়াছে।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল 'ভূত কেমন?' উত্তর হইল,'চৌদ্দ হাত লম্বা, দশ হাত প্রস্থে, বক্ষস্থলে পাঁচটা চক্ষু।" ক্রমে গ্রামের অপর প্রান্তে কি অন্য গ্রামে খবর পৌছিল, 'অমুকের স্ত্রী তাহার শিশু ছেলে নিয়া ঘাটে গিয়াছিল, একটা বিকটমূর্ত্তি ভূত আসিয়া মার নিকট হইতে ছেলে কেড়ে নিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে।' সকলেই যে ইচ্ছা পূর্ব্বক এই প্রকার সত্যের ব্যত্যয় করিয়া থাকে, তাহা নহে। সরল বিশ্বাসের দরুণ সাধারণতঃ এই প্রণালী সঙ্ঘটিত হয়। ফ্রাউড (Froude) বলিয়াছেন,—'Mythic history, mythic theology, mythic science, are alike records not of facts but of beliefs. They belong to a time when men had not yet learnt to analyze their convictions or distinguish between images vividly present in their own minds and an outward reality which might or might not correspond with them." "অতি প্রকৃত ইতিহাস, অতি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান, এই সকলই বিশ্বাসের বিবরণ, প্রকৃত ঘটনার নহে। মানুষ তখন বিশ্বাসের বিশ্লেষণ, বা মনের আভ্যন্তরীণ ভাব হইতে বাহ্য জগতের প্রকৃত বিষয় পৃথক করিতে শিখে নাই। আমাদের মনে যাহা, বাহ্য জগতে যে তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে, এই কথা বুঝে নাই।"

এখন ইতিহাস শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। নানা সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ পাঠ করিয়া, তাহা হইতে মানব সমাজের পরিবর্তন, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাস পাঠ করার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অল্পবয়স্ক বালক বালিকা কি নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সাজে না। যাঁহারা পরিণত বয়সে সমালোচকের ন্যায় ইতিহাস পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই উপরোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে ছাত্রগণ উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় এবং ইতিহাস পাঠের যাহাতে স্বার্থকতা হয়, শিক্ষককে তাহা মনে রাখিতে হইবে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদিগের নিকট হইতে কেবল প্রসিদ্ধ ঘটনার সন, তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া সন্তুষ্ট না হন এবং তাহাদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হয়। ছাত্রগণ বয়স্ক হইলে ও স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। এই নিয়মে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষককে পাঠ্য পুস্তকে যাহা আছে, তাহা হইতে আরো অধিক জানিতে হইবে। বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া নিজ মস্তিষ্ক হইতে অনেক কথা বলিয়া দিতে হইবে; কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। মান্দ্রাজ Educational Journal নামক মাসিক পত্রে এক লেখক লিখিয়াছেন,—"The best method of Science must be applied to history too, as in chemistry or biology; the student must be brought to deal with the objective realities of his study."—"প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী ইতিহাস পাঠেও অবলম্বন করিতে হইবে। রসায়ন শাস্ত্র এবং প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষার ন্যায় ইতিহাস শিক্ষার সময়ও ছাত্রকে প্রকৃত বস্তুর সহিত কারবার করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় ও ঘটনাগুলি চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে হইবে।"

ইতিহাসে ঘটনা ও বিষয়ের অভাব নাই, সকল বিষয় ও সকল ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে শিক্ষকের আর নিস্তার নাই। এই সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন,—"Just here the teacher is daunted by the mass of this material, by the world of historical reality; but are there not in history as Botany or Zoology certain type-genus, whose detailed study gives the key to large classes of facts?" "কোন কোন্ ঐতিহাসিক বিষয় পাঠার্থীর চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে, এই বিষয়ে শিক্ষক গোলে পড়িয়া যান; কেন না ঐতিহাসিক বিষয়ের ত আর অভাব নাই। কিন্তু যেমন উদ্ভিদশাস্ত্রে ও প্রাণী বিষয়ক শাস্ত্রে এক একটা আদর্শ শ্রেণী আছে, ঐতিহাসিক বিষয় সমূহেরও তদ্রূপ আছে।"

বিষয়গুলি পৃথক পৃথক করিয়া লইলে, বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বিশেষের জীবনী, প্রচলিত উপাখ্যান ও প্রচলিত ভাষা প্রভৃতি দ্বারা এক একটা বিষয় সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। যথা থর্ম্মাপলীর বীর লিওনিদাসের জীবনী দ্বারা তাৎকালীন স্পার্টানদিগের আভাস পাওয়া যায়; সক্রেটিসের জীবনী হইতে গ্রীক দেশীয় দর্শন শাস্ত্রের অনেকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়; তাঁহার জীবনী পাঠে সেই সময়ে গ্রীক দর্শনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। এথেন্সের শাসন প্রণালী এবং ইংলণ্ডের

পার্লিয়ামেণ্টের বিবরণ হইতে প্রচলিত রাজনীতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। "আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু," "মহিমার্ণব," "দয়ার প্রস্রবণ" ইত্যাদি রূপ তোষামোদ বাক্যের বহুল প্রয়োগ দেখিয়াই,রোমকদিগের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে, বুঝিয়া লওয়া যায়।

দেখা যায়, অনেক লোক ইতিহাস পড়িতে ভালবাসেন না। উপন্যাস পাঠে কিন্তু সকলেই আনন্দ অনুভব করেন। নর নারীর জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র অনেকেই চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দেখিতে ভালবাসেন। আমরা মানুষ, মানুষের জীবনী যদি আমাদের কাছে ভাল না লাগে, তবে কাহার নিকট উহা ভাল বোধ হইবে?

আমরা কবিত্বের প্রশংসা করি, কেন না মনুষ্যের মনের ভাব ও প্রবৃত্তিগুলি কবিগণ অতি স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত করেন। উপন্যাস ও কাব্য যদি আমাদের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তবে ইতিহাস পারিবে না কেন? ইতিহাসে বহুকালের বহুসংখ্যক নর নারীর জীবনের ছবি আছে। আমরা যেগুণ থাকিলে উপন্যাসকার ও কবিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকি, প্রকৃত ঐতিহাসিকের সেই গুণের অভাব নাই। উপন্যাসের ঘটনা যদি ঠিক প্রকৃত মানব জীবনের ঘটনার মত বর্ণিত হয়,তবেই উপন্যাসখানি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। কালিদাস ও সেক্ষপিয়র প্রভৃতি প্রকৃত মানবজীবনের চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি। ইতিহাস, প্রকৃত মানবজীবনেরই চিত্র। ইতিহাস পাঠের অন্যান্য উপকারিতা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা যেজন্য উপন্যাস পড়িতে ভালবাসি, সেক্ষপিয়রের মানবচরিত্র বর্ণন পড়িতে ভালবাসি, সেই কারণেই ইতিহাস পাঠে আমাদের আনন্দ অনুভব করা উচিত। উপন্যাস ও কাব্যের অন্যান্য গুণ আছে বটে, কিন্তু সত্যের অনুরূপ হওয়া যে প্রধান গুণ, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেক্ষপিয়র, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে, যে শব্দগুলি বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছিল, ঠিক সেই শব্দগুলি রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। Henry VIII নামক নাটকে ওলসির কথাগুলি একেবারে প্রকৃতের অনুরূপ, কেবল ছন্দের অনুরোধে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। Duke of Maralborough ইংলণ্ডের ইতিহাস শিখিবার জন্য, সেক্ষপিয়রের ঐতিহাসিক নাটক পাঠ করিতেন।

সত্যই, ইতিহাসের সৌন্দর্য্য। কিন্তু কখন কখন ইতিহাস-লেখকগণ নিজের অভিলাষ মত সত্যের রূপান্তর বা অপলাপ করিতে বিমুখ হন না। যাঁহারা জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ করে, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক এবং এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগকে সাধ্য মত পরিহার করা কর্ত্তব্য। কখনও বা লেখকের বুঝিবার ভ্রমবশতঃও সত্যের বিপর্য্যয় হইতে পারে। এই সকল কারণে কাহারও কাহারও 'ইতিহাসের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া যায়। নেপোলিয়ন বলিতেন—"What is history but a fiction agreed upon?" "সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত কাল্পনিক বিষয় বৈ ইতিহাস আর কি?" সংসারে কেবল সত্যের প্রচার থাকিলে, এ সংসার স্বর্গ হইত। কিন্তু সংসার যাহাই থাকুক, সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে আমার কাজ আমি বুঝিয়া লইতে পারি। বাজারে কোন কোন বিক্রেতা ঠকায় জানি, কিন্তু তা বলিয়া ত আমি আর আহার

বদ্ধ করিয়া থাকিতে পারি না। আমাকে বাজারে জিনিস কিনিতেই হইবে, আমি ঠকি কি না, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি ও চাতুর্য্যের প্রতি নির্ভর করিবে। ঐতিহাসিক জগতে এই প্রকার বহুসংখ্যক ঠক আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে যে কারণে অতি প্রাচীনকালের কথার সহিত কাল্পনিক বিষয় জড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে এবং তৎসমুদয় হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে একটা "ইতিহাস-বিজ্ঞান" হওয়া সম্ভব, এইরূপ মত প্রকাশ করা গিয়াছে। বস্তুতঃ এই কথা সকলে স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, ইতিহাস-বিজ্ঞান সম্ভব হইলে মানব চরিত্রেরও একটা বিজ্ঞান সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যগণ এত বিভিন্ন প্রকৃতি ও চরিত্রের যে, তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ কোন নির্দ্দিষ্ট সাধারণ নিয়মের অধীন বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় না। যে কোন বিষয়েরই হউক, একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম (Uniformity) আবিষ্কার করিতে না পারিলে বিজ্ঞান প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ কারণে নির্দ্দিষ্ট ঘটনা হইবে, এইরূপ নিরূপণ করিতে না পারিলে একটা বিজ্ঞানের সৃষ্টি সম্ভব নহে। Jevous লিখিয়াছেন, "There is no such thing, for instance, as a real science of human character, because the human mind is too variable and complicated a subject of investigation.—"মনুষ্যের মনের ভাব সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল ও জটিল বলিয়া মনুষ্য স্বভাবের একটা বিজ্ঞান হইতে পারে না।

এইরূপ বিজ্ঞানের সৃষ্টি তত সহজ না হইতে পারে, কিন্তু কখনও হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি জানিও নিশ্চয় ......দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন।"

এখন প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমরা যতই ইতিহাস পাঠ করি না কেন, যতই নানা দেশের বিবরণ পর্য্যালোচনা করি না কেন, তাহা হইতে আমরা এক মহৎ উপদেশ, এক মহৎ সত্য শিক্ষা করি। এই সত্য সম্বন্ধে কোন সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত আবশ্যক করে না। ইতিহাস-বিজ্ঞান সম্ভবই হউক, আর অসম্ভবই হউক, এই সত্য ইতিহাসের প্রতি পত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। "It is a voice forever sounding across the centuries, the laws of right and wrong. Opinions alter, manners change, creeds rise and fall, but the moral law is written, on the tablets of eternity. For every false word or unrighteous deed, for cruelty and oppression, for lust or vanity the price has to be paid at last not always by the chief offenders but paid by some one. Justice and truth alone endure and live. Injustice and falsehood may be longlived but Doomesday comes at last to them, in French revolution and other terrible ways. Froude. *

যুগান্তর ব্যাপিয়া এক মহৎবাণী ধ্বনিত হইতেছে; ন্যায় ও অন্যায়ের অনিবার্য্য নিয়ম। লোকের মত, ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হয়, ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভ্যুত্থান ও পতন হয়, কিন্তু অনন্ত কালের বক্ষে এক নৈতিক সত্য লিখিত রহিয়াছে। প্রত্যেক অসত্য কথা, অসত্য আচরণ, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, পাশব প্রবৃত্তি, গর্ব্ব, এই সকলেরই একদিন প্রতিফল পাইতে হয়। সকল সময়েই যে প্রধান দোষীগণ শাস্তি পায়, তাহা নহে, কিন্তু কেহ না কেহ তজ্জনিত ফল ভোগ করে। ন্যায় এবং সত্যই স্থায়ী হয়, অন্যায় ও অসত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও অবশেষে ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ন্যায় ভয়ঙ্কর বিপ্লব বা অন্য কোন উপায়ে বিধ্বস্ত হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন,
চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক।

* Froude ইতিহাস-বিজ্ঞান হওয়া সম্ভব বলে করেন না।

যুগল কবিতা।

(চতুর্বিংশ জন্ম দিনে)

The one remains, the many change and pass,
Heaven's light for ever shines, earth's Shadows fly.—Shelly.

নূতন।

(১)

সকলই নূতন হেথা ;
কণা মাত্র জগতের নহে পুরাতন ;
কাল সমুদ্রের গায়, জল-বুদ্বুদের প্রায়,
দিন দিন অবিশ্রাম,
নূতন নূতন শুধু হ'তেছে সৃজন।

(২)

আজি যে ফুটেছে ফুল,
বিশ্ব-পিতা, কালি সে ত ছিল না হেথায়।
কোথা হ'তে জনমিল ? কেনই বা বিকাশিল
উষার কিরণ মাখি'
চকিতে উঠিল জাগি নব সুষমায় !

(৩)

নক্ষত্র ডুবিয়া যায় ;
আবার নূতন সেথা উঠিছে ফুটিয়া ;
আজি রবি অস্ত গেল, আবার নূতন এল,
বিস্ময়ে বিশ্বের পানে রহিল চাহিয়া।

(৪)

আজিকার মরুভূমি
কালি ওই জলধিতে হয় পরিণত ;
আজি গিরি হিমালয়, কালি সে তরঙ্গচয় ;
আজিও উষর ভূমি,
কালি তা'র বক্ষোপরি শস্য রাশীকৃত।

(৫)

নিদাঘ মরিয়া যায়,
বিধবা বরষা আসি' ফেলে অশ্রুজল ;
শরতের হাস্যরাশি, হেমন্তে মিলায় আসি,
জীর্ণ-শীর্ণ শীত হ'য়ে
বসন্তে ফিরিয়া পুনঃ পায় ফুলফল।

(৬)

নূতন নূতন সৃষ্টি ,—
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ হয়ে মাটীতে মিশায় ;
আবার সমাজ নব, পূর্ণিত করিয়া ভব,
সংসারের রঙ্গভূমে
নব হাসি রোদনের তরঙ্গ খেলায়।

(৭)

একি নব খেলা, দেব ?
ত্রয়োবিংশ বর্ষ আজ যেতেছে চলিয়া,
কে জানে সে কোথা হ'তে ভাসায়ে জীবন-
চঞ্চল তৃণের মত, স্রোতে,
জগতের তীরে মোরে ফেলেছে আনিয়া।

(৮)

কেউ কি চাহিত মোরে ?
কেউ কি এ আগমন করিত প্রয়াস ?
ভবিষ্য দিগন্ত পানে, আশায় উৎসুক প্রাণে,
কেউ কি থাকিত চাহি ?—
মরমেতে কা'রও কিগো জলিত পিয়াস ?

(৯)

কেহ না, কার'ও না, হায় !
নূতন প্রভাতে আমি এসেছি নূতন ;
বিজনে সাঁজের বেলা ফুরা'লে জীবন খেলা,
নব-বিদেশীর মত,
আবার নূতন কোথা করিব গমন !

(১০)

নিত্য এ নূতন স্বপ্ন,
নিত্য এ নূতন-সৃষ্টি চাহে না হৃদয় ;
আঁখিটি না পালটিতে, হয় গো বিদায় দিতে ;
সে কি ভাল লাগে প্রাণে ?
মুহূর্ত্তে কি মিটে কভু অসীম আশয় ?

(১১)

নূতন চাহি না আর ;
কে দিবে ফিরিয়া, হায়, পুরাণ বরষ?
সেই পুরাতন প্রাণ, পুরাণ প্রেমের গান,
সংসার অতীত বেলা,
অন্তহীন জীবনের অসীম হরষ।

(১২)

হৃদয় দেখিতে চাহে,
মৃত্তিকার আঁখি যাহা দেখেনি কখন ;
এক নির্ব্বাপিত হ'লে, অপর উঠিবে জ্বলে ;
বিশ্বাস শুনিতে চাহে,
মৃত্তিকায় শ্রুতি যাহা করেনি শ্রবণ।

(১৩)

হে পুরাণ! কোথা তুমি?
নূতনের রঙ্গমাঝে শান্তি নাহি পাই ;
ডাকো গো পুরাণ-গেহে, ভাসাও পুরাণ স্নেহে,
জাগো দেব! জাগো আজি,
তোমার পুরাণকোলে ঘুমাইতে চাই!

পুরাতন।

(১)

সবই পুরাতন হেথা ;
কণামাত্র জগতের নহে ত নূতন ;
কালে-সমুদ্রের গায়, জল-বুদ্বুদের প্রায়,
দিন দিন অবিশ্রাম,
একই, একই রূপ হ'তেছে সৃজন।

(২)

এক ফুল ঝ'রে যায়,
আবার কুসুম সেথা উঠিছে ফুটিয়া ;
বার্দ্ধক্যে বিশীর্ণ-কায়, বৃক্ষাদি শুকা'য়ে যায়,
মুহূর্ত্তে আবার তরু
মাথাটি তুলিয়া সেথা উঠিছে জাগিয়া।

(৩)

প্রভাতে যে ডুবে তারা,
সন্ধ্যা তা'রে কোলে ল'য়ে করিছে প্রবেশ!
সন্ধ্যায় যে ডুবে রবি, তারই পুরাতন ছবি,
জাগিয়া প্রভাত-কালে,
পুরাণ কিরণে পুন ভাসাইছে দেশ।

(৪)

এল পুরাতন গিরি
শিখর তুলিয়া জাগি র'বে চিরকাল ;
তুলিয়া একই রব, পুরাণ তটিনী সব,
একই প্রবাহে ছুটি'
রচিবেক পৃথ্বীতলে জলধি বিশাল।

(৫)

পুরাণ, পুরাণ সব ;—
পুরাণ পাখীরা গায় পুরাতন গান ;
শৈশবে যে শিখে কথা, চিরদিন কহে তথা,
সেই সুর, সেই ডাক,—
জানেনা নবীন কণ্ঠে নব অনুষ্ঠান।

(৬)

বৎসর চলিয়া গেলে
ফিরিয়া ঘুরিয়া পুন আসিতেছে তাই ;—
গ্রীষ্মের শুকান শ্বাস, বর্ষার বিষাদ-বাস,
শরৎ, হেমন্ত, শীত ;
বসন্তের মন্দ মৃদু আলস্যের হাই।

(৭)

সেই পুন, সেই সব ;—
সেই শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, সেই নারী-নর ;
প্রাচীন প্রেমের হাসি, স্নেহ, ভালবাসাবাসি,
সেই সে পুরাণ প্রাণে
পুরাণ চুম্বন-খেলা, পুরাণ বাসর।

(৮)

একিরে পুরাণ ধরা!
যুগ যুগান্তর তা'র গিয়াছে কাটিয়া ;

অবশ শিথিল-কায়, ঠেকাঠেকি পায় পায়,
শ্রান্ত নয়নের জ্যোতি
দারুণ মালিন্যে যেন আসিছে মরিয়া।

(৯)

একি জরা-জীর্ণ প্রাণ!
বয়ঃক্রম কেটে গেল সহস্র বরষ;
হায় গো জগত-স্বামী, সেই সে পুরাণ আমি,
সেই অন্ধকারে বাস,
সেই পরাজিত হৃদি, লালসা-বিবশ।

(১০)

নিত্য এ পুরাণ-স্বপ্ন,
নিত্য এ পুরাণ-কথা চাহেনা হৃদয়;
একই সাগর'পরি, ভাসিছে একই তরী,
সেকি ভাল লাগে প্রাণে?—
একেতে কি শান্তি রহে চপলা আশয়?

(১১)

পুরাণ চাহিনা আর!
কে ভাঙ্গিবে জীবনের প্রাচীন ভবন?
স্ফূর্ত্তিহীন দেঁতো-হাসি, শুষ্ক-শীর্ণ ভাব-রাশি,
গলিত হৃদয় হ'তে
আধ-মুক্ত, আধ-যুক্ত দেহের বাঁধন।

(১২)

আকাঙ্ক্ষা চাহিছে মোর
যৌবন-কবিত্বে পুন পূর্ণিমা-উচ্ছ্বাস,
নবীন প্রতিভা ল'য়ে, ছুটিতে উন্মত্ত হ'য়ে;
নবীন শিশুর মত,
ধরিতে আকাশে উঠি শশাঙ্কের হাস।

(১৩)

হে নূতন! কোথা তুমি?
সৃষ্টির শয়ন হ'তে উঠ একবার;
চাহি গো প্রভাত-বেলা, খেলিতে নূতন-খেলা
দুলিতে আনন্দ-ভরে
জীবন-প্রারম্ভে পুন নন্দন-মাঝার।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

ইউরোপ ভ্রমণ। (২)

১১ই জুলাই, সন্ধ্যার পর রেলযোগে গটেনবর্গ যাত্রা করিলাম। যতটুকু পথ সমুদ্রের ধার দিয়া গেল, তত্রস্থ ছোট ছোট দ্বীপগুলির শোভা রমণীয়। রেলের গাড়ীগুলির ব্যবস্থা অতি সুন্দর, ওরূপ আরামের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আর কোথাও চড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নরওয়ে ও সুইডেনের রেলপথে যেখানে যেখানে আহারের বন্দোবস্ত আছে, সেখানে গাড়ী অনেক ক্ষণ থামে। ষ্টেসন-হোটেলের ব্যবস্থাও নূতন ধরণের,—পানাহারের দ্রব্য সামগ্রী ঘরের এক পার্শ্বে টেবিলের উপর সাজান আছে, যাহার যাহা ইচ্ছা লইয়া আসিয়া খাইতেছে; পরিবেশক চাকর বাকর নাই, কেবলমাত্র একটী স্ত্রীলোক কাউণ্টরে (Counter) দাঁড়াইয়া আছে, আহারান্তে তাহাকে পেটপূরণের একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া চলিয়া যাইতে হয়। শুনিলাম, নরওয়ের পল্লিগ্রামস্থ ছোট ছোট ইনে (Inn) খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য পর্য্যটকগণের বিবেচনার উপর নির্ভর করে; বলা বাহুল্য, তাঁহারাও অন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি কোন জিনিস মনোমত না হইয়া থাকে বা প্রয়োজনানুরূপ না পাইয়া থাকেন, ইনের অধিকারীর গোচরার্থ ভৃত্য মূল্য লইবার সময় মন্তব্যপুস্তক আনয়ন করে, তাহাতে লিখিয়া আসিতে হয়।

অতিথির প্রতি নরওয়ের অধিবাসীগণের এতই সম্মান। আমাদের দেশে ওরূপ উদারতা কত দিন চলিতে পারে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

পরদিন প্রাতে গটেনবর্গ পঁহুছিলাম। স্থানীয় নাম যোতেবোর্গ (Goteborg)। হোটেলে স্ত্রীলোক পরিচারিকা অধিক; এবং সুইড ভদ্রলোকেরা সকলের সমক্ষে তাহাদের সহিত অযথা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এ সম্বন্ধে চক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা না করিয়া জনৈক সুবিখ্যাত পর্য্যটকের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "At the restaurants, young blades order their dinners of the female waiters with an arm round their waists, while the old men place their hands unblushingly upon their bosoms." Northern Travels --Bayard Taylor. সময়ে সময়ে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ হুড়াহুড়ি হয়, এবং স্ত্রীপুরুষ দর্শকবৃন্দ দাঁড়াইয়া হাসেন।

ইংলণ্ডাদি দেশে তৃষ্ণা নিবারণার্থ পানীয়ের জন্য যেমন সুরালয়ে (Public house)* যাইতে হয়, নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় মহাদেশস্থ বহুতর দেশে সেরূপ ব্যবস্থা নয়,—পথের ধারে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোট ছোট ঘরে এক একটী স্ত্রীলোক সোডাওয়াটার, লেমনেড, সরবত প্রভৃতি নানাপ্রকার সহজ পানীয় দ্রব্যদ্বারা পথিকগণের পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে।

নগরটী ওলন্দাজী, ফরাসি, ও ইংরাজী ধরণের। নগরের মধ্যে পাথর দিয়া বাঁধান তিনটী খাল, তাহার দুই ধারে রাস্তা, রাস্তার দুই ধারে গাছ; ইহাই ওলন্দাজী। বাড়ীঘরগুলি ফরাসি ধরণের, আর সাধারণ দৃশ্য যেন ইংরেজী ভাবের। নগর ও উপনগরে অনেকগুলি নিকুঞ্জ কানন। রাজপথের মধ্যে বৃক্ষশ্রেণী পরিশোভিত "নয়া আলী" (Nya Alee) বা নূতন রাস্তা অতি রমণীয়। এই পথে পাইচারি করিয়া বা ইহার ধারে বসিয়া নাগরিকগণ বিশেষ আরাম সম্ভোগ করেন। রাস্তায় রাস্তায় অনেকগুলি কাঠের টেলিফোন ঘর। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল প্রতাপ নরপতি গস্তাভস্ (Gustavus Adolphus—The Lion of the North) কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত। নগরের প্রধান গির্জ্জা (Gustavii Domkyrka) তাঁহারই নামে আখ্যাত। "তোর্গ্" (Torg) অর্থাৎ বাজারে উক্ত রাজার একটী প্রকাণ্ড পিত্তলমূর্ত্তি (Bronze statue) স্থাপিত আছে। এ দেশে জেলা বা প্রদেশকে "লান" (La'n) বলে। যোতেবোর্গ লানের এই নগর রাজধানী, সুতরাং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এইখানে থাকেন; এই কারণে এবং সুইডেনের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া স্থানটী গুলজার। প্রথম নেপোলিয়ন তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সময় যখন ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার উদ্দেশে উক্ত দ্বীপের সহিত মহাদেশের বাণিজ্য বন্ধ করেন, (Continental blockade) তখন ইংলণ্ডের সহিত উত্তর ইউরোপের বাণিজ্যের জন্য এই স্থান খোলা থাকে; সেই অবধি ইহার সমৃদ্ধি। নরওয়ে দেশের ন্যায় এখানকার মদের দোকানগুলির বন্দোবস্ত। উপরান্ত দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষগণের বেতন নির্দ্দিষ্ট থাকায় উপরি পাওনার আশায় তাঁহারা বেশী খরিদদার জুটাইবার কোন চেষ্টা করেন না; এবং শনিবার সন্ধ্যা ৬ টা হইতে সোমবার

* এই সকল স্থানে সুরা ভিন্ন সোডাওয়াটার, লেমনেড, জিঞ্জারেড্ প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

প্রাতঃকাল ৮টা পর্য্যন্ত সমস্ত দোকান একেবারে বন্ধ থাকাতে সুরাপায়ী ও মদের দোকানের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে রবিবার বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম চর্চ্চার দিন; সে দিন মদ্যপগণ সুরা হইতে বঞ্চিত থাকায় তাহাদের চিত্তের সুপরিবর্ত্তনেরই আশা করা যায়।

এই সময়ে এখানে একটী ক্ষুদ্র প্রদর্শনী বসিয়াছিল। (Industri—Ulstalningen ? Goteborg 1891.—Industrial Exhibition) একজিবিশনের চাকর বাকর গুলি অধিকাংশ স্ত্রীলোক, কালরঙ্গের লম্বা এক এক দরবেশী টুপি মাথায় দিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে ;—এক অভিনব দৃশ্য। কোথাও কলে ছাপা হইতেছে; কোথাও একটী বৈদ্যুতিক শক্তিতে একেবারে অনেক গুলি শেলাইয়ের কল চলিতেছে; কোথাও পালিশ করা গ্রাণাইট পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রদর্শিত; কোথাও মারবেল পাথরের নানারূপ কারখানা, আর এক স্থানে দেশালাই বাক্সের পাহাড় শ্রেণী বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত; অল্প স্থানের মধ্যে এইরূপ নানা জিনিসে মেলাটী মন্দ সাজান হয় নাই। স্থানীয় দেশালাইয়ের কারখানাগুলি প্রসিদ্ধ, এইজন্য মেলার মধ্যে দেশালাই বাক্সের অধিকার বেশী ও বিশেষরূপে দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে।

স্থানীয় মিউজিয়মটীতেও সমস্ত স্ত্রীলোক পরিচারিকা। এখানে অতি প্রাচীন খোদাডোমা (Canal) হইতে সুইডেন দেশের নানাপ্রকার নৌকা ও জাহাজের নকল প্রদর্শিত। তদ্ব্যতীত রাজপরিবারবর্গের সহস্রাধিক ছবি, রাজা রাণীদের হাতের লেখা ও সাবেক রাজা রাণীদের হাতের কার্‌চোপের কাজ করা মখ্‌মলের পরিচ্ছদাদি ও ৯০০০ হাজার পুরাতন মুদ্রা ও মেডেল রক্ষিত।

এখানকার থিয়েটার কাফেগুলি পারিসের ধরণের। ১৩ জুলাই অপরাহ্নে গোথা খালষ্টিমার "পালাসে" (SS pallas) গোতেবোর্গ ত্যাগ করিয়া রাজধানী ষ্টকহলম (Stockholm) যাত্রা করিলাম। এখান হইতে রেলপথেও যাওয়া যায় এবং অনেক কম সময়ে, কিন্তু গোথাখালের (Gotha Canal) সৌন্দর্য্যের বিষয় অনেক পর্য্যটকের মুখে শুনা থাকায় খালপথে চলিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মুসলমান সাহিত্য। (১)

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, মুসলমান জাতির সাহিত্য নাই। বিদ্বজ্জন সমাজে যাহা 'সাহিত্য' বলিয়া অভিহিত, মুসলমানজাতির তাহা কখনও আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। যাহাকে সাহিত্য বলা যায়,তীর-তরবারি-প্রিয় মহম্মদীয় পুরুষেরা তাহার সুমধুর আস্বাদ ভোগে কখনও লোলুপ হয় নাই। কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি মাত্রকে যদি সাহিত্য শব্দে আখ্যাত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মুসলমানী ভাষায় তাহা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকুক, অল্প নাই। জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্গীয়-লেখক "সাহিত্য" শব্দের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত বিবরণী সাহিত্যের অংশ

বলিয়া পরিগণিত হইলেও, সম্যক সাহিত্য নহে; সাহিত্য শব্দে একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়কে বুঝিতে হইবে। সাহিত্য, শ্রেণী বিশেষের চিত্র অথবা পুরুষ বিশেষের আন্তরিক বা বাহ্যিক লিপি-করণ (nature) বলিয়া সাধারণ সমীপে অভিহিত হয়, কিন্তু তাহাও পূর্ণ সাহিত্য নহে। * * * সাহিত্যে দুইটি বিষয়ের নিতান্ত আবশ্যক; এই দুইটির অভাব হইলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ ভাষার তেজ, গভীরতা ও লালিত্য; দ্বিতীয়তঃ ভাবের প্রাণ (Life of thoughts and sinews of sentiments)। * * * ভাষা সাহিত্যের প্রসূতি; লেখক, সাহিত্যের ভাব, এবং বর্ণিত বিষয়ের উদ্দীপনা, সাহিত্যের প্রাণ। * * * আমি তাহাকেই সাহিত্য বলি, যাহা আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়, আমি তাহাকেই সাহিত্য বলি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক সবল এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হয়; আমি তাহাকেই সাহিত্য বলি, যদ্দ্বারা আমার অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগতের জ্ঞান-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; পরিশেষে আমি তাহাকেই সাহিত্য বলি, যাহার সাহায্যে আমার ব্যক্তিগত ও জাতিগত চরিত্র সম্যকরূপে উন্নত হইয়া জগতের মহিমা বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।" (রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এল, ডি।

প্রোক্ত চিন্তাশীল লেখক মহাশয়ের ভাষার দুই একটি স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে গোলযোগ থাকিলেও, তাঁহার অভিমতি অবিমিশ্র সত্যে পরিপূর্ণ। সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত লেখক মহাশয় জনৈক ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন— "No nation can attain to greatness without literature of its own." অর্থাৎ পৃথিবীর কোনও জাতিই স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত মহত্ত্বের পবিত্র ও প্রশান্ত প্রাসাদে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। গত ভাদ্র সংখ্যার "নব্যভারতে" বাবু নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্-এ, মহোদয় সনেট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধেও আমি আমাদের সমাজস্থ লেখক মহাশয়দিগকে সেই কথাগুলি বলিতে পারি।

উপরে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা গিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমান জাতির সাহিত্য ছিলনা এবং নাই। পুস্তকের সংখ্যা প্রচুর হইলেও, সাহিত্য সম্পূর্ণ নহে; অঙ্গহীন মুসলমান সাহিত্যে ভাব নাই, তেজ নাই, গভীরতা নাই, ভাবের বিশালতা নাই এবং ভাষার লালিত্য থাকিলেও ভাষার "জীবন" নাই। বাঙ্গালা ভাষা, তুলনায় পারস্য ভাষাপেক্ষা অভিনব, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে তেজ, যে একপ্রাণতা, যে মধুরতা পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন পারস্যে তাহার অর্দ্ধাংশও নাই (১)। মুসলমানের সাহিত্য থাকিলে, তাহারা বোধ হয় এতদূর অবনত হইয়া পড়িত না। হিন্দুজাতির পতন হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অধঃপতন হয় নাই; সাহিত্য-তরুর ছায়ায় বসিয়া তাহারা জাতীয় প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

ফরাসীজাতির সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে। পতিত রোম, গ্রীক, ফরাসী বা হিন্দুর আবার উন্নত হইবার

(১) এই প্রস্তাব লেখকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা এবং পিতামাতা উভয়েই বাঙ্গালী। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেখকের জন্ম; পঞ্জাব ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মুসলমান সমাজে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে। লেখক, পারস্য, উর্দ্দু এবং আরব্যভাষায় পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই লেখক ভিন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় আর কোন বঙ্গবাসী কখনও পারস্য বা আরব্য ভাষা, 'দ্বিতীয় ভাষা' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। লেখকের বিরচিত অনেকগুলি পারস্য, উর্দ্দু এবং আরব্য গ্রন্থ আছে। মুসলমান সাহিত্য সম্বন্ধে ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। নব্যভারত-সম্পাদক।

ভরসা আছে, আবার সভ্যতা-গিরির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিবার আশা আছে,—কেবল আশা নহে, উপায়ও আছে; কিন্তু মুসলমানের আশা থাকিলেও উপায় নাই। অনেকে বলেন, আশা থাকিলে উপায়ও উদ্ভূত হয়; এখানে সে কথাটি খাটে না; আশা থাকিলে উপায় হয় না, "ইচ্ছা" থাকিলে উপায় হয়। মুসলমানের ইচ্ছাও নাই, উপায়ও নাই। ইচ্ছার দৃষ্টি হইলেও সহজে সে ইচ্ছা পূরণের উপায় কোথায়? তাহাদের জাতীয় সাহিত্য প্রাণবিহীন; গলিত দেহে, পলিত অস্থিতে, মাংস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যে কারণে মুসলমান জাতির অধঃপতন হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই তাঁহাদের সাহিত্যও অঙ্কুরে শুষ্ক হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সহিত সাহিত্যের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মুসলমান ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারা যায়। অতীব বিলাস মুসলমানজাতির অধঃপতনের কারণ; অতীব বিলাস তাহাদের সাহিত্যের অনুন্নতিরও মূলীভূত হেতু। অকস্মাৎ শারীরিক বীর্য্যের অসম্ভবনীয় স্ফূরণ দেখিয়া তাহারা নিতান্তই আত্মম্ভরী হইয়া উঠিয়াছিল; একদিকে পরস্বাপহরণ (লুণ্ঠন), অপর দিকে সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির উপভোগ! বিলাসের একশেষ! সুতরাং মন ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ স্ফূরণ পাইল না; জাতীয় সাহিত্য-প্রসূনও শুকাইয়া গেল। এদিকে জাতীয় সাহিত্যে ঘোরতর বিলাসিতা দেখা দিল; মুসলমানজাতি বিলাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; সুতরাং জাতীয় সাহিত্য কদাকারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে অসভ্যতার গভীর গহ্বরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সাহিত্য, সমগ্র মুসলমানজাতির জাতীয় স্বভাবের পূর্ণ চিত্র! এই চিত্র অশ্লীল, অপবিত্র আদিরস পূর্ণ এবং সমাজের দুর্নীতির প্রশ্রয়কারী। এই জন্যই বলিতেছি, প্রকৃত সাহিত্য, মুসলমানের নাই। এই জন্যই বলিতেছি, মুসলমানের যেমন অধোগতি হইয়াছে, এমন অধোগতি জগতের আর কোনও জাতির কখনও হয় নাই। হিন্দুর পতন হইলেও, বলে, বুদ্ধিতে, সাহসে, সহৃদয়তায়, স্বদেশবৎসলতায়, সুনীতিপ্রাণতায়, উচ্চশিক্ষায়, হিন্দু এখনও মুসলমানের সমাজ হইতে, তুলনায়, বোধ হয়, লক্ষগুণ অধিকতর উন্নতমঞ্চে অধিষ্ঠিত। হিন্দুর সমকক্ষ হওয়া মুসলমানের সাধ্যাতীত। হিন্দুসাহিত্যের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে, সেই শক্তি আমাদের রক্ষয়িত্রী, সেই শক্তি আমাদের পরিচালিকা। সুতরাং সাহিত্যের আবশ্যকতা নিতান্ত গুরুতর।

সমগ্র মুসলমান সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে এই সাহিত্য-তরুর অভ্যন্তরে কতকগুলি মহাদোষরূপ কীট দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—(ক) অশ্লীল আদিরসের ছড়াছড়ি (খ) অন্ধতা বা কুসংস্কার, (গ) অসত্য ও অসম্ভব ঘটনা, (ঘ) ভ্রমজালপূর্ণ অপদার্থ কল্পনা, (ঙ) সহৃদয়তা-শূন্যতা, (চ) বিজ্ঞানবিহীনতা, (ছ) চিন্তাহীনতা, (জ) পরধর্ম্ম ও পরদেশ প্রতি অনর্থক বিদ্বেষ অথচ স্বজাতি বা স্বদেশের প্রতি বাৎসল্যহীনতা। (ঝ) মহম্মদপ্রদত্ত উপদেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস (ঞ) বিচারহীনতা (ট) যুক্তিহীনতা, এবং (ঠ) ভাষার দিকে দৃষ্টি, ভাব বা চিন্তার দিকে দৃষ্টিহীনতা। বর্ণিত বিষয়ের দিকেও সকল সময়ে দৃষ্টি সমান দেখা যায় না; মুসলমানের ভাষায় লালিত্য ও "বাহাদুরী"

থাকিলেই হইল; বর্ণিত বিষয়ে যাহাই থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই!! অনুপ্রাসে যবন বড় সুখী; এইজন্য

"গড়ের মাঠে গরুর গাড়ী গড় গড়িয়ে যায়।
মনের সুখে মৌমাছি মধুচাক্ খায়॥"

ইত্যাদি ভাষা, মুসলমানের নিকটে "ঈশ্বরীয় ভাষা" বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

মুসলমান সাহিত্যের অনেক দোষ থাকিলেও একটি মহাগুণ আছে, সে গুণ আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নাই। আমাদের সাহিত্যে তাহা নাই বলিয়াই, এখনকার "গরুকাটা" হাঙ্গামায়, মুসলমানের হস্তে অসংখ্য হিন্দু হত হইতেছে। হিন্দুর সাহিত্যে সে গুণ কখনও ছিল কি না সন্দেহ, এবং শীঘ্র তাহা হইবে কি না, তাহাতেও সম্পূর্ণ সংশয়। সে গুণটীর কিছু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আমি সে গুণটির নাম "ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম" রাখিয়াছি। হিন্দুর বর্ণবিভাগে ক্ষত্রিয় আছে সত্য, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে (ক্ষত্রিয় নায়ক থাকিলেও) "ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম" নাই; নাই বলিয়াই, ম্লেচ্ছ পুরুষের হস্তে ভারতবর্ষ সপ্তশত বৎসর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে এবং তিন শত বর্ষকাল ব্যাপিয়া শ্বেতমূর্ত্তির পদধূলি লেহন করিতেছে।

মুসলমান জাতি, হিন্দুজাতি অপেক্ষা বীর্য্যশীল এবং আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। শারিরীক উন্নতিতে মুসলমান হিন্দুকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে; "হৃদয়" বলিয়া কোনও পদার্থ মুসলমানের আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু মুসলমানে "মন" বলিয়া যে পদার্থ আছে, হিন্দুতে তাহা নাই। হিন্দুতে পূর্ণ হৃদয় এবং অর্দ্ধ "মন" আছে, মুসলমানের শূন্য হৃদয় পার্শ্বে পূর্ণ "মন" দেখিতে পাইবেন। হিন্দু যে মুসলমান হইতে শত বা সহস্র গুণে হীনবীর্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। যাঁহারা এ কথার প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে দুইচারিটি কথায় নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমেই দেখ, সমগ্র পৃথিবীতে "আপনার" বলিয়া পরিচয় দিবার একখণ্ড ভূমিও হিন্দুর নাই, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর পঞ্চমাংশ এখনও মুসলমানের পদতলে পর্য্যুদস্ত!! তাতার, আরব্য, পারস্য, আফগানিস্থান, তুরকিস্থান, মিশর, বেলুচীস্থান প্রভৃতি এখনও মুসলমান শাসিত, কিন্তু হিন্দুর একখণ্ড জমিও "নিজের" আছে কিনা সন্দেহ। যদি মুসলমান আমাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী না হইবে, তাহা হইলে এই গোহত্যা হাঙ্গামে হিন্দু পর্য্যুদস্ত হইল কেন? কেমন করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করতঃ সমগ্র ভারতকে পদতলে রাখিয়া সহস্রবর্ষ কাল হিন্দুর উপরে মুসলমানজাতি আধিপত্য বিস্তার করিল? হিন্দুজাতি কি সাধ্যসত্ত্বে মুসলমানকে পরাজিত করিতে ত্রুটি করিয়াছে? এ কথায় অনেকে বলিবেন, "কৌশলে ইহারা ভারত জয় এবং ভারত শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" আমি তারস্বরে এই অসত্য কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত আছি। মুসলমানের যতই দোষ থাকুক, মুসলমান "দাগাবাজ" নহে। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করতঃ বৈরির মস্তক ভঙ্গ করা মুসলমানের জাতীয় স্বভাবের বিরুদ্ধ; এ স্বভাব ইংরাজ বা আর কাহারও থাকিতে পারে, মুসলমানের নাই। এই মহা গুণের জন্য আমি মুসলমানের বড়ই প্রশংসা করি। মুসলমান প্রকাশ্যভাবে ভারতে আসিয়াছে, প্রকাশ্যভাবে লড়িয়া ভারত লইয়াছে। এ কথার আদৌ প্রতিবাদ হয় না। থানেশ্বর সমরে মহাবলী বাবর,

সেখ ফরিদকে যাহা বলিয়াছিলেন, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"Politeness and polity we know not; we—the followers of Hajrut Mahomet—know one thing, and that is this: MIGHT IS RIGHT * * * Make me a bull if you can, but pray, make me not an owl of a man." অর্থাৎ "ভদ্রতা এবং কৌশল আমরা জানি না; আমরা একটি বিষয় জানি, তাহা এই——জোর যার মুল্লুক তার। * * * আমাকে বৃষরূপে পরিণত কর, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভাই আমাকে পেচকরূপে পরিণত করিও না।"

কি সুন্দর কথা!!

"ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসনের ইতিহাস কপটতা ও কৌশলতার ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; মুসলমানের দশ শত বর্ষের ভারতীয় ইতিহাস বলপ্রয়োগ এবং সুশাসনের ইতিহাস।" (দাদাভাই নাউরোজী)। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে, মুসলমানে-হিন্দুতে বিবাহ ঘটিয়াছে—বলে; মুসলমানের ভাষা হিন্দুর ভাষাকে লুপ্ত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—বলে। এদিকে দেখ, ইংরাজ মহাপ্রভু তোমাকে বাইবেল পড়াইয়া, তোমার গৃহিণী সমীপে "জেনানা" পাঠাইয়া তোমাকে তোমার ধর্ম্মনিন্দা শুনাইয়া কত প্রকার কৌশলে তোমাকে খ্রীষ্টান করিতে চাহেন; তাহাতেও তুমি সন্তুষ্ট না হইলে, পাদ্রীপ্রভু "মথিলিখিত সুসমাচারের" ষষ্ঠ অধ্যায় খুলিয়া তোমাকে দেখাইবেন। "First seek ye the kingdom of Heaven, then everything shall be added unto you." St. Mathew. Ch. VI. 33.

অর্থাৎ প্রভুযিশু বলিয়াছেন, "তুমি প্রথমে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তদন্তর সমুদয় দ্রব্য তোমার হস্তগত হইবে।" এখানে "স্বর্গরাজ্য" (Kingdom of Heaven) অর্থে "খ্রীষ্টান হওয়া"; "সমুদয় দ্রব্য" (every thing) অর্থে "তোমার ভাত, কাপড়, বিবাহ, চাকুরী, সহায়" ইত্যাদি। পাদ্রীসাহেব বাহাদুরগণ, বাইবেলের এইরূপ অর্থ করিতেছেন!!

এদিকে মুসলমান কি বলিতেছে, শুন—

(ক) "লা ইল্লা মহম্মদ রশুলেল্লা।" (কোরাণ)।

(খ) "লা মাবুব্ নল হুদা; কাফারে লা লীলা হুদা; বতোর্ সৈয়া কুলুগ্ মা ইয়াল্ হুমুহুদা।" (কোরাণ)।

ইহা মূল কোরাণের কথা। অনুবাদ এই—"(ক) ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদকে না মানিলে ঈশ্বরসমীপে যাওয়া যায় না।" (খ) "আমাদের (মুসলমানদের) মত অন্য ধর্ম্ম (উচ্চ) নাই; অ-মুসলমানেরা ধর্ম্ম জানে না; কোরাণের কথা শুনাও, তাহারা না শুনিলে (কলে কৌশলে নহে, ছলে বলে নহে) অস্ত্র দ্বারা শিক্ষা দাও।" এখন দেখ, দাগাবাজী, কপটতা, কৌশল, দ্বি-হৃদয়তা প্রভৃতি দোষাবলী, তাহাদের কোরাণের অনুজ্ঞার বিরোধী। তাহাতেই বলিতেছি, "বলে" মুসলমান হারিলে, "ছলে"র ভরসা রাখে না। কেন রাখে না, জান কি? তাহাদের সাহিত্যের নীতি এইটি—"খোদা (ঈশ্বর) তোমাকে বল দিয়াছেন, 'ছল' দেন নাই।" কোরাণের এক স্থানে লেখা আছে "হে মুসলমান! খোদা (পরমেশ্বর) তোমাকে দুই হস্ত এবং এক জিহ্বা দিয়াছেন; ইহাতেই বিবেচনা কর, অধিক বাক্যব্যয়ে ফল নাই; দুই হস্ত দিবার অর্থ এই যে, বল প্রয়োগে তুমি শিক্ষিত হও; বলে তুমি দিগ্বিজয়ী হও। মুসলমান সাহিত্য এই বলের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, সম্পূর্ণ প্রশ্রয়দাতা। যবনজাতি প্রথমে এই "বল" দিগ্বিজয়ে ব্যয় করিয়াছিল, তাহাতে স্পেন, ইংলণ্ড এবং পর্টুগাল পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হয়; তদন্তর বিলাসে ব্যয় করিয়া বিনষ্ট, বিকৃত এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিলাসের বিশাল বারিধিতে নিমগ্ন না হইলে, না জানি, জগতের মানচিত্রে মুসলমানজাতির আজ কোথায় স্থান হইত!

মুসলমানের এই অত্যাশ্চর্য্য প্রতাপ যেন শাল্মলীতরুর বিশাল পত্র রাশির অগ্নির ন্যায় হঠাৎ জ্বলিয়াই "নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ" থামিয়া গেল; বাত্যার পরে যেন প্রকৃতি সুন্দরী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু এখনও সে অগ্নি সম্পূর্ণরূপে থামে নাই, এখনও ভিতরে ভিতরে ধুঁইয়া ধুঁইয়া উঠিতেছে। কেন উঠিতেছে? তাহার কারণ আছে। তাঁহাদের সাহিত্যপ্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে যে অগ্নি রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে মুসলমান সাহিত্য নিজেই ইন্ধন রূপে অগ্নিকে সতেজ করিয়া দিতেছে। মুসলমান সাহিত্য পড়িয়া দেখ, দেখিবে, তাহাদের সমগ্র সাহিত্য মুসলমানীয় ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান। এই ধর্ম্মভিত্তি খসিয়া পড়িলে, মুসলমান সাহিত্য, মুসলমান ভাষা, মুসলমানজাতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। একজন সুবিজ্ঞ মুসলমান লেখক বলেন, Minus Mahometanism, Mahomedans, as a nation, are mere cipher." অর্থাৎ মুসলমানত্ব বাদ দিলে, মুসলমানের কিছুই থাকে না। মুসলমানত্ব বাদ দিয়া দেখ, মুসলমান যেন মেষের ন্যায় নম্র, ছাগের ন্যায় ভীত, গর্দ্দভের ন্যায় নির্ব্বোধ এবং কোটর-কীটের (Sloth) ন্যায় অলস। আবার ঐ মুসলমানকে + Mahometanism (এই চিহ্ন + যোগের চিহ্ন) কর, মুসলমান যেন "পূর্ণ পাঠান" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় সাহিত্যের এই গুণ, মুসলমান-সাহিত্যে আছে। এইজন্যই বলিতেছিলাম,

A Mahomedan – Mahometanism = 0
A Mahomedan + Mahometanism = 1

স্বীকার করি, মুসলমানী সাহিত্য ধর্ম্মান্ধতায় পরিপূর্ণ; এই অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস—এই যুক্তি ও বিচারবিহীন ধর্ম্মভক্তি—কেবল মুসলমানের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, এমন নহে, জগতের অপরাপর জাতিরও সম্যক প্রকারে অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে। ধর্ম্ম ("দিন্") বলিলে, মুসলমানের দেহস্থ শোণিত উষ্ণ হয়, বিশালবক্ষে সাহস আসিয়া উপস্থিত হয়, হস্তে বল সঞ্চার হয়, প্রাণ হইতে ভয় চলিয়া যায়, তরবারীর কাষ্ঠ আবরণ কাঁপিয়া উঠে এবং সম্মুখে স্বর্গের মূর্ত্তি দেখা দেয়। হিন্দুর সাহিত্যে এ অপূর্ব্ব ভাব নাই। মুসলমানেরা এই অপূর্ব্ব ভাব হইতে বল, বিক্রম, সাহস ও বিদ্বেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এই ভাব হইতেই মুসলমান ধর্ম্ম Politico-religion (অর্দ্ধ-রাজনৈতিক অর্দ্ধ-ধর্ম্মনৈতিক) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বাবা নানক এই উদ্দেশেই শিখ ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, পরিশেষে কালক্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল না। মুসলমানেরা জন্মভূমি বুঝে না, স্বজাতিমহত্ত্ব জানে না; কেবল বুঝে ও জানে—ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই তাহাদের সাহিত্যের ভাল মন্দ সকল বিষয়েরই ভিত্তি। এই ধর্ম্ম সাহিত্যের তেজে, হিন্দু (কাফের) হত্যা করিয়া মুসলমান নৃত্য করে; গো বধ করিয়া গীত বাদ্যে উন্মত্ত হয়। এবং ইহার অভাবেই, হিন্দুসন্তান হস্তী দেখিলে সহস্র হস্ত দূরে পলায়, ঘোড়া দেখিলে ঘুরিয়া পড়ে, রাত্রিতে ঘরের বাহিরে আসিলে গৃহিণীর অঞ্চল আশ্রয় করে এবং সহোদরের পৃষ্ঠে ম্লেচ্ছ-পুরুষের পাদুকা পতিত হইতে দেখিলেও একটি কথা বলিতে সাহসী হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২—৩ শ্লোক।

এই ক্ষত্রিয় জনোচিত কথা রহিয়াছে বটে, কিন্তু জাতিতে বা জাতীয় সাহিত্যে এই কথা মৃতবৎ বর্ত্তমান। কবিবর রঙ্গলাল বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্যে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" ইত্যাদি।

বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু সে কথার জীবনীশক্তি আছে কি না সন্দেহ। হেম বাবুর ভারতসংগীত অথবা গোবিন্দ বাবুর "কতকাল পরে" সংগীত জগতে অতুল; তাহাতে প্রাণ থাকিলেও পরপদদলিত জাতির সাহিত্যে তাহা বিশেষ শক্তি বিকীর্ণ করিতে পারে নাই। যদুগোপাল বাবুর।

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে,
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর।
সেইরূপ সমুদয় মেদিনী মাঝারে,
আছে এক দিব্যস্থান অতি মনোহর।" ইত্যাদি

এইরূপ অনেক কথাই আছে, কিন্তু ইহা ইংরাজীর অনুবাদ! ইহার ভাষা বাঙ্গালীর; ইহার ভাব—ইংরেজের। ভারতীয় ভাষারূপী জাহাজে আমরা এই ভাবরূপী বাণিজ্য বিলাতী বাজার হইতে আমদানী করিয়াছি। মুসলমান সাহিত্যে এই (Foreign importation) পরদেশীয় আমদানী নাই। তাহাতেই বলিতেছিলাম, হিন্দুর সাহিত্যে "ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম" নাই; হিন্দুর ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, সুতরাং রাজনৈতিক ধর্ম্মের বিশ্লেষণ ইহাতে পাইবে না। ইংলণ্ডের "England expects every man to do his duty" একথা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নাই বটে; মুসলমানের ধর্ম্ম-তেজ আমাদের ধর্ম্ম সাহিত্যে নাই বটে; কিন্তু তাহা না থাকিলেও এখনও যাহা আছে, তাহার সংস্কার হইলে এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলে, ভারতীয় পতিত জাতি আবার উন্নত হইতে পারিবে, এমন আশা কি করা যায় না?

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

অনাত্মবাদের অযৌক্তিকতা। (১)

এক শ্রেণীর তার্কিক আছেন, তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের মধ্যে যে পদার্থকে আত্মা, বা মন বলিতেছ, উহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। উহা জড়েরই গুণ বা ফল। আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য রহিয়াছে, উহা দেহ বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া।

এই মত সম্বন্ধে সহজেই ইহা মনে হয় যে, জড় ও আত্মা পরস্পর বিপরীত। আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ, জড়ের গুণ। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা মনের গুণ। একের গুণ অন্যে নাই। জড় ও চৈতন্যের গুণ পরস্পর বিপরীত।

গুণ বা লক্ষণদ্বারা আমরা পদার্থ সকলকে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারি। যখন জড় ও মনের গুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন কি, যখন জড় ও মন বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, তখন একটীকে অপরের ক্রিয়া বা গুণ বলা;—মনকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলা কেমন করিয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

অনাত্মবাদী ইহার উত্তরে বলিতে পারেন যে, জড় পরমাণুর বিশেষ সংযোগে নূতন গুণের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যে কয়েক প্রকার জড়ের সংযোগ হইল,

তাহার প্রত্যেকটিতে যাহা নাই, সংযুক্ত নূতন পদার্থটিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। চূর্ণ লোহিত নহে, হরিদ্রাও লোহিত নহে; কিন্তু এই উভয়ের সংযোগে যে নূতন বস্তু (চুণে হলুদ) উৎপন্ন হইল, উহার বর্ণ লোহিত। জড়ের রাসায়নিক সংযোগে নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, ইহা কে না জানেন? যে কয়েক প্রকার জড়কে সংযুক্ত করা হইল, তাহার কোনটিতে মাদকতা গুণ নাই, কিন্তু সকলগুলি সংযুক্ত হইয়া যে নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হইল, তাহা মাদকতা গুণ সম্পন্ন। এইরূপে বহুপ্রকার ঔষধের সৃষ্টি হইতেছে। জড় পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে, রোগ-আরোগ্যকারী শক্তিসম্পন্ন ঔষধের উৎপত্তি হইতেছে।

এ কথার সহজ উত্তর এই যে, জড়ের বিশেষ সংযোগে যাহা হয়,তাহা জড়েরই গুণ। হাইড্রজিন ও অক্সিজিনের রাসায়নিক সংযোগে জল হয়। নাইট্রজিন ও অক্সিজিনের বিশেষ সংযোগে বায়ুর উৎপত্তি হয়। জড়ের সংস্পর্শে যাহা হয়, তাহা জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইহার ব্যভিচারস্থল কোথাও দৃষ্ট হয় না। কেহ কখন কি জড়ের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যত প্রকার রাসায়নিক সংযোগ কর না কেন, তাহাতে জড় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না।

যেমন চূর্ণ ও হরিদ্রায় "চুণে হলুদ; হাইড্রজিন, অক্সিজিনে জল; নাইট্রজিন, অক্‌জিনে বায়ু; সেইরূপ, জড়পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে কি কেহ কখন চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন?

বৈজ্ঞানিক একটা সিসি হইতে একপ্রকার আরক,' আর একটা সিসি হইতে আর এক প্রকার আরক, এইরূপ পাঁচটা সিসি হইতে পাঁচ প্রকার আরকের বিশেষ পরিমাণ ঢালিয়া মিশাইলেন, আর অমনি জ্ঞানের উৎপত্তি হইল! আবার পাঁচটা সিসি হইতে পাঁচ প্রকার পদার্থের এমন বিশেষ সংযোগ করিলেন যে, বিচার-শক্তির উদ্ভব হইল! আর একটা আল্‌মারি হইতে অন্য কয়েকটা সিসি লইয়া দয়া ও প্রেম উৎপন্ন করিলেন! ইহা কি কখন সম্ভব হইয়াছে? ইহা কি কেহ কখন করিতে পারিয়াছেন? জড়ের যোগে যাহা হয়, তাহা জড়েরই গুণ। সুতরাং জড়ের যোগে চেতনার উৎপত্তি অবৈজ্ঞানিক কথা।

এস্থলে অনাত্মবাদী বলিবেন যে, জড়ের সেই বিশেষ প্রকার সংযোগ,—বিশেষ বিন্যাস, মনুষ্য এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই বলিয়াই জড়ের সংযোগে চেতনাউৎপাদন করিতে সক্ষম নহে। যদি জানিতে পারিত, নিশ্চয়ই জড়সংযোগে চৈতন্য সৃষ্টি করিতে পারিত।

ইহা একটা কল্পনা মাত্র। বিশেষ প্রকার জড়ের বিশেষ সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাকে অনুমান বলিতে পারি না। কেন না, অনুমানের একটা মূল থাকে। এমন কিছু থাকে, যাহা অবলম্বন করিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকে। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্য উৎপত্তির কোন মূল নাই;—এমন কিছু নাই, যাহাতে মনে করিতে পারি যে, জড় চৈতন্যরূপে পরিণত হইল।

এস্থলে অনাত্মবাদী বলিবেন যে, জড় হইতে যে চৈতন্যের উদ্ভব হয়, ইহা প্রকৃতি-রাজ্যে সর্ব্বদাই দেখা যায়। জরায়ুজ, অ-

গুজ, ও স্বেদজ জীব সকলের উৎপত্তি দেখিতেছি। মাতৃগর্ভে শুক্রশোণিত হইতে জরায়ুজের উৎপত্তি, ডিম্বের বিকাশ হইয়া ক্রমে অণ্ডজের উৎপত্তি; এবং মলিন স্থান সকল হইতে স্বেদজের জন্ম হইতেছে। সুতরাং সকল স্থানেই জড় পরমাণু হইতে জীবের জড়দেহ এবং দেহস্থিত চৈতন্যের উৎপত্তি দেখিতেছি।

লোকে অনেক সময় মুখে বলে, দেখিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক দেখে না। জড় হইতে জড়পুত্তলিকা সকল নির্ম্মিত হইতেছে, মৃত্তিকা ও ধাতু হইতে বিবিধ পাত্র গঠিত হইতেছে, দেখিতেছি, এবং উহা সহজেই মনে করিতে পারি। সেইরূপ জড়পরমাণু হইতে জীবদেহের উৎপত্তি সহজেই বুঝি ও মনে করিতে পারি। কিন্তু জড় ও চৈতন্য পরস্পর বিপরীত। সুতরাং চক্ষু দ্বারা দর্শন করা দূরে থাক্, জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব আমরা মনেও ভাবিতে পারি না। জড়পরমাণু হইতে জড়দেহ হইল, বুঝিলাম; কিন্তু চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? জড় পরিবর্ত্তিত হইয়া,—জড়ের বিকাশে চৈতন্য হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? ঐশীশক্তি হইতে অন্য প্রকারে স্বতন্ত্র-ভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা নিশ্চয়রূপে কেমন করিয়া জানিলে?

অনাত্মবাদী বলেন, মস্তিষ্ক হইতেই মন বা চেতনার উৎপত্তি। ('Mind is the function of the brain.') অনাত্মবাদী বলিতেছেন, মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা ফল মন।

এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল কি বলেন? তাড়িত প্রবাহ দ্বারা (Electrical current) একটি চুম্বক শলাকার (Magnetic needle) কেমন করিয়া স্থানচ্যুতি (Deflection) হয়, তাহার সহিত মস্তিষ্কের অবস্থা ও মনের অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ তুলনা করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, এই বিষয়ে তিনি বলিতেছেন;—

"The cases differ in this, that the passage from the current to the needle, if not demonstrable, is thinkable, and that we entertain no doubt as to the final mechanical solution of the problem. But the passage from the physics of the brain to the corresponding facts of consciousness is unthinkable. Granted that a definite thought, and a definite molecular action in the brain, occur simultaneously: we do not possess the intellectual organ, nor apparently any rudiment of the organ, which would enable us to pass, by a process of reasoning, from the one to the other. They appear together, but we do not know why. Were our minds and senses so expanded, strengthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain; were we capable of following all their motions, all their groupings, all their electrical discharges, if such there be; and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling, we should be as far as ever from the solution of the problem. 'How are these physical processes connected with the facts of consciousness? The chasm between the two classes would still remain intellectually impassable. (Fragments of Science. Scientific Materialism. P. 420, 5th ed. 1876.)

উপরি উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তাড়িত-প্রবাহ দ্বারা কেমন করিয়া চুম্বকশলাকার স্থানচ্যুতি হয়, ইহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও, বিষয়টি আমাদের নিকট একেবারে অচিন্তনীয় নহে। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও, পরিণামে যে নিশ্চয় উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মস্তিষ্কের সহিত মনের সম্বন্ধ সে প্রকারে বুঝিতে পারার কোন সম্ভাবনা নাই।

শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র। বিজ্ঞানের মতে মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র, এই পর্য্যন্ত। মস্তিষ্ক হইতে মনের উৎপত্তি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া মন; বিজ্ঞান এমন কথা বলেন না।

এ স্থলে অনাত্মবাদী তার্কিক বলিতে পারেন যে, মন বা আত্মা যখন মস্তিষ্ককে

অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে, তখন, ইহা বলিতেই হইবে যে, মস্তিষ্ক যখন থাকিবে না, তখন মন বা আত্মার কার্য্য অবশ্য রহিত হইবে।

এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বাদ্যযন্ত্র ও বাদকের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব বাদকের অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে না। বাদ্যযন্ত্র আছে, উহা বাজিতেছে; সুতরাং প্রমাণ হইল যে, বাদক নাই। কোন তার্কিক এমন অদ্ভুত তর্ক করেন কি? যন্ত্রের সত্তা, যন্ত্রীর সত্তাকে অপ্রমাণ করেনা। ইহাই যদি হইল, তবে মস্তিষ্করূপ যন্ত্র আছে বলিয়া মন বা আত্মারূপ যন্ত্রীর সত্তা কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে?

বাদক ভাল হইলেও, বাদ্যযন্ত্র যদি খারাপ হয়, তাহা হইলে উহা ভাল বাজে না। উৎকৃষ্ট বাদক হইলেও তিনি ভাঙা ঢোলে ঠিক্ মনের মত করিয়া কখনই বাজাইতে পারেন না।

এস্থলে অনাত্মবাদী বলিতে পারেন, "যখন শরীর রূপ বাদ্যযন্ত্র নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন কি হইবে?"

ইহার সহজ উত্তর এই যে,একটা ঢোলক কি সেতার ভাঙ্গিয়া গেলে, বাদক কি আর একটা সেতার কি ঢোলক প্রাপ্ত হয় না? যে পরমেশ্বর একটি দেহরূপ যন্ত্র দিয়াছেন, তিনি কি অন্যরূপ যন্ত্র দিতে পারেন না? অথবা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি কি আত্মাকে এমন শক্তি দিতে পারেন না যে, আত্মা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আপনার চিন্তা প্রভৃতি কার্য্য চালাইতে পারিবে? ঐশীশক্তির পক্ষে ইহা কি অসম্ভব?

অনাত্মবাদী বলেন, জীবের মধ্যে যে চৈতন্য রহিয়াছে, উহা দৈহিক পরমাণুর কার্য্য বা ফল। আত্মার একত্ব একথা খণ্ডন করিয়া দিতেছে।

আমি অখণ্ড এক। সহস্র প্রকার জ্ঞান, ভাব ও বাসনার মধ্যে আমি এক। পাঁচশত প্রকার মানসিক অবস্থার উদয় হইতেছে; কিন্তু সকলগুলি **আমার।** সকলগুলির সঙ্গে **এক আমির** সম্বন্ধ।

পদ্মাস্রোতের ন্যায় অগণ্য মানসিক অবস্থা চলিয়া যাইতেছে। মানসিক অবস্থা সকল আসে, যায়। স্থিরভাবে থাকে না। তাহার মধ্যে স্থায়ী ভাব দেখিতে পাই না। কিন্তু স্থায়ী কি? সকল অবস্থায় চিরদিন স্থায়ীভাবে কে রহিয়াছে? এক স্থায়ী **আমি বা আত্মা।**

এক আমি না থাকিলে, বহু মানসিক অবস্থার অর্থ থাকে না।

দর্শন শাস্ত্রানুসারে আমাদের মানসিক অবস্থা সকল, জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিন ভাগে বিভক্ত। সহজেই এই প্রশ্ন আসে, কাহার জ্ঞান, কাহার ভাব, কাহার ইচ্ছা? ইহার একমাত্র উত্তর **আমার।** মূলে এই এক **আমার** না থাকিলে কোন মানসিক অবস্থার কোন অর্থ থাকে না। উহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। সকল মানসিক অবস্থা এক আমি বা আত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে।

পরশ্ব আমি, অদ্য আমি, কল্য আমি; সেই এক আমিই চিরদিনই আছি। অথচ গণনাতীত ভাবস্রোত ক্রমাগত বহিয়া যাইতেছে। যেমন নদী ও তাহার তরঙ্গনিচয়, সেইরূপ আত্মা ও তাহার অগণ্য অবস্থা। স্থায়ী নদীতে অগণ্য তরঙ্গমালা

উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। সেইরূপ স্থায়ী আমাতে বা আত্মাতে অগণ্য ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। "কত ঢেউ উঠ্‌তেছে, দেল্‌দরিয়ায়।" চুল্লিস্থ পাত্রে উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত জলের ন্যায়, ভাত ফোটার ন্যায়, আমাদের ভিতরে চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা ক্রমাগত উঠিতেছে ও অদৃশ্য হইতেছে। কিন্তু মূল আমি চিরদিনই বর্ত্তমান। আমি এক, ইহা বিশ্বজনীন, অখণ্ডনীয়,স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। কেহ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়, আপনি কয় জন?" তাহা হইলে তুমি তাহাকে নিশ্চয়ই উন্মাদ মনে কর। আমি এক, ইহা স্বাভাবিক, সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, অখণ্ডনীয়, বিশ্বজনীন বিশ্বাস।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মার এই একত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল? জড় বহু বহু অংশের সমষ্টি। জড়বাদীর মতে জড় পরমাণুপুঞ্জ। অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি জড়খণ্ড। তবে একত্ব-বোধ কোথা হইতে আসিল? কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কেমন করিয়া থাকিবে?

একটি উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষ তাহার ব্যষ্টি। সমগ্র উদ্যানটি বৃক্ষের সমষ্টি। সেইরূপ মস্তিষ্কের প্রত্যেক অণু (molecube) ব্যষ্টি। সমগ্র মস্তিষ্ক সমষ্টি। মস্তিষ্ক বহু অণুর সমষ্টি, এক নহে।

যদি বল মস্তিষ্কই চেতনার কারণ, তাহা হইলে সেই চেতনার একত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বহু হইতে এক কেমন করিয়া আসে? বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের যদি আত্মজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক বৃক্ষ মনে করিত, আমি এক বৃক্ষ। সমগ্র বাগানের একত্ববোধ কখনই সম্ভব হইত না। বৃক্ষ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; সুতরাং প্রত্যেক বৃক্ষ আপনাকে স্বতন্ত্রই ভাবিবে।

সেইরূপ মস্তিষ্কের প্রত্যেক অণু বা পরমাণুর আত্মজ্ঞান আছে, মনে করিলে, ইহাই ভাবিতে হয় যে, প্রত্যেক অণু বা পরমাণু আপনাকে এক ভাবিতেছে। সুতরাং সমগ্র মস্তিষ্ক আপনাকে অবশ্যই বহু ভাবিবে। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, বহুর মিলনে এক হইল। তাহা কেমন করিয়া হইবে? বহু হইতে এক কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে? কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কোথা হইতে আসিবে? উহা কার্য্য কারণ সম্বন্ধীয় নিয়মের বিরুদ্ধ। তবে আমাদের আত্মজ্ঞানের অখণ্ডনীয় একত্ব কোথা হইতে আসিল?

সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, বিভিন্ন যন্ত্রের অনেক সুর একত্র হইয়া যখন এক হয়, তখন মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অণুর জ্ঞান একত্র ও মিলিত হইয়া এক হইবে না কেন?

বিভিন্ন যন্ত্রের বিভিন্ন সুর একত্র হইয়া আমাদের নিকট এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক ঐ সুর সকল বিভিন্ন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে এক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন। যদি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আরও তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ হইত, তবে উহাদের স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারিতাম।

আর একটী কথা ভাবিয়া দেখ, যদি ঐ প্রত্যেক সুরের আত্মজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক সুর আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিত কি না? অপর ব্যক্তি তাহাদিগের

স্বতন্ত্রতা অনুভব করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক ভাবিত, সত্য; কিন্তু সুর সকল প্রত্যেকে আপনাকে অবশ্য স্বতন্ত্র ভাবিবে। উদ্যানের বৃক্ষ সকলের আত্মজ্ঞান থাকিলে, প্রত্যেক বৃক্ষ যেমন আপনাকে অবশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিত, সেইরূপ মস্তিষ্কের প্রত্যেক অণুও আপনাকে অবশ্য স্বতন্ত্র ভাবিত। অর্থাৎ মস্তিষ্ক হইতে জ্ঞান আসিতেছে বলিলে উহার প্রত্যেক অণু হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান আসিতেছে বলিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানের একত্ব সম্ভব হইল না। আমি এক, এই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন জ্ঞানকে জড়বাদী ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। জড়বাদ সত্য হইলে আমাদের অখণ্ডনীয় আত্মজ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না। আমাদের আত্মজ্ঞানের একত্ব (Unity of the ego) জড়বাদ বা অনাত্মবাদকে খণ্ডন করিতেছে।

আত্মার একত্বের ন্যায় ব্যক্তিগত একত্বও (Personal identity) জড়বাদ বা অনাত্মবাদকে খণ্ডন করিতেছে। শারীরবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনূর্দ্ধ সাত বৎসরের মধ্যে মানবদেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শরীরের অংশ বাহির হইয়া যাইতেছে, অন্য জড়পরমাণু আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিতেছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনূর্দ্ধ সাত বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেহ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হয়। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা দেহের ক্ষয় হইতেছে। আহারের দ্বারা সেই অভাব নিয়মিতরূপে পূর্ণ হইতেছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের পরমাণু কিছুই থাকিতেছে না, নূতন পরমাণু আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে। যদি কোন ইষ্টকালয়ের একখানি করিয়া ইষ্টক খসাইয়া লওয়া হয় ও তাহার স্থানে অন্য ইষ্টক স্থাপন করা হয়,—জানালা, কবাট, কড়ি, বরগা সকলই যদি এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইষ্টকালয়টী দেখিতে বহুল পরিমাণে পূর্ব্বের ন্যায় থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পূর্ব্বের কিছুই আর তাহাতে থাকে না। মানবদেহ সম্বন্ধেও তাহাই। অনূর্দ্ধ সাত বৎসরের মধ্যে মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমুদায় দেহ নূতন হইয়া যায়। সাত বৎসর পূর্ব্বে যে দেহ ছিল, তাহার একটি পরমাণুও বর্ত্তমান দেহে থাকে না। বিজ্ঞান এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

দেহের বিষয়ে যেরূপ, আত্মা সম্বন্ধেও কি সেইরূপ হইতে পারে? এ বিষয়ে আত্মা নিঃসংশয়ে কি বলিতেছে? যে আমি সাত বৎসর পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমিই এখন আছি, ইহাই কি আত্মার বাণী নহে? ইহাই কি মানবের নিঃসংশয়, অবিনশ্বর, বিশ্বজনীন, মৌলিক জ্ঞান নহে? যদি জড়ই চৈতন্যের কারণ হয়, তবে যে আমি সাত বৎসর বা চৌদ্দ বৎসর বা আটাইস্ বৎসর পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমিই এখন রহিয়াছি, এই সুনিশ্চিত জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভব হয়? কারণের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও চলিয়া যায়। কিন্তু দৈহিক জড়পরমাণুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই, এই জ্ঞান তো কাহারও চলিয়া যায় না,—অনাত্মবাদীরও যায় না।

এস্থলে অনাত্মবাদী বলিতে পারেন যে, পরিবর্ত্তন একবারে হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। সুতরাং এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বের পরমাণু সকল নবাগত পরমাণু দিগ-

য়কে তাহাদের আত্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে দিয়া যাইতেছে। এ কথায় আপত্তি এই যে, যখন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, পূর্ব্বের পরমাণু চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে নূতন পরমাণু আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে মানবদেহ নূতন হইয়া যাইতেছে। তখন চৈতন্য জড়েরই ক্রিয়া বলিলে দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কারণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও অবশ্য পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের দেহ যখন নাই, তখন বলিতেই হইবে যে, পূর্ব্বের চৈতন্য নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বর্ত্তমান দেহ যেমন পূর্ব্ব দেহের অনুরূপ, সেইরূপ বর্ত্তমান চৈতন্যও পূর্ব্ব চৈতন্যের অনুরূপ। দৈহিক একতা যেমন নাই, সেইরূপ চৈতন্য সম্বন্ধীয় একতাও থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান দেহ যেমন পূর্ব্ব দেহের তুল্য, সেইরূপ বর্ত্তমান চৈতন্য পূর্ব্ব চৈতন্যের তুল্য, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। অনাত্মবাদীর যুক্তি অনুসারে তুল্যতা প্রমাণ হয়, একত্ব প্রমাণ হয় না।

কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের স্মৃতি বলিতেছে, আমি সেই। সাত বৎসর বা চৌদ্দ বৎসর বা অষ্টাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি। আমি পূর্ব্ব মনুষ্যের তুল্য, স্মৃতি এমন কথা বলে না। আমি সেই, ইহাই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, অখণ্ডনীয় জ্ঞান। আমি সেই গোপাল, সেই হরি বা সেই রাম, তাহার তুল্য নূতন কোন ব্যক্তি, এরূপ নহে। আমাদের স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি কোটী কণ্ঠে একথা ব্যক্ত করিতেছে।

অনাত্মবাদী বলিতে পারেন যে, পরিবর্ত্তিত হইবার সময় পূর্ব্বের পরমাণু নবাগত পরমাণুদিগকে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত একত্বের জ্ঞানও দিয়া যাইতেছে।

ইহা অতি ভয়ানক কথা। প্রকৃতি কি দিবা রজনী মিথ্যা কথা বলিতেছে? পূর্ব্ব দেহের একটি পরমাণুও নাই। সুতরাং দেহোৎপন্ন চৈতন্যও সম্পূর্ণরূপে নূতন হইয়া গিয়াছে। তবে আমি কেমন করিয়া মনে করি যে, এই আমি বাস্তবিক সেই আমি? এইরূপ মনে করা কি বিষম ভ্রান্তি নহে? প্রত্যেক মনুষ্যের স্মৃতি নিঃসংশয়ে বলিয়া দিতেছে যে, আমি সেই ব্যক্তি। মানবীয় স্মৃতির এই স্বাভাবিক অবিনশ্বর বাণী যদি মিথ্যা হয়, তবে সকলি মিথ্যা। সহজ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ পত্তন ভূমির উপর সমুদয় জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সহজ জ্ঞান অস্বীকার করিলে কোন জ্ঞানই আর দাঁড়াইতে পারে না। ভিত্তিমূল চলিয়া গেলে অট্টালিকা কিরূপে রক্ষা পাইবে? প্রকৃতি নিঃসংশয় ভাষায় যাহা বলিতেছে, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগতে আর কিছু সত্য থাকে না। আমি আছি, যেমন সত্য, সাত বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি, ইহাও তেমনি সত্য। এ উভয় জ্ঞানই এক ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতি সত্যময়, প্রকৃতি সত্যস্বরূপের প্রকাশ, প্রকৃতির বাণী পরমেশ্বরের বাণী, "The voice of nature is the voice of God" ইহাই পাশ্চাত্য কবির মহাবাক্য। জড়বাদী তাঁহার মত সমর্থন করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

এই ব্যক্তিগত একত্বের জ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে যে, আত্মা জড়ের ক্রিয়া নহে। মন বা জ্ঞান মস্তিষ্কের ফল বা ক্রিয়া

এ কথা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। দেহের সমস্ত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, অথচ সেই আমি চিরদিন বর্ত্তমান। পিঞ্জরের একটী একটী কাঠি বদলাইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় পিঞ্জরটী নূতন হইয়া যাইতেছে, অথচ ভিতরের যে পক্ষী সে চিরদিন একই। দেহপিঞ্জর পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইতেছে, কিন্তু আত্মা পক্ষী চিরদিন সেই একই।

যে আমি শৈশবে ধূলি ক্রীড়া করিতাম, সেই আমি বাল্যে বিদ্যালয়ে যাইতাম, সেই আমি যৌবনে বিবিধ উৎসাহকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, আবার সেই আমি বার্দ্ধক্যে প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু সে দেহ নাই। কতবার দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, কিন্তু চিরদিনই আমি সেই রহিলাম, আমি অপরিবর্ত্তনীয়। শারীরিক ও মানসিক অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে চিরদিন আমি এক।

যে নেপোলিয়ান বাল্যক্রীড়ায় অনুরক্ত, সেই নেপোলিয়ান ইয়ুরোপ জয়ী এবং সেই নেপোলিয়ানই সেণ্টহেলেনায় বন্দী। অথচ তাঁহার দেহ কতবার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে গারফিল্ড নৌকার দাঁড়ী সেই গারফিল্ড কলেজের অধ্যাপক, সেই গারফিল্ড রণস্থলে সেনানায়ক, আবার সেই গারফিল্ডই যুক্তরাজ্যের মহাসভার সভাপতি, অথচ তাঁহার দেহ কতবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে লিঙ্কন নিরক্ষর দরিদ্র যুবা, সেই লিঙ্কন সুপণ্ডিত, সুতার্কিক ও বাগ্মী এবং সেই লিঙ্কন যুক্তরাজ্যের সভাপতিরূপে দাসব্যবসায়রূপ মহাপাতকের বিনাশকর্ত্তা, অথচ তাঁহার দেহ কতবারই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! যে রাধানগরের ষোড়শবর্ষীয় বালক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক লিখিতেছেন, তিনিই যৌবনে রাজকর্ম্মচারী হইয়া সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং তিনিই প্রৌঢ়াবস্থায় বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতেছেন, সতীদাহ রূপ কুপ্রথা সমূলোৎপাটিত করিতেছেন, তিনিই কর্ত্তব্যের আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অকূল জলধি পার হইয়া রাজদেশে গমন পূর্ব্বক ভারতের দুঃখী প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন এবং তিনিই ব্রিষ্টল নগরে বিদেশীয় বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান, অথচ তাঁহার দেহ কতবারই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

ক্রমশঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তড়িন্ময়ী।

তড়িন্ময়ীর কার্য্য।

পুরুষের ভোগের নিমিত্ত নানাবিধ আকারে প্রকৃতি অভিব্যক্ত। পূর্ব্বে মানুষ অসভ্য ছিল। প্রকৃতি যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিত, তাহাতেই তখন মানুষকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। সুন্দরী নর্ত্তকীর ন্যায়, প্রকৃতি বিশ্বজগৎরূপ রঙ্গালয়ে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হইত, তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিত না। তখন প্রকৃতির কুহকিনী মায়ায় মানুষ মুগ্ধ হইত সত্য, কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য ছিল না। প্রকৃতিকে মনে মনে ভয় করিত।

ক্রমশঃ পুরুষকার প্রভাবে জ্ঞানভাণ্ডার

মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইতে লাগিল। অসভ্য মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিকে স্বায়ত্ত করিতে লাগিল। প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মানুষের সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি, মানুষের সভ্যতা। এক বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে সংসারে তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা মানুষকে স্বহস্তে করিতে হইত, এখন প্রকৃতির একজন সহচরী সে কার্য্য কত সহজে সম্পাদন করিতেছে। ব্যজনকারিণী পরিচারিকা হইতে ময়দানবের উপযুক্ত যাবতীয় কার্য্য এই তাপময়ী নাম্নী সখী দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। প্রকৃতি, তাপময়ীকে অগ্নির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, মানুষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আপনার করতলস্থ করিয়াছে। এই ভয়েই বোধ হয়, প্রকৃতি তাহার অপর সহচরী সৌদামিনীকে মানুষের চক্ষুর দূরে, মেঘের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়াছিল। শ্রবণের জন্য কর্ণ, দর্শনের জন্য চক্ষু, স্পর্শনের জন্য ত্বক্ আমাদের আছে। সৌদামিনীকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদের কোন অঙ্গ নাই। বোধ হয়, প্রকৃতি জানিত না যে মানুষের চর্ম্মচক্ষু ব্যতীত এখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। নিকটে হউক, দূরে হউক, দৃশ্য হউক, অদৃশ্য হউক, জ্ঞানচক্ষুর দুষ্প্রবেশ্য স্থান নাই। যিনি চিন্তারও অগোচর, তাঁহাকেও অনন্যমনে ধ্যান করিয়া জ্ঞানচক্ষু কৃতার্থ হইতেছে। কিন্তু তাপময়ীর যে দশা, সৌদামিনীরও সেই দশা ঘটিয়াছে। তাহারও উপর মানুষ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। ইহাকে বশীভূত করিতে অনেক সময় গিয়াছে, বোধ হয় সেই জন্যই তাপময়ী অপেক্ষা ইহাকে অনেক নীচ ও ক্ষুদ্রতর কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আশার শেষ নাই। কিঞ্চিৎ ফলবতী হইলে উহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। তাপময়ী কত কার্য্য করিতেছে। বিনা আপত্তিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে। তাহাতেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়। এখন কথা হইতেছে, তাপময়ীকে বাষ্পীয় যন্ত্ররূপ একখানি বড় ঘর দিতে হইতেছে, সে যেন আর ক্ষুদ্র ঘরে থাকে না; সে যেমন কাজ করে, তেমন সে আহার করে, কাজের তুলনায় চারিভাগের তিন ভাগ এখন তাহার আহার, এই এক ভাগের কাজের জন্য সে এখন তিন ভাগ আহার বৃথা নষ্ট করে,—সে এত নষ্ট করে কেন? কয়লাই এখন তাহার প্রধান আহার, কিন্তু এই আহার বড় ভারি, ইহা অনেক স্থান জুড়িয়া থাকে, এজন্য বহিতে বড় অসুবিধা, সে কোন লঘু অল্পায়তন-বহনযোগ্য দ্রবপদার্থ আহার করুক না; একটা কাজ করিতে এখন তাহার যত সময় লাগিয়াছে, অত সময় দেওয়া যায় না; সে কেন অধিক শক্তি প্রকাশ করে না; ইত্যাদি তাপময়ীর নানাবিধ দোষ বাহির হইতেছে। তাপময়ীর গত্যন্তর নাই। একবার শিরোনত করিয়া সে মানুষকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে। এই জন্যই সে ধীরে ধীরে পার্থীব দেহের ন্যায় অল্পায়তন অল্প ভার বিশিষ্ট গৃহে থাকিয়া পাখীর ন্যায় শক্তি প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেছে। সে তাহার আহার কমাইয়াছে। দশ ছটাক কয়লা খাইয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এক অশ্বের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, এক ছটাক মাত্র আহার্য্য খাইয়া সমুদ্রে এক মাইল পথ ৫৪।৫৫ মণ ভারি বোঝা বহিয়া লইতেছে।

এতদিন তাপময়ী ও তড়িন্ময়ীকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল। উভয়ে পৃথক্ ভাবে কার্য্যও করিত। কিন্তু

ইহাতে তড়িন্ময়ীর কার্য্যের বড় সুবিধা হইত না। এজন্য কয়েক বৎসর হইল উভয়ের মিলন করা হইয়াছে। তড়িন্ময়ীকে এখন দাইনেমো নামক প্রধান গৃহে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তাপময়ী, জলময়ী, পবনময়ী প্রভৃতি কতকগুলি সহচরীকে তড়িন্ময়ীর সাহায্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সৌদামিনী এখন মানুষের প্রধান পরিচারিকা পদে নিযুক্ত হইতে বসিয়াছে। দাইনেমো নামক গৃহে থাকিয়া তড়িন্ময়ী তাহার সহচরীগণের সাহায্যে তার পথে গিয়া বহুদূরবর্ত্তী মানুষের প্রাসাদে ও রাজ-পথে মস্তকে আলোক লইয়া বসিয়া আছে, দূরস্থিত মানুষের কাপড় সেলাই, জুতাবুরুষ, পাখাটানা ভাতরান্না, প্রভৃতি ঘর কন্নার সমুদয় কাজ করিতেছে। বহু মাইল দূরবর্ত্তী মানুষের রথ টানিয়া লইতেছে, সেকরার কাজ, কামারের কাজ, প্রভৃতি মানুষের প্রায় সকল কার্য্যেই সহায়তা করিতেছে।

অনেকে দাইনেমো যন্ত্রটা কি, না জানিতে পারেন। চুম্বকের নিকট কতকখানি তারের কুণ্ডল বেগে ঘুরাইলে, তারে তড়িন্ময়ীর আবির্ভাব হয়। এই তত্বটি দাইনেমো যন্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। চুম্বকের ভার, তারের দৈর্ঘ্য ও ঘূর্ণন বেগ অনুসারে আবির্ভূত তড়িতের বল বৃদ্ধি হয়। এই তিনটিকেই যখন প্রায় ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তখন যে দাইনেমো হইতে শত শত অশ্বের ক্ষমতা প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

দাইনেমোর সন্নিকটবর্ত্তী তারকুণ্ডলীকে ঘুরাইলে তড়িৎ আবির্ভূত হয়। এই তার-কুণ্ডলীকে ঘুরানই কঠিন ব্যাপার। উহা এমন সুন্দর আশ্রয়ের উপর রাখা হয় যে, নিশ্চল অবস্থায় উহাকে অতি সহজেই ঘুরাইতে পারা যায়। কিন্তু ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার সুষুপ্ত শক্তি যেন জাগরিত হইয়া উঠে। তখন তাহাকে ঘুরাইতে বাষ্পীয় যন্ত্র বা তদনুরূপ ক্ষমতাশালী যন্ত্র নিযুক্ত করিতে হয়। এইখানে তাপময়ী, তড়িন্ময়ীর সাহায্য করিতেছে।

তারপথে একস্থানের তড়িৎশক্তিকে অন্যস্থানে আনিতে পারা যায়। দাইনেমোর তড়িৎ তার দিয়া দূরে প্রেরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু তড়িৎশক্তি আসিলেই ময়দার কল বা রেলেরগাড়ী চলিবে না। তড়িৎ-শক্তিকে কার্য্যকরী করা চাই। অতএব দাইনেমোর তড়িৎকে কার্য্যকরী অবস্থায় পরিণত করিতে পারে, এমন যন্ত্র আবশ্যক।

শক্তি সমূহের মধ্যে যেমন পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তেমন কোন শক্তির আধার যন্ত্রের ও ক্রিয়াযন্ত্রের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যেমন একটি শক্তিকে অপর শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়, তেমনি আধার যন্ত্রে শক্তি থাকিলে ক্রিয়াযন্ত্র চালিত হয়; ক্রিয়া-যন্ত্র চালিত হইলে আধার যন্ত্রে শক্তি উৎপন্ন হয়। বাষ্পীয় যন্ত্র সম্বন্ধে এই মহান্ আবিষ্কার মহানুভব কার্ণট সাহেব করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ এই প্রত্যাবর্ত্তনীয়ক্রম(১) তড়িন্ময়ী শক্তিতে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই প্রশ্ন বিখ্যাত জড়বিজ্ঞানবিদ্ ক্লার্ক মাক্সয়েলকে তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন যে, তড়িতে এই প্রত্যাবর্ত্তনীয়তা ক্রম প্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা

(১) Reversibility of engines.

প্রধান আবিষ্কার। বস্তুতঃ তড়িৎশক্তি থাকিলে কি হয়। যতক্ষণ তাহাকে আমাদের কার্য্যে প্রয়োগ না করা যায়, ততক্ষণ তাহা আবিষ্কর্ত্তার আনন্দ ও বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব নিরূপণ ব্যতীত জন সাধারণের পক্ষে তাহার থাকা না থাকা সমান। আলোক যত বেগে চলে,সেই প্রভূত বেগ বিশিষ্ট শত শত অশ্বের সমান ক্ষমতাশালী তড়িৎকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কার্য্যোদ্ধার করা কি সহজ কথা?

দাইনেমোর তার কুণ্ডলী ঘূর্ণায়মান হইলে কুণ্ডলীতে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ দাইনেমোর তার কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রেরণ করিলে কুণ্ডলী ঘুরিতে থাকে। ইহারই কথা ক্লার্ক মাক্‌সয়েল বলিয়াছিলেন। এইখানে দাইনেমোতে প্রত্যাবর্ত্তনীয়তাক্রম কার্য্য করিতেছে। দাইনেমো নিজেই তড়িৎ উৎপাদক, আবার উহা তড়িৎ সাহায্যে অপর যন্ত্রের ভ্রামক। (১)

বস্তু হইতেই বস্তু সিদ্ধি। অবস্তু হইতে বস্তু সিদ্ধি হয় না। যাহা নাই, তাহা সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে, তাহাই পাওয়া যায়। কেবল রূপ পরিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তি ঘটে। মহর্ষি কপিল যে সূত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিতেছেন। দাইনেমোর শক্তি সৃষ্ট হয় না, তড়িন্ময়ীরূপে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সে শক্তি অন্যরূপে থাকে। কয়লায় সৌরতেজঃ রসায়নশক্তিরূপে নিহিত আছে, সেই নিষ্ক্রিয় শক্তিকে সক্রিয় করিবার জন্যই বাষ্পীয় যন্ত্র বা "ষ্টীম এঞ্জিন"। সেই রসায়ন শক্তিই বাষ্পীয় যন্ত্রে তাপময়ীরূপে, তাহাই দাইনেমোতে তড়িন্ময়ীরূপে প্রকাশিত। দাইনেমোর তড়িন্ময়ী-ই আবার ভ্রামকযন্ত্রে যন্ত্রময়ীরূপে আবির্ভূত। প্রকৃতির যতখানি শক্তি ততখানিই থাকে, নানাবিধ যন্ত্র দ্বারা তাহার রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। বস্তুতঃ রূপ পরিবর্ত্তন করাই যন্ত্রের উদ্দেশ্য।

জগদ্‌বিখ্যাত এডিসন সাহেব যে, পাথুরিয়া কয়লায় যত শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাহার শতকরা প্রায় নব্বইভাগ সেই শক্তিকে কার্য্যকরী করিতে নষ্ট হয়। এখন কয়লা হইতে প্রথমে তাপ, তাপ হইতে পরে তড়িৎ আবির্ভাব করা যাইতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের গতি উৎপাদন করা কত অপব্যয়, আবার তাহাকে তাড়িতে পরিণত করিতে অপব্যয়। কয়লারূপ আহারই এ স্থানে শক্তির আদি। সেই কয়লা হইতেই একেবারে তড়িৎ উৎপাদন করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিলে, উপরি উক্ত অপব্যয় নিবারিত হইবে। এডিসন সাহেব এ সম্বন্ধে বিস্তর চিন্তা করিয়াছেন, এবং কোন কোন অংশ ঠিকও করিয়াছেন। তবে প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ।

কিন্তু পাথুরিয়া কয়লা, কাষ্ঠ প্রভৃতি দাহমান পদার্থ ব্যতীত,প্রকৃতির কতশক্তি বহমান পবনে, নদী স্রোতে, সমুদ্রের জোয়ার ভাটায়, সূর্য্যতেজে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মানুষ পবন, বরুণ, তপন, সকলের দ্বারাই স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। শক্তির অভাব নাই, উপযুক্ত ভ্রামক আবশ্যক।

প্রকাণ্ড নায়েগ্রাজলপ্রপাত প্রভূতশক্তির

(১) যেটি উৎকৃষ্ট দাইনেমো, সেইটিই যে উৎকৃষ্ট ভ্রামক (motor) হইবে, পূর্ব্বে তাহা মনে করা হইত। কিন্তু "ইমিশ" নামক ভ্রামক যন্ত্র প্রত্যাবর্ত্তনীয়তা তত্ত্বে নির্ম্মিত হইলেও তাহারও উৎকৃষ্ট দাইনেমোর গঠন বিষয়ে প্রভেদ আছে। ইমিশ ভ্রামককে এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তড়িৎ ভ্রামক বলা যাইতে পারে।

আধার। অবিরত জলপতন বশতঃ কত শক্তির অপব্যয় ঘটিতেছে। সেখানে তদ্দ্বারা অনেকবিধ যন্ত্র চালিত করিতে পারা যায় সত্য। যে সকল সামগ্রী কলে প্রস্তুত করিয়া রপ্তানী করা যাইতে পারে, সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কল তথায় চালিত করিতে পারা যায়। কেবল বৃথা বহন ব্যয় পড়ে। কিন্তু অনেক কল মনুষ্য সমাজের নিকটে থাকা আবশ্যক। নায়েগ্রাজলপ্রপাতে শক্তি থাকিলে কি হইল? নিউইয়র্ক সহরে আমার বাড়ীর পাখা টানিবার জন্য, কাপড় সেলাই করিবার জন্য বলের প্রয়োজন, আমার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য তাপ আবশ্যক, রাত্রিকালে আলোক আবশ্যক। এ সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত দাইনেমো জলপ্রপাতের শক্তি কার্য্যোপযোগী করিবে। উহার পতনশক্তি দাইনেমো দ্বারা তড়িতে পরিণত করিয়া তারপথে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত চালিত করা গেল। (১) এখন সেই শক্তি কলের জল ও গ্যাসের আলোকের ন্যায় তার দ্বারা ঘরে ঘরে আনিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লও। নায়েগ্রাজলপ্রপাতের শক্তিরাশি নিউইয়র্কে গিয়া উপস্থিত। কেবল উপস্থিত নয়, মনুষ্যের অনুজ্ঞায় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তড়িন্ময়ী কোমলরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বাসী ও কর্ম্মক্ষম দাস দাসীর কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত।

শক্তি দূরে সঞ্চালন করিতে হইলে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির অপব্যয় ঘটে। জল, বায়ু, রজ্জু প্রভৃতি শক্তি সঞ্চালনের যে সকল উপায় আছে, দূরত্ব কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই শক্তির বিস্তর বৃথা ব্যয় ঘটে। দুই তিন মাইল দূরে শক্তি প্রেরিত হইলেই এই সকল উপায় দ্বারা শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে। কিন্তু তাড়িৎশক্তির অন্যপ্রকার। দুই তিন মাইল দূরে প্রেরণ করিলে ইহার শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র নষ্ট হয়। কোন ঝঞ্ঝাট নাই, খানিকটা তার বসাইয়া দিলেই তড়িতের পথ প্রস্তুত হইল। ট্রাম ও রেলের গাড়ী এইরূপে অনায়াসে চালাইতে পারা যায়।

কিন্তু নদীতে জাহাজ চলিবে কি রূপে? নদীজলে জাহাজের গতির সঙ্গে তার বসান সুবিধাজনক নহে। এ সকল স্থলে অন্য ব্যবস্থা। তড়িৎকে ইচ্ছামত বোতলে পুরা যায়। আরব্যোপন্যাসে ধীবর কলসীর ভিতর এক শক্তিশালী ভীষণ দৈত্যকে পুরিয়াছিল। কিন্তু ভয়ে কলসীর মুখ খুলিতে পারে নাই। মানুষ তদপেক্ষাও শক্তিশালী তড়িৎকে বোতলে পুরিতে ও তাহা হইতে বাহির করিতে পারে। যাহা উপন্যাস-লেখকের চরম কল্পনা ছিল, তাহা এখানে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। মেঘের তড়িৎ এখন মনুষ্যের বোতলে আবদ্ধ। বজ্র আছে বলিয়াই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। তিনি ইচ্ছামত সেই বজ্র নিক্ষেপ করিতে পারেন। এখন মানুষ বজ্রকে বোতলে রাখিয়াছে, ইচ্ছামত উহাকে নিক্ষেপও করিতে পারে। মানুষের ইন্দ্রত্বলাভ হয় নাই?

দাইনেমোর কারখানা হইতে বোতল তড়িৎপূর্ণ করিয়া অনায়াসে তোমার আমার ঘরে তড়িৎ আনিতে পারা যাইবে, পূর্ণ করিবার জন্য আবার কারখানায় পাঠালেই

(১) এই উদ্দেশ্যে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাহাদের কল কারখানারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। জলপ্রপাত হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অশ্ব ক্ষমতার কার্য্য পাওয়া যাইবে। আমেরিকার সমুদায় যুক্ত রাজ্যও এই উপায়ে রাত্রিকালে আলোকিত করা যাইতে পারিবে।

চলিবে। এইরূপ তড়িৎপূর্ণ কতকগুলি বোতল জাহাজে রাখিয়া ভ্রামক সাহায্যে জাহাজ চালনা করা যায়। বস্তুতঃ আজকাল পাশ্চাত্যদেশে শতশত ট্রামগাড়ী শত শত ক্ষুদ্র জাহাজ তড়িৎশক্তি দ্বারা এইরূপে চালিত হইতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র বিশিষ্ট জাহাজ ঐ যন্ত্রেই কতখানি স্থান জুড়িয়া থাকে। এক একটা জাহাজ দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ যন্ত্রটি বহিবার জন্যই জাহাজখানি নির্গত হইয়াছিল। জাহাজের মধ্যস্থিত সুন্দর স্থানটী যন্ত্রের জন্য জোড়া থাকে। কিন্তু তড়িৎ পূর্ণ চালক জাহাজে এরূপ একটা অসুবিধা হয় না। তড়িৎপূর্ণ বোতলগুলি জাহাজের খোলে বা একটা কোণে রাখা চলে। বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত স্থানও আবশ্যক হয় না। সহস্র লোক বসিতে পারে, এমন জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে যত স্থান আবশ্যক, এই সুবিধাবশতঃ তাহার সিকিভাগ অনায়াসে কম করিতে পারা যায়। সুতরাং প্রথমতঃ পোত নির্ম্মাণ ব্যয়, দ্বিতীয়তঃ পোতের ভার লাঘব এই দুই বিষয়েই সুবিধা। বাষ্পীয়যন্ত্রের ঘড় ঘড় শব্দ, জাহাজের সে কাঁপুনি নাই, অগ্নির সে তাপ নাই, সে ধুঁয়া নাই। বাষ্পীয় কল ফাটিবার সম্ভাবনা নাই; যন্ত্রচালক কাঁচা হউক পাকা হউক কোন আশঙ্কা নাই।

অবশ্য যেখানেই ভীষণ শক্তির সঙ্গে খেলা, সেইখানেই কিছু না কিছু বিপদাশঙ্কা থাকে। কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নাই।(১) বোতল হইতে একেবারে অধিক পরিমাণে তাড়িৎ ছাড়িয়া দিলে হয়ত দুই একটা তার নষ্ট হইতে পারে এবং তড়িৎও ফুরাইয়া যাওয়াতে কার্য্যেরও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে তড়িন্ময়ীর কাজ সম্বন্ধে যত উন্নতি হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সামান্য মাত্র বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। এখানে একটি মাত্র কার্য্যের কথা বলা যাইতেছে।

গমনপথে কোনরূপ বাধা পাইলে তড়িন্ময়ী বিক্রম প্রকাশ করে। তাহারই ফলস্বরূপ তড়িন্ময়ী তাপরূপে প্রকাশিত হয়। তড়িন্ময়ীর এই রূপান্তর অত্যল্প কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বেলজিয়মের দুইজন বৈজ্ঞানিক এমন এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বোধ হয়, দেখিলেও সহজে বিশ্বাস হইত না। অম্লাক্তজলপূর্ণ একটা কাচ বা চীনের বাসনে লোহার দুইটা চিম্‌টা রাখিয়া ঐ দুইটিতে দাইনেমোর তড়িৎ চালাইলে ও ঐ দুই চিমটার মধ্যে একখণ্ড লৌহ নিক্ষেপ করিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই প্রকারে অতি সহজে শতাংশিক তাপমানের চারি সহস্র অংশ উষ্ণতা পাওয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, পূর্ব্বে তড়িন্ময়ীকে তাপে পরিণত করিতে হইলে শতকরা ৮০ ভাগ শক্তি নষ্ট হইত, কেবল ২০ ভাগ মাত্র তাপরূপে প্রকাশিত হইত। উপরিউক্ত প্রণালীতে শতকরা ৫০ ভাগ তাড়িৎ তাপে পরিণত

(১) আমেরিকায় তড়িৎ দ্বারা নরহত্যাকারীর প্রাণ বিনাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশেষ বলশালী তড়িৎ নিক্ষিপ্ত হইলেও ক্ষণমধ্যে মৃত্যু ঘটে নাই। অনেকের বিশ্বাস যে ডাক্তারের সেই সব পরে ব্যবচ্ছেদ করার সময় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই কাগজে দেখা যায় যে,কারিকরগণ অমুক স্থানের তড়িতের তার ছুঁইয়াছিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গিয়াছে। এ সকল কথা কতদূর সত্য, বলা যায় না।

হইতেছে। তড়িতের বলবৃদ্ধিতে উষ্ণতা বৃদ্ধি; তড়িতের বলবৃদ্ধি দ্বারা অনায়াসে ৮০০০° শ অংশ উষ্ণতা পাওয়া যাইতে পারিবে।

লৌহাদি ধাতুময় সামগ্রী যুড়িতে তড়িন্ময়ীকে তাপে পরিণত করা হইত। যে প্রণালী অবলম্বিত হইত, তাহাতে কতকগুলি অসুবিধা ছিল। এখন এই উপায়ে ইচ্ছানুরূপ উষ্ণতা পাওয়া যাইতে পারিবে। কৃত্রিম উপায়ে হীরক ও পান্না, কামানের ইস্পাত, লৌহখাদ হইতে লৌহ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের সুবিধা হইবে।

(২) তড়িন্ময়ীর প্রকৃতি।

অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দেওয়া উচিত নয়। অনেক বৎসর হইতে তড়িন্ময়ী গৃহে গৃহে বাস করিতেছে, উহার প্রকৃতির বিষয় অনুসন্ধান না করা দোষের কথা। কিন্তু উহা এমনই মায়াবিনী যে রীতিচরিত্র সহজে জানিতে দেয় না। উহা তার দিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, ধাতুময় সামগ্রীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ইত্যাদি দেখিয়া পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, উহা হয়ত অদৃশ্যরূপিণী কোন তরল পদার্থ হইবে। পূর্ব্বে তাপকেও এক অগ্নিময় তরল পদার্থ মনে করা হইত।

চারি বৎসর হইল জড়বিজ্ঞানবিদ্ হার্জসাহেব এক বিচিত্র কৌশলে তড়িন্ময়ীর অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, তড়িন্ময়ীর বিকাশের সময় উহা চারিদিকের স্থানে (দেশে) আপন প্রভাব বিস্তার করে। তড়িন্ময়ীর বাহন পবন নয়, এ কথা সামান্ত পরীক্ষা দ্বারাই জানা যায়। হার্জসাহেব দেখাইয়াছেন যে, যেমন প্রভাময়ী বায়ু মধ্যে বিচরণ করে, তড়িন্ময়ীও সেইভাবে গমনাগমন করে, এবং উহার ন্যায় তড়িন্ময়ীও পরিমিত বেগে ধাবমান হয়। যে দুষ্কর কৌশলে হার্জসাহেব এই সকল বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, তাঁহার পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তড়িন্ময়ী বায়ু দিয়াই গমন করুক, কিম্বা কোন পরিচালক দিয়াই গমন করুক, প্রভাময়ীর মত উহাও প্রতিসেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ আশী সহস্র মাইল বেগে ধাবমান হয়।

ইহাই তাঁহার পরীক্ষার শেষ নয়। তড়িন্ময়ীর সাহায্যে লৌহকে অয়স্কান্ত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ তখন তড়িন্ময়ী অয়স্কান্তরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন কাচ, জল, বায়ু, প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থ ভেদ করিয়া প্রভাময়ী অনায়াসে গমন করিতে পারে, অথচ কাষ্ঠ, স্থূলধাতু প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিতে পারে না, তদ্রূপ অয়স্কান্তরূপে তড়িন্ময়ী কাষ্ঠাদি অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধাতুময় সামগ্রীর আবরণ ভেদ করিতে পারে না। হার্জসাহেব রুদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে অয়স্কান্তরূপিণী তড়িন্ময়ীকে চালনা করিয়াছিলেন। পুটাকার দর্পণের কিরণ সমাহার বিন্দুতে কোন তেজোময় পদার্থ রাখিলে যেমন দূরস্থিত অন্য পুটাকার দর্পণের কিরণ সমাহার বিন্দুতে তৈজস কিরণ পাওয়া যায়, তেমনি উপযুক্ত দর্পণ সাহায্যে তাড়িৎকে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। মাক্সয়েল সাহেব প্রভাময়ী ও তড়িন্ময়ীর অভিন্নভাব অনুমান করিয়া গিয়াছিলেন। এতদিন উহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে নাই। হার্জসাহেবের পরীক্ষা সকল

দ্বারা জানা যায় যে, উহারা অভেদাত্মা। উভয়েই আকাশ (১) নামক বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থের অবস্থা বিশেষ। সুতরাং তড়িন্ময়ী ও অপরাপর শক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রভাময়ীর দ্বারস্বরূপ আমাদের চক্ষু, তাপময়ীর জন্য ত্বক্, শব্দের জন্য কর্ণ রহিয়াছে, গন্ধের জন্য নাসিকা, আস্বাদের জন্য জিহ্বা রহিয়াছে, তড়িন্ময়ীর জন্য আমাদের দেহে কোন যন্ত্র নাই। এই জন্যই ত তড়িন্ময়ীর অস্তিত্ব বা কার্য্য বুঝিতে পরীক্ষার প্রয়োজন। আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ের আকারে তড়িন্ময়ী যতক্ষণ না পরিবর্ত্তিত হয়, ততক্ষণ আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ যখন আকাশ পদার্থের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের ১২ হইতে ১৬ ভাগ হয়, তখন উহা রসায়ন শক্তিরূপে; যখন ১৬ হইতে ৩০ ভাগ হয়, তখন প্রভাময়ী রূপে; যখন ১২০ ভাগ হয়, তখন তাপময়ীরূপে একই শক্তি প্রকাশিত হয়। এক ইঞ্চির ক্ষুদ্রাংশ না হইয়া যখন আকাশ তরঙ্গ বহুহস্ত বা শতাধিক মাইল দীর্ঘ হয়, তখন উহাই তড়িন্ময়ী রূপে আবির্ভূত হয়। আলোক জ্ঞানের সময় আকাশ পদার্থের স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে কোটি গুণ চারি কোটি সংখ্যক হয়, তড়িতের বিকাশের সময় উহার স্পন্দন আড়াই শত কিম্বা তিন শতের অধিক হয় না। বস্তুতঃ উৎপত্তি বিষয়ে তাপময়ী, প্রভাময়ী ও তড়িন্ময়ী একই। (১)

তাপময়ী প্রভাময়ী ও তড়িন্ময়ী যে একই বংশের একই পিতামাতার কন্যা, তাহা জড়বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কতকটা অনুমান,

(১) সংস্কৃত দর্শনে শব্দের কারণ রূপেই অতীন্দ্রিয় বিশ্বব্যাপী আকাশ নামক পদার্থ বিশেষের অনুমান করা হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানে শব্দের অন্য কারণ স্থির হইয়াছে। কিন্তু তড়িৎ ও আলোকের কারণ স্বরূপ আকাশের ন্যায় কোন কারণ স্বীকার আবশ্যক। ইংরাজীতে সেই কারণের নাম "ঈথর"। সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে আকাশ বলা যাইতে পারে। বিশ্বব্যাপীও অতীন্দ্রিয় হইলেও ঈথর সংস্কৃত ভাষায় আকাশের ন্যায় পরম মহৎ (infinite, absolutely continuous) নহে। ইহার অনু আছে, স্বীকার করা যায়। সুতরাং উভয়ের কার্য্যের প্রভেদ ব্যতীত স্বরূপেরও বিশেষ প্রভেদ আছে। ঈথর ও আকাশের বৈলক্ষণ্য না দেখাইয়া একের পরিবর্ত্তে অন্যটি ব্যবহার করা দোষাবহ। আর এক কথা। পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকেরা তড়িতের বিষয় অজ্ঞাত ছিল কি? জড়বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি না, জানি না। কিন্তু বেলারি নিবাসী মিঃ বিঃ সূর্য্যনারায়ণ রাও,বি-এ উকিল, (Madras Argus নামক পত্রিকার ভূতপূর্ব্বক সম্পাদক ও কয়েকখান ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা) লিখিয়াছেন, তিনি তথায় জড়বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়াছেন। সে গ্রন্থখানি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট আছে। ইনি সংস্কৃত টেলেগু ও কেনেরী ভাষা ব্যতীত ইংরাজী বা অপর ভাষা জানেন না। সেখানি যে প্রাচীন গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই গ্রন্থের এক অধ্যায়ের নাম সৌদামিনী কলা। ইহাতে তড়িৎ ও অয়স্কান্ত বিষয়ক অসাধারণ জ্ঞানের ও নানাবিধ যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট সূত্রে সমুদায় বিষয়টি লিখিত হইয়াছে। সৌদামিনী সম্বন্ধে এমন অনেক বিষয় ও যন্ত্র বর্ণিত আছে, যাহা তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই। এতদ্ভিন্ন তাহাতে রসায়ন প্রভৃতি অপরাপর জড়বিজ্ঞান বর্ণিত আছে। এ সকল অংশের নাম ভৌতিকতী ভৌতিক বিদ্যা।

(১) তড়িন্ময়ীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা এখনও সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই। বস্তুতঃ আকাশ (ঈথর) পদার্থের ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে।

কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাদের এবং সামান্য জড়ও তাহার গতিশক্তির মধ্যে বংশগত কোন পার্থক্য নাই, ইহা অনেকে অনুমান করিতেছেন। আমরা যাহাকে জড় বলি, লর্ডকেলভিন সাহেবের মতে তাহা বিশ্বব্যাপী অতীব সূক্ষ্ম অতীব স্থিতি-স্থাপক আকাশ পদার্থের আবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার কথা এখন অনুমান মাত্র। গণিতশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি আকাশের ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে এ জড় পদার্থ-সম্বন্ধে লর্ডকেলভিনের এই অনুমান স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু অনুমান দ্বারাই মানুষের জ্ঞানচক্ষু দুষ্প্রবেশ্যস্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

যাহা হউক, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা পৃথক্ কোন জড়পদার্থই হউক বা আকাশ পদার্থের আবর্ত্তই হউক, তাহার অণু সকল যে সর্ব্বদা পরস্পর ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহা নানা কারণে বিশ্বাস করিতে হইতেছে। অধ্যাপক ক্রুকস্ সাহেব সুন্দর সুন্দর পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে অণুসমূহের আভ্যন্তরিক সংগ্রামে যে শক্তিরাশি ব্যয়িত হইতেছে, তাহার তুলনায় আমাদের জ্ঞাত সমুদায় শক্তিই মৃদু। গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে ঐ বলরাশি আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। কৌশলক্রমে যদ্যপি এই অগণনীয় অণুর পরস্পর যুদ্ধ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে কোন কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের ক্ষমতার সীমা থাকিবে না।

এ সম্বন্ধে ক্রুকস্সাহেব যাহা দেখাইছেন, তাহা হইতেই বোধ হইয়াছিল যে, অসংখ্য সেনাকে অচিরে বশীভূত করিতে পারা যাইবে। তাঁহার পরীক্ষায় তিনি অগণনীয় সেনাকে কৌশলক্রমে অল্পসংখ্যাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই অল্প সংখ্যক সেনাকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু অল্পসংখ্যক সেনাদ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। এ সকল পরীক্ষায় তড়িন্ময়ী প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু যখন সেনার বলেই তড়িন্ময়ীর বল, সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে বলসমষ্টিরও বৃদ্ধি হয় না। এ সকল স্থলে প্রতিসেকেণ্ডে তড়িন্ময়ীর কিঞ্চিদূন এক শতটি মাত্র স্পন্দন হয়। এত ধীরে ধীরে স্পন্দন ঘটিলে তড়িন্ময়ীর বলবীর্য্য সম্যক্ বিকশিত হয় না। না রাগাইলে লোকের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না।

গত বৎসর নিকোলা টেস্‌লা স্বীয় পরীক্ষাদ্বারা তড়িন্ময়ীর কিঞ্চিদুন্মুক্ত অবগুণ্ঠন আরও উন্মুক্ত করিয়া অল্পকাল মধ্যে আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তিনি তড়িন্ময়ীর স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। প্রচলিত দাইনেমোর তড়িৎ প্রতিসেকেণ্ডে প্রায় ৮০ বার স্পন্দিত হয়। এজন্য এ সকল দাইনেমোর দ্বারা কল্পিত কার্য্যসিদ্ধ হইবে না স্থির করিয়া এক নূতন দাইনেমো নির্ম্মাণ করিলেন। এতদ্বারা প্রতিসেকেণ্ডে তড়িতের বিংশতি সহস্র স্পন্দন হইতে লাগিল। তাহা আবার পরিবর্ত্তক (১) নামক অন্য যন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া প্রতিসেকেণ্ডে তাড়তের ১০।১৫ লক্ষ স্পন্দন ঘটিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

প্রকৃতির গুপ্তবল বাহির হইয়া পড়িল। সম্ভব অসম্ভব বিষয়ের প্রভেদ রহিল না।

(১) Transformer.

প্রতাপান্বিতা তড়িন্ময়ীকে স্পর্শ করিলে দেহে সংক্ষোভ উৎপন্ন হয়, প্রতাপ অধিক হইলে আমাদের দেহ বজ্রাহতের ন্যায় আহত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তড়িতের প্রতাপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে সামান্য সংক্ষোভ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। (১) আলোকের পক্ষে অনচ্ছ পদার্থ যেমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ, সামান্য তড়িতের পক্ষে একোনাইট (রবর বিশেষ) তেমনই। কিন্তু কাচের ভিতর দিয়া আলোকের গমনের ন্যায় এই বহু স্পন্দিত তড়িৎ একোনাইটের ভিতর দিয়া গমন করে। যখন তিনি তাঁহার যন্ত্র স্পর্শ করিলেন কিম্বা যন্ত্রের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার দেহ কোমল জ্যোতিতে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাড়িত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিতে হইলে তড়িন্ময়ীর গৃহের সহিত দুইটি তারপথ দিয়া প্রদীপের যোগ করিতে হয়, নচেৎ তড়িন্ময়ীর আগমন হয় না। কিন্তু টেসলার অঙ্গুলি নির্দ্দিশে বিনা তারযোগে প্রদীপটি স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইল। (২)

(১) কেনইবা পাওয়া যাইবে? আকাশ পদার্থের কোটি কোটি স্পন্দনে আলোক উৎপন্ন হয়, আলোক লাগিলে ত সংক্ষোভ পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, সংক্ষোভ উৎপাদন করিতে হইলে তড়িতের পরিমাণ বৃদ্ধির আবশ্যক। উহার প্রাখর্য্য বৃদ্ধিতে সংক্ষোভ উৎপন্ন হয় না।

(২) নবরচিত ডাইনেমো ও পরিবর্ত্তক যন্ত্র সাহায্যে টেসলা তাঁহার পরীক্ষা তিনি দেখিয়াছিলেন। কোন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিলে এবং তাহার উপপত্তি বুঝিলে বিবিধ উপায়ে সেই ক্রিয়া উৎপাদন করা, তত কঠিন হয় না। এখন তাঁহার অনেক পরীক্ষা সামান্য উপায়ে পুরাতন যন্ত্র সাহায্যে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সামান্য উইম্‌সহার্ষ্ট (wimshurst) কল দ্বারা তাড়িতের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে পারা যায়। তড়িতের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই হইল।

তড়িন্ময়ীর এই গুণ প্রায় এক বৎসর মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে উহা সহজ উপায়ে প্রকাশিত করিবার কৌশলও উদ্ভাবিত হইয়াছে। শীঘ্র যে এই গুণ আমাদের প্রয়োজনীয় দৈনিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, তাহা আশা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রায় দুই বৎসর হইল আমেরিকাবাসী বিচিত্র-বুদ্ধি বিখ্যাত এডিসন সাহেব তার সাহায্য ব্যতিরেকে তড়িন্ময়ী দ্বারা দূরে সঙ্কেত প্রেরণের এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে হইলে এখন তারদ্বারা ঐ দুই স্থানের যোগ আবশ্যক হয়। এডিসন বলিতেছেন তারের আবশ্যকতা নাই টেলিগ্রাফ দণ্ডের মত দূরে দূরে পৃথিবীতে তারদ্বারা বদ্ধ বিশেষ ব্যোমযান (বেলুন) সাহায্যে অনায়াসে সঙ্কেত প্রেরিত হইতে পারিবে। সমুদ্রে এই প্রণালীটি এখন বিশেষ উপযোগী হইবে। দূরবর্ত্তী দুই জাহাজের মধ্যে সঙ্কেত প্রেরণ জন্য তারদ্বারা জাহাজদ্বয়ের যোগ অনাবশ্যক। মধ্যস্থিত জলরাশিরূপ পথ দ্বারাই তড়িতের গমন চলিবে।

তড়িন্ময়ী শক্তিকে দূরে প্রেরণ সম্বন্ধে সম্প্রতি টেসলা যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আশা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, তড়িন্ময়ীর গমনের জন্য দুইটা পথ অনাবশ্যক, একটা পথ থাকিলেই চলিবে। আর, পৃথিবীরূপ প্রকাণ্ডপথ বর্ত্তমান, তারময় পথের প্রয়োজন কি? পৃথিবী প্রকাণ্ড বলিয়া ভয় করা কাজের কথা নয়। তড়িন্ময়ীর বেগের তুলনায় পৃথিবী যে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু পৃথিবীতে কি পরিমাণ তড়িৎশক্তি আছে, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করা আবশ্যক।

এটি সহজ কাজ নহে। কিন্তু যে উপায়ে তুলাদণ্ডে পৃথিবীকে তৌল করা হইয়াছে, তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন করিলে উহার তড়িৎভাণ্ডার পরিমিত হওয়া সম্ভব। তাহার পর উপযুক্ত যন্ত্রসাহায্যে পৃথিবীর কোন স্থানে তাড়িৎশক্তি চালিত করিলে, দূরে বা নিকটে উহার স্পন্দন লক্ষিত হইবে। কল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হইলে সংবাদ পাঠাইবার পক্ষে দূরত্ব থাকিবে না। তাঁহার বিশ্বাস যে তাঁহার জীবনকালের মধ্যেই এই চেষ্টা সফল হইবে।

তড়িন্ময়ীর বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে ও বিগত দশ বৎসরের মধ্যে উহাকে যতদূর করতলস্থ করা গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে, মানবের ক্ষমতা ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা এখন আমরা ভাবিতেই পারি না। বাষ্পীয় যন্ত্র ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মিত হওয়াতেই মানবসমাজের কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নদী স্রোতে নৌকার ন্যায়, বায়ুস্রোতে ব্যোমযান এখন ভাসিয়া বেড়ায়, কর্ণধারের আয়ত্ত হইতেছে না। অনেক নরনারী উড়িবার কল নির্ম্মাণে সফলকাম হইবার জন্য নিযুক্ত। শক্তির তুলনায় তাপময়ীর গৃহ ভারি, সে আপনার ভারবহনেই অক্ষম। তড়িন্ময়ীরও সম্প্রতি সেই অবস্থা। এই জন্যই ত উড়িবার কল প্রস্তুত হইতেছে না। ভবিষ্যতেও কি এই অবস্থা থাকিবে? তড়িন্ময়ীর স্পন্দনবেগ কোন উপায়ে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে কি,—এ প্রশ্ন তিন বৎসর পূর্ব্বে লোকের মনে উদয় হইত। এখন তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। কে জানিত, দূরস্থিত ব্যক্তির কথা ঘরে বসিয়া শুনিতে পাওয়া যাইবে? টেলিফোন তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। দূরস্থিত ব্যক্তিকে ঘরে বসিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি? এ আশা কি সুদূরপরাহত? সেলেনিয়ম্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর একটি গুণ এই যে তাহাতে পতিত আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে ঐ ধাতুর তড়িৎশক্তি সঞ্চালনের ইতর বিশেষ হয়। এই গুণ দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তুর প্রতিকৃতি নিকটে দেখা যাইবে না কি? (১) আদৌ তাপ থাকিবে না, এমন প্রদীপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারিবে না কি? আমরা যত প্রকার প্রদীপ ব্যবহার করি, সকলেতেই শক্তির অপব্যয় ঘটে। একটু আলোকের জন্য আমাদিগকে যেন খাণ্ডবদাহন করিতে হয়। প্রদীপে আমরা প্রভাময়ীকে চাই, তাপময়ীকে চাই না। জোনাকি পোকায় প্রভাময়ী থাকে, কই তাপময়ী ত থাকে না। প্রভাময়ীর সহিত তাপময়ীর বিচ্ছেদ ঘটান অসম্ভব কি? আহারে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাহারই রূপ পরিবর্ত্তনে প্রাণিগণের বল সামর্থ্য। আমরা কেন কয়লা প্রভৃতি সামগ্রীতে সঞ্চিত শক্তিকে প্রথমে তাপে পরিণত করিতেছি? জোনাকি পোকার আলোকের কারণ, তাহার আহার। প্রকৃতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, পথ খুঁজিয়া লইলেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে"।

তড়িন্ময়ী দ্বারা আমার মনের চিন্তা অ-

(১) এডিসন নির্ম্মিত কাইনেটোগ্রাফ নামক যন্ত্র দ্বারা যুগপৎ দেখা ও শুনা যায়। বলা বাহুল্য, ফনোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ নামক দুইটি যন্ত্রের ক্রিয়া একত্রিত করিয়া কাইনেটোগ্রাফ নির্ম্মিত হইয়াছে। ফনোগ্রাফ সঞ্চিত শব্দ শুনায়, ফটোগ্রাফে সঞ্চিত চিত্র দেখায়। ইহাতে তড়িন্ময়ীর কার্য্য নাই কিম্বা টেলিফোনের দূরস্থিত শব্দ শুনানের ন্যায় দূরস্থিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি দেখায় না।

পরের নিকট প্রতিভাত করা যাইবে না কি? চিন্তার কারণ, মাস্তিক পদার্থের স্থান বিশেষের ক্রিয়া। সেই সকল ক্রিয়ার সহিত তড়িন্ময়ীর সম্পর্ক নাই কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

জাতি-যজ্ঞ-কর্ম্ম।

ভারতবর্ষে দার্শনিক বিচার এত প্রাচীন-কালে আরম্ভ হইয়াছিল যে, কোন একটী দার্শনিকমতের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা এখন দুরূহ হইয়াছে। এজন্য কেহ বৌদ্ধদর্শন হইতে সাংখ্য ও বেদান্তের উৎপত্তি কল্পনা করেন; কেহ বা বলেন সাংখ্য হইতে,কাহারও মতে বেদান্ত হইতে বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি। উপনিষদের পরে যখন সহস্র অস্ফুট দার্শনিকমতে সন্ন্যাসীর সহস্রদল বিভক্ত, যখন দার্শনিক মত কোন একটী নামরূপে বিশেষিত হয় নাই,যখন বর্ত্তমান বৌদ্ধদর্শন সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শনের আদি সূত্র সকল বাষ্পীয় আকারে ভারতের আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছিল, তখন বিভিন্ন দর্শনের বিশেষত্ব জন্মে নাই। সারূপ্য অনেক ছিল,তাহার পরে এক একটী দর্শন এক এক বিশেষ আকারে গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন সারূপ্যের তিরোধান হয় নাই বটে, কিন্তু বিশেষত্ব এত কঠিন হইয়াছে যে, এখন সম্পূর্ণ বিভিন্নবলিয়া বোধ হয়। আবার কেহ বা কাহাকে অন্যের গোত্রজ বলিয়া ভ্রম করেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বতন যুগে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের উদয় হয়। বৌদ্ধদর্শন হইতে সাংখ্য ও বেদান্তের অথবা সাংখ্য বেদান্ত হইতে বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক বিশেষত্ব না থাকিলেও, দুইটী কারণে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ধর্ম্ম-বিষয়ক বিভিন্নতা প্রথম হইতেই সূচিত হইয়াছিল। যজ্ঞ ও জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বেদ ও ব্রাহ্মণযুগে নিরন্তর যাগযজ্ঞের কোলাহলে হিন্দুসমাজ কল্লোলিত থাকিত। পুপ-পিষ্টক-পায়সান্নের সুরভিঘ্রাণে,সোমরসের মনোমোহন মদিরতায় হিন্দুর দৈবী ও লৌকিক প্রকৃতি চিরদিন সুপ্রসন্ন। যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ জীবের চীৎকারে, গৃহস্থের গৃহ সদাই পরিপূর্ণ। যজ্ঞহীন গৃহস্থ ও জাতি-শূন্য হিন্দুকল্পনার অতীত। বর্ণভেদ বৈদিক সময় হইতে হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিয়াছে। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে বর্ণভেদের বন্ধন যত কঠোর হইয়াছে, মন্ত্র বা ব্রাহ্মণযুগে তত কঠোর ছিল না, একথা সত্য। উপনিষদ-বাদী মুনি ঋষিরা, চতুর্বর্ণের বিশেষত্ব উপেক্ষা করিতেন সত্য বটে, সন্ন্যাসী-সঙ্গমে ব্রাহ্মণ বৈশ্যের প্রভেদ লক্ষিত হইত না,ইহাও সত্য; ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, রাজা ও ঋষি তখন দুরপনেয় রেখায় চিহ্নিত হন নাই সত্য, তথাপি গৃহস্থাশ্রমে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শূদ্রের নিকৃষ্টতা, জন্ম হেতু জাতিভেদ, ব্যবসায় হেতু নহে, এ বিশ্বাস হিন্দুর হৃদয়ে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হেতু নির্গুণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, গুণবান হইলেও শূদ্রের নিকৃষ্টতা, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই অবগত

ছিল। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য তখন অসামান্য। এমনি ক্ষেত্রে শাক্য গৌতম বর্ণভেদের অসারতা উর্দ্ধকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

শাক্য সমাজ-সংস্কারক নহেন। খ্রীষ্ট ও মহম্মদ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে কোন নূতন সমাজের সৃষ্টি হয় নাই। এখন তত না থাকিলেও কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিভিন্ন সমাজ ছিল। কিন্তু চৈতন্য কোন নূতন সমাজের সৃষ্টি করিবেন অভিলাষ করেন নাই। যাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্মের অভিযাত্রী, তাঁহারা সংস্কৃত সমাজের পক্ষপাতী হইতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহস্থের নহে, ইহা ভিক্ষুর ধর্ম্ম। গৃহস্থের গৃহে ইহা সমাদৃত হইলেও, উপাসকের স্থানে ভিক্ষুর অনেক নিম্নে। যাঁহারা সংসারে সৎপ্রবৃত্তির চালনা করিয়া সুখে থাকিবার কামনা করেন, সমাজ-সংস্কার তাঁহাদের আবশ্যক। মৃত শরীরের ন্যায় যাঁহারা সমাজকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যান, সমাজের ভূষণ ও অঙ্গলেপন ব্যবস্থা ও উন্নতি, তাঁহাদের চিন্তার বহির্ভূত।" হিন্দুসমাজে বুদ্ধ জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার প্রয়াস পান নাই, কিন্তু ভিক্ষু-সংঘে সহস্রবার তাঁহাকে জাতিভেদের অকিঞ্চিৎকারিতা প্রতিপাদন করিতে দেখিয়াছি।

অন্ত ধর্ম্মে কর্ম্ম ত্রিবিধ। দেব কর্ম্ম, লৌকিক কর্ম্ম ও আত্মকর্ম্ম। দেবতার প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজ বা প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, ও আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, প্রায় সকল ধর্ম্মে মনুষ্য-কর্ত্তব্য এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ হিন্দু সমাজের এই ত্রিবিধ ঋণ। অন্যান্য লক্ষণের ন্যায় এ লক্ষণও লক্ষিত হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। দেব-ঋণ,—যাগ যজ্ঞ সে কি মানিবে, যে দেবতাকে আপনার ন্যায় কর্ম্মজাল জটিত হতভাগ্য জন্ম-মরণশীল জীবমাত্র বলিয়া বিশ্বাস করে? অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সৎপ্রবৃত্তির অনুশীলনে সাধিত হয়, যে প্রবৃত্তির নিরশন প্রচার করে, যে সংসার ঘৃণা করে, সে পরকে সাংসারিক সুখ দিবার জন্য কখনও প্রয়াস পায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম নিতান্ত স্বার্থপর। পরের দুঃখ নিবারণ করিতে হয় আত্মদুঃখ নিবারণের জন্য, পঞ্চশীল অষ্টসন্মার্গ প্রচার করিতে হয় আপনার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য, দয়া মৈত্রী অহিংসা আত্মমঙ্গলজনক। আপনার প্রতি বৌদ্ধের এক মাত্র কর্ত্তব্য আছে। তাহাও দেহ মন আত্মার পূর্ণ বিকাশের প্রয়াস নহে। কিসে জরামরণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এই চেষ্টা বৌদ্ধের কর্ত্তব্য। পঞ্চশীলা, অষ্টশীলা, বা দশশীলায় কোথাও সিদ্ধার্থ বলেন নাই, ইহা করিবে; সে যে কর্ম্মের বিধান, তিনি কেমন করিয়া তাহা উপদেশ করিবেন? তিনি কেবলই বলিয়াছেন, ইহা করিও না, তাহা করিও না। তিনি ভিক্ষুককে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। কর্ম্মে বন্ধন হয়, কর্ম্ম তাঁহার অনভিপ্রেত। যে কর্ম্ম হইতে একেবারে নিরস্ত হইতে না পারে, মল মূত্র স্বেদের ন্যায় তিনি সে সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে অনুরোধ করিতেন। নির্দ্বন্দ্ব দুঃখ শোক বাসনা বা নির্ব্বেদের অতীত হইয়া, প্রবৃত্তির লেশ মাত্র না রাখিয়া, কর্ম্মবীজ বিনাশ করিয়া তিনি কর্ম্ম করিতে বলিতেন। জীবন দুঃখ মাত্র, তথাপি জীবনে দুঃখিত হইবে না, সুখের কারণে যে সুখ বোধ করে, দুঃখের কারণে যাহার দুঃখ হয়, সে প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন ক-

রিতে পারে নাই। জীবনের দুঃখ পরিণাম, জন্মের অসংখ্যত্ব, যাবতীয় পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা বৌদ্ধের মত আর কেহ অনুভব করে নাই; তাই বলিয়া বৌদ্ধকে মুহ্যমান শোককাতর, বিষাদে অবসন্ন, ইহা মনে করা ভ্রম। যন্ত্রণা তাঁহার মস্তিষ্কের অনুভূতি মাত্র, হৃদয় বিচলিত করিতে পারে না।

বৌদ্ধের হৃদয় নাই, ভাব নির্মূল হইয়াছে। প্রবৃত্তির বিনাশ না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। প্রবৃত্তি কার্য্যের মূল, যজ্ঞ প্রবৃত্তি-মূলক, এজন্য কামনা, প্রার্থনা, যজ্ঞ, বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে পারে না। ভাবের অনুশীলন যাঁহারা ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া গণনা করেন, বৌদ্ধধর্ম্মকে তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এমন শুষ্ক জ্ঞানময় ধর্ম্ম জগতে আর হয় নাই। অথচ ধর্ম্মনীতি এত উদার, নীতি শাস্ত্রের শাসন এত কঠোর, কর্ত্তব্যপথের অপ্রশস্ততা এত সঙ্কীর্ণ আর কোন ধর্ম্মে নাই। এ ক্ষুরধারের উপর দেবগণ ভ্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হন। রেখামাত্র পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত জন্মজন্মান্তরে পরিপূর্ণ হয় না। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতা পুরুষকারের মাহাত্ম্য ও একান্ত আবশ্যকতা আর কোন ধর্ম্মে এমন তীব্রস্বরে ঘোষিত হয় নাই।

গিরিভেদ করিয়া সহস্র নদী উত্থিত হয়। সমতলে প্রবাহসময়ে কাহারও নাম গঙ্গা, কাহারও নাম যমুনা। সহস্র নামে সহস্র নদী অভিহিত হয়। কিন্তু সমুদ্রে পতিত হইলে কাহারও কোন বিশেষত্ব থাকে না, তখন সকলে আপন আপন নাম হারাইয়া সমুদ্রের নামে অভিহিত হয়। তেমনি বুদ্ধের সাগর-সঙ্গমে সংঘ মধ্যে উপনীত হইলে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য চণ্ডালের জাতিত্ব বিশেষত্ব অপনীত হয়। রাজার ভৃত্য বৌদ্ধসঙ্ঘে শ্রমণত্ব লাভ করিলে, রাজার নমস্য হয়। শূদ্র কাষায় পরিধান করিলে ব্রাহ্মণের অনধিকৃত গৌরবের অধিকারী হয়। বৌদ্ধাশ্রমে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোন প্রভেদ নাই। ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্র অভেদে সকল বর্ণ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। নির্ব্বাণ পুরুষকারের পুরস্কার, বর্ণের পুরস্কার নহে। বর্ণ নির্ব্বিশেষে পুরুষকার যাহার আছে, নির্ব্বাণ তাহারই। বর্ণবিচারের দোষ গুণভাগী সংসার। সংসারের সহিত ভিক্ষুর কোন সম্পর্ক নাই। সংসারের ধন মান বর্ণবিচার ভিক্ষুর আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে না। সংসারগতি পরিবর্ত্তনে শাক্যের প্রয়াস ছিল না, সমাজে তিনি জাতিভেদের উপকার বা অনুপকার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না, কিন্তু আশ্রমে জাতিভেদের লেশমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। সমাজের মঙ্গলের জন্য আদৌ বর্ণবিভাগের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া গৌতম অনুমান করিতেন, দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গৌতমের মতে পূর্ব্বে সকল লোকে এক সঙ্গে জোত সম্পত্তি উপভোগ করিত। কালক্রমে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হয়, তখন একে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমতঃ অপহৃত ব্যক্তি স্বয়ং অপহারীর দণ্ড বিধান করিত, কালক্রমে অপরাধের দণ্ড দিবার জন্য তাঁহারা আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সকলে মিলিয়া একজনকে নির্ব্বাচিত করে। এবং আপন আপন সম্পত্তি হইতে কিছু কিছু দিয়া তাহার জন্য একটী ধনাগমের সংস্থান করিয়া দেয়। এইরূপে রাজা বা ক্ষত্রিয় বর্ণের এবং এইরূপে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি হয়।

বর্ণবিভেদ সমাজের মঙ্গলের জন্য মনুষ্য আপনি বিধান করিয়াছিল, ইহা দেববিধান বা অপরিবর্ত্তনীয় বিধান নহে।

বৌদ্ধসংঘে সকল বর্ণের অবারিত-দ্বার। গৌতম সমাজসংস্কারক না হইলেও, কেহ কেহ তাঁহাকে আশ্রম-সংস্কারক বলিয়া অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ অনুমান সত্য নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্র ঋষি ও শ্রমণাচার্য্য সম্মতে জাতিনির্ব্বিচারে দিনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে অদ্যাপি এইরূপই চলিয়াছে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধসংঘে শ্রেষ্ঠ বর্ণের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, জাতিনির্ব্বিশেষে আশ্রমে সকল বর্ণের প্রবেশ অধিকার থাকিলেও নিম্নবর্ণের লোকদিগকে গৌতম বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিতে প্রশ্রয় দিতেন না। বৌদ্ধাশ্রমে চণ্ডালের প্রবেশ লাভের কোন নিদর্শন কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না; উপালী জাতিতে ক্ষৌরকার বটে, কিন্তু রাজসভাসদ অন্যদিকে সারিপুত্র মৌদগল্যায়ণ,কাত্যায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, আনন্দ রাহুল,অনুরুদ্ধ,যশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ গৌতমের প্রধান সহচর। অম্বষ্ঠ, মল্লরাজ প্রভৃতি উচ্চবর্ণীয় অনুসন্ধিৎসুদিগকে শিষ্য করিতে বুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশ ভিন্ন অন্য বংশে বুদ্ধের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা নাই, একথাও আমরা প্রাচীন গ্রন্থে বারম্বার শুনিতে পাই। তবে কি গৌতম প্রাচীন মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে সকল বর্ণকে আশ্রমে প্রবেশ অধিকার প্রদান করিলেও তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে জাতিশ্রদ্ধা পোষিত হইত? ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইলে শোণিত গৌরবে সমাদর অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর নহে।

শাক্যের নির্ম্মল চরিত্রে এরূপ কলঙ্ক যাঁহারা আরোপ করেন, তাঁহারা বৌদ্ধনিদানের জটিলতা অনুভব করেন নাই। বোধিদ্রুম মূলে সম্যক সম্বোধিলাভের পরে বহুদিন পর্য্যন্ত তথাগতকে চিন্তা করিতে হইয়াছিল, জটিল বৌদ্ধনিদান লোকে ধারণা করিতে পারিবে কি না? যে পারিবে, সে নির্ব্বাণ মার্গের কঠোর সাধন আয়ত্ত করিতে পারিবে কি না? সংসারের বিলাস শয্যায়, মদিরা পানে বিমোহিতচিত্ত প্রবৃত্তিপরায়ণ প্রাকৃতগণ হৃৎপিণ্ডের সমূল উৎপাটন করিতে কি স্বীকার করিবে? "যে সত্যের উদ্ভাবনায় তাঁহার মত তীক্ষ্ণধীর সাত বৎসর অতীত হইয়াছিল, যে সত্য মহাপ্রতিভাশালী পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই, সে সত্যকে সত্য বলিয়া সংসারের লোকে বিশ্বাস করিবে কি? অবিশ্বাসী তাঁহাকে উপহাস করিয়া কি অন্ধতর তিমিরে পুনঃ জড়িত হইবে না? অবিশ্বাসের কারণ অজ্ঞানতা। যে হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ সে হেতুমালা, সে কার্য্যবিবর্ত্তন সাধারণ লোকে কি বুঝিতে পারিবে? সংসারের লোক মোহনিদ্রিত, সংসারের কনকশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে শৃঙ্খলের কনকতায় তাহারা পুলকিত, দাসত্বের গরলতা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে, নরককে তাহারা স্বর্গ বলিয়া ভুলিয়াছে, তাঁহার কথায় তাহারা সে সংসার কি ছাড়িবে? সংসারের আপাত মনোরম মোহিনী মায়া পরিহার করিতে পারিবে? স্ত্রী, পুত্র পরিবার, স্বজন বৈভব ছাড়িয়া তাঁহার মত সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতে পারিবে? নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র পথ সন্ন্যাসচর্য্যা, সংসার পরিহারলালসা বিসর্জন, করজনে গিরিশৃঙ্গের দৃঢ়ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মত অপরিণতবুদ্ধি যুবকের পরামর্শে তরঙ্গ-উল্লাসিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে?" (নব্যভারত দ্বিতীয় খণ্ড)

বহুচিন্তার পরে, তিনি সশঙ্কিত হৃদয়ে, মৃগদাব ঋষিপত্তনে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার অমানুষী সৌন্দর্য্য, মধুর স্বরলহরী,

তীব্র উত্তেজনা ও নিরুপম আদর্শ মন্ত্রবিমুগ্ধ করিয়া লোকদিগকে তাঁহার আশ্রমে টানিয়া আনিত। যে দিন সে বেণুধ্বনি নীরব হইল, সেই দিন, তাঁহার অসাক্ষাতে, তাঁহার জীবনকালেও, বৌদ্ধাশ্রমে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে শত শত দলে বৌদ্ধসংঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে আপন বিশেষত্ব হারাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে বিকৃত হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানীর ধর্ম্ম, ধ্যান ধারণা সমাধির ধর্ম্ম। এই গিরিমন্দিরের দ্বার অবারিত হইলেও, পথের বন্ধুরতা, কণ্টকাকীর্ণতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুরারোহতা প্রযুক্ত অপরিসীম সাহসে সাহসী না হইলে অমিত বল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে, সুসহচর ও উপযুক্ত পথদর্শক না পাইলে, এ গিরিমন্দিরে প্রবেশ করা সাধ্য নহে।

দ্বিজগণ সহস্র সহস্র বৎসর জ্ঞানের চর্চ্চায় নিয়োজিত। বিবর্ত্তন নিয়মানুসারে নীচজাতি অপেক্ষা তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তি অধিকতর ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মত দার্শনিক ধর্ম্ম, বৌদ্ধসূত্রের মত জটিল সূত্র, বৌদ্ধসাধনের মত কঠোর সাধন, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধিকতর আয়ত্ত। স্বতঃই বৌদ্ধসংঘের আচার্য্য শ্রেণীতে এই তিন বর্ণের অধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। শত সহস্রবর্ষ দূরত্বের মধ্য দিয়া, কেবল উচ্চ শীর্ষ মনিষিগণের মস্তকের অগ্রভাগ অস্পষ্টভাবে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হয়। অনতিদীর্ঘ কৃত বর্ণের কত লোক সে জনতায় মিশিয়াছিল, কে জানে?

বিদ্যার গম্ভীরতা বা বুদ্ধির প্রখরতা, ভক্তির আধিক্য বা ধর্ম্মবিশ্বাসের উন্নতি, এই পার্থক্যের কারণ হইয়া থাকিবে, আভিজাত্য অন্যতম কারণরূপে গণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধসূত্রের জটিলতা, অপ্রখর বুদ্ধির অনধিগম্য বলিয়া সন্ন্যাসসাধন, বিলাসলালসা-কাতর সংসারীর অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধার্থ দুর্ব্বল প্রকৃতি মহিলাদিগকে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশাধিকার দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কেবল মাতৃস্থানীয়া মহাপ্রজাপতির সবিশেষ অনুরোধে এবং প্রতিপালক ও নিত্যসহচর আনন্দের কাতর প্রার্থনায় তিনি ভিক্ষুণী সংঘের সৃষ্টি করেন।

সেরাগাথা (স্থবিরগাথা) গ্রন্থে স্থবীর সুনীতের একটী গাথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুনীত নীচবংশীয়, মন্দির ও রাজপ্রাসাদে তিনি সম্মার্জন করিতেন। নীচবংশীয় বলিয়া সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিত। এই সুনীত বৌদ্ধসংঘে সদ্গুণে স্থবীর পদবী লাভ করিলেন। সিদ্ধার্থ স্বয়ং তাঁহাকে সংঘ মধ্যে আহ্বান করেন, তিনি তাঁহার নীচ জাতীয়তা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, সদুৎসাহ ও সৎচরিত্র, আত্মসংযম ও প্রবৃত্তি নিরাকরণে লোকে ব্রাহ্মণ হয়, ইহাই ব্রাহ্মণের আভিজাত্য, জন্মহেতু ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না। জন্মহেতু আভিজাত্যের নিন্দা, ব্রাহ্মণের বর্ণাহঙ্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আমরা বুদ্ধের মুখে বারম্বার শুনিতে পাই।

তিনি জন্মহেতু বর্ণবিভেদের যেরূপ প্রতিবাদ করিতেন, যজ্ঞ ও কৃচ্ছ্র সাধনের প্রতিবাদ তদপেক্ষা অধিক করিতেন। বীণার তার খুব টানিয়া বাঁধিলে যেমন মিষ্টস্বর বহির্গত হয় না, খুব শিথিল করিয়া দিলেও তেমনি তাহা বিতন্ত্রী হইয়া যায়। শিথিলতার বিলাসিতার বিরুদ্ধে তিনি যেমন প্রতিবাদ করিতেন, কৃচ্ছ্র সাধনের বিরুদ্ধে

তেমনি প্রতিবাদ করিতেন। কৃচ্ছ্রসাধনে মানসিক দুর্ব্বলতা জন্মে, ধ্যান ধারণা সমাধির ব্যাঘাৎ হয়। বিলাসিতা ও কৃচ্ছ্রসাধন, উভয়ই মারপিশুনের বিড়ম্বনা। ধর্ম্ম পথের প্রতিবায়।

আমগন্ধসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "নিরামিষ আহার, দিগম্বর, মস্তকমুণ্ডন, জটাধারণ, ভস্মলেপন, কাষায় পিন্ধন বা যজ্ঞহোম,অবিদ্যা অপনোদন করিতে সমর্থ নহে।"

অম্বষ্ঠসূত্রে লিখিত হইয়াছে "ঋষিগণ অধ্যয়ন করিয়া বা উচ্চারণ করিয়া যে আপনাকে ঋষি বলিয়া গণনা করে,সে মুগ্ধ বা প্রতারক। রাজার আসনে বসিয়া রাজনীতি উচ্চারণ করিলে কৃতদাস কখন রাজা হয় না।"

মধ্যমণিকারে লিখিত হইয়াছে "শিষ্য গুরুর কথা বিশ্বাস করে, গুরু আপন গুরুর মুখে যাহা শুনে তাহা বিশ্বাস করে। অন্ধের পথদর্শক স্বয়ং অন্ধ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এমনি অন্ধতাপূর্ণ।"

কূটদন্তসূত্রে লিখিত হইয়াছে, এক ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ যজ্ঞসাধন কর্ত্তব্য। তদুত্তরে বুদ্ধ এক প্রাচীন নরপতির আখ্যায়িকা বিবৃত করেন। রাজা পৃথিবী অধিকার করিয়া দেবতাদিগের সন্তোষহেতু যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। কুলপুরোহিতকে আহ্বান করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করেন, কিরূপে তাঁহার সংকল্প পূর্ণ হইতে পারে। পুরোহিত বলেন, যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে শান্তি সুখ সমৃদ্ধি স্থাপন করা, সর্ব্ববিধ অবিচার নির্ম্মূল করা রাজার কর্ত্তব্য। রাজা তাহাই করিলেন। তাহার পর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞে কোন জীব হত্যা হইল না, কোন তৃণলতার প্রাণনাশ ঘটিল না। বিনা উৎপীড়নে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দ মনে ভৃত্যগণ যজ্ঞক্ষেত্রে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিল। বেত্রাঘাতে কাহাকে পীড়িত হইতে হইল না, কাহারও চক্ষে জলধারা বহিল না। ঘৃত মধু দুগ্ধ দিয়া যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হইল। এইরূপে রাজার যজ্ঞ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য যজ্ঞ ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহা অনায়াস-সাধ্য ও পুণ্যকর; ভিক্ষু সেবা ও বিহার নির্ম্মাণ। কিন্তু অন্য যজ্ঞ আরো উন্নত, ধর্ম্মসংঘ ও বুদ্ধের শরণগ্রহণ, মৈত্রী সাধনা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা পরিহার। কিন্তু অন্য যজ্ঞ আরো উন্নত—নির্দ্বন্দ সুখ-সন্তাপের অতীত ভিক্ষুর নির্ব্বাতজীবনে নিমজ্জন। অন্য যজ্ঞ আরো উন্নত, বাসনা সংযত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ।

কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তিলাভ হয়, এ বিশ্বাস বুদ্ধের বহুপ্রাচীন। গোতম নিরঞ্জনাতটে স্বয়ং কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন। সাধনার কঠোরতায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি সমাধিলাভ করিতে পারেন নাই। তখন গোপকুমারী সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করেন। কৃচ্ছ্রসাধনে দেহ শুষ্ক হয়, কিন্তু প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে না। আত্মসংযমে প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। বিলাসিতা ও কৃচ্ছ্রসাধন, উভয়ই আত্মসংযমের সমান প্রতিদ্বন্দ্বী; মধ্যমার্গ ভিক্ষুর বিহিত। প্রবৃত্তি বিনাশ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

যজ্ঞ করিলে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যজ্ঞফলে দেহান্তে স্বর্গে নবজীবন লাভ হয়, সে জীবনের অন্ত নাই; যে যজ্ঞ না করে, তাহার জন্মে জন্মে মৃত্যু ঘটে; যে সময়ে যজ্ঞের মাহাত্ম্য এতই ঘোষিত হইত, যজ্ঞক্ষেত্রে দেবগণ আহুতি গ্রহণ করিতে যাজ্ঞিকের আতিথ্য স্বীকার করিতেন, যজ্ঞমণ্ডপে নর ও দেবতার পার্থক্য অপনীত হইত। যে সময়ে যজ্ঞীয় ধূমে গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থের আশ্রম নিত্য পবিত্র ও সুরভিত হইত, যজ্ঞীয় কোলাহলে যুবতী গৃহস্থ-

নারী ও বর্ষিয়সী ঋষিপত্নী পুত্র কন্যা কুটুম্ব লইয়া সংসারে নিত্য সুখ অনুভব করিতেন, যজ্ঞের আয়োজনে ও সম্পাদনে প্রবৃত্তির আমূল আন্দোলিত হইয়া আনন্দ মদিরায় সকলকে বিমোহিত করিত,সে সময়ে যজ্ঞের অকিঞ্চিৎকরতা শ্রমণ ও উপাসক, গৃহী ও ভিক্ষু রাজা ও প্রজা সকলের নিকট সমানভাবে অকুতোভয়ে প্রচার করা সামান্য সাহসের কার্য্য হয় নাই।

আশ্বলায়ন সূত্রে লিখিত আছে যে, বর্ণগত কোন প্রাধান্য জন্মে না।'গৌতমের এ কথায় ব্রাহ্মণেরা বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আশ্বলায়ন নামে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে গৌতমের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। গৌতম ধর্ম্মবাদী,আপ্তবাক্য বিশ্বাসী নহেন, যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পারিলে তিনি পরাস্ত হন, সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলে তাঁহাকে পরাস্ত করা যায় না। এজন্য আশ্বলায়ন তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন,কিন্তু স্বজাতীয়দিগের সাগ্রহ অনুরোধে অগত্যা তিনি গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—

"গৌতম ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট বর্ণ, আর সকলে নিকৃষ্ট, তাহারা শুভ্রবর্ণ আর সকলে কৃষ্ণবর্ণ', তাহারা পবিত্র আর সকলে অশুচি, তাহারাই ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মার প্রকৃত সন্তান, তাঁহার সৃষ্ট, তাহার উত্তরাধিকারী। গৌতম, ইহার বিরুদ্ধে কি কিছু বলিবার আছে?"

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,"অন্যবর্ণীয় রমণীদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণীদিগকে গর্ভধারণ, প্রসব-বেদনা প্রভৃতি যাতনা সহ্য করিতে কি হয় না? তাতার আফগানস্থান প্রভৃতি দেশবাসীদিগের মধ্যে কি বর্ণভেদ নাই? থাকিলে, তথায় কৃষ্ণবর্ণ কি শ্বেতবর্ণের পদবী গ্রহণ করিতে পারে না? অশ্ব ও গর্দ্দভে সংস্রব হইলে যেমন অশ্বতর নামে এক নূতন জীবের উৎপত্তি হয়,ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াণীর সংস্পর্কে সেরূপ কোন নূতন জীবের অভ্যুদয় হয় কি? চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, লোভ হিংসা অবিশ্বাসে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকেই কি নরক যাতনা ভুগিতে হয়,ব্রাহ্মণের কি হয় না? স্নেহ দয়া মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণে ব্রাহ্মণদিগের কি একমাত্র অধিকার,অন্যবর্ণের অধিকার নাই? চণ্ডাল গৃহের দুইখানি কাষ্ঠ ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলে, ব্রাহ্মণের প্রমন্থজনিত যজ্ঞীয় অগ্নি অপেক্ষা উহা কি অল্প তাপ বা উজ্জ্বলতা শূন্য হয়?" আশ্বলায়নকে সকল কথাই বুদ্ধের মনোমত স্বীকার করিতে হইল—বর্ণানুসারে গুণের কোন প্রভেদ হয় না।

বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দুইটী ব্রাহ্মণ কুমারের একজনের দীক্ষা হইয়াছে, অন্যের হয় নাই, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞক্ষেত্রে এ দুজনের কাহাকে প্রাধান্য দিবেন?

দীক্ষিত ব্রাহ্মণ কুমারকে।

কিন্তু দীক্ষিতের চরিত্র মন্দ ও স্বভাব যদি কদর্য্য হয় এবং অদীক্ষিতের চরিত্র নির্ম্মল ও স্বভাব সুন্দর হয়?

অদীক্ষিত ব্রাহ্মণকুমারকে।

তখন গৌতম বলিলেন, আশ্বলায়ন! উচ্চবংশে জন্মিলে বা বেদ শিক্ষা করিলে প্রাধান্য হয় না। যাহার চরিত্র ও স্বভাব নির্ম্মল ও স্বভাব সুন্দর, সেই প্রধান।

ত্রিবিদ্যা সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ নামে দুই ব্রাহ্মণকুমার একদিন গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গৌতম! নগর বা গ্রামের নিকট পাঁচ সাতটী ভিন্ন পথ থাকে, গ্রামের মধ্যে আসিয়া তাহারা মিলিত হয়,সেইরূপ বেদশাখাবলম্বী সকল ব্রাহ্মণেই কি মরণান্তে ব্রহ্মার সালোক্য লাভ করিবেন?

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সকল শাখাই কি সমানরূপে সত্যকথা বলে? বশিষ্ঠ বলিলেন "হাঁ"।

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণশিষ্য, ব্রাহ্মণগুরু সাতপুরুষেও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি?

বশিষ্ঠ বলিলেন "না"।

গৌতম বলিলেন, বেদজ্ঞ, বেদ-রচয়িতা বেদপ্রপাঠক ব্রাহ্মণদিগের কেহ কখনও ব্রহ্মাকে দেখে নাই, তিনি কোথায় বা কেমন, কিছুই জানে না, তাহারা বলে, আমরা যাহা দেখি নাই, যাহা কোথায় জানি না, তাহার সহিত তোমাদের মিলনের পথ দেখাইয়া দিব, আমাদের সঙ্গে আইস। এক অন্ধের দলে যে প্রথম, সে দেখিতে পায় না, যে মধ্যম, সেও দেখিতে পায় না, যে শেষে সেও দেখিতে পায় না, অথচ অন্ধেরা অন্যকে পথ দেখাইতে চায়, বেদজ্ঞ অন্ধ ব্রাহ্মণদিগের মোক্ষ প্রদর্শনের অভিমান এইরূপ। যদি কেহ বলে, এ দেশের পরমা সুন্দরী কন্যাকে আমি বড় ভালবাসি, তাহার জন্য আমি লালায়িত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সে কোন্ জাতির কন্যা? সে বলে জানি না, তাহার নাম কি? তাহাও জানি না। তাহার পিতার নাম কি? তাহাও জানি না। সে খর্ব্বকায় না দীর্ঘায়তন? তাহাও জানি না। গৌরী না শ্যামাঙ্গিনী, তাহাও জানি না? সে থাকে কোথায়? তাহাও জানি না। এরূপ লোককে সকলেই মূর্খ বলে।

উচ্ছ্বলিত ইরাবতীতটে উপস্থিত হইলে পার হইতে না পারিয়া যদি কেহ তটে বসিয়া প্রার্থনা করে যে, অপর তট এদিকে চলিয়া আসুক, তাহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিবে। সদ্প্রবৃত্তির অনুশীলন না করিয়া অসৎপ্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিলে, ইন্দ্র এখানে আইস, সোম এখানে আইস, বরুণ এখানে আইস, ঈশান এখানে আইস, প্রজাপতি এখানে আইস, ব্রহ্মা এখানে আইস, মহেন্দ্র এখানে আইস, যম এখানে আইস, বশিষ্ঠ, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না। সৎপ্রবৃত্তির কর্ষণ না করিলে, যজ্ঞ ও প্রার্থনায় ব্রহ্মার সালোক্য বা মোক্ষ ঘটে না।

ব্রাহ্মণেরা দারসম্পত্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা দারসম্পত্তিশূন্য; ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ হিংসাপূর্ণ, দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ, ব্রহ্মার রাগদ্বেষ প্রবৃত্তি নাই, তিনি সংযমী। ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও ব্রাহ্মণ সংযমী ব্রহ্মার সালোক্যলাভ করিতে সক্ষম নহে। বেদাধিকার লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ আপনাকে দৃঢ় পদবীসংপ্রাপ্ত জ্ঞান করেন, পরন্তু প্রতিক্ষণ দুস্তর পঙ্কে তিনি নিমগ্ন হন। এজন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ত্রয়ীবিদ্যা নিরম্বু মরুভূমি ও নিবিড়গহন এবং বিনাশের প্রসূতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যে বাসনা শূন্য হইয়া যাবতীয় জীবকে স্নেহ করে, যে দয়াপ্রেম পবিত্রতাপূর্ণ, আত্মসংযত শীলসমাধিপ্রজ্ঞা-পরায়ণ, দেহবিলয়ে তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সামাজিক উৎকট ব্যাধি।

মানবদেহ ব্যাধিমন্দির। রক্ত দূষিত হইলে অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে তন্মধ্যে অনেকানেক সাংঘাতিক রোগ সঞ্চিত হয়, পরে যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া দে-

হকে ধ্বংস করে। মানবসমষ্টিরূপ সমাজ-দেহ সেই রূপ ব্যাধির মন্দির। শরীর অপেক্ষা মনের প্রকৃতি আরো দুর্ব্বোধ্য,সুতরাং তাহার রোগ সকলও অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য। সমাজদেহ মানবমনের সমষ্টি, শত সহস্র মানসিক প্রকৃতির কূট সূক্ষ্ম উপাদানে তাহা সংরচিত। একটী মনের ক্রিয়া অবধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নৈতিক স্বাস্থ্য ও সত্যের পথে নিয়মিত করা কত কঠিন, তাহা আমরা নিজ নিজ জীবনের পরীক্ষায় অবগত আছি। ঈদৃশ বহু সংখ্যক মানবমন একত্র মিলিত হইয়া যখন সমাজদেহ গঠন করে, তাহার প্রকৃতি যে কিরূপ দুষ্প্রবেশ্য-গভীর এবং কুটীল, তাহা ভাবিলে উহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আর সাহস হয় না। প্রতিজনের মধ্যেই অল্লাধিক স্বার্থপরতা, স্বাধীন রুচি, আত্মগরিমা,ভ্রান্তি অজ্ঞতা আছে ; নিজ নিজ আন্তরিক স্বভাব কর্ত্তৃক নীত হইয়া সকলেই আপনাপন আদর্শাভিমুখে ধাবিত হইতেছে ; এই সমুদায় বিচিত্র প্রকৃতি, বিভিন্ন গতি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র রুচির লোকদিগকে এক সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যবিন্দুর দিকে লইয়া গিয়া একটী বিশুদ্ধ সমাজ গঠন করা সাধারণতঃ অতীব কঠিন কার্য্য; বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষতঃ আরো কঠিন। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রুচি, নিগূঢ় বিশ্বাসের বিশেষত্ব সম্বন্ধে দলবদ্ধ হওয়াত সম্ভবই দেখি না ; স্থূল স্থূল সাধারণ এবং সর্ব্ববাদীসম্মত হিতানুষ্ঠান উপলক্ষেও অনেক অন্তরায়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং ব্যক্তিগত ঘৃণা হিংসা পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসংস্কার, কোন রূপ সদনুষ্ঠানকারী দলের শ্রীবৃদ্ধি এবং সর্ব্বাঙ্গীন কৃতকার্য্যতা এ দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্প লোকের (এক জন হইলে আরো ভাল হয়) ঘনীভূত স্বার্থ যেখানে নির্ব্বিঘ্নে চরিতার্থ হয়, কেবল সেই সেই স্থলে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। আর্য্যবংশোদ্ভব জাতির, বিশেষরূপে বাঙ্গালী প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অন্তর কেন্দ্রাভিমুখী ; পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে যদিও তাহা এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে কেন্দ্রবিমুখে গমনোন্মুখ হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আত্মত্যাগের অভ্যাস বড়ই কম। এই কারণে কি প্রাচীন অশিক্ষিত, কি আধুনিক সুশিক্ষিত উভয় সমাজে দলাদলির প্রবৃত্তি কিছু বলবতী। ইহা জাতীয় অধঃপতন এবং অনুন্নতির মূল স্বরূপ। সাধারণ হিতোদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা এখনো ভালরূপে আরম্ভ হয় নাই। এ পথে কেবল যে প্রাচীন কুঅভ্যাস, স্বার্থপ্রবৃত্তি প্রতিকূল তাহা নহে, মূল প্রকৃতিই আমাদের ভয়ানক প্রতিকূল।

আমরা এক্ষণে সমাজ সমিতিতে অনেক বিধ উদার শিক্ষা পাইয়া থাকি, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতি তাহা পুনঃপুনঃ জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে অস্বীকার করিতেছে। বিপরীত দৃষ্টান্ত সকল উচ্চ উদার শিক্ষাকে কার্য্যতঃ নিষ্ফল করিয়া দিতেছে। এমন কি, যেখানে উদারতা প্রশস্ততার জন্য যত অধিক উপদেশ আলোচনা, সেইখানে তত পরিমাণে সঙ্কীর্ণতা একদেশদর্শিতার প্রাদুর্ভাব ; দলাদলির প্রেত সেখানে যেন ততোধিক বলের সহিত মহা আস্ফালন পূর্ব্বক স্বীয় অধিকৃত অনুচরবর্গকে অন্ধকার-কূপ মধ্যে লইয়া যায়। বাস্তবিক দেহের শোণিত দূষিত হইলে যেমন সাংঘাতিক ক্যান্সার রোগ জন্মে, তেমনি সমাজদেহে ঐরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত দূষিত অঙ্গবিশেষে সর্ব্বাগ্রে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা সঙ্গঠিত হয়। তাহা বজ্র-বর্ত্তুলের ন্যায় কঠিন, সবলে আঘাত করিলে ছিট্‌কাইয়া পলায়, ধরিতে গেলে সরিয়া যায়, ভাঙ্গিলে ভাঙ্গে না। ক্রমে সে গুলি এক সঙ্গে মিলিত হইয়া (যদিও কেহ কারো সঙ্গে মিশ খায় না) এক দুস্পর্শ শিলা সদৃশ কৃতান্তের করাল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। এক বিন্দু বিষ যখন শত বিন্দুর সঙ্গে যোগ দেয়, তখন তাহার আসুরিক প্রভাব দুরতিক্রমণীয়। এক স্থানে অস্ত্র কর, আর এক অঙ্গে গিয়া উহা উপস্থিত হইবে; পাকাইবার ঔষধ দাও পাকিবে না; কাটিয়া ক্ষত প্রস্তুত কর, পূঁয জন্মিবে না; যদি তাহাকে একবারে উৎপাটন, করিয়া ফেল, তাহা হইলে রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও মরিয়া যাইবে। সামাজিক উৎকট ব্যাধির এইরূপ অবিকল কারণ সকল বর্ত্তমান আছে। স্বার্থহানি বশতঃ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইতে সমাজদেহে শোণিত-বিকৃতি, শোণিত-বিকৃতি হইতে বজ্র গুটিকা রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উৎপত্তি। এরূপ সঙ্কীর্ণমনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ঠিক উপরিউক্ত কঠিন গুটিকা সদৃশ, এক অপরের সহিত কোন কালে মিশ খায় না। সয়তানদিগের ঘরে ঘরে অনৈক্য, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ মহাজন প্রচলন। সমাজ দেহের মহাবিনাশ জন্য সময়ে সময়ে উহারা একত্র মিলনের ভাণ করে, কিন্তু সে মিলনে সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। একবারে মূল উৎপাটন করিতে গেলে রোগ ও রোগী উভয়েরই বিনাশ। "ঠগ বাছিতে গাঁ উজোড়।" কিন্তু এ রোগের অন্য বিধ সুচিকিৎসা আছে। উহারা দেহেরই উপাদান, সুতরাং অপরিত্যাজ্য; কেবল দূষিত শোণিতে জন্ম গ্রহণ করে, এই জন্য সাংঘাতিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বজ্রবর্ত্তুলগুলিকে বিবিধ উপায়ে বলপূর্ব্বক চূর্ণীকৃত করিতে হইবে। গুটিকাগুলি চূর্ণীকৃত হইলে ক্রমে শোণিতও প্রকৃতিস্থ হয়। ইহা আরোগ্যমূলক ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত রোগনিবারক ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ কঠিন গুটিকা জন্মিবার পূর্ব্বেই সাবধানে বিশেষ যত্ন সহকারে শোণিত বিকৃতির কারণ যে হিংসা দ্বেষ বিচ্ছেদ, তাহার প্রথম সূচনাতেই দলঘ্ন বটিকা প্রধান রোগী ব্যক্তিকে সেবন করাইতে হইবে। এইরূপ নিবারক এবং বিনাশক উভয় ব্যবস্থা সমাজদেহের চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদা আবশ্যক। সমাজসংস্কাররূপী চিকিৎসকগণ অন্যকে চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে যেন আপনাদের রোগটীর প্রতি দৃষ্টি করেন। নতুবা তাঁহাদের অকাল মৃত্যুতে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিবে এবং বিনা চিকিৎসায় সংক্রামক মহামারী রোগ দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এই যে দলাদলির সাম্প্রদায়িকতা, ইহা স্বভাবতঃ সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, ইহার কারণ কি? অবশ্য ইহার কোন বিশেষ উপকারিতা আছে। মনুষ্য সকল স্বভাবতঃই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান আদরণীয় এবং ঐশীশক্তি সম্পন্ন হইলেও প্রকৃতি এবং শিক্ষা সংস্কারভেদে প্রতি জীবনে অখণ্ড সর্ব্বাঙ্গীন তত্ত্বের বিচিত্র বিকাশ হয়। সমস্তগুলিকে একত্র করিলে সেই অখণ্ড মূল সত্যতত্ত্বের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। মূল প্রকৃতি অনুসারে, রুচিভেদে, শিক্ষাভেদে এক এক শ্রেণীর লোক এক একটী বিশেষ শাখাতত্ত্বের পক্ষপাতী, এবং তদ্দ্বারা সেই সেই শাখাতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাও বিধাতার মঙ্গল কৌশল।

বিশেষ বিশেষ এক একটী তত্ত্বে যদি ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা দলবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি সমস্ত জীবন ঢালিয়া না দেয়, তাহা হইলে তৎ-সংক্রান্ত আমূল বিবরণ আবিষ্কৃত হয় না। এজন্য স্বভাবকেও সৃষ্টিকর্ত্তা সে বিষয়ে অনুকূল করিয়া দেন। ইহার সঙ্গে প্রকৃতি এবং নিয়তির নিগূঢ় যোগ আছে। কিন্তু এই খানেই আবার সাম্প্রদায়িক অন্ধ-তার মূল নিবদ্ধ। একটী বিশেষ তত্ত্বে অধিক কিম্বা অসাধারণ অনুরাগ জন্মিলে কেবল যে অন্য বিষয়ে ঔদাসীন্য জন্মে তাহা নহে, একদেশদর্শিতা এবং অন্ধতা বশতঃ তাহার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ অবিশ্বাসও উপস্থিত হয়। অনন্ত পরমেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডারে কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে তাহা কে জানিতে সক্ষম? তুমি যেটী পাইয়াছ তাহার যথেষ্ট প্রশংসা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহা দেখ নাই, পাও নাই, তাহা যে তেমনি প্রশংসনীয় অমূল্য সামগ্রী, তদ্বিষয়ে কেন তুমি অন্ধ হইবে? দেখ আর না দেখ, মানিতে হইবে যে অনন্তের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। তুমি একটী বিশেষ তত্ত্বের অভিজ্ঞ হইয়া তাহা দ্বারা কি অনন্তের অনন্ত মহিমা সীমাবদ্ধ করিতে পার? তুমি অল্পবুদ্ধি মনুষ্য, তোমার পক্ষে একটা বিষয়ই যথেষ্ট, কিন্তু তাহার অন্তরালে চাহিয়া দেখ, সেখানে অখণ্ড অনন্তের অনির্ব্বচনীয় লীলারহস্য! যাবতীয় তত্ত্ববিভাগের মূলে এক অবিভক্ত মহাসত্তা, অখণ্ড পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থিতি করিতেছে। অল্প-দর্শী সংকীর্ণচেতা লোকেরা যদি কোন এক বিষয়ে যশস্বী এবং কৃতকর্ম্মা হয়, অজ্ঞানতা এবং আত্মাভিমান বশতঃ সে মনে করে, "আমি সকলি জানি। তাবৎ বিষয়েই আমি সুযোগ্য।" এই সাধারণ ভ্রান্তিতে অনেকেই অন্ধ। তুমি ধনী সম্ভ্রান্ত হইতে পার, কিন্তু জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পদতলে বসিয়া তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। তুমি জ্ঞানী পণ্ডিত শাস্ত্রী, তোমাকেও প্রেমিক ভক্তের নিকট বিনম্রভাবে ভক্তি প্রেম শি-খিতে হইবে। কার্য্যী জ্ঞানী যোগী ভক্ত প্রত্যেককে প্রতিজনের ছাত্র হইতে হইবে। সুবিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা সরল বালক কৃষক অজ্ঞজনের নিকটেও ভগবত্তত্ত্ব শিক্ষা করেন। প্রতিজনকেই যখন প্রতিজনের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, তখন আর অন্ধ সাম্প্রদায়ি-কতার স্থান কোথায়? বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িকতা, মূর্খতা এবং অহঙ্কারের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রতিঘটে যখন ভগবান লীলাবিহার করিতেছেন, তখন হে আত্মা-ভিমানি, তুমি কাহাকে বাদ দিবে? যেখানে যতটুকু সত্য পরিহার করিবে, সেইখানে ততটুকু অখণ্ড ভগবানকে খণ্ড, পূর্ণব্রহ্মকে অপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। একাধারে তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয় না, বিচিত্র আ-ধারে বিচিত্র ভাবে খণ্ডাকারে হয়; অতএব সমস্ত অঙ্গকে আত্মস্থ করিয়া, "ঈশ্বর যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হও।" নিগূঢ় বিশ্বাসের বিশেষ সাধন একাকী অথবা সমভাবী দশ পাঁচজনে মিলিয়া কর, তজ্জন্য ছোট ছোট দল বাঁধিতে হয় বাঁধ, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যাহা সার সত্য, তাহা সর্ব্বজনীন। যদি কিছু অভিনব তত্ত্ব পাও, তাহা লুকাইবার জন্য নয়, জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। কোন সত্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘৃণা চরিতার্থের জন্য নহে। বস্তুতঃ যে একটী বিষয়ে যথার্থরূপে তত্ত্বদর্শী হয়, তাহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দ্বার খুলিয়া যায়। সং-কীর্ণ জ্ঞানী, অন্ধ ভাবুক, অনুদার মতাবলম্বী,

আংশিক সত্যদর্শী সাম্প্রদায়িক মোহে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডস্বামী অনন্ত দেবতাকে বাড়াইতে যায়, গিয়া কমাইয়া ফেলে এবং তাঁহার সোণার সংসারে বিশ্বপরিবার মধ্যে অশান্তি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনয়ন করে।

শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত পরম হংস রামকৃষ্ণ বলিতেন, "কোথায় কত বিষয় সম্পত্তি জমিদারী নীলকুঠী বাগান আছে,তাহার তালিকা না খুঁজিয়া বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আগে আলাপ পরিচয় কর, পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন, কোথায় কত তাঁর সম্পত্তি।" ফলতঃ কর্ত্তার দিকে যদি ষোল আনা দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্বদর্শী হও, তাহা হইলে সর্ব্বতত্ত্বের মূলে তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সহিত সমতানে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিবে, "এক ঈশ্বর! এক পরিবার, এক তত্ত্ব,এক সংসার।" তখন তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রসারিত হইবে। একের ভিতরে কোটী ব্রহ্মাণ্ড, এবং সর্ব্বভূতে এক পরম পুরুষকে দেখিয়া আপনিও তখন তাহাতে বিলীন হইয়া যাইবে। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। (৯)

জন্মকথা।

কোন্ উপদেবতা খ্রীষ্টীয় উপশাস্ত্রের কুহকজাল বিস্তৃত করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা সুকঠিন। শ্রুত আছি, জ্ঞস্তিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহা উৎপাদিত হইয়াছিল। আর ইহাও শুনা আছে, বিষাক্ত জ্ঞস্তিক কণ্টকীলতায় খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্ব পরিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে জ্ঞস্তিক ধর্ম্ম-ভাবের সন্নিকর্ষ ঘটিয়াছে কেন, তদ্‌গবেষণায় বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শিগণকে প্রগাঢ় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যে খ্রীষ্টীয়-পুরাতত্ত্ব জ্ঞস্তিক উপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন, তাহার আলোচনা নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে তেজোময় দীপ্তি দ্বারা ভুবন আলোকিত হইয়াছিল। সে অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ কোন্ উপগ্রহে মিশিয়া গেল? মানিলাম, আলোক সত্য,যুষফও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিসের আলোক, বাধা যদি না থাকে, তবে উহার নিগূঢ় ভাবটী প্রকাশ করুন। জ্ঞস্তিক দলের লোপ হইয়াছে, খ্রীষ্টের জন্মালোকের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞস্তিক ভিন্ন এক্ষণে কে বুঝিবে? কে বা তাহা বুঝাইবে? আর কি ফাইলো, ইউসিবিয়স, ওরিজেন আছেন? খ্রীষ্টের জন্মালোকের জটিল কথা এখন থাকুক। বুদ্ধের জন্মালোকের একটা প্রবোধ আমরা অনুসন্ধান করিয়া লইলাম। আর্থর লিলির মতে, মহম্মদ, জোরোয়াস্তর, এবং যিশুর জন্মকালে অভিনব নক্ষত্রোদিত হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের জন্ম সময়ে ঐ প্রকার তারা উদয়ের প্রবাদ চীন-ভ্রমণকারীর গ্রন্থে দেখিয়াছি। সুতরাং ইহা চীনের প্রবর্দ্ধিত মত নহে। ফাহিয়ান অপ্রামাণ্য কথা বলেন নাই। অবশ্যই তিনি ললিতবিস্তর হইতে ইহা অবগত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যোগের বহ্বাড়ম্বর

ছিল, লোকের বিশ্বাস ছিল, যোগবলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অপলাপ করা অসাধ্য নহে। উক্ত বিশ্বাস বশতঃ যোগাভ্যাসে লোকে আসক্ত হইত। তদর্থে এদেশ যোগীর জন্মক্ষেত্র ছিল। পাতঞ্জল এতদ্দেশীয় লোকের চিন্তা প্রসূত; সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক বেদান্ত ও মীমাংসা এদেশ হইতেই উদ্ভূত, ভারতের পূর্ব্ব গরিমা যদি কিছু থাকে, তাহা দর্শন। ইহা পূর্ব্বকালের লোকদিগের বিজ্ঞতা, রুচি, এবং মানসিক উন্নতির পরিচায়ক। তাঁহারা জীবন-ঘড়িকে ঠিক রাখিবার জন্য ইহার চাবি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কোন দেশে যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন তথায় সত্যের তেজ অগ্রেই অস্তমিত হয়। ইহা আমরা মোগল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই। রত্নহারা ভারতে আবাল বৃদ্ধ সকলের বিশ্বাস আছে, রাহু চন্দ্রকে খাইতে যায়। কিন্তু সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির মত ইউরোপ ও অন্যান্য বিদেশ ভিন্ন কোথায় আদরণীয় হইয়াছে? অমূল্য রত্নভাণ্ডার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ইউরোপবাসীরা নিজ সম্পত্তি বলিয়া অভিমান করেন। সুপ্রচার আছে, সাংখ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পিথাগোরস্ ও প্লেতো; ন্যায়ের স্রষ্টা আরিস্ততল; বৈশেষিকের উদ্ভাবক লিউসিপস এবং থিমক্রেতস্; সক্রেটিস্ স্বর্গ হইতে দর্শন আনয়ন করিয়াছিলেন; এরূপ অলীক উক্তি দ্বারা ভক্তির উদ্রেক না হইয়া বিপরীত ঘৃণা উৎপন্ন করে। আর্য্যদের অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তির অক্ষয়চিহ্ন আজি কি বিলুপ্ত হইয়াছে? পতঞ্জলি কৃত পাতঞ্জল যোগ যোগীর আধ্যাত্মিক আহারের উপায়ন ছিল। প্রবাদ আছে, ভূতপূর্ব্ব ঋষিগণ যোগাভ্যাস দ্বারা "ঋদ্ধি" লাভ করত অবলীলাক্রমে মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য সাধনে সক্ষম হইতেন। বুদ্ধদেব যোগবলে, সাধন বলে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগে যদি আশ্চর্য্যশক্তি থাকে, বুদ্ধদেব তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

> উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ব চন্দ্রইব শুক্লপক্ষে।
> অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ব পদ্মমিব বারি মধ্যে।
> নদসি ত্বং বিশুদ্ধসত্ব কেশরীব বনে রাজ বনচারী।
> বিভ্রাজসে ত্বমগ্রসত্ব পর্ব্বত রজাইব সাগর মধ্যে।"

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভূমণ্ডল পাশবাকার ভয়ানক মনুষ্যে পূর্ণ ছিল, অধিকাংশ মনুষ্যে ঘোর বন্য বুদ্ধি ও পশুভাব ছিল, ভগবান বুদ্ধদেবের করুণার প্রস্রবণ শান্ত ধর্ম্মোপদেশ সে সময়ে শত বাধা অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল। মানবের উপর বুদ্ধের এরূপ প্রাধান্যলাভের হেতু কি? পুণ্য প্রভাবেই তিনি বিশ্বরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকালে যে আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাতির অথবা গ্রহাদির আলোক নহে। বৌদ্ধেরা ইহাকে পবিত্র জীবনের মহাতেজ বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব রাত্রিকালে "অবক্ষোবর্ত্তন" নাম দিব্য হস্তীরূপে মাতার গর্ভস্থ হইয়াছিলেন, প্রভাতে নানা দিক হইতে বোধিসত্ত্বগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অসংখ্য সৎকর্ম্মোপলব্ধ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃরাশির উদ্দীপন দ্বারা তাঁহাদের বসিবার দিব্য সিংহাসন প্রদান করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহা উক্ত আছে :—

> "This is the cause why the Bodhisattva had, on the expiry of the night evolved the light from his body." LalitaVistara, II, 107.

মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার কালে

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বুদ্ধের যোগসিদ্ধ পুণ্যময় তেজের কথাই আমি বলিয়াছি; ইহার সহিত অপর আলোকের তুলনা করাই লজ্জাবহ। অনুমান হয়, বুদ্ধদেবই উপশাস্ত্রে খ্রীষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন। এবং জ্ঞস্তিক লিপি ক্রমে বহু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, তৎসঙ্গে মূল বিষয়েরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান সঙ্গত কি না? কারণ জ্ঞস্তিকগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহে, অথচ উপশাস্ত্রে তাহারাই খ্রীষ্ট জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এই জ্ঞস্তিকগণ কে? অগ্রে স্থির করুন। পরে বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের জন্মালোক স্থির হইবে। তখন বুঝিতে পারিবেন, উপশাস্ত্র বুদ্ধদেবের জন্ম প্রসঙ্গের অবচ্ছিন্ন অনুবর্ত্তন কি না?

লুম্বিনি উপবনে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিলে, শাক্যকুল আনন্দে মত্ত হইয়াছিল। কপিলবাস্তু নগর মহোৎসবে প্রকম্পিত হইতেছিল, এমন সুখের তরঙ্গে এক বিষাদ ঝটিকা উত্থিত হইয়া সর্ব্বদিক বিষাদময় করিল। বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের সপ্তাহের মধ্যে মায়াদেবী মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলেন কেন, তাঁহার মৃত্যুর কি কোন কারণ ছিল? পালিভাষাভিজ্ঞ টর্ণার সাহেব সিংহলের গ্রন্থাদি দৃষ্টে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এই। *

"That a womb in which a Buddha elect has reposed is like the sanctuary of a chaitya (temple). On that account the mother of Buddha always dies in seven days that no human being may again occupy it."
Ar. Lillie. P. 12.

অপর ললিতবিস্তরের সপ্তম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে-যে, ভূতপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বদিগের প্রসূতিগণ সাত রাত্রি মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মায়াদেবী পুত্র প্রসবান্তে অল্পকাল মাত্র জীবিতা ছিলেন। জ্ঞানী বোধিসত্ত্বকে উদরে ধারণ জন্য তাঁহার হৃৎকোষ বিদীর্ণ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণদ্বারা মায়াদেবীর মৃত্যুর দুইটী কারণাবধারিত হইল। প্রথম কারণ, অতুলজ্ঞানসম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয় সকলের পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ। দ্বিতীয় কারণ, ভগবান্ যে গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনুষ্যের তাহাতে উৎপত্তি হইতে পারে না। দেবালয় মনুষ্যের জন্য নহে। মায়াদেবীর গর্ভে অপর পুত্র উৎপত্তির নিবারণ হেতু তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য, বৌদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত মত এই। আপনি দিব্যচক্ষে দেখুন, মহাপর্ব্বের সেবকেরা মেরীর অপর পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে কিরূপ ধারণায় অগ্রসর হইয়াছেন!

মহাত্মা আর্থর লিলি তাঁহার প্রণীত "খ্রীষ্টীয় সমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম" (Buddhism in Christendom) নামক গ্রন্থে এক স্থানে হার্ডিকৃত গ্রন্থ হইতে এই কথাগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন, যথা ;—

"The resemblance between this legend and the doctrine of the perpetual virginity of the mother of our Lord cannot but be remarked. The opinion that she had ever borne other chileren was called heresy by Epephaneus and Jerome. * * *
They suppose that it is to this circumstance that reference is made in the prophetical account of the eastern gate of the temple. "Then said the Lord unto me, this gate shall be shut. It shall not be opened and no man shall enter in by it, because the Lord the god of Israel hath entered in by it. Therefore it shall be shut"
Ezek. 44. 2.

এখন আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইলেন, উপরে যাহা বলা হইল, তাহা অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, কিন্তু মহাপর্ব্বের সকল তাৎপর্য্য সর্ব্বতোভাবে

* Journal. Beng. As. Soc. Vol VII. P. 800.

সকলে বুঝিতে অক্ষম, আমি এইমাত্র স্থূল মর্ম্মাবগত হইয়াছি যে, যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তার উক্ত্যনুসারে মায়াদেবীর ন্যায় মারায়ার গর্ভে খ্রীষ্ট ব্যতীত অপর সন্তানোৎপত্তি নিষেধ আছে। যে হেতু উহাতে খ্রীষ্টের উৎপত্তি হেতু উহা দেবালয় তুল্য। দেবালয়ে মনুষ্যের স্থান নাই, ইহাই যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে মনের অন্ধতা দূর হয় কৈ? মহাপর্ব্বে যে ইহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। অব্যবহিত চিত্তে সেই আখ্যায় বাক্যগুলি প্রতিমূলে গ্রহণ করুন।

"এই সকল দৃষ্টান্ত কথা সমাপ্ত করিলে পর যিশু স্থানান্তরে গমন করিলেন, এবং স্বদেশে আসিয়া লোকদিগকে তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন বিজ্ঞান ও এমত প্রভাবের ক্রিয়া কোথা হইতে হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম্ নহে? এবং যাকোব্ ও শিমোন ও যিহুদা এ সকল কি ইহার ভ্রাতা নহে? এবং ইহার ভগিনীরা কি সকলে আমাদের এখানে নাই?" মথি ১৩ অ। ৫৫ পদ।

খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্বের এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ব্বে হইয়াছিল কি? খ্রীষ্ট ব্যতীত মারায়ার গর্ভে অপর সন্তনোৎপাদিত হইতে পারে না, কেন না, তাঁহার চির কৌমার্য্যে দোষস্পর্শ হয়। প্রাচীনেরাও সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারেন নাই। বরং এরূপ উক্ত আছে যে, যুসেফের সহিত মেরীর কোন কালেই দাম্পত্য বিঘটন হয় নাই।

"Excluded a matrimonial connexion between Joseph and Mary for all time." Strauss 1. 186.

যুষেফের ঔরসে মেরীর পুত্র হইয়াছিল কি না, এ সম্বন্ধে দুরূহ মতান্তর দৃষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্টের জন্মের পর যুষেফ মারায়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঘোর অশাস্ত্রীয় কথা বলিয়া লোকে বিদিত আছে।

"The opinion that Mary after the birth of Jesus became the wife of Joseph was early ranked among the heresies and the orthodox Fathers saught every means to escape from it and to combat it." Strauss. I. 186.

জানিনা কোন্ অনির্ব্বচনীয় কারণে, বহু গবেষণার পর, কোন কোন খ্রীষ্টীয় যাজক সিদ্ধান্ত করিবেন যে, খ্রীষ্টের ভ্রাতা ভগিনী সকল ছিল বটে, কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টের সহগর্ভ-সম্ভূত নহে। যুষেফের পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত। কি প্রাচীন কি আধুনিক, সুবিজ্ঞ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রদর্শী মাত্রেই বলিয়াছেন যে, যুষেফের সহিত মারায়ার দাম্পত্য সম্বন্ধ কথনই বিঘটিত হয় নাই। বরং যুষেফের পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভ-সমুদ্ভূত সন্তানের কথায় মহাত্মা জেরোম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উহা দুঃসাহসিক কল্পনা এবং অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিয়া উহার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন।

"Though Epephaneous allows that Joseph had sons by a former marriage Jerome rejects the supposition as an impious and audacious invention." Strauss 1. 186.

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মারায়ার গর্ভে অপর পুত্রোৎপাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং বুদ্ধ মাতা মায়াদেবীর পুনঃ গর্ভ সম্বন্ধে বৌদ্ধ শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, দেখিতেছি, তাহাই যেন মারায়ার আখ্যায়িকায় প্রতিপাদিত হইতেছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাইবেলোক্ত খ্রীষ্টজীবন ঘটনার সহিত তাহার ভূরি সন্নিকর্ষ আছে; পাঠক তাহা স্থির চিত্তে পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে,

ঐ সমস্ত বিষয় প্রভূত অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বুদ্ধদেব মায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এবং পরে স্বীয় পিতা মাতাকে জন্ম সংবাদ অবগত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে স্বপ্নাবেশে মাতাকেই ইহা অবগত করেন। মায়াদেবীর সসত্বা হইবার পর কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত মহারাজা শুদ্ধোদনের চিত্ত অধীর হইলে শূন্যে অমরবৃন্দ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান জন্মিয়াছেন, এই সংবাদ তাঁহাকে অবগত করিবামাত্র তাঁহার চাঞ্চল্য দূরীকৃত হইল। এই বৌদ্ধলিপির প্রত্যভিজ্ঞান বাইবেলে দৃষ্ট হয়। লুক লিখিত সুসমাচারের প্রথমাধ্যায়ে, ২৮ পদে উক্ত হইয়াছে, মারায়ার গর্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূত আসিয়া অগ্রে তাঁহাকেই অবগত করিলেন যে, তাঁহার গর্ভে ত্রাণকর্ত্তা (যিশু) জন্মপরিগ্রহণ করিবেন; এই ঘটনার অল্পকাল পরে মারায়া সসত্বা হইলে যুষেফের মনোভঙ্গ হইয়াছিল। ঐ সময়ে স্বর্গীয় দূত মারায়ার গর্ভবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর করায় তাঁহার সকল আশঙ্কা অপগত হইল। আপনি বলুন, এ বৌদ্ধ বিবরণ বাইবেলে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না? শুধু ইহাই নহে, হিব্রুজাতির মহাযান সূত্র কার্ব্বালাহের লিখিত বিষয়ের সহিত বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বহুতর সন্নিকর্ষ দৃষ্ট হয়। ফ্রাঙ্ক, ব্লাবাৎস্কি এবং লিলি প্রভৃতি প্রবুদ্ধ ব্যক্তির প্রগাঢ় পরিশ্রমে বিলুপ্তপ্রায় পুরাতত্ত্বের ভূরি সার সঙ্কলন হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে ভারতে পূর্ব্বে কি ছিল এবং এক্ষণে বা তাহা কোথায় কিরূপে নিহিত আছে, ইহা স্পষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। লিলি লিখিয়াছেন,

"In the Kabbalah it is announced that the Heavenly Man comes to earth in the marcaba or chariot."

ললিতবিস্তরের পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্বের স্বর্গারোহণকালে অসংখ্য ত্রিদশবৃন্দ তাঁহাকে রথে বহন করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রথারোহণের একখান প্রতিকৃতি ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের ভূমণ্ডলে রথাবতরণ সংবাদ আরমাণিয় জাতির অজ্ঞাত ছিল না।

"In the Armenian ritual this is the Collect for Good Friday. 'Thou who seated on majesty on the firy chariot of four faces, ineffable Word of God, hast come down from heaven for thy creatures. Surprised with admiration the seruphim and Cherubim and principalities of celestial cohorts gathered round, crying in their astonishment Holy, holy, holy, is the Lord of hosts.' A. Lille. P. 13.

ললিতবিস্তরের পঞ্চম পরিচ্ছেদের কয়েকটি কথা এ স্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Davas innumerable carried forth the pavilion on their heads and shoulders and hands while hundreds of thousands of Apsarases, placing themselves in front and behind, on the left side and on the right, each employing musical voice bepraised the Budhisattva."

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনলের প্রতি পতঙ্গ।

"কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তস্য সুন্দরম্"।

১

পুড়িয়া মরিব—
ও পদে ভিখারী দাস,
পুড়িয়া মরিতে আশ,
বিধাতার বরে আজি সাধ পুরাইব;
জীবনে "মরণ" আছে,
তাই যাচি তব কাছে,
এ কচি পরাণ টুকু রাঙ্গা পায়ে দিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

পুড়িয়া মরিব—
জগতের যত শোভা
মনোহর মনোলোভা,
সকলি তোমাতে মাখা, বেশি কি বলিব!
ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্য ভূমি
আমার সকলি তুমি!
তোমাতে এ কায় মন পূর্ণাহুতি দিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৩

পুড়িয়া মরিব—
বসন্তের সমীরণে,
কুসুমিত উপবনে,
কত খুঁজিয়াছি তোমা, কেমনে কহিব?—
তুমি ভেবে—রবিটীরে,
দেখিয়াছি ফিরে ফিরে!
রাঙ্গা মেঘে দেখে বলি "ছুটিয়া ধরিব"!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৪

পুড়িয়া মরিব—
মুহূর্ত্তে সে ভেঙ্গে ভুল,
মরমে বাজিত শূল!
সে যাতনা সে বেদনা খুলে কি বলিব?—
ভাবিতাম—ক্ষুদ্র আয়ু,
কবে কেড়ে নেবে বায়ু,
হয়তো এ তৃষা নিয়ে শ্মশানে শুইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৫

পুড়িয়া মরিব—
যদি বিধাতার লেখা,
দয়া করি দে'ছ দেখা,
জীবন থাকিতে দেহে কেমনে ছাড়িব?—
পতঙ্গের তুচ্ছ প্রাণ,
"উপহার" লহ দান!
চির-বাসনার তৃপ্তি বারেক লভিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৬

পুড়িয়া মরিব—
শত তপস্যার ফল,
চুমি ওই পদতল,
অণু পরমাণু হয়ে ও অঙ্গে ডুবিব!
ও জ্বলন্ত দেবরূপে
ধীরে ধীরে—চুপে চুপে,
আত্ম-সমর্পণ করি "অমর" হইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৭

পুড়িয়া মরিব—
অবোধ পতঙ্গ-প্রাণ,
চাহেনা কো প্রতিদান,
আমারে দিওনা কিছু—আমি সবি দিব,
দিছি সাধ দিছি আশা,
দিছি প্রীতি ভালবাসা,
বাকী আছে দেহ, আজি তাহাই সঁপিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব!

৮

পুড়িয়া মরিব—
মানুষ বঞ্চক জাতি,
সদা থাকে হাত পাতি,
বলে "তুমি আগে দাও আমি শেষে দিব"
আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গম,
নর নহি—প্রিয়তম!
আমার সর্ব্বস্ব লও, কৃতার্থ হইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৯

পুড়িয়া মরিব—
পুড়িয়া মরিতে আসা,
পুড়িয়া মরিব আশা,
কেমনে এ ভালবাসা নীরবে সহিব?

তাই বলি আরো ঢা'লো,
ও পূত উজল আলো,
হইয়া আপনা হারা ঝাঁপায়ে পড়িব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

১০

পুড়িয়া মরিব—
তফাতে, বাহিরে থেকে,
হাতে ছুঁয়ে চোকে দেখে,
যে হয় সে হো'ক্ সুখী আমি না পারিব!
আমি তব অণু হব,
তোমাতেই ডুবে রব,
"তুমি আমি" ঘুচে গিয়ে একই হইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

১১

পুড়িয়া মরিব—
অনন্তের সাক্ষী পারা,
দেখ চেয়ে কোটি তারা!
বিন্দু আমি সিন্ধু-মাঝে মিলিব মিশিব!
ইষ্টদেব-পদে প্রাণ
সশরীরে করি-দান,
সারূপ্য, সাযুজ্য, মোক্ষ সকলি পাইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।
(কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি)

বিলাত যাত্রা ও অকপটতা।

বাঙ্গলা দেশের বাষ্পাতপজাত দৈহিক শিথিলতাবশতঃ হউক, অথবা পরাধীনতার নির্জ্জীবতা বশতঃ হউক, অথবা গৃহসুখ-লালসা হেতুই হউক, ইহা নিতান্ত সত্য যে, বাঙ্গালীর জীবনে একটা আলস্যের ঘোর লাগিয়াছে। বাঙ্গালী, অহিফেন-সেবীর ন্যায় ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া হাই তুলিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কার্য্যশীলতা, উদ্যম, ও বিপদের নামে ভীরু ও অলস বাঙ্গালীর আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

কবে বাঙ্গালীর এই আতঙ্ক যাইবে? কবে এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিবে? এ নিন্দিত নিদ্রার ঘোর যাহাতে ভাঙ্গে, তাহা অনিন্দিত নহে, তাহা প্রার্থনীয়।

এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গা পক্ষে বিলাত যাত্রা যে কতকটা সহায়তা করে, তাহার সন্দেহ নাই। বাত্যোন্মথিত জলধির বজ্রনাদী নির্ঘোষে উত্তাল তরঙ্গ-ঘূর্ণিত তরির আলোড়ন, লণ্ডন মহানগরীর ঘনঘোর রোল-কলকারখানার অবিরাম ঘর্ঘর নিনাদ হয়ত বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে। বিলাতের স্বাধীনতার স্ফুরিতাগ্নি কার্য্যময়তার সংক্রামক তেজ,জীবনসংগ্রামের মহাকোলাহল, সমাজের ঘন ঘন উচ্ছ্বাস, বীরত্বের ভৈরব হুঙ্কার হয়ত বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে, হয়ত কর্ম্মশীল ও সাহসী করিতে পারে। তাই বলি,যদি স্বদেশহিতৈষী হও, যদি মিছা প্রাচীন গর্ব্বে ডুবিয়া না গিয়া থাক, যদি আবার মাথা তুলিতে চাহ, তাহা হইলে, গোলে হরিবোল দিয়া, মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া, যাহা অন্তরে বিশ্বাস কর না, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিয়া, স্বজাতির উন্নতির পথে কণ্টক দিও না; নিরপরাধী বিলাত ফেরত শিক্ষিত সন্তানগণকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া আপনাকে আপনি দুর্ব্বল করিও না। ভিন্ন মতাবলম্বিগণ! আমি মনে করিয়াছি, যতদূর পারি, ততদূর ভক্তি ও সম্মানের সহিত, আপনাদিগের ব্যবহার আলোচনা করিব; যতদূর পারি, সম্মান-সূচক ভাষায় আপনাদিগের ভ্রম দেখাইয়া

দিবার চেষ্টা করিব। পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব বাবু, মহানুভব বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, সমাজের প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়া উচিত। আমি এই কথা মাথায় করিয়া লই।

কিন্তু যাহা সত্য কথা, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য নাই। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা রাগে বা দ্বেষে লিখিতেছি না। দুঃখে লিখিতেছি। আমার লিখিত সত্য কথা যদি কাহারও মনে ব্যথা দেয়, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, প্রার্থনা করি।

আমি উপরে বলিয়াছি, "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া" বিলাত-প্রত্যাগত সন্তানগণকে সমাজচ্যুত করিও না। "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া ?" হাঁ, "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া" এই কথা অনেক বর্ত্তমান হিন্দুর পক্ষে খাটে। প্রায় প্রত্যেক ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দুর পরিবারে কেহ না কেহ ম্লেচ্ছ আহারে বা পানে লিপ্ত। জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়, আপনি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেমন করিয়া এক সঙ্গে আহার করেন ? আপনি বলিবেন, অন্যে কে কোথায় ঘরের ভিতর, আমার অগোচরে, কি করে বা কি না করে, তাহা আমি অনুসন্ধান করি না, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, অন্যে গোপনে কি করে, আপনি যদি তাহা ঠিক নাই জানেন, আপনার নিজ ঘরে পুত্র বা ভ্রাতা আপনার জ্ঞাতসারে (পয়সায় কুলাইলে) নিত্য যে কুক্কুট মাংস ভোজন করেন, মধ্যে মধ্যেই কৃষ্ণভ্রমরশ্মশ্রু শোভিত বাবুর্চ্চির হস্তে পলান্ন কট্লেট লেহন করেন। তদ্বিষয় কি বলেন ? তাহার সহিত আহারাদি করিতে কি আপনার হিন্দুধর্ম্মে বাধে না ? যত আপত্তি ঐ বিলাত ফেরত সম্বন্ধে ? আর আপনি ইংরাজিভক্ত শুভ্রকেশধারী হিন্দু, আপনাকেও বলি, আপনি নিজে যে নিশীথে নির্জ্জন গৃহে যাহা আহার করেন, তাহা কি হিন্দুধর্ম্মে বাধে না ? হিন্দুধর্ম্মে বাধে বুঝি কেবল বিলাত-ফেরত ? ঘরে ঘরে দেখ, কি ব্যাপার ! গোপনে, প্রকাশ্যে চলিতেছে দেখুন কি ব্যাপার ! প্রকাশ্যে ? হাঁ, প্রকাশ্যে, কত স্থানে। তাহার সম্বন্ধে হিন্দুদলপতিগণের কথাটী নাই।

একদা, নবদ্বীপের ও অন্য স্থানের পণ্ডিতগণ কোন ধনী হিন্দুভবনে উপস্থিত। ধনবান যজমান শূকর গোমাংস কিরীটিত ভোজ প্রকাশ্যে ভোজন করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে পণ্ডিতমণ্ডলীদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী চরিতার্থ হইলেন। এই প্রকারে শূকর গোমাংস-ভোজীর ভবনে আহার করিলেন ; এবং রজতরূপী প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এখানে হিন্দুধর্ম্মে বাধিল না। স্মৃতি বা শ্রুতি, ভাষ্য বা টীকা, যুক্তি বা দেশাচার এই শূকর-গোমাংস-ভোজী হিন্দুভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আহার ও বিদায়ের অবিধেয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিল না, তাহারা যাহা কিছু বলে, কেবল বিলাত-ফেরতদিগকে। অপূর্ব্ব (আধুনিক) হিন্দুধর্ম্ম ! তোমার লীলা কে বুঝিবে ?

পূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তাহা এখানে মনে আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন এক হিন্দুরাজার বাটীতে গিয়াছিলেন। রাজা ঘোর সাহেব। টেবিলে ভিন্ন "ডাইন" করেন না, যবনের হাতে ভিন্ন অন্ন রোচে না। একদিন রাজভবনে এই রাজার গুরুদের, এবং দেশের

একজন প্রধান স্মার্ত্ত অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজা আসীন। এমন সময় একজন হাড়ি বাবুর্চ্চি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর আজি বান্দার প্রতি কি কি "ডিশ" হুকুম হয়?" রাজা নিজের মনের মত খানা হুকুম করিলেন। হাড়ি বাবুর্চ্চি অন্তর্হিত হইল। পণ্ডিতপ্রবর দুই জন গুরুদেব ও স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও নেত্তাপণ্ডিত নিষ্প্রভ হইয়া যাইলেন। কিন্তু গুরুর কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া। সুতরাং তিনি বলিলেন, "মহারাজ যবন বাবুর্চ্চি ছিল, তার উপর আবার হাড়ি বাবুর্চি কেন? এটা নিষ্প্রয়োজন অত্যাচার নহে কি?" রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, নিষ্প্রয়োজন নহে। অপ্রয়োজনে একজনের স্থলে দুইজন কেন রাখিব? দুঃখের কথা বলিব কি, ঠাকুর, মুসলমান বাবুর্চ্চিটা সব রাঁধে, কেবল শূকর রাঁধিতে নারাজ। হাড়ি বাবুর্চ্চি পাষণ্ড, সব রাঁধে, কিন্তু কোনমতে গোমাংস পাক করিবে না। সুতরাং উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মুসলমান ও হাড়ি উভয় বাবুর্চ্চি রাখিতে হইয়াছে।" পণ্ডিতদ্বয়ের মুখদ্বয় প্রভাতের চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় একবারে প্রভাহীন হইয়া যাইল। কিন্তু এই রাজাকে সমাজচ্যুত করার কথা কখন উঠে নাই। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকটে, এই রাজার আচরণ বাধে নাই। হিন্দুধর্ম্মে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট, বাধে কেবল বিলাত-ফেরত।

দেশে বসিয়া যাহা খুসি তাহাই কর না কেন (বিশেষতঃ যদি টাকা থাকে) তাহাতে জাতি যায় না; কিন্তু বিলাত যাইলে জাতি যায়, এই রহস্যের তথ্য কি? ইহার উত্তর, আমি জাতিভেদ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তাহাতে প্রকারান্তরে দিয়াছি। ইহার উত্তর, প্রাচীন জাতিভেদের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে, তাহা মন্দ, তাহা সমাজের অনিষ্টজনক, তাহা কপটতাপোষক, ঈর্ষাচালিত, ভীরুতাবর্দ্ধক।

বিলাত-ফেরতদিগের সমাজচ্যুত করার পক্ষে সমাজ শাসক বা কার্য্যচালক কে, তাহা মনে করিয়া দেখিলেই, আমার কথা পরিষ্কার হইবে। যাঁহারা নিজে যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য বিলাত-ফেরতের সঙ্গে মিশেন না, তাঁহারা বিলাত-ফেরতকে সমাজচ্যুত করার পক্ষে কোন কার্য্যই করেন না। কারণ তাঁহারা এখন প্রায় সমুদয় হিন্দু সমাজকে পতিত মনে করেন, এবং সমাজের সহিত আহারাদি করেন না। এবং এখানকার নব্য ইংরাজি শিক্ষিত কুক্কুটভোজী (বা গোখাদক) নব্য হিন্দুর মধ্যে কোন প্রভেদই দেখেন নাই।

এখানে একটী বাস্তবিক ঘটনা বলি। কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে একটী ব্রাহ্মণ কন্যা আছেন। ইনি শৈশব হইতে বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণী, স্নেহের বন্ধনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সংসারে থাকেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ইংরাজি নবিশ নব্যতন্ত্র যুবক। তিনি তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করেন না, রোগের সময় শুশ্রূষাদির জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের যখন স্পর্শ করেন, তখন স্নান না করিয়া আর জলগ্রহণ করেন না। স্নান করিয়া তাঁহার হবিষ্যের ঘরে যান, সেখানে রন্ধন ও আহার হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের কক্ষে আইসেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বিলাত যাইলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সময় উপস্থিত হইল। বিধবার অন্ত

ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের বিলাত-ফেরত ভ্রাতার সহিত যদি আমরা এ সংসারে থাকি, তাহা হইলে আপনি এই নূতন বাটীতে থাকিবেন, অথবা আমাদিগের পুরাতন বাটীতে গিয়া স্বতন্ত্র বাস করিবেন? তাহাতে ব্রহ্মচারিণী বিধবা উত্তর করিলেন—"কেন, তোমাদিগের সংসারে এই বাটীতে এখন যেমন আছি, তেমনি থাকিব। তোমরা বিলাত যাও নাই, সে বিলাত গিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগের এবং তাহার মধ্যে আমার নিকট কোন প্রভেদ নাই। তোমাদিগের সংসারে আমি যেরূপ ভাবে আছি, তাহার সহিত সেইরূপভাবে এক সঙ্গে থাকাতে কোন দোষ দেখি না।" এই ব্রাহ্মণীর হিন্দুধর্ম্মে যথার্থ বিশ্বাস আছে। তাহার কঠোর ব্যবস্থা কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া থাকেন। অথচ তাহার অকপট উক্তি কি ভাবিয়া দেখুন। হিন্দু সমাজের প্রাচীন হিন্দুয়ানীর প্রতি যাঁহাদিগের অকপট বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের কার্য্য এই বিধবার কার্য্যের অনুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহারা জানেন "ঠক বাছিতে গাঁ ওজর" হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা কাহাকেও "এক ঘরে" করিতে ব্যস্ত হন না। তাঁহারা অন্তরে জানেন, বাস্তবিক অখাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি আচার ব্যবহার বিচার করিয়া "একঘরে" করিতে হইলে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোককে "একঘরে" করিতে হয়; এবং এইরূপে "একঘরের" দল "অনেক ঘরে" হইয়া পড়ে এবং "একঘরে"-করণপ্রয়াসিগণ নিজেই একঘরে দশাপন্ন হন। সুতরাং এই সকল বুদ্ধিমান ও অকপট ব্যক্তিগণ, অন্যের উপর হস্তারক না হইয়া, নিজের ধর্ম্ম নিজে রক্ষা করিয়া চলেন, এবং অনর্থক কোলাহল না করিয়া, স্ব স্ব বিশ্বাসমতে বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করেন।

তবে বিলাত-ফেরতকে একঘরে করে কে? ইহার উত্তর বারান্তরে দিব।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা। (১)

বাঙ্গালা-লেখকেরা চারি দলে বিভক্ত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সুদক্ষ, তাঁহাদের মতানুসারে বঙ্গভাষা, সংস্কৃতের অনুযায়িনী হওয়া উচিত। শুধু উচিত বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত নন, তাঁহারা স্ব স্ব রচনাকে তদনুরূপ আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, এমন অনেকেও এই মতাবলম্বী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজিতেই সমধিক পণ্ডিত; সংস্কৃতেও তাঁহারা নিপুণ নহেন, এমন নয়। উক্ত ভাষা-যুগলকে সম্মুখে রাখিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে বাঙ্গালাকে চালিত করিতে তাঁহারা সযত্ন। বাবু অক্ষয়কুমারদত্ত, বাবু ভূদেব-মুখোপাধ্যায় সি আই ই, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ, রায় বাহাদুর, সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি-এল, বান্ধব-সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি-এস, পণ্ডিত

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ইত্যাদি লেখকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক দল আছেন। কেবল তাঁহারা বাঙ্গালাই জানেন। বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের উপজীব্য। কলিকাতা নর্ম্মাল্, হুগলি নর্ম্মাল্ প্রভৃতি নর্ম্মাল্ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীরা এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ঐ সকল নর্ম্মাল্ স্কুলের ছাত্র ও পণ্ডিত ভিন্ন অন্যেরাও এই শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারেন। যাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন অপর ভাষা অধ্যয়ন অনুশীলন করেন না, স্কুল-কালেজেও বিদ্যোপার্জ্জন করেন না, তাঁহারাও কি এই শ্রেণীর স্থান অধিকারের উপযুক্ত নন? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে হইবে যে, তাঁহাদিকে এই দল হইতে বহিষ্কৃত করিতে গেলে, শ্রেণী-বিভাগের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সুতরাং তাঁহাদিগকেও এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইল। এ শ্রেণীর খ্যাতিমান্ লেখক-সংখ্যা স্বল্প। তবে তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ লোক আছেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান যুবকবৃন্দ। ইংরেজিই ইহাদের আদর্শ। ইহারা ইংরেজিও উত্তম অবগত। যুক্তি, বিচার, সুতর্ক, মীমাংসা ইহাদের নিকট হার মানে। নদী, যেমন আপন মনে সাগরোদ্দেশে কোন বাধা-বিপত্তি না মানিয়া অনবরতই ধায়, ইঁহাদেরও মনের গতিই তদ্রূপ নানাভাবে যায়। ইহাদের ভাষারও সেই প্রকার রীতি, ব্যাকরণ, সুশৃঙ্খলা, সুশ্রাব্যতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলই চলিয়াছে; সে ভাষা ভাসা-ভাসা। তাহা কোন বিঘ্ন বাধা মানিবে না। এ শ্রেণীর সংখ্যার তালিকা করিতে গেলে, আমাদের পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তাহাতে বিরত হইতে হইল।

এখন বাঙ্গালার কোন্ গতি শ্রেয়সী? আমাদের বিবেচনায় দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লেখকেরা যে মতাবলম্বী, বাঙ্গালার তাহাই আদর্শ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক, তাহা সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী হওয়া বিধেয়। অনুবাদ-বিষয়েও আমাদের সতর্কতা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অবিকল অনুবাদ না করিয়া শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনে অনুবাদ নিষ্পন্ন হওয়া প্রার্থনীয়। এই সকল কারণে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

আমরা নিম্নলিখিত রূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

১। সাধারণ ভ্রম। ৬। লেখক-গণের
২। বানান ভুল। শ্রেণী বিভাগ।
৩। বিবেচ্য বিষয়। ৭। এইপ্রবন্ধ-
৪। অসঙ্গত আশঙ্কা লেখকের বক্তব্য
৫। ভাষার আন্দোলন বিষয়।

অগ্রে "সাধারণ ভ্রম"-বিষয়েই আলোচনা করা যাইতেছে। ক্রমশঃ অন্য অন্য অংশ লিখিত হইবে।

১। সকৃতজ্ঞ চিত্ত।—"সকৃতজ্ঞ" শব্দের ভ্রান্তি নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে উহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। উক্ত শব্দে দুই সমাস আছে। "কৃতজ্ঞ" শব্দ উপপদ-তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন। উহার সমাস-বাক্য এই—কৃতকে (কৃত উপকারকে) জানেন যিনি। এই সমাস নিষ্পন্ন পদ বিশেষণ। সুতরাং উহা এখানে বিশেষণ, তাহা বলাই বাহুল্য। 'সকৃতজ্ঞ' সমাস করিতে যেরূপ ব্যাস-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা এইরূপ, "কৃতজ্ঞের সহিত বর্ত্ত-

মান যাহা, তাহা সকৃতজ্ঞ।" এই খানেই গোলযোগ। এই সমাস-বাক্যের অন্তর্গত "কৃতজ্ঞের সহিত" এই পদে "কৃতজ্ঞের" স্থানে 'কৃতজ্ঞতার' না করিলে চলিতেছে না। কিন্তু ইহা নিয়মবিরুদ্ধ। তবে "কৃতজ্ঞতার সহিত বর্ত্তমান যাহা তাহা" এইরূপ প্রয়োগ শিষ্ট বটে। কিন্তু এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? "সকৃতজ্ঞ চিত্ত" পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞ চিত্ত" লেখাই উচিত; কেন না উহাই ভ্রম-বিবর্জ্জিত। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় কোন লেখক * ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। ভ্রম বুঝিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুকরণকারীরা সম্যক্ বিবেচনা, বিচার না করিয়াই অবাধে উহা চালাইতেছেন। যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কেবল ভ্রম ধরিয়া রাখিয়াছেন। "কৃতজ্ঞ" বিশেষণ। "সকৃতজ্ঞ" দ্বিগুণ বিশেষণ।

২। সম্রাজ্য।—রাজন্ শব্দ হইতে "রাজ্য" সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া "সম্রাজ্য" শব্দও নিষ্পন্ন করিতে যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের কর্ত্তৃক সাধিত "সম্রাজ্য" পদের মূল কি? মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা অবধারণ করিতে পারিবেন, উহার মূল সম্রাজন্ নয়, কিন্তু "সম্রাজ্।" সম্রাজ্ শব্দের প্রথমার একবচনে "সম্রাট" হয়, কিন্তু রাজন্ শব্দের ঠিক্ ঐরূপ স্থলে (প্রথমার একবচনে) "রাজা" হইয়া থাকে। পাঠক বুঝুন, উভয়ের কি পার্থক্য! যখন উহার মূল সম্রাজন্ হইল না, তখন রাজন্ শব্দ হইতে "রাজ্য" নিষ্পন্ন হয়,এই নজির ধরিয়া সম্রাজ্য কেন হইবে না, এতক্ষণে বোঝা গেল। যেরূপ নিয়মে "রাজন্" হইতে "রাজ্য" নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ স্থলে "সম্রাজ্" হইতে "সাম্রাজ্য" নিষ্পন্ন হইবে। সুতরাং সম্রাজ্য ভুল; কিন্তু সাম্রাজ্য নির্ভুল।

৩। সম্রাজ্ঞী।—রাজন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রাজ্ঞী হইয়া থাকে; সুতরাং সম্রাজ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে গেলে, "সম্রাজ্ঞী" কেন হইবে না, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া "সম্রাজ্ঞী" লেখা চলিতে আরম্ভ করে। উহা যে অপসিদ্ধান্ত, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। ২ সংখ্যায় বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, সম্রাজ্ শব্দ যদি সম্রাজন্ হইত, তবেই সম্রাজ্ঞী হইতে পারিত। সম্রাজ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "সম্রাজ্ঞী" হইবার যে বাধা আছে, এখানে স্পষ্টই প্রদর্শিত হইল। উহার পুংলিঙ্গেও যাহা, স্ত্রীলিঙ্গেও তাহা হইবে। শ্রীমান্ তারিণীচরণ সান্ন্যাল নামক এক অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নামক নিজ-সংগৃহীত পুস্তকে সম্রাজ্ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে "সম্রাজ্ঞী" করিয়াছিলেন। ১২৯২ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণের "সোমপ্রকাশে" আমরা তাহার ভ্রম প্রদর্শন করি। সম্রাজ্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সম্রাট হয়, স্ত্রীলিঙ্গেও তাহাই হইবে। "মহারাজ্ঞী" দেখিয়া "সম্রাজ্ঞী" লেখার সূত্রপাত হয়। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলা আবশ্যক। কর্ম্মধারয় সমাসে মহান্ রাজা স্থলে যে মহারাজ হয়, তাহার স্ত্রীলিঙ্গে মহারাজী হইয়া থাকে; ঐ স্থানে মহারাজ্ঞী হইবে না। যুবরাজ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেও যুবরাজী হইবে, যুবরাজ্ঞী হইবে না। মহতী রাজ্ঞী এই বাক্যে মহারাজ্ঞী হইয়া থাকে। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

* বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির-সম্বন্ধ বিচার" পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রথমতঃ ঐরূপ লেখেন, কিন্তু পরে শোধন করেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (৫)

ব্যবস্থা ঘটিত উন্নতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

অস্থি, তৈলপ্রদ বীজের খৈলভাগ ও যবক্ষার, এই তিন পদার্থ ব্যবস্থা দ্বারা কিরূপে সংরক্ষিত হইয়া কৃষি-উন্নতির সহায়তা সম্পাদন করিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে দেখান গিয়াছে। এই অধ্যায়ে ব্যবস্থা দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করাইয়া কৃষিজীবিদিগের কিরূপে বিশেষ উপকার সাধন করা যাইতে পারে, তাহাই বিবৃত হইবে।

অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা কৃষিজাত শস্য সকলের যেরূপ ক্ষতি হয় বৃক্ষ সকলের সেরূপ ক্ষতি হয় না। অতি বৃষ্টি নিবন্ধন বন্যা দ্বারা প্রতি বৎসরই দেশের কোন না কোন স্থলে শস্য নষ্ট হইল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আবার অনাবৃষ্টি দ্বারাও প্রতি বৎসর কোন না কোন স্থলে শস্য উৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে। অনাবৃষ্টি রহিত করিবার কোনই প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আকাশে কিছু ২ মেঘ থাকিলে ব্যোমজানে উঠিয়া কামানের আওয়াজ করিলে নিম্নবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টি পতন হয়। এই উপায় অবলম্বনে যে আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের কখন কোন সহায়তা হইবে, তাহা বোধ হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন যে, বৃক্ষ রোপণ দ্বারা বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ও বৃক্ষ কর্ত্তনের দ্বারা বৃষ্টিপাতের হ্রাস হয়। এ বিষয়ের উল্লেখ পরে আবার করা যাইবে। অতি বৃষ্টি ঘটিত বন্যা রোধ করিবার জন্য যে, যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তদ্দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়। বন্যার দ্বারা মৃত্তিকার উপর 'পলি' পড়িয়া উহার শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করে। বন্যার সময় নিরূপণ করিতে পারিলে অথবা ইচ্ছানুসারে বন্যার সঞ্চার ও প্রতিরোধ করিতে পারিলে বন্যা দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হইতে পারে না। মীসর দেশে নীল নদের পার্শ্বস্থ ভূভাগে প্রতি বৎসরই যথা সময়ে বন্যা উপস্থিত হয়। এই বন্যার পরে প্রতি বৎসর উপর্য্যুপরি তিনটী ফসল একই জমী হইতে উৎপন্ন হয়। দেশময় খাল, সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণলী ও পয়ঃ-প্রতিরোধ-কবাট (Lockgate) নির্ম্মিত হইলে ইচ্ছানুসারে বন্যার সঞ্চার ও রোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা অনেক অর্থ ও সময় সাপেক্ষ।

কাল সহকারে ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কি কি হওয়া সম্ভব, ইহার বিচার করায় বিশেষ লাভ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই এই স্থলে বলা উদ্দেশ্য। ব্যবস্থা দ্বারা অর্থাৎ বলপূর্ব্বক খাদ্যোৎপাদনকারী বৃক্ষ সকল দেশময় জন্মাইয়া লওয়াই এই উপায়। বৃক্ষ উৎপাদন এত সহিষ্ণুতা ও সময় সাপেক্ষ যে কেবলমাত্র ইহার উপকারিতা কৃষকদিগের বোধগম্য হইলেই যে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইবে, তাহার আশা করা যায় না। কৃষিজাত শস্য ৪।৫ মাসের মধ্যেই লাভ হয়, বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পাঁচ সাত বা দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। অন্য পক্ষে বৃক্ষ ধ্বংস করিতে কৃষকেরা

সর্ব্বদাই তৎপর। বৃক্ষের পত্র জন্তুদিগকে ক্রমাগত খাওয়াইয়া বৃক্ষ সকল তাহারা প্রায় হীনতেজ করিয়া ফেলে। গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যের জন্য কাষ্ঠ আবশ্যক হইলেই তাহারা বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া ফেলে। টাকার আবশ্যক হইলেও বৃক্ষরূপ মূলধন তাহারা ছাড়িয়া দিয়া বসে। বৃক্ষ রোপণ অপেক্ষা বৃক্ষ কর্ত্তন অধিক পরিমাণে হওয়াতে, দেশ ক্রমশঃ বিশাল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। যত দূর নজর হয়, ততদূর ধানের মাঠ। প্রকৃত রূপে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা বড় সুখের বিষয় নহে। "কেবল রুটী খাইয়া মানুষের জীবন ধারণ করা উচিত নহে, ঈশ্বর মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বাক্য খাইয়া তাহার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য," এই শাস্ত্রীয় বচন ভৌতিক (Material) ও আধিভৌতিক (Spiritual) উভয় অর্থে লইলে ইহার গভীরত্ব প্রতীয়মান হইবে। এই বিশাল ধরণী তলে জগৎপাতা যে কত অসংখ্য জাতীয় খাদ্যের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? এক এক জাতীয় খাদ্য ঈশ্বরের এক একটী বাক্য সদৃশ। সমস্ত খাদ্য উপেক্ষা করিয়া কেবল চাল দালের উপর নির্ভর করা ঈশ্বরের বাক্য উপেক্ষা করাও স্বভাবের সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দ্দেশের বিপরীত দিকে যাওয়া মাত্র।

আমাদিগের দেশের কৃষকগণের জ্ঞান ও দূরদর্শিতা এত অল্প যে, নিজ নিজ ভূমিতে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ থাকিলে দুর্ভিক্ষের সময় উপকারে আসিতে পারে, এ বিষয় ভাবিয়া দেখে না। কৃষকদিগের পক্ষে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ দুর্ভিক্ষ কালে প্রয়োজনে আসিতে পারে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব বা 'খাস' জমীর প্রজাদিগের পাট্টায় বৃক্ষ বিশেষের রোপণ সম্বন্ধে একটী স্বত্ব থাকে। এই স্বত্ব অনুসারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কার্য্য করার পক্ষে নিতান্ত শিথিল; এ কারণ গবর্ণমেণ্টের খাসমহল অন্যান্য জমীদারীর পক্ষে আদর্শস্থল হইবার সম্ভব থাকিলেও ফলে তাহা নহে। রাস্তা, খাল প্রভৃতি পথের দুই পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় 'বোর্ড' কর্ত্তৃক যে সকল বৃক্ষ রোপিত হয়, সেই সকলেও বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রণালী অনুসৃত হয় না। কোন কোন জেলার এঞ্জিনিয়ার পথের ধারে গাছ লাগানই পছন্দ করেন না। আবার কোন কোন এঞ্জিনিয়ার পথের ধারে সহস্র সহস্র আম্র ও কাঁটাল গাছ লাগাইয়া জেলার স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতেছেন। কেহ কেহ বা দেবদারু, বকুল, শিরীষ, নীম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি যে সে গাছ লাগাইয়া পথিকদের কিসে ছায়া হয়, এইমাত্র লক্ষ্য রাখেন। আর কেহ কেহ মনে করেন,মেহগিনি, টুন, সাল, সেগুন, শিশু, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠের বৃক্ষ লাগাইলে জেলার অধিক উপকার করা হইবে এবং এক্ষণে অনেক জেলার প্রশস্ত পথগুলির দুই পার্শ্বেই এই সকল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠের বৃক্ষ সকল রোপণ, সংরক্ষণ ও বিলি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী স্বতন্ত্র বিভাগই রহিয়াছে। অরণ্য বিভাগের সহায়তা ডিষ্ট্রীক্ট্ এঞ্জিনিয়ারগণের করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আবার কোন কোন এঞ্জিনিয়ার ভবিষ্যতে বিশেষ বিশেষ শিল্পের অনুষ্ঠানের সহায়তা হইবে বলিয়া বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ সকল রোপণ করেন। হরীতকি, ডিবি-ডিবি প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে

চাম্‌ড়া প্রস্তুত করিবার মস্‌লা প্রস্তুত হয়; পলাস গাছে সুন্দর লাক্ষা হয়; আসন, অর্জ্জুন প্রভৃতি গাছে উত্তম তসর জন্মে; বকম, লোধ, পাট্‌ সিঁদুরে, চেলি ইত্যাদি গাছ হইতে উত্তম রং প্রস্তুত হয়; এই সকল ভাবিয়া উক্ত বৃক্ষ সমুদায়ের রোপণ-দ্বারা জেলার ভাবী উপকার হইবে মনে করেন। যে যে স্থানে এই সকল বৃক্ষের ব্যবহার আছে,সেই সকল স্থানে বৃক্ষ বিশেষের সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকারি বন্দোবস্ত হওয়া বিহিত বটে, কিন্তু যে সে জেলায় এই সকল বৃক্ষ রোপণদ্বারা নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি আশা করা দুরাশা মাত্র। বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট্‌ এঞ্জিনিয়ারদিগের দুইটী মাত্র উদ্দেশ্য থাকা কর্ত্তব্য। সেই দুইটী উদ্দেশ্য এই:—(১) অসময়ে কিসে জেলার মনুষ্য ও ইতর জন্তু আহার পাইতে পারিবে; (২) কিসে জ্বালানি কাষ্ঠ সুপ্রাপ্য হইয়া গোময় সাররূপে ব্যবহার হইবে। কেবল দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বৃক্ষ রোপণের আয়োজন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। খাদ্যোৎপাদনকারী বৃক্ষ সকলের রোপণদ্বারা উভয় উদ্দেশ্যই যুগপৎ সিদ্ধ হইবে। কৃষিজাত শস্যের ন্যায় বৃক্ষজাত খাদ্য উপাদেয় বা পুষ্টিকর না হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভিক্ষকালে অনাহারে না মরিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তি অনায়াসে নিকৃষ্ট খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় কত সহস্র বিহার প্রদেশস্থ লোক মহুয়ার ফুল ও ফলের তৈল ব্যবহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল।

ডিষ্ট্রীক্ট্‌ এঞ্জিনিয়ারগণ রাস্তার ধারেই গাছ লাগাইতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে বা গ্রামের সন্নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রে বৃক্ষ লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে, জমীদারদিগের সাহায্য আবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তদ্দ্বারা জমিদারদিগের যে প্রজার প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এমত নহে। বস্তুতঃ এই বন্দোবস্তের একটী প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের জমীদারীর ও প্রজাদিগের উপর মমতা বৃদ্ধি করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ক্রমশঃ প্রজাদিগের দেয় খাজানা বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জমীদারদিগের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি হয় নাই, অথচ প্রজাদিগের উন্নতি আইন ভিন্ন প্রায় কিছুই সাধিত হয় নাই। বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে জমীদারদিগের প্রজার প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা আইন ভিন্ন সাধন করিয়া লইবার উপায় নাই। কার্য্যটী প্রজাদিগের দ্বারাই করাইয়া লইতে হইবে, অথচ সাক্ষাৎভাবে সকল প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ নাই বলিয়া জমীদারদিগের দ্বারা কর্ত্তব্য সাধন বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যেখানে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই জমীদার, সেখানে বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা লঙ্ঘন হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই প্রজাস্বত্ব কাড়িয়া লইতে পারেন, অথবা তহসিলদারকে জব্দ করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে গ্রাম সকলে জমীদারী বন্দোবস্ত আছে, সেখানে অন্য ব্যবস্থা আবশ্যক। কি খাসমহলের প্রজা, কি জমীদারী প্রজা, সকল প্রজাকেই বিঘাপ্রতি অন্ততঃ একটী করিয়া খাদ্যপ্রদ বৃক্ষ জন্মাইতে হইবে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে, দশ বৎসরের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ-ভয় দেশ হইতে বিদূরিত হইবে। কৃষকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যদি ১০০ হাত

অন্তর এক একটী করিয়া গাছ লাগায়, তাহা হইলে শস্যের ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারই হইবে। ক্ষেত্রে বৃক্ষ রোপণ দ্বারা নিম্নলিখিত কয়টী উপকার সাধিত হইবে।

(১) গ্রীষ্মাধিক্য কমিয়া গিয়া শীত গ্রীষ্মে ও দিবারাত্রিতে শীতোষ্ণতার তারতম্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইবে।

(২) মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত সরস থাকিবে।

(৩) দেশে বৃষ্টি অধিক হইবে।

(৪) গভীর ভূগর্ভ হইতে মূল ও কন্দদেশ বহিয়া সারবান পদার্থ সকল উঠিয়া, পত্র সমুদয়ে বিস্তৃত হইয়া, ক্রমে ভূমির উপরিভাগে আসিয়া মিলিত হইবে। বৃক্ষ জন্মাইয়া যেরূপ সহজে ভূমির উপরিভাগের স্তরকে সারবান করিতে পারা যায়, এরূপ অন্য কোন উপায়ে উহাকে সারবান করা যায় না। অর্থাৎ বৎসর বৎসর শস্য কর্ত্তন দ্বারা যেমন কিছু কিছু সার ভূমি হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তাহার পরিবর্ত্তে তেমনই স্বতঃই ভূগর্ভ হইতে সারবান পদার্থ সকল বৃক্ষ পত্র সহযোগে ভূতলে আসিয়া পড়িবে।

(৫) গাছ বড় হইয়া গেলে, অর্থাৎ রোপণের ৫ বৎসরের পরে, এক বৎসর অন্তর প্রত্যেক গাছের কিছু কিছু শাখা ছেদন করিয়া দিলে, গাছেরও উপকার হইবে কৃষকও গোময় সাররূপে ব্যবহার করিয়া ঐ সকল শাখা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৬) বৃক্ষ হইতে যে আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি কৃষকের পরিশ্রম বা আকাশের গতির উপর বিশেষ নির্ভর করে না। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা যখন সমস্ত শস্য নষ্ট হয়, তথনও খাদ্যপ্রদ বৃক্ষ হইতে খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৭) বৃক্ষ সকল ঝঞ্ঝাবাতের প্রবলবাত্যা রোধ করিয়া, অনিষ্টপাতের লাঘব করে।

(৮) বৃক্ষ দ্বারা মৃত্তিকার স্বভাব কালসহকারে পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ নিম্নস্থ শ্লথ মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত শ্লথ হয়।

(৯) বৃক্ষগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের স্থানে অন্য বৃক্ষ রোপণ করিয়া বৃহদাকারের বৃক্ষগুলি ক্রমশঃ বিক্রয় করিলে এককালে অনেক অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। বিশেষ দায় উপস্থিত হইলে কৃষকগণ মহাজনের নিকট অর্থ কর্জ্জ করিতে না গিয়া, অনায়াসে দুই চারিটী আম কাঁঠালের গাছ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

(১০) দেশময় বৃক্ষ থাকিলে, বায়ু সঞ্চালিত হইয়া মহামারি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতে পারে না।

খাদ্যপ্রদ বৃক্ষরোপণের উপকারিতা বুঝিলেই যে কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐ সকল বৃক্ষ রোপণ করিবে, এরূপ নহে। এ কারণ ব্যবস্থার আবশ্যক। আবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যবস্থা পালনের যদি সুবিধা করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৃক্ষরোপণ সুচারুরূপে হইবে না। গত তিন বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের কোন একটী খাস মহলের প্রজাগণ, জেলার প্রধান কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে আদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। প্রজারাও, "বীজ রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু গাছ মরিয়া গিয়াছে" এইরূপ ওজর করিয়া আসিতেছে। পথের

ধারে বৃক্ষ জন্মাইয়া জেলার এঞ্জিনিয়ার প্রজাদিগকে বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষা সম্বন্ধে আদর্শ দেখাইলেই কার্য্য সাধিত হইবে,এরূপও মনে হয় না। প্রত্যেক জেলাতেই কতকগুলি করিয়া 'রোড্‌সেস্ বাঙ্গলা' বা সরকারি ঘর আছে। এই সকল 'বাঙ্গলার' সমীপবর্ত্তী ভূমিতে চারা বাগান প্রস্তুত করিলে 'বাঙ্গলার' দ্বারবান অনায়াসে চারাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে। চারাগুলি ৫।৬ হাত উচ্চ হইলে 'বাঙ্গলার' রক্ষকের নিকট প্রজারা উহা ক্রয় করিয়া লইয়া বর্ষাকালে ভূমিতে লাগাইয়া যদি উহার স্কন্ধদেশ বংশখণ্ড দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে, তাহা হইলে বৃক্ষ জন্মান সম্বন্ধে তাহাদিগের অধিক উদ্বেগ পাইতে হয় না। বীজ বা কলম হইতে গাছ তৈয়ার করা প্রজাদের পক্ষে সুবিধা নহে। স্থানে স্থানে যে সকল চারা-বাগান থাকিবে, তাহাতে কেবল খাদ্যপ্রদ উত্তম উত্তম জাতীয় বৃক্ষের চারাই প্রস্তুত হইবে। কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ বৃক্ষের রোপণ বিধেয়, ঐ সকল বৃক্ষের কি কি বিশেষ'উপকারিতা, কিরূপে উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া সরল দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া প্রত্যেক 'বাঙ্গালায়' বিক্রয়ার্থ রাখা কর্ত্তব্য।

বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে প্রজাদিগের উৎসাহ অনেকটা জেলার এঞ্জিনিয়ারের উৎসাহ ও কার্য্যের প্রণালীর উপর নির্ভর করিবে। রাজপথ, রেল, নদী, খাল, যে পথেই লোকে যাত্রা করিবে,সেই পথেই খাদ্যপ্রদ বৃক্ষের বীথিকা তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে; এরূপ' অবস্থায় প্রজাদিগের মনে ঐ সকল বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে একটী প্রবল ধারণা হওয়া সম্ভব। এক এক জাতীয় বৃক্ষ ক্রমাগত এক এক ক্রোশ বা এক এক মাইল ধরিয়া থাকিলে অনেক সুবিধা আছে। প্রথম সুবিধা পুতিবার সময়, দ্বিতীয় সুবিধা রক্ষা করিবার সময়, তৃতীয় সুবিধা ফল, কাষ্ঠ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবার সময়।

স্থল ও জল পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ লাগাইতে গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয় হইবে না, কেন না, এই সকল পথের তত্ত্বাবধারণের জন্য লোক নিযুক্তই আছে। প্রজাদিগের জন্য চারা প্রস্তুত করিতে যে খরচ হইবে, তাহা চারার মূল্য হইতেই উঠিয়া যাইবে। প্রত্যেক গ্রামের নিকটে জমী লইয়া বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষা করিয়া এক একটী অরণ্য সংগঠন করিতে গবর্ণমেণ্টের বিপুল অর্থ ব্যয় হইবে। ডাক্তার ভলকার সাহেবের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, হয় ত একটী নূতন কর স্থাপন আবশ্যক হইবে। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সমস্ত কার্য্যে হস্তার্পণ না করিয়া অধিকাংশ কার্য্য প্রজাদিগের দ্বারাই করিয়া লইতে পারেন। সে যাহাহউক, এই অধ্যায়ে কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা গেল, তাহা এত বিশাল ও শ্রেষ্ঠ যে ব্যবস্থা ভিন্ন ইহা কার্য্যে পরিণত করা অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে কখনই হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তি কি উপায়ে শ্রেষ্ঠ জাতীয় আলু, বিলাতি শাক ও অন্যান্য শস্য, সুন্দর মাখন এবং নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রাপ্ত হইবেন, কি উপায়ে দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া ধন বৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে দেশে নানাজাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় স্থাপিত হইবে, এ সমস্ত ভাবিবার পূর্ব্বে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা স্থানীয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কি উপায়ে

সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হইবে, ইহার আয়োজন করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ—

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

পরিণাম-চিন্তা।

এই বিচিত্র প্রকৃতির এবং প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের পরিণাম কি? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, সকলই অবিনশ্বর,—অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির উন্নতি হইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে মানব দেহ মনের বিবর্ত্তনে সমূহ-উন্নতি ঘটিতেছে। দার্শনিকগণ মানবাত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, মানুষ ক্রমেই পূর্ণত্বের (Perfection) দিকে চলিয়াছে; অসভ্য মানুষ সুসভ্য হইতেছে,—ক্রমে সুসভ্য মানুষ সুদেবত্বে উন্নীত হইবে। এ সকল কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়ায় কোন ফল নাই, কেন না, বিজ্ঞান-প্রমুখ যুগের পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা জরা মরণের অধীন, শোক দুঃখে, পাপ তাপে মুহ্যমান, আমরা বড় কথা জানি না, বড় কথা বুঝি না। সরল চক্ষে দেখিতেছি, সবই যেন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, সবই যেন পতন ও ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে। আমার অস্তিত্বেই আমার নিকট জগতের এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন। আমিই যদি চলিলাম, আমার সমাজের লোক সবই যদি ডুবিতে চলিল, তবে সমষ্টির উপর পৃথিবীর আর কার কি উন্নতি সম্ভব কি অসম্ভব, সে সকল ভাবিয়া আমার প্রয়োজন কি? আমি যাহাকে প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব বলি, আমি যাহাকে মানবের মানবত্ব বলি, তাহা যেন পতন এবং মরণের পথেই চলিয়াছে। চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, ফুল নিঙড়াইয়া সুষমা, জল জমাইয়া শৈত্য, অগ্নি জ্বালিয়া উষ্ণতা, জল-অগ্নি মিলাইয়া যে বাষ্প পাওয়া যায়, তাহার মূলে কি? তাহার মূলে একই অবিনাশী কার্য্যকরী চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। সেই শক্তি, প্রত্যক্ষবাদ বা জড়বাদের তর্কে দিন দিন প্রচ্ছন্ন, কুজ্ঝটিকাবৃত হইতেছে না কি? এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এখন কেবল জড়ই স্বীকার করেন; আর এক শ্রেণীর লোক, জড় উড়াইয়া কেবল মায়াই স্বীকার করেন। শঙ্কর এবং বার্কলীর মায়াবাদ বা চৈতন্যবাদই ঠিক হউক, বা চার্ব্বাক ও মিল-হক্সলির প্রত্যক্ষবাদ বা জড়বাদই ঠিক হউক, বিচার চাই না, বিচার করি না; বলি কেবলি এই কথা, উভয় মতবাদের ভিতরেই যে সত্য লুকায়িত আছে, উভয় মতই যে আংশিক সত্য, এ কথা কোন পক্ষই কোন দিন মানিল না, কোনদিন উভয় দলের মিলন সংঘটিত হইল না। মানিল না যে, এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জড় এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্য সংমিশ্রিত। সুতরাং পূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ জ্ঞান কই মানুষ পাইল? চিরবৈপরিত্য ও চিরবৈষম্যময় প্রকৃতি পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইলেন কই? যিনি পূর্ণরূপে আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃতই হইলেন না, তাহার পরিণামই বা কে বলিতে সক্ষম? বিজ্ঞান বলেন, চন্দ্র সূর্য্য কালে নিবিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পরিণতিতে কি হইবে, কেহ কি বলিতে পারেন? কল্পনা এবং থিওরি (theory)-বিমিশ্রিত কথা ছাড়িয়া বিচার করিলে, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতির

পরিণাম বা পরিণতি সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এই প্রকৃতির বিবর্ত্তনে কি বিকৃতি ঘটিবে, কোন জড়বাদী বা কোন অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবাদী ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। উভয়ের যখন সম্মিলন হইবে, তখন বোধ করি, কতক সম্ভব হইতে পারে। এখন সে কথা আকাশকুসুমের ন্যায় কল্পনাময়।

প্রকৃতির পরিণাম যদি এইরূপ, মানবের পরিণাম তবে কি? মানব, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিরই ছায়া, সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, উহার পরিণামও ঐরূপ। সৃষ্টির মধ্যে, অতি পরিষ্কাররূপে, জড় ও চৈতন্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কেবল মানবে। মানুষে জড়ের লীলা আছে, চৈতন্যের খেলাও আছে। অথবা এখানে জড়-চৈতন্য মিশ্রিত আকারে পরি-শোভিত। এখানে চৈতন্যের কাজ, চির-ভৃত্যের ন্যায়, জড়দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন করিতেছে। মস্তিষ্ক হুকুম করে, হাত পা কাজ করে। অথবা মন ইচ্ছা করে, ইন্দ্রিয় সকল তাহা পালন করে। কাম ক্রোধ ষড়রিপুর অধীন মানুষ প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা অবনত ভাবে স্বীকার করিতেছে। এখানেই পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব। যেন। এখানে আসক্তি বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আলোক আঁধার, ইহকাল পরকাল সব যেন প্রতিভাত। মানুষ যদি সম্যক প্রকারে মানব-জ্ঞানে জ্ঞানী হইত, তবে, বুঝি বা, প্রকৃতির পরিণামসমস্যার সদুত্তর প্রদান করিতে পারিত। দুঃখের বিষয়, দেখিয়া শুনিয়াও মানুষ নিরেট বোকা, পড়িয়া ঘাটিয়াও মানুষ মহামূর্খ;—যেন কখন কিছু দেখে নাই, যেন কেহ কিছু শুনে নাই। কে না পরীক্ষায় দেখিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনায় শরীরের ক্ষতি হয়; কিন্তু কে তাহা হইতে বিরত থাকে? কে না শুনিয়াছে, অযথা রিপু-পরিচালনে মনুষ্যত্বের বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু কে তাহা মানিয়া চলে বা নিবৃত্তি সাধন করে? রিপুর সেবা, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে মানুষ সদা আত্মহারা; সেই জন্যই পরিণাম বুঝে না। আত্মজয়ী, মানব-জ্ঞানে জ্ঞানী, মনীষা-সম্পন্ন মহাত্মাগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারেন, মানুষের কে কোন্ পথে যাইয়া কোন্ কূলে পৌঁছিবে? আমরা ইন্দ্রিয়াধীন, রিপুর অধীন বারমাস আমরা জরা মরণ দেখিয়া বিকম্পিত, সশঙ্কিত, সংসার চিন্তায় বিজড়িত, তাই আমরা বলি, মৃত্যুই মানুষের পরিণাম। আত্মার অমরত্বে কাল্পনিক বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিলে, এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা মরণ ভিন্ন আর পরিণাম জানি না। যদি জানিতাম, এমনি করিয়া মনুষ্যত্বের পথে কাঁটা পুতিতাম না।

ভাল মন্দ যদি মানুষ বুঝিতে না পারিত, কোন কথা ছিল না। মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ, উভয় বুদ্ধিই বর্ত্তমান। দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত মানব অন্তরে চলিতেছে। বিবেক বা বিধাতার আদেশ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, এ দুই জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। দেখিতেছি; দেবাসুর সংগ্রামে এখন আসুর বুদ্ধিরই জয় হইতেছে। দেখিতেছি, মানুষ শ্রেয়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পথেই ধাবিত। বুঝে না কে? মদ খাইলে শরীর নষ্ট হয়, কে না জানে? ব্যভিচার করিলে শরীর ও মানসিকশক্তি

দুর্ব্বল হয়, নানা ব্যাধি আক্রমণ করে, কে না বুঝে? ধন ঐশ্বর্য্য, বিষয় বৈভব সকলই ক্ষণস্থায়ী, কে না জানে, অথচ জীব অহঙ্কারে কেন মত্ত হয়? দু'দিন যে সুখ সম্পদ,তাহার জন্য মানুষ আত্মহারা হইয়া গর্ব্বে অন্ধ হয় কেন? অন্যের মহত্ত্ব স্মরণে মানুষ মহত্ত্ব পায়, কে না জানে, অথচ নিজের সহস্র দোষ উপেক্ষা করিয়াও অন্যের দোষ আলোচনায় মানুষ কেন সদা ব্যাপৃত? কারণ আর কিছুই নহে,—কারণ এই, দেবাসুর সংগ্রামে অসুরেরই প্রতিনিয়ত জয় হইতেছে। ইহাই প্রত্যক্ষবাদের বিশেষত্ব। "ঋণ করিয়া ঘি খাও" মতের জয় হইলেই, মানুষ ভিতর ভুলিয়া বাহিরে মজে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের নানা হিত সাধনের সহিত এই এক মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে যে, বহুদর্শী, যোগ-নিরত ভারতঋষিগণের সন্তানদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে, সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে স্থূল জ্ঞানে, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ভক্তির রাজ্য হইতে, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ সম্ভোগে উপস্থিত করিতেছে। আগে ছিল সাধন ভজন, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা কাজ-কর্ম্ম-জগতে আমাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে! কেবল সাধন ভজন ভাল নহে, কেবল কাজ কর্ম্মও ভাল নহে। উভয়ের সংযোগ চাই। কিন্তু কোন দিনও কোন দেশে তাহা হইল না। কেহ সাধন ভজন করিয়া পৃথিবী খোয়াইল,পৃথিবীর শিক্ষা হারাইল; কেহ বা সুখ সুখ,কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম,স্বর্গ,পুণ্য,নীতি ভুলিয়া কেবল পাপের পথে চলিল! মানুষ বুঝিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মানুষ বুঝিয়াও, বিষকে সুধা বলিয়া ভক্ষণ করিয়া মরিল! এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, মরিতে হইবে জানিয়াও, মানুষ, তাহা ভুলিয়া, পাপে মজিতেছে। যেন মরণের পথ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই জানে না!!

জড়বিজ্ঞান মরণের কথা বলিতে পারে. মরণের পর পারের কথা ঠিক বলিতে পারে না। মানুষ মরিবে ঠিক, কিন্তু তারপর? এইখানেই কি শেষ? এই জ্ঞানের অতীত আর কোন জ্ঞান কি নাই? জড়বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। মানুষ সেই জন্যই আত্মহারা, এ জন্যই অনেকের কথা এই, জীবন পাইয়া সুখসম্ভোগ করিয়া মরি। মানুষ পতঙ্গ, আসক্তিপিপাসা আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। যে দিকে তাকাই, সবই যেন এই দশাগ্রস্ত। ক্ষণিক সুখের জন্য সকলে ব্যস্ত। উন্নতি বা পরিণাম চিন্তা নাই বলিলেই চলে। চার্ব্বাকের মতই ষোল আনা আধিপত্য করিতেছে। সর্ব্বনাশের আর বাকী কি? মানুষ যদি কেবল জড়দেহধারী হইত, শরীর ক্ষয়ে ব্যথিত হইতাম না। দেহের ভিতর যে চৈতন্যশক্তি, আত্মাই বল বা মনই বল, আছে; তাহার উৎকর্ষের জন্য আমরা কিছুই করিতেছি না তাহার উৎকর্ষ, তাহার অনুশীলন ভিন্ন জীবের উদ্ধার নাই। তাহার উৎকর্ষের জন্যই রিপু, ইন্দ্রিয়, শরীর; তাহার জন্যই সুজলা সুফলা প্রকৃতিময় এই বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মিক জগতে যাইবার আয়োজন এই জড়দেহে রহিয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত, উদাসীন। কাজেই আমরা মরণকে দেহের পরিণাম মনে করি। কাল্পনিক বিশ্বাসের বলে কেহ কেহ আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত আত্মজ বিশ্বাস নহে। সন্দেশ না খাইয়া, শুনা কথায় সন্দেশের স্বীকার করার ন্যায় ঐ স্বীকৃতি। উহাতে কোনই উপকার নাই। শুনা কথায়

যে জ্ঞান, তাহা প্রকৃত আত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান নহে। মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না পাইলে, প্রকৃত আত্মার অমরত্ব-বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না। আত্মিক শক্তির উৎকর্ষসাধন-হীনতাই এই অবিশ্বাসের মূল। এই অবিশ্বাস মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং মরণের অতীত জগতের কথা এখন কল্পনা-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। মানুষ, মৃত্যু উপস্থিত হইলে, এইজন্য হাহাকার করে, অস্থির হয়, আবার দুদিন পরে তাহা ভুলিয়া আনন্দোৎসবে যোগ দিয়া রিপু-সংগ্রামে মাতে। মানুষ দিন দিন এত অসার হইয়া যাইতেছে যে, আত্মিক জগতের কথা, চিন্ময় রাজ্যের কথা, এখন কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে। পুনর্জ্জন্ম সম্ভব কি না, পরকালে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকিবে, এ সব এখন মত-সঙ্কীর্ণতায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে; যাহা যাহার অন্ধ বিশ্বাস, তাহা কিছুতেই ছাড়ে না। নূতন কথা শুনিলেই ক্রোধ বা বিরক্তিতে আত্মহারা হয়। প্রকৃত জ্ঞান না থাকাই এরূপ হওয়ার কারণ। প্রকৃত চিন্ময় শক্তির জ্ঞান যতদিন উদয় না হইবে, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের কথা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিবে না। তত দিনই মানুষ, মৃত্যুকেই জীবনের শেষ মনে করিবে এবং মৃত্যুতে হাহাকার করিবে।

মনুষ্য যখন জড় ও চেতনের জ্ঞানে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে, তখন, জড়াতীত চৈতন্য এবং চৈতন্যাতীত জড়ের পরিণাম তাঁহার নিকট উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইবে; মরণের পর মানুষ কোথায় যাইবে, কি করিবে, তখন বুঝিবে। একবার বুঝিলে আর পৃথিবীকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে পাপে তাপে জড়িত হইয়া মরিবে না। কিন্তু সেই দিন কবে আসিবে, কে জানে?

আশ্বিনে কার্ত্তিকে।

আশ্বিনে- -অতুল।*

"যাবনা মা, যাব না";—
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতার ফুল,
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়ে আঁচল!
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা!
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গলে যায়,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূর দেশ তায়!
স্বপনে হারা'য়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস, আপনারে ভয়!

এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসা'য়ে আঁখি—নীল সুঁদি ফুল,
'যাবনা' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে "চল ঢাকা চল!"
ছুটি ফুরাইয়া গেছে আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল্ হবি করিলে কামাই।
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়,
গলিয়া নয়নপথে বের হ'তে চায়!

১

ভাদর—তেরশ সন—চারি দিকে জল,
বিশাল বরুণরাজ্য হাসিছে কেবল
বিকট তরঙ্গ ভঙ্গে, শুভ্র ফেণময়
ফুৎকারে উড়িছে থুথু—ভীষণ—বিস্ময়!

---

* বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগ্রামনিবাসী ৺ মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র। মৃত্যু ২৫ শে আশ্বিন—১৩০০।

নদী নদে শত জিহ্বা করিয়ে প্রসার,
গ্রাসিয়াছে সারা দেশ চিহ্ন নাহি আর!
অনন্ত অতলস্পর্শ অগাধ গহ্বর,
ব্যাদিত কেবল এক মহা দামোদর!

তৃতীয় প্রহর গত শরদের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা!
রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ড প্রায়,
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়!
কি বিশাল লম্ফ ঝম্প বিশাল গর্জ্জন,
বিকট ভ্রুকুটি ভঙ্গে করে আক্রমণ!
পড়ি তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে,
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে!

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়!
দুরাশা তথাপি তারে গাঁ'ট দিয়া দিয়া,
যতবার ছিঁড়ে যায় যোড়া দেয় গিয়া!
মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে,
এক ভুজ কাট যদি শত ভুজে ধরে!

ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল,
কূল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কূল!
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ!
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল!
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ!
মায়েপোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলীর কোল থেকে রবি অস্ত যায়!
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধুম,
মলিন করিয়া মা'র জাগরণ ঘুম!

২

শরতের শুক্লাষষ্ঠী,—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়ে সূতিকাগার—তমো সুগভীর
গগন অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির!
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়!
আনন্দ সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল!
উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ শেফালিকা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী স্নেহের আজ বিশ্ব-অধিবাস!

বাজে শংখ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল!
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দ সাগরে যেন ভাসিছে সবাই
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায়!
খেলিতেছে নববেশে বালক বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন!

৩

এক খানি গ্রাম ভাসে জলমগ্ন মাঠে,
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোটা সাগর ললাটে!
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয় স্থল!
জগত উজ্জ্বল যার রজত কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো নিবারণে!
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার!
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার খণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্!
জগত-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ!
ডাকিছে নিশার কাক সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল!

পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খালি!
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল! অতুল!'

৪

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ গহ্বর!
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবু ডুবু করে!
তৃতীয় প্রহর গত নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন!
তরু লতা ঘুম যায় ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহা শয্যাবৎ!
নিরাশার নিষ্পেষিত মহামরুভূমে,
কত বক্ষঅস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে!
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল!
দিক্‌বদ্ধ শ্যাম মাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটী মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া!
দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্যপানে চেয়ে একাকিনী.—
"আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন-উৎসব নীরব!
কোলে নিয়ে জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়াছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান!
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল-দেরি করে কি কারণ?"
অরুণের অগ্রজ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত স্বর্ণে পূরব আকাশ!
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে চায় কোলে নিতে গিয়া,
চীৎকারে 'অতুল মোর আসিতেছে অই!'
খুজিতে উড়িল কাক "ক-ই, ক ই, ক-ই?"
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি!
শেফালি ঝরিল আগে, তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল!
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী স্নেহের সেই বিজয়া দশমী!

কার্ত্তিকে—মণিকুন্তলা।*

সারদা! কোলে নেও,
এই যে যেতেছে মেয়ে তোমার নিকটে ধেয়ে,
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর,
পৃথিবীর ধূলা খেলা, দিয়েছিনু সারা বেলা,
ভুলিল না ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র বালিকার!
আদর যতন কত, করিয়াছি অবিরত,
ও যেন ভেবেছে উহা কত বোঝা ভার!
রাখিয়াছি কোলে কাখে, কারো কোলে নাহি থাকে,
কেবল আকুল কোলে যাইতে তোমার,
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর!

১

এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর,
জ্বলে মরে পিপাসায়, তথাপি কিছু না খায়,
পৃথিবীর কিছু ভাল লাগেনা উহার!
কেবল আথটু শুধু, খাইবে তোমার 'দুদু'
সারদা! এত কি মেয়ে চাতকী তোমার?
কত আছে ছেলে পিলে, ভোলে তারা যা তা দিলে,
একটী পেয়ারা পেলে আনন্দ অপার,

* ১৪ই কার্ত্তিক—১৩০০ সন।

সুরসাল নানা ফল, পবিত্র গঙ্গার জল,
কিছুতে ভোলেনি মন মণিকুন্তলার!
এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর!

২

এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার?
সরল চাঁদের হাসি, তরল জ্যোছনা রাশি,
দেখিলে ভোলে না আহা প্রাণ মন যার?
শ্যামল সায়াহ্ন কালে, আকাশের নীল চালে,
ফুটিলে ঝিঙ্গারফুল নব তারকার,
কোথায় এমন মেয়ে, আনন্দে দেখে না চেয়ে,
দেখিয়ে ভোলে না আহা প্রাণ মন যার,
এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার?

৩

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
ঊষার সিন্দুর ডিবা, প্রভাতে খুলিতে কিবা,
ছড়িয়ে পড়িয়ে গেলে সিন্দুর তাহার,
দিক্‌বালা হেসে ওঠে, হেসে কুবলয় ফোটে,
বদনে ফোটে না হাসি কোন্ বালিকার?
দিয়েছি মাথার কিরা, তথাপি চাহেনি ফিরা,
এমন দারুণ মেয়ে সারদা তোমার!
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর!

৪

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার,
বসন্তের ফুলবন, দেখিয়া ভোলেনি মন,
এমন মোহন রূপ কোথা আছে আর?
অধরে আতর হাসি, অন্তরে অমিয় রাশি,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে ফুল বালিকার!
বনের পতঙ্গ পোকা, নিরেট নির্ব্বোধ বোকা,
তারাও বাসিয়া ভাল চুমো খায় তার,
তারাও দেখিয়া হায়, শত মুখে গুণ গায়;—
স্থবর্ণ-সোহাগে সন্ধ্যা তোষে অনিবার,
কেবল ভোলে না মেয়ে সারদা তোমার!

৫

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
শীতল মলয়ানিলে, গায় হাত বুলাইলে,
পুলকে শিহরে নাহি তনু মন কার?
শ্যামা পাপিয়ার ডাকে, কার না থমকি থাকে,
ধমনীর আধা পথে রুধিরের ধার?
কার না আঁখির হায়, নিমেষ ভুলিয়া যায়,
অনন্ত জোনাকি দেখে অনন্ত বাহার?
এর চেয়ে কি খেলানা এনে দিব আর?

৬

এর চেয়ে কি খেলানা কোথা আছে আর?
নিদাঘের খর রবি, বরষার জল ছবি—
নীল নীরদের বুকে তড়িতের হার!
শরদে গরদ পরা, মনোহরা বসুন্ধরা
কাশ কুসুমের বনে—কাণে কর্ণিকার!
হেমন্ত রাজার মেয়ে, সুন্দরী সন্ধ্যার চেয়ে,
কোন্ পুতুলের গায় এত অলঙ্কার?
শীতের হরিণ যূথ, প্রকৃতির প্রিয় সুত,
প্রভাতে শ্যামল ঘাসে মুকুতা তুষার!
এর চেয়ে কি খেলানা কোথা পাব আর?

৭

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার!
কিছুতে ভোলে না মন, বৃথা যত্ন আকিঞ্চন,
একমাত্র তুমি আহা-সব যেন তার!
একটু বোঝে না হাবা, কত ভালবাসে বাবা
কত ভালবাসে মামা মামী অনিবার,
কত ভালবাসে 'টুকী', ছোট বোন্ সোণামুখী,
কত ভালবাসে দাদা স্নেহের আধার!
কত ভালবাসে দিদী, যারও নয়ননিধি,
যারও প্রাণের প্রাণ জীবন যাহার!
কি বিস্ময়! ভয়ঙ্কর! সকলেরে ভাবে পর,
একেবারে লেশ নাই স্নেহ মমতার;
মা-আদুরে হেন মেয়ে দেখি নাই আর!

৮

নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার!
সৃষ্টির আদিম সাম্য, পবিত্র মুহূর্ত্ত—ব্রাহ্ম,
অপবিত্র হয় নাই জাগরণে কার!

কুচিন্তার কুবাতাসে, পাপের প্রতপ্ত শ্বাসে,
জন্মেনি কলঙ্ক সেই শান্তি সুষমার!
উচ্ছিষ্ট করেনি কেহ, অভোগ্য এ কালদেহ,
শুভ্র শশধর ঢালে শুভ্র জ্যোতি তার!
গগন তারকাপূর্ণ, ঢালিছে কিরণ চূর্ণ,
খুলিয়া দিয়াছে যেন নীল রত্নাগার!
অমলিন অনাঘ্রাত, স্বর্গীয় শিশিরে স্নাত,
বহিছে মলয়ানিল সুরভি-সম্ভার!
শান্তিময় ঋষিভোগ্য, সুধাময় দেবযোগ্য,
পুণ্যময় মহাকাল মহা তপস্যার,
পূর্ব্বাচল কণ্ঠচ্ছেদি, ব্রহ্মরন্ধ্র নভ ভেদি
ফুটিছে অরুণ জ্যোতি মহা সহস্রার,
অব্যয় সচ্চিদানন্দ, অনন্ত অমৃত কন্দ,
স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক দ্বার!
তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে সারদা তোমার!
লও সে স্নেহের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরসুখে,
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর!
ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চির দগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগত সংসার!
নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২৲ দুই টাকা। কাঁদিতে কাঁদিতে মাইকেল জীবনব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে যোগীন্দ্রনাথ মাইকেলের জীবনচরিত্র সমাপন করিয়াছেন। মুরলীর কাতরধ্বনি আমাদের হৃদয়ে বাজিতেছে।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম পূর্ণ সমালোচন গ্রন্থ। বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত শকুন্তলাতত্ত্ব, এই প্রকারের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ,—কিন্তু সেখানি অসম্পূর্ণ। শুনিয়াছি, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শনাংশের এবং পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন শকুন্তলার কাব্যাংশের সমালোচনা করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কল্পনা কল্পনাই রহিয়া গিয়াছে। যোগীন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। ইহাতে মাইকেলের পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার লিখিত পত্রাদি, তাঁহার অপ্রকাশিত কবিতা সকল এবং তাহাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। যোগীন্দ্র নিজে ব্রহ্মচারী, তাঁহার মাইকেল স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু উভয়েই কবি। ধূর্জ্জটি মেঘনাদবধ-রচয়িতার ভাব-প্রবণতায় সমজাতীয়। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি মাইকেলের কলঙ্কময় বিষাদময় জীবনপট পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। একটী কথা গোপন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কঠোরতা চক্ষুজলে আর্দ্র হইয়াছে। তিনি নিজে কাঁদিয়াছেন, আমাদের কাঁদাইয়াছেন। নীরব নিশীথে শ্মশান বায়ুর হা হুতাশের ন্যায়, মাইকেলের চক্ষুজল-প্লাবিত বক্ষের কারুণ্যধ্বনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায়। আমরাও বলি—

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে।

যতদিন বঙ্গোপসাগরের প্লাবনে বঙ্গদেশ ভারতপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত না হইবে,

ততদিন বঙ্গভাষা নিত্য বিকসিত, নিত্য নূতন, নিত্য প্রফুল্লতায় সুশোভিত রহিবে, ততদিন মাইকেল মধুসূদনের নাম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ক্ষোদিত রহিবে। ততদিন মাইকেলের রচিত মধুচক্রে বঙ্গবাসী "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" ততদিন যোগীন্দ্রনাথের কাতর মুরলীধ্বনি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দুর্ভাগ্য কবির মধুমাখা নাম যমুনা-পুলিনে রাধা নামের ন্যায় ঘোষিত করিবে। সহস্র কুসুম হইতে মকরন্দ সঞ্চয় করিয়া মাইকেল মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—সহস্র কুসুম হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া যোগীন্দ্র মাইকেলের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষ, গৌরদাস বসাক,যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,সকলে মহাকবির জীবনবৃত্তের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বিচার বুদ্ধি, রচনা-কৌশল, হস্তের সুকুমারতা, বর্ণবিন্যাস যোগীন্দ্রের নিজস্ব। যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, চক্ষু ঝলসিত করে না, হৃদয় মুগ্ধ করে। মাইকেল ধন্য, যোগীন্দ্রের মত টীকাকার পাইয়াছেন,—বঙ্গবাসী ধন্য, এমন একজন সমালোচক বঙ্গদেশে জন্মিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়। যোগীন্দ্র অল্পবয়স্ক-ঋষির কঠোরতার সহিত কুমারীর কোমলতায় তাঁহার চরিত্র স্নিগ্ধ। ভবিষ্যতে কত ভাগ্যবান লোক তাঁহার হস্তে অমরত্ব লাভ করিবেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমালোচন গ্রন্থ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি।

যোগীন্দ্র মাইকেলকে তাঁহার বর্ণিত রাবণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। "মেঘনাদ বধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহবান পিতা ও নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। কাঞ্চনসৌধ-কিরিটিনী সাগর বেষ্টিতা লঙ্কা তাঁহার পুত্র, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। রাবণের ন্যায় কাহার বাহুতে তেমন অপরিমিত বল, ইষ্টদেবতাকে কে তেমন করিয়া ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিল। মহামায়া কাহার পুরে পুরাধিষ্ঠাত্রী, শূলপাণি কাহার দ্বারে দ্বারপালক? কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর, অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্য-গিরির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া আর কাহারও, বুঝি তাঁহার ন্যায় অধঃপতন হয় নাই। যে বিকসিত কুসুম তাহার হৃদয়াকাশ জ্যোতিম্ময় করিত, যে উজ্জ্বল তারাবলি তাহার হৃদয়াকাশ জ্যোতিম্ময় করিত, বিধিবশে নয় তাঁহার নিজদোষে সে কুসুম আকাশে বৃন্তচ্যুত, এবং সে তারকামালা অস্তমিত হইয়াছিল। পুত্র,পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, সুহৃদ, তাঁহার অসংযত বাসনা-রূপ অনলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন ; তিনি একা কেবল সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন। তাঁহার কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলিতেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সদৃশপুরী, অন্ধকারময় প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিষাদময়, কঙ্কালপূর্ণ পুরীতে রাবণ একা অতীতের মর্ম্মাভিঘাতিনী স্মৃতি লইয়া বাস করিতেন, পতিহীনা বিধবা, এবং পুত্রহীনা মাতার ক্রন্দন, সমুদ্র কল্লোলের অপেক্ষা গম্ভীরতর স্বরে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার পরিণাম বুঝাইয়া দিত; তিনি সমরকোলাহলে তাহা নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। এইরূপেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল।"

ভাবের গভীরতায় এ মহাচিত্র রাফেলের অনুপযুক্ত নহে। বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির কত প্রভূত বল, সুচিত্রকরের হস্তে এক একটী রেখাপাতে কি সুন্দর ছবি উদ্গত হয়!

মাইকেলের জীবন-নাটকের উষা কি সুন্দর শিশির-স্নাত, কণককিরণে আভাময়ী-সন্ধ্যা কি ঝটিকাময় বিদ্যুত-চমকিত বজ্রা-

হত, যোগীন্দ্রনাথ অতি কৌশলে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কপোতাক্ষীর শস্য-শ্যামল প্রান্তর হইতে ভার্সেলের রাজপ্রাসাদ, মেঘনাদের অনির্ম্মুক্ত বিষ-সর্পশিশুর দৃপ্ত তেজ হইতে ধূলিবিলুণ্ঠিত কৃপাপাত্র ধনদাসের আত্মবেদনা, ঋষিকন্যা শকুন্তলার সুশীল সরলতা ও বারাঙ্গনা উর্ব্বশীর রূপজ মোহের কুটীলতা, কবিসুলভ কোমল চিত্রাঙ্কনে বা দার্শনিক কঠোর সমালোচনে যোগীন্দ্রনাথ কোথায়ও অধীরতা, অসাধুতা বা অপ্রবীণতা প্রকাশ করেন নাই। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠ বৃহৎ গ্রন্থে অনুবীক্ষণ লইয়া আমরা কচিৎ ধূলিচিহ্ন সন্দেহ করিতে সমর্থ হই। মাইকেলের রহস্যপূর্ণজীবন এক এক অঙ্কে অভিনয় সময়ে—কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় অপেক্ষা পাঠককে চকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত ও যুগপৎমুগ্ধ করে। "সাংসারিক সুখ-সম্পদের জন্য মনুষ্য বিধাতার নিকট সাধারণতঃ যে সকল বিষয় কামনা করে, যাচ্ঞা ব্যতিরেকেই মাইকেল তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনক জননী, মধ্যবিত্তরূপ ঐশ্বর্য্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সরল উদার প্রাণ, অনন্যসাধারণ প্রতিভা, এই সকলের অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসার কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় বন্ধুবান্ধবদিগকে ভালবাসিতে পারিতেন কে? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিতে জানিতেন কয় জন? গুণবানের প্রতি সম্মান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারে উপেক্ষা, প্রভৃতি গুণে কয়জন তাহার সমকক্ষ ছিলেন? তিনি ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান, ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি ব্যারিষ্টার, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা সমূহে তিনি সুপণ্ডিত, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ, গুণ-পক্ষপাতী এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা, সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য। তাহার স্বদেশীয় ভাষা এবং স্বদেশবাসীগণ তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত।" লোকে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, তাঁহার বুঝি সকলি ছিল। তবে বিষপানে মাইকেল আত্মহত্যা কেন করিলেন—এ বিষম ভয়াবহ রহস্যে আমাদিগকে কণ্টকিত করে, আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া এ রহস্যের মীমাংসার জন্য একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি। কোন নাটক বা নভেল বুঝি আমাদিগকে এত সচকিত করিতে পারে নাই, বুঝি নিশ্বাস না ফেলিয়া আমরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছি। শেষে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস ও আপ্লুত নয়নে সমাধিস্তম্ভে একটী দীর্ঘ দৃষ্টিপাত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কিন্তু সকলের হতভাগ্য অমর কবিকে মহাপ্রস্থানে বিদায় দিয়াছি। সে মহাসাগর পারের কুয়াসা-পরিবৃত মহাশূন্যে যাইবার তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, প্রাণ দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল—ইচ্ছা অনিচ্ছা সকলি বিফল হইল,

> করি স্নান সিন্ধুনীরে বন্ধুগণ সবে
> ফিরিলা গৃহের পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে
> বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।

একাদশ খণ্ড—নবম সংখ্যা। পৌষ —১৩০০।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মনিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই পৌষ ১৩০০।

ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲] [এই সংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। পৌষ সংখ্যা নব্যভারত প্রকাশিত হইল। কোন অপরিহার্য্য কারণে মাঘ সংখ্যা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইলে, কিম্বা মাঘ ফাল্গুন একত্রে প্রকাশিত হইলে গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন।

২। অনেক সহৃদয় গ্রাহক আমাদের করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া, পূজার সময়, কিছু কিছু মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী। তাঁহারা দয়া করিয়া এখন কিছু কিছু মূল্য পাঠাইয়া উপকার করিলে একান্ত বাধিত হইব।

৩। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেন্ট হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। আমার স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া এবং টাকার পরিমাণ চেকের মুড়িতে লিখিয়া দিয়া গ্রাহকগণ টাকা দিবেন। বিনা রসিদে টাকা দিলে আমরা দায়ী হইব না। বাবু বনমালী ব্রহ্মদাস অন্য কাজে গিয়াছেন, তিনি এখন আর নব্যভারতের এজেন্ট নন্।

ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা।

আগামী ২রা মাঘ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ফরিদপুর মেলা-হলে সুহৃদ্ সভার নানা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। তত্ত্বাবধায়কগণ পারিতোষিক গ্রহণের বন্দোবস্ত করিবেন। সেখানে দ্রব্যাদি রাখার স্থান নাই। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (৬)

মনুষ্য ও গবাদি জন্তুর খাদ্য প্রধান প্রধান কতকগুলি ফল-বৃক্ষ বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে।

(১) আম্র।—এই বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। (ক) অন্ন কষ্টের সময় আম্র খাইয়া দরিদ্রলোকে অন্নের সুসার করে। (খ) আমের 'কসি' চূর্ণ করিয়া যে 'ছাতু' হয়, উহা ধৌত করিয়া উহার কষায়ত্ব দূর করিলে, উহা ময়দার ন্যায় ব্যবহার করা যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই ময়দা লোকে রুটী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর আমের আঁটি সংগ্রহ করিয়া যে বৎসর অন্নকষ্ট হইবে, সেই বৎসর উহা হইতে 'কসি' বাহির করিয়া ছাতু প্রস্তুত করিয়া, ঐ ছাতুর কষায়ত্ব দূর করিয়া, বাজারে অন্যান্য ছাতুর ন্যায় বিক্রীত হইলে একটা নূতন ব্যবসায় চলিতে পারে। (গ) বন্যা বা অন্য কোন কারণে তৃণাদি দুষ্প্রাপ্য হইলে গবাদি জন্তুকে আমের পাতা খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখা যায়। (ঘ) মহিষকে কেবল আমের পাতা খাওয়াইলে উহার শুষ্ক বিষ্ঠা হইতে হরিদ্রা বর্ণ প্রস্তুত করা যায়। (ঙ) ঝড়ে যে সকল অপক্ক আম্র ভূতলে পড়িয়া যায়, তদ্দ্বারা গৃহস্থের সম্বৎসরের জন্য আম্‌সি, কাসুন্দি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। (চ) আম কাঠ বড় মন্দ কাঠ নহে।

(২) কাঁঠাল।—(ক) এক একটা কাঁঠাল গাছ হইতে বৎসরে প্রায় অর্দ্ধমণ বীজ পাওয়া যায়। কাঁঠাল বীজ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। গৃহস্থ যে পরিমাণ কাঁঠাল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে, তাহার সেই পরিমাণ ধান্য ও গোধূমের অপ্রতুল হইলেও চলিতে পারে। (খ) কাঁঠালের অপক্ক ফল পাক করিলে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। (গ) পক্ক কাঁঠালের কোষ পরিপাক করা সুকঠিন, কিন্তু ইহার মিষ্টতা এত তীব্র যে, ইহা হইতে সহজে শর্করা বাহির করিবার উপায় হওয়া কর্ত্তব্য। আপাততঃ যে শর্করা ব্যবহার হয়, তাহা প্রায় ইক্ষু বা বিট্‌পালম্ হইতে উৎপন্ন। কৃষিজাত অন্যান্য শস্যের ন্যায় ইক্ষু ও বিট্‌পালম্ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা লাগা, প্রভৃতি নানা দোষে নষ্ট হইয়া থাকে। কাঁঠাল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষজাত ফল বা রস হইতে শর্করা প্রস্তুতের আয়োজন বিশেষ আবশ্যক। শর্করা এত উপাদেয় ও আবশ্যকীয় পদার্থ যে, কেবল কৃষিকার্য্যের উপর ইহার আমদানি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভর করা অন্যায়। (ঘ) পাকা কাঁঠালের যে যে ভাগ মানুষে খাইতে পারে না, গোরু সেই সেই ভাগ আগ্রহের সহিত আহার করে। (ঙ) কাঁঠাল পাতাও অসময়ে জন্তুদিগকে আহার করাইতে পারা যায়। (চ) আম কাঠ অপেক্ষা কাঁঠাল কাঠ শ্রেষ্ঠ। (ছ) কাঁঠাল কাষ্ঠের করাতের গুঁড়ি অথবা কাঁঠাল কাষ্ঠ বাকস গাছের সহিত একত্রে জলে সিদ্ধ করিলে সবুজ রং প্রস্তুত হয়।

(৩) রুটী ফলের গাছ (Artocarpus Incisis)। ইহা কাঁঠাল জাতীয় এক প্রকার গাছ। সিংহল দ্বীপে এই গাছ বড় আদরের সামগ্রী। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে এই গাছ রোপিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ফলও পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লবণাক্ত ভূমিতে

(অর্থাৎ, যেরূপ ভূমিতে নারিকেল অতি সুন্দর জন্মে) ইহা স্থানে স্থানে রোপিত করিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহা হইতে প্রচুর ফল পাওয়া যায় কি না। ইহার ফল বিলাতী রুটীর ন্যায় সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। সিংহল দ্বীপে যে পরিবারের ৫।৭টী রুটী ফলের গাছ আছে, তাহাদিগের কৃষিজাত সমস্ত শস্য বিনষ্ট হইলেও তাহারা অনাহারে মরে না।

(৪) বাদাম, বিশেষতঃ হিজ্‌লি-বাদাম (Anacardium Occidentale or Cashew-nut)। হিজ্‌লি বাদাম আম জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ। (ক) ইহার পক্ক ফল বড় একটা সুখাদ্য নহে, কিন্তু ফলের মধ্যে যে বৃহদাকারের বীজ হয়, তাহা অতি সুস্বাদু। এই বাদাম খাইতে, অতি সুন্দর বিলাতি বিস্কুটের ন্যায়। (খ) হিজ্‌লি-বাদামের তৈল বাদামের তৈলের ন্যায়, বিলাতি জলপাইয়ের তৈল (Olive oil) অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা প্রদেশে এই বৃক্ষের অত্যন্ত আদর। বাঙ্গালা দেশে এই বৃক্ষ সকল স্থানেই জন্মাইবার প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।—(গ) বীজের উপরিস্থিত আবরণ হইতে যে তৈল নির্গত হয়, ঐ তৈল কাষ্ঠে মাখাইয়া দিলে কাষ্ঠে উই লাগে না। গাবের আঠার ন্যায় ঐ তৈল নৌকা ও মৎস্য ধরা জালের রক্ষার জন্য ব্যবহার হয়।

(৫) মহুল বা মহুয়া। (ক) বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে শুষ্ক মহুল পুষ্প অন্নের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্ন দুষ্প্রাপ্য হইলে মহুল সিদ্ধ খাইয়াই সাঁওতালেরা দুই তিন মাস কালযাপন করে। এক একটী মহুল বৃক্ষতলে প্রতিবৎসর প্রায় ৩।৪ মণ ফুল কুড়াইয়া পাওয়া যায়। এই ফুল শুকাইয়া লইলে অনেকটা কিস্‌মিসের মত খাইতে ও দেখিতে হয়। এক একটী গাছ হইতে এইরূপ শুষ্ক ফুল এক বা দেড় মণ করিয়া পাওয়া যায়, এবং এই এক বা দেড় মণ মহুল এক বা দেড় মণ চাউল বা গোধূমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে অন্ন বা শাকের সহিত মহুল সিদ্ধ মিশাইয়া খাইতে নিতান্ত মন্দ লাগে না, এবং দুর্ভিক্ষ কালে দরিদ্র ব্যক্তি অনায়াসেই এই খাদ্য খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। (খ) মহুল ফল হইতে এক প্রকার শুভ্র ঘৃতের ন্যায় তৈল নির্গত হয়। এই তৈল সাঁওতালেরা পাকের জন্য গাত্রে মাখিবার জন্য ও জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করে। তৈল এত আবশ্যকীয় পদার্থ যে, একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর এই পদার্থের উদ্ভব বিষয়ে নির্ভর করা অবিবেচনার কার্য্য। ব্রহ্মদেশে কতকগুলি তৈলপ্রদ বৃক্ষের বিশেষ আদর আছে। এই সকল বৃক্ষের বাঙ্গালা নাম নাই, একারণ ইহাদিগের ল্যাটিন্ বা বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া গেল। ইহাদের নাম Calophylum lanceolaria, Calophylum longifolia, Calophylum inophyllum, Spondias mangifera, Connarus speciosa, Connarus nitida, Xanthoxylon badrunga, Buchanania augustifolia, Buchanania latifolia, gabdupha arborea. সাবান ও বাতি প্রস্তুতের জন্য মহুলের তৈলের যে পরীক্ষা বিলাতে হইয়াছে, তাহাতে ইহার মূল্য টাকায় দুই সের হওয়া উচিত, ইহা স্থির হইয়াছে। আপাততঃ সাঁওতালদিগের মধ্যে টাকায় ৮।৯ সেরের দরে মহুলের তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে। মহু-

লের তৈলের রপ্তানিতে সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা নাই। (গ) মহুল ফল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খৈল বাহির হয়, তাহা মনুষ্য ও গবাদি জন্তুর আহার্য্য। (ঘ) মহুল গাছের পাতা কেবল গবাদি জন্তুকে খাওয়ান যায়, এরূপ নহে। ইহা খাইয়া তসর পোকা সুন্দর কোয়া প্রস্তুত করে। (ঙ) মহুল ফুল হইতে যে মাদক দ্রব্য (Spirit) চোয়াইয়া প্রস্তুত হয়, তাহা ডাক্তারদিগের মতে ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, জিন্ প্রভৃতি বিলাতি স্পিরিট্ অপেক্ষা কম অনিষ্টকর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশ হইতে ফ্রান্সে প্রতি বৎসর প্রায় ৬লক্ষ টাকার মহুল রপ্তানি হইয়া উক্ত দেশে কৃত্রিম ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইত। (চ) শুষ্ক মহুল ফুল দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিসির খৈল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ খাদ্য। (ছ) মহুল কাষ্ঠ উত্তম কাষ্ঠ।

৬। কাল জাম।—জামের রস ও জামের আরক বলকারক ও পাচক বলিয়া এদেশে খ্যাত। বস্তুতঃ জামের রসে প্রায় পোর্ট্ ওয়াইনের কার্য্য করে ও জামের আরকে ভিনিগার্ বা সির্কার কার্য্য করে। জামের রস খাইলে মদ খাওয়া হয়, এরূপ ধারণা এ দেশে না থাকাতে এই বস্তুর ব্যবহারে কাহাকেও কখন মত্ত হইতে দেখা যায় নাই। ইউরোপ খণ্ডে অনেক স্থানেই লোকেরা দ্রাক্ষারস, নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহা পান করিয়া তাহারাও মত্ত হয় না। ফ্রান্স ও ইটালীতে সাধারণতঃ লোকে দূর পথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে রুটী ও দ্রাক্ষারস এই দুই সামগ্রী পাথেয় করিয়া বাহির হয়। বস্তুতঃ দ্রাক্ষারস ও জামের রস অতি সেবনেই অখাদ্য হইতে পারে। খাদ্যরূপে জামের রস ব্যবহারের পক্ষে এদেশে কিছুই আপত্তি হইতে পারে না, এবং ব্যবহারেও উপকার ভিন্ন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। জাম চট্‌কাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া পরদিবস প্রথমে কাপড় দ্বারা ও পরে ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া রস বোতলে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে রস বরাবরই সুমিষ্ট থাকিবে। বোতল মধ্যে মধ্যে খুলিয়া রৌদ্রে দিলে রস অম্ল হইয়া 'জামের আরক' প্রস্তুত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর, বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারির উপদ্রবকালে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ জামের আরক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জামের আরকের পরিবর্ত্তে কাগ্‌জি, পাতি বা কমলা লেবুও ব্যবহার করা যাইতে পারে। জামের আরকে এসিটিক্ এসিড্ আছে; লেবুতে সাইট্রিক্ এসিড্ আছে। এসিটিক এসিড্, সাইট্রিক্ এসিড্, কুইনাইন্, দারুচিনির তৈল, রাইসর্ষপের তৈল, এইরূপ কতিপয় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে উদ্ভিদাণুগুলি মরিয়া যায়। মাহামারি ও সংক্রামক রোগ সকল কতকগুলি উদ্ভিদাণু দ্বারা জন্মিয়া থাকে। এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাবকালে যে কয়েকটী পদার্থের কথা উল্লেখ করা গেল, উহাদের মধ্যে যেটী হউক, একটীর নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা ঐসকল পীড়ার আশঙ্কা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উক্ত কয়েকটী পদার্থের মধ্যে জামের আরক ও লেবু যেরূপ অনায়াসপ্রাপ্য ও সেব্য, সেরূপ আর কিছুই নাই। প্রত্যেক গৃহস্থের দুই চারিটী জামের ও লেবুর গাছ থাকা উচিত।

(৭) খর্জ্জুর, নারিকেল ও তাল বৃক্ষের উপকারিতা বিষয়ে সকলেই অবগত। এই সকল বৃক্ষের স্কন্ধের উপরিভাগ কোমল ও

খাদ্যের উপযুক্ত এবং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গাছগুলি কাটিয়া আহার্য্যভাগ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(৮) বাব্‌লা ও খয়ের গাছের পাতা ও ফল এবং বাঁশ-পাতা গবাদি জন্তুর সুন্দর আহার। বাব্‌লা, খয়ের ও বাঁশের অন্যান্য উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

(৯) বেল।—বেল অতি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য ফল। কাঁচা বেলের মোরব্বা অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন। উদরাময় পীড়ার সময় ইহার উপকারিতা কাহার বিদিত নাই? বিল্বপত্র অসময়ে ভগবতীর পাদপদ্মে প্রদান করিতে পারা যায়; কিন্তু কোন গাছেরই অধিক পত্র চয়ন বিধেয় নহে; তাহাতে গাছ অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয়। তৃণাদি দুষ্প্রাপ্য হইলেই বৃক্ষের পত্র জন্তুদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত। কাঁচাবেল ভাঙ্গিয়া, কাঁটানোটেশাক ও কলাইয়ের সহিত একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধবতী গাভীকে খাইতে দিলে তাহার দুগ্ধ দিবার শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

(১০) তরকারির জন্য ডুম্বুর ও পেঁপিয়া গাছ সকলেরই রাখা কর্ত্তব্য। এই দুই গাছে প্রায় বারমাসই ফল পাওয়া যায়। পাকা পেঁপে উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

(১১) লিচু, বিলাতি আম্‌ড়া, আতা, নোনা ও কলা, এই সকলের উপকারিতা প্রায় সকলেরই জানা আছে। নোনাগাছের ডালের ছাল হইতে উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়। রজ্জু যেরূপ আবশ্যকীয় পদার্থ, ইহারও সংগ্রহ বিষয়ে কেবল কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। পাট ও শন নষ্ট হইয়া গেলেও নারিকেল দড়ি, নোনাগাছের দড়ি, তুঁত গাছের দড়ি, এই সকলে গৃহস্থালী কার্য্য চলিয়া যাইতে পারে।

(১২) পঙ্গপাল সিম্ (Ceratonia Siliqua, Locust bean or Carob bean)।—ভূমধ্য সাগরের উত্তর ও পূর্ব্বভাগের দ্বীপ ও দেশ সমূহে এই গাছ প্রচুর জন্মে। এক একটী গাছে বৎসরে প্রায় দুইমণ করিয়া সিমের ন্যায় ফল হয়। এই ফল খাইতে বড় মিষ্ট। শতকরা প্রায় ৬০ বা ৬৫ ভাগ ইহাতে শর্করা আছে। ইউরোপের সকল দেশেই গবাদি জন্তুকে খাওয়াইবার জন্য পঙ্গপাল সিম ব্যবহার হয়। দুই সের খৈলে যে উপকার হয়, এক সের পঙ্গপাল সিমে জন্তুদিগের সেই উপকার হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগের লোকেরা পঙ্গপাল সিম আহার করে। কথিত আছে, জর্দ্দন নদীর তীরে যোহন সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতে করিতে বনমধুর সহিত যে পঙ্গপাল খাইতেন, তাহা বাস্তবিক কীট নহে, পঙ্গপাল অভিধেয় এই ফল। পুনা, লক্ষ্ণৌ ও হাজারিবাগ সহরে এই গাছ উত্তম জন্মিয়াছে। এদেশে যতদূর পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে নীরস ও প্রস্তরখণ্ডময় ভূভাগে জন্মিবার জন্য ইহা উপযুক্ত, এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(১৩) বড় তুঁত গাছ।—নিম্ন বাঙ্গালায় যে সকল জেলায় রেশম প্রস্তুত হয়, সেই সকল জেলায় যে জাতীয় তুঁত গাছের (Morus Indica) আবাদ আছে, তাহা অধিক বড় হয় না। সাহেবদের বাগানে যে তুঁত ফলের গাছ থাকে (Morus nigra) তাহা অপেক্ষাকৃত বড় বটে, কিন্তু উহার পাতা খাওয়াইয়া রেশম কীট পালনে, বিশেষ "ছোট পোলু" জাতীয় রেশম কীট

পালনে সুবিধা হয় না। বিলাতে যে জাতীয় তুঁত গাছের (Morus Alba) পাতা খাওয়াইয়া রেশম কীট পালিত হয়, তাহা দেশী তুঁত অপেক্ষা বড়ও হয় এবং উহার দ্বারা সকল প্রকার রেশম কীট পালন করা যায়। বিলাতী তুঁত অপেক্ষা চীন (Morus Cinensis) ও ফিলিপাইন পুঞ্জের তুঁত (Morus Philippinensis) আরও ভাল। কিন্তু সর্ব্ব প্রকার তুঁত গাছের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নভাগে এক প্রকার প্রকাণ্ড তুঁত গাছ (Morus Serrata) জন্মে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। (ক) ইহার ফল ছয় বা আট অঙ্গুলী দীর্ঘ, পাকিলে সবুজই থাকে, খাইতে মধুর। (খ) এই তুঁত গাছের নব পল্লব শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া যায়। (গ) ইহার ন্যায় বৃহদাকারের বৃক্ষ হিমালয় পর্ব্বতে প্রায় নাই। ইহা ৫০। ৬০ হাত উচ্চ হয় এবং ইহার কাষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠ। (ঘ) ইহার পত্র গবাদি জন্তুর সুন্দর আহার। (ঙ) এই জাতীয় তুঁত পাত খাওয়াইয়া সকল প্রকার রেশম কীট উত্তমরূপে পালন করা যায়। (চ) ইহা নিম্ন বাঙ্গালায় সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। (ছ) রেশম কীট পালন করিতে করিতে যে সকল শাখা পত্র সংগ্রহের জন্য ছেদন করা যাইবে, তদ্দ্বারা গৃহস্থের জ্বালানি কার্য্য চলিতে পারে। (জ) কীটের ভুক্তাবশিষ্ট পত্র ও কোমল পল্লব গবাদি জন্তু আগ্রহের সহিত আহার করে। (ঝ) রেশম কীটের বিষ্ঠার ন্যায় তেজস্কর সার প্রায় নাই। (ঞ) এই গাছের শাখার ছাল হইতে পাটের ন্যায় রজ্জু প্রস্তুতকারী সামগ্রী বাহির করা যায়।

উপরে যে কয়েকটী বৃক্ষের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে এই শেষোক্ত বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক বলিয়া বোধ হয়। ইহা বীজ হইতে অনায়াসে জন্মে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

"গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোসলপতি শ্রীহর্ষদেব"

ইনি কে ?

জুনাগড়ের নবাব সরকার হইতে প্রদত্ত ব্যয় দ্বারা নেপালের ক্ষোদিত লিপি সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার জন্য বোম্বের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার ভাউদাজি নিযুক্ত হন। কিন্তু মহাত্মা ভাউদাজী উল্লিখিত কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া পরলোক গমন করেন। তদনন্তর উক্ত কার্য্যভার তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রজীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ডাক্তার ভগবান লাল নেপাল গমন করত ২৩ খণ্ড শিলালিপি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বঙ্গীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে ঘৃণাবোধ করেন। কিন্তু বোম্বের এক জন প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সেই ঘৃণা পরিহার পূর্ব্বক গুজরাটী ভাষায় উল্লিখিত শিলালিপি সমূহের অনুবাদ স্বীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করেন। তদ্দর্শনে ডাক্তার ভুলার ইংরেজি অনুবাদের সহিত সেই সকল শিলালিপি প্রকাশ করিবার জন্য যত্নবান হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী" নামক সাময়িকপত্রিকায় ডাক্তার ভুলারের অনুবাদ

ইত্যাদি সহ শিলালিপির (ফটো-লিথোগ্রাফ) প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। তদনন্তর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। *

এই সকল শিলালিপির মধ্যে ১৫ নং শিলালিপি খানা বিশেষ উপাদেয়; অদ্য আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উক্ত শিলালিপি বিখ্যাত পশুপতি নাথের মন্দির হইতে সংগৃহীত। ইহা একখানি কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট প্রস্তরে ক্ষোদিত। ইহার অক্ষর গুপ্ত সম্রাটদিগের সমসাময়িক অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। ইহার তারিখ "সম্বত ১৫৩ কার্ত্তিক শুক্লনবম্যাম্।" ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রজী, ডাক্তার ভুলার, ও বিজ্ঞবর ফ্লিট সাহেব উক্ত সম্বতকে হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের প্রচলিত অব্দ নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। পণ্ডিতপ্রবর আলবেরুণীর মতানুসরণ পূর্ব্বক "বর্দ্ধন রাজগণ" প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন ৫২৯ শকাব্দে (৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন, সুতরাং (৫২৯+১৫৩=) ১৮২ শকাব্দে (৭৬০খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত শিলালিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল।

উক্ত শিলালিপিতে ৩৪টী শ্লোক আছে, তন্মধ্যে ৫টী শ্লোক মহারাজ জয়দেব স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। † অবশিষ্ট শ্লোকগুলি বুদ্ধকীর্ত্তি নায়ক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচনা।

উক্ত শিলালিপির কয়েকটী শ্লোকের মূলমর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম শ্লোক—ভগবান ত্রিপুরারীর মহিমা কীর্ত্তন।

দ্বিতীয় শ্লোক—মঙ্গলাচরণ।

তৃতীয় শ্লোক—ব্রহ্মার প্রপৌত্র সূর্য্য হইতে মনু, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু, তাঁহার পুত্র বিকুক্ষি, তৎপুত্র। তাঁহার পুত্র বিম্বগশ্ব।

চতুর্থ শ্লোক—তদনন্তর ২৮ জন রাজা গত হইলে সগর জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র অসমঞ্জ, তৎপুত্র অংশুমান, তৎপর দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন।

পঞ্চম শ্লোক—তদনন্তর যথাক্রমে ভগীরথ, রঘু, অজ এবং দশরথ আবির্ভূত হন। তৎপর ৮ জন রাজা গত হইলে লিচ্ছবি জন্মগ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ শ্লোক—সেই নরপতি হইতে "চন্দ্রকলা কলাপধবল গঙ্গাপ্রবাহ" সদৃশ লিচ্ছবি বংশের উৎপত্তি।

অস্ত্যেব ক্ষিতিমণ্ডলৈকতিলকো লোকপ্রতীতোমহানা—প্রভাব মহতাম্মান্যঃ সুরাণামপি। স্বচ্ছঃ লিচ্ছবিনাম বিভ্রদপরোবংশ প্রবৃত্তোদয়ঃ শ্রীমচ্চন্দ্রকলা কলাপধবলো গঙ্গাপ্রবাহোপমঃ॥ ৬॥ *

* Twenty Three Inscriptions from Nepal, collected at the expense of H. H. The Navab of Junagadh. Edited under the Patronage of the Government of Bombay, by Pandit Bhagavan Lal Indraji, Ph. D. &, together with some considerations on the chronology of Nepal. Translated from Gujarati By Dr. Buhler, C. I. E.

† শিলালিপি কিম্বা তাম্রফলকে নরপতিবর্গের স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করিবার প্রথা ভারতে বিরল নহে। আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট যে কবিকুলতিলক নরপতির কবিত্ব শক্তির প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, সেই কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা হর্ষদেব বা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য স্বীয় তাম্র শাসনে স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

* লিচ্ছবি বংশ যে ভারতে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ হইতে পারেনা। গুপ্ত সম্রাট

সপ্তম শ্লোক—লিচ্ছবির পর ** জন রাজা গত হইলে পুষ্পপুরনগরে সপুষ্প জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর ২৩ জন নরপতি গত হইলে জয়দেব আবির্ভূত হন।

অষ্টম শ্লোক—বিজয়ী জয়দেবের পর একাদশজন নরপতি গতায়ু হইলে পরমসৌগত বুধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

নবম শ্লোক—সেই নরপতি হইতে শঙ্কর দেব, শঙ্কর দেব হইতে ধর্ম্মদেবের উৎপত্তি। তদনন্তর তৎপুত্র মানদেব এবং তদন্তে তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন আরোহণ করেন।

দশম শ্লোক—সেই নরপতি হইতে বসন্তের ন্যায় মনোহর বসন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন।

একাদশ শ্লোক—তদনন্তর ত্রয়োদশজন নরপতি গত হইলে উদয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তদন্তে তৎপুত্র নরেন্দ্রদেব সিংহাসন আরোহণ করেন।

দ্বাদশ শ্লোক—সেই নরপতি হইতে শিবদেবের উৎপত্তি।

* ত্রয়োদশ শ্লোক—এই নরপতি মৌথরিবংশজ ভোগবর্ম্মার কন্যা (মগধাধিপতি গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের * দৌহিত্রী) বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

চতুর্দ্দশ শ্লোক—সেই বৎসদেবীর গর্ভে শিবদেবের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম জয়দেব।

পঞ্চদশ শ্লোক—যাহার মত্তমাতঙ্গ সমূহের মুষল সদৃশ দন্ত দ্বারা শত্রু নরপতিগণের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়াছে, সেই গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোসল ইত্যাদি রাজ্যের অধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কন্যা (যিনি ভগদত্ত রাজবংশজা এবং কুলোচিত গুণবিশিষ্টা ও লক্ষ্মী) সদৃশা, দেবী রাজ্যমতীকে (মহারাজ জয়দেব) বিবাহ করিয়াছিলেন।

মাদ্যদ্দন্তিসমূহ দন্তমুস ষ)ল ক্ষুণ্ণারিভূভৃচ্ছিরোগৌড়োড়াদি কলিঙ্গ কোসলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা। দেবীরাজ্যমতী কুলোচিত গুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈর্গেনোঢ়া ভগদত্তরাজ কুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষাভুজা।

ডাক্তার ভুলার কৃত অনুবাদ:—That King wedded, as if she were Fortune, qu-

দিগের ক্ষোদিত লিপি সমূহের যে কোনও স্থলে মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ হইয়াছে, সেই স্থানেই গৌরবের সহিত তাঁহাকে লিচ্ছবি বংশ দৌহিত্র" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

* মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত পুত্রস্য লিচ্ছবি দৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্ত"

প্রয়াগের লাট প্রস্তর লিপি, ২৮। ২৯ পংক্তি।
বিলসার শিলাস্তম্ভ লিপি, ৩। ৪ পংক্তি।
মথুরার শিলালিপি, ৬। ৭। ৮। ৯ পংক্তি।
বিহার শিলাস্তম্ভ লিপি, ১৮। ১৯ পংক্তি।
ভিটারি শিলাস্তম্ভ লিপি, ৩। ৪ পংক্তি।
কুমার গুপ্তের মুদ্রা ২। ৩ পংক্তি।

চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা মহাদেবী কুমার দেবীর নামের পার্শ্বে "লিচ্ছবয়ঃ" শব্দ ক্ষোদিত রহিয়াছে। অন্য কোন রাজার পিতৃ বংশের প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই।

* আদিত্য সেন সম্পাদক মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের ভ্রাতা হইতেন। আদিত্যসেনের পিতামহ এবং হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহী একপিতা মাতার সন্তান। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর আদিত্যসেন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক 'মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। আশিড় গড়, মান্দর পর্ব্বত এবং দেও বারণার্কের ক্ষোদিত লিপিতে তাঁহার মহিষীর নাম কোণা দেবী লিখিত রহিয়াছে। সাহাপুরের দেব মূর্ত্তিতে ক্ষোদিত লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ৬৭ হর্ষাব্দে আদিত্যসেন মগধে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া ছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তিনি ৫৯৬ শকাব্দে জীবিতছিলেন।

een Rajyamati, possesed of virtues Befitting her race, the noble descendant of Bhagadatta's royal line and daughter of Sriharshadeva, lord of Gouda, Odra, Kalinga, Kosala and other lands, who crushed the heads of hostile kings with the club-like tusks of his rutting elephants.

উক্ত শিলালিপির অবশিষ্টাংশের মর্ম্মালোচনা এই প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। নেপালাধিপতি জয়দেবের শ্বশুর, দেবী রাজ্যমতীর পিতা শ্রীহর্ষদেব কোন্ দেশের অধিপতি, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। এজন্যই বঙ্গীয় বিজ্ঞ পাঠকদিগকে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি, "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোসলপতি" এই যে শ্রীহর্ষদেব, ইনি কে?

ডাক্তার ভুলার সাহেবের মতে, ইনি কামরূপের অধিপতি। তিনি বলেন:—

"Bhagadatta and Sriharahadev probably belong to the dynasty of Pragjyotisha, to which Harshvardhana's contemporary Kamararaja also belonged."

আসামবুরুঞ্জি (আসামের ইতিহাস) পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শকাব্দ প্রচলিত হওয়ায় পূর্ব্বে ভগদত্তের বংশধরগণ কামরূপের রাজমুকুট হারাইয়াছিলেন। শকাব্দের প্রারম্ভে শূদ্রবংশীয়গণ কামরূপ শাসন করিতেছিলেন। শূদ্রবংশের তিরোধানান্তে ব্রাহ্মণবংশীয়গণ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক যে কুমাররাজের কথা ডাক্তার ভুলার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সেই ব্রাহ্মণবংশজ, চীন পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ স্পষ্টাক্ষরে ইহা লিখিয়াগিয়াছেন। আমরা "সিউকী" গ্রন্থ * হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"The present king belongs to the old line of Narayan-dev. He is of the Brahman caste. His name is Bhaskaravarman, his ltitle kumar."

শ্রীহর্ষদেব ক্ষত্রিয় নরপতি, তিনি ব্রাহ্মণ বংশজ হইলে কখনই তাহার কন্যা ক্ষত্রিয় নরপতি জয়দেবের হস্তে সমর্পণ করিতেন না। তৎকালে যে ভারতে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল না, হিয়োন সাঙ তাহা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহর্ষদেবকে কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মনের বংশধর বলা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ শ্রীহর্ষদেব যদি কামরূপের অধিপতি ছিলেন, তাহা হইলে শিলালিপিতে সেই কথা উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাকে গৌড়োড্রাদি রাজ্যের অধিপতি বলিবারই বা প্রয়োজন কি? ভগদত্তের বংশধর বলিলেই যে তাঁহাকে কামরূপপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন কারণ নাই। এই সকল হেতু দ্বারা আমরা ডাক্তার ভুলারের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

শিলালিপি দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, শ্রীহর্ষদেব বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল। তিনি গৌড়ের রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়া উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন, কিম্বা তিনি উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন, গৌড় তাহার বিজীত রাজ্যমাত্র; এই তর্কেরও একটি মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে ভারতীয় নরপতিমণ্ডলি মধ্যে আমরা হর্ষনামক অনেকগুলি ভূপতির দর্শন পাইয়াছি। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিপতি হর্ষ, যাঁহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সম্বত-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য অবধারণ করিয়াছেন, তিনি, এবং কান্যকুব্জপতি হর্ষ (হর্ষবর্দ্ধন) এবং মালব-

* Beal's Si-yu-ki. Vol. II. P. 196.

রাজ হর্ষ (ইনি মুঞ্জের পিতা, উদয়পুর প্রশস্তি ও নবসাহসাঙ্কচরিতে ইঁহার বর্ণনা আছে) এবং চন্দেলবংশীয় কলিঞ্জর বা মহোবাপতি বিখ্যাত বিজয়ীবীর হর্ষ এবং কাশ্মীরপতি "অশেষ দেশভাষাজ্ঞ সর্ব্বভাষাসু সৎকবি" হর্ষই বিশেষরূপে খ্যাত। বাঙ্গালা কিম্বা উড়িষ্যায় হর্ষনামক কোন নরপতি যে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি না।

পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট কয়েকটি রাজবংশের একখানি তালিকা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে, ইহাদ্বারা গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ কোসলপতি শ্রীহর্ষদেবের সময় নির্ণয় অতি সহজ হইবে।

শ্রীহর্ষদেবকে সাধারণত নেপালাধিপতি জয়দেবের পিতা শিবদেবের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে, তিনি ৭২৫—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী (কিম্বা তাহার ৮।১০ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ) সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। পালরাজগণ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সম্ভবত ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে) পালবংশের স্থাপনকর্ত্তা গোপাল দেব গৌড়দেশের রাজপাট সংস্থাপন করেন। সুতরাং ইহার ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহর্ষদেব জীবিত ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের প্রায় সার্দ্ধৈকশতাব্দী অন্তে এবং মহারাজ গোপালের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোসলপতি" যে শ্রীহর্ষদেব বর্ত্তমান ছিলেন, ইনি কে?

১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের নব্যভারতে "সাময়িক সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, কারণ তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, বঙ্গদেশে ২। ১ জন মৌলিক পুরাতত্ত্ববিৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশেষত প্রবন্ধলেখক স্বয়ংও কলাপের ভাষ্যকারের ন্যায় কুশাগ্রবৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত, ভরসা করি, উল্লিখিত অসাধারণ পণ্ডিত এবং মৌলিক পুরাতত্ত্ববিৎ মহাশয়গণ অবশ্যই অনুগ্রহপূর্ব্বক মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের সন্দেহ নিবারণপূর্ব্বক "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোসলপতি শ্রীহর্ষদেব" কে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মহানদী।

মহানদী-সন্নিকটে গ্রাম কুলসাই।
বসিয়া তাহার কোন হর্ম্ম্য-বাতায়নে,—
সম্মুখে সুশ্রেণীবদ্ধ সুপারির সারি;—
দেখিলাম, উত্তরেতে বিস্তৃত প্রান্তর
মিশিয়াছে নীলাকাশে দূর-চক্রবালে।
গগন-নীলিমা জিনি গাঢ়তর নীল
জলদাভ গিরিশ্রেণী, তরঙ্গিত শির,
বেষ্টিয়া সে মালভূমি দৃষ্টি অবরোধি;—
ধরণীর শীর্ষে ইন্দ্র-নীলের মুকুট।
ভূধর-নিবদ্ধ এই বিস্তারের মাঝে
নানা জাতি বৃক্ষ, চারু-বিষমে ছড়ানো
কোথাও বা ছত্রাকার নারিকেল-তরু,
কিম্বা জটাজুটধারী প্রাংশু তাল গাছ,—
ধ্যানমগ্ন শীর্ণ-তনু দীর্ঘ-কলেবর
যেন যোগী পঞ্চতপে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
সু-উচ্চ চিন্তায় ভেদি উচ্চ নভস্তল।
পত্র-সুবহুল কোথা ছোট ছোট গাছ
রচিয়াছে কুঞ্জ,—বুঝি বন-নারী তরে।
সুবিশাল বটবৃক্ষ, হরিত গৌরবে,
গ্রাসিয়ে প্রভাত-ভানু বিস্তীর্ণ ছায়ায়,
অটল দাপটে রাজে,—বিরাট দানব,
দশ দশানন তুল্য, শত দীর্ঘ করে
উৎপাটিতে চায় যেন কঠিন ধরণী,
আর শত ঊর্দ্ধ করে তর্জ্জিছে আকাশ।
পত্র-বিরহিত কোথা তরুর কঙ্কাল,
বিশুষ্ক, বিদগ্ধ-প্রায়, কঠোর-আকৃতি,
জীর্ণ শীর্ণ বাঁকা ভুজ গগনের দিকে,
স্পর্শি পরস্পরে বাঁকা শীর্ণ করাঙ্গুলি
রহিয়াছে নির্দ্দেশিয়া ধরণীর পানে;
কাল-সহচরী কোন স্থবিরা ডাকিনী,
নিরাশা সঞ্চারি হৃদে, বলিতেছে যেন,—
"ঊর্দ্ধে উঠিবারে চাস্, গর্ব্বিত মানব!—

দেখ চেয়ে, শেষ তোর পৃথিবীর মাটি !"
সুদূর ভূধরে মিশি চক্রবাল-সীমে,
ঢালিয়া নীলিমা' পরে হরিতের আভা,
রাজিতেছে একাকারে তরুবর-রাজি,
অনুমান অনুমেয়, দূরতা কারণে ;
ইন্দ্র-নীল-বিনির্ম্মিত সে কিরীট তলে
বোধ হয় হরিতের স্নিগ্ধ পত্রলেখা।
সবার উপরে ঢাকা তরল কুজ্ঝটি,—
কঠোর সত্যের প'রে মোহ-আবরণ।
অদূরেতে মহানদী, বিশাল-প্রসার।
পড়িয়া রয়েছে তনু অসরল স্তরে,
একাধিক কাছাকাছি তীক্ষ্ণতর বাঁকে ;
প্রকাণ্ড কুণ্ডলীকৃত হরিদ্রাভ যেন
শ্বেত অজগর সুপ্ত গভীর নিদ্রায়।
শূন্যগর্ভ পূর্ণ এবে বালুকা-রাশিতে।
নিষ্প্রভ রবির করে বালু-ঝিকিমিকি
ধাঁধে না আঁধারি আঁখি এবে তা দেখিলে।
দেখিনু চাহিয়া মাঝে। এই কি সে নদী,
গৌরব দিয়াছে যাঁরে 'মহানদী' নাম ?
ক্রোশ-ব্যবহিত উচ্চতটযুগমাঝে
কোথা দৃপ্ত বরুণের ক্রীড়া-বিলসন ?
ধূ ধূ করিতেছে, শুষ্ক মরুভূমি প্রায়,
বারির আবাসভূমি,—কোন্ ব্রহ্মশাপে ?
বালু-স্তূপ-শ্রেণী তায়, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ,
ধরিত্রীর কলেবর তরঙ্গিত যেন,
শীর্ণ বক্ষে পঞ্জর বা যেমন প্রকাশে ;
ক্ষুদ্র এক গর্ত্তে কোথা কলঙ্কিত জল,
মৃত্যুর কুঞ্চন যেন তরঙ্গে তাহার ;
কোথাও বা অর্দ্ধ-সিক্ত মৃৎ-পিণ্ড-রাশি ;
অঙ্গুষ্ঠেতে পরিমেয় জীর্ণ জলধারা
বহিতেছে কোনখানে, প্রায় অলক্ষিতে,
ছিন্ন ভিন্ন নাড়ী যথা মুমূর্ষু-শিরায় ;—
মনে হয়, বুঝি কোন দুর্দ্দান্ত দানব,
পঞ্চত্ব লভিয়ে ঘোর বাসব-আহবে,
পশিয়াছে প্রেতলোকে, ফেলে গিয়ে হেথা
প্রকাণ্ড পঞ্জর, ভীম বিরাট গঠন।
জীর্ণ অস্থি তার, শ্বেত-হরিদ্রা বরণ,
দেখিতেছে অন্ধভাবে সুনীল আকাশে।
কোন খানে অস্থি হ'তে খসেনি এখনো
অর্দ্ধ-শুষ্ক মাংস-পিণ্ড, বিভৎস দর্শন,—
ছাড়িতে চাহেনা তারে, এতাবৎ কাল
যার সঙ্গে করেছিল একত্রেতে বাস ;
কোনখানে ঝরিতেছে কালিমা-ধারায়
শোণিতের অপভ্রংশ, ব্যতিক্রম লভি।
মরণের ছায়া যেন রয়েছে এখনো
অলক্ষিতে নভোমাঝে সে শবের প'রে,—
অতৃপ্ত রাক্ষস ক্ষুধা, আছে যতক্ষণ
বিন্দুমাত্র রক্ত, কিম্বা পিশিত-কবল।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, তীব্র ঝিল্লি নাদে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে প্রকাণ্ড মণ্ডলে,
বাসনা, আস্বাদ করে শোণিত, আমিষ;
কিন্তু এসে ফিরে যায় আতঙ্কে, তরাসে,
তীব্রতর ঝিল্লীরবে সে শব হইতে।
অবসন্ন হয় চিত্ত সে চিত্র দেখিলে,—
করুণা উপজে হৃদে ত্রাস-বিজড়িত।
এই কি সে মহানদী,—বিশাল কঙ্কাল ?
হের চিত্র অন্যরূপ শ্রাবণ আঁধারে।
ক্রোশ-ব্যবহিত উচ্চ তটযুগ প্লাবি,
একাকার বারি-রাশি, যোজন জুড়িয়া,
উদ্দাম উর্ম্মিতে নাচি, খরতর স্রোতে,
চলিয়াছে আস্ফালিয়া বেলা অবহেলি।
বরষা আবিল বর্ণ, হরিদ্রা-পাংশুল ;
স্মরণের প্রতিবিম্ব মুছে ফেলি তায়,
ছুটিয়াছে মত্ত-ক্রোধে, নির্ম্মম হৃদয়ে,
উৎক্ষেপি ওষ্ঠের প্রান্তে অর্দ্ধ-শুভ্র ফেনা।।
এ ত নহে কালিন্দীর সুমন্দ কল্লোল;
বিরহ গাহিত যাহে শ্যামের বাঁশরী;—
আলোড়ি জীমূত-গর্জ্জে ঘন বায়ুস্বর,

পশে কর্ণে প্রকৃতির আর্ত্তনাদ প্রায়।
সান্ধ্য কালিমায় মাখি দিবসের মুখ,
ঢালি গাঢ়তর মসী নিশির শরীরে,
নাচিছে উলঙ্গ মৃত্যু ক্ষিপ্ত বক্ষদেশে;
যোজন জুড়িয়া তার পড়িয়াছে ছায়া;
যোজন জুড়িয়া এক তরল শ্মশান;—
প্রতিহিংসা-রোষে যেন চায় জানাইতে
চরাচরে, জীবগণে, সে বিষের স্বাদ,
যাহে ছিল এত দিন আপনি মূর্চ্ছিত।
কি কুহক-বলে কিম্বা নিয়তি-আজ্ঞায়,
এ ক্ষিপ্ত জীবন পশি শবের কঙ্কালে
দিতেছে মরণ ঢালি স্পর্শিছে যাহাকে,
শিশু, বৃদ্ধ, বনিতায়, না করি বিচার,
না করি বিচার কিম্বা জীবজন্তুগণে,
মুছি প্রকৃতির মুখে হরিত সুষমা?
ভাবিলাম মনে বুঝি,—এই সেই নদী,
আতঙ্ক দিয়াছে যারে 'মহানদী' নাম।
ব্যবহার হেরি তার, ভাবিলাম মনে,
এ ধরায় এমনি বা ইন্দ্রিয়-সংযম।
কঠোর তপস্যা কিম্বা তন্ত্রের সহায়ে,
অনিদ্রায়, অনশনে, ইচ্ছাশক্তি বলে,
দলি তনু, করি তায় অস্থি-পরিণত,
শুকায়ে প্রবল বেগ শোণিত-প্রবাহ,
নির্ম্মমে বাসনাচয় করি নিষ্পেষিত,
ভাবি সাধিলাম বুঝি রিপুর সংহার।
বৃথা আশা!—কোন এক মুহূর্ত্তে মঘরে,
কিম্বা ঘোর-বিঘ্নপ্রসূ শনির দৃষ্টিতে,
পণ্ড চিরজীবনের যত পরিশ্রম।
জানি না কেমনে,—কিন্তু, হেরি মুহূর্ত্তেকে,
ভাঙিল সংযম-বেলা দুরন্ত আঘাতে;
টুটে, তৃণবৎ, লৌহ-ইচ্ছার শৃঙ্খল;
লভিয়া মরণ হতে বিকৃত জনম,
মাতিল বাসনা-প্রেত শ্মশান-হুঙ্কারে;
ছুটিল দিগন্ত মথি চরিতার্থ করি
সংরুদ্ধ বিকৃত ক্ষুধা বীভৎস প্রকারে,
দলি লজ্জা, দলি ক্ষোভ, দলি নিন্দা, ঘৃণা,
না ডরি অবশ্যম্ভাবী নিকট মরণে;
নরকের উত্তেজনা শুধু মত্ত-হৃদে!
ছড়ায় মরণ, ব্যাধি,—শরীরে, আত্মায়;
যথা ওই মহানদী শ্রাবণ-আঁধারে!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

অনাত্মবাদের অযৌক্তিকতা। (২)

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব শতকণ্ঠে আমাদের ব্যক্তিগত একত্ব ও তৎসঙ্গে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। সাত বৎসর বা চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যে ঋণ করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমি বাধ্য কেন? আমার সমুদয় দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে দেহের ফলস্বরূপ চৈতন্যও অবশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কারণ চলিয়া গেলে কার্য্য কেমন করিয়া থাকিবে? সুতরাং পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে ঋণ করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমি বাধ্য কেন? যে ঋণ করিয়াছিল, সে তো এখন নাই? সাত বৎসর বা চৌদ্দবৎসর বা আটাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বিবাহ করিয়াছি, সে স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে আমি বাধ্য কেন? তাহার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য আমি দায়ী কেন? দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ফল বা ক্রিয়াস্বরূপ চৈতন্যও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াগিয়াছে। ব্যক্তিগত একত্ব যখন নাই, তখন দায়িত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

সাত বৎসর বা ততোধিক সময় পূর্ব্বে আমার যে সন্তান হইয়াছে, তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব কেমন করিয়া থাকিতে পারে? ব্যক্তিগত একত্ব চলিয়া গেলে পিতামাতার সঙ্গে যে গাঢ় নৈতিক সম্বন্ধ, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, স্বজন, শিক্ষক, ছাত্র, উপকারী, উপকৃত প্রভৃতির মধ্যে যে নৈতিক বন্ধন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। উহার আর কোন অর্থ থাকে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের পরিবর্ত্তন, এবং চৈতন্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বের বিনাশ। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিগত, মৌলিক, অখণ্ডনীয় জ্ঞান উহার অসারত্ব প্রদর্শন করিতেছে। চিরদিনই সেই এক আমি। দৈহিক পরমাণুর পরিবর্ত্তন ও মানসিক অবস্থা সকলের পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক আমি বা আত্মা চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান।

মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রমাণ করিতেছে যে, আত্মা ও দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ। জড়জগৎ নিজে কর্ত্তা নহে। প্রাকৃতিক শক্তি বা ঐশীশক্তি জড়জগতে কার্য্য করিতেছে। যদি জড়পিণ্ডের ন্যায় মনুষ্য প্রাকৃতিক শক্তির সম্পূর্ণ অধীন হয়, তাহা হইলে মনুষ্য নিজে কিছুই করে না। যাহা কিছু মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়,—পাপ পুণ্য,ভাল মন্দ, যাহা কিছু কার্য্য,—তাহা বাস্তবিক মনুষ্যের কার্য্য নহে, প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য। মানুষ কিছুই করে না, সকলই প্রাকৃতিক শক্তি বা ঐশীশক্তি করিতেছে।

সকলই যদি প্রাকৃতিক শক্তি বা ঐশীশক্তির কার্য্য হয়, তাহা হইলে পাপ পুণ্য থাকে না। সকলই যখন ঈশ্বর করিতেছেন, তখন মানুষের পাপ, পুণ্য, মানুষের অপরাধ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? কিন্তু মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব শক্তি নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও কর্ত্তৃত্ব, মানবের মধ্যে এই কয়েকটি দেখিতেছি। যেমন মানবের জ্ঞান, ভাব ও বাসনা অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। আমি জানি, ইহা যেমন সত্য; আমি করি, কার্য্য করি, ইহাও সেইরূপ সুনিশ্চিত সত্য।

আমি করি এবং আমি স্বাধীনভাবে করি, এ দুই এক কথা। যদি আমার স্বাধীনতা কিছুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে আমি করি, এই বাক্যের কোন অর্থই থাকে না। যদি আমার নিজের শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে, আমি করিতেছি বা আমি করি। কিন্তু যদি আমি অন্য শক্তির সম্পূর্ণ অধীন হই, তাহা হইলে যাহা আমার কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা সেই শক্তির কার্য্য। বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নিজে কর্ত্তা নহে। প্রাকৃতিক শক্তি ঐ সকলের মধ্যদিয়া কার্য্য করিতেছে। যদি জড়পিণ্ডের ন্যায় মনুষ্য প্রাকৃতিক শক্তির সম্পূর্ণ অধীন হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বাস্তবিক মনুষ্যের কার্য্য নহে; প্রকৃতিক শক্তির কার্য্য। মনুষ্য নিজে কিছুই করে না। প্রাকৃতিক শক্তি সকলই করিতেছে। আমি লিখিতেছি, হস্তস্থিত লেখনী লিখিতেছে না। লেখনী আমার হস্তের যন্ত্র মাত্র। সেইরূপ যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে মানুষ কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির হস্তের যন্ত্রমাত্র।

তাহা হইলে আমি করিয়াছি, করিতেছি বা করিব, এরূপ সকল কথাই ভ্রমমূলক। প্রাকৃতিক শক্তিই সকল করিতেছে। আমার স্বাধীনতা বা কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, আমি করি এরূপ বাক্য নিতান্ত অযুক্ত। সুতরাং আমি করি এবং আমি স্বাধীনভাবে করি, এ দুই এক কথা।

এই মত সত্য হইলে পাপ পুণ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু পাপ পুণ্য বোধ মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানব প্রকৃতি হইতে উহা কখনই নিষ্কাসিত হইবার নহে। পাপ-পুণ্য-বোধ ও কর্ত্তৃত্ববোধ, মানব হৃদয়ে চিরদিন বর্ত্তমান। কর্ত্তৃত্ববোধ না থাকিলে পাপ-পুণ্যবোধ থাকিতে পারে না। আবার পাপ-পুণ্য-বোধের উজ্জ্বল আলোকে কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রকাশিত হয়।

এই স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তৃত্ববোধ স্বীকার করিতেই হইবে। যে ব্যক্তি মুখে অস্বীকার করে, সে কার্য্যে স্বীকার করে।

এই কর্ত্তৃত্ব, এই স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিল? সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক নিয়মাধীন বদ্ধ জড় হইতে এই স্বাধীনতা কেমন করিয়া আসিবে? কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কেমন করিয়া আসিবে? চৈতন্য যদি জড় মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বও থাকিত না। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকা সম্ভব নহে।

আমরা অন্তরে ও বাহিরে কর্ত্তৃত্বশক্তির যত চালনা করি, আন্তরিক ও বাহিক বাধা বিঘ্নের সঙ্গে যত যুদ্ধ করি, ততই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমি স্বতন্ত্র জীব। আমি জড়ের ক্রিয়া নহি। যখন মানুষ কাম ক্রোধাদি পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে, দরিদ্রতা রোগ শোকাদির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার জন্য প্রাণগত যত্ন করে, তখন সে আপনার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা সমুজ্জ্বলভাবে অনুভব করে। সে তখন কোন ক্রমেই মনে করিতে পারে না যে, সে জড়ীয় শক্তির হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। আমাদের কর্ত্তৃত্বশক্তি সম্পূর্ণরূপে অনাত্মবাদ খণ্ডন করিতেছে।

আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে অনন্ত প্রকাশিত। সুতরাং তাহা পরিমিত জড়ের ক্রিয়া হইতে পারে না। আমাদের দেশ ও কালের জ্ঞানে অনন্ত প্রকাশিত।

পরিমিত দেশখণ্ড ভাবুন। উহার সীমার ওপারে দেশ নাই, ইহা কেহ ভাবিতে পারে না। আরও আছে, আরও আছে, অন্ত নাই!! যত উচ্চ আকাশে মনকে প্রেরণ কর না কেন, তাহার পরেও আকাশ! অন্ত নাই!! বাল্যকালে মনে করিতাম বাঁশের উপর বাঁশ, তাহার উপর বাঁশ এইরূপ ক্রমাগত বাঁশের উপর বাঁশ লাগাইলে শেষে উহা আকাশে গিয়া ঠক্ করিয়া ঠেকিবে। ইহা বালকের অমূলক চিন্তা মাত্র। বাস্তবিক কেহ মনে করিতে পারে না যে, পরিমিত দেশ খণ্ডের ওপারে আর দেশ নাই। তোমার মনকে বামে, দক্ষিণে, অধঃ উর্দ্ধে যে দিকে কেন, প্রেরণ কর না, সে আকাশের সীমা খুঁজিয়া পাইবে না;—অনন্তে আত্মহারা হইয়া যাইবে।

সেইরূপ কালের জ্ঞানেও অনন্ত। কাল আছে, ঘটনা নাই; ঘটনা আছে, কাল নাই, এই দুইই অসম্ভব। কাল আছে, কিন্তু কিছু ঘটিতেছে না; ঘটনা ঘটিতেছে, অথচ কালে নয়, ইহা অসম্ভব। সুতরাং বর্ত্তমান কাল বলিলেই বর্ত্তমান ঘটনা বুঝায়। বর্ত্ত-

মান ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে; কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বেও কাল আছে। সুতরাং ঘটনা আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপে কালের শেষ, এবং সর্ব্বপ্রথম ঘটনার নাগাল পাইবেন না। জ্ঞান, অনাদি কাল ও অনাদি ঘটনার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে।

যেমন ভূতকাল সম্বন্ধে, সেইরূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বর্ত্তমান ঘটনার পরে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে; সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পরেও অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পরেও অবশ্য কাল আছে। সুতরাং ঘটনা আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপে কালের শেষ এবং সর্ব্বশেষ ঘটনার নাগাল পাইবেন না। জ্ঞান অনন্ত কাল ও অনন্ত ঘটনার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে।

কেবল তাহাই নহে। জ্ঞান, অনাদি অনন্ত দেশ ও কালের সৃষ্টি কর্ত্তা। একটি দেশখণ্ড মনে কর। তাহার অবশ্য অংশ আছে। তাহাকে যতই ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করনা কেন, তাহার অংশ থাকিবে। খণ্ড খণ্ড কর; তথাচ অংশ থাকিবে। খণ্ড করার শেষ হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক দেশ খণ্ড অনন্ত অংশের সংযোগ।

আবার যত বৃহৎ দেশখণ্ডকে মনে করনা কেন, উহার সহিত আরও দেশখণ্ডের যোগ। আকাশের পর আকাশ, তাহার পর আকাশ, তাহার পর আকাশ সীমা পাইবে না। অনন্ত! অনন্ত!! অনন্ত!!! দেশ কেবল অনন্তের যোগ।

যেমন দেশ সম্বন্ধে, সেইরূপ কাল সম্বন্ধেও। কাল কেবল পূর্ব্ব ও পরের সম্বন্ধ বা যোগ। কালের পর কাল, ঘটনার পর ঘটনা। কাল, কেবল এইরূপ অনাদি ও অনন্ত সংযোগ। এখন দেখ, এই সংযোগকারী কে? সংযোগকারী জ্ঞান। সংযোগ ভিন্ন দেশ ও কাল সম্ভব নহে। সুতরাং জ্ঞান, দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে। জ্ঞান কেবল আপনার মধ্যে অনাদি অনন্ত দেশ কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এমন নহে। জ্ঞান, অনাদি অনন্ত দেশ কালের রচয়িতা।

এখন দেখ, আমাদের মধ্যে, যে জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সামান্য বস্তু নহে! উহা কেবল আপনার মধ্যে অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এমন নহে; জ্ঞান, অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে সৃষ্টি করিতেছে! অনন্ত আমাদের অন্তরে!

কয়েক অঙ্গুলি পরিমিত মস্তিষ্করূপ ক্ষুদ্র জড়খণ্ড হইতে এই অনন্ত বস্তু উৎপন্ন হইল? মুষ্টি-মেয় মস্তিষ্ক হইতে অনাদি অনন্তের জ্ঞান (Eternal consciousness) আসিল?

কার্য্য কারণের নিয়ম বলিয়া দিতেছে, উহা অসম্ভব। পরিমিত হইতে পরিমিতই আসিবে। অনন্ত আসিতে পারে না। যে জ্ঞান অনাদি অনন্ত দেশ কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যে জ্ঞান অনাদি অনন্ত দেশ কালের রচয়িতা, তাহা আমাদের অন্তরে। অনন্ত স্বরূপ স্বয়ং আমাদের অন্তরে আপনার আভাষ প্রকাশ করিতেছেন!

এতক্ষণ জড়ের স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকার করিয়া লইয়া অনাত্মবাদের অযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াআসিলাম। কিন্তু অনাত্মবাদের অসারতা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে, জড় কি, জড়ের স্বরূপ কি, বুঝিতে হয়।

জড় কি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহা ভিন্ন বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে আমরা কি জানি? বহির্জগৎ কি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কি? ঐ সকল আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র। দর্শনেন্দ্রিয়ের বোধ, রসনেন্দ্রিয়ের বোধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বোধ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বোধ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বোধ,ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই বোধ, ইন্দ্রিয়বোধ, মনের ধর্ম্ম। সুতরাং জড় মনের ধর্ম্ম *।

তবে, বল হে তার্কিক! জড় হইতে মন, না, মন হইতে জড়? জড় আগে, না, মন আগে? জড় আছে, কেমন করিয়া জানিতে পারি? মন বা চেতনা বলিয়া দেয়, জড় আছে। তাহার পর দেখিতেছি যে, রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র। তবে, হে জড়বাদি! দেখ জড় হইতে মন, না,মন হইতে জড়?

সম্মুখে যে বৃক্ষ দেখিতেছি, উহা ইন্দ্রিয় বোধ মাত্র। সুতরাং উহা আমার মনের অবস্থা। তবে ইন্দ্রিয়বোধ ভিন্ন আর কিছু কি নাই? রূপ, রস ইত্যাদির আধার কি? রূপ, রস ইত্যাদি যখন ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়বোধের আধার মন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে মন ভিন্ন কি আর কিছু নাই?

* জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব তাহার তর্কশাস্ত্র (Logic) এবং স্যার উইলিয়ম হামিলটনের দর্শনশাস্ত্রের সমালোচনা গ্রন্থে (Examination of Sir William Hamilton's Philosophy) জড় সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, জড় আর কিছুই নহে, উহা ইন্দ্রিয়বোধের স্থায়ী সম্ভাবনা। (Permanent possibilities of sensation)

আছে বই কি? সম্মুখে যে বৃক্ষ দেখিতেছি, উহা ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র। কিন্তু ঐ বৃক্ষের উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে। সুতরাং অন্য এক শক্তি ঐ বৃক্ষের উৎপত্তি স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ। উহাই ত ব্রহ্ম-শক্তি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই এই কথা। ব্রহ্ম-শক্তি আমাদের জ্ঞানের উপরে ক্রিয়া করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রকাশ করিতেছেন। তবে জড় কোথায়?

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। একবার পরেশনাথ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চস্থানে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্করোড উহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুপ্রশস্ত ট্রঙ্ক্রোডকে একটি ফিতার ন্যায় দেখাইতেছে। এস্থলে আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে, ট্রঙ্করোড কি ফিতার ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া গেল? পর্ব্বত হইতে নামিয়া যত রাস্তার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই উহা ক্রমে ক্রমে বড় দেখাইবে, এবং রাস্তা হইতে যত দূরে যাইবে, ততই উহা সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকিবে। এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। একটা বড় পদার্থের নিকট হইতে যত আমরা দূরে গমন করি, ততই উহা ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। আবার যত দূর হইতে উহার নিকটে আসিতে থাকি, ততই উহা ক্রমে বৃহত্তর দেখায়।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই কি বড় হয়? আর কি ছোট হয়? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই, যাহা দ্রষ্টব্য,—যাহা দেখিতেছি, তাহাই বড় হয় ও ছোট হয়। প্রত্যক্ষ ইহাই বলিয়া-

দিতেছে। তবে কি গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্করোড বাস্তবিক ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে ও বড় হইতেছে? রাস্তার উপরে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা ত উহার সমভাবই দেখিতেছে। তবে কি ছোট হয়? আর বড় হয় কি? যাহা দেখিতেছি, তাহাই ছোট হইতেছে ও বড় হইতেছে, ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে কি বলিবে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখে যাহা প্রকাশিত হইতেছে,—যাহা ছোট হইতেছে ও বড় হইতেছে, উহা প্রকৃত বস্তু নহে। যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত বস্তু নহে। উহা ভিন্ন দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত প্রকৃত বস্তু আছে; তাহা ছোট হয় না, বড়ও হয় না।

এস্থলে কি ইহাই বলিবে যে, ঐযে গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্ক রোড দেখিতেছি, উহা প্রকৃত বস্তু নহে? উহা ভিন্ন আর এক ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্য গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্ক রোড আছে? সেরূপ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? কিছুই প্রমাণ নাই। সেরূপ অনুমান বা কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। যাহা দেখিতেছি,—যাহা দেখিবার স্থানানুসারে ক্রমে ছোট হয় ও বড় হয়, তাহাই জানি, তাহাই প্রত্যক্ষ। সুতরাং তাহার যে জ্ঞান বা মননিরপেক্ষ স্বাধীন-সত্ত্বা আছে, ইহা হইতে পারে না। বহির্জগতের সকল পদার্থ,—সমগ্র বহির্জগতের জ্ঞানাধীন সত্ত্বা। স্বাধীন সত্ত্বা নাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন, জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি, তাঁহাদের মতের অসারতা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। লোকে যাহাকে জড় বলে, উহা জ্ঞানেরই একটি অবস্থা মাত্র। দার্শনিক বিচারে এই নিঃসংশয় মীমাংসায় আমরা উপনীত হই।

এই বিষয়টি অন্য এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখা যাউক। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইত্যাদির লক্ষণা কি? রূপ কি? যাহা দর্শন জ্ঞানের বিষয়। রস কি? যাহা আস্বাদ জ্ঞানের বিষয়। গন্ধ কি? যাহা আঘ্রাণ জ্ঞানের বিষয়। স্পর্শ কি? যাহা স্পর্শেন্দ্রিয় বা স্পর্শজ্ঞানের বিষয়। শব্দ কি? যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় বা শ্রবণজ্ঞানের বিষয়। এস্থলে দেখুন, জ্ঞান হইতে বিষয় অবিচ্ছিন্ন। জ্ঞান আছে, অথচ তাহার বিষয় নাই, ইহা অসম্ভব। জ্ঞান ও তাহার বিষয় অচ্ছেদ্যরূপে একত্রে স্থিতি করে। জ্ঞান ও তাহার বিষয়, একই পদার্থের দুইটি দিক্‌ মাত্র।

আবার দেখুন। রূপ কি? যাহা দর্শন জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং যাহা দর্শনজ্ঞানের অবিষয়, তাহা রূপ নহে। রস কি? যাহা আস্বাদজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং যাহা আস্বাদ জ্ঞানের অবিষয়, তাহা রস নহে। গন্ধ কি? যাহা আঘ্রাণজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং যাহা আঘ্রাণ জ্ঞানের অবিষয়, তাহা গন্ধ নহে। শব্দ ও স্পর্শ বিষয়েও সেইরূপ। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির অথবা এক কথায় জড়ের জ্ঞানাধীন সত্তা। তবে দেখুন, জ্ঞান বা চৈতন্য জড়ের ক্রিয়া নহে। জড় জ্ঞানেরই অবস্থা মাত্র।

অনেকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা জড়বাদ বা অনাত্ম-বাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এই অনাত্মবাদ, কেবল কি একটি দার্শনিক তত্ত্ব? এসম্বন্ধে কি কোন সাধন নাই? সাধন এই যে, দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। এমন সাধন কর যে, যেন তোমার আত্মা, দেহ ও মানসিক অবস্থা সকলের উপর কর্ত্তা হয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অস্থায়ী দেহ ও

অস্থায়ী মানসিক অবস্থা সকলকে শাসনে রাখ।

প্রাচীন মহর্ষি কঠোপনিষদ এ বিষয়ে কেমন সুন্দর উপদেশ দিতেছেন;—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমের তু॥

আত্মাকে রথ, শরীরকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, এবং মনকে রাসরজ্জু (লাগাম) বলিয়া জান।

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানহুবির্ষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, এবং রূপ রসাদি বিষয় সমূহকে তাহাদের সম্বন্ধে পথ বলে। ইন্দ্রিয় মনযুক্ত আত্মাকে মনীষীরা ভোক্তা বলেন।

যস্ত্বাবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ান্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথে।

যে সর্ব্বদা অসমাহিত মন ও অবিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির দুষ্টাশ্বের স্থায় অবশীভূত হয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

যে সর্ব্বদা সমাহিত মন ও বিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির সৎ অশ্বের ন্যায় বশীভূত। ইত্যাদি

স্যার উইলিয়ম্ হ্যামিলটন, প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থ (Plato's Dialogue) হইতে দেহাত্মবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি স্থানের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা-পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ সক্রেটিস্ ও তাঁহার শিষ্য আলসি-বাইডিসের মধ্যে কথোপকথন বলিয়া লিখিত। উহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেখুন। দেখুন, কেমন সুন্দর!

"সক্রেটিস। স্থির হও। তুমি এখন কাহার সহিত কথা কহিতেছ? আমার সঙ্গে কি নহে?

আলসিবাইডিস। হাঁ।

স। আমিও তোমার সহিত কথা কহিতেছি?

আ। হাঁ।

স। তবে সক্রেটিস কথা কহিতেছে?

আ। নিঃসংসয়।

স। আর আলসিবাইডিস শ্রবণ করিতেছেন?

আ। হাঁ।

স। সক্রেটিস কি বাক্যের দ্বারা কথা কহিতে-ছেন না?

আ। তা বইকি? উহা ত সত্যই।

স। কথোপকথন করা আর বাক্য ব্যবহার করা তবে একই?

আ। একই।

স। যিনি ব্যবহার করেন, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, এই দুই কি স্বতন্ত্র নহে?

আ। তাহার অর্থ কি?

স। চর্ম্মকার কি তাহার অস্ত্র ও আর আর যন্ত্র ব্যবহার করে না?

আ। হাঁ।

স। আর যে যন্ত্র ব্যবহার করে, সে কি সেই যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে?

আ। নিশ্চয়ই।

স। সেইরূপ বীণার সহিত বীণাবাদক কি পৃথক নহে?

আ। নিঃসংশয়।

স। আমি তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যিনি ব্যবহার করেন, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা কি স্বতন্ত্র নহে?

আ। হাঁ স্বতন্ত্র।

স। কিন্তু সেই চর্ম্মকার কি কেবল যন্ত্রের দ্বারাই চর্ম্ম ছেদন করে, না, তাহার হস্ত দ্বারাও ছেদন করে?

আ। হস্তদ্বারাও ছেদন করে।

স। তবে সে তাহার হস্ত ব্যবহার করে?

আ। হাঁ।

স। আর কার্য্য করিবার সময় সে চক্ষুরও ব্যব-হার করিয়া থাকে।

আ। হাঁ।

স। যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, ঐ দুই যে স্বতন্ত্র তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করিয়াছি।

আ। হাঁ।

স। সেই হেতু চর্ম্মকার ও বীণাবাদক যাহার দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই হস্ত ও চক্ষু হইতে পৃথক্ নহে?

আ। এইরূপ বোধ হইতেছে।

স। মনুষ্য কি তাহার সমুদয় শরীর ব্যবহার করে না?

আ। তাহার আর সংশয় নাই।

স। যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, এই দুই যে স্বতন্ত্র, তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করিয়াছি।

স। তবে মনুষ্য তাহার শরীর হইতে পৃথক্?

আ। আমার এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে।

স। মনুষ্য তবে কি?

আ। আমি তাহা বলিতে পারি না।

স। যে শরীরকে ব্যবহার করে, সেও যে মনুষ্য তাহা অবশ্য বলিতে পার?

আ। সত্য।

স। তবে মন ব্যতীত আর কি কিছু শরীরকে ব্যবহার করে?

আ। আর কিছু নহে।

(এ স্থলে মন ও আত্মা একার্থবোধক। ইত্যাদি)

স। মনই তবে মনুষ্য?

আ। একমাত্র মনই মনুষ্য।

দেহাত্ম বুদ্ধি বিনাশ কর। এই হাত পা, নাক, মুখ, এই অস্থি, মাংস, স্নায়ু, এই কাফ কাশপূর্ণ দেহ কি আমি? বেদান্তে দেহাত্মবুদ্ধিকেই সংসার বলিয়াছেন। আত্মাকে জান। আত্মাকে না জানিলে পরমাত্মাকে জানা যায় না। আত্মাকে না জানিলে পরিত্রাণ নাই। ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি আত্মাকে জানার উপর সকলই নির্ভর করে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ। * (২)

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

যখন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ পাঠকারীর সংখ্যা স্ত্রী ও পুরুষ দুই শ্রেণীতে বাড়িতে লাগিল, তখন কেবল স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত পুস্তকে তাহাদের অধ্যয়ন-প্রবৃত্তি

* স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যাহা টোঁকাটুঁকী ছিল, তাহা নব্যভারতে প্রকাশ করিয়া আমি ইতিহাস-লেখকদিগের নিকট খালাস হইতে চাই। গত বৎসর ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমার বাল্যকালের ও তৎপূর্ব্বের ঘটনা। তখনকার ঘটনা ভাল করিয়া লিখিতে না পারিলে এই ইতিহাস-লিখন-প্রথা-রহিত দেশে আমার মার্জ্জনা হইতে পারে। অতঃপর যাহা লিখিব, তাহা আমার জীবন কালের ঘটনা। আমি যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছি, সে সময়ের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ কেন বলিতে না পারিব, তাহার দোষ কোন কৈফিয়তে কাটিবে না। এজন্ত মনে হইয়াছিল, কাগজ পত্র দেখিয়া ইদানীন্তন বিবরণ ভাল করিয়া লিখিব। তন্নিমিত্ত কয়েক মাস বিরাম লইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে নানা প্রকার চর্চ্চা ও আন্দোলন চলিতেছে। অনেকে প্রাচীন হিন্দুদের পক্ষপাতী হইয়া বলেন, সে কালের মত স্ত্রীশিক্ষা রহিত করাই আবশ্যক। এ বিষয়ের সমালোচনা এখন করিব না। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমিই প্রাচীন হিন্দুদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা রহিত করিতে চাহেন, তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিবেন, যেহেতু আমার কন্যাশ্রেণীর (ভ্রাতুষ্পুত্রী পুত্রবধূ প্রভৃতির) মধ্যে কেহই লেখাপড়া জানেন না। বলা বাহুল্য যে, ইদানীন্তন শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের দোষাবলী দর্শন করিয়াই আমি তাঁহাদিগকে এই নূতন আলোকে আনিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এখন খেদ হয়, যদি তাঁহাদের মূর্খতা দূর করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবকাশ কালে, বিশেষতঃ রাত্রি কালে, তাঁহাদিগকে দিয়া বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করাইয়া ও লেখাইয়া জ্ঞান ধর্ম্মের অনুশীলনে উন্নতি লাভ করিতাম। সম্প্রতি রোগ ও জরা নিবন্ধন দিনে দিনে চক্ষুর দৃষ্টি ও মনের স্মৃতি খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ সম্বন্ধে অধিক অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। যাহা টোঁকাটুঁকি ছিল, তাহাই প্রকাশ করিতে অগত্যা বাধ্য হইলাম।

পরিতৃপ্ত হয় না। এজন্য ১৮৫১ খ্রীঃঅব্দে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে Vernacular Literature Committee নামক সভা স্থাপন হয়। ভাল ভাল ইংরাজী গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। কেহ কোন উত্তম পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিলে এই সভা সেই পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করিয়া লইতেন এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ানুরূপ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। এই সভার আদেশে অনুবাদিত লর্ড ক্লাইবের বিবরণ বিবিধ চিত্র সহকারে ১৮৫২ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথমে যে সকল পুস্তক এই অনুবাদ কমিটির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাকল্পদ্রুমের ন্যায় ইংরাজীর রূপান্তর মাত্র। এই সভার প্রধান গ্রন্থকার, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, ১৮৫৮ অব্দে স্বায়ত্তরূপে অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া চলিত বাঙ্গালার কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। স্ত্রীদিগের পাঠের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সমাজ প্রথমতঃ চকমকির বাক্স ইত্যাদি নামে কতকগুলি কৌতুকাবহ গল্পের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৯—৬০ অব্দে এই সভার দ্বারা সুশীলার উপাখ্যান, তিন ভাগ, প্রকাশিত হয়। এই কমিটির পুস্তকগুলি পরে Bengali Family Library এই ইংরাজী এবং "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ" এই বাঙ্গালা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়ে গ্রন্থকারেরা স্বয়ং যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শিশুপালন ও নবনারী প্রসিদ্ধ।

সুশীলার উপাখ্যান।

এই পুস্তকখানি গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ মধ্যে প্রধান। ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। সুশীলা তাহার রচয়িতা উক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের মনঃকল্পিতা আদর্শনারী। কেবল সুশীলা কেন, তাঁহার স্বামী, সন্তান, ছাত্রী, ঘরকন্নার সমুদায় সামগ্রী এবং তাঁহার গ্রাম ও গ্রামের জমিদার সকলেই আদর্শ যোগ্য। এ দেশের সমাজসংস্কারক ইংরাজগণ এবং তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্য এ দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নারীদিগের যেরূপ রীতি ও চরিত্র দেখিতে প্রয়াস করেন, সুশীলা তাহারই প্রতিকৃতি। এই গ্রন্থে দেশী-বিলাতী ভাব মিশ্রিত বঙ্গীয় সমাজসংস্করণের আদর্শ স্ফুটতর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কত আদরে বঙ্গীয় সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে, রচয়িতা স্বয়ং তাহা তৃতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"এই পুস্তক দুইখানি স্ত্রীসমাজের প্রকৃত ফলোপধায়ী হইয়াছে বলিয়া, কি সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, কি বিদ্যোৎসাহী মহোদয় মহাশয়গণ, কি বামাগণ, সকলেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এমন কি, ইংলণ্ডীয়া ও এতদ্দেশীয়া বিদ্যাবতী কোন কোন রমণী সুশীলার তৃতীয় ভাগ শীঘ্র প্রকাশ হইবার নিমিত্ত অর্থ ও উৎসাহ প্রদান দ্বারা অনুরোধ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদক সমাজের প্রকটিত সমুদয় পুস্তক অপেক্ষা উহা অধিক সংখ্যায় বিক্রীতও হইয়াছে। ফলতঃ বিশেষাগ্রহ সহকারে বিদ্যার্থী এবং বিদ্যাবতী কামিনীরা যে সুশীলার উপাখ্যান পাঠ করেন, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এই সামান্য গ্রন্থ সুশীলার উপাখ্যান জন সমাজে এইরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে, স্বপ্নেও আমি এমত আশা করি নাই। এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফল হওয়াতে আমার যে কতই সুখ হইয়াছে, প্রকাশ করাই দুষ্কর।"

যে হিন্দুসমাজে সুশীলার এত আদর, সে সমাজে শীঘ্রই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এমন বিলক্ষণ সম্ভব। সুশীলা যে বিদ্যালয়ে

অধ্যয়ন করিতেন, সে বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা "ইউরোপীয় বিবিদিগের সমাজে" আবেদন করিয়া "কলিকাতা ফিমেল নর্ম্ম্যাল স্কুল" হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া স্বগ্রামে ঐ স্কুল স্থাপন করেন। যাঁহারা এই অভিনবরূপে বিদ্যাশিক্ষার এমন অতিমাত্র প্রয়াসী,তাঁহার কিন্তু পরের পায়ে কত দিন চলিবেন? ইউরোপীয় বিবিরা দয়া করিয়া শিক্ষা না দিলে এ দেশীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচার হইবে না, এমন অসুবিধায় এমন সর্ব্বজন প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উন্নতি সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পরন্তু এই সুশীলার উপাখ্যান পুস্তক বঙ্গীয় সমাজের যে গতির সূচনা করিয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে সমুপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মসমাজ ঘটিত পরিবর্ত্তন।

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে একেশ্বর উপাসক ব্রাহ্মেরা যেরূপে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতেছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে আর কতক গুলি যুবক জীবনের সমস্ত কর্ম্ম "ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে" সম্পাদন করিবার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম নাম বিশেষ রূপে অধিকার করিয়া ছিলেন। অতঃপর আমরা সেই নবাভ্যুদিত লোকদিগকে ব্রাহ্ম নামে ব্যক্ত করিব।

এই সকল ব্যক্তি ১৮৬০ অব্দে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা হিন্দুর বৈদান্তিক মতের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডীয় Theistic মত গ্রহণ করিলেন। আচার ব্যবহারে তাহারা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে অধিক অগ্রসর হইলেন। তাহাদের মতে স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বপ্রকার সচ্ছন্দ ব্যবহার অতীব আবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা স্বায়ত্তরূপে স্ত্রীদিগের লেখাপড়ার চর্চ্চা নানা প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা এই ব্রাহ্মদলভুক্ত নহেন, তাহারাও, ইহাদের দেখাদেখি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উত্তেজিত হইলেন। স্ত্রীদিগের নিমিত্ত বামাবোধিনী পত্রিকা নামে এক মাসিক পত্রিকা ১৮৬৩ অব্দের (১২৭০ সালের) ভাদ্রমাস হইতে ব্রাহ্মদিগের উৎসাহে ও সহযোগে প্রচার হইতে লাগিল।

প্রথম বৎসরে বামাবোধিনী পত্রিকা যে যে মাসে প্রকাশিত হইত, সেই সেই মাসের উপযোগী একটি করিয়া মহদুক্তি পদ্যাকারে উক্ত পত্রিকার শীর্ষ দেশে থাকিত। আষাঢ় মাসের পত্রিকার শিরোভাগে এই কবিতা ছিল।—

অবলাগণের আঁখি হ'তে অবিরল,
বৃষ্টির ধারার ন্যায় বহে অশ্রুজল।
বিদরে হৃদয় নদীকুলের সমান,
দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিন কবে হবে অবসান॥

এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সহজ সহজ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, উপদেশ ও সংবাদ প্রকাশিত হইত। নবশিক্ষিত কুলবালাগণের লেখনী হইতে যে সকল রচনা প্রসূত হইত, ভাল হইলে তাহা এই পত্রিকায় কেহ কেহ মুদ্রিত করিয়া দিতেন। এইরূপে বামাবোধিনী সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের বস্তু হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার বাহিরে বরাহনগর প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মদিগের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই সকল বিদ্যালয়ে হিন্দুদিগের কন্যাগণকে প্রেরণ করিতে অধিক আপত্তি থাকে নাই। ব্রাহ্মদিগের বামাবোধিনী পত্রিকা বিশুদ্ধ জ্ঞান

ধর্ম্মের কথা বলিতেন। তাহাতে তাহা বহু হিন্দু পরিবারেও পরিগৃহীত হইত।

১৮৬৪ অব্দে ব্রাহ্ম সমাজে এক বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীতাদি জাতি চিহ্ন ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজের চক্ষু শূল হইয়া পড়িলেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সকলের প্রতি হিন্দুদিগের বিরাগ জন্মিতে লাগিল।

উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা।

কলিকাতায় উপরোক্ত সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মমতের আন্দোলন বৃদ্ধি করাতে অনেকে তাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন না। যাহাতে লোকের সাক্ষাত হিতসাধন হয়, সেই পন্থায় তাঁহারা প্রধাবিত হইলেন। উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা সেইরূপ উদ্দেশে ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ৬এপ্রেল প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিতকরী সভা প্রধানতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। সভা উত্তরপাড়ার নিকট ও অল্পদূরবর্ত্তী নানা স্থানে বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পারিতোষিক ও মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বয়স্থা স্ত্রীদিগকে লিখিত প্রশ্ন পাঠাইয়া তাহাদের লিখিত উত্তর লইতেন এবং শিক্ষা নৈপুণ্য বিচার করিয়া পারিতোষিক দিতেন। ইহা দ্বারা বালিকা ও অল্প বয়স্কা মহিলাদিগের বিদ্যালোচনার প্রতি অতিশয় আগ্রহ জন্মিল। হিতকরী সভার এই যশ প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্ত জেলার অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় তাঁহাদের আশ্রয়ে আসিল। সভা এই কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন।

মিস্ মেরি কার্পেণ্টরের চেষ্টা।

ব্রাহ্মসমাজের উক্ত নবাভ্যুদয়ের প্রথমে কয়েকটী বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ড গমন করেন। রামমোহন রায়ের বন্ধুকন্যা ব্রিষ্টলবাসিনী মিস্ মেরি কার্পেণ্টর এই সকল যুবকের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর বিষয় জানিতে পারিয়া ১৮৬৬ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বঙ্গদেশের স্ত্রীদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে, স্ত্রীদিগের সামান্যরূপ শিক্ষা চলিতেছে; কিন্তু অন্তঃপুরের বয়স্থা স্ত্রীদিগের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা না করিলে, আশানুরূপ ফল হয় না।

যাহাতে অন্তঃপুরস্থিতা হিন্দু স্ত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ হয়, সেই উদ্দেশে তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কারণ, তাঁহারা স্ত্রীদিগের অল্প শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট; আর শিক্ষাদান ব্যবসায়িনী সামান্যা স্ত্রীদিগের দ্বারা হিন্দুমহিলাগণের সুশিক্ষা হইবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহান।

মিস্ কার্পেণ্টর সে বারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংলণ্ডস্থ লোকের সহানুভূতি পাইয়া আর দুই বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন;তাহা একান্ত বিফল হইবার নহে। পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ব্যয় জন্য মাসিক ১০০০ টাকা দিতে

অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৮৭১ অব্দে ঐ স্কুল পরীক্ষাভিপ্রায়ে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে তাহা স্থায়ী হইল না।

মিস্ কার্পেণ্টর যথার্থ লোকানুরাগিণী ও পর-দুঃখ-কাতরা ছিলেন। যেখানে লোকের ক্লেশ, সেইখানে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। অনাথ বালক বালিকার আশ্রয় জন্য, জীবিকাহীন স্ত্রীদিগের জীবিকার জন্য, কারাবাসী দুশ্চরিত্রদিগের চরিত্রশোধন জন্য, এবং সাধারণতঃ সকল সম্প্রদায়স্থ লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তিনি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অকাতরে ও অবিরামে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল চলিবে না, দেখিয়া, তিনি ১৮৭১ অব্দে National Indian Association নামক এক সভা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারত মহিলাদিগের চিকিৎসা ঘটিত দুর্গতি মোচন এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন যাহাতে এদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে সাহায্যদান করা ঐ সভার উদ্দেশ্য। ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী এলিস্ এই সভার প্রথম প্রতিপোষিকা ছিলেন। এক্ষণে ভারতসাম্রাজ্য সংক্রান্ত ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত বড় লোক, তাহাদের পত্নী, ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চপদাধিষ্ঠিত সমুদায় ইংরাজ রাজপুরুষ এবং দেশীয় মহারাজগণ এই সভার সভ্য। এই মহাসভা ভারতের চতুঃসীমাতে ব্যাপৃত হইয়া অতি উচ্চ প্রকরণে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই সভা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পাত্র বিশেষে মাসিক দান ও পারিতোষিক দান করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রকরণ।

১৮৬০ হইতে ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তবে প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার কন্যাদিগকে, যতদূর সম্ভব, জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে অভিলাষী ছিলেন। তাহাতে তাঁহারা কন্যাগণের লেখা পড়া শিক্ষা পক্ষে কোন প্রকারে ঔদাস্য বা অবহেলা করিতেন না। ১৮৭০ সালে তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্প্রদায় মধ্যে এমন কতকগুলি স্ত্রী আছেন, এবং অন্য সম্প্রদায় মধ্যেও এমন অনেক স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি ভারত-সংস্কারের সর্ব্ববিষয়িণী এক বৃহৎ কারখানা খুলিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। স্ত্রীদিগের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা তাহার মধ্যে একটী প্রকৃষ্ট বিষয়। কিন্তু কর্ম্মের স্থলে তিনি কাহাকেও পাইলেন না। তাঁহার ভারত-সংস্কার সভার স্ত্রী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইল।

এই পরীক্ষায় কেশব বাবুর গতি অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, স্ত্রীদিগের বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চা অধিক হয় এবং তাহাদের মর্য্যাদার খর্ব্বতা না হয়, ইহাই হিন্দুদিগের আন্তরিক বাসনা। লেখাপড়ার জ্ঞান যতদূর তাহাদের ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী হয়, তাহাই তাঁহারা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন। যাঁহারা অধ্যাপনার ব্যবসায় করিবেন, এমন শিক্ষ-

মিত্রীগণ দ্বারা স্ত্রীদিগের মর্য্যাদা রক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য হইবে, ইহা এদেশীয়দিগকে বুঝাইতে পারা যাইবে না।

এই তথ্য অনুভব করিয়া কেশব বাবু উত্তর পাড়ার হিতকরী সভার পন্থা অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসর তিনি সেই সভার ব্যবস্থা মত বয়স্থা স্ত্রীদিগের বাটীতে প্রশ্ন পাঠাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিতেন এবং তাহাদিগকে নানা দ্রব্যের পারিতোষিক দিতেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীগণ এ বিষয়ে তাঁহার আয়ত্ত হইয়া থাকিলেন না।

হিন্দু ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়।

১৮৭৩ অব্দে মিস্ একরৈয়ড্ নাম্নী আর একটী নব্যতরা মহিলা ইংলণ্ড হইতে আগমন করেন। তিনি এক্ষণকার মিসেস্ বিভরেজ। এ দেশীয় স্ত্রীদিগের উন্নতি পক্ষে ইঁহার অনুরাগ আজিও দেখা যায়।

ইনি কলিকাতায় আগমন করিলে কতকগুলি বয়স্থা ব্রাহ্মকন্যা তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মগণের এরূপ নিয়ম নাই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। অতএব মিস্ একরৈয়ড্ সেই কিশোরবয়স্কা কন্যাগণকে অধিকতর বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইলেন।

প্রথমতঃ কেশব বাবু মিস্ একরৈয়েডের হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কমিটির মেম্বর ছিলেন। কিন্তু যেমন বিদ্যাসাগর বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্টরূপ অনুরাগী হইয়াও মিস্ কার্পেণ্টরের প্রস্তাবানুযায়ী স্নানর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন পক্ষে তাঁহার সহায়তা করেন নাই, তেমনি কেশব বাবু, এই পথের পথিক হইয়াও, স্ত্রীদিগের অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিবার ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারিলেন না। কেশব বাবু এজন্য হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। কেশব বাবুর এই ত্যাগপত্র প্রাপ্ত হইয়া মিস্ একরৈয়ড্ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "Your resignation has relieved me from a difficulty, and I accept it with satisfaction." ইহার ভাবার্থ এই, আপনাকে লইয়া চলা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল; আপনার পদত্যাগ আমি আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিলাম।

মিস্ এক রৈয়ড্ খ্যাতনামা বিভারিজ সাহেবকে বিবাহ করিয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য ভার জজপত্নী মিসেস্ ফিয়ারের হস্তে সমর্পণ করেন। বিবি ফিয়ার স্বদেশ যাত্রা করিলে ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে তাহা উঠিয়া যায়। দুই মাস পরে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতির যত্নে উক্ত স্কুলের আদর্শে আর একটী বিদ্যালয়, অথবা সেই বিদ্যালয় অন্য নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নামেরও সকল পরিবর্ত্তন হয় নাই। "হিন্দু" শব্দের স্থলে বঙ্গ শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়া বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় আখ্যা ধারণ করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু।

অদৃষ্ট। (৭)

যাহা পাপ বা যাহা পুণ্য, তাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি সকল যুগে এবং হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের পক্ষেই পাপ এবং পুণ্য। পাপ পুণ্যের বিচার সকল সময়ে এ জগতে হয় না বলিয়াই অনেকে পরকাল মানিয়া থাকেন, কিন্তু এক কাজের জন্য কাহারও স্বর্গ, কাহারও বা নরক হইতে পারে না। জীবহিংসা মহাপাপ—বৌদ্ধেরা অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ক্ষুদ্র মশাটীরও কখন প্রাণ নষ্ট করেন না, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এক বৈষ্ণব ভিন্ন জীবহত্যা করিতে কোন ধর্ম্মেই নিষেধ দেখা যায় না। বৈষ্ণব জীবহিংসা করেন না, কিন্তু বলি ভিন্ন শাক্তের পূজা হয় না, অথচ উভয়েই হিন্দু। ধর্ম্মের নামে হিন্দু কালীপূজা করিয়া, ছাগ বলি, মহিষ বলি দিতেছেন, ইদ্‌বকরিদের দিনে মুসলমান গোহত্যা করিতেছেন। গোহত্যা হিন্দুর পক্ষে পাপ, তাহাও পূর্ব্বে ছিল না, পূর্ব্বে বাড়ীতে অতিথি আসিলে আর্য্য মুনি ঋষিগণ বাছুর মারিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছেন, তখন গোহত্যা করিলে পাপ হইত না, এক্ষণে হয়। যদি গোহত্যা করিলে পাপ হয়, তবে ছাগহত্যা করিলেই বা না হয় কেন? গরু ছাগল উভয়েই কৃষ্ণের জীব, উভয়ের শরীরেই প্রাণ আছে, বেদনা বোধ উভয়েরই আছে, তবে গরুর দ্বারা সংসারের অনেক উপকার হয় বলিয়া যদি গোহত্যা পাপ হয়, তবে মহা অষ্টমীর দিন মহামায়ার সম্মুখে মহিষ বলি দেও কেন? গরুর দ্বারা যে উপকার হয়, তাহা মহিষের দ্বারাও অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়, ছাগলের দ্বারাও যে সংসারের কোন উপকার নাই, একথা কেহই বলিতে পারেন না। এ সংসারে এমন কোন জীব নাই, যদ্দ্বারা সংসারের কোন না কোন উপকার সাধিত হইতেছে। যদি জীবহত্যা পাপ হয়, তাহা হইলে যে কোন জীবেরই কেন প্রাণ বধ কর না, তাহাতেই পাপ আছে, পাপ করিলে যদি নরক হয়, তাহা হইলে এক জীবহত্যা জন্যই নরক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানের কথায় কাজ নাই, তাঁহারা বিধর্ম্মী, হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে তাঁহাদের অনন্ত নরক হইতেছে, কিন্তু যদি গোহত্যা পাপ হয় তাহা হইলে আর্য্য মুনি ঋষিগণ নরকে গিয়াছেন। যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে, শাক্তেরা নরকস্থ হইতেছেন। তবে আর সেখানে স্থান কোথায়? কলিতে সতীত্বের বড় আদর; পূর্ব্বে সতীত্বের যে কখন অনাদর ছিল, একথা আমরা বলিতেছিনা, তবে বর্ত্তমান সময়ে প্রলোভনে পড়িয়া বা নিতান্ত দুরবস্থান্বিত হইয়া ভ্রম প্রযুক্ত যদি কখন একবার কোন স্ত্রীলোকের চরণস্খলন হয়, তাহা হইলে তাহার ইহকাল এবং পরকাল নষ্ট হইয়াছে, জ্ঞান করিয়া তাহার উপর যতখানি নির্য্যাতন করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা হইত না, পূর্ব্বে এ কাজটা যে পাপকার্য্য আদৌ তাহা লোকে মনে করিত না, এজন্য কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক এপথে দাঁড়াইলেও তাহাতে দোষ হইত না; সতীত্বের আদর থাকিলে বা সতীত্ব নষ্টকরা অতি দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিলে আর আজ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি কুলটা স্ত্রীগণ প্রাতঃস্মরণীয়া থাকিতেন না।

পরস্ত্রী গমন করা মহাপাপ, কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। থাকিলে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করার ব্যবস্থা থাকিত না; সেই ব্যবস্থার ফলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন; স্বয়ং ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। মানুষের কথায় কাজ নাই, ইন্দ্র চন্দ্রাদিদেবগণ পরস্ত্রী গমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কত গোপিনীর কুল মজাইয়াছেন। তবে অনেকে বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার আপন বা পর কেহই ছিল না। তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া তোমার আমার পক্ষে তাহা করা উচিত হইতে পারে না। না পারুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য কাল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পরস্ত্রীগমন যে প্রচলিত ছিল, মহাভারত এবং রামায়ণে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কুলনারী হরণ করা পাপ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করিয়াছেন। একা শ্রীকৃষ্ণ এ কাজ করিলে, অবশ্য তিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁর কথা আর আমরা তুলিতাম না, কিন্তু রুক্মিণী হরণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বাপরযুগে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কুলনারী হরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পৈশাচিক বিবাহ, এই কুপ্রথার নামান্তর মাত্র। এই সকল বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার সময়ে কুলনারী হরণ করিলে কোন দোষ হইত না।

সমাজের ঘোর বিশৃঙ্খলা হয় বলিয়া এই সকল বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, পরস্ত্রীগমন এবং কুলনারী হরণ রহিত হইয়াছে, ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করার ব্যবস্থাও লোপ পাইয়াছে। এ সকল কাজ পাপ হইলে এবং এই সকল কাজের ফলে নরকে যাইতে হইলে এই পাপ কলিযুগের লোক তো আছে ভাল, কিন্তু ধর্ম্মের যখন চতুষ্পদ বর্ত্তমান ছিল, সেই সত্য হইতে দ্বাপর পর্য্যন্ত, যুগে যুগে মর্ত্ত্যের মুনি ঋষি হইতে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলকেই নরকস্থ হইতে হইয়াছে।

লোকের শিক্ষা, দীক্ষা এবং রুচি অনুসারে সমাজের অবস্থা যখন প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন সামাজিক শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা দ্বারা পাপ পুণ্য কখন স্থির করা যায় না। অনেক আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতি যাহা পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই এবং এক্ষণে যাহা আছে, পরে তাহা হয়ত থাকিবে না। যে শৃঙ্খল ভুঁফোটা শিশির পাত হইলেই বৃদ্ধি পায় এবং ঈষৎ রৌদ্রের উত্তাপেই শুখাইয়া যায়, তদ্দ্বারা পাপ বা পুণ্যক্ষেত্র জরিপ করিলে ফল কখন ঠিক থাকে না।

পাপ কি পুণ্যই বা কি, তাহা বুঝিতে পারি না। চুরি ডাকাতি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কতকগুলি কাজ সকল দেশে এবং সকল শাস্ত্রেই পাপ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। একজনের দ্রব্য বলপূর্ব্বক হরণ করা অবশ্য অন্যায় কর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া হরণ করিলেই যে চুরি হয়, এবং চুরি করিলেই যে নরক হয়, তাহা কেহ কখন বলিতে পারেন না। অবস্থা বিশেষে মিথ্যা সত্য হয় এবং চুরি ডাকাতিও সৎকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। মিথ্যা যে সত্য হয়, তাহা বঙ্কিমবাবু "প্রচারে" শ্রীকৃষ্ণের উক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাহা হইলে, মিথ্যা বলিলেই পাপ হয় না, চুরি করিলেও দোষ হয় না। যদি ফল দেখিয়া ভাল কাজ, মন্দ কাজ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে চুরি ডাকাতিও অনেক

সময় দোষ না হইয়া গুণ হইয়া দাঁড়ায়। একজন অনাথিনী একটী শিশুসন্তান বক্ষে করিয়া নিজের এবং পুত্রের উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইল, কেহ তাহাদের এক মুষ্টি ভিক্ষাও দিল না, ক্ষুধায় শিশুটী মারা যায়, এমন সময় যদি সেই স্ত্রীলোক পুত্রের জীবন রক্ষার্থে কাহারও ঘর হইতে এক মুষ্টি অন্ন চুরি করিয়া ছেলেটীকে খাইতে দেয়, তাহা হইলে তোমার আমার বিচারে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে অনাথিনীর ফাটক হইতে পারে, কিন্তু সে অন্ন মুষ্টি চুরি করিয়া ছেলেটীকে খাইতে না দিলে ছেলেটী হয়ত সেই দণ্ডেই মারা পড়িত। এ অবস্থায় পাঠক তোমার যদি সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চুরি এ স্থলে দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে। তাহা হইলে চুরি করিলেই পাপ হয় না, অবস্থানুসারে ডাকাতি করিলেও দোষ হয় না—তুমি আমি আর দশজনে একত্রে মিলিত হইয়া কাহারও বাড়ী হইতে বলপূর্ব্বক যদি তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করি, তাহা হইলে আমরা ডাকাতি করিলাম, কিন্তু এ প্রকার ডাকাতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা প্রায়ই করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করেন, তাহা এই ডাকাতির নামান্তর মাত্র। তুমি আমি যে ডাকাতি করি, তাহা অপেক্ষা রাজাদের এ ডাকাতি কত ভয়ানক। এক একটি যুদ্ধে কত লোকের জীবন নষ্ট হইতেছে, কত ধন কুবের পথের ভিখারী হইতেছে, দেশ শুদ্ধ লোকে অধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরিয়া কত কাল দুঃখে কাল কাটাইতেছে। এই প্রকার ভয়ানক ডাকাতি হইতেও দেশের মঙ্গল সাধন হইতেছে। ইংরাজ রাজ ব্রহ্ম অধিকার করিয়াছেন, শুনিয়াছি ব্রহ্মরাজ থীব বড় অত্যাচারী ছিলেন। তুমি বলিবে, থীব ইংরাজের কোন ক্ষতি করেন নাই, তিনি অত্যাচার করিয়া থাকেন নিজের দেশের লোকের উপর করিয়াছেন, গায়ে পড়িয়া যুদ্ধে তাহাকে পরাভব করিয়া তাহার দেশ অধি[illegible] কর্ত্তব্য [illegible] কার করা হওয়া [illegible] আমরা কোন বিচার করিব না, থীব প্রজারঞ্জক কি প্রজা-পীড়ক ছিলেন, তাহাও আমরা অনুসন্ধান করিব না, পৃথিবীতে সিরাজ উদ্দৌলার ন্যায় প্রজা-পীড়ক রাজা শূন্য হয় নাই, অসভ্য প্রদেশে এখনও অনেক স্থানে অনেক সিরাজ উদ্দৌলা বিরাজ করিতেছেন। থীব সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই যদি সত্য হয়, থীব যদি দ্বিতীয় সিরাজ উদ্দৌলা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ন্যায় একজন অত্যাচারী রাজাকে ছলে বলে বা কৌশলে বন্দী করত যদি ব্রহ্ম অধিকার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরাজের এ কার্য্য অন্যায় হইলেও ন্যায় হইয়াছে। নর শোণিতে ব্রহ্ম রাজ্য যদিও প্লাবিত হইয়াছে, ব্রহ্মবাসীগণ যদিও স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ রাজের অনুগ্রহে ব্রহ্ম রাজ্যে জ্ঞানালোক বিস্তীর্ণ হইলে, যে ব্রহ্মবাসী আজ ইংরাজদের উপর খড়্গহস্ত, তাহারাই এক দিন অবনত মস্তকে ইংরাজদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে।

পাপ কি, পুণ্যই বা কি, তাহা জানি না, যে কাজ অতি গর্হিত বলিয়া একদিন লোক নিন্দা করিয়াছে, কালে তাহাই সুফল প্রসব করিয়াছে, আবার ভাল কাজও অনেক সময়

নানা প্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল দেখিয়া ভাল কাজ মন্দকাজ স্থির করিতে হইলেও যখন ভাল হইতে মন্দ এবং মন্দ হইতে ভাল ফল ফলিতে দেখি, তখন কোন্‌টীকে পাপ কোন্‌টীকে পুণ্য বলিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, সৎকার্য্য করিলে আমাদের মনে আত্মপ্রসাদ এবং মন্দকাজ করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম প্রসাদ বা আত্মগ্লানি এ দুই আপনাপন সংস্কার অনুসারে জন্মাইয়া থাকে, বাল্যকাল হইতে যে যাহা করিয়াছে এবং যে সংস্কার যাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তদ্বিপরীতে কোন কাজ করিতে হইলেই তাহার মনের ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে। কশাইদার শত গো হত্যা করিলেও তাহার মনে বিন্দু পরিমাণে কখন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না। আর যে বৈষ্ণব, সে একটী ছাগবলিও চক্ষে দেখিতে পারে না—যিনি কখন মিথ্যা বলেন নাই, ভ্রমপ্রযুক্ত তাহার কথার অন্যথা হইলে অনুতাপানলে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যায়; আর একজন উকীল বাড়ী যাও, দেখিবে, মিথ্যা জবাব, মিথ্যা সাক্ষী শিখাইয়া কোন রকমে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিলেই তাহার আত্মপ্রসাদ হয়। মানুষ অভ্যাসের দাস, যে যাহা করে, দিন কতক পরে অভ্যাস হইয়া গেলে তখন আর তাহাতে তাহার সুখ দুঃখ থাকে না।

পাপ পুণ্য কি, বুঝিলাম না—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনের জীবন সংহার করিতে হইবে, এই ভয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য যদি আত্মীয় স্বজনের জীবন নষ্ট করিতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য—সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে; বঙ্কিমবাবু প্রচারে গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও সেই কথাই বলিয়াছেন; তিনিও বলিয়াছেন, "সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড প্রদান কাহারও স্বধর্ম্ম ক্ষমা। শিপাহীর স্বধর্ম্ম শত্রুকে আহত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আহতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম্ম আছে।" (প্রচার চতুর্থভাগ ৪২ পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুসারে আপনাপন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত নরহত্যা, গুরুহত্যা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না। ব্যাসের মুখে শ্রীকৃষ্ণের এ উক্তি বড় ভয়ঙ্কর কথা, কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব মধ্যে আমরা নানা স্থানে নানা জনের মুখে শুনিয়াছি; একব্যক্তি অপরকে সংহার করিল, ইহা কেবল কথার কথা, ফলতঃ কেহই কাহাকে সংহার করে না। ভগবান স্বয়ং সংহার-কর্ত্তা, তবে তিনি নিজে স্বহস্তে কাহাকেও বধ করেন না, একজনের দ্বারা অপরের নিধন সাধন করিয়া থাকেন। ব্যাসের মতে ভগবান আমাকে উপলক্ষ করিয়া যদি কাহাকেও বধ করেন, সে বধের ভাগী আমি হইব না, এবং সে জন্য আমার কোন পাপও হইবে না—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পাপ পুণ্য বিশ্বাস করিতেন না; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির রাজ্যাভিলাষী হইয়া অনেক অবধ্য লোকের জীবন নষ্ট করত শোক ও সন্তপ্ত হইলে ব্যাস বলিয়াছিলেন :—

যদি ঈশ্বর সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরই তাহার ফল ভোগ করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি কানন মধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যই বৃক্ষ ছেদন জনিত পাপে লিপ্ত হয়; কুঠার ঐ পাপে কখনই লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত

পাপ ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কুঠার ব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে, কুঠার নির্ম্মাণ-কর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনজনিত পাপ লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ সে যদি কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদন কর্ত্তা কোনক্রমেই বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্র প্রহার কর্ত্তা স্বকার্য্য সাধন জন্য বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্র নির্ম্মাণ কর্ত্তাই পাপভাগী হইবে ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্যই ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া কি জন্য সেই কার্য্যের ফলভাগী হইবে? ঐ ফল ঈশ্বরের ভোগ করাই কর্ত্তব্য। আর দেখ কেহই অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে কার্য্য করিয়া কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিবে?"

প্রতাপচন্দ্ররায়ের মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ৭০ পৃঃ

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বৌদ্ধনিদান।

ঈশ্বরের সাযুজ্য বা সামীপ্য লাভে, স্বর্গে বা পরকালে সুখের ভরসা সকল ধর্ম্ম শিষ্যগণকে দিয়া থাকে। ইহকালে সুখ কচিৎ ঘটে; এখানে ধার্ম্মিকের বিড়ম্বনা, অধার্ম্মিকের প্রশ্রয়, এখানে পুণ্যের শোক, পাপের আনন্দ। ইহজীবনের অসমতা সামঞ্জস্য করিতে স্বর্গের উদ্ভাবনা; সেখানে পার্থিব লাভ লোকসানের হিসাব হইয়া ক্ষতিপূরণ করা হয়। পরকালে বা ইহকালে আপনার বা অন্য অনেকের যাহাতে সুখ হয়, তাহার অন্বেষণ করা, সেইরূপ কর্ম্ম করা, অন্য সকল ধর্ম্মের বিধান। পুণ্য সুখজনক এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব সময়ে সুখজনক কর্ম্মই পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ অন্যবিধ। সুখ নাই, থাকিলেও সুখের প্রয়োজন নাই। জীবনমাত্র দুঃখপূর্ণ। দুঃখ হইতে কিসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই মনুষ্যের অনুসন্ধেয়।

সুখের যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের তিনটী বিষয়ে বিশ্বাস আছে। (১) সুখ আছে (২) সুখ প্রার্থনীয় (৩) চেষ্টা করিলে মনুষ্য সুখ পাইতে পারে। অর্থাৎ সুখলাভ করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আছে। বৌদ্ধ বলেন, সুখ নাই, সুখ প্রার্থনীয় নহে এবং মনুষ্যের সুখ লাভের ক্ষমতা নাই। জগতে দুঃখ আছে, দুঃখ অপ্রার্থনীয়, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ক্ষমতা মনুষ্যের আছে। জীবন আধি ব্যাধি পরিপূর্ণ, জন্মজরামৃত্যু দুঃখময়, রাজার প্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে, ধনজনপূর্ণ পণ্যবীথিকায় বা নিরম্বু মরুভূমে, যৌবনের উল্লাসে বা স্থবীরের বিষাদে সুখ কোথাও নাই। আছে কেবল দুঃখ। দুঃখের অভাবের নাম সুখ। দুঃখের অভাব নির্ব্বাণে। এজন্য নির্ব্বাণই একমাত্র সুখময়।

দুঃখের যখন অস্তিত্ব আছে, তখন দুঃখের উৎপত্তি আছে। কিসে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাই বৌদ্ধনিদান। কিসে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহাই বৌদ্ধসূত্র। বোধি-মূলে একান্ত ধ্যানগত হইয়া সিদ্ধার্থ এই বৌদ্ধনিদান আবিষ্কার করেন। নিদান-সূত্র বড় জটিল। ভাষ্যকারগণ আরো জটিলতর করিয়াছেন।

যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া মনে করা একটী বিষম ভ্রম। মনুষ্য মাত্রই এই

ভ্রমের অধীন। অবিদ্যমানকে বিদ্যমান বলিয়া মনে করা, ইহাই অবিদ্যা। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, ইহাই মায়া। সেখানে সর্প নাই, কিন্তু রজ্জু আছে। মরীচিকায় সরোবর বা প্রাসাদভ্রম, একটা জিনিষকে আর একটা জিনিষ বলিয়া মনে করা, ইহা মায়া। কিন্তু যাহা মোটে নাই, যাহার মত কিছু নাই, তাহার বিদ্যমানতা কল্পনা করা, ইহা অবিদ্যা। সুখ নাই, সুখের সত্ত্বা কল্পনা করা, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর সংসারে নিত্যতা কল্পনা করা, যে নাই তাহাকে আপনার পুত্র, আপনার স্ত্রী অনুমান করা, ইহা অবিদ্যা। সকল জীব স্বভাবতঃ এই অবিদ্যা জড়িত।

সংসার দুঃখময়। হাহাকার ঘরে ঘরে। জলধারা চোখে চোখে। বৈরাগ্যের নিশ্বাস, বিরহের বেদনা, শোকের ক্রন্দন, রোগের যাতনা, শত্রুর অত্যাচার, দ্রোহীর অবিশ্বাস, প্রণয়ীর বিড়ম্বনা, হতাশের বিবাদ আক্ষেপে সংসার জর জর। মাথার ঘাম ফুটিয়া পায়ে ঝরে, তবুও উদর পুরে না। উষ্ণ শোণিত শীতল হয়, তবু অভাব পূরে না। কাল কেশ সাদা হয়, তবু পিয়াস মিটে না। হা হতাশ দীর্ঘশ্বাস, হৃদয় বেদনা নিত্য নিরন্তর, তবু লোকে বলে সংসার সুখের, আমার সোণার ঘরকরণা। আনন্দবাসরে সহসা "হরিবোল হরি" ধ্বনির চিৎকারে আমার চমক ভাঙ্গিয়া যায়, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি গায়ের বস্ত্র টানিয়া দিয়া নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়ি। স্বপ্নই আমার ভাল লাগে, নিদ্রার অজ্ঞানতা আমার বড় প্রিয়, চৈতন্য আলোক জ্ঞান সূক্ষ্মতা আমাকে আকর্ষণ করে না। লোকে এত বুঝায়, তবু যাহা জড়, যাহা অনিত্য, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, যাহা অন্ধকার, যাহা স্থূল, আমি তাহাই ভালবাসি।

যাহা পর্ব্বত বলিয়া ভিত্তি গাঁথিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, চোরা বালির মত সেই ভিত্তি দিন দিন পলে পলে সরিয়া যাইতেছে। ঘর ফাটিয়া চুরিয়া গেল, তথাপি মেরামত করিয়া চক্ষু বুজাইয়া বিপদের কোণে মাথা দিয়া পতনোন্মুখ সেই গৃহে শুইয়া আছি। জীবনের শিক্ষা, সাধুর দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতের বেদ সকলেই আমাকে শিখাইয়া দেয়, সংসার অসার কণ্টকপূর্ণ, বেত্রাঘাতে পৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছে, আঘাত কত পীড়াদায়ক, বুঝিয়াছি, তবু যেখানে আঘাত পাইব, সেই খানেই ছুটি, যেখানে যন্ত্রণা সেখানে মস্তক পাতিয়া দেই, গরল দেখিলেই অমৃত বলিয়া পান করি।

যাহা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বায়ুতে মিলাইয়া যাইতেছে, যাহা আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়াছিলাম, তাহা অন্ধ হইতে অন্ধতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, যাহা বরমালা বলিয়া সোহাগ করিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, তাহাই সর্প হইয়া বক্ষে দংশন করিতেছে; তথাপি সেই মালা আবার খুঁজিতেছি, সেই আলোক আবার চাহিতেছি, সেই স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রান্ত হইতেছি। অনিত্যকে নিত্য বলি, অসুখকে সুখ বলি, সাধ করিয়া কণ্টকে দেহ ছিন্ন ভিন্ন করি। মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিয়াও তাহার পিছনে ধাবমান হই।

কুৎসিত কুরূপকে সুন্দর সুরূপ বলিয়া কল্পনা করিতেছি। শূন্য হইতে উৎপত্তি, শূন্যের উপাদানে গঠিত, বায়ুভরে সেই আদিম শূন্যে পরিণত, তাহাই নিত্য অপরি-

বর্ত্তনীয় বলিয়া বুকে পুরিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। আমোদের পুত্র কন্যা শূন্যের সমষ্টি, প্রেমময়ী দয়িতা শূন্যের ছায়া, স্নেহময়ী ভূদেব জননী জীবনশূন্য স্বপ্নের আবেগ। সাধ করিয়া যাহাকে কোলে লইয়া বসাইতেছি,সে পূতিগন্ধময় শবমাত্র ; যাহাকে বুকে পুরিয়া বুক জুড়াইতেছি, সেও নাই, আমিও নাই, বুকও নাই, জুড়াওও না। কেহ, চিন্তা করিতে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক মুহ্যমান হয়, হৃদয় মস্তিষ্কের মাথায় একটা ঘোমটা ফেলিয়া মস্তিষ্ককে ঢাকিয়া ধরে। কিসে আমাকে এত ভ্রান্ত করে, চিতাবাঘিনীকে কুরঙ্গিনী ভাবিয়া কেন পোষা করি ? অবিদ্যা! অবিদ্যা! অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে সংসারের উৎপত্তি, অবিদ্যার উপাদানে গঠিত, অবিদ্যা জড়িত। অবিদ্যার বিনাশে যাদুকরের কুহক অন্তর্দ্ধান করে। অবিদ্যাই নিদান।

সুখ নাই, যশ নাই, ধন নাই—অবিদ্যা বলে লোকে এ সকল আছে বলিয়া ইহাদিগকে পাইবার, ইহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবার বাসনা করে। অবিদ্যা না থাকিলে বাসনা হইত না। অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি। নিদানচক্রে অবিদ্যার পরে বাসনা। সুখের বাসনা, জীবনের বাসনা, প্রাধান্যের বাসনা, এই বাসনা,তৃষ্ণা বা তংহা জন্মের কারণ, জন্ম যাবতীয় দুঃখের কারণ। বাসনার নির্ম্মূল উচ্ছেদে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। কিন্তু অবিদ্যার বিনাশ না হইলে বাসনার বিনাশ হয় না, বাসনার বিনাশ না হইলে জন্মের নিবৃত্তি হয় না, জন্মের নিবৃত্তি না হইলে জরামৃত্যু পরিতাপের বিনাশ হয় না। মূলে অবিদ্যা, প্রপঞ্চ অবিদ্যার কুহকী কল্পনা, এই জ্ঞান হইলে অবিদ্যার বিনাশ হইলে বাসনার নির্ব্বাণ হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না। দুঃখ জানিতে পারিলে, দুঃখের কারণ জানিতে পারিলে, দুঃখের বিনাশ আছে জানিতে পারিলে, দুঃখ বিনাশের উপায় জানিতে পারিলে আর অবিদ্যা থাকে না, বাসনার নিবৃত্তি হয়, জন্ম বা ভবচক্র হইতে জীব নিষ্কৃতি পায়। দুঃখবিনাশের পন্থায় চারিজন পথিক। পূর্ব্বে আমরা তাঁহাদের পরিচয় পাইয়াছি—স্রোতপন্ন, শকৃদাগামী অনাগামী ও অর্হৎ।

বৌদ্ধদর্শনে আত্মার স্বীকার নাই। মনও অন্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটী ইন্দ্রিয়, জড়পদার্থ। সুতরাং মনুষ্য একটী জড়পিণ্ড মাত্র, সতত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য পঞ্চস্কন্দের সমাবেশে মনুষ্য নামে জড়পিণ্ডের উৎপত্তি। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্দ। রূপ অষ্টাবিংশতি প্রকার, বেদনা ষড়বিধ, সংজ্ঞা ষড়বিধ এবং সংস্কার দ্বিপঞ্চাষৎ প্রকার। বৌদ্ধদর্শনে পঞ্চস্কন্দ সমাবিষ্ট মনুষ্যের উৎপত্তি এইরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে :—(১) অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার (৩) সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (৪) বিজ্ঞান হইতে নামরূপ (৫) রূপ হইতে ষড়ায়তন (৬) ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ (৭) স্পর্শ হইতে বেদনা (৮) বেদনা হইতে তংহা (৯) তংহা হইতে উপাদান (১০) উপাদান হইতে ভব (১১) ভব হইতে জন্ম (১২) জন্ম হইতে জরামৃত্যু। ইহাই দ্বাদশ বৌদ্ধনিদান। এ নিদান যে বুঝিয়াছে, তাহার অবিদ্যার আশঙ্কা নাই।

উপাদান চতুর্বিধ—কাম, মোহ, শীলাব্রত ও আত্মবাদ। আত্মার সত্তা স্বীকার করা আত্মবাদ, ব্রতযজ্ঞে কোন শুভফল হয়, স্বীকার করা শীলাব্রত। এ দুটিই পাপ বা ভ্রম।

মোহ দুই প্রকার, উচ্ছেদবাদ এবং শাশ্বতবাদ্। নির্ব্বাণে চিরমৃত্যু ঘটে, ইহা বলা উচ্ছেদবাদ, নির্ব্বাণে অমরত্ব লাভ হয়, ইহা বলা শাশ্বতবাদ। এরূপ মীমাংসা মোহজনিত। কাম দুই প্রকার, রূপরাগ ও অরূপরাগ। কোন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া জন্মলাভ করা বা সর্ব্বপ্রকার রূপশূন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করা, এ উভয়ই কাম। বৌদ্ধনিদানে এই কামকেই উপাদান নামে বিশিষ্ট করা হইয়াছে।

অগ্নির উপাদান তৃণ, অগ্নি যত উৰ্দ্ধে উঠুক, নীচে তৃণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, বায়ুভরে দিগদিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইলেও সে উপাদান শূন্য হয় না। উপাদান শূন্য হইলে অগ্নির নির্ব্বাণ হয়। যতক্ষণ দহনীয় তৃণ কাষ্ঠ মিলিবে, ততক্ষণ অগ্নির নির্ব্বাণের সম্ভাবনা নাই। জীবন অগ্নির ন্যায় দাহময়, জন্মে জন্মে লোকান্তরে বাসনা উপাদানের উপর জীবন অবলম্বন করে। সে অবলম্বন বা উপাদান বিচ্ছিন্ন হইলে দাহময় জীবনের নির্ব্বাণ হয়। বাসনার বিনাশ না হইলে জীবন আগুনের নির্ব্বাণের সম্ভাবনা নাই। অবিচী হইতে স্বর্গ, তুষিত হইতে মহেন্দ্রলোকে, বাসনা অবলম্বন করিয়া জীবনবহ্নি জ্বলিতে থাকিবে। বাসনার কণামাত্র বিদ্যমান থাকিলে পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। যে পরিবর্ত্তনশীল সংসারের প্রত্যেক বাসনা পরিহার করিয়া, নিরান্দোলিত শান্তিলাভ করিয়াছে, সে যদি কণামাত্র সে শান্তিসুখে আনন্দ অনুভব করে, সে শান্তির ক্ষণমাত্র কামনা মানসে অস্ফুটভাবে উদ্দীপিত হয়, তবে তাহার বন্ধন ঘুচে নাই, তাহার পুনর্জ্জন্ম নিঃসন্দেহ।

কাম হইতে ভব বা হইবার ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। হইবার অর্থাৎ জন্মিবার ইচ্ছা হইলে জন্ম হয়, জন্মমাত্রই জরামরণতাপিত। রূপ না হইলে তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। এজন্য নিদানচক্রে ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে রূপ আরোপিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষেত্র দর্শনযোগ্য শ্রবণযোগ্য পদার্থের আবির্ভাব। মনের সঙ্গে চিত্ত, ধর্ম্ম বা ভাবনার উদয়। আবার চক্ষে গোলাপ প্রতিভাত না হইলে চক্ষে গোলাপের অনুভূতি জন্মে না। চক্ষে গোলাপের রূপ অনুভূত হইলে এবং নাসিকায় গোলাপের সুগন্ধ অনুভূত হইলে, গোলাপের সংজ্ঞা মনে উদ্ভূত হয়, সুরূপ সুগন্ধ গোলাপের জ্ঞানলাভ হইলে গোলাপটী লইবার বাসনা হয়। সুখের সংজ্ঞা জন্মিলে সুখ পাইবার বাসনা হয়, নরের বা দেবতার সংজ্ঞা জন্মিলে নর বা দেবতা হইবার বাসনা হয়, স্বর্গের সংজ্ঞা জন্মিলে স্বর্গে থাকিবার বাসনা হয়। এই বাসনা রূপরাগ বা অরূপরাগে পরিণত হয়। সেই কাম হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম। জগতে যদি জন্মজরামৃত্যু না থাকিত, তবে বুদ্ধাবতার বা বৌদ্ধধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জন্ম হইতে জরামৃত্যু। যে বাসনার দমন করিতে পারে, পদ্মপত্র হইতে জলের ন্যায় তাহার দুঃখ অপসারিত হয়। মূল একেবারে বিনষ্ট না হইলে ছিন্নশির বট বৃক্ষের ন্যায় আবার শাখাপল্লবে বিকশিত হয়। বৌদ্ধমতে জড় জগতের উৎপত্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অন্য সকল ভূত অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং অপ্রমেয়। মৃত্যু হইলেও বিজ্ঞানের বিনাশ হয় না। নূতন জন্মে পুরাতন বিজ্ঞান উপস্থিত থাকিয়া জন্মের ক্রমবর্দ্ধিতা রক্ষা করে। নির্ব্বাণ লাভ হইলেই বিজ্ঞানের বিনাশ হয়।

"জরায়ু মধ্যে বিজ্ঞান সমাবিষ্ট না হইলে নামরূপের উৎপত্তির কি সম্ভাবনা আছে ? আনন্দ! জরায়ু মধ্যে বিজ্ঞান একবার সমাবিষ্ট হইয়া আবার যদি অন্তর্দ্ধান করে, তবে নামরূপ লইয়া কি জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে ? আবার শৈশবে বিজ্ঞান অন্তর্হিত হইলে নামরূপের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় ?"

ব্যক্তিত্বহীন পঞ্চস্কন্দের সমাবেশে নামরূপ বিশেষত্ব প্রদান করে। শূন্যের সমষ্টি এক এক নামে অভিহিত হইলে স্বতন্ত্রভাবে প্রতীয়মান হয়। স্বতন্ত্রতার কারণ পিতামাতা, স্ত্রী পুরুষ, রাম গোপাল, হ্রস্বদীর্ঘ, ক্ষুদ্র বৃহৎ ইত্যাদি। নামরূপ বিশেষণবাচক। নামরূপের কারণ বিজ্ঞান। কুসুম মালার সূত্র সেই কর্ম্মফল এই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ক্ষিতি অপ তেজের মত জড় পদার্থ, কিন্তু এক ফুল হইতে অন্য ফুল পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তরে প্রবহমান জীবনগতি অনুসরণ করে। পুরাতন বৃক্ষের বিজ্ঞান বীজ হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কোথায় কোথায়ও ইহা বলা হইয়াছে যে, যেমন একটী কাষ্ঠ আর একটী কাষ্ঠে অবলম্বন করিয়া উভয়ে দাঁড়াইতে পারে, তেমনি বিজ্ঞানের অবলম্বন নামরূপ, নামরূপের অবলম্বন বিজ্ঞান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা মরণ কিরূপে উৎপন্ন হয়, আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবিদ্যার উৎপত্তি কোথায়, অবিদ্যা হইতে কিরূপে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, বুঝিতে পারিলে বৌদ্ধনিদান এক প্রকার বুঝা যাইতে পারে।

প্রজ্ঞা পারমিতায় লিখিত হইয়াছে, যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করা অবিদ্যা। নামরূপ অনুভূতি বা সংজ্ঞা কিছুই নাই। যাহা নাই তাহা আছে, এই অজ্ঞানতার প্রথমস্তর সংস্কার, দ্বিতীয় বিজ্ঞান, তৃতীয় নামরূপ। ক্রমে অবিদ্যা যত বাড়িয়াছে, তত বিভিন্ন পদার্থের কল্পনা বা ভ্রম জন্মিয়াছে। ইহা আধুনিক বৌদ্ধমত। প্রাচীন বৌদ্ধমতে দুঃখ কি না জানা, দুঃখের উৎপত্তি কোথায় না জানা, দুঃখের বিনাশ হয় না জানা, কিসে দুঃখের বিনাশ হয় না জানা, ইহাই অবিদ্যা। মহাবর্গে লিখিত হইয়াছে "এই চারিটী আর্য্য সত্য (চতুরার্য্য সত্য) না জানিয়া আমি জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছি। এখন ইহাদিগকে জানিতে পারিয়াছি, জন্মপ্রবাহনিরোধ হইয়াছে, দুঃখের উন্মূলন হইয়াছে, আর পুনর্জন্ম নাই।" এ জন্মের পূর্ব্বে জন্ম ছিল, তাহার পূর্ব্বে অন্য জন্ম ছিল। এ জন্মের কারণ পূর্ব্ব জন্মের অবিদ্যা, সে জন্মের কারণ তাহার পূর্ব্বজন্মের অবিদ্যা-জন্ম অনন্ত; অবিদ্যার আরম্ভ কোথায়, উৎপত্তি কি হইতে, ইহা জ্ঞাত হওয়া নির্ব্বাণলাভে আবশ্যক নাই। অবিদ্যার আরম্ভ গৌতম ব্যাখ্যা করেন নাই। জীবাত্মা বা পরমাত্মার অদ্বৈততত্ত্ব না জানা মায়া বলিয়া বেদান্তদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে, দুঃখের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিনাশ ও বিনাশের উপায় না জানা অবিদ্যা বলিয়া প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখ কি, কিসে দুঃখের উৎপত্তি, কিসে দুঃখের বিনাশ হয়, জানিতে পারিলে সংস্কার, বিজ্ঞান, বাসনা বা জন্ম জরামৃত্যু ঘটে না, অবিদ্যার বিনাশে জীবনের নির্ব্বাণ ঘটে, জীবের নির্ব্বাণলাভ হয়। এই জ্ঞানের অভাবে সুখ লোভনীয়, জীবন

প্রার্থনীয় বোধ হয়। এই ভ্রম হইতে সুখের বাসনা জন্মে, সেই বাসনা বা তৃষ্ণা বা তৃষ্ণা জন্মের কারণ।

সংস্কারের অর্থ সুন্দর করা, ব্যবস্থা করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সুশোভিত করা। সুশোভিত করা এবং যাহা সুশোভিত করা যায়, উভয়কে ইসংস্কার বলে। উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও বিনাশ, এ তিন অবস্থার অতীত কোন পদার্থ নাই, সুতরাং এ তিনের কোন একটী রূপে পদার্থমাত্র পরিলক্ষিত হয়। এইরূপের অতীত পদার্থ আর কিছু আছে কি না, বৌদ্ধের বিচার করিবার অধিকার নাই, সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের সংস্কারকে ক্রিয়া, কার্য্য, বা পদার্থ যাহা বল, তাহাই সঙ্গত হইবে। বৌদ্ধনিদানে কর্ম্মকে সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবিদ্যা হইতে দুঃখের উৎপত্তি। দুঃখের স্বরূপ আদি, অন্ত ও বিনাশের উপায় জানা না থাকিলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, কর্ম্ম হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ ইত্যাদি।

যাহা করিয়াছি, আমি তাহার ফল। কর্ম্মই আমার সত্ত্ব, কর্ম্মই আমার বিত্ত, কর্ম্মই আমার গোত্র, কর্ম্মই আমার গৃহ, কর্ম্মগর্ভে আমার উৎপত্তি। আমি মূর্ত্তিমান কর্ম্মফল। আমার শরীর, আমার মন, আমার চেহারা, আমার গঠন, মাথার কেশ, চোখের চাহনি, গায়ের রং, চলিবার ধরণ, বিদ্যা বুদ্ধি ধারণা বিশ্বাস আমার সকলই কর্ম্মফলে এরূপ হইয়াছে। আমার যাহা কিছু, আমি যাহা কিছু—কর্ম্মফলানুযায়ী। আমার কিছুই নাই যাহা কর্ম্মফলে তেমনটী হয় নাই।

কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি নাই, অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্, কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। স্বর্গে বা সমুদ্রগর্ভে বা গিরিগহ্বরে কোথাও এমন স্থান নাই, যেখানে পলাইলে কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। নিরাপদে গৃহে ফিরিবার সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সমাদরে অভ্যর্থনা করে। পরলোকে পৌঁছিলে শুভকর্ম্মফল কর্ত্তাকে সাদরে সম্ভাষণ করে।। দেবলোক বা নরলোক প্রেতলোক জীবলোক বা অবীচি কর্ম্ম সর্ব্বত্র পথ প্রদর্শক। কর্ম্মই সংস্কার, কর্ম্মই স্কন্দ।

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামৃত্যু, এই বৌদ্ধনিদানচক্র। বোধিমূলে গৌতম এই নিদান আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতে নূতন জন্ম, নূতন জন্মে আবার অবিদ্যা, তাহার পর্য্যায়ে আবার জন্ম। অবিদ্যা হইতে পর পরে কিসের ব্যাবৃতি হয়, বৌদ্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম অবিদ্যা কোথা হইতে হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিতে বৌদ্ধের অধিকার নাই। প্রদীপের আগুন হইতে ঘরে আগুন, ঘরের আগুন হইতে গ্রামের আগুন। পরস্পর পর্য্যায়ে সর্ব্বনাশ হইলে প্রথম যে প্রদীপ দ্বারা ঘরে আগুন লাগিয়াছিল; দোষী সেই। এজন্য অবিদ্যায়ই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সে প্রদীপ কাহার বাড়ীর প্রদীপ হইতে জ্বালিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা অন্বেষণের প্রয়োজন কি?

বৌদ্ধনিদানের সঙ্গে সঙ্গে চারিটী আর্য্য সত্য উল্লিখিত হয়। দুঃখ আছে, দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি আছে, দুঃখের নিরোধ হয় এবং দুঃখনিরোধের মার্গ আছে, ইহা যে জানে, তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহার বাসনা দূর হয়, বাসনা দূর হইলে জন্মজরামৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। গৌতম দুঃখনিরোধের

উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, উহা অষ্ট সন্মার্গ নামে উল্লিখিত হয়। মোহমুগ্ধ মানব জানে না যে দুঃখ আছে, সংসার সুখের বলিয়া সে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। পতঙ্গ যদি জানিত, অগ্নি কেবল জ্বালাময়, তবে কি সে দীপ-শিখায় ঝাঁপ দিত? মানব জানেনা যে দুঃখের উৎপত্তিমূল তাহার বাসনা। গোলাপের কাঁটায় বেদনা হয়, জানিলে শিশু কি গোলাপ তুলিতে প্রয়াস করিত? যাহারা দুঃখ আছে জানে, দুঃখের কারণ জানে, তাহারাও দুঃখ পরিহার করিতে প্রয়াস পায় না, তাহারা অদৃষ্টের প্রতি চাহিয়া পুরুষকার বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখ সহ্য করে। বিশ্বাস যে দুঃখের অন্ত নাই, দুঃখ সহিতেই হইবে, এজন্য অপরিহর্ত্তব্য দুঃখ কুঠারের আঘাতে মস্তক পাতিয়া দেয়, পুরুষকার পরিচালনে প্রয়াসী হয় না। গৌতম তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—দুঃখের বিনাশ আছে এবং কি উপায়ে দুঃখ বিনাশ করা যায়, তাহাও বলিয়াছিলেন। বাসনা দুঃখের মূল। কিরূপে বাসনা সংযম করা যায়, তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহারই নাম অষ্ট আর্য্য সন্মার্গ। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্য গৌতম নির্ব্বাণ লাভের উপায় সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন :-

সর্ব্বপাপস্ত অকরণম্ কুসলস্স উপাসম্পাদা
সচিত্ত পরিয়োদাপনম্ এতম্ বুদ্ধা নুশাসনম।

পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও, সৎকার্য্য সাধন কর, চিত্ত পবিত্র কর, ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, পাপ কার্য্য কি? বৌদ্ধনিদানে দশ সংযোজনা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

(১) কামরাগ—বিলাস কামনা।
(২) পতিঘা—অদর্শনীয় দর্শনে ঘৃণা।
(৩) মান—অহঙ্কার, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক।
(৪) দিত্থি—আত্মবাদ।
(৫) বিচিকিচ্ছা—সন্দিগ্ধতা, জন্মান্তরে অবিশ্বাস, জড়বাদ।
(৬) ভবরাগ—পুনর্জন্মের ইচ্ছা। ইহা দুই প্রকার, রূপরাগ ও অরূপ রাগ।
(৭) শীলাব্রত পরামস—যাগ যজ্ঞের আবশ্যকতা স্বীকার।
(৮) ইস্‌সা—স্বার্থপরতা।
(৯) মচ্ছরীয়—লোভ।

সৎকার্য্য কি? প্রতিদিন প্রাতে বৌদ্ধকে এই পাঁচটী প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, ইহার নাম পঞ্চশীল :

১। পাণাতি পাতা বেরমণি সিখ্‌খা পদম্ সমাদিয়ামি।
২। অদিন্নাদানা বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৩। কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৪। মুসাবদা বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৫। সুরামেরয় মজ্জপমাপঠানা বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।

ভিক্ষুদিগকে আরো কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, ইহার নাম উপোসথশীল।

৬। অব্রহ্মচারিয়া বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৭। বিকাল ভোজন বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৮। নচ্চগীত বাদিত বিসুক দস্‌সন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডল বিভুসনথানা বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।
৯। উচ্চাসয়ন মহাসয়না বেরমণি সিখখাপদম্ সমাদিয়ামি।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি :—১ প্রাণিপাত করিব না। ২। অদত্ত গ্রহণ করিব না। ৩। কামজনিত ভ্রষ্টাচার করিব না। ৪। মিথ্যা বৃথা বা অপবাদ কথা কহিব না। ৫। সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করিব না। ৬। ব্রহ্মচর্য্যের বিপরীত আচরণ করিব না। ৭। বিকাল ভোজন করিব না। ৮। নৃত্য

গীত বাদ্য শ্রবণ বা দর্শন করিব না। ৯। মালা বা গন্ধ বিলেপন বা ধারণ করিব না। ১০। উচ্চাসন বা মহাসন গ্রহণ করিব না।

ইহাও যথেষ্ট হইল না। এক একটি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নিরূপণে সমগ্র বিনয়-সূত্র পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজন্য সংক্ষেপে অষ্ট আর্য্য সন্মার্গ বিহিত হইয়াছে :—

(১) সম্যক দৃষ্টি—জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস।

(২) সম্যক কল্পনা—পরোপকার বিনয় ও মৈত্র।

(৩) সম্যক বচন—মিথ্যা বৃথা ও অপযশ কথা হইতে নিবৃত্তি ও সদা সত্য কথন।

(৪) সম্যক কর্ম্মান্ত—প্রাণিপাত, চৌর্য্য, ব্যভিচার মাদক সেবন হইতে নিবৃত্তি।

(৫) সম্যক অজীব—অস্ত্র বিষ মাংস ও জীববিক্রয়াদি পাপ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্তি।

(৬) সম্যক ব্যায়াম—পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্তি, শুভ চিন্তায় নিবেশ।

(৭) সম্যক স্মৃতি—যত্নে মনের পবিত্রতা রক্ষা।

(৮) সম্যক সমাধি—জীমনের পবিত্রতা দ্বারা মনের শান্তি বিধান।

এই অষ্ট সন্মার্গ হইতে দশপারমিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

(১) দান—পরোপকার প্রবৃত্তি বিনাশ।

(২) শীল—কর্ম্ম মনবাক্যে সম্যক পবিত্রতা।

(৩) নৈষ্ক্রমণ্য—পরোপকারে স্বার্থ বিসর্জ্জন।

(৪) প্রজ্ঞা—নির্ব্বাণোপযোগী জ্ঞানলাভ।

(৫) বীর্য্য—কর্ত্তব্য সাধনে সাহস অধ্যবসায়।

(৬) ক্ষান্তি—ধৈর্য্য ও ক্ষমা।

(৭) সত্য—সকল অবস্থায় সত্যপালন।

(৮) অধিষ্ঠান—মনের একাগ্রতা সাধন।

(৯) মৈত্রী—সকল জীবে অসীম করুণা।

(১০) উপেক্ষা—সুখ দুঃখে, মান অসম্মানে বিরাগ।

উপরিলিখিত কয়েকটি তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, বৌদ্ধধর্ম্মকে সুনীতি ধর্ম্ম বলিলে অন্যায় করা হয় না। পুরুষকারে মনুষ্য আপনার মোক্ষ আপনি সাধন করিতে পারে। বৌদ্ধনিদান জটিল হইলেও অষ্ট সন্মার্গ জটিল নহে। সাধন কঠোর হইলেও বুঝিতে দুরূহ নহে। এ ধর্ম্মে আড়ম্বর নাই, অমানুষী কিছুই নাই। সকল ধর্ম্মে যাহা কর্ত্তব্য বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মে যে সকল অমানুষী কথা লইয়া মতভেদ, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। সন্মার্গ সাধনে দার্শনিক বুদ্ধির, কৃচ্ছ্র সাধন বা যাগযজ্ঞ ভিক্ষা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। শীলসমাধি প্রজ্ঞাবলে পুরুষকারে মোক্ষসঞ্চয় সকলের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু সাধনের কঠোরতা অতি ভয়াবহ। অন্যধর্ম্মে দুর্ব্বলচিত্ত কাঁদিয়া অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মে দুর্ব্বল মানব অনন্যসহায় হইয়া দুর্গম গিরিপথে নিঃসম্বল পথচারী।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (৭)

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, কি তিনি নিজে সৃষ্ট হইয়াছেন? বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর না হইলে ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু আমি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, পাঠকগণ গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ভাব গ্রহণ করিবেন। সমুদ্র হইতে নানা প্রকারের (ছোট বড় মাঝারি) অসংখ্য তরঙ্গ, ফেণ, বুদ্‌বুদ্ পৃথক পৃথক উত্থিত হয়; অথচ সমুদ্রে যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু

উপাধি ভেদে ফেণ, বুদ্‌বুদ্‌ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্ত্তন আছে। ফেণ, বুদবুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতির মনে হয় যে, আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কিছুই নাই। যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে। এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু এস্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেণ, বুদবুদ প্রভৃতি যে উত্থিত হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই উত্থিত হয়। সুতরাং বায়ু সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে। এস্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইলেন? আমাদের শাস্ত্র ও বেদে সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এইরূপে বুঝিয়া লইবেন যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম এস্থলে যেন সমুদ্র, তাঁহার ইচ্ছা শক্তি (আমি বহু রূপ হইব) বায়ু, আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেণ, বুদবুদ, তরঙ্গ। স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিছুই নাই; কিন্তু উপাধি ভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয় জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে, আর পূর্ণ পরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। এইরূপ সারভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যে সকল ঋষি, মুনি, ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব? ইহার উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহা আপনারা নিজ নিজ চিরবদ্ধমূল সংস্কার, মান, অপমান ত্যাগ করতঃ বিচার করিয়া সারভাব গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন এবং জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে, এবং আপনার ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে। সমুদ্রে যেমন ছোট বড় মাঝারি নানা প্রকার তরঙ্গ, ফেণ, বুদবুদ উঠিতেছে, আবার সমুদ্রে যাইয়াই লয় হইতেছে, পুনরায় হইতেছে ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জগৎরূপ (ঋষি মুনি অবতারগণ) ফেণ বুদবুদ তরঙ্গ উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন, অনাদিকাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ও যাইবে, ফেণ বুদবুদ তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি যেমনই হউক না, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র হইতে জন্মিয়াছে ও সমুদ্রেই লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না; সেইরূপ এই ব্রহ্ম-সমুদ্রে ঋষি মুনি অবতারগণ এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী, মূর্খ পণ্ডিত, ধনী দরিদ্র, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই যেন ফেণ, বুদবুদ, তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে, লয় পাইয়াছে, জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে। ফেণ বুদবুদাদির ন্যায়, কেহই চিরকাল থাকিবে না, কেবল বিরাট ব্রহ্মই অনাদি কাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেণ বুদবুদ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটি ফেণ বুদবুদ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেণ

ও বুদবুদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না, কেন না তাহারা পরস্পর একই পদার্থ, এক হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারে। সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট বড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ ফেণ বুদ-বুদ হউক না, সমুদ্র ইচ্ছা মাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে; সেইরূপ ফেণ বুদবুদ রূপী ঋষি মুনি অবতারগণকে উপাসনা করিলে কোন ফল নাই, ও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাঁহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট হইতে সৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়; যখন তাঁহারা ফেণ বুদবুদের স্থায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে যাইয়া লয় পান, তাঁহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং উপাসনা ভক্তি করিবার আবশ্যকও নাই। কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে আমরা আমাদের ভ্রম ও অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য কাহার উপাসনা করিব? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না, তিনি অদৃশ্য মন বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয় অগোচর, আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎস্বরূপকে কোন কোন মতে জড় বলেন। সুতরাং একদিকে নিরাকারের ধারণা হয় না, সুতরাং মনে তৃপ্তি হয় না, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হলেন জড়; সুতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই, অতএব মুক্তির জন্য আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব? এ কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও গম্ভীর ও শান্তচিত্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। জড় ও চৈতন, কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা যায়। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকারের কোন সংজ্ঞা নাই। নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকার চেতনময়। জড় ও চেতন এইরূপে বুঝিতে হয় যে, যেমন তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, সুষুপ্তি অবস্থায় অচেতন বা জড়, কিন্তু জাগ্রত ও সুষুপ্তি দুই অবস্থাতেই তুমি একই পুরুষ বিদ্যমান আছ, কেবল তোমার অবস্থাভেদে চেতন ও অচেতন বলা যায়। যিনি সাকার জগৎময় বিরাট ভগবান তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণকে জড় বলেন, তিনি বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন। যদি তিনি বলেন যে, আমি জড়, তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে? যদি বল যে আমি চেতন, তাহা হইলে বল, চেতন একটা না হাজারটা? কিম্বা তুমি নিরাকার না সাকার? যদি বল যে, আমি নিরাকার, তাহা হইলে নিরাকারে জ্ঞান ও অজ্ঞানতা কিছুই নাই এবং কোন অবস্থা পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জানিতে পারিতেছ। স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তুমি প্রত্যহ পতিত হইতেছ। স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই যে অবস্থাত্রয়, ইহা সাকার ব্রহ্মে আছে, কি নিরাকার ব্রহ্মে আছে? যদি বল, নিরাকার ব্রহ্মে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা ভুল হইতেছে এবং শাস্ত্র বেদ মিথ্যা

হইবে। কেন না, কোন শাস্ত্রই এ কথা বলেন না যে,নিরাকারে অজ্ঞানতা ও অবস্থা পরিবর্ত্তনাদি আছে? যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল,তুমি সাকার কোন্ বস্তু? সাকার ব্রহ্ম ত প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন; শাস্ত্র বেদে লেখা আছে যে, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ, ইহা ব্যতীত আর সাকার ব্রহ্ম কেহ নাই ও হইবেও না। ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টা? তুমি ইহার কোন একটা অথবা সমষ্টি? যদি বল যে আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই, তখন তুমি কি? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ; আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছ, তখন তুমি কি, তাহা বল? যদি বল যে আমি এই সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তবে যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন তোমার স্থূলশরীর বিরাট ত পড়েই থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও, সে কে ঘুমায়?

আপনি যে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলেন; কিন্তু আপনি গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনি নেত্র দ্বারা যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখিতেছেন, অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা, এই ভ্রাতা, এই ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বার, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল, ইত্যাদি এবং শাস্ত্র বেদ দেখিয়া পাঠ করিতেছেন, ইহা আপনার চেতন গুণের অথবা জড়গুণের কার্য্য। যদি জড় গুণের কার্য্য বলেন, তবে অন্ধকারে (জড় গুণে) আপনার ঘরের মধ্যে কি আছে, দেখিয়া বলিতে পারেন কি? কখনই না। আর যদি বলেন যে,আপনার চেতন গুণের কার্য্য তাহা হইলে এই চেতন গুণ কাহার? আপনার নিজের অথবা অন্য আর একজনের যদি বলেন,আপনি যখন অন্ধকারে থাকেন, তখন আপনার চেতন গুণ আপনার সঙ্গেই থাকে,অথচ সে সময়ে (আপনার চক্ষু থাকিতেও) দেখিতে পান না কেন? তাহা হইলে আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা দ্বারা দর্শন কার্য্য হইতেছে, সে চেতন গুণ আপনার নহে, অন্য একজনের। এক্ষণে দেখুন যে, তিনি কে এবং কোথায় আছেন? রাত্রিতে অন্ধকারে যখন আপনি প্রদীপ জ্বালেন, তখন আপনি সমস্ত দেখিতে পান, অন্যথা নাহে। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণ দ্বারা আপনি রাত্রে দর্শন কার্য্য সমাধা করেন। দিবসে যখন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হয়েন, তখন তাঁহার প্রকাশ গুণ দ্বারা আপনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রূপ দর্শন করেন। এ স্থলে আপনার চেতন গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নির প্রকাশগুণ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছেন না। প্রকাশগুণ চেতন ব্যতীত অচেতনে কখন সম্ভবে না। যেমন নিদ্রা অবস্থায় যখন আপনি অচেতন থাকেন, তখন আপনি অন্যত্র যাইতে (প্রকাশ হইতে) পারেন না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে (প্রকাশ হইতে) পারেন, সেইরূপ চেতনগুণ না থাকিলে কখনই প্রকাশগুণ থাকিতে পারে না। যাহার প্রকাশগুণ চেতন, সে ব্যক্তিও চেতন; সে কখনও জড় হইতে পারে না। যে বস্তু জড়, তাহার গুণও জড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যখন সূর্য্যনারায়ণ ও তাহার অংশ

অগ্নির চেতন গুণ দ্বারা আপনারা ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহাকে জড় বলেন কি প্রকারে? যাঁহার গুণ চেতন হইল, তিনি কখন জড় হইতে পারেন? ইহাও কখন সম্ভব হয়? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ, জগৎ পিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা নিরাকার ও সাকার রূপে, অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। যতক্ষণ জীবের জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হয়, ততক্ষণ জগৎ ও জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে। সে যতই কেন শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কোরাণ, বাইবেল রাত্রি দিন ধরিয়া পাঠ করুক না, যতক্ষণ উপাসনা যোগ দ্বারা জ্ঞান স্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ সে নিজে জড় থাকিবে এবং সূর্য্যনারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ হইবে। যখন জীবের উপাসনা দ্বারা জ্ঞান স্বরূপ বোধ হইবে, তখন তাহার চক্ষুতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে চেতনময় বোধ হইবে। তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না। কেবল সংস্কার দ্বারা জড় বোধ হইতেছে, বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, জড় কি চেতন। আর ইহাও সত্য যে যখন জীবের তিনটী চক্ষুর, (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্বরূপ) কোন চক্ষুই নাই, তখন সে জড় ও চেতনের সূক্ষ্মতা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে? যদি জ্ঞান-নেত্র থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে নিরাকার ও সাকার চেতন স্বরূপ অখণ্ডাকার দেখিত, যদি বিজ্ঞান-নেত্র থাকিত, তাহা হইলে চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিত না, আর যদি স্বরূপ নেত্র থাকিত; তাহা হইলে আপনাকে ও পরব্রহ্মকে অভেদ চেতনরূপে বোধ হইত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

জাতীয় একতা। (৭)

আদম ও হাওয়া।

মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বিবর্ত্তন-প্রণালী, কেহ এক নরদম্পতী হইতে মনুষ্য সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করেন। যে প্রকারেই মানবসৃষ্টি হইয়া থাকুক, এই সৃষ্টি বিবরণ বহু শত বৎসর পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং উহাতে প্রচুর পরিমাণে কল্পনা প্রযুক্ত হইবে, ইহা কিছুই বিস্ময়কর নহে।

বিব্লিকবিবরণ এই;—নরদম্পতী আদম ও হাওয়া (Eve) হইতে মনুষ্যজাতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আদম শব্দের হিব্রুভাষায় অর্থ লালবর্ণ। (১) রক্তবর্ণ আদম এককই সৃষ্ট হইয়াছিলেন। সিংহ সিংহী, কপোত কপোতী প্রভৃতি ইতর জন্তু সকল যেমন যুগ্মভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল, মানবের অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। এজন্য আদম ইতস্তত সতৃপ্ত নয়নে চাহিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে ঈশ্বর তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া তদীয় পঞ্জর হইতে ঈশার সৃষ্টি করিলেন। ঈশা শব্দের হিব্রু-ভাষায় অর্থ স্ত্রী। এই আদি ঈশা বা স্ত্রীর নাম হাওয়া বা ঈব (Eve)। এই শেষোক্ত শব্দের অর্থ জগজ্জননী। (২)

(১) "This man was called Adam which in the Hebrew tongue signifies *one that is red.*" Antiquities of Jews by Flvious Josiphus translated by W. Whitson, page 29.

(২) Now a woman is called in the Hebrew tongue *Issa* but the name of this

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, ঋক্‌বেদে রুদ্র লালবর্ণাত্মক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণেও রুদ্রের যে সকল স্তব পাওয়া যায়, তাহাও রক্তবর্ণাত্মক। তবে কেহ কেহ (১) রুদ্ ধাতু (রোদনে) হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া রুদ্রের "গর্জ্জনকারী" অর্থও করিয়াছেন। সংস্কৃত রুদ্ ধাতু কিম্বা আরবিক রু ধাতু (২) ইহার কোনটী হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। সে যাহা হউক, রুদ্র শব্দের অর্থে রক্তিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই রুদ্র শব্দের একটী প্রতিশব্দ আদ্য। সুতরাং আদ্য (আদ্ম) ও আদম কি এক শব্দ ও একার্থক বলিয়া বোধ হয় না?

ঋক্‌বেদের একটী ঋকে "উমাঃ" শব্দে আমরা "পিতরঃ" অর্থ পাইয়াছি। ঐ শব্দ ঐ স্থানে পুং বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) উহার স্ত্রী এক বচনে উমা হয়। অর্থও তখন মাতা হয়। এই উমা শব্দের সহিত কি হাওয়া শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই?

"কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে। তথায় তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন, ব্রহ্মার স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন।" ঋগবেদসংহিতা (রমেশবাবুর অনুবাদ) ১ম মণ্ডল ৪৩ সূক্ত ১ম ঋকের টীকা দেখ।

জেন্দ অবস্থায় দ্বিতীয় সিরোজায় আমরা হাওমা শব্দের এইরূপ ব্যবহার পাই।

"আমরা কাঞ্চনবর্ণ সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্ঞ দান করি, আমরা হর্ষদাতা হাওমাকে যজ্ঞ দান করি, তিনি জগৎ বৃদ্ধি করিতেছেন; আমরা হাওমাকে যজ্ঞ দান করি, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন।" ১ম মণ্ডল, ১৮ সূক্ত ৪ ঋকের টীকা।

এই হাওমা শব্দ এখানে সোমার্থে। সোম শব্দ সোমলতারস ভাবেই বেদে ব্যবহৃত, তবে কোন কোন স্থানে সোম অর্থে "চন্দ্র"ও করা হইয়াছে (সায়ণ)। ভারতীয় হিন্দুর সোম (৪) ও ইরাণীয় আর্য্যের হাওমা শব্দের ভাবে যদি কতক পরিমাণেও চন্দ্রত্ব থাকে এবং আরবিক হাওয়া (উচ্চারণে হাও্বা) ও হাওমা শব্দ যদি এক মূলাত্মক হয়, তবে আদম ও হাওয়া শব্দের সহিত আদ্য ও উমা শব্দের এক সাদৃশ্য ভাব স্থাপিত হইতে পারে।

রুদ্র ও সূর্য্য এক, ইহা বৈদিক মত। রুদ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব ও আদিদেব। ইহাতে রুদ্রকে Light ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতেছে না। সম্ভবতঃ ঐ Light শব্দ রুদ্র শব্দের পারস্পরিক বিকাশ মাত্র। এই আদি আলো বা সূর্য্য ইহাই রুদ্র। ইহাই আদ্য ও ইহাই আদম। আর ঐ হাওমা (চন্দ্র বা সোম) উহাই হাওয়া বা Eve। উনি "জগৎ বৃদ্ধি করিতেছেন।" উনি আদি মাতা বা উমা।

কি মহাকবিত্ব! আকাশের দৃশ্যমান সূর্য্য ও চন্দ্র (প্রাচীন ভাষায় আদম ও হাওয়া অথবা আদ্য ও উমা) মানবের পিতা মাতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। যখন মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রকৃতিবাদী আদি জনসমাজ সূর্য্য ও চন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকে আদি পিতা মাতা বলিয়া বিবেচনা করিবেন? ডারউইন তখন জন্মেন নাই; এক ঈশ্বরের ভাবও তখন

---

woman was Eve which signifies *the mother of all living.* Ibid page 30.

(১) Muir & Maxmuller (vide notes in Rik Veda by Mr. Dutt page 105.)

(২) আরবিক রু ধাতুর অর্থ তেজ।

(৩) উমা বা যে সুহবাসো যজত্রা আয়েমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ (৩।৬।৮)

(৪) যে ভাবে সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু হইয়াছে, সেই ভাবে সোমঃ শব্দ হাওমা হইয়াছে।

উপলব্ধি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তাঁহারা জগৎবর্দ্ধনকারী সূর্য্য ও চন্দ্রদেবকে পিতৃমাতৃ স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

সায়ণ বিবৃত একটী বৈদিক উপাখ্যান সূর্য্য চন্দ্রের দাম্পত্য ভাবের কতক সমর্থন করিতেছে। রমেশ বাবু ১ম মণ্ডল, ১১৬ সূক্ত, ১৭ ঋকের টীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সবিতা সূর্য্যানাম্নী আপন দুহিতাকে সোমরাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সকল দেবই সেই সূর্য্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদের মধ্যে যে জয় লাভ করিবে, সূর্য্যা তাহারই হইবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করিলেন এবং তাহারাই সূর্য্যাকে জয় করিয়া রথে উঠাইলেন। সায়ণ।"

সোমের সহিত সূর্য্যার এই বিবাহোপাখ্যান সম্ভবতঃ আদম ও হাওয়ার বিবাহোপাখ্যানের ভগ্নস্মৃতি মাত্র। তবে বিভিন্নতা এই, বৈদিক উপাখ্যানে সূর্য্যা স্ত্রী ও সোম পুংভাবে বর্ণিত; বিব্রিক উপাখ্যানে সূর্য্য পুং এবং সোম বা হাওয়া স্ত্রী ভাবে বর্ণিত।

চন্দ্র সূর্য্যের কে উর্দ্ধে স্থিত ও অগ্রে সৃষ্ট, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল। চন্দ্রালোকের মৃদুতা বশতঃ তাহাকে আদি প্রকৃতিবাদী সমাজ সূর্য্যাপেক্ষা উর্দ্ধে স্থিত ও অগ্রে সৃষ্ট বিবেচনা করিবেন, বিচিত্র নহে। প্রত্যুত সমাজের আদি অবস্থায় এইরূপ চিন্তাই সম্ভবপর। এজন্য হাওমা (সোম) বা উমা একদা জগজ্জননী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কেন উপনিষদে যে তাঁহাকে পরব্রহ্মের প্রকৃতি বর্ণনে সমর্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাও এতাদৃশ বিশ্বাসের পরিণাম মাত্র। এজন্য কোন কোন পুরাণে আদি ঈশা উমা (হাওয়া বা হাওমা) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের প্রসবিত্রী বলিয়াও কথিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিব্রু ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দ ঈশা। এই ঈশা শব্দের ভারতীয় পুং ভাব ঈশ। সুতরাং ঈশ ও ঈশা বা ঈশানী অর্থগতভাবে আদম ও হাওয়ার সদৃশ। এই কল্পিত আদি স্ত্রী পুরুষ (ঈশানী ও ঈশ) দার্শনিকদিগের হাতে পড়িয়া প্রকৃতি পুরুষ (Matter and soul) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকারে কি বৈদিক, কি দার্শনিক, কি পৌরাণিক, সকল ধর্ম্মতত্ত্বের মূল রুদ্র ও উমায় বা ঈশ ও ঈশানীতে বিজড়িত হইয়া আছে। ইলাবৃতবর্ষীয় পেগম্বরবাদ বা প্রেরিত পুরুষবাদও উক্ত মূলকেই আশ্রয় করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক অবতারবাদও ঐ একই মূল হইতে উৎপন্ন এবং প্রেরিত পুরুষবাদের রূপান্তর মাত্র। সর্ব্বত্রই রুদ্র ও উমা কিম্বা আদম ও হাওয়া অর্থাৎ মহামহিমান্বিত সূর্য্য ও চন্দ্রের বিভিন্ন কবিত্বে মানবমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অবতারবাদ ও প্রকৃতিবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন নহে।

কেবল এও নয়, প্রায় সর্ব্বদেশীয় ইতিবৃত্ত রুদ্র ও উমা কিম্বা আদম ও হাওয়া হইতে বিনিঃসৃত। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ইতিবৃত্ত, ঈশকৃষ্ণ ও মহম্মদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আদম ও হাওয়ার বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পরমেশতত্ত্বেও যে ঈশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় * বলে, তাহাও আদ্য (রুদ্র) বা আদমাশ্রিত। এই প্রকারে *প্রায় সকল শাস্ত্রের মূলে প্রকৃতিবাদ পাওয়া* যাইতেছে।

* "সহি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ পারে ব্যবস্থিতঃ।"

হে ভগবন্ সূর্য্য ও চন্দ্রদেব! হে ভগবন্ রুদ্র ও ভগবতী উমে! হে ভগবন্ আদম ও ভগবতী হাওয়া! যে ভাষায় যে ধর্ম্মে তোমাদিগকে যে ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুক, তোমরাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিভূতি। তোমাদের যুগ্ম রূপেই ঈশ্বর দৈনন্দিন প্রকাশিত। তোমরাই জগজ্জনকজননী। ধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শন তোমাদেরই পদাশ্রিত। আমি তোমাদিকে নমস্কার করি। হে আদি পিতঃ, আদি মাতঃ, তোমাদের অপেক্ষা আর নমস্য কে?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

(প্রতিবাদ।) (১)

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "নব্যভারতে" সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটী পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি (১) নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে সাকারবাদিগণের আপত্তি খণ্ডন, (২) নিরাকার উপাসনার আবশ্যকতা, (৩) সাকার উপাসনার অসারতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমেই তিনি "নিরাকার পদার্থ আছে কি না?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজনীয়, ইহার কোনই সারযুক্ত উদ্দেশ্য দেখা যায় না। কারণ কোন সাকারবাদী হিন্দু এ কথা বলেন না যে, নিরাকার পদার্থ নাই। হিন্দুগণ যদি নিরাকার পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন, তবে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের "নিরাকার ব্রহ্ম" কোথায় পাইতেন? বস্তুতঃ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, এবং হিন্দুর উপনিষৎ হইতেই ব্রাহ্মগণের নিরাকার ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে কোন মতভেদ লক্ষিত হয় না। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর এ বিষয় আলোচনার আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে মূল যে বিষয় লইয়া গোল, নগেন্দ্র বাবু তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেন নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা লইয়া গোল চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুগণ বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না, সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য। শ্রুতি বলিতেছেন,

> যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
> তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
> যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
> তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ইত্যাদি।
> তলবকার উপনিষৎ।

অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় যাঁহা হইতে নিজ দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি উপাস্য নহেন। যাঁহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাঁহা হইতে নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি উপাস্য নহেন। * বাস্তবিক নিরুপাধি চৈতন্য

* "নেদং যদিদমুপাসতে" এই অংশের অর্থের জন্য

পদার্থ উপাসনার বিষয় হইতে পারে না। কারণ মনের অগোচর যাহা, বুদ্ধির অগম্য যাহা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যাহা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হয় ("যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" ইতি শ্রুতিঃ), ভাষা যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে অশক্ত, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি কি প্রকারে ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের প্রয়োগ হইতে পারে? বঙ্কিম বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন, "মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, আমাদের সে শক্তি নাই। (কৃষ্ণচরিত্র ১ম সং, ১৫ পৃষ্ঠা)

পাশ্চাত্যদর্শনেরও সিদ্ধান্ত এই যে, Pure Being অথবা Noumenal side of God আমাদের ধারণা হইতে পারে না, সুতরাং উপাস্যও নহে। Mansel বলেন, "Our conception of the Diety is then bounded by the conditions which bound all human knowledge, and therefore we cannot represent the Diety as he is, but as he appears to us." (Metaphysics, P. 384.) অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্গুণ অবস্থা আমাদের চিন্তার অতীত; তাঁহার সগুণ প্রকাশমান অবস্থাই চিন্তনীয়, সুতরাং উপাস্য। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রে সোপাধি, সগুণ, সাকার ঈশ্বরোপাসনার বিধান রহিয়াছে। এবং আমাদের দেশে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে বর্ব্বরজাতির পৌত্তলিকতা বা জড়-পূজা বোধে ইহার যথাসাধ্য নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এ কথা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, যীশুখ্রীষ্টকে মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা, ও প্রতিমাকে মধ্যে রাখিয়া হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যাহা হউক, ইয়ুরোপীয়জাতি সুসভ্য, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানতেজে তেজস্বী; সুতরাং তাঁহাদের কথার গুরুত্ব খুব অধিক। এক সময়ে তাঁহাদের যুক্তিতে ভারতবাসীর মন টলিয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কৃতবিদ্য ভারতসন্তান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মহাত্মা মৃত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান ছিলেন। আর কয়েক জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন দেশের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত ও স্খলিত হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রধান ছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান মিশনারিগণ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিয়াছিলেন না বটে, কিন্তু ইহাঁদিগকে তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও বর্ব্বরজাতির জড়পূজা একই জিনিষ। এই কারণে ইহাঁরা হিন্দুর দেবদেবী মূর্ত্তিকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেবদেবীর জড়মূর্ত্তির প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ ভাব, তাহা ক্রমশঃ জড় সাধারণে সংক্রামিত হইল। সেই কারণে তাঁহারা যাহা কিছু

এ স্থলে শঙ্কর ভাষ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "নেদং ব্রহ্ম যদিদমিত্যুপাধিভেদবিশিষ্টমনাত্মেশ্বরাদ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্মেত্যনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে।" অর্থাৎ লোকে যে উপাধিভেদ বিশিষ্ট আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ—যেমন ঈশ্বরাদি যে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ উপাস্যপদার্থ ব্রহ্ম নহে। এই propositionকে convert করিলে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন।

জড়সংশ্লিষ্ট, তাহাই বিদ্বেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মতে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্র বিধেয়; সাকার দেবদেবীর পূজা ঈশ্বরোপাসনা নহে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। উপনিষৎ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমর্থনোপযোগী শ্লোক সকল সংগৃহীত হইল। উপরে উদ্ধৃত তলবকার শ্রুতির "নেদং যদিদমুপাসতে।" এই অংশের অর্থ করা হইল, "লোকে কালী, দুর্গা, শিব, প্রভৃতি দেবদেবীর যে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্মোপাসনা নহে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই ঠিক ব্রহ্মোপাসনা।" * এইরূপে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই অদ্বৈতবাদসূচক মহাবাক্যের অর্থ করা হইল,ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, সুতরাং হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবদেবী ঈশ্বর নহে। † এই আন্দোলনের ফলে এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং এই সময় হইতেই জড়-ঘৃণা অনেক লোকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিল। অনেক লোকে সাকার উপাসনা ত্যাগ করিয়া নিরাকার উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্তও এই জড়-ঘৃণা অনেকের মধ্যে প্রবল রহিয়াছে, তাই নগেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন "সর্ব্বত্র তাঁহার (ব্রহ্মের) সমান অধিষ্ঠান কিন্তু সাধু ভক্তে তাঁহার উচ্চতম প্রকাশ, জড়ে তাঁহার নিকৃষ্টতম প্রকাশ। যদি তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পূজা করিতে চাও, সাধু ভক্তের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। অন্ধ হইয়া জড়মূর্ত্তির নিকট যাইতেছ কেন?"

অর্থাৎ সাধুভক্তগণ যেন একেবারেই বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পদার্থ—তাঁহাদের মায়' শরীর পর্য্যন্ত চৈতন্যে গড়া, তাঁহাদের মধ্যে একটুও জড়ত্ব নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে পূজা করিলে জড়পূজা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! * যাহা হউক, আমাদের ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে, জড়পদার্থকে একেবারে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিলে যে চলিতে পারে না, তাহা অনেক ব্রাহ্মই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য নগেন্দ্র বাবু স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড,ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।" অর্থাৎ নগেন্দ্রবাবু প্রকারান্তরে বলিতেছেন, ঈশ্বরোপাসনায় একটা জড় অবলম্বনের আবশ্যক,আমি মানি।" জড়পদার্থের অবশ্য একটা না একটাআকার আছেই। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন "নিরাকারবাদীর একটা সাকার জড় পদার্থের আবশ্যক।" কিন্তু তাহা হইলে, সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর মধ্যে প্রভেদ কি রহিল? আমি ত কিছু দেখি না। আজকাল কোন কোন ব্রাহ্ম আবার বলিয়া থাকেন, যাহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদের সাকার উপা-

* নগেন্দ্রবাবু এই অংশের অর্থ করিয়াছেন, "লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

† পণ্ডিত মাত্রেই জানেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বেদান্ত বাক্যের অর্থ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

* গত অগ্রহায়ণের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় "সামাজিক উৎকট ব্যাধি নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"প্রতিঘটে যখন ভগবান লীলা বিহার করিতেছেন, তখন, হে আত্মাভিমানি, তুমি কাহাকে বাদ দিবে? যেখানে যতটুকু সত্য পরিহার করিবে, সেইখানে ততটুকু অখণ্ড ভগবানকে খণ্ড, পূর্ণব্রহ্মকে অপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। একাধারে তাঁহার সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয় না, বিচিত্র অক্ষরে, বিচিত্র ভাবে খণ্ডাকারে হয়;সমস্ত অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া,"ঈশ্বর যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হও।" ভক্তের এইকয়েকটী কথা, "জড় কোবিয়া রোগের ঔষধ স্বরূপ পথ্য হইতে পারে॥

সমাই বিদেয়। কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, সকল লোকের মনই এরূপ অসমর্থ, তখন আমার বোধ হয়, উপাসনা বিষয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে না।

"মন নিরাকার কি না?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "মনের আকার আছে, ইহা হাস্যের কথা।" বেশ কথা। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র বাবু কোন্ অর্থে "মন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বলা উচিত ছিল। "মন" যদি পাশ্চাত্য দর্শনের mind হয়, তবে তাহার আকার বলা বাস্তবিকই হাস্যের কথা। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনের mind প্রাচ্য দর্শনের আত্মা। আত্মা চিন্ময় পদার্থ, তাহার আকার সম্ভবে না। কিন্তু হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে "মন" অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ মনকে একটী ইন্দ্রিয় ও জড়পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবন্ শঙ্করাচার্য্য "সদাচার" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

অর্থাকারা ভবেদ্‌বৃত্তিঃ ফলেনার্থঃ প্রকাশতে।
অর্থজ্ঞানং বিজানাতি স এবার্থঃ প্রকাশতে॥

অর্থাৎ—"যখন কোন বস্তু আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন আমাদের চিত্ত সেই ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা সেই বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া তাহার আকার ধারণ করে; অনন্তর সেই চিত্তে জ্ঞানরূপী প্রকাশময় আত্মপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে তাঁহারই জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহা সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যই একমাত্র প্রকাশময় পদার্থ।" (তত্ত্বকুসুমাঞ্জলী, ১ম ভাগ পণ্ডিত শশীভূষণ বিদ্যাবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ)।

উক্ত উদ্ধৃতাংশে বৃত্তি শব্দ চিত্তবৃত্তি বা মন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল, মন সাকার ও সগুণ জড়পদার্থ ও তাহা যখন যে জড়পদার্থের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার আকার ধারণ করে। সুতরাং মনের আকার আছে, ইহা প্রমাণিত হইল। আর দেখা গেল, নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত ambiguous middle এই fallacy দোষে দূষিত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

মুসলমান সাহিত্য।

(শেষ প্রস্তাব।)

মুসলমান জাতির সাহিত্য বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে আমি তাহাদের সাহিত্যের ভাব ও রুচি দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি; অদ্যকার প্রস্তাবে তাহাদের সাহিত্যের একটি মোটামুটি (সংক্ষিপ্ত) সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যবন জাতির মধ্যে একাদশ প্রকার ভাষা প্রচলিত, এই সকল ভাষা পৃথিবীর নানা দেশের এবং নানা সম্প্রদায়ের মুসলমান সমাজে কথোপকথনে এবং লিখন ও পঠনে ব্যবহৃত হয়। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, আরব্য ভাষা এই সমুদয় ভাষার মূল বা প্রকৃতি স্বরূপ। উর্দ্দু, পশ্‌তু, কুর্দ্দী, কাফিরী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভাষা যবনসমাজে প্রচলিত থাকিলেও একমাত্র পারস্য ভাষাই মুসলমান সাহিত্যের "সাহিত্য" নাম রক্ষা করিয়াছে; আরবী ইহাদের মূল ভাষা হইলেও আরব্য সাহিত্য পারস্য সাহিত্যের তুলনায় উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। কঠিনতা এবং কঠোরতা, এই

উভয় দোষেই আরব্য ভাষার প্রতি মুসলমানের ভক্তি ও আকর্ষণ টলিল; কেবল কোরাণ পড়িবার জন্যই এখন আরবীর কিয়ৎ পরিমাণে সম্মান বজায় আছে, নতুবা আরব্য ভাষার (গৌরব নষ্ট না হইলেও) বিকীরণশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইত। ভারতে সংস্কৃত ভাষার লোপ হইলেও প্রচার একেবারে বন্ধ হয় নাই; আরব্য ভাষার লোপ এবং প্রচার প্রায় দুই-ই সমভাবে ঘটিতেছে। মুসলমানের মাতৃভাষা (আরবী) সংস্কৃতের ন্যায় সুমধুর না হইলেও, পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ; ইহা বীরের ভাষা—ইহার সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব তেজে (বৈদ্যুতিক রাগে) পরিপূর্ণ। ইহা শিখিবার যোগ্য বটে। পরাধীন জাতির মধ্যে এরূপ ভাষার চর্চ্চা থাকিলে, স্বাধীনতার বহ্নি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এমন ভরসা করা যায়। ফলতঃ, আরব্য ভাষা, দুর্ব্বল, অলস, কাপুরুষ, বিলাসী বা ক্রীতদাসের ভাষা নহে, শাণিত তরবারীধারী, বীর্য্যমান, সুস্থদেহী বীরের ইহা প্রিয়ধন। আরব্য ভাষায় বহুসংখ্যক গ্রন্থ বর্ত্তমান; বিদেশের বহুসংখ্যক গ্রন্থ ইহাতে এবং অগণ্য আরবী গ্রন্থ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে ফ্রান্স দেশে আরবী ভাষার বহুল প্রচার আছে; ফরাসী জাতির প্রধান প্রধান স্থানে বহুসংখ্যক আরবী গ্রন্থ দেখা যায়। আরবী গ্রন্থের সংখ্যা আনুমানিক ১৬০০। *

আরব্য ভাষা মুসলমান সাহিত্যের মূল, যাবনিক ভাষা নিচয়ের শিরোমণি এবং বহুসংখ্যক গ্রন্থমালার প্রসূতি হইলেও, ইহাতে কেবল দুইখানি গণ্য মান্য গ্রন্থ আছে; অপরাপরগুলি "আদি" (Original) নহে, হিন্দু সাহিত্যের ছায়া বা অনুকরণ। আরব্য ভাষার অভিধান (লোগায়েদ্) সম্পূর্ণ; একখানি আরব্য অভিধান (প্রণেতা ইবন্-বিন্ নেশী) ওজনে প্রায় ৩৫ সের, মূল্য ২৭৫৲ টাকা। সর্ব্ব প্রথম পারিসে ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণ হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। আরবী ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য গ্রন্থ আল্‌কোরাণ বা কোরাণ সরিফ্; অন্য নাম ফোর্‌কাণ বা মোসাহেফ্।—ইহা জগতের এক অপূর্ব্ব পদার্থ, এক অদ্ভুত অমূল্য গ্রন্থ। ইহা পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু হিন্দু হইয়াও এই গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে পারি। এক কথায় বলিতে পারি, কোরাণ এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্মজগতে তাহার এখনও সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় নাই। যাহারা কোরাণকে "বদ্‌মায়েশের কল্পিত উপন্যাস" বলে, তাহারা রজকবাহনের সহিত সখ্যতা করিতে পারেন; ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বা সাহিত্যপ্রিয় ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল।

কোরাণের সমগ্র কঠিন ও কঠোর আরব্য ভাষায় লিখিত। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়, ব্যাকরণের বাঁধুনী খুব মজ্‌বুদ্ এবং শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতূহলময়। সমুদয় কোরাণসাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক তেজের

* Dr. Rosebeck's "Arabs and the Arabic." PP. 66-69. appendix B

লহরী ছুটিতেছে; সেই তেজে যবনজাতি এখনও বাঁচিয়া আছি। অন্যদিকে ধর্ম্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে (অর্দ্ধ লুকায়িত হইয়া) দেখা দিতেছে। এই দৃশ্য বড়ই মনোহর! ইহা বেদে বা বাইবেলে নাই।

কোরাণ ত্রিশ অংশে বিভক্ত, একটি একটি অংশের নাম "সেপারা"। * এক একটি অংশ বহুধা বিভক্ত হইয়া বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ বিচ্ছিন্নতাকে ইংরেজেরা চ্যাপ্‌টার বলেন, আমরা অধ্যায় বলি। এই চ্যাপ্‌টার ধরিতে গেলে, কোরাণে ১১৪ অধ্যায় আছে। এক একটি সেপারার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম, এক একটী চ্যাপ্‌টারেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম দেখা যায়। সমগ্র কোরাণ গদ্যে লিখিত।

* পৃথিবীর প্রায় ১৩টী ভাষায় কোরাণানুবাদিত হইয়াছে। ইংরাজিতে সেল, হুইটনী এবং মুরের অনুবাদ প্রসিদ্ধ। উর্দ্দুতে হায়দ্রাবাদের নিজাম কর্তৃক প্রকাশিত কোরাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জর্ম্মণ ভাষায় গেলজার এবং ফরাসি ভাষায় মিরটিন্ সাহেবদের অনুবাদ প্রশংসনীয়। বাঙ্গালা ভাষায় বৰ্দ্ধমানান্তর্গত রায়না গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্ব প্রথমে কোরাণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। ইঁহার ভাষা মনোহারিণী এবং অনুবাদ মূল আরব্যের সহিত একমিল হইয়াছিল; গবর্ণমেণ্ট এবং বিজ্ঞজনসাধারণ এই অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, ইহা সমাপ্ত হয় নাই। তদন্তর ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত টাঙ্গাইলের জনৈক বিদ্যোৎসাহী মুসলমান যুবক ইহার অনুবাদ আরম্ভ করেন; ঐ অনুবাদটি মুসলমানজনোচিত হইলেও তাবার মাধুর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই, অনুবাদও সমাপ্ত হইল না। পরিশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ইহার অনুবাদ ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়া ৪টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে মতামত পাঠকেরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, সুতরাং আমি নিজে কোনও অভিমত দিলাম না।—লেখক।

এক্ষণে প্রকৃতভাবে মুসলমান সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমে পারস্য ভাষার কথা কিছু বলি; ভাষা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা পারস্য ভাষা দেখাইতেছি।

বাঙ্গালা	পারস্য
তোমার নাম কি?	তোমারা নামৎ চিস্‌ৎ।
তোমার বয়স কত?	য়োম্‌রে সোমা চন্দস্‌ৎ।
এখানকার জলবায়ু ভাল।	আব্‌হাওয়া দরিন্‌জা খুবস্‌ৎ।
প্রস্রাব পরিত্যাগ করি।	সাসাকর্দ্দে বেয়াম্।
তিনি কোথায় আছেন?	য়োঃ কোজাশৎ।
দ্বার বন্ধ কর।	তাক্ বিজান্।
কবে কহিবে?	কয়্‌মে গোয়েদ্?
রাত্রি অধিক হইয়াছে।	সব্ বিযিয়ার্ দরাজাস্‌ৎ।
নব্যভারত একখানি মাসিক পত্র।	নব্যভারতই একে আক্‌বরস্ত্ দর্ হরম্ সওয়াদ্।?

বাঙ্গালা ও পারস্য শব্দ।

বালক—তিফ্‌লে।	কাষ্ঠ—রিয্।
চন্দ্র—মা।	প্রস্রাব—সাষা।
সূর্য্য—আপ্‌তাপ।	রুটি—নান।
জল—আব্।	পিপাসিত—তৃশ্‌না।
জুতা—পাপোষ।	ক্ষুধা—গোলেশ্‌না।
হস্ত—দশৎ।	ফুল—গুল্।
চক্ষু—চশম্।	চাউল—বিরিন্‌জ্।
চর্ম্ম—পোশৎ।	গোধূম—গন্দম্।
কেশ—মো।	আছে—বাসদ্।
ময়ূর—তাউশ।	চুপকর—খামোষ্।

সম্বাদ (বা মাসিক) পত্র।—আক্‌বার।
প্রয়োজনীয়-মুফীদ্। কথোপকথন—গুপ্‌ৎগু।
বস্ত্র—কিরপাষ। শ্রেষ্ঠ—সরিফ্।
শুভাগমন—তশ্‌রীফ্।

পারস্য হইতে উৎপন্ন, মুসলমান জাতির অন্যতম মহাভাষা পশ্‌তু, ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বড়ই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই ভাষার অক্ষর নাই, ইহা কেবল কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। বেলুচীস্থান, আফ্‌গানিস্থান, প্রভৃতিতে ইহাই একমাত্র ভাষা। আমাদের দেশে কাবুলিয়ানের সহিত যাঁহারা মিলিয়াছেন, তাঁহারা পশ্‌তু শুনিয়া থাকিবেন। নমুনা দিতেছি। (পশ্‌তু এখন যাবনিক-জাতীয়-সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।)

বাঙ্গালা	পশ্‌তু
জুতা	পানে
বাসন	লোথা
পক্ষি	চন্‌চনে
চাউল	রীজে
ছত্র	ছৎরয়
গোধুম	গনম্‌
চর্ম্ম	শর্ম্মণ
ব্যাঘ্র	অম্‌জরে
ভল্লুক	ইয়েগ
হস্ত	লাশ্‌
কেশ	বেক্তো
অগ্নি	য়োর্‌
কাঠ	লরগী
পৃষ্ঠ	সা
পদ	আপ্‌পা
জল	য়োবো
চন্দ্র	মেয়াসৎ
গলা	মরই
উদর	গেডা
দাড়ি	গিরা
চক্ষু	স্তিরগী
পালঙ্ক	কট্‌
ঘাঘরা	পরতুৎ
কোট্‌	খল্‌কা
বস্ত্র	খান্‌তা
রুটি	ডোডে
পরহে	
গৃহ	কোটা
দ্বার	বর্‌
কর্ণ	ঘাগ
নাসিকা	পোজা

এক্ষণে কতকগুলি বাঙ্গালা পংক্তির পশ্‌তু অনুবাদ দিতেছি।

তোমার নাম কি?	য়েস্তানু সিদে
আমার বয়স ২০ বর্ষ।	জোমা য়োমর্‌ শিল্‌ শালেদ্‌
অদ্য খুব বর্ষা	নেনু ডের্‌ বারান্দে
সূর্য্যের তেজ প্রখর	নোর্‌ ডের্‌ দে
এক মনুষ্য আসিতেছে	ইয়াও সড়ে রাজী
তুমি কোথায় যাইতেছ?	তু চর্‌তো যে
আমি পিপাসিত	জুক্ত গয়েম্‌
উনি নিদ্রিত	য়োঃ য়ুদোম্‌

যে যে স্থানে পশ্‌তু প্রচলিত, তথায় লিখন অপেক্ষা পঠনের প্রতি লোকের অধিকতর যত্ন দেখা যায়। পশ্‌তু ভাষার পরেই কুর্দ্দী ভাষার উল্লেখ করা আবশ্যক, এই ভাষা কুর্দ্দীস্থানে প্রচলিত। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী এবং খ্রীষ্টান জাতিদিগের ভাষা বামদিক হইতে দক্ষিণ হস্তের দিকে লিখিতে হয়; যাবতীয় মুসলমানী ভাষা (আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু, ইত্যাদি) দক্ষিণ হস্তের দিকে আরম্ভ করিয়া বাম হস্তের দিকে শেষ হয়। মনে কর, "শশধরের সুবিমল কিরণে মন প্রাণ বিমোহিত হইল" এই পংক্তিটি বাঙ্গালায় লিখিতে হইবে এইরূপ হইবে—

১। "শশধরের সুবিমল কিরণে
মন প্রাণ বিমোহিত হইল।"

ইহা যাবনিক ভাষায় লিখিত হইলে এইরূপ হইবে।

"ণেরকি লমবিসু রেরধশশ
"। লইহ তহিমোবি ণপ্রা নম

পড়িবার সময়ে যেমন বাঙ্গালা পড়া

যায়, সেরূপে পড়িবেন না ; বিপরীত দিক হইতে পড়িতে হইবে। কিন্তু কুর্দ্দীস্থানের কুর্দ্দী ভাষা আরও কৌতুককর, ইহা চীন ভাষার ন্যায় উপর হইতে নীচের দিকে লিখিত হয়। যথা—

শ কি বি
শ ব মো
ধ
রে ণে হি
র ম ত
স্থ
বি ন হ
ম প্রা ই
ল ণ ল।

মুসলমানদের মধ্যে কেবল এই একটি ভাষা এই নূতন রীতিতে লিখিত হইয়া থাকে। আর একটি ক্ষুদ্র ভাষা আছে, তাহার নাম কাফিরী ; ইহা শিয়াপোষ্ আখ্যাধারী (কাফির স্থান বাসী) পণ্ডিত মুসলমানগণ ব্যবহার করেন। ইহার লিখিবার প্রথা এক প্রকার চিত্র বলিলেই হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঐ পংক্তিটি যদি কাফিরী ভাষায় সুন্দররূপে লিখ, তাহা হইলে এইরূপে লিখিতে হইবে—

৪ প্রাণ

৫ বিমোহিত হইল।

পাঠের সুবিধার জন্য লেখকেরা পংক্তির প্রথমে অঙ্ক্ বসাইয়া দেয়। আর একটী ক্ষুদ্র ভাষার উল্লেখ না করিলে, প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এই ভয়ে সেটিরও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ভাষাটির নাম লশী, ইহা মধ্য আসিয়ার অতি উচ্চ শ্রেণীর যবন-পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত। লশী ভাষা, পারস্য ভাষার ন্যায় লিখিত হয় ; ইহাতে অনেক আরব্য শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে ; কিন্তু যখন বিবাহ বা কোনও সুখকর সমাচার প্রেরিত হয়, তখন লোহিত রঙ্গের মসি দ্বারা অতি অপূর্ব্ব চিত্র বিদ্যার সহায়তায় অক্ষরগুলি লিখিত হইয়া থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—* (একখানি পত্রের নবম ও দশম পংক্তি এইরূপ)

১
মী
র্
জ
তা
বোতাতী মুবশ্দ। তে জিন্ক্ খারেশ্ৎ
র
শ্
ৎ
ন বু বা হ স্ ৎ র্ দা দ্ শু ব শ্ দ রা মী র খু॥

* [illegible] খানি পত্র দেখিয়া দিতেছি। এই পদ্যময় পত্র একটী বিবাহ উপলক্ষে সুলতান সাহেব খেলাতের পদচ্যুত খাঁ মীরনুরদাদসা সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। আমি

নব্যভারতের পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, এই পত্রের সুন্দর অর্থ করিয়া লওয়া যাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। পারস্য ভাষা জানিলে এই পত্রও সহজে রীতিমত পাঠ করিয়া লওয়া যায়।

আর একটি ভাষার বিষয় লিখিলে, ভাষার কথা শেষ হইয়া যায়। যাবনিক ভাষার মধ্যে উর্দ্দু যে পরিমাণে নিত্য প্রচলিত ও আলোচিত হইয়া থাকে, এরূপ কোনও ভাষাই হয় না। ইহা ভারতের Lingua Franca অর্থাৎ সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর্দ্দু জানিলে (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত) ভারতের—আসিয়ার-প্রায় সমুদয় অংশ পরমসুখে ভ্রমণ করিয়া সাধারণের সহিত মিলিতে ও মিশিতে পারা যায়। এখনকার কালে উর্দ্দু অনেকেই জানেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃতরূপে লিখিব না। দুই চারিটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বাঙ্গালা।	বিশুদ্ধ উর্দ্দু।
শুভাগমন করুন।	তশ্‌রীফ লাইয়ে
মহাশয়ের নাম কি?	আপ্‌কা ইশম্ সরিফ্ কেয়া হ্যায়?
আমার গৃহ এই স্থানে।	মেরী গরিবখানা হিঁয়া হ্যায়।
কোথায় যাইতেছেন?	কাঁহা (বা কিধর) যাতে হো?
বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই।	এন্‌তেজাম্ পূরা ইয়া রোম্‌দা নেহী
এই চিকিৎসক এস্থানে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন	ইয়ে হকিম সাহেব ইঃ যায়গা পর্ মুশ্‌ৎ কীল্ হুয়া হ্যায়

যখন বেলুচীস্থানে ছিলাম, তখন এই পত্র দেখিয়াছিলাম।— —লেখক।

একটি বিশুদ্ধ উর্দ্দু কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইস্‌কি মাবুবে খোদা আয় দিল যিসে হাশীল নেহী।
লাখোঁ মুমীন্ হো মগর্ ইমান্ মে কামীল নেহী॥"

অর্থাৎ—খোদা (পরমেশ্বর) প্রতি যাঁহার দিল্ (অন্তঃকরণ) ইস্‌ক (প্রেম) সহিত হাঁশীল (অর্পিত) না হইয়াছে, তিনি (লক্ষগুণ গুণশালী বা তীর্থবাসী হইলেও) ইমান্‌মে (ধর্ম্মজগতের) কামীল (অধিকারী) নহেন।

উর্দ্দু ভাষা মিশ্রিত ভাষা; প্রধানত, পারস্য ও হিন্দি ভাষাই ইহার মূল। আকবরের সময়ে ইহা উৎপন্ন হয়; এ ভাষা মধুর, তেজব্যঞ্জক এবং প্রাসাদ গুণবিশিষ্ট। বিনয়, কোমলতা, মধুরতা, প্রেম, প্রণয় প্রভৃতি গুণ উর্দ্দু ভাষার সুন্দররূপে প্রকাশ করা যায়।

এক্ষণে পারস্য ভাষারূপ গভীর সাগরে অবতরণ করিতেছি। এই ভাষা প্রথমে পারস্যে সৃষ্ট হয়, এজন্য ইহার নাম পার্শী; ইহার অপর নাম "ফার্শী" অর্থাৎ সুন্দর; অন্য নাম (যাহা অতি অল্প লোকে বলে) "দিল্‌রসীনী" অর্থাৎ "মনোমোহিনী।" বালক শিক্ষার জন্য পার্শীতে যে সকল পুস্তক আছে, তন্মধ্যে সেখ সাদী প্রণীত "করিমা" (যাহার অপর নাম পান্দেনামা) অতি উৎকৃষ্ট। ইহা এক প্রার্থনা গ্রন্থ; ইহাতে বিশেষ নীতি কিছু নাই; ভাষা সুন্দর। দৃষ্টান্ত—

১। হামারা হাওয়াও হায়োশ্ সাক্‌তী।
　দমেরা মোশালে নপর্ দাফ্‌তী॥
২। চেহেল্ শাল্ রোমূরে অজিজ্ৎ গুজস্‌ৎ।
　মেজাজে তোয়াজ্ হাল্ তিফ্‌লে নিজস্‌ৎ॥'

সেখ সাদী মুসলমানের কালিদাস। ইহাঁর প্রণীত গোলেশ্‌তা এবং বোস্‌তা মুসলমান সমাজে অপূর্ব্ব পবিত্র কাব্য। সেখ সাদী মধ্য আসিয়ার কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বংশের বংশধর ছিলেন; কালপ্রভাবে

মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সীরাজ নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে এখনও সমাধি আছে। সীরাজ, পারস্যের এক প্রধান সহর। হিন্দু, মুসলমান হইলে "সেখ" উপাধিতে বিভূষিত হয়, এইজন্য তিনি সেখসাদী বলিয়া বিখ্যাত। গোলেস্তার একটি কবিতা এবং তাহার অর্থ দিতেছি।—

"সোপর্‌দম্‌ বোতো মায়ে খেশ্‌রা।
তোদানী হেশাবে কমো বেশ্‌রা॥
গুণাহে মনর্‌ না-মদে দর্শোমার।
তেরা নাম্‌ ক্যায় বুদে আমুর্‌ জেগার্‌॥"

অর্থ—"হে ঈশ্বর! আমি আমার ধন মন প্রাণ তোমাতেই সমর্পণ করিলাম, ইহার ফল কিছুই জানি না; তুমি দয়াময়; দয়ার সাগর না হইলে, পাপীগণ তোমাকে দয়ালু বলিয়া কেন ডাকিবে?"

বোস্তা হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"পর্‌রে তাউশ বর্‌ আওরাক্‌ মোসাহাক্‌ দিদম্‌।
গুফ্‌ৎমী মন্‌রলৎ আজ কদ্‌রে তোমম্‌সে বিনম্‌বেষ॥
গোফ্‌ৎ খামোশ!! হারা কশ্‌কে জমালে দারদ্‌।
হরজাকে পায়নে হদ্‌ দস্‌ৎ বদরান্‌ দশ্‌ পেশ্‌॥"

ইহার অর্থে বিশেষ চমৎকারিত্ব নাই, সুতরাং অনুবাদ করিলাম না। আর একটি সুন্দর কবিতা দেখাইতেছি—

"রাহে রাশ্‌ৎ বেরো অগর্‌চে দুরশ্‌ৎ।
জান্‌ বেওয়া মকুন্‌ অগর্‌চে হুরস্‌ৎ॥"

এই শ্লোকে দেখা যায়, সেখসাদী মুসলমান হইয়াও বিধবা বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী; গোঁড়া হিন্দু ভ্রাতাগণ বোধ হয় ইহা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবেন।

অর্থ—"সরল পথ দুর হইলেও সেই পথে চলা ভাল; বিধবা রমণী পরমাসুন্দরী হইলেও তাহাকে বিবাহ না করা ভাল।"

আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সেখসাদীর কথা শেষ করিব।

"দঃ দর্‌বেশ্‌ দর্‌ গিলিমে বখুশ্‌ পনদ্‌।
দো বাদ্‌শা দর্‌ রেক্‌লিমে না গুনজনদ॥
নীম্‌ নানে গর খোরদ্‌ মর্দ্দে খোদা।
বুজলে দরবেশা কুনৎ নীমে দিগর॥"

অর্থ—"দশটি দীনহীন (ফকির) একখানি ছিন্ন আসনে বসিয়া আরাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু একটী বিশাল রাজ্যের দুইটী অধিপতি (একত্রে এক সময়ে রাজত্ব করিয়া আরাম লাভ করিতে পারেন না।"

সেখসাদীর রুচি অপেক্ষাকৃত (তুলনায়) ভাল; তাঁহার কবিতার একটি প্রধান দোষ এই যে, তিনি বড় অনুপ্রাস (Alliteration) এবং অজীবকে সজীব করণ (Personification) প্রিয়। সেক্সপীয়রের "In maiden meditation fancy free" সদৃশ কবিতা, সেখসাদীর গ্রন্থে বহুপরিমাণে আছে। সেখসাদী, মুসলমানের ঘনরাম!! যে সকল ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী, সেখসাদীর অনুপ্রাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা উপহাসচ্ছলে প্রায়ই বলেন—

"A Bengallee Baniah Baboo of Bombay bought a Beelatee Bicyle at Mr. Borradeill's big bungalow in Byeula Bazar; the sonnetteer Sheik Shadee saw the seraftee Bicyle of Bombay and imitated the amusing alliterations of Aryan authors and put them in his peereatic poems in Persian." এ কথার কোন অর্থ নাই বটে, কিন্তু ইহাতে সেখ সাদীর অনু-প্রাসপ্রিয়তা বুঝা যায়।

মুসলমান সাহিত্যে, "তারিখ ফিরীস্তা" এখন সর্ব্বোচ্চ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা (ফেরেশ্‌ৎ) ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে আমেদনগরে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি বিজাপুরের দ্বিতীয় আমেদসা আবদালীর প্রাসাদে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। প্রায় ৩০ বর্ষকাল লিখিয়া ইহা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ডাউ (Dow) সাহেব ইহা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। "আকবরনামা" অন্যতম ইতিহাস; প্রণেতার নাম (আকবরের মন্ত্রী) আবুল্‌ ফজল্‌। ইহাতে মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগের এবং আকবরের

৪৬ বৎসর কাল শাসনের বিবরণ আছে। টাইমুর লঙ্গের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম অংশে পাওয়া যায়। তৃতীয় অংশের নাম আইন আকবরী। আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী সাহেব একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক। ইনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি মহাভারতকে পারস্য ভাষায় (আংশিক) অনুবাদ করেন। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইবন্ বাতিতা নামে এক মিশর দেশীয় মুসলমান মহম্মদ টোগ্লকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন; বাতিতা দিল্লীতে অবস্থানকালে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এক রমণীয় ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাস ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। থাপী খাঁ (অপর নাম মীর মহম্মদ খাঁ) আওরঙ্গজেবের সময়ে প্রাচুর্ভূত হয়েন, ইহাঁর বিরচিত মুসলমানজাতির ইতিহাস অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। সুলতান বাবর, বদাউনী, মোতামীদ খাঁ, নিজামুদ্দীন আমেদ, প্রভৃতি মুসলমানদের অন্যতম ইতিহাস লেখক। আন্সারী ও ফর্দ্দিসী ভাল কবি। আমীর খুশ্রো বিরচিত "বাগোবাহার" কবিত্বে পূর্ণ। ইনি বুল্বুলের প্রিয় ছিলেন। কৈকোবাদ এবং বগ্রা খাঁ এতদুভয়ের মিলন এবং খিজির খাঁ ও দেয়ালী দেবীর প্রণয় সম্বন্ধে ইনি যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। খশ্রুর "গজল্" (সংগীত-কবিতা) এক এক স্থানে অতি উচ্চ সীমায় পৌছিয়াছে। এই সকল লেখক ভিন্ন আর যে মুসলমানগণ পারস্য সাহিত্যে নাম রাখিয়া গিয়াছেন, কালে তাঁহাদের নাম লুপ্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পারস্য সাহিত্য (বা মুসলমান সাহিত্য) বলিতে গেলে উপরিউক্ত লেখক মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা যায়। যাহা হউক, মুসলমান সাহিত্যান্তর্গত ইতিহাস এবং সেখসাদীর গ্রন্থাবলী পাঠের যোগ্য।*

সমাপ্ত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

* "মুসলমান সাহিত্য" এবং "মুসলমান সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" এই দুই প্রবন্ধ (একত্রে) পুস্তিকাকারে কেহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, স্বত্ব তাঁহারই থাকিবে। লেখকের নাম দিবার আবশ্যক নাই, কেবল "নব্যভারত হইতে উদ্ধৃত" কথাটি আবরণ পত্রে ব্যবহার করিতে হইবে এবং মুদ্রাঙ্কণের জন্য নব্য-ভারত-সম্পাদকের অভিমতি আবশ্যক। নব্য-ভারত-সম্পাদক মহাশয় যদি এই প্রবন্ধদ্বয় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্বত্ব তাঁহারই থাকিবে, অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।——লেখক।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি।

১। কবিতাকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত। বাঙ্গালায় বর্ত্তমান তিনজন পুরুষ কবিদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র নীরব, নবীনচন্দ্র এখন মালাজপ আরম্ভ করিয়াছেন। যখন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণতত্ত্ব লিখিতে পারেন, তখন নবীনচন্দ্রের গীতার অক্ষর মিলান আশ্চর্য্য নহে। বরং বঙ্কিম বাবু যখন বাসরের কুৎসিৎ আমোদের চিত্রাঙ্কনে আনন্দ অনুভব করেন, তখন নবীন বাবু যে শাক্য গৌতমের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করেন, ইহা সৌভাগ্য বলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের নব অভ্যুদয়ে চন্দ্রনাথ বাবু শকুন্তলাতত্ত্ব ছাড়িয়া হিন্দুত্ব লিখিতে বসিয়াছেন। এ সময়ে হেমচন্দ্র সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রটী মাথো-

জিরাওর মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলে ভাল করিতেন। বোধ হয়, বাঙ্গালায় কবিদিগের সম্মানের পরিমাণ দেখিয়া বাঙ্গালী কবিগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন। জীবিতাবস্থায় মাইকেল দ্বারে দ্বারে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া শেষে দাতব্যচিকিৎসালয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার মরণান্তে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন, তখন রাজাবাহাদুর ও রায়বাহাদুর মিলিত হইয়া গ্রন্থ ছাপাইয়া বুঝাইতে বসিলেন যে সকলের আগে তাঁহারা মাইকেলের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা কেমন বুদ্ধিমান্! হয়ত মাইকেলের সঙ্গে তাঁহাদেরও নাম অক্ষয় হইবে, ইহার বাসনাও রাখেন। কিন্তু এই অকপট বন্ধুগণ মুমূর্ষু মাইকেলের মরণশয্যায় জলবিন্দু দিয়া তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিতে কেহ অগ্রসর হন নাই। সাধারণ বঙ্গবাসী কখন দেখে নাই কে রাজা হইল, কোন্ রাজা যাইল। যতক্ষণ হালের গরু থাকে, ততক্ষণ তাহারা নিশ্চিন্ত। বার্সেলের রাজপ্রাসাদে বা দরিদ্র চিকিৎসালয়ে কাহার অভ্যুদয়, কাহার বা পতন হয়, তাহাদের সন্ধান রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

বঙ্গে এখন তিনজন মহিলা কবি। কুমারী কামিনী সেন প্রথম, গিরীন্দ্রমোহিনী দ্বিতীয়, মানকুমারী তৃতীয়। এই তিন জন কবিকে যে কোন দেশীয় মহিলা কবির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এমনি বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, তিন জনেই একইসুর সাধনা করিয়াছেন। ভগ্নহৃদয়ের বিষাদ রবে জ্যোৎস্নাস্নাত নিশিথিনীর মত হৃদয় উদাস করিয়া দেয়। শ্রান্ত পথিক আতপতাপে বটমূলে আশ্রয় লইলে পল্লবাবৃত কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে তাহাকে চমকিত করে, সে সকল জ্বালা ভুলিয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে চাহিয়া থাকে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মে মর্ম্মে কলকণ্ঠের বিষম বিরহ-বেদনা যখন মজ্জা স্পর্শ করে, তখন জলধারা দরদর বিগলিত হয়। বঙ্গমহিলার প্রথম অভিনয় বিরহের বিজন বিথীকায়। এই করুণ রবে সল পল হইয়াছিল, দস্যু রত্নাকর বাল্মীকির অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গমহিলার উলুধ্বনি আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু ভরসা রহিল, মহিলা মহাকবি অদূরে।

মানকুমারী স্বভাব কবি। পণ্ডিত রাখিয়া কেহ ইঁহাকে লিখা পড়া শিখায় নাই। ভদ্র কায়স্থের গৃহে জন্ম, মাইকেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সাগরদাঁড়ী ইঁহার জন্মস্থান। সপ্তদশ বর্ষে ইনি বিধবা হন, এখন ইঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর। বৈধব্যের মর্ম্মযাতনার সহিত যশোহরের জল বায়ু দোষে ইনি এই অল্প বয়সে ভগ্নদেহ। কোন্ দিন বা বাঁশী নীরব হইবে! একমাত্র কন্যা প্রিয়বালা ও স্নেহময়ী জননী জগতে এখন এই দুই সম্বল। কি পিতৃগৃহে, কি বিদ্যানন্দকাটীর শ্বশুরালয়ে সর্ব্বত্র ইঁহার সৌম্য স্বভাব গুণে, অকপট স্নেহে, লোকে ইঁহাকে দেবতাতুল্য সম্মান করে। চন্দ্রনাথ বাবু ও অক্ষয় বাবু যে চিরব্রতচারিণী মূর্ত্তিমতী দয়া ও নিস্বার্থতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা মানকুমারীর প্রতিমূর্ত্তি। মাইকেলের জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ ইঁহার কথা সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন।

মানকুমারীর হৃদয় শান্তি ও করুণায় পরিপূর্ণ। শিশিরস্নাত কুসুমের ন্যায় তাঁহার পদাবলি নয়ন শীতল করে। দরিদ্রের কাতরতা, ভিখারীর দীর্ঘশ্বাস, মৃত্যুর হাহা-

কারে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় প্রসারিত করিয়া তিনি সমগ্র বিশ্ব তাহার মধ্যে পুরিয়া লইতে প্রয়াস করেন। যাঁহারা বালবিধবার চিরব্রহ্মচর্য্য বিধান করেন, একজন হিন্দু বিধবা সে সম্বন্ধে কি বলেন,সসম্মানে শুনিতে তাঁহাদের আগ্রহ হইতে পারে।

কারে গো সাজাস ভাই মুক্ত সন্ন্যাসিনী ?
না বাঁধিতে হাতে হাত, আগে 'হবিষান্ন' ভাত,
না হতে 'সম্রাজ্ঞী' আগে পথ-ভিখারিণী ?
কে তোরা হৃদয় হারা, কি বলিলি,'ধ্রুবতারা,'
পাখীরে পড়ালী কেন 'হরে কৃষ্ণ' বাণী ?
ছয় আট নয় দশে, সিঁথির সিঁদুর খসে,
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি ?
বোঝেনা যে খাদ্যাখাদ্য, 'ব্রহ্মচর্য্য' তার সাধ্য ?
না হলে থাকেনা মান, লোকে কাণাকাণি,
এই তোর শাস্ত্র তত্ব হায় অভিমানী।

একজন প্রেমিক বলিয়াছেন "যা কিছু গাহিব গান, ধ্বনিবে তোহারি নাম।" অগস্ত কোম্‌ট সংসারে তিনটি দেবতা নির্ণয় করিয়াছিলেন, কন্যা, স্ত্রী ও মা। এ পুরুষের জন্য। হিন্দু শাস্ত্রকার মহিলাদিগের জন্য পতিদেবতা নির্ণয় করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় অল্প বয়সে মানকুমারীর স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন মানকুমারীর বয়স সপ্তদশ বৎসর। মানকুমারী পতিপ্রাণা, সেই এক দেবতার উদ্দেশে তাঁহার সকল কবিতা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। তাঁহার উপাসনা সঙ্গোপনে, তিনি হিন্দুবিধবা, প্রেমময়ের চিত্রের দিকে চাহিবার সময়েও তাঁহার দৃষ্টি অধোমুখে, পাছে কেহ দেখিতে পায়, পাছে কেহ মুখরা বলে। নানা ছলে নানা বেশে তাঁহার ভালবাসার প্রকাশ হইয়াছে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাঁহার নলিনীর লাঞ্ছনা। লক্ষান্তরে ভানু জলেচ পদ্ম। পদ্ম কি বেহায়া মেয়ে, কাঙ্গালের ঘরে জন্মে, জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বান্তারি মহাদ্যুতি বিশ্বপূজিত কশ্যপেয়কে সে তার এক রতি প্রাণে বাঁধিতে চায়, দিবানিশি সেই মুখে চাহিয়া থাকে। পাঠক গ্রন্থকর্ত্রীর প্রণয়ানুরাগ বুঝিয়া লইবেন— তিনি স্বর্গের নন্দনকাননে—ইনি পৃথিবীর পঙ্কিল জলাশয়ে

নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়
পাগল পাগল পারা
ভালবেসে হল সারা
পরাণ দিয়াছে ফেলে সেই দেবতায় ;
সে যেন যোগিনী মত
ধেয়ানে রয়েছে রত
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় এই মহাসাধনায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।

গিরিন্দ্রমোহিনী বয়োজ্যেষ্ঠ, কামিনী সর্ব্বকনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠার হৃদয়ের কাতরতা নিশ্বাসে অনুভব করিতে হয়, মধ্যমার বাঁশরীর সুরে; কনিষ্ঠার অভিমানে। গিরী পূর্ব্বরাগে, কামিনী মানে, মানকুমারী বিরহে শ্রেষ্ঠ।

সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে মানকুমারী হৃদয়ের প্রসন্নতা বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যে চপলতা, কৌতুক প্রথম বয়সে সখীগণকে চমকিত করিত, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু এখনও যায় নাই। যাঁহারা এতদিন পরে বলিতে শিখিয়াছেন "না জাগিলে আর ভারত ললনা ; এ ভারত আর জাগে না জাগেনা" তাঁহাদিগকে দুটা মিষ্ট কথা তিনি যে সুরে শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা চমকিত ও পুলকিত হইয়াছি :—

কেন আর মিছা ডাক "জাগ জাগ" বলিয়া—
মড়ার উপরে খাঁড়া, দিয়ে কেন কর সারা
কেন বা শুনাতে এস "দেশ গেল বহিয়া" ?
আর কি আছে সে সাধ্য, কটি ছেলে নয় বাধ্য,

তারা হাসে আমাদের জ্ঞান কাণ্ড দেখিয়া
হায়! এ জীবনে মড়া কি করিবে জাগিয়া?

গ্রন্থকর্ত্রী একবার গঙ্গাস্নানে এ দেশে আসিয়াছিলেন, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বঙ্গমহিলা একটু ঘরের বাহিরে দেখিবার অবসর পান। সেই যাত্রায় বডি জ্যাকেট পরা গঙ্গাতীরের মেয়ে দেখিয়া তাঁহার মনে কি হইয়াছিল, তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

নুতন কথা দেখলেম হেথা, "গঙ্গাতীরে মেয়ে"
সাজা গোজা ভূতের বোঝা বেড়ান শুধুই বয়ে।
গৃহধর্ম্ম কাজকর্ম্ম মর্ম্ম নাহি বোঝেন
ষোল আনা, বিবিয়ানা তাই কেবল খোঁজেন।
সিঁথির পাশে, পেথাম ভাসে, হয়ে ময়ূর হারা
গাউন বডি, লাখ কি কোটী, দ্রোপদী বাস পরা।
চোক রাঙ্গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ছাড়েন কেকা তান
কথায় কথায় রাগের মাথায় 'সভ্য' অভিমান।
সভ্য কি সে বিলাস বিষে দেহে ধরেছে ঘুণ
নভেল নাটক, পড়ার চটক, ওইটী আছে গুণ।
ভাবেন মনে অনুক্ষণে, আকাশ পানে চেয়ে
রহুই ঘরে কেমন করে থাকে বঙ্গ মেয়ে
ভেবে এ কথা সোণার লতা হাসেন কত হাঁসি
তাদের খাইয়ে দেয় "বামুন দিদি" আঁচিয়ে দেয় দাসী।

বঙ্কিমবাবু সুজলা সুফলা নামে মাতৃভূমকে গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। মানকুমারী বাহিরের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেশীয় প্রকৃতির চিত্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন:—

"মলয়জশীতলা" সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশীলোক, বুকভরা কত শোক
নাই সুখ নাই যেন আরামের লেশ
সদা ভোগে কর্ম্মভোগ, দেহেভরা নানারোগ
বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ।

বস্তুতঃ কবিতাকুসুমাঞ্জলি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমতী মানকুমারী রোগবিমুক্তা হইয়া চিরদিন মাতৃভাষার সেবা করুন এবং তাঁহার প্রিয়বালা আয়ুষ্মতী হউন। শিবপূজা, ভাঙ্গিওনা ভুল, ভুল, নীরবে, ভুলনা আমায় প্রভৃতি কবিতা তাঁহার দেশীয় কপোতাক্ষের ন্যায় চিরদিন বঙ্গদেশ স্নিগ্ধ করিবে। চিরদিন তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় তাঁহাকেও

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডপে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। জ্ঞান-মুকুল।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত, মূল্য।০। ব্রাহ্মমিশন প্রেস। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্কুলের ছাত্রদের ত কথাই নাই, আমাদের বিবেচনায়, অনেকের অনেক জানিবার বিষয় ইহাতে আছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাঠ্যপুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই দেখিয়াছি; কি লেখা, কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি ছাপা, কি চিত্র, সবই অতি সুন্দর। কোন কোন চিত্র এত সুন্দর হইয়াছে যে, অবাক্ হইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং ভাবিয়া মোহিত হইতে হয়, এ দেশের শিল্প-নৈপুণ্যের এত উন্নতি হইয়াছে। ছাপা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বলিতে ইচ্ছা হয়, এরূপ উৎকৃষ্ট ছবিছাপা বাঙ্গালীর কোন প্রেসে দেখি নাই। লেখা প্রাঞ্জল ও মধুর, রুচি মার্জ্জিত, বিষয় নির্ব্বাচন বৈচিত্র্য পূর্ণ। এ পুস্তক যে এ দেশে খুব আদৃত হইবে, আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় শেষ লেখাটী—আশাবাহিনী ইহাতে না থাকিলেই ভাল হইত। ইহা যেন medical advice gratis এর মত।

২। মনোহর পাঠ।—শ্রীহরনাথ বসু, মূল্য।৴০, হেয়ার প্রেস। এখানিও পাঠ্য পুস্তক। এখানিও ভাল। কিন্তু বলিতে হইতেছে, জ্ঞান-মুকুল হইতে ইহা সকল বিষয়েই কিছু নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জ্ঞান-মুকুল পাওয়ার পূর্ব্বে ইহা পাইলে অনেক প্রশংসার কথা বলিতাম। উভয় পুস্তকই একপ্রকার ছাঁচে ঢালা,—লেখা প্রাঞ্জল, রুচি মার্জ্জিত, চিত্র পরিষ্কার। প্রথম অধ্যায়ে নীতিকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাজন কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণিকথা, চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষিকথা আছে। আমাদের বিবেচনায়, পঞ্চম অধ্যায়ে বস্তু কথা কিছু থাকিলে ভাল হইত। এ পুস্তকও স্কুলের পাঠ্য হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী।

একাদশ খণ্ড—দশম ও একাদশ সংখ্যা। মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "বণিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬ই ফাল্গুন, ১৩০০।

[ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩] [এই সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা।

১। মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা চৈত্র সংখ্যায় সংলগ্ন হইবে।

২। বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া এখন কিছু কিছু মূল্য পাঠাইয়া উপকার করিলে একান্ত বাধিত হইব।

৩। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন।

কাল-মাহাত্ম্য।

দর্শনকারেরা কালের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঘটনার পর ঘটনা, তাহার পরে ঘটনা, তাহার পরেও ঘটনা, এইরূপে ঘটনা পরম্পরার অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। একটী ঘটনা হইতে অপর একটী ঘটনার ব্যবধানের নাম কাল। ঘটনা ছাড়া কাল কিছুই নয়। ঘটনা না থাকিলে, কাল, এই কথাটারই সৃষ্টি হইত না। সূর্য্যের উদয়াস্ত, এই দুই ঘটনার ব্যবধানের নাম দিনমান। আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে, কাল শুধু একটী স্মৃতি। সূর্য্যাস্তের সময়ে সূর্য্যোদয়ের কথা মনে জাগে বলিয়াই, দিন নামক একটী দীর্ঘ-কালের অনুভব করি। অনেকক্ষণ খুব গাঢ় নিদ্রা দিয়া উঠিলে, মেঘান্ধকারের দিনে, সময় সময় বিকালকে সকাল বলিয়া মনে হয়। গাঢ় অন্যমনস্কতার সময় অতি সুদীর্ঘ কালকে সামান্য বলিয়া বোধ হয়। আবার দুঃখাদির সময়ে যখন কালের উপরে অর্থাৎ দুঃখারম্ভরূপ বিগত ঘটনা হইতে দুঃখান্তরূপ ভাবী ঘটনার ব্যবধানের প্রতি বড়ই মনোযোগ হয়, তখন কালকে অত্যন্ত লম্বা বোধ হইতে থাকে। এই জন্যই "দুঃখের রাত পোহায় না" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাক্, স্থূলকথা, দার্শনিকেরা কালটাকে কিছুই বলিতে চান না।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বোধ বা গতি দর্শনাপেক্ষা কবিত্বের দিকেই প্রবল। জ্যোতির্ব্বিদের চক্ষে যে চন্দ্র একটী জল বায়ু-শূন্য মরুমাত্র, মানুষ তাহাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে সুধাকর বলে, প্রেয়সী ও প্রিয়তমের মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করিয়া নর নারী অপার আনন্দ ভোগ করে, প্রাণের আবেগ প্রশমিত করে। পিপাসু ব্যক্তি, শীতল জল পান করিবার সময় জলজান ও অম্ল-জানের মিশ্রণোৎপন্ন কোন একটা যৌগিক পদার্থ পান করিতেছে, মনে করে না। কাল সম্বন্ধেও এই কথা। দার্শনিক যে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কবি সেই কাল লইয়া কালী এবং মহাকাল মূর্ত্তি রচনা করিয়া চমৎকারিত্বের একশেষ দর্শন করিয়াছেন। কালই, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। কালই স্রষ্টা, কালই পোষ্টা, কালই সংহার-কর্ত্তা। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন করে কাল, অঙ্কুরকে ফল-ফুল-পল্লব-ভূষিত বৃক্ষ করে কাল, বৃক্ষকে জ্বলন্ত চুল্লিকার ইন্ধন করে কাল।

আমরা বাহ্য জগতের উপরেই কালের প্রভাব সহজে অনুভব করিয়া থাকি। শিশু যুবা হইল, যুবা বৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধ শ্মশানে মিশিল, অবশেষে কাল তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিল, এইরূপে মানব-সৃষ্টি-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। এই হাসি, এই কান্না। সকালে দেখিলাম, ওয়াটার্লুর রণাঙ্গনে বীর-কেশরী সগর্ব্বে ব্যূহ ভেদ করিতেছেন, বিকালে তিনি পলায়মান, দশ দিন পরে দেখিলাম, সেণ্ট্ হেলেনায় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ। ইনিই না আল্‌প্‌সের তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গকে পদদলিত ক্ষুদ্র বল্মীকবৎ তুচ্ছ মনে করিতেন? ইঁহারই না প্রতাপে পৃথিবী কাঁপিতেছিল? মেষরক্ষক দরিদ্র বালক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বিজয়ী সম্রাট্ হইল। আজ ডেবিড্ বা দাউদের প্রশংসায় মানবেতিহাস বিভূষিত। আজ ভূপাল, কাল কাঙ্গাল,

কাল রাখাল আজ ভূপাল, কালের ইঙ্গিতে মানবভাগ্য সর্ব্বদা এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

জড়জগতে এ প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। বনে নগর বসিতেছে, মহানগরী বনে ঢাকা পড়িতেছে, নদী শুকাইয়া ক্ষেত্র হইতেছে, ক্ষেত ভাঙ্গিয়া নদী বহিতেছে। সুন্দরবনের বাদা আজ সিটি অব্ পেলেসেস্ (City of Palaces), কিন্তু বাঘের ভয়ে সপ্তগ্রামের ভগ্নদৃশ্য কেহ দেখিতে চায় না। যুগে যুগে ধরা নবীন বেশ ধারণ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ কালমাহাত্ম্যকে অন্য ভাবে দেখিয়াছেন। জনসমাজের উপরে কালের প্রভাব অতি ধীরগামী। বহুশত বর্ষে সমাজসাগরের এক একটী তরঙ্গের উত্থান পতন হয়। জাতীয় প্রকৃতির একটী ভাবের উন্মেষ হইতে সহস্র বৎসর অতীত হয়। আর্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান মানব সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কালের আয়তনকে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির উপরে কালের আধিপত্য অনিবার্য্য। কাল কুম্ভকারের চক্র বা চিত্রকরের তুলিকা, জীব ঘটপটের মত। কাল যে ভাবে পড়ে, জীব সেই ভাবে গঠিত হয়। জীবের সমগ্র প্রকৃতি যুগমাহাত্ম্যের অনুযায়ী। কলিতে সত্যের প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের এবং সত্যে কলির প্রকৃতি বিশিষ্ট জীবের বর্ত্তমানতা সম্পূর্ণ সম্ভাবনার অতীত। আর্য্য ঋষিগণ বাহ্য জগৎকেও এইরূপ কালাবর্ত্তের বহির্ভূত মনে করেন নাই। এক কথায়, কাল তাঁহাদের মতে বিধাতার প্রতিনিধি স্বরূপ, অথবা স্রষ্টার হস্তের প্রত্যক্ষীভূত নির্ম্মায়ক যন্ত্র। ঘটনা কালের দাস। কালই প্রকারান্তরে অদৃষ্টলিপির লিখক। পূর্ব্বকালে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল সভ্যজাতিই কাল-মাহাত্ম্যের অনিবার্য্যতা স্বীকার করিত। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের মত কালের এতাধিক উচ্চ মাহাত্ম্য অপর কোন দেশের লোকই স্বীকার করে নাই।

এখনকার ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে বলেন, কালকে কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনাই মানব মহত্ত্বের পরিচায়ক। বুদ্ধ, মুষা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এইরূপে শত শত ভবিষ্য বর্ষকে কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ধরার যুগান্তর ঘটাইয়া গিয়াছেন। হার্বাট স্পেন্সার-প্রমুখ পণ্ডিতদিগের এই মত।

মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটী মত আছে। জনসমাজের দুর্গতি দূর করিবার জন্য সময় সময় ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, অথবা কোন বিশেষ আত্মাকে প্রেরণ করেন। এইটী প্রথম মত। ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে যেমন আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হয়, মহাপুরুষগণও তদ্রূপ জনসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াবিশেষের ফল মাত্র। আবর্জ্জনা পচিলে সময়ে যেমন গ্যাস্ জ্বলিয়া আলেয়াগ্নি উৎপন্ন হয়, দুর্গতিসম্পন্ন সমাজের চরম দুরবস্থার পরে প্রাকৃতিক শক্তি প্রভাবেই সেইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এইটি দ্বিতীয় মত। আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন দলের লোকেরা প্রথম মত এবং কোন দলের লোকেরা দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। এই মত দুইটীর কোন একটী স্বীকার করিলেই যে কাল-মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয়, তাহা বাহুল্যরূপে বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁহারা কালকে মানব শক্তির অধীন বলেন, তাঁহারাও এই মত দ্বয়ের কোন না কোন একটী পোষণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের এক মত অপর মতকে খণ্ডন করিতেছে।

যে যাহা বলুক, মানবজাতি চিরদিন কালের আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সভ্য মানবসমাজের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এ কথার প্রমাণ দিতেছে। কাল প্রভাবে একই প্রণালীতে ক্রমে সকল সমাজেরই আচার ব্যবহার রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের মিলন জনসমাজের একটী অতি প্রধান ব্যাপার। বেশী কথা না বলিয়া, শুধু এই প্রথা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। মহাভারতাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে দাম্পত্য সম্বন্ধের এত কড়াকড় নিয়ম ছিল না। ঋতুমতীর ঋতু রক্ষা একটী ধর্ম্মকার্য্য ছিল। ইহাতে স্ব-স্ত্রী পর-স্ত্রীতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত বিবাহ-প্রথার ঘোর বিরোধী। মুষার পূর্ব্ব সময়ে মিসর, বেবিলন, প্যালিষ্টন প্রভৃতি দেশেও এইরূপ বিবাহপ্রথার শিথিলতা ছিল। বাইবেলের ইতিহাসে এজরাইল বংশের আদিম বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে বাকল সাহেব লিখিয়াছেন;—"এক সময়ে স্পার্টার বীরগণ ক্রীট্ দ্বীপ অবরোধ করিয়া তথায় বার বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে দেশ ভাবী বীরবংশে ও লোক সংখ্যায় হীন হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা, দেশীয় যুবতীদের গর্ভে স্বেচ্ছা ক্রমে সন্তানোৎপাদন জন্য আপনাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশৎ বলিষ্ঠ যুবাপুরুষকে স্পার্টায় প্রেরণ করিয়া দিলে সেই প্রেরিত যুবাগণ তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল।"

মানুষ চিরকাল কালের পায়ে মাথা নোয়াইয়া আসিতেছে। কাল যাহা বলে, মানুষ তাহাই করে। প্রতি দশ বৎসরে হিন্দুর হিন্দুয়ানি নবীন আকার ধারণ করিতেছে। কেন? শুধু কালের তাড়নায়। কালের ভাব অতিক্রম করিয়া কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত উন্নতির পথগামী হইতে পারে নাই। এই বন্দুক কামানের দিনে যদি তুমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সমরে নাম, নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। এখন আর ধনুর্ব্বাণের কাল নাই, বন্দুক কামানের দিন। এখন যুদ্ধে জয় চাও ত ধনুক রাখিয়া বন্দুক ধর। ভাবিয়া দেখিলে, সব বিষয়েই এইরূপ করা বিধেয় বোধ হইবে। আর্য্য ঋষিগণও এই জন্য কলিতে কলির ভাবই রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ভাব অবলম্বন করিতে বলেন নাই। শরীর মনের প্রকৃতি এবং বাহ্যশক্তির পার্থক্য প্রদর্শন দ্বারা তাহা অসম্ভবপর প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাল, কে বলে তোমাকে অস্তিত্বহীন? কে বলে তোমাকে শুধু আকার-হীন ঘটনা, জলীয় ছায়া? যে বলে বলুক, মানুষের প্রাণ তাহাতে কখনও সায় দেয় নাই, দিবেও না। যাহাকে তুমি কুসুমকোমল কোলে স্থাপন করিয়া আদর কর, পলকে তাহার কৌপীন রাজবেশে পরিণত হয়,—শীতাতপক্লান্ত শূন্য শিরে স্বর্ণমুকুট শোভে, মুকুটে মাণিক জ্বলে। আর বজ্র-নির্ম্মিত জ্বলন্ত অঙ্গুলে একবার যাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছ, সে হায়—হায়—করিয়া, সুখ শান্তির জন্য চীৎকার পূর্ব্বক মৃত্যুকে ঘন ঘন আহ্বান করিতেছে। হা কাল—হা কাল—, তুমি দয়ালু, তুমি নিদারুণ।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভিক্ষাবৃত্তি।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত আছে। ভিক্ষার প্রয়োজনও আছে। যখন লোক নিজ ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে প্রকৃত পক্ষে অপারক হয়, সৎপথে থাকিয়া শত চেষ্টা করিয়াও জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান জুটাইয়া উঠিতে পারে না, এমতাবস্থায় তাহার পরের দয়ার প্রতি নির্ভর না করিয়া উপায় কি? এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ শ্রেয়। জগৎপিতা মনুষ্যের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ দিয়াছেন, ইহাদের অবশ্যই সার্থকতা আছে। নিঃস্ব, রোগগ্রস্ত, কার্য্যাক্ষম, দুর্দ্দশাপন্ন কত লোক আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যাঁহারা দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। পরদুঃখ বিমোচনের সুযোগের অভাব নাই। কিন্তু দান করিতেও বিচারের প্রয়োজন। পাত্রাপাত্র ভেদে কেবল দান করিলেই পরোপকার হয় না। কতকগুলি দান আছে, তাহাতে সমাজের, পৃথিবীর, অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন;—
'There are a few of the administrative functions of Government for which a person would not be fit, who is fit to bestow charity usefully.' (Subjection of women)

যাহারা দান করিয়া প্রকৃত উপকার করিতে পারে, তাহারা শাসন কার্য্য প্রভৃতি কঠিন কার্য্য করিতেও সক্ষম। অতএব দেখা যায়, মিলের মত পণ্ডিতের মতে বিচার করিয়া দান করা একটা দুরূহ কাজের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ভিক্ষুক আছে। সুস্থ, সবল, কার্য্যক্ষম অনেক লোক নিশ্চিন্ত মনে, স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে, সুখ-স্বচ্ছন্দে, সাধারণের স্কন্ধে চাপিয়া দিনপাত করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকের দুর্ভিক্ষে ভয় নাই; জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তাহারা একবারও ভাবে না। আমাদের সমাজে ইহাদের প্রতি বিশেষ সামাজিক নিগ্রহ আছে, এইরূপও বোধ হয় না। পরন্তু অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ইহারা আবার সম্মানিতও হইয়া থাকে। 'বৈরাগীঠাকুর,' 'ফকির সাহেব' উল্লিখিত প্রকার ভিক্ষুকের উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে অনেক দুশ্চরিত্র লোকও আছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে, অধিকাংশ 'বৈরাগী' (?) সর্ব্বপ্রকার আসক্তির দাস হইয়া, নির্ব্বিবাদে প্রকাশ্যভাবে পাপাচরণ করিবার জন্যই 'বৈরাগী' নাম ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা পবিত্র বৈরাগ্য ধর্ম্ম এইরূপে কলঙ্কিত করে, ধর্ম্মের নামে যাহারা অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের, সমাজের প্রতি, সাধারণের প্রতি, কোন প্রকার দাবি আছে কি? ইহাদিগকে উৎসাহিত করা সমাজের উচিত, না, ইহারা আর সমাজের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করা বিধেয়? দেশ নানারূপ দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত; এমতাবস্থায় সুস্থকায়, সবল, দুশ্চরিত্র অলস লোকদিগকে সমাজের পালন করিতে হইলে দেশের দুর্গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে।

এই স্থলে আর এক শ্রেণীর লোকের কথা বলিব। অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা মনে করেন, সমাজের প্রতি তাহাদের একটা স্বাভাবিক দাবি আছে। যাঁহারা

সুপণ্ডিত ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের হিন্দু-সমাজের প্রতি দাবি থাকিতে পারে। কিন্তু যাহারা কেবল নামে ব্রাহ্মণ, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নামের কলঙ্ক, তাঁহাদিগকে সমাজ কেন প্রতিপালন করিবে? অল্প কতক দিন হইল আমাদের নিকট একটী ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া ঋণী হইয়াছেন, কাজেই ভিক্ষার প্রয়োজন। ছেলের বয়স আঠার বৎসর, কন্যার বয়স দশ বৎসর। তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না, 'বাপু তুমি আমোদ আহ্লাদ করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিলে, পুত্রবধূ ও জামাতার মুখ সন্দর্শন রূপ আনন্দ উপভোগ করিলে, আমি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়াছি, তাহাতে তুমি ভাগ বসাইতে আসিলে কেন?'

বিক্রমপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি, শ্রীহট্ট হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ (গলায় পৈতা আছে এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়) আসিয়া বাসা করিয়া থাকে। তাহারা ভিক্ষা করিয়া প্রচুর চাউল সংগ্রহ করে এবং বৎসরান্তে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা লইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্রাহ্মণগুলি প্রায়ই সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ, লেখা পড়ায় সরস্বতীর বরপুত্র। এই অলস লোকগুলি সমাজের উপর টেক্স বসাইয়া কেন বাস করিবে? আমরা টেক্স টেক্স বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, এই সকল টেক্সের কথা একবার ভাবি কি? যে কারণেই হউক, আমরা একেবারে স্বাবলম্বন হীন হইয়া পড়িয়াছি; আমরা গগনভেদী চীৎকার তুলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে জানি। দুর্ভিক্ষ হইল গবর্ণমেণ্ট বসিয়া করেন কি? সকল দোষগুণই যেন কেবল শাসন প্রণালীর, আমাদের কিছুই নহে। এইরূপ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। হারবার্ট স্পেনসর লিখিয়াছেন;—'In each such mind there seems* to be the unexpressed postulate that every evil in society admits of cure; and that the cure lies within the reach of law.'

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিষয় গুলি তলাইয়া দেখা উচিত। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপদ্রব কি কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষে হয়, না অন্য কোন কারণও আছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে ভাল করিয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। এমতাবস্থায় এক শ্রেণীর লোক যদি অলস থাকিয়া কেবল আহার্য্য বস্তুর ধ্বংস এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তবে কালে আরও দুঃসময় উপস্থিত হইবে। কেবল জাতির গৌরব করিয়া বসিয়া থাকার সময় চলিয়া গিয়াছে। জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত। আমাদের দেশে এখনও বিস্তর অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকলের চাষাবাদের প্রয়োজন হইয়াছে। যে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, তাহার নিকট অনেক পথই খোলা আছে। পাত্রা পাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করায় জাতীয় মনুষ্যত্বের হানি হয়, আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং নরনারীকে পরিশ্রমের গৌরব শিক্ষা না দিয়া নীচ ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ "জীবনের ভার" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যে অলস, সে সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে, দূরে থাকুক, ব্যাধিজীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সে সমাজের কণ্ঠে বিল-

স্থিত রহে, এবং তাহার ভারবহন রূপ অনাবশ্যক কার্য্যেই সমাজ অকারণে ক্ষীণবল হইতে থাকে। * * * "তুমি কে যে তুমি আলস্যের পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বৃথা হাস্য পরিহাসে সময় পাত করিবে; আর আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করিব? তুমি কে যে তুমি বিলাসের পুষ্পিত আবরণে অঙ্গ ঢালিয়া বিরহ বিলাপে বসিয়া থাকিবে; আর আমি গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে তোমার জন্য পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব? হউক তোমার নাম হস্ত, আর আমার নাম পদ, অথবা তোমার নাম কেশ আর আমার নাম নখ; কিন্তু তুমি আমি উভয়ই যখন সমাজের অঙ্গ, তখন তুমি হস্ত কিম্বা কেশের কার্য্য না করিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখের কার্য্য সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহাতেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কি সংকুলন হয় না, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

আর একটী বিখ্যাত সঙ্গীত।

GOD SAVE IRELAND.

(অনুবাদ।)

(১)

অতি উচ্চে ফাঁসি-তরু-শির দেশে
মহামতি বীরত্রয় ঝোলে ফাঁসে।
অত্যাচারী প্রতিহিংসা তৃপ্তি তরে
বধিল পরাণ যৌবনের ঘোরে।
তারা কিন্তু সবে স্বজাতি প্রখ্যাত
বিক্রমের সহ শত্রু সম্মুখিল।
অতি সুনিশ্চিত মরণেরি ভিতে।
নির্ভিক পরাণে সবে আগুইল।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—বীরেরা কয়।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সকলে গায়।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে
'মরেনা যেখানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(২)

চৌদিকে বেষ্টিত ক্রুর শত্রুদলে;
সগর্ব্বে তবুও সাহস উথলে।
কেমনা অন্তরে ভেবে ছিল তারা
সে সবার কথা ভালবাসে যারা—
দূরে বা অদূরে বিশ্বস্ত সাহসী
লক্ষ লক্ষ প্রিয় সুহৃদ হিতৈষী
বীচি-সঙ্কুল জলধি পারে, আর
চির প্রিয় পুণ্যভূমি আয়র্লণ্ডে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সদর্প রবে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—ফুকারে সবে।
বধ্যমঞ্চ পরে, কিংবা রণস্থলে
'মরিনা যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(৩)

সধীরে আরোহী সোপান বন্ধুর
তুলিল গম্ভীরে প্রার্থনার স্বর।
ইংলণ্ডের মৃত্যুপাশ পরি গলে,
দাঁড়ায়ে সবাই ফাঁসি তরু তলে;
সোদর স্নেহে চুমিল পরস্পরে।
স্বদেশ স্বধর্ম্ম স্বাধীনতা তরে
অটল রাগ মরণেরও কালে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—বর যাচিল।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সবে বলিল।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে,
'মরিনা যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(৪)

স্বদেশের তরে যে বীর প্রাণ
এইরূপে করি জীবনদান
গেলরে চলি ; বিনা শেষ দিন
লয় না পাইবে কভু তাহাদের স্মৃতি।
কিন্তু এ উদ্দেশ্য ততদিন রবে
আনন্দে সম্পদে কিংবা বিপদে
যত দিন এই, এই ক্ষুদ্র দ্বীপে
না করি স্বাধীন না করি মহৎ জাতি।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সদর্পে বলি।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সকলে গাই।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে,
'মরি না যেখানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

উপক্রমণিকা।

ফরাসী 'মার্শেয়েঝ,' ইংলিস 'রুল ব্রিটানিয়া' বা 'গড সেভ দি কুইন'র ন্যায় 'গড সেভ আয়র্লণ্ড' একটি জন-সাধারণ-প্রিয় আইরিস জাতীয় সংগীত। দেশ কাল ও জাতিগত বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত জাতীয় সংগীত গুলি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ভাবাত্মক ; কিন্তু প্রত্যেকটি একই উদ্দেশ্যমূলক। স্বদেশের হিত সঙ্কল্পে স্বদেশ-বৎসল সুকবি এক এক সময়ে সমগ্র জাতির অস্ফুট মনোভাব কবিতার ছন্দে পরিব্যক্ত করেন। মাধুরীময় কবিতার ছন্দ বিন্যাসে জাতীয় ভাব লিপিবদ্ধ হইয়া বংশ পরম্পরা চলিয়া যায়। এক একটি সংগীতে সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশবাসীর এক এক সময়ের বিশেষ বিশেষ মনোভাব বা অবস্থা সন্নিবদ্ধ থাকে বলিয়া, জাতীয় সংগীত, স্বভাবতঃই প্রত্যেক জাতির অতীব আদারের, সম্মানের ও গৌরবের সামগ্রী।

আমরা বলিলাম, 'গৌরবের' সামগ্রী। ইহা সকল দেশের পক্ষে অথবা সকল সংগীতের পক্ষে প্রয়োজ্য না হইতে পারে। যেখানে কোন স্বাধীন জাতির সংগীতে জয়োল্লাস, কীর্ত্তি কলাপ ঘোষণা, সুখ শান্তি, বীরত্ব বর্ণনা থাকে, সেখানে নিশ্চয়ই সে সংগীত 'গৌরবের সামগ্রী'। কিন্তু যেখানে পরাধীন জাতির সংগীতে দুঃখ বিষাদের আর্ত্তরব নিনাদিত হয়, অত্যাচার, নির্য্যাতনের নিদারুণ মর্ম্মপীড়া কবিতাচ্ছন্দে গীত হয়, রুদ্ধ ক্রোধ, অতৃপ্ত প্রতিহিংসা ও ভগ্ন-আশার ভাব যুগপৎ উচ্ছ্বাসিত হইতে থাকে, সেখানে জাতীয় সংগীত নিশ্চয়ই গৌরবের নহে। কিন্তু উভয় স্থলেই উহা যে গভীর আদর ও সম্মানের সামগ্রী, তাহা অবিসম্বাদিত। সকল সময়ে সকল জাতির অদৃষ্টে গৌরব গান ঘটে না। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় জাতি বিশেষের অদৃষ্ট-চক্রও সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, শান্তি অশান্তি, প্রাচুর্য্য অভাব, অধীনতা স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। সুতরাং যদি কোন দেশের জাতীয় সংগীতের মধ্যে আমরা দেখি যে, পাশাপাশি গৌরব-গান ও বিষাদ-গান অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

আমাদের অনুবাদিত সংগীতটি আইরিশ কীর্ত্তি কাহিনী পরিজ্ঞাপক নহে। গভীর, অতি গভীর—বিষাদের গান, এই আইরিশ জাতীয় সংগীতটি। আনন্দ উল্লাস অপেক্ষা দুঃখ বিষাদ অধিকতর সংক্রামক। বোধ হয়, তাই এই বিষাদ সংগীত, এই গভীর মর্ম্মদাহী আর্ত্তরব ভিন্ন জাতির প্রাণেও সমবেদনার তরঙ্গ উত্থিত করে।

খ্রীঃ ১৮৬৭ অব্দে নবেম্বর মাসে এন্সেন,

লার্কিন, ওব্রায়েন নামক তিন জন আইরিশ ফিনিয়ান, পুলিশ সার্জ্জণ্ট বেটের প্রাণ বধ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সংগীতটি ইহাদের উদ্দেশে রচিত। টিমথি, ডি, সলিভান এই সংগীতের রচয়িতা।

আইরিশ 'ফিনিয়ান' পদটি বোধ হয় সকল পাঠকের নিকট সহজ-বোধ্য হইবে না। আমরা তাই ইহার অর্থ একটু খুলিয়া বলিলাম। খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে যখন ইউনিয়ন একৃট দ্বারা আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযোজিত হয়, সেই অবধি ইহার স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের স্বাধীনতা লোপ হইয়া গিয়াছে। হৃতস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার বাসনায় অন্যুন শত বর্ষ ব্যাপিয়া স্বদেশ-প্রাণ আইরিশ ধুরন্ধরগণ নানারূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে গুপ্ত সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশময় বিদ্রোহানল পরিব্যাপ্ত করিবার চেষ্টাও একটি। অন্যান্য গুপ্ত সভার মধ্যে ফিনিয়ান সভা তদানীন্তন শাসন কর্ত্তাদিগের বিশেষ ভয় ও উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্ট দুই বা তিন শতাব্দীতে আইরিশ জাতীয় সৈন্যদিগকে উহাদের অধ্যক্ষের নামানুসারে Fiana Erion অর্থাৎ Fenians বলা হইত। (অধ্যক্ষের নাম ছিল Fenius) ফিনিয়ান গুপ্ত সভার অধিনেতা, সেই প্রাচীন নামে এই সভার নামকরণ করেন। ইহা হইতে প্রত্যেক সভ্যকে ফিনিয়ান বলা হয়। ফিনিয়ান গুপ্ত সভার প্রত্যেক সভ্য বিদ্রোহিতার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে প্রতিশ্রুত। প্রত্যেক ফিনিয়ান্ গুপ্তভাবে এক সৈনিক পুরুষ। ফিনিয়ান সম্প্রদায় বিদ্রোহ সংঘটনেচ্ছু গুপ্ত সেনাদল। সুতরাং ফিনিয়ান্স্ বলিলে এই বুঝিতে হয় যে—যাহারা এই সভার সহিত এক উদ্দেশ্যে স্বদেশের উদ্ধার বাসনায় বদ্ধপরিকর এবং অস্ত্রধারণ করিয়া দেশের জন্য প্রাণদানে কৃতসংকল্প ও প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, এইরূপ গুপ্ত, অবৈধ, অন্যায় ও অবিহিতরূপে দেশোদ্ধার মন্ত্রণায় যোগদান করিয়া অনেক সহস্র সহস্র আইরিশ যুদ্ধে, বধ্য মঞ্চে, কারাগারে, অস্বাস্থ্যকর দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসনে আপনাদের জীবন হারাইয়াছে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে কেলি (Colonel Thomas J. Kelly) নামক এক ব্যক্তি আয়র্লণ্ডে ফিনিয়ানদের নেতা। কেলি ১৮৬৭ অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে মাঞ্চেষ্টর নগরে উপস্থিত হয়। তৎকালে অনেক আইরিশ মাঞ্চেষ্টরে আসিয়া বাস করিতেছিল। কেলি মাঞ্চেষ্টর প্রবাসী আইরিশদিগের কোন এক গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ডে আগমন করে। কেলি ও ইহার সহযোগী ডিজি (Captain Deasy) এবং অন্য দুইজন এক পরিচ্ছদ বিক্রেতার আপণ সমক্ষে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল। এক পুলিশ কনষ্টেবল ইহাদিগের কথাবার্ত্তার একটু আভাস বুঝিতে পারিয়া এবং ইহাদের প্রতি সন্দিহানচিত্ত হইয়া, ইহাদিগকে ধরিবার জন্য উদ্যম করিলে, অন্য দুইজন পলাইয়া যায়, কেলি ও ডিজি ধৃত হয়। বিচারস্থলে ইহারা আপনাদিগের প্রকৃত নাম ধাম গোপন করিয়া, অন্য নামে পরিচয় দেয়, এবং আপনাদিগকে আমেরিকাবাসী বলিয়া বলে। বিচারক ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া Vagrancy Act মতে ২।৩ দিবসের মিয়াদ দিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া

দিবার আদেশ প্রচার করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ডিটেকটিভ পুলিশের লোক বলিল যে, ইহাদের বিচার সপ্তাহ কাল স্থগিত রাখা হউক; কেন না, ইহাদের দুইজনের মধ্যে ফিনিয়ান-নেতা আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সপ্তাহ বিলম্ব করিতে হইল না। সেই দিবসই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডিটেকটিভ পুলিশ যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিল যে, এই বন্দিদ্বয়ের একজন কেলি, ফিনিয়ান-অধিনেতা, অন্য জন তাহার সহকারী কাপ্তেন ডিজি।

কেলি ও ডিজির বন্দী সংবাদে মাঞ্চেষ্টার-প্রবাসী আইরিশ ফিনিয়ানদের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধিনেতার মুক্তির জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা হইল। একদল সশস্ত্র যুবা কেলির উদ্ধারের জন্য কারাগারের পথে এক নিভৃত স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কেলির মুক্তি মন্ত্রণার সংবাদ যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট পৌঁছিলেও, তাঁহারা যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। এই নিমিত্ত যখন বন্দীবাহী শকট পুলিশরক্ষী সমভিব্যাহারে কারাগারাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, লুক্কায়িত ফিনিয়ানগণ যথাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া শকট আক্রমণ করে। দাঙ্গায় পুলিশ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। শকটাভ্যন্তরস্থ সার্জেণ্ট বেট কোন এক ফেনিয়ানের বন্দুকের গুলির আঘাতে নিহত হয়। কথিত আছে যে, কোন ফিনিয়ান ইচ্ছা করিয়া বেটকে নিহত করে নাই। বাহিরে গোলমাল শুনিয়া বেট শকটের চাবির ছিদ্র পথ দিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছিল। সেই সময়ে একজন ফিনিয়ান, অন্য উপায়ে শকটদ্বার উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, বন্দুক দ্বারা চাবি ভাঙ্গিবার জন্য সেই ছিদ্র মুখে বন্দুকনালী রাখিয়া আওয়াজ করে। তাহাতেই আহত হইয়া বেট প্রাণত্যাগ করে। ফিনিয়ান-অধিনেতা কেলির মুক্তির জন্য এই উদ্যমকে আইরিশ ইতিহাসে Manchester Rescue নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পুলিশ হস্তে কেলির ধৃত হওন, বলপূর্ব্বক কেলির উদ্ধার সাধন ও তদানুষঙ্গিক দাঙ্গা হাঙ্গামা, এবং পরে ধৃত বিদ্রোহীদের উপর পুলিশের অমানুষী পীড়ন ও অত্যাচার, মাঞ্চেষ্টার প্রবাসী সমগ্র আইরিশদিগের প্রতি পুলিশের উৎপীড়ন ও অন্যায় আচরণ সংবাদে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীরা নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত, উদ্বেলিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এদিকে ইংরাজগণ মুষ্টিমেয় ফিনিয়ান হস্তে রাজশক্তির অবমাননা দেখিয়া প্রতিশোধ বাসনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ভয়, ক্রোধ, প্রতিহিংসা উভয় জাতির হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এমতাবস্থায়, মাঞ্চেষ্টার উদ্ধার-সহায়কারী বন্দীদের বিচারের জন্য Special commission বসিল। উইলিয়ম ফিলিপ এলেন, মাইকেল লার্কিন, টমাস মাগুয়ার, মাইকেল ওব্রায়েণ এবং এডওয়ার্ড কণ্ডেন, এই পাঁচজনকে সার্জেণ্ট বেটের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে পাঁচজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর অপরাধীরা প্রথমতঃ, প্রত্যেকে অভিযোগের বিরুদ্ধে আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করে। সকলেই দৃঢ়বাক্যে অভিযোগ অস্বীকার ও স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রদর্শন করে। শেষ বক্তা, কণ্ডেন, স্বীয় বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে এই কথাগুলি বলে;—"আপনারা শীঘ্রই আমাকে

ঈশ্বর সমীপে প্রেরণ করিবেন এবং আমিও যাইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আমার অনুতাপ করিবার বা প্রত্যাহার করিবার কিছুই নাই। আমি কেবল এই বলি, ঈশ্বর আয়র্লণ্ড রক্ষা করুন"।

কণ্ডেণের এই কথা বলা শেষ হইলেই, ইহার সঙ্গীগণ সকলে এককালে অভিযোগ-মঞ্চ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ঊর্দ্ধপানে মুখ তুলিয়া ও হস্ত বিস্তার করিয়া সমস্বরে ও একাগ্রপ্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিল—God save Ireland. সেই অবধি God save Ireland পদটি আয়র্লণ্ডে জাতীয় মহামন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বিচারের কিয়দ্দিবস পরে, লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানের সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণ, (যাঁহারা বিচার স্থলে উপস্থিত ছিলেন) মাগুয়ার সম্বন্ধে বিচারের দোষ দেখাইয়া হোম-আপীসে এক আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধান দ্বারা যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া, মাগুয়ারকে দোষমুক্ত করিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দেন। মাগুয়ারের দণ্ডাজ্ঞা রহিত দেখিয়া ন্যায়বান্, অপক্ষপাত বিচারপ্রিয় কোন কোন সদাশয় ইংরাজ আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, যখন অপক্ষপাত বিচার হয় নাই, যখন যথাযোগ্য প্রমাণের অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন এই অপরাধীদের অন্য যে কোনরূপ দণ্ড দেওয়া হয় হোক, কিন্তু ইহাদের প্রাণদণ্ড যেন না করা হয়। এইরূপ আন্দোলনের পরেই কণ্ডেণের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রচারিত হইল। আয়র্লণ্ডবাসীরা আশা করিয়াছিল, ক্রমে অবশিষ্ট তিনজনেরও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ২৩শে নবেম্বর ১৮৬৭ অব্দে এলেন, লার্কিন ও ওব্রায়েণের ফাঁসি হয়।

যদিও ইংরাজদিগের সমক্ষে উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তিত্রয় অতি নীচ ঘৃণ্য হত্যাকারী, আইরিশদিগের নিকটে ইঁহারা স্বদেশের জন্য "মারটার" বলিয়া পূজ্য ও আদরণীয়। সেই জন্যই, ইঁহাদের স্মৃতি স্থায়ী করিবার উদ্দেশে এবং ইহাদের প্রতি স্বদেশের জন্য প্রাণদানকারীর আত্মার গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও আয়োজন হয়, তন্মধ্যে বিষাদ-মাখা জাতীয় সংগীতে ইহাদিগকে অমর করিবার বাসনাও অতি স্বাভাবিকরূপে কবির লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিল। আইরিশ মিনিষ্ট্রেলাদির মধ্যে, স্বদেশ-ভাবময় কবিতাস্তবকে, ভবিষ্য আইরিশ বংশের নিকট প্রকাশ্য বধ্যমঞ্চে প্রাণদণ্ডিত এই স্বদেশবাসীদের স্মৃতি চির জাগ্রত থাকিবে।

সংগীতোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় 'murderers' কি 'martyrs', আমাদের বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমরা শুদ্ধ ভাবের পক্ষ হইতে এই জাতীয় সংগীতটীকে দেখিব। ইহাতে যেরূপ উৎসাহ, আবেগ ও বিষাদ সহকারে জাতীয় ভাবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা আইরিশ জাতীয়তার, স্বদেশপ্রাণতার এক উচ্চ বিকাশ অতি সুন্দররূপে অনুধাবন করিতে পারি। স্বাধীন হোক, আর পরাধীন হোক, যে জাতি স্পর্দ্ধার সহিত, উচ্চ সৎসাহসের সহিত মুক্তপ্রাণে আইরিশ কবির সহিত সমস্বরে বলিতে পারে

'বধ্য মঞ্চপরে কিংবা রণস্থলে
'মরি না যেখানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

সে জাতি পবিত্র জাতীয়তার উচ্চসোপানে যে উন্নীত হইয়াছে, কেহ অপক্ষপাত হৃদয়ে তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

গৌড়-ইতিহাস ও ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

পূজ্যপাদ শ্রীল সম্পাদক মহাশয়, আপনার অবিদিত নাই, জেলা রাজসাহী রামপুর বোয়ালিয়াস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় পত্র দ্বারা আমাকে কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আর তাহার উত্তরগুলি নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলেন। আমি তদনুসারে অর্থাৎ তাঁহার প্রশ্ন-ঘটিত উত্তরগুলি নিম্নে লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, ভরসা করি, আপনার কৃপাদৃষ্টিতে যদি পত্রিকায় স্থান পাইবার যোগ্যহয়, অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর প্রথম প্রশ্ন।

"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ।"

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই লিখনানুসারে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী কি যবন?

"তোমার বড় ভাই করে, দস্যু ব্যবহার।"
"জীব পশু মারি কৈল, চাকলা সবকাশ॥"

(২) পাতসার এই উক্তিতে শ্রীসনাতনের কেহ কি বড় ভাই দস্যু ছিলেন? জীব পশু হিংসা করিতেন?

(৩) তাঁহারা কোন কুলোদ্ভব? এবং তাঁহাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত কি?

উত্তর।

১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড় বঙ্গদেশ একপ্রকার স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল। ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যে সময়ে সম্রাট হুমায়ুন ও তৎপুত্র আকবর সাহা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়নগরে সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক হিন্দুরাজা এবং পাঠান বংশীয় হুসেন সাহা নামে ঐ রাজার জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন।

দিনাজপুরের উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ গৌড় নগরে (অধুনা জঙ্গলাকীর্ণস্থানে) প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশিষ্ট (সেকালের নৃপতি কর্ত্তৃক বিচিত্র নির্ম্মাণ কৌশল) রাজপ্রাসাদের এবং মস্‌জিদের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং নানারঞ্জিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি স্থানে স্থানে পতিত আছে এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন তিন্তড়ী বৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং নানা ফুলদল পরিশোভিত যে একটী সুরম্য সরসী শোভা পাইতেছে, রাজা সুবুদ্ধি রায় ঐ বাপি খননের নিমিত্ত উক্ত হুসেন সাহার হস্তে বিস্তর অর্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

লোভ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। অর্থ-লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "সা হুসেন" সেই অর্থ হইতে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেন। পশ্চাৎ রাজা সেই ছিদ্র পাইয়া অপহৃত অর্থ উদ্ধারের নিমিত্ত হুষেণের পৃষ্ঠ দেশে চাবুক মারিয়াছিলেন। এই প্রহারের জন্য সা হুসেন উক্ত রাজার ভয়ানক শত্রু হইয়া নানা কুচক্র দ্বারা সৈন্য সামন্তকে বশীভূত করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে সমরে বন্দী করেন। রায়ের প্রাণদণ্ড করিবারই হুসেণের পত্নীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। পরন্তু, সা হুসেন উক্ত রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই খাতিরে প্রাণদণ্ড না করিয়া প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে রাজার মুখে নিষ্ঠীবন পাত্রের জল

দিয়া জাতিচ্যুত ও রাজ্যচ্যুত ও দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া "সাহুসেন" স্বয়ং গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

রাজ্য লাভের পর "সাহুসেণ" বিপুল পরাক্রমের সহিত বাহুবলে উড়িষ্যা প্রদেশের কিয়দংশ জয় ও বল প্রয়োগে অনেকের যথা-স্বর্ব্বস্ব লুট ও বিস্তর জীব পশু হিংসা ও বিস্তর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া তত্র প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত সাহু-সেনের অত্যন্ত সৌহৃদ্য থাকা বশতঃ দিল্লীশ্বর গৌড়রাজ্যের কোন কার্য্যে স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তার্পণ করেন নাই ও করিতেন না। কেবল সময়ে সময়ে রাজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন মাত্র। তৎকালীনে বঙ্গের হিন্দু রাজগণ তাঁহার অধীনস্থ ছিলেন। বিদিত আছে, সম্রাট আকবরের দেশ-প্রসিদ্ধ মন্ত্রী "আবুল-ফজল" আইন আকবরি নামে এক-খানি দণ্ড পুস্তক প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় মন্ত্রী রাজপুত-বংশীয় "রাজা তোড়লর্ম্মল" রাজ্যের ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়া এক এক স্থানের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হই-তেই রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তায় "চাকলা" "সরকার" ও পরগণা লিখিবার রীতি নীতি প্রচলিত হয়। তৎসময়ে গৌড় বঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অনেক স্থান "গএর আবাদি" অর্থাৎ পতিত ভূমি ও নানা স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও হিংস্র জন্তু প্রভৃতির অধিক দৌরাত্ম্য ও পথ ঘাট অত্যন্ত দুর্গম ছিল। অদৌ রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সেই কালে কর্ণাট প্রদেশস্থ রাজবংশী ভরদ্বাজ গোত্র কুলোদ্ভব যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীকুমার দেব নবহট্ট (নৈহট্ট) বাস পরি-ত্যাগে নিজপুত্র বহুবিদ্যা-বিশারদ শ্রীসনা-তন ও শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ, এই পুত্রতনয় এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব সহিত গৌড় রাজধানীর নিকটস্থ "রামকেলী গ্রামে" বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম "অমর" ও "সন্তোষ" পশ্চাৎ নাম শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। যথা, ভক্তিমালা প্রকাশিকা গ্রন্থে ;—

"অমর, সন্তোষ, নাম পূর্ব্বেতে আছিল।
সনাতন, রূপ নাম, পশ্চাৎ হইল॥"

কুলীন গ্রামনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহা-প্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীবসু রামানন্দ ও শ্রীসত্য রাজখাঁনের পিতা মহাত্মা মালাধর বসু, উপাধি গুণরাজ খাঁন, যাঁহার কৃত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে বঙ্গের আদি গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ৪০০ শত বৎসরের হস্ত-লিখিত গ্রন্থ যাহা আমার বাড়ীতে আছে, এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রা-ঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহাত্মা মালাধর বসু, গৌড়েশ্বরের বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে পড়সী ভাবে নিকটে পাইয়া বড়ই স্নেহ করিতেন, ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মন্ত্রণা ও লেখ্য বিষয়ে সাহায্য লইতেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ তৎসময়ের রাজভাষা আরব্য ও পারস্য বিদ্যায় এতদূর ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া-ছিলেন যে, তখনকার মুসলমান সম্প্রদায় বড় বড় মৌলবী ও মোল্লা ও কাজীগণ উক্ত বিদ্যার বিচারে তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হইতেন। একখানি তুরকিনামা পারস্য ভাষার গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর দিল্লী হইতে গৌড়েশ্বরকে পারস্য

ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, এক এক সময় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ হইত। অর্থাৎ লোগদ নামা পারস্যাভিধানের সাহায্য ব্যতীত তাহার অর্থ মীমাংসা ও উত্তর লেখা হইত না। গৌড়েশ্বর সেই সকল পত্রাদির উত্তর লিখিবার কারণ, মূল পত্রাদি গুণরাজ খাঁনের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গুণরাজ খাঁন আবার সেই সকল পত্রের উত্তর লিখিবার কারণ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের হস্তে দিতেন। পশ্চাৎ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কর্তৃক লেখা প্রস্তুত হইলে, মন্ত্রীবর তাহা লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত করণান্তর রাজার অনুমতি ক্রমে তাহাই সম্রাটের নিকট দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন। সেই সকল পত্রের "এবারত" অর্থাৎ রচনা এতই মধুর ও শ্রবণ-তৃপ্তিকর হইত যে, পাঠ ও শ্রবণ করিবার কালে দিল্লীশ্বর বড়ই প্রীত এবং বিস্মিত হইতেন। এবং লেখ্য দর্শন করিয়া একমুখে লেখক ও রচকের শত শত প্রশংসা করিতেন। গুণীর গুণ গুণী ব্যতীত কি অন্যে জানিতে সক্ষম? দিল্লীশ্বর সামান্য ছিলেন না। জগতে খ্যাতি আছে;— "দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা" নামে তিনি, সম্বোধিত হইতেন। সম্রাট আকবর যথার্থ গুণী লোকের আদর ও সম্মান করিতেন। লেখা ও রচনার ভাবে দিল্লীশ্বরের হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়াছিল যে, লেখক ও রচক সামান্য ব্যক্তি নহেন। হয়, দেব-অংশ-সম্ভূত, নয় ঈশ্বরের কৃপাভাজন পাত্র, অথবা সরস্বতীর বরপুত্র। তাই তিনি, এক সময় একটী পত্রের উত্তরে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে লেখক ও রচকের নাম জানিবার অভিপ্রায়ে গৌড়েশ্বরকে পত্র লেখেন। গৌড়েশ্বর সেই পত্র পাইয়া এবং অমাত্য গুণরাজ খাঁন প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া লেখক শ্রীরূপ ও রচক শ্রীসনাতন, এই উভয় নাম পত্রাভ্যন্তরে লিখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন। দিল্লীশ্বর সেই উত্তর পাইয়া, শ্রীরূপ ও সনাতনকে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত এবং মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ ও বন্ধু ভাবে গ্রহণ ও তাহাদের মন্ত্রণানুসারে রাজ কার্য্য সম্পাদন করণের নিমিত্ত "ফরমান" অর্থাৎ নিজ আজ্ঞার সহিত শ্রীরূপ ও সনাতনের পৃথক পৃথক নামকরণে এক একখানি "পাঞ্জাপাট্টা" অর্থাৎ নিজ করপল্লব যুক্ত সনন্দ লিখিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন। গৌড়েশ্বর, সম্রাটের সেই আদেশ এবং সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডেই, শ্রীরূপ ও সনাতনকে দরবারে আহ্বান করিয়া, সম্রাট-প্রদত্ত খেলাৎ অর্থাৎ ঐ সনন্দ গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাতে দুই ভাই বড়ই ভীত হইলেন। কারণ, সেকালের লোক এ কালের মত ম্লেচ্ছ সেবী, ম্লেচ্ছ-স্পর্শী, অথবা চাকরির ভিখারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণের চাকরী জীবিকা নহে, স্মৃতিআদি শাস্ত্রের বিরোধী; বিশেষতঃ কাম্বোজ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ সংসর্গে জাতিচ্যুত হইতে হয়। তাহার আবার প্রায়শ্চিত্তাভাব। সংহিতা-কার পরাসর বলিয়াছেন;—

"আসনাচ্ছয়নদ্যানাৎ সম্ভাষণাৎ সহভোজনাৎ
সক্রামন্তিহি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥" ১২শ অ, ১২

যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে সমুদায় জল ব্যাপে, তদ্রূপ যবন ও পাপীর সহ উপবেশন, একত্র শয়ন ও একত্র গমন ও একত্র ভোজন ও আলাপন করিলে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্রয় করে।

এতন্নিবন্ধন, দুই ভাই মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া রাজসমীপে বহু প্রকার

অনুনয় ও আপত্তি করিলেন। পরন্তু গৌড়েশ্বর কোন আপত্তিই শুনিলেন না। তখনকার রাজ-নিয়ম বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, কোন প্রকারে এড়াণ পাইবার যো ছিল না। তদাবস্থায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। অগত্যা দণ্ড ভয়ে শেষ রাজারসহ কয়েকটী নিয়ম বদ্ধ করিয়া মন্ত্রীত্ব পদ ভয়ে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে ;—

সনাতন রূপ, মহামন্ত্রী, সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা, শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড় রাজ যবনের, অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি, দিলা রাজ্য ভার॥
মেলচ্ছ ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজা, বৃদ্ধি কৈল তার॥

যৎ সময়ে গৌড় রাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপ ও সনাতনকে সনন্দ প্রদত্ত হয়, তৎসময়ে তখনকার রাজ নিয়মানুসারে হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের যাবনিক নাম ও খেতাব অর্থাৎ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। যাবনিক অর্থাৎ পারস্য শব্দে তন্নামের অর্থ এই ;—"দবির শব্দে" ঈশ্বরের আজ্ঞাভাজন ; "খাস শব্দে" উত্তম, এই খাস শব্দ হইতেই খাসা শব্দের উৎপত্তি। দ্বিতীয় খাসনবিশ শব্দে উত্তম লেখক।
"সাওকর বা সাওয়ার শব্দে" অত্যন্ত দাতা এবং মুক্তহস্ত, আর বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। মল্লিক শব্দে অতি মর্য্যাদাশালী। দুই ভাই এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া শ্রীরূপ "দবির খাস" এবং শ্রীসনাতন "সাকর মল্লিক" নাম ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ মর্য্যাদা ভিন্ন সম্রাটের আদেশানুসারে স্বয়ং গৌড়েশ্বর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে সময়ে সময়ে ভাই, "দোস্ত" বলিয়া বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিতেন।

এদিকে গৌড়েশ্বর সকল বিষয়ে সম্মানিত, বিশেষতঃ বয়সে প্রবীণ ছিলেন। তাই তাঁহার প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত শ্রীরূপ ও সনাতন (রাজাকে) যে "জিন্দাগানি" "ও জিন্দাপীর" বলিয়া সময়ে সময়ে সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ম্লেচ্ছ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ ম্লেচ্ছের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না,কখনও একাসনে বসিয়া কাজ করিতেন না। স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া কাজ করিতেন। "জিন্দাগানি শব্দে পীর" এবং জিন্দা শব্দে দাদা" যথা পারস্যাভিধানে ;—

" জিন্দা দাদা, কাসদ্ নানা " ইত্যাদি

সাওকর শব্দ হইতে সাকর শব্দের উৎপত্তি। সাওকর শব্দটী এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কাহাকেও মুক্তহস্ত এবং দাতা ও উদার চেতা দেখিলে "লোকটী বড়ই সাওকর," কার্য্য কারণ সম্বন্ধে লোকে সচরাচর এই শব্দ বঙ্গ ভাষায় ব্যবহার করে। শব্দটী যাবনিক ভাষা হইলে কি হয়, বড়ই মিষ্ট। তাই মহাপ্রাজ্ঞ সম্রাট বাছিয়া বাছিয়া উভয়ের নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষ নামও সার্থক ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারে জীবের ভাগ্যে সদয় হইয়া "সাওকার" অর্থাৎ ভক্তি শাস্ত্র প্রচার ও বিতরণ না করিলে ভক্তি শাস্ত্র কি, এবং তাহার ভিতর কি বস্তু আছে, ইহা কেহ কি জানিতেন? না বুঝিতেন? তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও বিনামূল্যে অকাতরে বিতরণ ও প্রচার করিয়া

একদিকে বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ও অন্য দিকে জগতে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে;—

" দবীর খাস আর সাকর মল্লিক।
প্রভাবেতে এ দোহাঁর খেতাব অধিক॥
যাহাঁদের হইতে হয়, ভক্তির প্রচার।"
আচার্য্য সম্রাট বলি, খ্যাতি নাম যাঁর॥" ইত্যাদি

ইঁহারা বাল্যকালে বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির প্রসিদ্ধ নৈহট্টের চৌবাড়ীতে ন্যায়,দর্শন,স্মৃতি সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদায় এবং "ক্যাস্পিয়ান" মহাদ্বীপ বাসী সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী "সাইদ ফকিরদ্দিনের" নিকট পারস্য ও আরব্য বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী রাজা তোড়ল্মল রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে কিছু বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌড় বঙ্গেও সেই বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি এবং প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া সকলের চক্ষুরঞ্জন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব কালে যবনদিগের অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য দমিত হইয়াছিল। এই-কালে যবনদিগ হইতে হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ঠ হওয়াতে,

" পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

দুষ্কৃত জনের হস্ত হইতে সাধুগণের পরিত্রানের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান, পূর্ণ অবতার

" ধর্ম্মং মহা পুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম।
ছন্নো কলৌ যদ্ভব স্ত্রি যুগোইত সত্বম্॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

রূপ ধারণ করিয়া, যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আদিকালে স্বরস্বতী তীরে অঙ্কুরিত ও মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে পল্লবিত ও তৎপরবর্ত্তী কালে নৈমিষারণ্যে মুকুলিত হইয়াছিল, সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম ফলবান প্রবল বৃক্ষে পরিণত করিবার নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে,১৪০৭ শাকে, শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের প্রবাহে সমস্ত বঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন। সেই পবিত্র প্রবাহে সকল পাপ তাপ এবং বহুদিনের বদ্ধ কুসংস্কার ধৌত হইয়াছিল। সকলে সকলকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিল। এমন কি, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্যের অস্তগমনের পর হিন্দুর এমন দিন আর কখন হয় নাই। হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম, আঘাতের পরিবর্ত্তে আলিঙ্গন, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলধামে গমন করেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহার পূর্ব্বাবতারে সহচর বা সহচরী, সেই কালে তাঁহাদিগকে মনোমধ্যে স্মৃতি হওয়াতে, বিশেষত তাঁহাদিগের দ্বারা বহু কার্য্য সাধন অর্থাৎ অবতারের মোক্ষ প্রয়োজন সাধিত করিতে হইবে, এই জন্য, তাঁহাদিগকে বিষয়-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মথুরা গমনের ভাণ করিয়া, সাঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ ভক্তগণের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন আর ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম প্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে গৌড় রাজ্যের নিকট "রামকেলী" গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। সেইকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে গৌড় রাজধানীর নিকট লক্ষ লক্ষ লোকের সংঘট্ট হয়। সেই

কালে শ্রীশ্রীপ্রভু দাস রঘুনাথ গোস্বামী নিজকৃত পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা,—

"শ্রীবৃন্দাবন যাইতে প্রভুর যবে হৈলা মন।
ভক্তগণ লয়ে সাথে, চলিলা গৌড়ের পথে,
যাঁহা আছে রূপ-সনাতন॥
কণক পূর্ণ ছাঁদে, কাঁমিনী মোহন ফাঁদে,
মদনে মদন গর্ব্ব চূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধভাষা, ঈষৎ উন্নত নাশা,
দাড়িম্ব কুসুম যিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নার বিন্দে, বাস্প নামক রন্ধে,
তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু, কভু বলে হাহা প্রভু,
আপাদ মস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখিয়া বাট, ক্ষণে মারে মাল সাট,
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবারে ধায়,
কর্ম্ম বন্দে পড়ি গেল বাধা॥
পাইছেন প্রেম ধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ,
আনন্দ সায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলী, চাতক করিছে কেলী,
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতয়াল গোরা, জগৎ করিল ভোরা,
যবনের হইল বিশ্বাস।
জড় অন্দ, মুক মাত্র, সবে হৈলা প্রেম পাত্র,
বঞ্চিত শ্রীরঘু নাথ দাস॥" (পদসমুদ্র)

* * * * *

সেইকালে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের সমাগম দৃষ্টে জনৈক পাঠান কোতয়াল অর্থাৎ শান্তিরক্ষক তদর্শনে অত্যন্ত ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া একটু ভাব উল্টাইয়া বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে।
নিরবধি করয়ে সে ভূতের কীর্ত্তনে॥"
না জানি তাহার সঙ্গে, আছে কত জন।

রাজা তৎ শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ;—

"রাজাবলে কহ কহ, সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায় কি নাম কৈছে দেহের গঠন॥"

তখন রাজার কিঞ্চিৎ মুখের আশ্বাস পাইয়া সহর কোতয়াল স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

কোতয়াল বলে শুন, শুনহ গোসাঁই।
এমন অদ্ভুত কভু, দেখি শুনি নাই॥
সন্ন্যাসীর শরীরের, সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কাম দেব সম হেন, নাপারি বলিতে॥
জিনিয়ে কনক কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, সুনাভী গভীর॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ, কমল নয়ন।
কোটিচন্দ্র সে মুখের, নাহি করি সম॥
সুরঙ্গ অধর মুক্ত, জিনিয়া দশন।
কাম সরাশন যেন, ভ্রুভঙ্গ পত্তন॥
সুন্দর সুপিন বক্ষে, লেপিত চন্দন।
কটিতটে শোভে মহা অরুণ বসন॥
রাতুল চরণ যেন, কমল যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই, করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হইতেও কমল সব অঙ্গ
তাহাতে অদ্ভুত শুন, আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পড়েন, আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥

যবনরাজ, কোতয়ালের মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপ, গুণ, এবং মহিমা শুনিয়া আর বদান্যতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তখনই হিন্দু কর্ম্মচারী সজ্জন ও সুশীলবন্ত কেশব ছত্রি প্রধান পাত্রকে ডাকিয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করেন;

"কহত কেশব খাঁন, কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি, নাম বল যার॥
কেমত তাহার কর্ম্ম, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঁই সেহ, কহিবে অবশ্য॥"

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজার ভয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহিমা গোপন করিয়া কেশব পাত্র বলিলেন ;—

"কেবলে সন্ন্যাসী সে, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব, বৃক্ষের তলবাসী॥"

রাজা কেশবের প্রতি উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যথা বাক্যে বলিলেন ;—

রাজা বলে, গরিব তারে বলিল কেমনে।
মহাদোষ হয় ইহা, শুনিলে শ্রবণে॥
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ, খোদায় যবনে।
সেই তিঁহো নিশ্চয়, জানিহ সর্ব্বজনে॥
তাঁহারে সকল দেশ, কায় বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
অতএব তিঁহ সত্য, জানিহ ঈশ্বর।
গরিব বলিয়া তারে, না কর উত্তর॥
কাজি বা কোটাল কিংবা, হউ যেই জন।
কিছু বলিলেই তার, লইব জীবন॥"

রাজা, এইরূপ সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন। কিন্তু মন স্থির হইল না। অনন্তর খাস-মন্ত্রী দবির খাসকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে।—

"দবির খাসেরে রাজা, পুছিলা নিভৃতে।
গোঁসাইর মহিমা তিঁহো, লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিলা, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে, জন্মিলা আসিয়া॥
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমায় সর্ব্বত্রেতে জয়।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি, পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশতম॥
"রাজা কহে হেন এই, মনে যেই লয়।
সাক্ষাত ঈশ্বর ইহোঁ, নাহিক সংশয়॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর, প্রাগুক্ত প্রশ্নোক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীরূপ যবন রাজের অন্তঃকরণে প্রতীতি জন্মাইয়া অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। পশ্চাৎ দুই ভাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় নিজ নিজ বেশ লুকাইয়া (রামকেলী গ্রামে) অর্থাৎ যেখানে মহাপ্রভু সাঙ্গপাঙ্গ সহিত বিরাজমান ছিলেন, অর্দ্ধরাত্রে তত্র-স্থানে উপনীত হইয়া প্রথমেই কৃষ্ণাবতার শ্রীশ্রীমদ্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীহরি দাস ভক্তের পাদবন্দনা পূর্ব্বক অনন্তর দর্শনে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া

" গৌর কান্ত্যা ছন্নরূপ, শ্যামায় পরমাত্মনে।
গৌড়াকাশা দিতা খণ্ডে, সলিলে ব্রহ্মণে নমঃ।"

এইরূপ বহুবিধ স্তুতি বাধের পর আপন আপন পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন ;—

" নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু, কহিতে বাসী লাজ॥"

পতিতোদ্ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়ের মস্তকে হস্ত প্রদান ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে, সনাতন ! হে শ্রীরূপ ! আর দৈন্য প্রকাশ করিতে হইবে না। তোমার উক্তিতে আমার প্রাণ বিকল হইতেছে ;—

" গৌড় নিকট আসিতে নাহি কোন প্রয়োজন।
তোমা দোহাঁ দেখিতে মোর, ইহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা, কেহ নাহি যানে।
সবে বলে কেন আইলা, রামকেলী গ্রামে॥
ভাল কৈলা দুই ভাই, আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ আর কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই, কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা দোহাঁর করিবে উদ্ধার॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভুর এইরূপ প্রসন্নতায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন আশ্বস্ত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে বিদায় হইবার কালে বিনীতভাবে কিছু নিবেদন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ;—

" সনাতন কহে প্রভু, করি নিবেদন।
হেন পরিচ্ছেদে না যাইবে বৃন্দাবন॥
দুই এক বন্ধু লয়ে, মথুরা যাইবে।
তবে ব্রজ দরশনে, বহু সুখ পাবে॥"

এই সঙ্কেত কথা বলিয়া দুই ভাই নিজ বাড়ীতে গমন করেন। পশ্চাৎ প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মথুরাগমনে

ক্ষান্ত হইয়া সাঙ্গপাঙ্গ অর্থাৎ ভক্তগণ সহিত নীলাচলে প্রত্যাগমন ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন। দুই ভাই যখন শুনিলেন, মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছেন, তখন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভুর বিরহে দুই ভাই অতিমাত্র চঞ্চল হইলেন। প্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইয়া কখন কোন সময় কোন স্থানে গমন করেন, তৎসংবাদ জানিবার মিনিত্ত দুইজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীরূপ রাজধানীতে গমন করিলেন। আর, শ্রীসনাতন বাড়ীতে রহিলেন। কিছু দিনের পর গুপ্তচর নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, যখন এই সংবাদ শ্রীরূপের শ্রুতিগোচর করিলেন, তখন শ্রীরূপ আর কালব্যাজ না করিয়া আপনার উপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে এবং কুটম্ব ভরণ পোষণে বিভাগ করিয়া দিয়া এবং অগ্রজ সহোদর সনাতনের বৈরাগ্যহেতু দশ সহস্র মুদ্রা মুদি ঘরে রাখিয়া রাজভয়ে জ্যেষ্ঠকে কোন কথা খুলিয়া লিখিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠকে বৈরাগ্য উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এই কারণে একখানি "শর্কর" অর্থাৎ খোলাকুচীর মধ্যে সূচিকার অগ্রভাগে;—

য, রী, র, লা, ই, র,ং ন, য়, ॥

এই ৮ টী অক্ষর মাত্র লিখিয়া অগ্রজকে দিবার নিমিত্ত ঐ গুপ্তচর হস্তে ঐ শর্করাখণ্ড সমর্পণ করিয়া এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া দিয়া কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভকে সঙ্গে লইয়া গুপ্ত পথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন। পশ্চাৎ মহামহা সঙ্কটস্থল এবং পর্ব্বতারণ্য পার হইয়া বহুকষ্টে প্রয়াগধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন্। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সে সময়ে শ্রীরূপকে পাইয়া করিলেন কি?

"প্রিয় স্বরূপে, দয়িত স্বরূপে,
প্রেম স্বরূপে, সহজাতি রূপে,
নিজানু রূপে, প্রভুরেক রূপে,
তদনু রূপে, স্ব বিলাস রূপে, ॥
প্রিয় স্বরূপে রূপ, দায়িত স্বরূপ,।
সহজ মধুর ইহোঁ, প্রভুর স্বরূপ ॥
ত্রিভুবনে মুখ্যত্তম, হয় যার রূপ।
তাররূপ হয় সেই বিলাস স্বরূপ ॥
হেনরূপ পাঞা প্রভু, উল্লাসিত হঞা।
বিস্তর করিল প্রেম, আলিঙ্গন দিয়া ॥
তারে আজ্ঞা দিলা তুমি, যাহ বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ গূঢ় লীলা, করহ বর্ণন ॥"

(শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক)

এদিকে শ্রীরূপের প্রস্থানে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার ধৃতানুসন্ধান জন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহার আর সন্ধান পাইলেন না। অন্য দিকে শ্রীরূপের বিরহে শ্রীসনাতন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিলেন। এবং বৈরাগ্যের পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যদিগকে লইয়া নিজ প্রাঙ্গণ মধ্য শ্রীশ্রীতুলসীক্ষেত্রের নিকটে বসিয়া দিবসের প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ এবং রাত্রে হরিবাসর সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পীড়ার ভাণ করিয়া রাজ সংসারে আর গমন করিলেন না।

কাজে কাজেই শ্রীরূপের প্রস্থানে এবং শ্রীসনাতনের অনুপস্থিতে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি লক্ষিত হইল। সেই সময় উড়িষ্যার কোন এক বিভ্রাটে রাজা তত্রস্থানে যাইতে

অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। হয়, প্রধান মন্ত্রী শ্রীসনাতনের হস্তে রাজ্য সমর্পণ, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্রস্থানে গমন করিবেন, রাজা এই ইচ্ছা করিয়া শ্রীসনাতনের দৈহিক অবস্থা জানিবার নিমিত্ত জনৈক রাজবৈদ্যকে শ্রীসনাতনের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই বৈদ্যরাজের বাড়ী শ্রীখণ্ডে, সে কথা পরে বলিব।

বৈদ্যরাজ রাজ আজ্ঞায় শ্রীসনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষকের মুখে শুনিলেন, শ্রীসনাতন সুস্থ শরীরে ভট্টাচার্য্যাদি সমভিব্যহারে প্রাঙ্গনে বসিয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন, ভিতরে প্রবেশের কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় ক্ষেত্রস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দৌবারিকের কথা সত্য। শ্রীসনাতন বৈদ্যরাজকে দেখিয়াই সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন। অন্যান্য কথা হইল বটে, পরন্তু যে জন্য গমন, বৈদ্যরাজ শ্রীসনাতনের ভাব গতি দেখিয়া সে কথা আর তুলিলেন না ও বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ শ্রীসনাতনের নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা চাক্ষুষে দেখিয়া ছিলেন তৎসমস্ত রাজার শ্রুতিগোচর করিলেন। রাজা শ্রবণ মাত্রেই বুঝিলেন, এই সমস্ত সেই আগন্তুক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খেলা। শ্রীরূপ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অতঃপর শ্রীসনাতনও তৎপথ অবলম্বন করিবেন। মন মধ্যে এই এক যুগপৎ দুঃখ ও ভাবনার উদ্রেক হইল। কি যাহাদিগের মন্ত্রীত্ব বলে আমার রাজ্যসুখ, যদি তাহারাই আমাকে একে একে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে। কিন্তু সেই দুঃখ কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পরদিন, স্বয়ং পদব্রজে শ্রীসনাতনের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, শ্রীসনাতন বুধমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রাঙ্গণ মধ্যে বসিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে একদিকে হর্ষ ও অন্য দিকে বিমর্ষ হইলেন। এদিকে স্বয়ং পাতসার হটাৎ আগমন দৃষ্টে সকলে সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বসিতে আহ্বান ও উচ্চাসন প্রদান করিলেন। রাজা স্বতন্ত্র স্থানে উচ্চাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই একটু গম্ভীরভাবে শ্রীসনাতনকে বলিলেন, হে মন্ত্রীবর? তোমার মনস্থ কি? তুমি উপস্থিত ও সবল থাকিয়াও আমার সকল কার্য্য নাশ করিতেছ, এ তোমার কি ধর্ম্ম? তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া আমি বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম, পশ্চাৎ বৈদ্য মুখে শুনিয়াছি এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও দেখিতেছি, বস্তুতঃ তুমি পীড়িত নহ. এরূপ ছল করিবারই বা প্রয়োজন কি?

সনাতন উত্তর করিলেন, হে জিন্দাপীর, আমি বস্তুতঃ শ্রীরূপের বিরহে কাতর, এ অবস্থায় আমা হইতে আর রাজকার্য্য চলিবে না, যেহেতু আমার মনের স্থিরতা নাই; অতএব আমার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য সমাধান করুন। রাজা তৎশ্রবণে অন্তরে দুঃখ ও বাহ্যে কোপ প্রকাশ করিয়া (পারিভাষিক শব্দে বলিলেন;—. যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"তবে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা, কহে আরবার॥
তোমার বড় ভাই করে, দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল, চাকলা সবনাশ।
তুমি হেতা কৈলে মোর, সব কার্য্য নাশ।"

বলিতে কি; আমাদের যখন কিছু কিছু জ্ঞান হয়, আর পূজ্যপাদ বৃদ্ধ মাতা-

মহের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক ও অর্থ শিক্ষা করি, সেই কালে মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ গুরু মাতামহ মহাশয় ঐ কতিপয় পয়ারের অর্থ আমাদিগকে এই মত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অপরে যিনি যাহাই বলুন, "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" বলিয়া আমাদের এতাবত তাহাই স্মরণ ও ধারণা আছে। রাজাদিগের কূট বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহারা কার্য্য-কালে, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি নীতির অনুসরণ করেন। ঐ কয়েকটী পয়ারের ভিতর দ্ব্যর্থভাব আছে, প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতৃভাব স্থাপন। যথা;—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥"

হে, সনাতন? তুমি যাহাকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে বহু মান্য কর, সে একজন দুষ্ট অর্থাৎ তাহার দস্যু ব্যবহার।

"জীবপশু মারি কৈল, চাকলা সবনাশ।"

সে জীব পশু হিংসা করিয়া "চাকলা" অর্থাৎ প্রদেশ আরম্ভ ও শেষ করিয়াছে। তুমি সেরূপ দুষ্টের হস্ত হইতে কেমনে এড়ান পাইবে? ইহা ভয় প্রদর্শন। পক্ষান্তরে তিতিক্ষা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন, তুমি সেরূপ দুষ্টকে রাখিয়া কোথায় যাইবে?

ধীসম্পন্ন, শ্রীসনাতন রাজার এই ইঙ্গিত বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, রাজা অত্যন্ত বল-বান ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, যখন এই উৎপেক্ষা ভাব প্রদর্শন দ্বারা, অর্থাৎ আমার কেহ বড় ভাই না থাকা সত্ত্বেও যখন পারি-ভাষিক শব্দে নিজেরই পরিচয় দিতেছেন, তখন ইহাকে সন্তোষ ও আত্মরক্ষা করি-বার উপায় কি? এই ভাবিয়া তখনই রাজ-মর্য্যাদা স্থাপনার্থে বলিলেন;—

"সনাতন কহে তুমি সতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যাহা দোষ করে, দেহ তার ফল॥"

হে গৌড়াধিপ! আপনি স্বতন্ত্র, আপ-নাতে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, যে যাহা কার্য্য করে, তাহার উপযুক্ত ফল অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার অধিকন্তু আমার কিছু বলিবার নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, রাজা একে যবন, তায় হিংস্র এবং দেবদ্রোহী শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যানুষ্ঠান দেখিয়া তাহার ঈদৃশ দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপলাবণ্য দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর ও সক-লের শাস্তা, ও তাহার উপর আর কেহই নাই, পূর্ব্বেই রাজার সে বিশ্বাস এবং সত্ত্ব গুণের উদয় হইয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতেঃ—

"যে হুসেন সাহা, সর্ব্ব পড়িয়ার দেশ।
দেবমূর্ত্তি দেউল, ভাঙ্গিয়া কৈল শেষ॥"
"হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।" ইত্যাদি

পুনঃ প্রশ্ন হইতে পারে সে কোন সময়?—যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়নাটকে;—

"যখন রামকেলী গ্রামে যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, এবং জড় প্রভৃতি, কি নীচ কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বৈশ্য এবং যবন ও স্বপচ প্রভৃতি একত্রিত হইয়া শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত ও নগরে অসংখ্য লোকের সমাগম ও চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির কল্লোল তখন রাজা বিস্ময় রসে আবির্ভূত হইয়া কেশব খাঁন পাত্র সমভিব্যাহারে নিজ অট্টালিকার উপরে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন কি, যেন সর্ব্বত্রই প্রসন্নতার মূর্ত্তি, সুখের উৎসব, প্রেমের বিলাস, আন-ন্দের হাট, বিপদ নাই, মলিনতা নাই, শোক নাই, জাত্যাভিমান নাই, সেই অসংখ্য লোকের মধ্যস্থলে শ্রীগঙ্গার উপকূলে দ্বিতীয় গঙ্গার স্বরূপ একটী নবীন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীতারম্ভে অকাতরে হরিনাম প্রেম বিতরণ দ্বারা পাষণ্ড দলন ও লোক নিস্তার করিতেছেন। সেই স্বর্গমেরু সদৃশ রূপরাশি রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হইবামাত্র রাজা তদগত চিত্ত হইয়া চিত্র পুত্তলিকাবৎ সেই জগন্মোহন রূপ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিমিষশূন্য নিস্পন্দ ভাবে দর্শন করিয়া আত্ম-

হারা হইলেন। সেই কালেই তাঁহার সত্ত্ব গুণের উদয় হয়। সেই কালেই শ্রীশ্রীমহা প্রভুর সহিত তাঁহার সন্মিলনের ইচ্ছা হয়।

পরন্তু ;—

" বহু জন্মানী পুণ্যানী, রতিস্যাৎ শ্যামসুন্দরে॥ "

বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং সেই রতিতে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ হয়, এবং তদভক্তকে ভগবান আত্মসাৎ করেন। রাজার সে পুণ্য ছিল না। বিবিধ পাপজনিত নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকারণ বশতঃ রাজা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপালাভে অকৃতার্থন্মন্য হইলেন। কেবল দূর হইতে দর্শন সুখ হইল, এইমাত্র। তাহার সেই কালের মনঃক্ষোভ দরিদ্র আশাবৎ মনোমধ্যেই বিলীন হয়। পশ্চাৎ শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য চেষ্টা দেখিয়া রাজার পূর্ব্বভাব উদিত হওয়াতে শ্রীসনাতনের সঙ্গলাভ বাসনায় রাজা বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীসনাতন রাজার সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সুতরাং রাজা; শ্রীসনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়া উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চাকলা শব্দে প্রদেশ, সব শব্দে "সমস্ত" "কাশ" শব্দে শেষ। যাবনিক নিকাশ শব্দ হইতেই কাশ শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা শেষ শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। নিকাশ শব্দটী বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কার্য্যকালে "কাজ শেষ অথবা নিকাশ কর, এমন স্থলে ঐ শব্দ ব্যবহার হয়। তুরকিনামা পারস্যাভিধানে ব্যক্ত আছে ;—

" নিকাশে কাশ, খাস, দুনিয়া তামাম।" ইত্যাদি

শ্রীসনাতন যখন বন্দীশালে তখন শ্রীরূপের প্রেরিত গুপ্তচর সেই শর্কর লিপি সুযোগ ক্রমে শ্রীসনাতনের হস্তে সমর্পণ করেন। আর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বন পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন, এ কথাও নিবেদন করেন।

শ্রীসনাতন শর্করখণ্ড পাইয়া শ্রীরূপের হস্তাক্ষর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার মধ্যে ৮টী অক্ষর মাত্র। অন্য কোন সংবাদ নাই। পশ্চাৎ বহুচিন্তা ও অক্ষর যোজনা করিয়া জানিলেন, মহাভাবযুক্তউপদেশপূর্ণ, একটী বিচিত্র শ্লোক।— যথা, শ্রীসনাতন বিবেকতন্ত্রে ;—

" য দু প তেঃ ক গতা মথুরা পু রী।
র ঘু প তেঃ ক গ তো ত্ত র কোশ লা!
ই তি বি চি ন্ত, কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন স দি দ ম্, জ গ তী তাব ধার য়॥ "

শ্লোকটী পাঠ করিয়াই আর স্থির হইতে পারিলেন না। অশ্রুবেগ সম্বোরণ করিতে পারিলেন না। নদীর বেগ কখন কি ধরিয়া রাখা যায়? পলাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা পাদ-বন্ধন, কেমন করিয়া পলাইবেন। স্মরণ হইল, মুদিঁঘরে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত আছে। কারাধ্যক্ষকে বহু বিনয় করিয়া বিনয়ে বাধ্য করিলেন। অবশেষে তাহাকে সেই অর্থ হইতে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া "দাড়ুকা" অর্থাৎ পাদবন্ধন বেড়ি মোচন করাইয়া ঈশান নামক জনৈক রক্ষক সমভিব্যাহারে "গড়িদ্বার" অর্থাৎ গৌড়ের দুর্গ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড রাস্তা গিয়াছে,সেই প্রকাণ্ড রাস্তায় না গিয়া রাত্রিকালে নাবিকের সাহায্যে গঙ্গাপার হইয়া পাতড়া পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করেন। অনন্তর, সমস্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাককালে পাতড়া পর্ব্বতে উপনীত হইয়া দস্যু হস্তে পতিত হন্। কথিত আছে, পার্ব্বতীয় ভুঞাজাতি পথিক পাইলে পথিকের নিকট

কি আছে, তাহা গণনা দ্বারা জানিতে পারিত। এবং অর্থ লালসায় পথিককে বিবিধ যত্নের সহিত আটক করিয়া শেষে বিষ প্রয়োগে দ্বারা প্রাণদণ্ড ও অর্থ আত্মসাৎ করিত। শ্রীসনাতন ও ঈশানকে পাইয়া জানিল, তাহাদের সহিত ৮টী মোহর আছে। তন্নিমিত্ত শ্রীসনাতনকে আবাসে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিবিধ যত্ন ও ভক্তি করেন। "অতি ভক্তি চোর লক্ষণং" রাজমন্ত্রী সনাতন তা জানিতে পারিয়া সঙ্গে কোন অর্থ আছে কি না? ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান উত্তরে বলিলেন, ৭ টী স্বর্ণ মোহর আছে। সনাতন, ঈশানের নিকট হইতে সেই ৭ মোহর লইয়াও তদ্দ্বারা ভুঞাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এবং পশ্চাৎ ঈশানের নিকট আর একটী মোহর আছে জানিয়া সেখান হইতেই ঈশানকে গৌড়ে বিদায় দেন। আর ভুঞাদিগকে বিনয়ে বাধ্য করিয়া সম্বলের মধ্যে একমাত্র করঙ্গ লইয়া সেই ভুঞাজাতির সাহায্যে বহু কষ্টে পর্ব্বতারণ্য পার হইয়া এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই ভুঞাদিগকে বিদায় দিয়া শেষে হাজিপুর নামক গ্রামে গিয়া উপনীত হন। এই হাজিপুর গ্রাম অধুনা মজঃফরপুর ও ছাঁপরা জেলার মধ্যস্থিত এই স্থানের অনতিদূর শোনপুর নামক স্থানে হরিহরছত্র নামে প্রসিদ্ধ মেলা ও ঐ মেলাতে (প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে) বহু সংখ্যক হস্তী ও ঘোটকাদি বিক্রয় হয়। শ্রীসনাতনের শ্রীকান্ত নামে ভগ্নীপতি গৌড়েশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী ঘোটক ক্রয় করিবার নিমিত্ত ঐ হাজিপুরে থাকিতেন। দৈবাৎ শ্রীসনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াতে শ্রীকান্ত শ্রীসনাতনকে পাইয়া বিশেষ যত্ন এবং কারাগার ক্লেশজনিত অত্যন্ত মলিন অবস্থা দেখিয়া ভদ্রবেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করেন। কিন্তু সনাতন সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তাঁহার প্রযত্নাতিশয়ে শীত নিবারণ হেতু কেবলমাত্র একখানি ভোটকম্বল লইয়া গঙ্গাপার ও প্রসিদ্ধ পাটনা নগরের মধ্যভাগ রাস্তা হইয়া শ্রীকাশীধামে গিয়া উপস্থিত হন এবং তত্রস্থানে উপনীত হইয়া লোক-পরম্পরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তত্রস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীচন্দ্রশেখরের বাটীতে গমন করেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে অভ্যন্তরে ছিলেন, শ্রীসনাতনের আগমন জানিতে পারিলেন। চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, বহির্দ্বারে একটী বৈষ্ণব দাড়াইয়া আছেন, তাহাকে শীঘ্র বাড়ীর ভিতরে আন। চন্দ্রশেখর তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশ পালনার্থে বহির্দ্বারে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৈষ্ণব নাই; মলিন বসন পরিধানা, সবচুল ও শ্মশ্রু এবং করঙ্কধারী একজন দরবেশ অর্থাৎ ফকির দণ্ডায়মান আছেন। সন্দেহবশতঃ তাঁহাকে আহ্বান না করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া সেই অবস্থা জানাইলেন।

প্রভু তৎশ্রবণে পুনরাজ্ঞা করিলেন, তিনি দরবেশ নহেন, ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব, তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক মৎসমীপে শীঘ্র আনয়ন কর। শ্রীচন্দ্রশেখর আজ্ঞামাত্র দ্বারদেশে গমন করিয়া সমাদরপূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে ভিতরে আনিয়া প্রভুর সহিত মিলাইলেন। প্রভু; শ্রীসনাতনকে পাইয়া করিলেন কি? শ্রীসনাতনকে ক্রোড়ে লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিজ বহির্বাসে তাঁহার

অশ্রু সমার্জ্জন করিলেন। আর তৎক্ষণাৎ শ্রীচন্দ্রশিখরের দ্বারা জনেক নরসুন্দরকে আনাইয়া সেই নরসুন্দরের দ্বারা শ্রীসনাতনের মস্তকে শিখামাত্র রাখাইয়া এবং শ্মশ্রু ত্যাগ করাইয়া সমীচীন করাইলেন। এবং বহু শিক্ষা দিয়া পশ্চাৎ বলিলেন ;—

"তোমার শরীরে মোর, প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব, বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভুক্তি কৃষ্ণ প্রেম, ভক্তের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর, বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম, সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষা॥"

এইমত শ্রীসনাতনকে বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের নিকট যাইতে অনুমতি করেন। তদনুসারে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারহেতু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপের সহিত মিলিত হন্।

এস্থলে এই কয়েকটী কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে। (১) এখনকার সবচুল এবং শ্মশ্রু ও করঙ্গ এবং কন্থাধারী মৎস্য ও পলাণ্ডু ও পান্তা অন্নভোজী, মাদক-সেবী মানবী বা পিশাচী সহযোগী কোন কোন সম্প্রদায় শ্রীসনাতন প্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া যে সমাজে পরিচয় দেয়, বস্তুতঃ তাহারা শ্রীসনাতন প্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। তাহারা দুকুলের বাহির। তাহাদের করণ কারণ ও চাল চলন দেখিলে শ্রদ্ধা হওয়া দূরে থাকুক, আপনা হইতেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন আদৌ তদ্রূপ কোন সম্প্রদায় গঠন করেন নাই।

(২) কোন কোন সম্প্রদায় বলেন; "নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।' শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের এই পরিচয়ে তাহাঁরা যবন ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন; "নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রচার॥"

ইহাতেও বেশ বিবেচনা হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নীচে দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যাহাঁরা এ সকল তর্ক করেন, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব, ইহাই বলিব যে, তাহাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত অথবা ভগবানোক্ত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা কখন দেখেন নাই। কারণ গীতাতে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন ;—

"পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

"হে পার্থ, দুষ্কৃতি জনের হস্ত হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু (বিশেষতঃ ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত) আমি অবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকি।" এস্থলে ইহাই বক্তব্য, কলিযুগ নিস্তারকাবতারে দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাস কার্য্য নাই। সুতরাং অনেকে অনেক প্রকার বলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ;—

"ধর্ম্মং মহা পুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম।
ছন্নো কলৌ যদ্ভব স্ত্রি যুগোঽত সত্তম॥"

এই কলি কালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছন্নো ভবে অবতার রূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ভক্ত দ্বারা এই ৪টী কার্য্য সমাহিত করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,

"রামানন্দ দ্বারে, কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর দ্বারে, নিরপেক্ষ পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে, সহিষ্ণুতা জানাইলা।
সনাতন রূপ দ্বারে, দৈন্য প্রকাশিলা॥
জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত, কৈলা শ্রীচৈতন্য॥"
সনাতন রূপ দৈন্য, নাপারি বুঝিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক, করে নানা মতে॥" ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন ও শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীরূপ শ্রীশ্রীমহা প্রভুর নিকট যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সে কেবল তাহাদিগের দৈন্যোক্তি।

বস্তুতঃ তাহারা যবন নহেন। কর্ণাট দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্র কুলোদ্ভব যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, তাহাদের বংশাবলীর পরিচয় এই ;—

যথা, লঘুতোষনী গ্রন্থে।

"রেজে রাজ সভা সভাজিত পদ, কর্ণাট ভূমি পতি।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদগুরু ভবি, ভরদ্বাজীশ্বয় গামনী॥
পুত্র স্তস্য নৃপস্য কশ্যপ তুল্য, মারোহত রোহিনী,
কাও স্পার্দ্ধ যশোভব স্বরপতে, স্তুল্য প্রভাবো ভবৎ॥"

*　　*　　*　　*

"বিহার স্তুনি শেখর, শিখর ভূমি বাসস্পৃহাং।
স্ফুরত স্বরতরঙ্গিনী তট, নিবাস পর্য্যুৎ সুকঃ
ততো দমুজ মর্দ্দন ক্ষিতি প্রপূজ্য পাদঃ ক্রমোৎ
ভুবাস নবহট্টকে সকিল পদ্ম নাভঃ কৃতি।
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজত স্তুতৈব সত্রোৎ সবৈ।
কন্যাষ্ঠা দশ কেন সার্দ্দম ভব স্নেতস্য পঞ্চাত্মজ
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথাশ্চ নারায়ণো।
ধীরঃ শ্রীল মুরারি রূত্তম গুণঃ শ্রীমন্মুকুন্দ কৃতী ;
জাত স্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবর শ্রীমান কুমারা ভিবঃ॥"

*　　*　　*　　*

তত্রৈর "আদি শ্রীলসনাতন স্তদনুজ শ্রীরূপ নামাততঃ"
শ্রীবল্লভ নামধেয় বলিতো নির্ব্বেদ্য যে রাজতঃ॥
আস্য দাতি কৃপাঃ ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিয়ে মুরহরঃ প্রেমাখ্যা ভক্তি শ্রিয়ি॥"

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ গোত্রে সমুদ্ভব কর্ণাট দেশীয় রাজার প্রপৌত্র পদ্মনাভ শিখর ভূমি বাসস্পৃহা পরিহার করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। ক্রমে তাহার ১৮টী কন্যা এবং পুরুষোত্তম, জগন্নাথ নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে ৫ সন্তান হয়। ঐ মুকুন্দের কুমার নামে এক সন্তান; তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। কোন দ্রোহ হওয়াতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সৎকুল জাত এবং সদাচারী হইয়াও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহারে মিল হয়। শেষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পানি গ্রহণ করেন। এবং অনেক গুলিন পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে আদি শ্রীসনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ। পরন্তু শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ কেহ ছিলেন না। শ্রীকুমার দেবের অবশিষ্ট পুত্রগণে অকালে কাল কবলে কবলিত হইয়াছিলেন। এখন তর্কবাদিগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এতৎ প্রমাণ দ্বারা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নিখুঁত ব্রাহ্মণ কি যবন? অপিচ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা প্রভুর পূর্ব্বাবতারে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সি বর্গের মধ্যে শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী ও শ্রীরূপ মঞ্জরী নামে গোপিনী ছিলেন। যথা শ্রীগণোদ্দেশ দিপীকায়াং।

"যারূপ মঞ্জরী শ্রেষ্ঠা সুরাসী রতি মঞ্জরী,
দোব্যতে নাম ভেদেন, লবঙ্গ মঞ্জরী বুধৈঃ
সাদ্য গৌর ভিন্ন তনুঃ সর্ব্বারাধ্য সনাতন,
তদেব প্রাবিশৎ কার্য্যে মুনিঃ বর সনাতন॥"
"শ্রীরূপ মঞ্জরী খ্যাতা, যাসীবৃন্দাবনে পুরা ;
সাদ্য রূপাখ্যা গোস্বামী ভুত্বা প্রকটা মিয়াৎ॥"

বৈষ্ণব দিকদর্শনাতে ব্যক্ত আছে ;— শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন ১৪১০ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭ বৎসর গৃহে বাস এবং ৪৩ বৎসর ব্রজভূমে অবস্থিতি এবং মধ্যে মধ্যে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ১৪৮০ শকের আষাঢ় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে শ্রীবৃন্দাবনের যোগধামে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যোগপিঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ তিনিই প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু রূপগোস্বামী ১৪১১ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২৫ বৎসর গৃহে অবস্থিতি ও ৫০ বৎসর শ্রীব্রজভূমে বাস ও মধ্যে মধ্যে নানা

তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ১৪৪৫ শকের শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনধামে তিরোহিত হন। শ্রীবৃন্দাবন যোগপিঠে বিরাজমান শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ শ্রীমূর্ত্তি তাহারই প্রতিষ্ঠিত।

শাস্ত্র বেত্তাগণ বলিয়াছেন ;—"পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং।"

কিন্তু বৈরাগ্যধর্ম্মে দারপরিগ্রহ একবারে নিষেধ। তাঁহারা ভবিষ্যত ভাবিয়া তন্নিবন্ধন দারপরিগ্রহ করেন নাই। বংশ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ নামান্তর অনুপম জেষ্ঠদ্বয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীশ্রীহরিভক্তি শ্রীপ্রভু প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে ইহাদের অন্যান্য কাহিনী অনেক আছে। বাহুল্যভয়ে তৎপ্রকাশে বিরত হইলাম।

বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তনিধি।
বদনগঞ্জ।

সটীক ভবিষ্যৎ মহাকাব্য।

এ মহাকাব্যের রচয়িতা কে, তাহা জানি না। কি উপায়ে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা কাহারও জানিবার প্রয়োজন দেখি না। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে টীকা দিয়াছি। কবি নিজে একটী ভূমিকা দিয়াছেন, সেটি অপ্রয়োজনীয় হইলেও আমি মুদ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

শ্রীমল্লিনাথ বঙ্গবাসী।

ভবিষ্যৎ মহাকাব্য।
ভূমিকা।

একটি গল্প আছে যে, একজন কাব্যরসগ্রাহী বদান্য ধনীর নিকটে, একজন লোক একটি শ্লোক রচনা করিয়া পুরস্কার লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল ; শ্লোকটি এই :—দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ। শ্লোক দেখিয়াই ধনী হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, এ কি রকমের শ্লোক? পুরস্কারপ্রার্থী কবি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহাশয়, শ্লোকের কোন্ লক্ষণ আমার কবিতায় নাই?" ধনী কহিলেন, "মহাশয়, শ্লোকের চারিটি চরণ থাকে।" কবি :—"আজ্ঞে আমার শ্লোকে 'বিড়াল' রহিয়াছে ; বিড়াল চতুষ্পদ, সুতরাং চারিচরণের অভাব কোথায়?" ধনী কৌতুক দেখিবার জন্য হাসিয়া বলিলেন,"শ্লোকে একটা রস থাকা চাইত?" কবি :—"কেন, আমার শ্লোকে দুগ্ধ আছে, ইহা সাক্ষাৎ গব্যরস।" ধনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শ্লোকের একটা অর্থ কই?" এবার কবি হাসিয়া বলিলেন—"মহাশয় যদি অর্থ থাকিত, তবে আর আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি কেন?" ধনী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে পুরস্কার দান করিলেন।

আমার এ মহাকাব্যও সর্ব্বলক্ষণ যুক্ত। ইহাতে প্রলয় আছে, সৃষ্টি আছে, যুদ্ধবিগ্রহাদি আছে,রাজ বংশের বর্ণনা আছে, এবং নয়টি সর্গও আছে। তবে রস আছে কি না, সে কথা পাঠকগণ বিচার করিবেন। আর অর্থ আছে কি না, গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে আমি নিজে তাহার বিচার করিতে পারিব। অলমতি বিস্তরেণ।

১ম সর্গ।

(১)

বিধিলিপি, ভবিতব্য, কে খণ্ডাতে পারে ?
কলিতলা ভূমে ঘোঁট,
মেসিন্ প্রেসের চোট,
কত ইন্দ্র চন্দ্র অষ্টবসু দরবারে *—
বসিয়া মন্ত্রিল কত,
গালি দিল মনোমত,
তবুও বিকৃত রুচি বাঙ্গালী সন্তান—
এমনি স্বভাব ধৃষ্ট,
না ভাবিল নিজ ইষ্ট,
নাহি দিল্ কড়ি তায় পেতে পরিত্রাণ।
ইন্দ্র পুরাঙ্গনাগণ
হেরি এই অলক্ষণ,
নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্রতে আসিয়া ধরায়,
সহরের বুক জেঁ'তে
রঙ্গভূমি নিল পেতে ;
বঙ্গভূমি তবু ত্রাণ ঠেলিল হেলায়।

(২)

হায় হায়, বিধিলিপি কে পারে খণ্ডাতে ?
অধর্ম্মের অত্যাচার
নাহিক সহিল আর—
ক্রোধে দণ্ড নিলা দেব, বঙ্গেরে দণ্ডিতে।
আষাঢ় পহেলা দিবা,—
বরষার ঘটা কিবা,—
কড় কড়ে বজ্রনাদ, উপজয়ে ভয় ;
অশ্রান্ত অনন্ত বৃষ্টি—
ভেসে যায় বঙ্গ সৃষ্টি ;
অখণ্ড্য দেশের রিষ্টি, আসিল প্রলয়।

গলা গলা হল জল,
যায় বঙ্গ রসাতল ;
আঁকু মাকু করি সবে উঠে গৃহ ছাদে ;
কিন্তু জল ক্রমে বাড়ে,
মূল সুদ্ধ ঘর নড়ে ;
পড়িল গলিয়া শেষে 'ছপ্ ছপ্' নাদে।

(৩)

ঘর বাড়ী এমারৎ কীর্ত্তি-স্তম্ভ যত,
বনরাজি পাখী পশু,
মানবের পঞ্চ অসু,
প্রলয়ের পদতলে হল অবনত।
হায়রে বরষাকালে,
উনবিংশ এক শালে,
এরূপে বাঙ্গালী বংশ ধ্বংস একেবারে।
অনিত্য এ ঘর বাড়ী
তবু এত বাড়াবাড়ী
কেন হায়! ভাবে কবি ভাসি নেত্রাসারে।
না শুনিলে উপদেশ,
এবে এই হল শেষ ;
ইন্দ্রে না সঁপিয়া অথ কি হল সে ধনে ?
মরেছ, এখন আর
কিবা মিছা তিরস্কার ;
পূর্ব্বে না বুঝিলে, তাই দুঃখ র'ল মনে।

(৪)

দুরন্ত প্রলয় অন্তে কিবা ছিল বাকী ?
বেঁচে ছিল অর্দ্ধ লাখ
ভূষণ্ডি কুলের কাক,
কাদাখোঁচা, ছাতারিয়া এইরূপ পাখী।
কেন না মাংসের লোভে
কের যদি পাপে ডোবে
লোভী মানবের দল ; এই শঙ্কা করি—
শুধু সঙ্গীতের তরে,
রাখিলেন খাঁচা করে
উল্লিখিত পাখী-গুলি, লীলাময় হরি।

---

* টীকা—ইন্দ্রের সহিত অষ্টবসুর কোন পৌরাণিক সংশ্রব নাই ; দ্বিতীয়তঃ দেবতাদিগের সহিত ইংরাজের আমলের মেসিন প্রেসের কথা লিখিয়া কবি আপনার মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভূচর আদির মাঝে,
যেকটি নিতান্ত বাজে,
তারা ছাড়া আর গুলি বাঁচিয়া উঠিল ;
বিলায়তি ফুল ফল
মরে গেল অজচ্ছল,
গজাল কুমুড়া, ঘেঁটু আবার ফুটিল।

(৫)

লোপ কিসে পায় আর্য্য বংশ আহা মরি ;
রয়ে গেল চারি জন
নরকুলে বিচক্ষণ,
ইন্দ্র বসু দীননাথ কৃষ্ণ নাম করি। *
যোগশাস্ত্রে অধিকারী
বৈদ্যুতিক টিকি ধারী,
তাহারা মরিতে পারে? সম্ভবেনা কভু।
রঙ্গভূমে পুণ্যনারী
বঙ্গভূমে র'ল চারি ;
হইলেন চারি বীর তাহাদের প্রভু।
কলিতলা গৃহ ছত্রে
জড়িত সংবাদ পত্রে,
অপূর্ব্ব পাইল রক্ষা ভারতের বেদ ;
পাপে ভারি বসুন্ধরা
ডুবে বটে গেল ত্বরা,
কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা হল আর কার খেদ?
ভনিল কবি ভবিষ্যৎ কেমনে ঈশ রোষে—
প্রলয় হইল বঙ্গে পাপ কর্ম্মে স্বদোষে। ‡
ইতি প্রলয় নামক প্রথম সর্গ।

২য় সর্গ।

প্রলয়ের ঝড় গেল থেমে ;
জল গেল সাগরেতে নেমে।
নব সৃষ্টি নব বঙ্গে হইল রচন।
বেঁচে ছিল আর্য্যভাব ধারী
যেই চারি যোড়া নর নারী,
আধ্যাত্মিকভাবে তারা মিলিল এখন।
বিধাতার বিশেষ নিয়োগে
কলিতলা বীডন্ সংযোগে (১)
কিরূপে হইল সৃষ্টি কহি সংক্ষেপিয়া ;
মেল্‌থাসে ব্যক্ত আছে ধারা—
কিরূপেতে আর্য্য তেজে তারা—
অচিরে মানুষে দেশ ফেলিল ছাপিয়া ;
বর্ষা অন্তে নব কুশাঙ্কুর,—
করে যথা ক্ষেত্র ভরপুর,
তেমনি অসংখ্য আর্য্য উঠে গজাইয়া।
কিম্বা যথা বরষার চোটে—
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে শত ফোটে
বেঙ্-ছাতি শির ফুলাইয়া—
পিতৃ মাতৃ ধর্ম্ম পুণ্য রাশি
সংক্রমিল সেই বংশে আসি ;
লিখেছে ডার্ব্বিন্ এই তত্ত্ব বিস্তারিয়া।
সুতরাং বুঝহ সংকেতে,
কিরূপে সে নবীন বঙ্গেতে
ষোল আনা আর্য্য ধর্ম্ম বেড়াল চরিয়া।
নীরোগ হইল নারী নর,
দূরে গেল ম্যালেরিয়া জ্বর ;
দূর হল যাবনিক আধি ব্যাধিচয়।
গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষা তরে
জোর করে ড্রেন্ নাহি করে ;
শুধু আর্য্য তেজে ধরা হলো শান্তিময়।
কেহ আর রহিল না গাধা
বালিকা বিবাহে দিতে বাধা ;
অথবা দশমে তার ধর্ম্ম রক্ষা তরে।

টীকা—* ইন্দ্র নাম করিয়া, অথবা দীননাথ যে কৃষ্ণ তাঁহার নাম করিয়া উদ্ধার পাইল, এরূপ অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু 'বসু' কেন? অষ্টবসুর নাম করিয়া কোন কার্য্য হইবার তো প্রথা নাই?

‡ দেখিতেছি মালিনী ছন্দে সর্গভঙ্গ করা হইয়াছে ; কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত ছন্দ কেন? আর যদি সংস্কৃতের অনুকরণ করা হইয়া থাকে, তবে আর দুখানি চরণ কোথা?

(১) বীডন্ অর্থ কি?

পুরুষ লইল বহু নারী,
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ভারি;
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি হ'ল ঘরে ঘরে।
নিষেধ করে না আর কেউ—
বাঘের পশ্চাতে যথা ফেউ—
আধ্যাত্মিকভাবে যেতে বেশ্যা রঙ্গভূমে।
যে যাহার নিজ মনোমত
হইল আমোদে সদা রত;
শিহরি রহিল দেশ উৎসবের ধূমে।
প্রলয়েতে হয়েছিল সাফ্—
নাহি ছিল রেল্ টেলিগ্রাফ্—
যোগ বলে এবে শুধু সব কার্য্য হয়;
সূক্ষ্ম দেহে যায় শূন্যে উড়ে—
প্রবেশে পাতালে ভুঁই ফুঁড়ে—
আর্য্যকীর্ত্তি আর্য্য তেজ জগতে অক্ষয়।
নিত্য মধুমাস ময় বঙ্গ মরি হোইল
ঘেঁটু ফুল কাককুল চারিদিক ছাইল।
পুণ্যময় দেশ ভরি আর্য্যদল ভাতিল;
ছন্দময় কাব্য কবি যত্ন করি গাঁথিল।
(ইতি সৃষ্টি নামক ২য় সর্গ।)

৩য় সর্গ।

হলত বিপুল সৃষ্টি; তখন লোকের দৃষ্টি
পড়ে গেল সুতীক্ষ্ণ বিচারে;
"মাথা শূন্য নহে কেশ, রাজা শূন্য নহে দেশ,
রাজা তবে বল করি কারে?
"আইনেতে অধিকার, সব চেয়ে সেরা যার,
আমাদের সেই রাজা হবে;
"ইন্দ্র নাম দিয়ে তার, রাজ ছাপ মেরে গায়
বসাইব" মন্ত্রিল সরবে।
গুণের বাছনি করি, রাজা সবে নিল ধরি;
রাণী তাঁর পরমা সুন্দরী—
সঙ্গীতের আলাপনে, নৃত্য গীতে একমনে,
পূর্ব্বে ছিল বীডন কিন্নরী।
দুই জন (?) করে ঘর (১) রাজা রাণী একত্তর,
কিন্তু এক বিপত্তি ঘটিল:—
সবারি বংশের ক্রম, বেঙের বেঙাচি সম,
একা শচী পড়িয়া রহিল।
গোধন চরাল শেষে, মাঠে ঘাটে দেশে
দেশে (২)
কেমনে কি হল নাহি জানি,
আর কিছু দিন পরে, আঁচাআঁচি পরস্পরে
পাড়া শুদ্ধ শেষে কাণাকাণি;
শেষে কথা স্পষ্ট খোলা, কিন্নরী ধরিল খোলা
পোড়ামাটি ইত্যাদি যাবৎ।
হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে সবে, পূর্ণদেশ মহোৎসবে;
কেটে গেল প্রকাণ্ড আপৎ।
রক্ষিতে সে মহাবংশ, সর্ব্বলোক পাল অংশ,
তিল তিল হয়েছিল জড়,
তাই বুঝি হল তার, অতিশয় গুরু ভার,
প্রজার আনন্দ তাহে বড় (৩)
শেষে তিনমাস পরে (৪) পবিত্র আর্য্যের ঘরে
জন্মে শিশু পুত্র মনোহর—
কিবা চক্ষু কিবা নাক, কিবা তার হাঁক ডাক,
কিবা মুখ কিবা ওষ্ঠাধর।
জন্মমাত্রে কাঁদে নাচে, লাফাইয়া উঠে গাছে,

(২) সর্গভঙ্গের শ্লোক হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িবার জন্য কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টীকা—(১) 'দুইজন' এই কথার পর প্রশ্ন চিহ্ন কেন? কবি punctuation জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

(২) এস্থানে সম্পূর্ণ রঘুবংশের অনুকরণ

(৩) গোধন চরাণ হইতে এ পর্য্যন্ত ভর্জ্জিক অনুকরণ কাণ্ড; মহাবংশ রক্ষার জন্য লোক পালাদি অংশের কথা রঘুবংশে এইরূপ আছে।

(৪) তিন মাস পরে, ইহা অসম্ভব; কবি সবই জল্দি জল্দি সারিয়াছেন।

কণ্ঠাগ্রে ভারতী খেলা করে
হাতে দিয়ে করতালি, মাতাকে বলিত **(৫)
হাসে মাতা প্রফুল্ল অন্তরে।
দিনক্ষণ বুঝে সুঝে, আধ্যাত্মিক গ্রন্থ খুঁজে,
নাম তার দিল কালাচাঁদ।
যোগীন্দ্র তাহার পায়, লুটাইয়া বলে হায়
আজি মোর ঘুচিল বিষাদ।
একি রত্ন গাছে ফলে? দীর্ঘ তপস্যায় ফলে,
সবারি অংশেতে আমাদের—
স্বর্গে না খুঁজিলে মেলে, জনমিল হেন ছেলে,
পবিত্র বংশেতে রাজাদের।
না হইতে দশ পার, দশ বিয়ে হল তার;
দ্বাদশেতে দ্বাদশ সন্তান;
ক্রমে বংশ হল তাজা, শেষে সেই হ'ল রাজা;
বাণপ্রস্থে ইন্দ্র তিরোধান।
ইন্দ্র-শ্রাদ্ধ প্রচুর করিয়া সোম নামা সুধাতে,
নৃত্যে গীতে গৃহ অবিরত গুঞ্জিয়া সপ্ত রাত্রি;
আষাঢ়েতে প্রথম দিবসে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত
হোলো পুত্র; প্রলয় গণনে ষোল বর্ষের
অন্তে। (৬)

ইতি অভিষেক নামক তৃতীয় সর্গ।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (৭)

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যবস্থা-ঘটিত উন্নতি।

কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য কিরূপ সরকারি বন্দোবস্ত হইতে পারে, ইহাই এই অধ্যায়ে বিচার করা যাইবে। এ বিষয়ে যে কোন সরকারি বন্দোবস্ত নাই, একথা বলিলে ভুল হয়। ১৮৭৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৮৪ সালের ১২ আইন ভারতবর্ষের উত্তরাংশের কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়। স্থান বিশেষে এই আইনের সাহায্যে অনেক উন্নতিও হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আইন অনুসারে ঋণ দান বা ঋণ গ্রহণ করা প্রায় কুত্রাপি প্রচলিত হয় নাই। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কমিসনরের উপর ঋণদানের ভার আপাততঃ অর্পিত। তাঁহাদের কাজ এত অধিক যে, এই আইনানুসারে কৃষকদিগের উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইলে পাছে তাঁহাদিগের কার্য্য অনেক বাড়িয়া যায়, এই কারণে তাঁহাদিগের এই উন্নতির প্রশ্রয়ের প্রতি অনাস্থা। কৃষকেরাও আইনানুসারে জামিনের যোগাড় করিতে অর্থ ব্যয় হইবে, ঋণ পাইতে অনেক বিলম্ব সহিতে ও হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক শতকরা ৬।০ সুদে ঋণ লওয়া অপেক্ষা, দেড়া সুদে অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ৫০৲ টাকা সুদ হিসাবে মহাজনের নিকট বীজ লওয়া বা আহারের চাউল ফুরাইলে ধান্য লওয়াই ভাল, এইরূপ স্থির করে। যে আইনের কথা উল্লেখ করা হইল উহা যে কেবল কৃষকদিগের বীজের মূল্য পাইবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, এমন নহে। এই আইনের উপর নির্ভর

(৫) * * চিহ্নের অর্থ কি? এ কি বিদ্রূপ না বিকল্প? যাহাই হউক কিছুই হয় নাই; বিদ্রূপ ফোটে নাই, বিকল্প হয় নাই।

(৬) কবি বলেন, এটা মন্দাক্রান্তা বৃত্ত।

করিয়া কৃষকগণ, পুষ্করিণী বা কূপ খনন ও পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য, বন্যা হইতে জমী রক্ষা করণার্থ বাঁধ দিবার জন্য, লাঙ্গলের বলদ কিনিবার জন্য, এবং কৃষি ব্যবসায় চালাইতে গিয়া অন্যের নিকট যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধের জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট যথেষ্ট জামিন দিয়া ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারে। বাস্তবিক এই আইনানুসারে যদি কার্য্য করিবার কোন সুবন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে দেশের কৃষকদিগের সমূহ উপকার দর্শে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেমন গ্রামে ২ এক জন পাটওয়ারি ছিল, সেইরূপ পাটওয়ারী বা কানুনগো প্রত্যেক গ্রামের বা কয়েকটী গ্রাম সমষ্টির তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইবার কথা পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, এ সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কার্য্যে পরিণত হইলে এবং কৃষিকার্য্যে সহায়তায় সম্যক প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে এই আইন দ্বারা যে কৃষকদিগের উন্নতি কল্পে একটী সুন্দর ভিত্তি স্থাপিত হইবে, এরূপ আশা আছে। এই আইনের দ্বারা জমীর যেরূপ বন্দোবস্তের কল্পনা হইতেছে, সেই বন্দোবস্তের ভার গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের উপরই অর্পিত। কৃষি ও ভূম্যধিকার বন্দোবস্ত এক বিভাগের উপর ন্যস্ত হওয়াতে, কানুনগোগণের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ঋণ দান করা সুবিধা হওয়া সম্ভব। ঋষিগণ যাহাতে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধারণের মধ্যে থাকে, ইহা ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবেরও মত।

গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষতি না হয়, অথচ সহজে অনেক কৃষক ঋণ পায়, কানুনগোগণের সহিত একটী কমিসন বন্দোবস্ত হইলেই ইহা নিষ্পন্ন হইবে। স্থানীয় লোক জামিন দিয়া কানুনগো নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিনা মোকদ্দমায় কানুনগোগণ যত টাকার ঋণ নিয়মিত সময়ের মধ্যে সুদশুদ্ধ আদায় করিয়া দিতে পারিবে, সেই টাকার উপর শতকরা ৷৷৹ আনা করিয়া কমিশন পাইলে, উহারা ঋণদান ও আদায়, উভয় বিষয়েই যত্নবান থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত বন্দোবস্তী ডেপুটি কলেক্টাররাও স্থানীয় তদারকের দ্বারা সর্ব্বদাই জানিতে পারিবেন, ঋণ দান কার্য্যে উৎকোচের প্রাদুর্ভাব আছে বলিয়া কৃষকগণ কানুনগোর নিকট ঋণ না লইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনদিগের নিকটই অত্যধিক সুদে ঋণ লইতে উৎসুক কি না? ঋণের টাকা কৃষকের হস্তে অর্পণ ও ডেপুটীকালেক্টরের সম্মুখে হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষিঋণ দান ও আদায় কানুনগোদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিলে, এ কার্য্য নিশ্চয়ই সুচারুরূপে চলিবে, এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে বৃথা লেখালিখি ও হাঁটাহাঁটি আবশ্যক হইবে না। জামিন সম্বন্ধেও নিয়ম শিথিল হওয়া আবশ্যক। সিকিভাগ না বসাইয়া প্রায় কেহ জামিন হইতে রাজি হয়েন না। কানুনগো আবশ্যক বোধ করিলে কৃষকের জামিন না লইয়া ঋণ দানে সম্মতি দিবে না, এইমাত্র নিয়ম থাকিলেই যথেষ্ট।

ঋণ সম্বন্ধে আর একটু ব্যাপক নিয়ম হইলে ভাল হয়। কেবল গ্রামের কৃষকগণই ঋণ পাইবে, শিল্পীগণ পাইবে না, এরূপ নিয়মে সকল প্রজার সমান সুবিধা হইল না। শিল্পীগণ কৃষকদিগের অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর লোক বটে,

কিন্তু তাহারাও মহাজন-প্রপীড়িত। গ্রাম্য শিল্প সমুদয় মহাজনের দৌরাত্ম্যে ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত প্রায়। দেশীয় তন্তুবায় যে বিলাতি কাপড়ের দরে দেশী কাপড় বিক্রয় করিতে পারেনা, এমত নহে, কিন্তু মহাজনের সুদ দিয়া ও তাঁহাকে বিনালাভে অর্থাৎ বিলাতি কাপড় অপেক্ষাও সুলভ মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিয়া যে কাপড় তাহার অবশিষ্ট থাকে, তাহা অন্যকে অধিক মূল্যে বিক্রয় না করিলে বেচারার অন্নই জুটিয়া উঠা দায়। উদাহরণ স্থলে মুরশিদাবাদ জেলার একজন প্রধান রেশম তন্তুবায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মির্জ্জাপুরের প্রধান তন্তুবায় মৃত্যুঞ্জয় সরকার এক মহাজনের নিকট ৮০০৲ টাকা ও অন্য এক মহাজনের নিকট ৩০০৲ টাকা ঋণী। ৮০০৲ টাকার জন্য বাৎসরিক শতকরা ১৮৲ টাকার হারে ও ৩০০৲ টাকার জন্য ২৪৲ টাকার হারে তাহাকে সুদ দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ধনী মহাজন দ্বয়ের যখন যে রেশম কাপড়ের বরাত হইবে, মৃত্যুঞ্জয়কে খরচা মাত্র পোষাইয়া তাহা যোগাইতে হইবে। রেশম কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও অবশ্যম্ভাবী হীনাবস্থায় ঋণ যেরূপ একটী প্রধান কারণ, অন্যান্য শিল্পেরও দুরাবস্থার প্রায় সেই কারণ। কৃষক ও শিল্পীদিগের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ হইলে যে দেশের আবস্থা কত পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বলা যায় না।

জমির বন্দোবস্ত করিবার ও হিসাব রক্ষার জন্য যে সকল কানুনগো নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগের জমির জরিপ জমীদার ও কৃষক সংক্রান্ত আইন ও কি কি উপায়ে জমির উন্নতি সাধন হয়, এই সকল বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা দিয়া পরে নিযুক্ত করা উচিত। ভাগারি, বৃক্ষরোপণ, গাছে কীটলাগা নিবারণ, শস্যরক্ষা, জমীর সার, প্রভৃতি কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে মুদ্রিত প্রবন্ধ কানুনগো আপিসে বিক্রয়ার্থে থাকা আবশ্যক। কৃষকগণ সহসা সাহস করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে যাইতে পারে না, কিন্তু কানুনগো আপিসে কৃষকদের উন্নতির নানা উপায় হইলে, সেই সকল উন্নতি কৃষকগণ অনায়াসেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে। আপাততঃ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেক কৃষক ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে।

১৮৮৪ সালের ১২ আইনের ৬ধারা অনুসারে গ্রামের সমুদায় লোক একত্র হইয়া যাহাতে কোন সাধারণ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী গ্রামের সাধারণ উন্নতি সমুদায় জমী দারেরই কর্ত্তব্যের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট; সাধারণ উন্নতি সাধন দ্বারা জমীদারও আইনানুসারে প্রজার নিকট অধিক হারে খাজনার দাবি করিতে পারেন। গ্রামের স্বাস্থ্যহানি বা কৃষি বিভ্রাট নিরাকরণার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। এই সমুদায় অনুষ্ঠান কার্য্য কিরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহার বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। কানুনগো আপিসে এই সকল পুস্তিকা বিক্রয় হইলে কৃষকদিগের এই সকল উন্নতি সাধনের দিকে নিশ্চয়ই ক্রমশঃ আস্থা জন্মিবে। জমীদারের নিকট আবেদন করিয়া নিষ্ফল হইলে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ লইয়া কানুনগো ও গবর্ণমেণ্টের এঞ্জিনিয়ার দ্বারাই একের পর অন্য উন্নতি কার্য্যে প্রতিশ্রুত করিতে পারে। উল্লিখিত ১২ আইনের

৬ ধারা বাঙ্গালা দেশে প্রযুজ্য না হইলেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে প্রযুজ্য হইতে পারে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ না হয়, অথচ জমীদারের অনাস্থায়ী সত্ত্বেও গ্রামের স্বাস্থ্য বা কৃষিকার্য্যের হানি নিবারণের উপায় হয়, এরূপ বন্দোবস্ত তাগাবি ঋণ দ্বারা অনায়াসেই হইতে পারে। কানুনগো আপিসে সাধারণ ঋণের জন্য আবেদন হইলে, ঐ আবেদন বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টরের আপিসে কানুনগো দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় সমেত দাখিল হওয়া কর্ত্তব্য। বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টরের ঋণ দেওয়া অভিপ্রেত হইলে, তিনি জমিদারের কাছারিতে অমুক তারিখে অমুক গ্রামে অমুক সাধারণ কার্য্যের জন্য জমিদার কোন বন্দোবস্ত না করিলে প্রজাদের ঋণ দেওয়া হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে জমীদারের লোক আসিয়া ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থিত উন্নতি জমীদার দ্বারা সাধিত হইবে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে প্রজাদিগের ঋণ দেওয়া স্থগিত থাকিবে। জমীদার অর্থাভাবে এই উন্নতি সাধনে অশক্ত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইলে এবং জমিদার তাগাবি ঋণ লইতে সম্মত থাকিলে জমিদারকেই ঐ ঋণ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ হইবে না; অথচ জমিদার তাগাবি করিয়া প্রজাদের যে স্থায়ী উন্নতি করিবেন, তজ্জন্য যে অধিক হারে প্রজার নিকট খাজনা প্রাপ্য, তাহাও তিনি পাইতে পারিবেন। যে খানে জমীদারের অনাস্থা বশতঃ প্রজারা ঋণ লইয়া নিজেদের উদ্যোগে গ্রামের কোন স্থায়ী উন্নতি করিবে, সেখানে জমীদার প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, এরূপও নিয়ম হওয়া উচিত। এরূপ হইলে প্রজা ও জমীদার উভয় পক্ষেরই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে এবং উভয় পক্ষেরই স্থায়ী উন্নতি সাধনের সহিত স্বার্থ জড়িত থাকায় দেশের স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রত্যেক বন্দোবস্তী ডেপুটীকালেক্টর প্রতিবৎসর এত টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দান করিতে পারিবেন, এইরূপ একটা নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। আপাততঃ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কৃষি ঋণ দানের বন্দোবস্ত করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। প্রত্যেক জেলার জন্য তাগাবির পৃথক্ বজেট নাই, এবং তাগাবি না দিলে ম্যাজিষ্টেটদিগের এক্ষণে কিছুই দুর্ণাম হয় না। বন্দোবস্তী ডেপুটীকালেক্টরদিগের দ্বারা দেয় তাগাবির বজেট হইলে এবং ঐ বজেট অনুসারে কোন কাজই না হইলে, তাঁহাদের জবাবদারী হইতে হইবে।

কৃষকগণ এক্ষণে প্রায় বীজ ক্রয়ের জন্যই মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে মহাজনগণ টাকা না দিয়া বীজের শস্য ঋণস্বরূপ কৃষকদিগকে দিয়া তৎকালীন বীজের যে মূল্য, তাহাই ঋণের টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। শস্য উৎপন্ন হইলে ঐ টাকায় যত নূতন শস্য ঐ সময় পাওয়া যায়, ও সুদের পরিবর্ত্তে আরও এক চতুর্থাংশ পরিমাণ শস্য কৃষকের নিকট গ্রহণ করেন। শস্য যদি দৈবাৎ মারা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত বীজের মূল্য ও তাহার এক চতুর্থাংশ ঋণ ধার্য্য হইয়া ইহার পরে আবার শস্যোৎপাদন কালে ঐ ঋণের জন্য সুদ সহ টাকা বা শস্য কৃষককে দিতে হয়। মহাজনগণ

ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষককে পীড়াপীড়ি করেন না। অদূরদর্শী কৃষকও ঋণ পরিশোধে তাদৃশ ব্যগ্র না হইয়া ফসল উত্তম হইলে অন্য প্রকার ব্যয়ে অধিক তৎপর হয়। এরূপ অবস্থায় অনেক কৃষকই মহাজনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কানুনগোও, মহাজনের পরিবর্ত্তে কৃষকগণকে সময়ে যাহাতে বীজ দিতে পারেন ও টাকার পরিবর্ত্তে শস্য কর্ত্তনের সময় যাহাতে শস্য লইতে পারেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। বীজ দান দ্বারা কৃষিবিভাগ কৃষকদিগের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। বীজের গুণে বা বীজের দোষে শস্যোৎপাদনের বিশেষ তারতম্য হয়। একই জমীতে একই কালে এক প্রকার ধান্য, গোধুম বা আলুর বীজ হইতে অধিক পরিমাণ ফসল ও অন্য প্রকার বীজ হইতে অল্প পরিমাণ ফসল হয়। কোন প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অনাবৃষ্টিতে অধিক ক্ষতি হয় না, আবার কোন প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অতি বৃষ্টিতে অধিক ক্ষতি হয় না। কোন্ কোন্ ভূভাগে কোন্ কোন্ প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অধিক পরিমাণ ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৃষি-বিভাগের পরীক্ষা সমূহের ইহাই একটী মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষার ফল অনুসারে কানুনগোগণও বুঝিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ জাতীয় বীজ তাঁহাদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধারণের অধীনস্থ গ্রামপুঞ্জের জন্য উপযোগী। উপযুক্ত বীজের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে কৃষি কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। বস্তুতঃ কানুনগোগণ কৃষি-বিদ্যালয়ে ও পরীক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষিত হইলে ও তাঁহাদের সহিত কৃষি বিভাগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রক্ষিত হইলে, তাঁহাদের দ্বারা যে গ্রামে গ্রামে কত প্রকার উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেফটেনেণ্ট পোগ্‌সন্ তাঁহার ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই মত বারম্বার প্রকাশিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা ক্ষেত্রগুলি প্রজাদিগের ব্যবহারের উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুতের জন্যই প্রধানতঃ রাখা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ভলকর সাহেবও গবর্ণমেণ্টকে মহাজনের পরিবর্ত্তে প্রজাকে বীজ যোগাইবার ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে যে কয়টী পরীক্ষা ক্ষেত্র আছে, সে গুলি উদ্দেশ্য-বিহীন বলিলেও বলা যায়। কানুনগো-আপিসে কৃষকগণ বীজের জন্য আবেদন করিলে, ঐ অবেদন বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টর ও কৃষি বিভাগের কর্ত্তার অনুমতি ও আদেশ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কোন একটী বীজ-প্রস্তুতের ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের নিকট দাখিল হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের জন্য বিশেষ উপযোগী যদি কোন প্রকার বীজ ক্ষেত্রাধ্যক্ষের নিকট মজুত থাকে, তবে তিনি সেই বীজ কানুনগোর তিকট প্রেরণ করিবেন, নতুবা স্থানীয় বীজ তাঁহার শস্য-ভাণ্ডার হইতে দিতে অনুরোধ করিবেন।

প্রত্যেক কানুনগো-আপিসে এক একটী শস্যভাণ্ডার থাকা কর্ত্তব্য। তাগাবি ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকগণের পক্ষে শস্য কর্ত্তণের সময় শস্য দেওয়াই সুবিধা। সেই শস্য অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া কৃষকগণ টাকা হাতে পাইলে প্রায় ব্যয় করিয়া ফেলে। কৃষকগণ এখনও অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার ও

ঋণ পরিশোধের আবশ্যকতা শিক্ষা করে নাই। তাহাদের বীজ আবশ্যক হইলে বীজ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ ঋণ স্বরূপ না দিয়া বীজ দেওয়াই ভাল। পরিশোধ কালেও তাহারা যদি অর্থ না দিয়া বীজের মূল্য ও নির্দ্দিষ্ট কুলিদের অনুরূপ শস্য দেয়, তবে তাহাই লওয়া কর্ত্তব্য। এই সমস্ত শস্য এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত কানুনগো আপিসে উপযুক্ত ভাণ্ডারে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ শস্য রক্ষার পাঁচটী উদ্দেশ্য (১) পুরাতন চাউল, গোধুম, ছোলা প্রভৃতি নূতন চাউল, গোধুম, ছোলা প্রভৃতি হইতে সহজে পরিপাক হয়। মহাজন কর্ত্তৃক নূতন চাউল প্রভৃতির ক্রয় ও রপ্তানি এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, পুরাতন চাউলাদি এক্ষণে বাজারে পূর্ব্বের মত সহজে পাওয়া যায় না। কানুনগো-আপিস হইতে সর্ব্বত্র এক বৎসর পুরাতন করিয়া শস্য বিক্রয়ের নিয়ম হইলে বাজারে পুরাতন শস্য পুনরায় সহজে পাওয়া যাইবে। (২) নূতন চাউলাদি অপেক্ষা পুরাতন চাউলাদির মূল্য অধিক। শস্য এক বৎসর ভাণ্ডারে রাখিয়া বিক্রয় করিলে, বোধ হয়, কানুনগো আপিস সংরক্ষণে গবর্ণমেণ্টের যত ব্যয় হইবে, সমস্তই উঠিয়া যাইবে। (৩) শস্য সমুদায়ের রপ্তানি বৃদ্ধি হওয়ায় গোলাজাত করিয়া শস্য রাখার প্রতি কৃষকদিগের আর পূর্ব্বের মত আস্থা নাই। এক্ষণে দেশের সর্ব্বত্র যদি ভাল ধান হয় ও কেবল একটী স্থানে মাত্র ধান ডুবিয়া বা জলিয়া যায়, তখনই সেই স্থানের কৃষকগণের অন্নকষ্টে হাহাকার পড়িয়া যায়। কানুনগো আপিসে যদি এক বৎসর শস্য রাখিয়া বিক্রয় করার নিয়ম হয়, তবে দৈব দুর্ব্বিপাকে এইরূপ স্থানীয় অন্নকষ্টের বিশেষ লাঘব হয়। কৃষকগণ এরূপ অবস্থায় সরকারি শস্যভাণ্ডার গুলি হইতে উপযুক্ত মূল্যে বীজের বা আহারের জন্য শস্য ক্রয় বা ঋণ করিতে পারে। অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য সরকারি শস্য-গোলা সকল স্থাপনের প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়। (২) সাধারণতঃ প্রজারা বীজের জন্য ঋণ লইতে আসিলেই কানুনগো পূর্ব্ব-কথিত মত পরীক্ষা ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে বীজ-শস্য-ভাণ্ডার হইতে প্রজাদিগের বীজ ঋণ স্বরূপ বিতরণ করিবেন। (৪) শস্য কীটের উপদ্রব হইতে কিরূপে সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, এই সকল সরকারি শস্য-ভাণ্ডার এবিষয়ে শিক্ষা-স্থল হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষক যদি কীট বীজের শস্য নিজেই রক্ষা করিতে পারিত, তবে সে মহাজনের উপর তাদৃশ নির্ভর করিত না। বীজের শস্য না রক্ষা করিতে পারাই তাহার মহাজনের নিকট যাওয়ার এক প্রধান কারণ। ধান্য ও মাসকলাই রক্ষা করা তাদৃশ কঠিন নহে। ডাউল, গোধুম, ভুট্টা, ছোলা, পেয়াজের বীজ প্রভৃতি কতক গুলি শস্য কৃষকগণ প্রায় রক্ষা করিতে পারে না। কার্বণ বাইসালফাইড ব্যবহার দ্বারা কিরূপে সকল শস্য অতি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে কীট হইতে রক্ষা করা যায়, সরকারি শস্যের ভাণ্ডারগুলি ইহারই অদর্শ হইবে। গবর্ণমেণ্ট মহাজনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কৃষককে বীজ দান করেন, ইহা ডাক্তার ভলকার সাহেবেরও অনুরোধ।

আমাদের দেশের কৃষকগণ যে ইংরাজ রাজত্বকালে অধিক ঋণগ্রস্ত বা হীনাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে। কৃষকশ্রেণীর যে ইংরাজ রাজত্ব

কালে উন্নতি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষকদিগের ঋণগ্রহণ প্রথা যে হিন্দু রাজত্বকালেও বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ মনুসংহিতার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইংরাজিকারের প্রথমাবস্থায়ও যে কৃষকদিগের এই দশা ছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত মিসনরি ডাক্তার কেরি যখন ভারতবর্ষীয় কৃষি উদ্যান সমিতি (Agricultural and Horticultural Society of India) স্থাপন করেন, তখন কৃষকদিগের উত্তমর্ণ হইতে মুক্ত করা তাঁহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নূতন প্রকারের শস্যের বা ফুলের বীজ ও ফল ও ফুলের চারা বিতরণই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে উপকার হইতেছে না, তাহা নহে, তবে প্রকৃত কৃষকদের উপকারের জন্য এক্ষণে যে বিশেষ কোনই বন্দোবস্ত নাই, তাহা স্থির। ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোকেরও অধিক কৃষিজীবী! ইহাদের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট সহায়তায় সকল কার্য্যে পরিণত করিয়াই যে মমতারূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্থায়ীরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন, ইহা লর্ড লিটন্ প্রভৃতি শাসনকর্ত্তা সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রজাহিতের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে নানা ব্যবস্থা ও নানা উদ্যোগ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে।

কৃষকগণ এত দরিদ্র, অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী যে, তাহারা নিজের হিত নিজে কখনই করিতে পারিবে না। পদেঃ তাহাদের সাহায্য করা আবশ্যক। ঋণ সম্বন্ধে কৃষকদের যে ঔদাস্য, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ফসল ভাল হইলে কৃষকদের হাতে হটাৎ সময় সময় অনেক অর্থ আসিয়া পড়ে। প্রথমেই সেই অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ না করিয়া, তাহারা গ্রামের দলাদলী, মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি নানা ব্যাপকদেশে অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে, শেষ তাহাদের হাতে মহাজনকে সুদ দিবার টাকা পর্য্যন্ত থাকে না। স্বার্থপর মহাজনেরও সৌজন্যের পরিসীমা নাই; চৈতালী শস্য কাটিবার পরে কৃষক যদি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিল, অগ্রহায়ণী ধান কাটিবার পরে করিবে; এ বৎসর পরিশোধ করিতে না পারে, আগামী বৎসর করিবে, এইরূপ তাহারা ভাবে। ঋণদান ও আদায়ের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলে, পরিশোধ কালে এরূপ শিথিলভাব কৃষকের বা কানুনগোর হইবার উপায় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না হইলে কৃষক ও কানুনগো উভয়েরই ক্ষতি। ফলতঃ মহাজনের উদ্দেশ্য যেন কৃষকগণ চিরকাল ঋণী হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যেন তাগাবি লইয়া কৃষকগণ শীঘ্র ঋণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। ক্রমশঃ

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বন মাঝে কত তরু চারু ফুল ধরে,
ভাবগ্রাহী পথিকের মন মুগ্ধ করে।
নগরবাসীরা কিন্তু, অহঙ্কার ভরে,
বন ফুল বোলে তার আদর না করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এখন ভারত আলোকিত। ইংরাজীতে যাঁহারা কৃতবিদ্য, তাঁহারাই এখন দেশ-মান্য ও সম্মানিত। অমুক ব্যক্তি কৃতবিদ্য, এই কয়েকটী

কথা শুনিবামাত্র লোকের মনে ধারণা হয় যে এ ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী। ইংরাজী না জানিলে যে কেহ কৃতবিদ্য হয়, ইহা যেন কাহারো মনে স্থান পায় না। কোট পেণ্টুলনধারী ব্যক্তিই আজ কাল সভ্য। তাঁহারই বর্ত্তমান সময়ে সমধিক সম্মান; শিখাধারী ফোটাকাটা ভট্টাচার্য্য এখন অসভ্য, তাঁহার সম্মান এখন কে করে? বড় লোকের উদ্যানে প্রস্ফুটিত ফুলের কত সমাদর। তাহার শোভা দেখিয়া ও সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া লোকে বিহ্বল। কিন্তু বনফুল, শোভা ও সুগন্ধের আধার হইলেও, তাহার আদর অল্প লোকেই করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের আখ্যা "টুলোপণ্ডিত।" ইহাতেই বুঝা যায়, লোকের কাছে তাঁহাদের কত সমাদর। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষকদের কত আদর। কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে লোকে সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দেয়। ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করে। এবং এই সকল ব্যাপার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহোদয়গণ ইংরাজী শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিদ্বান ও সদ্গুণান্বিত হইলেও, তাঁহাদিগকে এবম্প্রকার ভাবে সম্মানিত হইতে দেখা যায় না। আমাদের দেশের অধ্যাপকগণ নিঃস্বার্থভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ছাত্রগণকে অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করান। তাহাদের নিকট হইতে অর্থ লওয়া দূরে থাক, তাহাদের সমগ্র ব্যয় ভার তাঁহারা বহন করিয়া থাকেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, অধ্যাপক মহাশয়দিগের যথেষ্ট সমাদর ছিল। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেন, ভদ্রলোক সকল তাঁহাদের শাস্ত্রীয় বিচার অতীব আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগকে সাধ্যমত অর্থ দিয়া তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসরে কিছু২ দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন মহোদয় এই মহামনা পণ্ডিতদের সমাদর রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য পর্য্যাপ্ত হয় না এবং তাহা দ্বারা কোন বিশেষ ফল ফলে না। আজ কাল ধনী ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের মনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়াছে। বড় বড় ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীদের অভ্যর্থনা করা ও তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। তাঁহারা রাজসম্মানের প্রার্থী, অধ্যাপকদিগের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি কেন পড়িবে? আহ্লাদের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি অধ্যাপক মহাশয়দের উপর নিপতিত হইয়াছে। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেছেন। আশা করি, অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ এবম্প্রকার সাহায্য পাইবেন। আজকাল বিখ্যাত পণ্ডিতগণ, রাজ উপাধির দ্বারা ভূষিত হইতেছেন। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে উৎসাহজনক বলিতে হইবে। কিন্তু কেবল উপাধি লইয়া কি হইবে? যাহাতে তাঁহারা অধ্যাপনা কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু, এতৎ সম্বন্ধে

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অধিক আশা করা যায় না। যখন তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার ব্যয় লাঘব করিতেছেন, তখন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য যে তাঁহারা অধিক ব্যয় করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নহে। তবে তাঁহারা যাহা কিছু করিতেছেন ও করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা এবং বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্র তাঁহাদের যশঃ সৌরভ পৃথিবীর চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদের গৌরবেই আমরা গৌরবান্বিত। আমাদের নিজের গৌরব করিবার কিছুই নাই। ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় লজ্জার বিষয় যে, ইউরোপের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন, আমরা যে সমুদায়ের প্রতি হতাদর করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হওয়াতে সেই সমুদয়ের মর্ম্ম অনেকে অবগত হইতেছেন বটে, কিন্তু অনুবাদে লেখকের হৃদয়ের ভাব উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয় না এবং তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা অতিশয় আদরের বস্তু। সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) মহোদয় ইহাকে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার উপর স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাতে ইহার প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সমধিক চেষ্টা করা উচিত। কারণ, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, সংস্কৃত না জানাতে কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। পুরোহিত মহাশয় যাহা সংস্কৃতে বলেন, তাহার অভিপ্রায় না জানিতে পারিলে মনের তৃপ্তি হয় না। বিশেষতঃ মন্ত্রের উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃতে যিনি অনভিজ্ঞ, তাঁহা দ্বারা মন্ত্রের বিশুদ্ধতা কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে? ৯০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বড় বড় লোকের সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সে সময়ে তাঁহারা যত্ন-পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়দিগকে নিজ নিজ গ্রামে থাকিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেন এবং চতুষ্পাটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের অধ্যাপনা কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতেন। সে সময়কার দৃশ্য অতি আনন্দজনক ছিল। অনেক গ্রামে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের আলোচনা হইত। এমন কি, কোন কোন গণ্ডগ্রামের প্রতি পল্লীতে দুই একটী চতুষ্পাটী নয়নগোচর হইত। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সকল গ্রামের মধ্যে, কোন কোন গ্রামে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে এবং কোন কোন গ্রামে তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে। একবার হালিসহরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমাদের উদাসীনতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহা কি ছিল এবং কি হইল, ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহোদয়ের সময়ে যে স্থান তাঁহার অধীনস্থ চারিটী সমাজের মধ্যে একটী সমাজ বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং যে স্থানে আগমন করত বড় বড় অধ্যাপকদিগের সহিত সদালাপ করিয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন, সে স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কাহার না মন বিচলিত হয়? এই মহামনা মহারাজার পরবর্ত্তী সময়েও হালি-

সহরে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপকগণ এখানে অবস্থিতি করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমৃদ্ধি-শালী গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন প্রকাশ করিতেন এবং চতুষ্পাঠী সংস্থাপন জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের ঔদাস্য জন্য, অধ্যাপক মহাশয়গণ উৎসাহ না পাওয়াতে, চতুষ্পাঠী সকল একে একে বন্ধ হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল যে, হালিসহরে একখানি চতুষ্পাঠীও স্থান পাইল না। ইহা কথঞ্চিৎ আনন্দের বিষয় যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে, কয়েক বৎসর হইল এতৎ গ্রামে একখানি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহাতে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। আশা করি, গ্রামের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ এই সুদৃষ্টান্ত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা জন্য আরো কয়েকখানি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এক সময়ে হালিসহরে অনেকগুলি খ্যাতাপন্ন অধ্যাপক বিরাজ করিতেছিলেন। আমরা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিব। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, চূড়ামণি মহাশয়, হালিসহর অন্ধকার করিয়া, পুণ্য-ধামে গমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২০৫ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামসুন্দর তর্কভূষণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বংশটিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সে বংশে বহুকাল হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ রামগোপাল তর্কপঞ্চানন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তনির্ণয় নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রতিলিপি স্থানে স্থানে আছে। পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে হরধামে গমন করতঃ, তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া বিখ্যাত অধ্যাপক কালীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে সাহিত্য, অলঙ্কার ও চিত্র কাব্যের সঙ্কেত শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর। এখানে আসিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তাঁহার বাসগৃহের কিয়দংশ শিক্ষালয়ে পরিণত হইল এবং তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সেও তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, কারণ ক্রমে ক্রমে ২০ জন বিদ্যার্থী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। প্রায় তিন বৎসব অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি শিঙ্গুর গোপালনগরে গমন করিলেন, এবং তথাকার খ্যাতনামা অধ্যাপক রামধন ন্যায়ভূষণের নিকট প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি অধ্যয়ন করিলেন। পাঠ সমাপনান্তে, তিনি বিদ্যাসাগর উপাধী লাভ করিয়া হালিসহরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় হইল যে

একখানি চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করিয়া রীতি-মত অধ্যাপনা কার্য্য করেন। ইহা অবগত হইয়া হালিসহরনিবাসী অমরনাথ শিরোমণি মহাশয়, খাসবাটীর ঘাটের উপর, চতুষ্পাঠীর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং তিন চারি জন ছাত্রের সমগ্র ব্যয় ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করিয়া, বলরাম বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি এই চতুষ্পাঠীর উন্নতির জন্য অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে প্রায় ২০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহার মধ্যে ১০।১২ জন পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তিনি এই সকল ছাত্রকে, তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স অনুমান ৫৩ বৎসর, তখন কলিকাতা নগরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহিষাদলের রাজার দেওয়ান রামনারায়ণ গিরি মহাশয় কর্ত্তৃক এই সভাটী আহুত হয়। দেওয়ান মহাশয় সে সময়ে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজ সভার সভাপণ্ডিত মনোনীত করাই এতৎ সভার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানের অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচার হইয়াছিল। এই বিচার-সংগ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয় জয়লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ান মহাশয় আনন্দের সহিত তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদটি গ্রহণ করিলেন। এতৎপদে অভিষিক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রকৃত কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ঋতুমালা রচনা করেন, এবং নানা প্রকার চিত্র-কাব্য, যথা পৃথ্বীবন্ধ, ছত্রবন্ধ, বেণীবন্ধ, নৌকাবন্ধ, নাগবন্ধ, পদ্মবন্ধ, মহাপদ্মবন্ধ এবং যোগবন্ধ লেখেন। শ্যামাশতক ও বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শূলরোগ গ্রস্ত হওয়াতে, তিনি এই দুইখানি কাব্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। অনুমান ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে, তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এখানে আসিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি আনন্দের সহিত তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিতেন। শূলরোগে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইতেন, তথাপি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন বেদনা বৃদ্ধি হইত, তখন বুকে বালিস দিয়া তাহাদের পড়াইতেন।

ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, তিনি বঙ্গদেশকে বিশেষতঃ কুমারহট্ট সমাজকে তমসাচ্ছন্ন করতঃ, তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগধামে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চারিটি পুত্র এবং একটি কন্যা রাখিয়া গমন করেন। তন্মধ্যে, দুইটি পুত্র তাঁহাদের পিতার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে

পারদর্শিতা লাভ করত শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন-যাপন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া কয়েকটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি এখনও হালিসহরের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁচটি শ্যামা বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্লোক কয়েকটি মুখে মুখে বলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহা লিখিয়া লয়েন, শ্লোক কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

মাতব্যাহিরতঃ প্রয়াণ সময়ে তারেতি বাচং মুদা
গঙ্গাতীর তরঙ্গ সঙ্গত তনোঃ প্রাণাযথা যান্তিমে।
যাচেদো ভবতীং ভবাব্ধি লহরীং দৃষ্টাতি ভীতস্তমা
দেবিহং কৃপয়া কুরুস্ব পচতে ভারোস্ম দাস স্তচ॥

তাৎপর্য্য—আমি ভবসমুদ্রের লহরী দেখিয়া ভীত হইয়াছি, এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি যে, গমন সময়ে, তারা বাক্য উচ্চারণের ফলে যাহাতে তরঙ্গায়িত গঙ্গা তীরে আমার প্রাণ নির্গত হয়, তাহা আপনি করুন।

(২)

তারে ত্বচ্চরণাঞ্চলেতি বিমলে দাতব্য মেবো মনাক
মূঢ়ং মাম কৃতিং বিহীনং সুকৃতিং দীনং ধরাশায়িনং।
দৃষ্টাচেৎ কুরুতে ঘৃণাং সহৃদয়ে ত্রৈলোক্য সারেঽপরে
অঙ্কং নাম্নি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেঽধুনা॥

তাৎপর্য্য—হে তারে, হে ত্রৈলোক্যসারে, হে অপরে, তোমার যে নির্ম্মল চরণপ্রান্ত, তাহাতে আমাকে একটু স্থান দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। আমি মূঢ়, কৃতি ও পুণ্য বিহীন, দীন ও ধরাশায়ী দেখিয়া যদি আমার প্রতি ঘৃণা কর, তাহা হইলে হে নিষ্কলঙ্কে, তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৩)

মৎপাদাম্বুজ মেকদাপি ভবতাভক্ত্যানবা পূজিতং
নধ্যাতং নচ সেবিতং নচ সমাখ্যাবাপি জপ্তা স্মৃতা।
এতদ্দোষগণং বিমর্শময়ি মাং জহ্যাদ্যদীশ প্রিয়ে,
অঙ্কং নাম্নি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেঽধুনা॥

তাৎপর্য্য—যদি মা এ প্রকার বল যে, আমার পাদপদ্ম একবারও ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর নাই, ধ্যান ও কর নাই, সেবাও কর নাই এবং আমার নামও জপ কর নাই ও স্মরণ কর নাই, হে মহাদেবপ্রিয়ে, আমাতে যদি এ সকল দোষ দেখে আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৪)

মাত ব্রহ্মময়ী পুনর্জগাদিদং সর্ব্বং শিবে তন্ময়ং
যত্র কাপি মন স্থিতের্মমসদাত্বয্যেব তদ্বর্ত্ততে।
নির্দোষে ময়ি দূষণং যদি শিবে সংদর্শ্য জহ্যাত্তদা
অঙ্কং নাম্নি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেঽধুনা॥

তাৎপর্য্য—মাতঃ আমাকে এ সকল দোষে দোষী করিতে পার না, যে হেতু তুমি ব্রহ্মময়ী এবং জগৎ তোমার স্বরূপ। আমার মন যেখানে থাকুক না কেন, তাহা তোমাতেই আছে। সুতরাং আমি দোষহীন। তথাপি যদি আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে, তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৫)

প্রাসাদেবা বনেবা হিমকর কর পাতো যথা তুল্য এব
সর্ব্বাশ্বিন দৃষ্টিপাত স্তব ভবতি তথা নাস্তি কুত্রাপি তত্তং।
নির্দোষেবা সদোষে নাহি তব করুণা নিক্ষিপ্তো দৃষ্টিপাত
অঙ্কং নাম্নি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতনিরঙ্কেঽধুনা॥

তাৎপর্য্য—অট্টালিকাতেই হউক অথবা বনেতেই হউক, চন্দ্র যেমন সকল স্থানেই সমভাবে কিরণ দান করেন, সেই প্রকার আপনার ও দৃষ্টিপাত সর্ব্বত্রেই সমভাবে করা উচিত। কোথাও ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। মাতঃ আমি নির্দোষী হই অথবা দোষী হই, আমার প্রতি যদি তোমার করুণাকটাক্ষ না হয়, তাহা হইলে তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ। (৩)

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে হিন্দুদিগের চেষ্টা।

বর্ষাকালীন বেগবতী নদী এক দিকে বহমানা হইলেও, জলের গভীরতার অল্পাধিক্য প্রভৃতি কারণে, তাহার স্রোত কোথাও প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত মৃদু গতিতে চলে; কোথাও উচ্চ উর্ম্মি উত্তোলন করে; কোথাও বা নত ও একাগ্রভাবে সাগরাভিমুখে গমন করিতে থাকে। বঙ্গীয় সমাজের উন্নতির স্রোতে সেইরূপ বিভিন্ন গতির লক্ষণ লক্ষিত হইবে। অথচ উদ্দেশ্য একই; অর্থাৎ ধর্ম্মোন্নতি—দেশোন্নতি। অতএব এই সমাজস্থ লোকদিগের বিবিধ গতির বিবরণ বলিতে গেলে কোন পক্ষের বিরাগের কারণ থাকিবে না।

১৮৬০ অব্দে যে যুবকবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সাক্ষাৎ সমাধান নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন, আমরা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্ম বলিতেছি। কারণ, তাঁহারা "ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে" সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ঐ নাম চাহেন। অতঃপর দেখা যাইবে যে, এই যুবকদল পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া আবার দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল ব্রাহ্ম নাম ধরিয়া রাখিলেন; আর এক দল নামান্তর পরিগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত যে সকল লোক এই দুই দলের বিশেষ লক্ষণযুক্ত হইতে না পারিলেন, তাঁহারা যেমন ছিলেন, তেমনি রহিয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে একেশ্বরবাদী বা বৈদান্তিক হিন্দু নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যখন সেরূপ কোন নামের দাবী করেন না, অথবা কোন বিশেষত্ব রাখেন না, তখন তাঁহাদিগকে প্রচলিত হিন্দু আখ্যা ভিন্ন আর কিছু দেওয়া যায় না। তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও কর্ম্ম-প্রণালী যে একই প্রকার, তাহাও নহে; সুতরাং তাঁহারা অনন্ত আখ্যাধারী হিন্দু-সম্প্রদায় মধ্যেই নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, এই সকল একেশ্বরবাদী বা বৈদান্তিক হিন্দু-প্রমুখ হিন্দুদিগের চেষ্টাতেই ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বেথুন স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পর ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর। এই কুড়ি বৎসরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নানা সম্প্রদায়স্থ লোকে যে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরের শেষ দশ বৎসর ব্রাহ্মেরা অধিকতর উদ্যম সহকারে যাহা করিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। এই কুড়ি বৎসরে পূর্ব্বোক্ত হিন্দুরা কি করিতেছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাঁহারা যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের উন্নতি স্রোতে তরঙ্গমালা দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও কল্যাণ উদ্দেশে উন্নতির পথে অবিরামগতিতে চলিতেছিলেন। নিস্তরঙ্গ নদী-প্রবাহ অতি গভীর হইলেও হইতে পারে। দেখা যাউক, তাঁহারা এই কুড়ি বৎসরে কি কি কার্য্য করিয়াছেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ,—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই।

স্কুলবুক সোসাইটি এবং বর্ণেকিউলার লিটরেচর সোসাইটি দ্বারা যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্বে ব্যক্ত

হইয়াছে। বর্ণেকিউলর লিটরেচর সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত এই সকল সভ্যের নাম দৃষ্ট হয়,—শ্রীযুক্ত ওয়াইলি, শ্রীযুক্ত সিটন-কার, শ্রীযুক্ত বেলি, শ্রীযুক্ত কাল্‌বিন্‌, শ্রীযুক্ত প্রাট্‌, শ্রীযুক্ত পাদরী লং, শ্রীযুক্ত উড্‌রো, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। * পূর্ব্বোক্ত ক্লাইব সাহেবের জীবনচরিতের লেখক শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত। মেকলে সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা স্ত্রীদিগের অধ্যয়ন উদ্দেশে প্রকটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নুরজিহাঁর চরিত্র, জাহানিরার চরিত্র এবং সুশীলার উপাখ্যান প্রধান।

বর্ণেকিউলর লিটরেচর কমিটি বা সোসাইটী কেবল গ্রন্থানুবাদ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সেই সভা কর্ত্তৃক "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ১৭৭৩ শকের কার্ত্তিক মাস (১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ) হইতে এই পত্রিকা বাহির হয়। উত্তরকালে যিনি সাহিত্য সংসারে বঙ্গবাসীদিগের শিরোমণি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সুবিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার প্রথম লেখক, সম্পাদক ও জন্মদাতা। "বিবিধ প্রকারে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ও শিল্প সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য" ছিল। যদিও এই পত্রিকা উক্ত সভার আনুকূল্যে পরিচালিত হইত, কিন্তু ইহার লিখন বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিলেন। উক্ত সভাকে "বঙ্গভাষার অনুবাদক সমাজ" বলা হইত।* এই গ্রন্থ-সংগ্রহকারদিগের মধ্যে ইংরাজেরা প্রধান। বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইত, তাহা, অনুবাদক সমাজের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায়, ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র না হইলেও, ইংরাজীর আদর্শ হইতে সঙ্কলিত, তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে অতি সুন্দর চিত্র সকল থাকিত। বোধ হয়, সে সকল চিত্র বিলাতের কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হইলে এখানে তাহার প্রতিরূপ উদ্ধার করা যাইত।

এই পত্রিকার অভিলক্ষিত বিষয় আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। প্রথম ভূমিকাতেই লিখিত ছিল :—

"যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক্ এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালকবালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপনাপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য।"

* ১৮৫৩ অব্দে এই সভা এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন ;—মুদ্রাঙ্কণ উদ্দেশে কেহ কোন গ্রন্থ রচনা করিলে তাহার আদর্শ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি রবিন্‌সন্ সাহেব দেখিবেন ; তাঁহারা মনোনীত করিলে সেই আদর্শ পাদরি লং সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে ; পাদরি লং "তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।"

* উহার অবলম্বিত বাঙ্গালা নামের সংশোধন জন্ম রাজেন্দ্র লাল এক স্থলে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—

"গ্রন্থ সংগ্রহ কারেরা অকিঞ্চনদিগের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলে "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা" শব্দের পরিবর্ত্তে "বাঙ্গালা গার্হস্থ্য" শব্দ লিখিতে অনুরোধ করিতাম।"

এই উদ্ধৃতাংশে বিদিত হইবে যে, এই পত্রিকা বালক ও বালিকা উভয়ের জ্ঞান বিস্তার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। আট বৎসর কাল এই পত্রিকা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার সহিত সাধন করিলে পর (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে) বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের অর্থ কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। তাহাতে এই পত্রিকা ইহার জন্মদাতার হস্ত হইতে সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে আইসে। ১৭৮২ শকের বৈশাখ মাসে সিংহ মহোদয় ইহার নূতন (২য়) কল্পের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল, কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে, এমন কি, বর্ণপরিচয় বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্রদর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশকাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।"

বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইত, তাহা পুরুষদেরই জ্ঞান বিজ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য, ও শিল্পনৈপুণ্যাদি বিষয়ে উন্নতি লাভের উপযোগী। রাজেন্দ্রলালের গাঢ় ভাব ও গভীর রচনা বুঝিতে পারেন, তখন এ দেশীয় স্ত্রীদিগের ততদূর ভাষা জ্ঞান জন্মে নাই। * তথাপি সেই পত্রিকার পরিপাটি চিত্র দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনেক স্ত্রীলোক তাহার মর্ম্ম ও অন্যান্য আশ্চর্য্য বিবরণ জানিয়া লইতেন। ১৭৭৯ শকের মাঘমাসের পত্রিকায় "স্ত্রীর পরাক্রম" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। ইংলণ্ডের বোয়াডেশিয়া, এডওয়ার্ড পত্নী ফিলিপা, স্থরিয়া দেশের সেমিরামিস ও নাইট্রক্রিস, আরব্যের অন্তর্গত পালমিরা নগরের রাণী জেনোবিয়া, চিতোরের রাজমাতা জবাহির বাই, রাণা উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না, উৎকলের গড়মণ্ডল প্রদেশের রাণী দুর্গাবতী, লাসিডিমন দেশীয়া টেকশিলা, ষষ্ঠ হেনরীর পত্নী মার্গেরেট, সম্রাট শার্লমেনের পত্নী কার্কাস, ফরাসিস দেশের বোবেনগরবাসিনী জেন্ হাশেট্ এবং জোয়ান অব্ আর্ক,—এই সকল বীরাঙ্গনার বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল। সীতা কর্ত্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ বধ বৃত্তান্তও উল্লিখিত হইয়াছিল। পর বৎসরের (১৭৮০ শকাব্দের) পৌষ মাসের পত্রিকায় গ্রীস্ দেশের ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের স্ত্রীগণের বেশ ভূষার দুইটী চিত্র সহ বর্ণনা আছে। তৎপ্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে যশঃকীর্ত্তনছলে কয়েকটী কথায় কিছু উপদেশও দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলিতে হইবে। তাহা এই :—

"কাণন্ দ্বীপের বেণী বিনাইবার প্রথা দেখিবামাত্র আমাদিগের বঙ্গদেশের উপবেশন-ভঙ্গী অবশ্য সকলের মনে উদিত হইবে; এবং গ্রীক-কন্যার মুকুট দৃষ্টে আমাদিগের ময়ূরপাতি বিস্মৃত থাকিবেক না। আমাদিগের প্রশংসাবাদে বিবিধার্থানুরাগিণী পাঠিকারা আমাদিগকে অত্যুক্তিবাদের নিমিত্ত তিরস্কার করিতে পারেন; অতএব এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইহাদ্বারা আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কোন

* স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের কোন পুস্তক নাই। অতএব বিবিধার্থের কথা ধরিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় ও চেষ্টার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে সেই মনীষাসম্পন্ন মহানুভব লেখকের প্রতি সমুচিত ব্যবহার হয় না। বিবিধার্থের রচনা এখনকার ভাষাভিজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা উত্তম বুঝিতে পারিবেন এবং তৎপাঠে বিস্তর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই পত্রিকা কিম্বা ইহার পরবর্ত্তী "রহস্য সন্দর্ভ" এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহকে 'রত্ন-ভাণ্ডার' বলিয়াছেন। রত্নভাণ্ডারের প্রতি এক্ষণে আর উপযুক্ত-যত্ন হইতেছে না।

মতে যেবভাবে কটাক্ষ করিতে অভিপ্রায় নাই, এবং তাঁহাদের পাতিব্রত্য ও সৌন্দর্য্য ও লালিত্য ও সদগুণের অনুকীর্ত্তন আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি।"

বাঙ্গালা ভাষার গদ্য রচনা প্রণালী।

নব্যেরা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বড় মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করেন। অন্য বিষয়ে যাহা হউক, বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তাহার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গভাষার গদ্য গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই ভাষা বহু-অংশে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে। গদ্য রচনার প্রণালী বিষয়ে যে একটু গোলযোগ এখনো চলিতেছে, বোধ হয়, বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহার সমাধান হইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে।

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে যাঁহারা এ দেশের পণ্ডিত শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত রচনায় নিপুণ হউন বা না হউন, বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিতে পারিতেন না। প্রচলিত বাঙ্গালা লিখনের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ছিল। পরে দেখা যাইবে যে, সেই ঘৃণা অপগত হইতে বহু কাল লাগিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংলণ্ডের কৃতবিদ্য সাহেবেরা অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের প্রয়োজন এই যে, তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিত মূর্খ সর্ব্ব প্রকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহারা অত্রত্য সুলেখকদিগের দ্বারা প্রচলিত কথায় গ্রন্থ লেখাইয়া মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় তাহা পাঠ করিতেন। তাহাতেই বাঙ্গালা গদ্য রচনার আরম্ভ হয়। এই গদ্য রচনার প্রথম পুস্তক—রামরাম বসু কৃত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। তাহা নিতান্ত চলিত ভাষাতেই "লিপিবদ্ধ" হইয়াছিল। সাহেবদিগের ভাষাজ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তত তাঁহারা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল রচনার প্রতি আগ্রহান্বিত হইলেন। এই কালেজের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উক্ত সাহেবদিগের অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধির উপযোগী করিয়া প্রবোধচন্দ্রিকা নামে এক পুস্তক রচনা করেন। প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ভাষা মূলক জ্ঞানগর্ভ উপাখ্যান সকল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহার রচনা সংস্কৃতেরই প্রতিরূপ মাত্র। তাহা যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনিই বিনা ক্লেশে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন।*

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের অনুপ্রাসাদি শাব্দিক অলঙ্কার, উপমানাদি আর্থিক অলঙ্কার এবং লিঙ্গভেদাদি বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলা বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল রাখিতে গিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে যেমন জটিল করিয়া তুলিতেন, তেমনি ইহার পরবর্ত্তী ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালার গ্রন্থকারেরা ইংরাজীর ব্যাবৃত্ত বাক্য (Paranthetical sentence) বাঙ্গালার শব্দে অবিকল অবতারণ করিয়া তাঁহাদের রচনাকে দুর্ব্বোধ করিয়া ফেলিতেন। বাঙ্গালা কথা কহিবার রীতি অনুসারে সংস্কৃত মূলক শব্দে কোন ভাব প্রকাশ করিলেই ঠিক হয়। এই নিয়ম

---

* প্রবোধচন্দ্রিকা কিছুকাল এই জটিল পরিচ্ছদেই ছিল, পরে তাহার ভাষা সংশোধিত হইয়াছিল। ১৮৬২ অব্দের এক নূতন [illegible]।

অনুসারে বাঙ্গালা গদ্য রচনা ক্রমে ক্রমে সংশুদ্ধ হইতে লাগিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপনের ২০ বৎসর পরে রাজা রামমোহন রায় বেদান্তাদি শাস্ত্র ও তাহার বিচার বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রণালী বহু অংশে পরিশুদ্ধ হয়। ইহার আর ২০ বৎসর পরে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ কতকগুলি সাহেব ও বাঙ্গালী বাঙ্গালার গ্রন্থকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজীর ভাব সকল বাঙ্গালায় সমাহরণ করিতে গিয়া ইংরাজী বাক্যের একান্ত অনুকরণে বাঙ্গালা গ্রন্থকে যে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিতেন, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদক সমাজ শেষকালে সেই রচনা প্রণালী পরিষ্কার করিয়া লইলেন, এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালক বালিকার জন্য গ্রন্থ লিখিবার পথ পাইলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীতে এই পর্য্যন্ত হইল।

সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা এখনো বাঙ্গালা গদ্য রচনা ভালবাসিতেন না। মহার্হ সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত অপভ্রংশ ও গ্রাম্য শব্দের মিশ্রণ তাঁহাদের বড়ই শ্রুতিকটু বোধ হইত। এজন্য অনুবাদক সমাজের গ্রন্থকারদিগকে পদে পদে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের আক্রোশের নিমিত্ত কম্পিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত পণ্ডিতগণকে "বঙ্গভাষাদ্রোহী" বলিতেন। সেই বিদ্বেষীদিগের "উপহাস সহ্য" করিয়া এবং "অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে," তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা ও 'পার্ব্বত্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার যে সকল গ্রন্থকার সংস্কৃত শব্দের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন, অথবা যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীকে ভয় করিয়া গ্রন্থ লিখিতেন, তাঁহারা প্রচলিত কথা বা গ্রাম্য ভাষা যত পারেন, ত্যাগ করিতেন। অতঃপর আর একদল গ্রন্থকার অভ্যুদিত হইলেন। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহে, অবিকল সেই ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে তাঁহারা সাহস অবলম্বন করিলেন। প্যারী চাঁদ মিত্র সে বিষয়ে অগ্রণী। ১২৬১ সালে (খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে) তিনি কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া "মাসিক পত্রিকা" নামে ক্ষুদ্রাবয়বে এক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা "সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীদিগের জন্য" লিখিত হইত। তাহার রচনায় মিত্রজ মহাশয়, যতদূর সাধ্য, অপভ্রংশ শব্দ, প্রচলিত কথা ও গ্রাম্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ভাষায় ইহার পরে তিনি কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" নামক পুস্তক তন্মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সুলেখক এই ভাষার অনুকরণে গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীতে বাক্য যোজনা করিয়া নাটক ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ এই ভাষার আদর বাড়িতে লাগিল। এক্ষণে এইরূপ ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গ ভাষার ইতিহাস সমালোচকেরা এই ভাষাকে আলালী ভাষা বলেন।

এস্থলে একটী সত্যের বিলোপ বা অপলাপ হইতেছে। যাহাকে আমরা আলালী ভাষা বলিতেছি, বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম গ্রন্থকার, অপ্রসিদ্ধ রামরাম বসু, এই ভাষায়

প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন। অতএব ইহাকে আলালী ভাষা না বলিয়া "প্রতাপী" ভাষা বলা অধিক সঙ্গত। দুর্ভাগ্য ক্রমে রামরাম বসু এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত-শব্দ-প্রিয় বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের নিকট চির দিন তিরস্কার পাইয়া আসিতেছেন। সেই নিন্দাবাদের আবর্জ্জনায় তাঁহার যশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য চরিত্র পুনর্লিখিত হইয়াছিল। তাহার সমালোচনাবসরে বিবিধার্থসংগ্রহসম্পাদক সেই ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাহা বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া না যায়, এই উদ্দেশে, এবং বর্ত্তমান সময়ে পাঠকগণের দৃষ্টির নিমিত্ত আমরাও সেই অংশ যথাবৎ নিম্নে পুনরুদ্ধার করিলাম।

"ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পুবে সিংহ দ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে২ আর২ অনেক২ পশুগণ।

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরী। তার চারিদিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পুবরদিগে সিংহ দ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভা কর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ-খানা তাহাতে অনেক২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎ-খানার উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হয়া মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুগ্দর। মারিয়া জাত করায় সকলকে।

তদুপরি ভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ঘণ্টা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি উচ্চ সে ঘর বিলক্ষণ দেখায় তাহার মধ্যে সিত নাদীয় ঘণ্টা বন্ধ লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় প্রতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠনঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ কোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।

ঘণ্টা ঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ণ পতকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহ দ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দো স্থানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।

দ্বারে দ্বারপাল সের আলির্খাঁ নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দৎ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি শত২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারি দিগেই দোপটি সহর ছেমহলা বালাখানা তাহাতে পৃথক্২ স্থানে বেস মুল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।"

বিবিধার্থ সংগ্রহকার এই রামরাম বসুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তদ্দ্বারা তাঁহার বংশ, বিদ্যা ও নিন্দা-ভাগ্য, তিনেরই পরিচয় হইবে। উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশের উপরে—

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। মহাকবি ভারতচন্দ্র স্বকীয় গ্রন্থে উক্ত রাজার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে এখন প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইল, উক্ত রাজকুলজাত রাম রাম বসু নামক কোর্ট উইলিয়ম কালেজের একজন শিক্ষক কর্ত্তৃক ইহা প্রথমত লিপিবদ্ধ হয়। যদিচ রাম রাম বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্রে উত্তম উপদিষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহার রচনা প্রণালী অতি জঘন্য ছিল।"

উদ্ধৃতাংশের পরে—

"এই কর্কশ ও কুৎসিত মূল গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত-কালেজের এক জন পূর্ব্বতম ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।"

বাঙ্গালা ভাষার সমালোচক পণ্ডিতেরা

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঃ ১২৯৪ সালে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন; তাহাতেও এই উক্তি দেখা যায়ঃ—"রামরাম বসু অতি কদর্য্য গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' নামে এক পুস্তক লেখেন।"

রামরাম বসু 'ইতর লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারিক বাক্যে' গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার এই অপবাদ। তখনকার এবং এখনকার "সাধু ভাষা" ব্যবহারীরা এপর্য্যন্ত ঐ দোষে তাঁহার প্রতি ন্যক্কার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, উক্ত অংশ, যেমন উদ্ধৃত হইয়াছে, তেমনি যদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে ত্রুটি এই যে, এখনকার প্রচলিত কমা, সিমিকোলনাদি বিরাম চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। তাহা দিলে এবং আর কয়েক স্থানে পূর্ণচ্ছেদ-চিহ্ন দাঁড়ি বসাইলে ঐ রচনা (কোন কোন শব্দ বাদে) এখন উপাদেয় বোধ হইতে পারে।

প্যারী চাঁদ মিত্র কৃত গ্রন্থাবলী।

রাজেন্দ্রলাল যখন পণ্ডিতদিগকে সমীহা করিয়া গাঢ় সাধু ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিতেছিলেন; তখন মদনমোহন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বালক বালিকাগণের নিমিত্ত অতি সহজ ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভাব ও বাক্য প্রকাশ করিতে হইলে তদুপযোগী, আরো কিছু সহজ প্রকার ভাষা আবশ্যক হয়। প্যারী চাঁদ মিত্র, "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কৃত্রিম নাম ধারণ পূর্ব্বক, সেইরূপ ভাষায় স্ত্রীদিগের নিমিত্ত কয়েক খানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রচারিত মাসিক পত্রিকার সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি সাধারণতঃ গ্রন্থকারদিগের যে ভয় ভয় ভাব ছিল, প্যারী চাঁদ তাহা স্পষ্ট বাক্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রতি মাসের প্রথম পত্রের শিরোদেশে এই কথা গুলিন থাকিত:—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে; যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রকারের শীর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

"স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা" "মাতা ভাল হইলেই পুত্র ভাল হয়।" "মাতার প্রতি ভদ্র কন্যার স্নেহ।" "বিপদকালে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ প্রকাশ পায়।" "লজ্জা" "কুলীনে মেয়ে দেওয়ার ফল" "ঈশ্বরোপাসনা" "মদ্যপান" "পরাধীন হওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নয়।" "সুখ দুঃখ কেবল ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য হইয়াছে" "বৃদ্ধ লোকের সম্মান" "সাধ্বী স্ত্রী মহারত্ন।"

প্যারীচাঁদ রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণী প্রভৃতি যে কয়েক খানি পুস্তক স্ত্রীদিগের পাঠের জন্য লিখেন, তাহার মর্ম্ম উপরোক্ত মাসিক পত্রিকাতেই ছিল। পুস্তকগুলির ভাষা পূর্ব্বানুরূপ তরল; কিন্তু ভাব ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" নামক পুস্তকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের নাম "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা"। এই পুস্তকে তাঁহার ভাষা আলালী তরলতা পরিহার করিয়া গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে কথোপকথন প্রণালীতে নানা বিষয়ে আলাপ, বিচার ও তদুপলক্ষে শাস্ত্রীয় মূল শ্লোক ও অনুবাদ বাক্যের এবং দেশীয় প্রবচনের ভূরি প্রয়োগ আছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থে কেবল সাধু ভাষা, সরল কথা এবং সার সিদ্ধান্ত।

ইহাতে তিনি দেবহূতি, অনসূয়া, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রুক্মিণী, সংযুক্তা, অহল্যা বাই, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্তা এবং ইতিহাসোক্তা স্ত্রীদিগের চরিত-মালা অপেক্ষাকৃত বিশদ রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ, সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য, পাতিব্রত্য, বহির্ভ্রমণ, রাজ্যশাসন, বীরভাব, দায়ব্যবস্থা ও সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৬১ সাল হইতে যাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত মিত্রজ মহাশয় এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া এত গ্রন্থ লিখিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার চরম উপদেশ এই :—

"আর্য্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্ব্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর।"

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

পরম হংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (৩)

পাঠকগণ, আপনারা স্থির চিত্তে গম্ভীর ভাবে সৎ ও অসতের বিচার করিয়া অসৎকে ত্যাগ ও সৎ অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মকে গ্রহণ করিলে, এবং পরস্পর একমত হইয়া তীক্ষ্ণ ভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন, আর তাহাতে জগতেরও বহু পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইবে। আপনারা প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখুন যে, ভারতবাসী আর্য্যদিগের আজ নানাপ্রকার দুর্গতি, বলহীনতা, এক মতাবলম্বী না হইবার ও একতা না থাকিবার কারণ কি?

আমি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়কে এই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া দেখিতে পাইতেছি।

১ম। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ।

২য়। নিরাকার ও সাকার উপাসনা।

৩য়। সাকার—পঞ্চ প্রকার উপাসনা, এবং উপাস্য ও উপাসনার প্রভেদ।

৪র্থ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা বা ভক্তির পৃথকত্ব।

এই সকল বিষয় লইয়া পরস্পরে বাদ বিসম্বাদ করিয়া মরিতেছে, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্য যে কি এবং তাহাদের ইষ্টদেবতা কে এবং কোথায় আছেন এবং তাহারা যে কে, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখিতেছে না, এবং দেখিবার চেষ্টা করে না। কেবল অন্যের মুখে শুনিয়া স্থির হইয়া আছে। যদ্যপি সকলে বাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করত পরস্পর একমত হইয়া তাহাদের সকলেরই দেবতা যে কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সকলেরই উন্নতি ও মঙ্গল হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

আপনাদের সকলেরই দেবতা সেই একই পুরুষ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ও সাকার রূপে এই চরাচর-বিশ্বকে লইয়া অখণ্ডাকার পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই সার ভাবটি সকলে অবগত নহেন, আবার যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাও স্বার্থপ্রযুক্ত গোপন রাখাতে আর্য্য জাতির আজ এত দুরবস্থা হইয়াছে। যদ্যপি জ্ঞানীগণ কষ্ট স্বীকার ও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ

করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে জগতের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হয়, তাহা বলিতে পারি না। অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া জ্ঞানীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কেন না, তাঁহাদিগের নিকট সকলেই সমান, তাঁহাদের আত্মা এবং অন্যের আত্মা একই ;—সুতরাং একজনে আনন্দ উপভোগ করিবে, আর একজনে নিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে, ইহা তাহাদের দেখা উচিত নহে। যাঁহারা এইরূপ সমদর্শী হইয়া অন্য সাধারণে জ্ঞান বিতরণ করেন, জগতে তাঁহারাই ধন্য।

দ্বৈত অদ্বৈত মত সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং আরও অনেকে নানা প্রকার বলিয়াছেন,এক্ষণে পুনরায় আমি আপনাদিগকে স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, আপনারা সূক্ষ্ম ভাবে ইহা গ্রহণ করিবেন। যেমন পিতা হইতে পুত্র জন্মে। এস্থলে পিতা হলেন কারণ, আর পুত্র হলেন কার্য্য। কারণ হইতে, কার্য্যের উৎপত্তি সুতরাং কারণে ও কার্য্যে পিতা পুত্রে সম্বন্ধ। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে কারণ ও কার্য্য,—পিতা ও পুত্র উভয়ই এক ও অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদে উপাধি ভেদ নাই। উপাধি ভেদ কেবল মাত্র দ্বৈতবাদে। কারণ ও কার্য্য,, পিতা ও পুত্র, উপাধি ভেদ দ্বৈতভাব জানিবেন।

এস্থলে পিতা হইলেন উপাস্য, আর পুত্র হইলেন উপাসক। পুত্রের ধর্ম্ম যে পিতার আজ্ঞানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক কার্য্য করেন ও তাঁহাকে উপাসনা ও ভক্তি করেন ; এবং তাঁহার নিকট ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন যে, হে পিতঃ, আমি অজ্ঞান, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমি জানি না, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, যাহাতে আমি উভয় কার্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন করতঃ সদা পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারি। পিতা পুত্রের এইরূপ ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন ; এবং যাহাতে সে সদা পরমানন্দে থাকিতে পারে, সেইরূপ উপদেশ দেন।

এই পিতা শব্দে সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু, আর পুত্র শব্দে আপনারা অর্থাৎ জীব সংজ্ঞা জানিবেন।

সৃষ্টির প্রকরণ হেতু, কারণ ও কার্য্য ভাবে, মায়া উপাধি অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা দ্বৈত ভাব জানিবেন। সৃষ্টির মায়া উপাধি পরিত্যক্ত জীব ও ঈশ্বর স্বরূপ পক্ষে এক, অনাদি, অদ্বৈত ও অভেদ জানিবেন। যেমন জলবিম্ব কিম্বা বরফ জল হইতে পৃথক বস্তু নহে ; অথচ উপাধি ভেদে পৃথক হইয়াছে ; সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব পৃথক নহে, কেবল উপাধি হেতু পৃথক বলা যায়। যেমন জল ও জলবিম্বের কিম্বা বরফের মধ্যে পৃথক ভাব দ্বৈত ভাব, আর ইহাদের একীভাব অদ্বৈত ভাব, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মে পৃথক ভাব দ্বৈত ভাব এবং ইহার অভাব অর্থাৎ একই ভাব অদ্বৈত ভাব। স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব নাই ; কেবল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি স্বরূপ পক্ষে অনাদি অদ্বৈত, তিনিই দ্বৈত ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় ভাসিতেছেন, ইহা মানিতে হইবে। যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইবে, তখন দ্বৈত ও অদ্বৈত সংজ্ঞা লয় হইয়া কেবল যাহা, তাহাই অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান

ভেদাভেদ রহিত হইয়া বিরাজমান আছেন উপলব্ধি হইবে। দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব আপনারা এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। হে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী পাঠকগণ, আপনারা পরস্পর মনের বাদ বিসম্বাদ, জয় পরাজয়, ও মান অপমান পরিত্যাগ করত সার ভাব গ্রহণ করুন ও একমত হউন। তাহা হইলে পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবেন, অন্যথা কখনও মনে শান্তি পাইবেন না; বরং ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিবে।

আর্য্যদিগের দ্বারা পৃথক পৃথক পাঁচটি দেবতার নাম কল্পিত হইয়াছে, যথা;—সূর্য্যনারায়ণ, বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণেশ ও দেবীমা। এ স্থলে গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক বুঝা চাই যে, ঐ পাঁচটি উপাস্য দেবতা নিরাকার না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হয়েন, তাহা হইলে নিরাকার ত একই অখণ্ডাকারে আছেন। নিরাকার ত পৃথক ভাবে নাই যে তাহাহত পাঁচটি পৃথক দেবতা আছেন। কেবল সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পাঁচ তত্ত্ব কিম্বা পাঁচ দেবতা বলা হয়। কিন্তু সাকার ব্রহ্ম একই অনাদি বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন; ইঁহার মধ্যে পাঁচটি নাই। বেদে ও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, বিরাট ব্রহ্মের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, আকাশ তাঁহার মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, অগ্নি তাঁহার মুখ, জল তাঁহার নাড়ী, ও পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই কয়েকই অনাদি রূপে জগতপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা ও জগৎমঙ্গলকর্ত্তা ভিতর বাহির প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। ইহার মধ্যে পাঁচটি উপাস্য দেবতা কোথায় আছেন যে, উপাসকগণ আপন আপন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন মানিয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন? ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা নিজে নিজে ইহা বুঝিবার কোন চেষ্টা করেন না, কেবল অন্যের মুখে শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

জগতের দেবতা সেই একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরাকার ও সাকার বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। এবং সেই বিরাটরূপী ভগবানের নামই সূর্য্যনারায়ণ, বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণেশ, শালগ্রাম, দেবীমাতা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও ওঁকার আদি। কেবল ভিন্ন ভিন্ন ঋষিমুণিগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তিনি ভিন্ন নহেন, একই পুরুষ অনাদি কাল হইতে বিরাজমান আছেন। যেমন জল একটি পদার্থ, দেশ ও ভাষা বিশেষে তাহার নানা প্রকার নাম আছে, যথা জল, পানি, নীর সরিৎ, তোয়, ওয়াটার ইত্যাদি, সেইরূপ দেশ ও ভাষা ও মত বিশেষে মুনিঋষিগণ তাঁহার কত প্রকার নাম যে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তিনি একই পুরুষ অখণ্ডাকারে অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন।

যদ্যপি আপনারা বলেন যে, আমাদিগের দেবতা পৃথক পৃথক এবং নামও পৃথক পৃথক, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, নিরাকার ব্রহ্মে ত পাঁচটি দেবতা নাই, কেবল সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাঁচটি দেবতা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে যে কোন স্থান হইতে দেখিবেন, সেই স্থানেই ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে লইয়া পূর্ণ

দেখিতে পাইবেন। যদাপি ইহার পাঁচটি নাম না হয় এবং আর চারিটি পৃথক দেবতা থাকেন, তাহা হইলে আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহারা কোথায় আছেন? কাহারও ভয়ে কি তাঁহারা লুকাইয়া আছেন? যদ্যপি এরূপ দেবতা হয়েন যে, তাঁহাদিগকে সাকার ও নিরাকাররূপে পাওয়া যায় না, তবে উপাসকগণের কি প্রকারে ভক্তি ও বিস্ময় জন্মিবে? ও কিরূপেই বা মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া শান্তি লাভ হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি, নিরাকার এক বই দুই নহেন, যাহা কিছু দ্বৈত ভাব সে কেবল সাকার ব্রহ্মে। যখন সাকার ব্রহ্মেও এক ব্যতীত দুইটি পৃথক দেবতা দেখিতে পাইতেছি না, কেন না, সাকার হইলেই প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন, যখন তাহা দেখা যাইতেছে না, তখন আর কাহারও অস্তিত্ব আছে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। সুতরাং সাকার ব্রহ্মও এক। বেদে বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেবতা বা দেব বলে। যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বিদ্যুৎ, তারাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। ইহা ছাড়া আর কোন দেবতা বা দেবী নাই। কেবল কল্পনা দ্বারা পৃথক পৃথক করিয়াছেন, আর আপনারা বিনা বিচারে সেই সকল মত গ্রহণ করিয়া বাদ বিসম্বাদ করিয়া মনের অশান্তিতে পুড়িয়া মরিতেছেন ও জগৎকেও পোড়াইয়া মারিতেছেন। ইহাতে যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা চক্ষে দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এ বিষয়টি আপনারা স্থির চিত্তে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনাদের পরস্পরের ইষ্টদেবতা কে, উপাসনার উদ্দেশ্য কি, এবং গন্তব্য পথ কোন্‌টা?

প্রকৃত পক্ষে আপনাদের দেবতা পৃথক নহেন। যিনি আপনাদিগের দেবতা, তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সাকার ও নিরাকার স্বরূপ ভিতর বাহির আপনাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাকে ধারণা করিলে সকলের মনের চঞ্চলতা ও ভ্রম দূর হইয়া যাইবে এবং সদা পরমানন্দে থাকিবেন। সাম্প্রদায়িকতার ঘোর তমসে পড়িয়া আর আত্মহারা হইবেন না।

জ্ঞানবাদিগণ কর্ম্ম উপাসনাকে নিন্দা করেন এবং কর্ম্মী ও উপাসনাবাদিগণ জ্ঞানবাদীকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করেন। জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপাসনাবাদিগণের মধ্যে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান কিম্বা ভগবানে যথার্থপক্ষে নিষ্ঠা নাই এবং যথার্থ জ্ঞানও হয় নাই, সেই সকল লোক পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করে। কিন্তু যে ব্যক্তির যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, আর যিনি যথার্থ কর্ম্ম ও উপাসনা করেন—ভগবানে যাঁহার প্রকৃত নিষ্ঠা আছে, সে ব্যক্তি কখনও কাহাকে নিন্দা করে না। তিনি জ্ঞান চক্ষুতে দেখেন যে, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পর তিনটিই মুক্তির সাহায্যকারী। একটি থাকিলেই তিনটি তাহার সঙ্গে থাকিবে, আর একটির অভাবে তিনটির অভাব ঘটিবে। কারণ জ্ঞান থাকিলে ভক্তি ও কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে হয়। জ্ঞান না হইলে কাহাকে যে ভক্তি করিব, তাহা জানিতে পারি না। জ্ঞান হইলে চিনিতে পারি যে ইনি আমার পিতা, ইহাঁকে আমার ভক্তি করা কর্ত্তব্য। যাহা দ্বারা পিতাকে জানিলাম, সেইটাই হইতেছে জ্ঞান, আর পিতাকে জানিতে

ইচ্ছা মনে উদয় হইল যাহা দ্বারা সেইটাই হইল কর্ম্ম, এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতার আজ্ঞা পালন করাই হইতেছে ভক্তিও কর্ম্ম। এই তিনটি ব্যতীত ব্যাবহারিক কি পারমার্থিক কোন কার্য্যই উত্তমরূপে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় না। যথা, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, উহার সঙ্গেই প্রকাশ গুণ ও উষ্ণতা ও বর্ণাদি সকলই প্রকাশ হয়। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তখন ঐ তিন গুণই উহার সঙ্গেই নির্ব্বাণ হয়। এইরূপ যাহার জ্ঞান হয়, তাহার সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তি সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ হয়।

হে পাঠকগণ, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও উপাসনা, যতক্ষণে জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি না হয়, ততক্ষণ পরিত্যাগ করিও না, মুক্তি হইলে আর ইহাদের আবশ্যক নাই। যে যে কর্ম্ম করিলে তোমাদের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয়, যাহা দ্বারা তোমরা সকল বিষয়ে সুখে থাক, সেই কর্ম্ম করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যতক্ষণ নদী পার না হওয়া যায়, ততক্ষণ নৌকার প্রয়োজন থাকে, নদী পার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ এই অজ্ঞান মায়ারূপী নদী পার হইবার জন্য জ্ঞানরূপী নৌকা পূর্ণ পরব্রহ্মরূপী মাঝির প্রয়োজন, যখন আপনারা মুক্তিরূপ ভবপারে যাইবেন, তখন আর নৌকা ও মাঝির প্রয়োজন থাকিবে না। তখন এই বিশ্ব সংসার আপনিময় দেখিবেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, জ্ঞান কর্ম্ম, ভক্তি, সাকার, নিরাকার তখন আর কিছুই থাকিবে না। —তখন ব্রহ্মে ও আপনাতে অভেদ হইবেন। অতএব আপনারা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করুন, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবেন, অন্যথা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যদি কাহারও কোন বিষয় ভ্রম হয়, অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে নব্যভারত সম্পাদককে লিখিলে তাহার যথাযথ উত্তর পাইবেন।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা। (২)

সাধারণ ভ্রম।

গত বারের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে ভাবিয়াছেন, আমরা সংস্কৃতের নিয়মানুসারেই বঙ্গভাষাকে চালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যাঁহাদের ঐরূপ আশঙ্কা, তাঁহারা একটু সহিষ্ণু হইয়া, আমাদের গতি পর্য্যবেক্ষণ করুন, বুঝিতে পারিবেন—আমরা কোন্ পথের পথিক। "সংস্কৃত" শব্দের অর্থ মার্জ্জিত। কোনও বস্তু প্রথম হইতেই মার্জ্জিত হইতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা; এক্ষণে যাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা কোন মতেই প্রথমাবস্থার— অব নয়। সংস্কৃত-ভাষা-সম্পর্কে যাহা বলা গেল, একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কৃতে শত শত অযোগ্য ব্যক্তি, লিপি চালনা করিতে আরম্ভ করিলে কোন কবি, এই প্রকার আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
যাহস্তার্ন্নরসিংহশঙ্খধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা॥

উহার ভাবার্থ এই—

বাল্মীকি, কবিতা-দেবীর পিতা। ভারতবর্ষে সংস্কৃত কবিতার তিনিই আদর-

অভ্যর্থনার সূত্রপাত করেন। বেদব্যাস, তৎপরে কবিতার গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া যান। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে এই দেবী কবিতার বিবাহ হইল। অমরসিংহ, শম্ভু, ধনিক প্রভৃতি ঐ বিবাহের ফল। তৎপরেই কবিতার বার্দ্ধক্য হইল—সুতরাং তাঁহার কান্তিলাবণ্য কোথায় রহিল! সেই সময় তিনি সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন।

ইহাতেই কি জানা গেল না, এককালে সংস্কৃত ভাষাতেও বিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল? "অলঙ্কার"-শাস্ত্রের সমালোচনায়, দার্শনিক বিচারে, বাদানুবাদে, তর্ক-যুক্তিতে তবে তাহার শোধন হইয়াছে। অতএব আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি,—এখন যে সংস্কৃত বর্ত্তমান, তাহা প্রথমের সংস্কৃত নয়। বাঙ্গালাও এই দৃষ্টান্তে মার্জ্জিত, পরিপুষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হউক—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

৪। "পরিবার" মৃত।—ভার্য্যা, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, ইহা বলিবার সময় অনেকে কহিয়া থাকেন—"আমার পরিবার মরিয়াছেন।" রেলওয়ে কোম্পানির অভিধানে জেণ্টল্‌মেন্ (Gentlemen) শব্দের অর্থ ইংরেজ। রেলওয়ে শকটে যিনি বিহার করিয়াছেন, ইহা সত্য কি না তিনিই অবগত। "জেণ্টল্‌মেন্‌স ওয়েটিংরুম্ (Gentlemen's waiting room) তাহার সাক্ষী। তথায় ভারতবর্ষজাত কোন জাতিরই বিশ্রামের জন্য প্রবেশাধিকার নাই! কেন না, ভারতীয়েরা যতই কেন সভ্য ভব্য হউন না, তাঁহারা 'ভদ্র' আখ্যা পাইবার যোগ্য নন! রেলওয়ে সম্বন্ধে এটী যেমন অদ্ভুত, উক্ত পদ ব্যবহারকারীদের পক্ষে "পরিবার" অর্থে পত্নীও তেমনই অদ্ভুত। ফলতঃ "পরিবার" অর্থে যাহা যাহা বুঝায় পত্নী তাহার একতম বটে। পরিবার শব্দে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিসী, মাসী, খুড়ী, জেঠাই, ইত্যাদি বোধ হয়। এই শ্রেণীর লোকেই আবার বলিয়া থাকেন, "আই হেভ্ ব্রট্ মাই ফেমিলি (I have brought my family) অর্থাৎ আমি পরিবার আনিয়াছি। পাঠকেরা ভাবিতে পারেন, তিনি বাস্তবিকই পুত্রাদি সমেত আপন বনিতাকেও আনিয়া থাকিবেন। যেখনে আমরা ঐ প্রকার বলিতে শুনিয়াছি, তল্লাস করিয়া জানিয়াছি, ঐ সকল স্থলে কেবল পত্নীকে আনা হইয়াছে। ইঁহারাই ইংরেজি ভাষায় অপূর্ব্ব পদ-বিন্যাস করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ক্লাস ফ্রেণ্ড (Class friend), ভেনারেবল্ এক্সেপশন্ (Venerable exception) ইত্যাদি ব্যবহারে তাঁহারা নিপুণ। ক্লাস-ফ্রেণ্ড স্থলে ক্লাস-ফেলো (Class fellow) বা ফেলো ষ্টুডেণ্ট (Fellow-student) বলাই রীতি। অনারেবল্ এক্সেপ্শন্ (Honourable exception) স্থলে বলিয়া, তদ্দৃষ্টে ভেনারেবল্ এক্সেপশন্ প্রচলিত হওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অনারেবল্ ও ভেনারেবল্ শব্দের অর্থ, প্রায় তুল্য; তথাপি একের পরিবর্ত্তে অপর ব্যবহৃত হইবে না। ইহাই ভাষার বিশেষত্ব। ইহাকেই ভাষার নিয়ম বলে। ফলতঃ গৃহিণী অর্থে "পরিবার" বলা অপপ্রয়োগ, সুতরাং উহা ভুল।

৫। এদিগে, পূর্ব্বদিগে, চতুর্দিগস্থ।—এই তিন শব্দের ভ্রম শোধিত হইয়া, 'এ দিকে' 'পূর্ব্বদিকে' 'চতুর্দ্দিকস্থ' হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যে "দিশ্" শব্দের সত্তা আছে, তাহারই প্রথমায় "দিক্" হয়।

"দিক্" সর্ব্ব বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "দিক" বিশুদ্ধ, কি "দিগ" বিশুদ্ধ—তাহার মীমাংসায় অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। লোকে "পূর্ব্বদিক্" "দক্ষিণদিক্" "এ দিক্" "ওদিক্" লেখেন, না, ঐ সকলের স্থলে "পূর্ব্বদিগ" "দক্ষিণদিগ" "এদিগ" "ওদিগ" লিখিয়া থাকেন? আমরা ইহার প্রসঙ্গ আদৌ করিতাম কি না সন্দেহ, যদি আমরা "ঐতিহাসিক রহস্যে" "পদ্যমালায়" "ভাষা প্রবন্ধে" ঐ গুলির অস্তিত্ব না দেখিতাম। "ঐতিহাসিক রহস্য"-প্রণেতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন; কিন্তু সুপণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয় কর্ত্তৃক উহা পরিশোধিত হইয়াও, উহাতে ঐ ভ্রম স্থান পাইয়াছে। প্রথম সংস্করণে ঐ ভ্রান্তি দেখিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ও সংশোধনকর্ত্তা—উভয়কেই ক্রমে ক্রমে মুখে ও লেখায় জানাইয়া আশা পাইয়াছিলাম, উহা সংশোধিত হইবে। ভুল এখনও রহিয়াছে দেখিতেছি, তাই এখানে তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইল। "ভাষা-প্রবন্ধ"-প্রণেতার সুলেখক বলিয়া এখনও খ্যাতি হইবার বিলম্ব আছে সত্য, কিন্তু তিনি না কি সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, সুতরাং তাঁহার এই দোষ ঘটা অবৈধ। তদ্ভিন্ন তিনি ভাষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তক লিখিয়াছেন, অতএব ঐরূপ পুস্তকে ত্রুটি থাকা কি সহনীয়? "পদ্যমালার" ষড়বিংশ সংস্করণেও ঐ ভুল আছে।

৬। দেশীয় ঔষধ।—নেটিভ্ (Native) শব্দের অনুবাদে "দেশীয়" শব্দটী চলিত হইতেছে। সাহেবেরা ভারতবর্ষের লোকদিগকে নেটিভ্ বলেন। সুতরাং আমরাও সম্যক্ হিতাহিত বিচার না করিয়াই, উহা চালাইতে বসিয়াছি। ইহা ঠিক্ নয়। সাহেবেরা আমাদিগকে যাহা বলিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, থাকুন। তাঁহারা আমাদের অধিপতি। রাজা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—গালাগালি দিতে পারেন, অপমান করিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে, ইহার ত্রুটি বোধগম্য হইবে। নেটিভ্ শব্দ সচরাচর অন্য শব্দ-সহযোগেই ব্যবহৃত হয়। তদ্রূপ হওয়াই আবশ্যক। যথা, নেটিভ্ অব্ ইণ্ডিয়া (Native of India), নেটিভ্ অব্ ইংল্যাণ্ড (Native of England)। বঙ্গদেশের লোকেরাও নেটিভ্, আর ইংরেজেরাও নেটিভ্। বঙ্গদেশের লোকেরা যেমন নেটিভ্ অব্ বেঙ্গল (Native of Bengal), ইংরেজেরাও সেইরূপ নেটিভ্ অব্ ইংল্যাণ্ড (Native of England)। তবে যে সাহেবেরা, এদেশের অধিবাসিসমূহকে নেটিভ্ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, সেটা তাঁহাদের গায়ের জোরে চালান হয়। খ্রীষ্টানেতর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা হিদেন্ (Heathen), পেগান্ (Pagan) বলিয়া থাকেন; আবার হিন্দুরাও অহিন্দুকে ম্লেচ্ছ, যবন, বিধর্ম্মী, ভ্রষ্টাচার, নাস্তিক ইত্যাদি বলিতেও ত্রুটি করেন না। মুসলমানেরাও অপর অপর ধর্ম্মাশ্রিতদিগকে কাফের বলেন। এস্থলে সকল জাতির এক একটা গালি দিবার বস্তু আছে। কিন্তু সাহেবেরা, এ দেশের হিন্দু-মুসলমানকে নেটিভ্ বলিয়া যাইতেছেন, আর আমরা তাহার অর্থ-গ্রহ না করিয়াই, তাহাই গৌরবে বক্ষে ধারণ করিতেছি।

এখন উহা অবজ্ঞাদ্যোতক হইয়াছে। নিগার (Nigger) যেমন অশ্রদ্ধাবিজ্ঞাপক, নেটিভ্ও প্রায় তদ্রূপ ভাব-প্রকাশক

তথাপি আমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কৈ কার্য্য করি? অবিবেচনার দোষে গালিও আমাদের শিরোভূষণ হইতেছে। আমাদের স্মরণ আছে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সংস্কৃত কালেজ-গৃহে যুবকদের "নেটিভ সোসাইটীর" এক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নেটিভ সোসাইটী' এই নামের পরিবর্ত্তে 'ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী' বা 'বেঙ্গল সোসাইটী' নামকরণ করা কর্ত্তব্য ছিল। নেটিভ্ শব্দ, সাহেবেরা হেয় ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তদবধি সেই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর এক কথাও বিবেচ্য। অনুবাদে ঠিক্ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। যেথানে "দেশীয়" লেখা হয়, বা বলা হয়, তথায় 'এদেশীয়' 'এতদ্দেশীয়' বা 'অস্মদ্দেশীয়' এই শব্দ-ত্রিতয়ের অন্যতম শব্দ ব্যবহার করিলে, অর্থ পরিস্ফুট হয়। কেন না, যথায় ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তথায় লেখকের বা বক্তার, জাতি বা স্বদেশ নির্ণয়ের পন্থা থাকে এবং তদ্দ্বারা "এদেশীয়" প্রভৃতি শব্দের কে লক্ষ্য, স্পষ্ট বুঝিবার কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। নচেৎ "দেশীয় ঔষধ" শব্দে সকল দেশের ভেষজই সূচিত হইতে পারে। কেন না, "দেশীয়" শব্দের অর্থ দেশ-সংক্রান্ত। ইহাতে যে কোন দেশ বোঝা যাইতে পারে; উহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের নাম, পাঠকের হৃদয়-পটে প্রতিফলিত হইবে না।

৭। সন ১২৯৯ সাল।— এখানে "সন" ও "সাল" দুই শব্দই একার্থক। দুয়েরই অর্থ—'অব্দ'। অতএব হয় "সন ১২-৯৯" না হয়, "১২৯৯ সাল" বলা উচিত। বিষয়ী লোকের হাতে পড়িয়া, এত কাল উহার অর্থ নির্ণয় হইতে পায় নাই। বিষয়ী লোকের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ প্রয়োগটা, সাধুভাষা-ভাষী গ্রন্থকর্ত্তাদেরও সমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছিল। এখন উহা সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে নির্ব্বিবাদে কি প্রবল প্রাধান্যই বিস্তার করিতেছে! উহার অসংগত প্রাদুর্ভাবে ভাষা-দেবীর অকপট উপাসকদিগকে বিমনাঃ করিয়া দিয়াছে। উহা আবহমান কাল চলিয়া আসায় "গড্ডলিকা প্রবাহ" ন্যায়েরই একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইয়াছে।

৮। ১১ই কার্ত্তিক, ১২৯৯ সাল।—আমাদের দলিল-দস্তাবেজে অনেক দোষ, ত্রুটি, ভ্রান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু একটী বিষয়ে যথার্থ সজাতীয় ভাব রক্ষিত হইতেছে। সেটী এই,—বাঙ্গালা ভাষাতে অগ্রে বৎসর, তৎপরে তারিখ লিখিয়া সর্ব্বশেষে মাসের নাম লেখার রীতি আছে। যথা—১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক। "সন ১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক" না লিখিয়া "১২৯৯ সাল ১১ই কার্ত্তিক" কি নিমিত্ত বলা যাইতেছে, তাহার যুক্তিটা পাঠকদিগকে জানান আবশ্যক। ঐরূপ বলিবার যুক্তি, উপরেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাষারই প্রকৃতি-গত একটা রীতি বা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালারই এই একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাউক না কেন:—"জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ"। জন্মের পর বিবাহ, তৎপরে মৃত্যু, ইহা সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। তথাপি 'জন্ম বিবাহ মৃত্যু' না বলা হয় কেন? ইহার উত্তর—ভাষার নিয়ম। ইংরেজিতেও এই রূপ। যথা—ব্রেড্ এণ্ড বরন্ (Bred and born) ইহার অর্থ শিক্ষিত ও জাত।

এখানেও অগ্রে "বরন্" (জাত), তদনন্তর "ব্রেড্" (শিক্ষিত) বলা হয় না। ইহা যেমন রীতিসিদ্ধ, ১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক সেইরূপ। কেন্ না, এক জন ইংরেজ "১২৯৯ সাল ১১ই কার্ত্তিক" এই অংশের অনুবাদ-কালে '11th Kartik, 1299 (Bengali Era)' [ইলেভেন্থ কার্টিক, ১২৯৯ (বেঙ্গলি ইরা)] লিখিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালীর নিয়মানুসারে '1299 (Bengali Era, 11th Kartik' ১২৯৯ (বেঙ্গলি ইরা) ইলেভেন্থ কার্টিক) কোন ইংরেজকে এবম্ভূত লিখিতে বা বলিতে শুনি নাই। তবে আমরা "25th October 1892" (টোইণ্টি ফিফ্থ অক্টোবর, ১৮৯২) এই অংশের অনুবাদ-কালে '২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২' কেন লিখি? এখানে অবিকল ইংরেজি প্রথার অনুমোদন নিন্দনীয়। আমাদের লেখা উচিত—'১৮৯২ খৃষ্টাব্দ ২৫শে অক্টোবর'। ইংরেজের ভাষাই যদি অবিকল অনুকরণীয় হয়, তবে আমরা এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হইব,—আমাদের জাতির ধর্ম্ম কার্য্য, রুচি প্রকৃতি, রীতি নীতি, প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করিয়া একীভূত করিয়া ফেলা হউক না। তবে ইংরেজের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম হউক। ইংরেজের পরিচ্ছদে সকল হিন্দু-সন্তান, আপনাদের দেহ আচ্ছাদিত করুন না কেন? ইংরেজ, বিড়ালাক্ষীকে গৃহলক্ষ্মী মনে করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে লক্ষ্মী মনে করা দূরে থাকুক, বরং বিপরীতই ভাবিয়া থাকেন; অর্থাৎ অলক্ষ্মী মনে করেন। মৃগশাবাক্ষী, পদ্মায়তাক্ষী, আকর্ণনয়না, হরিণ-লোচনা—হিন্দুর লক্ষ্মীস্বরূপা। প্রশস্ত-কেশী গৃহিণী, প্রশস্তকেশা তনয়া হিন্দুর গৃহ-লক্ষ্মী। পক্ষান্তরে স্বল্পকুন্তলা বালা, ইংরেজের উপাস্যা। রমণীর ক্ষুদ্রতম চরণ, চীন-জাতির আরাধন-দ্রব্য বলিয়া উহা কি সকলের অনুকরণ-যোগ্য? কদাচ অন্য জাতির পক্ষে ঐ প্রকার পদ, প্রিয়তম নয়। সুতরাং বলিতে হইবে, উহা কদাপি সুপ্রথা হইল না, অতএব উহা কদাচ অনুকরণীয়ও হইবে না।

বামাবোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক বি, এ উপাধিধারী বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন চলিয়াছিল। তিনি বলেন, অগ্রে তারিখ, পরে বৎসর থাকিলে, দেখিবার সুবিধা হয়। তদুত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম, সকল স্থানেই কি এই সুবিধা হয়? আর অসুবিধাই বা কত ক্ষণের জন্য? এক মিনিটের মধ্যেই সালের পর তারিখ দেখা যায়। অকিঞ্চিৎকর অসুবিধার জন্য স্বজাতীয় ভাব ত্যাগ করা কি সঙ্গত? এই কথা শুনিয়া তিনি আর প্রতিবাদ করিলেন না।

আরও একটী স্থল, বিশেষ বিবেচ্য। লোকে কখনই বলেন না, বা লেখেন না, 'এই ঘটনা, ৩রা শ্রাবণ ১২৩২ সালে ঘটিয়াছিল।' এরূপ স্থানে যাহা লিখিত বা কথিত হয়, তাহা এই,—

"এই ঘটনা, ১২৩২ সালে ৩রা শ্রাবণে ঘটিয়াছিল।"

এখানে কেহই ভ্রমাত্মক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই কেন? যুক্তি সর্ব্বত্রই সমঞ্জসীভূত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নয়? আমরা যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, কোন সংবাদপত্রে ও সাময়িক-পত্রে তাহার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখিয়া সুখী হইয়াছি, সংবাদ-পত্রের মধ্যে "সোমপ্রকাশ" "হিতবাদী" "সমাজ ও সাহিত্য"

পত্রিকা ঐ নিয়মের পক্ষপাতী। তাঁহারা অগ্রে সাল, পরে তারিখ ও মাস লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরেজির নকল করিয়া অগ্রে তারিখ, পরে বৎসর লিখিতে ইচ্ছা করেন না। সাময়িক পত্রের মধ্যে "সাহিত্য" এবং "জন্মভূমি" ঐ নিয়ম আংশিক প্রতিপালন করেন, সর্ব্বত্র নয়। আশার অর্দ্ধেক ফল। ইহাদের নিকটে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। সুপ্রসিদ্ধ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শেষাবস্থায় এই সংস্কৃত মত অবলম্বন করিয়া "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 'দ্বিতীয় ভাগে" ঐ নিয়মে লিখিয়া গিয়াছেন। "সুচিন্তা" ও "পুরোহিত" নামে মাসিক পত্র দুইখানি, পূর্ণমাত্রায় এই নিয়মাবলম্বী।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তি কথা।

৪১৪। সাধক মঙ্গলময়ের অনন্তস্বরূপ মনন করিবার কালে যতদিন না প্রতীতি করিতে পারিবেন যে, বাহ্য জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ সেই ভূমার অনন্তস্বরূপ-সাগরে মগ্ন, ততদিন তিনি সেই অনন্ত মহিমার্ণবের অনন্তত্ব প্রকৃতিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না।

৪১৫। বাহ্য জগতের সকল দৃশ্যমান শূন্য স্থান বায়ু অথবা বাষ্পরাশিতে পূর্ণ, কোন একটী স্থান নিঃশেষিতরূপ শূন্য হয় না। সেইরূপ মানব প্রাণের কোন স্থান একেবারে শূন্য হইবার নহে। তথায় হয় সংসার, না হয় ঈশ্বর থাকিবেনই থাকিবেন। ভক্তের প্রাণ এই নিয়মে ঈশ্বর দ্বারাই অধিকতর অধিকৃত। সংসার তাঁহার পদতলে, তথায় তাঁহার ইচ্ছামত একটু স্থান পায়। এজন্য কথিত আছে—"ভোগ বাসনা যত যায়, প্রাণ তত তাঁহারে পায়।"

৪১৬। জ্ঞান ও প্রেমের বিবাদ সম্বন্ধে এক জন ভক্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

"দেখরে রঙ্গ দ্বন্দ্ব জ্ঞান ও প্রেমে।
জ্ঞান বলে আমার হরি সকলের কর্ত্তা।
প্রেম বলে আমার হরি জন্মদাতা পিতা॥
(সুবাদ মিষ্ট কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি বায়ু চরাচরে।
প্রেম বলে আমার হরি অন্তরের অন্তরে॥
(শীতল করে প্রাণ)
জ্ঞান বলে আমার হরি অনন্ত অপার।
প্রেম বলে আমার হরি প্রেমের পাথার॥
(নইলে ভজ্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি স্বতন্ত্র স্বাধীন।
প্রেম বলে আমার হরি ভক্তের অধীন॥
(বাঞ্ছা করে পূরণ)
জ্ঞান বলে আমার হরি অগম্য অগোচর।
প্রেম বলে আমার হরি বন্ধু সবাকার॥
(নইলে ডাক্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি অসঙ্গ নির্লিপ্ত।
প্রেম বলে আমার হরি প্রাণের মূলে স্থিত॥
(নইলে বাঁচ্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি অচিন্ত্য নির্গুণ।
প্রেম বলে আমার হরি সৃষ্টিতে নিপুণ॥
(কৌশল জানে কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি কেবা ধ্যানে পায়।
প্রেম বলে আমার হরি যে চায় সে পায়॥
(যে জন ডাক্‌তে জানে)

জ্ঞান বলে আমার হরি দেখা যায় ওই।
প্রেম বলে আমার হরি নিকটেতে এই॥
(তাই লই শরণ)
জ্ঞান বলে আমায় হরি আছে স্বর্গধামে।
প্রেম বলে আমারি হরি হৃদি বৃন্দাবনে॥
(লীলা করে কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি পুণ্য পবিত্রতা।
প্রেম বলে আমার হরি পাপীজন ত্রাতা।
(নিরাশ হব কেন)
জ্ঞান বলে আমার হরি ন্যায় দণ্ডদাতা।
প্রেম বলে আমার হরি স্নেহময়ী মাতা॥
(অভয় করে দান)
এইরূপে জ্ঞান প্রেমের দ্বন্দ্ব হয়ে ছিল।
সাধু বলে তর্ক ছেড়ে হরি হরি বল॥
(নইলে মিট্‌বে কেন)

৪১৭। শারীরিক কোন কোন রোগ সংক্রামক কিন্তু আধ্যাত্মিক সকল রোগই সংক্রামক। ঐ সকল রোগ বুদ্ধি, নৈতিক আচরণ ও ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে হইয়া থাকে। অতএব যাহারা আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত, তাহাদিগের সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৪১৮। যিনি প্রাকাম্য, যাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই ঈপ্সিত বিষয় সম্পাদিত হয়, যাঁহার পাদস্পর্শে এই বিশাল বিশ্ব সত্তাবান্ হইয়া সজীব রহিয়াছে, যিনি এই বিশ্বের আধার হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম, আনন্দধাম ছাড়িয়া অবতার রূপে মানব শরীরধারী হইবেন!! অবতার সম্বন্ধে এ প্রকার চিন্তা সেই মহান্ ভূমা ঈশ্বরের নিতান্ত অনুপযোগী ও তাঁহার মহান্ ভাবের বিরোধী। ঐরূপ চিন্তায় পাপ হয়। সুতরাং যাহারা এমন কুসংস্কার বিশিষ্ট বিষয়কে আপনাদিগের মনোমধ্যে স্থান দেয়, তাহারা সংকীর্ণমনা হইয়া অতীব কৃপাপাত্র হয়।

সময়ে সময়ে জন সমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ ঐশ্বরিক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মহাজনগণ সেই সেই কালোচিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহারা একেবারে মানব ক্ষীণতার অনধীন হইতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের সময়ের প্রয়োজন সাধন জন্য উদয় হন বলিয়া সেই সময়ের ফলস্বরূপে প্রকাশিত হন ("They are the products of the age, they are born in") তাঁহাদিগকে ঐশ্বরিক সম্মান প্রদান করা অথবা তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সম পূজা করা নিতান্ত ভ্রমসূচক ও দূষনীয় কার্য্য। তাঁহারা মহাজনোচিত সম্মানেরই যোগ্য।

৪১৯। আমরা আমাদিগের সুখের জন্য যত শারীরিক, মানসিক, লোক ও ধন বলের উপর নির্ভর করি, ততই শোকাধীন হই। আর তন্নিমিত্ত যতই সেই পূর্ণ মঙ্গলময়ের উপর নির্ভর করি, ততই শোকবিহীন হই।

৪২০। যাঁহারা জীবিতাবস্থায় আমাদিগের সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানীয় হন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ, মননাদি করিব। কখনও তাঁহাদিগের চরিত্রের দোষের দিকে আমাদিগের মনকে যাইতে দিব না; যদি দিই, তবে আমাদিগের মনোবিকার উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে বড়ই দুঃখ দিবে। আমরা তখন আমাদিগের পাপের ফল হাতে হাতে পাইব। তাঁহারা আমাদিগের আশীর্ব্বাদক; আমরা তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদই চাহিব, কদাচ

তাঁহাদিগের অবমাননা সূচক কোন বিষয় আমাদিগের বাক্য ও মনে আসিতে দিব না।

৪২১। বিজ্ঞান শাস্ত্র সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করি। জগদীশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপাদির জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশ (Intuition & Inspiration) যোগে লাভ হয়।

৪২২। যিনি নীতিপরায়ণতা, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, ব্রহ্মোপাসনা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সদুপায়ে সেই পূর্ণ মঙ্গলময়ের সত্ত্বাসাগরে মগ্ন হইয়া আপনাকে হারাইতেছেন, তিনি বলেন যে, "ব্রহ্ম আমাতে আর আমি তাঁহাতে," আর অধিকতর সাধন বলে, যখন সেই সাধক প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে গভীরতর রূপে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত নিজের অভেদ জ্ঞানের অধীন হইতে থাকেন, তখন তিনি বলেন "পূর্ণ মঙ্গলালয় আমি ও আমিই তিনি"। এই রূপে আপনাকে তাঁহাতে হারাণই যথার্থ অদ্বৈতবাদ; ইহাই অতিশয় প্রার্থনীয় সাধনের সর্ব্বোচ্চ অমৃতময় ফল। ইহা গ্রন্থাধ্যয়নে লব্ধ হয় না।

৪২৩। যতদিন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণ পূর্ণ মঙ্গলময় কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগের মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া চলিতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রাণোৎসর্গ ও ব্রহ্মোপাসনা ও প্রচার কার্য্য সজীব করিতে সমর্থ হইবেন। বৈরাগ্যে যত্ন-শিথিল ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজ-ধর্ম্মের সজীবতা রক্ষা করিতে কখনই পারিবেন না।

৪২৪। যাহার জীবন যে পরিমাণে বৈরাগ্য-প্রধান, সে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম সাধনে সমর্থ।

৪২৫। যিনি সংসার অপেক্ষা জগদীশ্বরকে অধিকতর ভালবাসেন, তিনিই বৈরাগী। তিনি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার বলে, প্রেমময়ের আদেশ পালন নিমিত্ত একদিকে যেমন ঘোরতর ক্লেশভোগ করেন, অপরদিকে তেমন অপার সুখ ও শান্তি সলিলে ভাসিতে থাকেন। যে এইরূপে বৈরাগী হইতে না পারে, সে-ই ধর্ম্ম জগতের বাহ্যদর্শক হয় ও জ্যেষ্ঠতাত, কিম্বা খুল্লতাতদিগের পদারোহণ করিয়া আপনার অন্তরের অসারতা প্রকাশ করে।

৪২৬। ভৌতিক জগতে ব্যয় ক্ষয়, আধ্যাত্মিক জগতে ব্যয় বৃদ্ধি। অমর আত্মার এরূপ আশ্চর্য্য গতি না হইলে কি অনন্ত উন্নতি লাভ হইত?

৪২৭। যে গালাগালির পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করে ও মন্দকারীর মঙ্গল চায়, সে ইহলোকে থাকিয়া স্বর্গবাসের ফল পায়।

৪২৮। মাটীতে নির্ম্মিত দেহ, হবে হবে মাটী।
মাটী হবার আগে কেন হও না তুমি মাটী॥

৪২৯। সবল চায় আসল (অনন্ত দেবতা)
দুর্ব্বল চায় নকল (পরিমিত দেবতা)।

৪৩০। পিতা গো! কাতরে করি এই নিবেদন।
যেন তব ভক্তের মত হয় গো মরণ॥

সমাপ্ত।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

৺মহাত্মা কানাইলাল পাইন

মহাত্মা কানাইলাল পাইন আর এ সংসারে নাই। ভক্ত, ভক্তিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া অনন্তধামে মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন জীবন্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তি ও বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের লোক হিন্দুসমাজে হীন পদবীতে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থামতে গুণানুসারী সম্মান প্রাপ্ত হইলে লোকের কত গুণ কেমন উপচীয়মান হয়, পরলোকগত এই মহাত্মার চরিত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য কথায়, অকপট ব্যবহারে, চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। এই মহাত্মাকে সেই চেষ্টার বিশিষ্ট ফল বলিতে হইবে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার সময়ে এমন কোন সৎকাজ অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল না। ধর্ম্মে তিনি প্রদীপ্ত ছিলেন, সত্যে ভূষিত, অনুরাগে প্রাচীন হইয়াও নবীন, কাজে বীরের ন্যায় সদা সতেজ ছিলেন। নব্যভারতে প্রকাশিত কোন একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, জীবনের শেষাংশে, তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ দেখিয়া অবাক্ হইলাম, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলাম। তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আপনার মত পাঁচটী লোক পাইলে আমি ব্রাহ্মসমাজে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারি (I can work out miracles)." চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার বদনমণ্ডল উৎসাহে, বীরত্বে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বন্ধুবর ৺জগদীশ্বর বাবুর সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল, উভয় বন্ধু আজ স্বর্গে বসিয়া না জানি ব্রাহ্মসমাজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া কতই ব্যাকুল হইতেছেন। এই মহাত্মার আত্মবিবৃত জীবনকাহিনী হইতে নিম্নলিখিত মহামূল্য বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। এই মহাত্মা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না ; যাঁহারা মনোযোগ সহকারে ভক্তিকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার গভীর আত্মদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বিধাতার প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে, মহাত্মা কানাইলাল পাইন তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার পুণ্যবলে ব্রাহ্মসমাজ অনেক সৎকাজ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিকটবর্ত্তী কলুটোলায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ মধুসূদন পাইন। ৪ বৎসর বয়সে পিতৃ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়ায় শিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হয়। শীলদিগের কলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। ঐ কলেজ এখন শীলস্ ফ্রিকলেজ নামে খ্যাত। উনবিংশ বৎসর বয়সেই একাউণ্টেণ্ট জেনেরেলের আফিসে চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর গৃহ পাঠ ভিন্ন

বিজ্ঞাপন।

জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী। শ্রীযুত বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। সহর কলিকাতা সামপুখর রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ২৬।১ নং গ্রন্থপ্রণেতার নিজবাড়ী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্তর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১০।৪ নং নব্যভারত কার্য্যালয়, শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নিকট এবং সিমলা বলরাম দে ষ্ট্রীট ৮৮ নং শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ, মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিস্যনরের সাবেক পার্ছোনেল এসিষ্টাণ্ট ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজেষ্টর ও কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন তাহার অবয়ব নকল নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুত বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়।

মহাশয়!

আমি আপনার জমিদারী কার্য্য প্রণালী পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার কার্য্যে যেরূপ বহুদর্শিতা ও পারদর্শিতা আছে এই পুস্তকখানি তাহার বিশেষ পরিচয়স্থল হইয়াছে, ইহার দ্বারা যে জমিদার ও তাঁহাদের কার্য্য-কারকদিগের বিশেষ উপকার হইবেক তাহার সন্দেহ নাই কারণ ইহাতে জমিদারী কার্য্য প্রণালী অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যেরূপ শ্রম সহকারে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, ইহার মূল্য তদনুরূপ অধিক হয় নাই।

কলিকাতা

রামচাঁদ মৈত্র লেন, ১৭নং বাটী } শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য।

১৪ নবেম্বর ১৮৯৩।

কানাই বাবু অর্থ সাহায্য করেন এবং ইহার ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এই স্কুলের শিক্ষকগণকে উপদেশ দিতেন এবং মহাত্মা কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ছুটী রজনী বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা দিতেন। কেশব বাবুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দানের পরই, তাঁহার বাটীতে, কলুটোলায় তিনি সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই খানে অনেক মহাত্মার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬১ খৃীঃ কানাইবাবুও ৬৭ নং পঞ্চানন তলা হাড়কাটায় এইরূপ আর একটী সভা গঠন করেন।

অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই সময়ে কানাই বাবু ব্যবসা বাণিজ্য করিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতির আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে আফিসে ৪৫৲ বেতন পাইতেন। অনেক চেষ্টার পর ১৮৬২ খৃীঃ ৬০৲ বেতন হয়। আফিসে ভাল কাজ করিয়াও কর্ম্মচারীগণের পক্ষপাতিতায় বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ১৮৮৮ খৃীঃ ১৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ৭৯।৶০ পেন্সন লইয়া মনোক্ষোভে কাজ ছাড়েন। ১৮৬২ খৃীঃ হইতে ১৮৬৭ খৃীঃ পর্য্যন্ত নানা সৎ কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং সোমপ্রকাশে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সত্যান্বেষণ পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের নানা কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন। সে সকল ঘটনা পুঙ্খের বিশেষ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ণ জীবনীতে এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে। এই সময়ে তিনি যেন কার্য্যস্রোতে ভাসিতেছিলেন। কখনও নূতন প্রার্থনালয় সংস্থাপন করিতেছেন, কখনও ডিবেটিং ক্লব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, কখনও পত্রিকা (সত্যান্বেষণ) লিখিতেছেন, কখনও রজনী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও নানাস্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং সমাজে উপাসনা করিতেছেন। পঞ্চাননতলায় বরাবর তাঁহার চেষ্টায় প্রার্থনা সমাজ চলিতেছিল। ১৮৬৫ খৃীঃ কেশব বাবু আদি সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬৩ খৃীঃ ৺ঠাকুর দাস সেনের সহিত মিলিত হইয়া, কানাই বাবু কেশব বাবুকে লইয়া বহুবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাসনা পদ্ধতি ঠিক করিয়া দেন। এই সমাজ হইতে সত্যান্বেষণ প্রকাশিত হয়। এই সমাজে বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য ছুটী শ্রেণী খোলা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ধর এবং নিম্ন শ্রেণীতে কানাই বাবু শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে অনেক দিন কাজ চলিল না, ১৮৬৬ খৃীঃ ইহার কাজ বন্ধ হইলে ৺হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইল। এই খানেই প্রার্থনা সমাজ চলিতে লাগিল। ১৮৬৯ খৃীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমাজের সমস্ত দ্রব্যাদি ঐ সমাজে দান করা হয়। কানাই বাবু ইহার পরও কিছুদিন বাবু হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে সমাজ করিতেন। সাম্বৎসরিক উৎসবে কেশব বাবু ও দেবেন্দ্র বাবু আসিতেন। ১৮৭৪ খৃীঃ "A brief History of the Brahma Somaj" প্রকাশ করেন। ইহার পর পীড়া প্রযুক্ত অসমর্থ হওয়ায় প্রার্থনা সমাজের সহিত সম্বন্ধ পরি-

ত্যাগ করেন। ইহার পর আর প্রকাশ্যে তিনি উপাসনা করিতে পারিতেন না।

সকলেই অবগত আছেন, কেশব বাবু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভারত-সংস্কারক সভা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অধীনস্থ মদ্যপান নিবারণী বিভাগের কার্য্যভার ৪ বৎসর কানাই বাবুর উপর ছিল। এই বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে বাবু নীলমণি ধর সম্পাদক হন, তৎপরে কানাই বাবু সম্পাদক হন। পীড়াপ্রযুক্ত শেষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের হস্তে ইহার ভার দিয়া কানাই বাবু অবসর লন। প্রতাপ বাবুর বিলাত গমনের পর এই পত্রিকা উঠিয়া যায়। তৎপর সুরাপান সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের বাড়ীতে একটী ডিবেটীং ক্লব প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার মহোদয়ের অনুরোধে কানাই বাবু ইহাতে যোগ দেন। এখানেও তিনি বক্তৃতাদি করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ কেশব বাবু দেশে ফিরিয়া আসিলে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত থিস্‌টিক সোসাইটির পুনর্গঠন করেন। কানাই বাবু এই সভার সভ্য হন এবং নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভা ৬ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করেন, তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। কানাই বাবু ১৮৭৭ খ্রীঃ হিন্দু-এমুইটি ফণ্ডের ডিরেক্টর মনোনীত হন এবং এক বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত ঐ কাজ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ ফণ্ডের অডিটার মনোনীত হন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আপন জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। শেষ জীবন পীড়ার সেবা-তেই অতিবাহিত হয়। এই সময়ে বাবু রসিকলাল পাইনের নিকট যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহা অতি সুন্দর ধর্ম্মভাবপূর্ণ। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য লাভের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করেন। বাল্যকালে রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পর আর করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার শরীর রোগে ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, এমন সময়ে আমাদের সহিত আলাপ হয়। এই সময়ে ভক্তিকথা লিপিবদ্ধ হয়। ইহা তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় দিবার জন্য জগতে রাখিয়া, ৬০ বৎসর বয়সে, ১২৯৮ সন, ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ইং ১২ই জুন, ১৮৯১ খ্রীঃ বেলা ৩ ঘটিকার সময় তিনি বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। যে বীর ব্রাহ্মসমাজের নানা সঙ্কটের অবস্থায় প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার নামও নাই। মহতের পূজা যে দেশে হয় না, সে দেশ মরণের কোলে চির নিদ্রিত। যে সমাজে মহতের সম্মান নাই, সে সমাজ চিরমৃত। মহাত্মা কানাইলাল পাইনের কথা বঙ্গদেশ ও ব্রাহ্মসমাজ বিস্মৃত হইলে, এদেশ ও এই সমাজের মঙ্গল নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট কিছু ঋণী, ব্রাহ্মসমাজ নানাবিষয়ে বিশেষরূপ ঋণী। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

কোজাগরে শুকতারা।

১

জ্যোতিঃ-বসনে,
গোধূলি-আসনে
বসি, একমনে
কারে চাও?
ধীর আঁখিতে
কাহারে দেখিতে
কনক কিরণ
ঢেলে দাও?
গোধূলি মিশায়
আকাশের গায়,
নয়ন পলক
তবু নাই,
আঁখি অনিমিখ্
চেয়ে এক-ই দিক
কার আশাপথে
ভাবি তাই।
সুষমা ঝলকে,—
যামিনী-অলকে
গাঁথা রতনের
ফুল প্রায়,—
যাহার লাগিয়ে
রয়েছ জাগিয়ে,
কোন দেব সেই
অমরায়?

২

পূরবে চন্দ্রমা
পূর্ণ-সুষমা
ধীরে ধীরে ধীরে
ওঠে ওই,
যামিনী, অঞ্চলে
বাঁধি কুতূহলে,
বলে,—"আমি উষা,
নিশি নই!"
শ্রান্ত নয়ান,
উদাস পরাণ
মলিন বয়ানে
দেখা যায়,
যেন বা কাহারে
আলোক-আঁধারে
চেয়ে চারিধারে
খোঁজে, হায়!
কিরণ-মালিকা
তারকা-বালিকা
ফুটি একে একে
বলে,—"কও
কথা মোর সনে,"—
শশী আনমনে
বলে,—"ওগো সেত
তুমি নও!"

৩

প্রণয়-নিরাশে
লুকায় আকাশে
মলিন-সুষমা
তারাচয়;
শশী উঠে ধীরে,
চাহে ফিরে ফিরে
আকুল পরাণে
নভোময়।
সুদূর পশ্চিমে,
গগনের সীমে
মাঝে সোণামাখা
নীলিমায়,
বিমল কিরণ,
রতন-বরণ,
থির আঁখি হতে
ঝরে কায়?

নেহারিল চাঁদ ;—
ঘুচিল বিষাদ,
হৃদয়েতে সুধা
উথলায়,
আশার পূরণে
উজল আননে
রজত লহরী
ভেসে যায় !

৪

মিলিল চকিতে
আঁখিতে আঁখিতে,—
গগন-পরিধি
মাঝে তার !
অবশ পরাণ,
উথল নয়ান,
সুদূর মিলন
দুজনার !
কোমল কিরণে,
বিকচ নয়নে
পরশিল শশী
তারকার,
সুখের শিহরে,
কিবা লাজভরে,
চারু আঁখি আধ
মুদে তার !
না কহিল কথা,
না জানাল ব্যথা,
না দিল ফিরিয়া
সে সোহাগ,
সরমেতে সারা
ম্লান শুকতারা,
মরমেতে ভরা
অনুরাগ !

৫

সুখের অলসে,
কিবা লাজবশে,
ঢলে পড়ে তারা
নভোগায়,
ধীর চরণে,
স্তিমিত নয়নে,
শেষে নিশিকোলে
মিশে যায়।
যে দিকে লুকালো,
সে মাধুরি-আলো,
শশীর সেদিকে
ধায় প্রাণ,—
বিনা পরশন
দেবের মিলন,
বাধে না আকাশ-
-ব্যবধান !
স্মৃতি কোলে করি,
হৃদে সুধা ভরি,
ভাসাল রজতে
চরাচর,
জাগি সারারাতি,
শশী, ম্লানভাতি,
সোহাগ প্রেমের
কোজাগর !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

কলিকাতায় ইংরেজী চর্চ্চা। (১)

কলিকাতা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী। কলিকাতায় ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হইয়া, বঙ্গদেশ ও

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কালক্রমে ইরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন বিস্তৃত হয়। কলিকাতাই বর্ত্তমান কালের স্কুল, কলেজ ও পাঠশালাদি বিদ্যালয়ের আদিম প্রসূতি। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ এই মহানগরীর নিকট ইংরেজী চর্চ্চা বিষয়ে কতদূর ঋণী, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট এই বিষয় অনাদরনীয় হইবে না, ভরসা করি।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রামের অধঃপতনের পর হুগলী বঙ্গদেশের প্রধানতম বন্দরে পরিণত হয়। পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ হুগলীতে বাণিজ্যকুঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। ১৬৪২খ্রীঃ হুগলীতে ইংরেজদিগের প্রথম কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৮৬ খ্রীঃ সুবিখ্যাত জব চার্ণক হুগলীর ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ পদে অধিষ্টিত ছিলেন। বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক প্রদান সম্বন্ধে বাঙ্গলার নবাব সায়েস্তাখাঁর সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ঢাকা নগরীতে তখন বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবাবের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পর, হুগলীতে অবস্থান বিপজ্জনক ভাবিয়া, সুবিজ্ঞ চার্ণক আপনার দলবল সহ ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী সুতানুটীতে আগমন করিতে বাধ্য হন। ১৬৮৬ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর হুগলীর বাজারে কতিপয় মুসলমান সিপাহীর সহিত এডমিরাল নিকলসনের অধীনস্থ তিন জন ইংরেজ সৈনিকের বিবাদ হয়। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষীয় সেনাদলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইংরেজ নৌসেনার অধিনায়ক ইহাতে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন। এই গোলাবৃষ্টিতে ইংরেজ কুঠীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন ৫০০ গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইংরেজ কোম্পানীর প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী বিনষ্ট হয়। নবাব সায়েস্তাখাঁ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, ইংরেজদিগকে হুগলী হইতে দূরীভূত করার জন্য বহুতর সেনা প্রেরণ করিলেন। ইংরেজদিগের ঢাকা, পাটনা, মালদহ ও কাসিমবাজারের বাণিজ্যকুঠী অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। চার্ণক হুগলী হইতে সুতানুটীতে গমন করিলেন। এইরূপে ১৬৮৬ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা মহানগরীর সূত্রপাত হয়।

১৬৮৭ খ্রীঃ নবাব সেনার অনুসরণ ভয়ে চার্ণক সুতানুটী পরিত্যাগ করিয়া হিজলীতে গমন করিলেন। ১৬৮৮ খ্রীঃ কাপ্তান হীথ বালেশ্বর নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, বাঙ্গালা হইতে সমুদয় ইংরেজ বণিকগণকে মান্দ্রাজে লইয়া গেলেন। ১৬৯০ খ্রীঃ বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ দিল্লীর সম্রাটের আদেশ ক্রমে জব চার্ণককে বাঙ্গলায় প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন। সম্রাট আরঙ্গজীবের বিশেষ অনুমতিপত্র ভিন্ন নবাবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে পুনরায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে চার্ণক প্রথমত অসম্মত হইলেন। কিন্তু পরে ৩০জন সৈনিক ও কুঠীর কর্ম্মচারীর সহিত তিনি ১৬৯০ খ্রীঃ ২৪শে আগষ্ট সুতানুটীতে প্রত্যাগত হইলেন। হুগলীর ফৌজদার মীর আকবরআলী সুতানুটীতে আগমন করিয়া অতি আগ্রহ ও শিষ্টাচারের সহিত চার্ণককে দলবলে গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতায় ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া জব চার্ণক দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। ১৬৯২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে

সুতানুটীতে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং এলিস সাহেব তাঁহার স্থলে ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীঃ শোভা সিংহ ও রহিম খাঁ বিদ্রোহী হয়। ১৬৯৭ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে বিদ্রোহীরা মালদহের ইংরেজ ও ওলন্দাজ কুঠী লুণ্ঠন পূর্ব্বক উৎসন্ন করে। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে সুবাদারের বিনা লিখিত অনুমতিতে আপনাদের ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজেরা কলিকাতার কুঠীকে দুর্গ মধ্যে পরিণত করেন। ১৬৯৯ খ্রীঃ সুবাদার সুলতান আজিম উসমানের অনুমতি ক্রমে স্থানীয় জমীদারগণের নিকট হইতে আমীরাবাদ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ক্রীত হইল। এই গ্রাম তিনখানির তালুকদারী স্বত্ব লাভের জন্য ইংরেজ বাঙ্গালার নবাবের সরকারে ১১৯৫।৶০ সিক্কা টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। কলিকাতার দুর্গবদ্ধ কুঠী ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নাম অনুসারে "ফোর্ট উইলিয়াম" নামে অভিহিত হইতে থাকে। আয়ার সাহেব তৎকালে কলিকাতা কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আয়ারের প্রতিষ্টিত কলিকাতা দীর্ঘে তিন মাইল ও প্রশস্ততায় এক মাইল ব্যাপিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। তখন তাহার অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল।

১৭৪২ খ্রীঃ মারহাট্টা দস্যুদিগের আক্রমণ ভয়ে নগরীর উত্তর পূর্ব্বদিকে "মারহাট্টা খাত" খনিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৃঢ়তা ও কার্য্যদক্ষতায় সেই ভয় নিবারিত হইলে, খাতের খনন কার্য্য বন্ধ হয়। ১৭৫৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যু ঘটে। তাহার দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে মাতামহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে কলিকাতা দুর্গের জীর্ণসংস্কার যেন কখনও সাধিত না হয়, এবং রাজা রাজবল্লভ সেনের পুত্র কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে যেন তাঁহার সমীপে প্রেরণ করা হয়। ইংরেজ গবর্ণর নবাবের এই প্রস্তাব প্রতিপালনে অসম্মত হইলে, ২০শে জুন নবাব সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। ডিসেম্বর মাসে ক্লাইভ বজবজ, কলিকাতা ও হুগলী অধিকার করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধিপত্র দ্বারা নবাব ইংরেজ বণিকদিগের সর্ব্ববিধ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সন্ধির বলে ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য ও কলিকাতায় দুর্গ ও টাকশাল নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। নবাব কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ মৌজার (বর্ত্তমান চল্লিশ পরগণার) জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করার অনুমতি এই সময় প্রদান করেন। ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের চক্রান্তে ক্লাইভ সাহেব বাঙ্গালায় ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্টিত করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট ক্লাইভ সম্রাট সাহ আলমের স্বাক্ষরিত সনদ বলে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেনার সাহায্যে রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মুরসিদাবাদের নবাবকে নিজামতের খরচ বাবতে ৫৩ লক্ষ ও সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, বাঙ্গালায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ইংরেজ কোম্পানী গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ রবার্ট ক্লাইভ এইরূপে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্টিত করেন। ইংরেজ রাজত্বের

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এক জন সুইডেন-বাসী খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া ভারতে ইংরেজ রাজত্বের মূল দৃঢ়ীভূত করে এবং ভারতবাসীর দৃষ্টি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত করে। এই মহাপুরুষের নাম জন জেকারিয়া কিয়ারনেণ্ডার।

১৭১১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিনে তিনি পূর্ব্ব গোথলেণ্ডের অন্তর্গত লিঙ্কোপিং নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৫-৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি জর্ম্মনীর অন্তর্গত হেলিনগরে অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৭৩৯ খৃঃ ২০শে নবেম্বর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে দীক্ষিত হন। স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া তিনি ভারতীয় প্রচার কার্য্যে প্রেরিত হওয়ার জন্য ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করেন। পর বৎসর বসন্তকালে ধর্ম্মপ্রচারক পদে নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বোপকূলস্থ কুডালোর নগরে উপনীত হন। তিনি ৮ জন বালক লইয়া তথায় একটী তামিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত পুরঃসর প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে অবস্থান কালে রবার্ট ক্লাইভের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার চরিত্র, উৎসাহ, অধ্যবসায়, বিজ্ঞতা ও সহৃদয়তা দর্শনে ক্লাইভ তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পলাসীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় ইংরেজ রাজত্বের মূল প্রোথিত করিয়া, ক্লাইভ তাঁহাকে কলিকাতায় প্রচারাশ্রম স্থাপনার্থ পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ১৭৫৮ খৃঃ ২৯ শে সেপ্টেম্বর তিন সপ্তাহ সমুদ্রপথে অতিবাহিত করিয়া, মহাত্মা কিয়ারনেণ্ডার কলিকাতায় উপনীত হন।

ক্লাইভ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বাসস্থলের অনতিদূরে, কলিকাতার দুর্গ মধ্যে, এক সুবৃহৎ গৃহ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তিনি এই গৃহে আট বৎসর অবস্থিতি করেন। ক্লাইভ নবাগত ধর্ম্মযাজককে এতদূর অনুগ্রহ ও সম্মান করিতেন যে, অতি আহ্লাদের সহিত পাদরী কিয়ারনেণ্ডারের শিশু পুত্রের ধর্ম্মপিতার পদ গ্রহণ করেন। হেনরী বাটলার ও জন কেপ নামে দুইজন ইংরেজ ধর্ম্মযাজক তাঁহার আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় আগমন করেন। দুর্গমধ্যে এক মৃণ্ময় গৃহে তখন উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদ্বয় তথায় ইংরেজ সেনা ও কর্ম্মচারীগণকে লইয়া প্রতি রবিবার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা উভয়েই অতি আগ্রহ ও শিষ্টাচারের সহিত নবাগত সুইডিস যাজককে গ্রহণ করেন।

কলিকাতা তখন নদীতীর পর্য্যন্ত নিবিড় জঙ্গলে আবৃত অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিল, ঝিল, গর্ত্ত, নালা ও জঙ্গল হইতে অতি দূষিত বায়ু উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইত। এই বিষাক্ত বায়ু সেবনে অনেকে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত। দুই বৎসর পূর্ব্বে নবাবের আক্রমণে কলিকাতার দুর্গ ও ভজনালয় ভূমিসাৎ হইয়া নাম মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্গের কার্য্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছিল। গোবিন্দপুরের অনেকানেক কুটীর ও গৃহের ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত পরিখা খনিত হইতেছিল। নদী গর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ও পিনিস ভিন্ন বড় আকারের এক খানি

জাহাজও দেখা যাইত না। নদীতীরে উত্তরণের উপযোগী ঘাটের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। নদীতীর দিয়া যাতায়াতের কোনও রাস্তা যে ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গের সম্মুখ-ভাগে বাণিজ্য দ্রব্য উত্তোলন ও অবতরণের জন্য যৎসামান্য ইষ্টক-নির্ম্মিত স্থল শোভা পাইত। এখন তথায় কাষ্টম হাউস অবস্থিত। প্রাচীন দুর্গ, সেনানিবাসের পরিবর্ত্তে বাণিজ্যাগারে পরিণত হইয়াছিল। দুর্গের উত্তর ভাগের অধিকাংশে কোম্পানীর কাপড়ের গুদাম অবস্থিত ছিল। অন্যান্য নানা স্থানে দ্রব্যাগর ও কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। লালবাজার তখন সম্ভ্রান্ত লোকের আবাস স্থল বলিয়া পরি-গণিত ছিল। চীনাবাজার, রাধাবাজার, মুরগীহাটার আর্ম্মেনিয়ানগির্জ্জা পর্য্যন্ত ইংরেজ বণিকগণের দোকান অবস্থিত ছিল। লাল-দিঘীর চতুষ্পার্শে (Tanks Square) ইংরেজেরা যথায় অবস্থিতি করিতেন, তাহা 'পার্ক' নামে পরিচিত ছিল। নদীতীরে ও 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে' সামান্য গৃহে ইংরেজেরা বাস করিতেন। বড় বড় গৃহের সংখ্যা অতি কম ছিল। ঘরের সাজ সজ্জাও যৎ সামান্য ছিল। নবাবের আক্রমণের পর কলিকাতার পূর্ব্বতন শোভা সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অধিবাসীরা সকলে নবাব মীরজাফরের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থে স্ব স্ব আবাসস্থল নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। পূর্ব্বদিকে মারহাট্টা খাত পর্য্যন্ত নগরী বিস্তৃত ছিল। বৈঠকখানা ও ধর্ম্মতলার রাস্তা দিয়া পূর্ব্বভাগে যাতায়াতের কার্য্য সম্পন্ন হইত। কলিঙ্গা তখন বাঙ্গালীদের বাসস্থান ছিল। চৌরঙ্গী নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান ময়দানের অধি-কাংশ জঙ্গলে আবৃত ও কিয়দংশ কর্ষিত ভূমিতে পরিণত ছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়া আলিপুর ও খিদি[illegible] গ্রামে যাতায়াতের জন্য দুইটী শাখা পথ বিদ্যমান ছিল। দুইটি কাষ্ঠময় সামান্য সেতু দ্বারা আদি গঙ্গা পার হইতে হইত। দক্ষিণ-ভাগে ইংরেজেরা ও উত্তর ভ[illegible] বাঙ্গালীরা বাস করিত। চিৎপুরের রাস্তা দিয়া নগরের উত্তরভাগে যাতায়াতের কার্য্য সম্পন্ন হইত। তথায় অনেক বাজার সংস্থাপিত ছিল বটে কিন্তু বসতিগৃহ এত ঘন ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল না। প্রতি বাড়ীর চতুষ্পার্শেই প্রায় জঙ্গল ও দূষিত জলপূর্ণ জলাশয় ছিল। তাহা হইতে অতি বিষাক্ত বায়ু নির্গত হইয়া অনেককে অকালে মৃত্যুমুখে পাতিত করিত। নগরীর চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল। তাহা দস্যু ও হিংস্র জন্তুর আশ্রয়স্থল ছিল। প্রতি বৎসর জ্বরাদি রোগে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিত এবং অগ্নিদেবের প্রভাবে অনেক কুটীর ভস্মীভূত হইত। তখন যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ বাস করিতেন, তাহাদের অধিকাং-শই কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা গবর্ণর ক্লাইভের সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। কোমল-হৃদয়া স্ত্রীজাতির অভাবে ইংরেজ সমাজ সর্ব্বতোভাবে সংযত ও সুশৃঙ্খল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 'মেয়র' ও 'এলডারম্যান'গণ দ্বারা এক ক্ষুদ্র বিচারালয়ে নাগরিক শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। জমিদারী কার্য্য শাসনের ভার যাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল, তিনি 'জমিদার' নামে পরিচিত ছিলেন। শান্তিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর রাজস্ব সংগ্রহ ও ফৌজদারী আদালতের বিচারভার

ন্যস্ত ছিল। ১৭৫২ খ্রীঃ সুবিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্রের হস্ত হইতে হলোয়েল সাহেব জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন। কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বাণিজ্য কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শাসন কার্য্যের সহিত তাঁহাদের কোনও সংশ্রব ছিল না। বাণিজ্য ব্যাপারে তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিলাসী ও অপব্যয়ী হইয়া উঠেন। প্রথমে ক্লাইভ ও ওয়াট্স সাহেবের দুইখানি মাত্র গাড়ী ছিল। তখন পাখা টানার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। নগরে কোন মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্বও সেই সময়ে কল্পিত হয় নাই। পোলিসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাহারা নানা অবৈধ উপায়ে লোকের উৎপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ ছিল না। তখন কালীঘাটে ও চিৎপুরে নরবলি প্রদত্ত হইত। মৃতদেহ বলির পর নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত। পথে, ঘাটে, মাঠে ও জঙ্গলে দস্যুতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। নদীগর্ভে ও ঘাটে নরহত্যার অভাব ছিল না। নদীর তীরে পতির চিতানলে সতীদাহ হইত। কেহ কেহ বা গঙ্গাগর্ভে ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। ধনী ও দরিদ্র সকলেই, যে কোন উপায়ে হউক, অর্থের উপার্জ্জনকে জীবনের প্রধানতম কার্য্য মনে করিত। ধনী হিন্দুরা অত্যাচারী, অহঙ্কারী ও লোভ-পরায়ণ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে কোনরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল না।

যেখানে ইউরোপীয় সেনা থাকিত, রাজদত্ত সনদ অনুসারে ইংরেজ কোম্পানী তথায় একজন শিক্ষক ও একজন ধর্ম্মযাজক রাখিতে বাধ্য ছিলেন। ১৭১৫ খ্রীঃ খিয়ারক্লিফ নামে যাজক কলিকাতার ইংরেজ সমাজের ধর্ম্মাচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আগমনের পরে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে প্রাচীন দুর্গের একতম দ্বারের ৫০ গজদূরে 'সেণ্টজনগির্জ্জা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় নিয়মিতরূপে প্রতি রবিবার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা সমবেত হইয়া উপাসনা কার্য্যে যোগদান করিতেন। বর্ত্তমান 'রাইটারস্‌বিল্‌ডিং' প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোণে এই ভজনালয় অবস্থিত ছিল। ১৭৩৭ খ্রীঃ প্রবল ঝড়ে কলিকাতার অনেক লোক বিনষ্ট ও অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হয়। সেই সময়ে গির্জার চূড়া মৃত্তিকাশায়ী হয়। ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণে এই গির্জা বিনষ্ট হয়। গির্জ্জার দুইজন ধর্ম্মযাজকের মধ্যে জারভাস বেলামি অন্ধকূপহত্যায় প্রাণত্যাগ করেন এবং অন্যতম যাজক মেপলটফ্‌ট কয়েক মাস পরে জ্বররোগে ফল্তায় জাহাজে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

১৭৫৮ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে ধর্ম্মযাজক কিয়ারনেণ্ডার কলিকাতায় উপনীত হন এবং ১ লা ডিসেম্বর তিনি বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করে। ইংরেজী, বাঙ্গালা, পর্টুগিজ ও আর্ম্মেনিয়ান ভাষা এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পঠিত হইতে থাকে। অবিলম্বে ৪০টী বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। ২০ জন ছাত্রের যাবতীয় ব্যয় ১৭৩২ খ্রীঃ বোর্চিয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য তহবিল হইতে প্রদত্ত হইত। বোর্চিয়ার পরে বোম্বের গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯

খ্রীঃ শেষ হইতে না হইতে ছাত্র সংখ্যা ১৭৪ জনে পরিণত হয়। এই ১৭৪ জনের মধ্যে ৩৭ জনের ব্যয় দাতব্য তহবিল হইতে প্রদত্ত হইত। ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষা ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভিন্ন লেখা পড়া ও পাটীগণিত শিক্ষা করিত। এই প্রথম বৎসরে একজন বাঙ্গালী বালক সমগ্র বাইবল, 'Whole Duty of man' এবং 'Instruction for the Indians' নামে তিনখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ফেলেন। মহাত্মা কিয়ারনেণ্ডার ইংরেজী ও জার্ম্মেন পুস্তক বিতরণ করিতেন, ইংরেজী ও পর্ত্তুগিজ ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, এবং সময় সময় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত গমন করিতেন। দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অবসর ছিল না। এই জন্য তিনি ইংলণ্ডে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিয়া, দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক চাহিয়া পাঠাইলেন। দ্বিতীয় বৎসর ছাত্রসংখ্যা ২৩১ জনে পরিণত হয়, তন্মধ্যে ১৯ টী ইংরেজ ও পর্ত্তুগিজ বালিকা বালকদিগের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। ছাত্রদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যকের ব্যয় দাতব্য তহবিল হইতে প্রদত্ত হইত। কেহ কেহ বেতন দিয়া পড়িত। অবশিষ্ট বালকদিগের ব্যয় ইংরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রদত্ত চাঁদায় নির্ব্বাহিত হইত। তিনি নিজে ৪০ জন ছাত্রের খরচ দিতেন। ১৭৬১ খ্রীঃ তিনি নিজ ব্যয়ে এক প্রশস্ততর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যালয় ও ভজনালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে ও গির্জ্জায় পর্ত্তুগিজ ভাষাই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

১৭৬১ খ্রীঃ মই মে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিবি উলী নামে এক ধনশালিনী বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী হন। এই বৎসর কলিকাতায় এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইয়া, ছাত্রসংখ্যা ৪০ জনে পরিণত করে। কিয়ারনেণ্ডার স্বয়ং ছয়বার আক্রান্ত হইয়া অবশেষে পরিত্রাণ লাভ করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতা তখন অতি অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। ১৭৫৬ খ্রীঃ অন্ধকূপহত্যার পর ইংরেজ সৈন্য মেজার কিলপেট্রিকের অধীনে নদীগর্ভে ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিল। মহামারীতে আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২৪০ জনের মধ্যে ২১০ জন মহামারীর প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্ষাকালের সঙ্গে সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রীঃ প্রতি বৎসর এই মহামারী জ্বরস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া শীতকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত অনেককে মৃত্যুমুখে পাতিত করিত। ১৭৬৮ খ্রীঃ কলিকাতায় এই জ্বর রোগে অনেকের মৃত্যু হয়। ১৭৭০ খ্রীঃ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময়ে কলিকাতায় ৮০ হাজার দেশীয় ও ১৫০০ ইউরোপীয় অধিবাসীর মৃত্যু হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ আগষ্ট হইতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় ১২০০ ইংরেজ ও ইউরোপীয় অধিবাসীর মধ্যে ৪৭০ জনের মৃত্যু ঘটে। ১৭০৯ খ্রীঃ ডায়মণ্ড হারবারে ১২০০ নৌসেনা ও নাবিকের এক চতুর্থাংশের জ্বরের আক্রমণে মৃত্যু ঘটে।

১৭৬৩ খ্রীঃ পাদরী কিয়ারনেণ্ডারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার স্থাপিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ের জন্য এক জন স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত হয়। পর বৎসর কলিকাতার গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব বিদ্যালয় ও ভজনাল-

য়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সুবৃহৎ গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, ১৭৬৭ খৃীঃ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য তাহা পুনর্ব্বার গৃহীত হয়। ১৭৫৮—৬৬ খৃীঃ পর্য্যন্ত তিনি ১৮৯ জনকে খৃীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বালকগণকে শিক্ষা ও যুবাবৃদ্ধকে ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ, এই ত্রিবিধ উপায়ে তাঁহার প্রচার কার্য্য চলিতেছিল। তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষিত পাঁচ জন ছাত্র শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে সরকারী কার্য্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার বলে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

পাদরী বেণ্টো পনর বৎসর কাল কলিকাতায় প্রচার কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, ১৭৬৭ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' পুস্তক ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত করেন। ১৭০০ খৃীঃ হইতে কলিকাতায় পর্ত্তুগিজদিগের ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭২০ খৃীঃ তাঁহার আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে তাহাদের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত ম্লান হয়। বেণ্টো প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পর্ত্তুগিজগণকে আপনার অবলম্বিত মতে দীক্ষিত করার কার্য্যে পাদরী কিয়ারনেণ্ডারের বিশেষ সাহায্য করিতে থাকেন। ১৭৬৯ খ্রীঃ একজন বাঙ্গালী খৃীষ্টান পাদরী বেণ্টোর সহকারী নিযুক্ত হয়। ১৭৭০ খৃীঃ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের ⅓ অংশ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে বলিয়া শুনা যায়। এই বৎসর বিদ্যালয়ে ৯৭ জন ছাত্র শিক্ষা পাইতেছিল। ১৭৭২ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা ৯৪ জনে পরিণত হয় এবং ১৭৭৬ খ্রীঃ ৮৮ জন মাত্র থাকে। ১৭৯৯ খ্রীঃ ১০ ই মে ৮৮ বর্ষ বয়সে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়। ১৭৭২ খৃীঃ মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজকোষ ও সরকারী কার্য্যালয় আনীত হইয়া, কলিকাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের রাজধানীতে পরিণত করে। জিলায় জিলায় দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হয়। ফৌজদারী আদালতের তত্ত্বাবধান ভারও কালেক্টরের প্রতি অর্পিত হয়। কাজি, মুফতী ও মৌলবীর সাহায্যে ও পরামর্শে মুসলমান ব্যবস্থাবলী মুসলমান জাতির বিচার সময়ে আদালতে প্রয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। হিন্দু ব্যবস্থা হিন্দুর প্রতি প্রয়োগের জন্য, আদালতকে সাহায্য করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিয়োগের নিয়ম প্রচলিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় 'সদর দেওয়ানী' ও 'সদর নিজামত' নামে দুই প্রধানতম বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯০ খৃীঃ 'সদর নিজামৎ আদালত মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় পুনরানীত হয়। ১৭৭৪ খৃীঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, এবং কলিকাতায় 'সুপ্রিম কোর্ট' নামে প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠার পর হইতে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে বিশেষ ব্যগ্র হয়। এদিকে দেশীয় লোকের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা, ইংরেজরাজপুরুষদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

১৭৭৮ খৃীঃ নাথানিয়েল হলহেড্ নামে

জনৈক অসৈনিক রাজপুরুষ বাঙ্গালাভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণ ইংরেজীতে রচিত হয়, কিন্তু তাহার উদাহরণ গুলি ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালা অক্ষর কি মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যমান ছিল না। শিল্পকুশল মহাত্মা চার্লস উইলকিন্স মহা উৎসাহের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরের এক 'সেট' প্রস্তুত করিয়া, হুগলীতে উক্ত ব্যাকরণ ১৭৮১ খৃীঃ মুদ্রিত করেন। এইরূপে উইলকিন্স বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া, বাঙ্গালীর চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন হন। ১৮০৮ খৃীঃ কলিকাতায় প্রথম 'সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র' স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃীঃ ফরষ্টার নামে বাঙ্গালাভাষায় সুপণ্ডিত, একজন সাহেব সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালাভাষার অভিধান প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণ, অভিধান ও মুদ্রাযন্ত্র এইরূপে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অধ্যবসায়ে সৃষ্ট হইয়া, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতে থাকে। ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। J. A. Hicky কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম মুদ্রাকর ছিলেন। ১৭৮০ খৃীঃ ২৯শে জানুয়ারী শনিবার কলিকাতায় প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত হিকি সাহেব এই পত্রিকার মুদ্রাকর ও সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাকারও নিরাকার উপাসনা। (প্রতিবাদ) (২)

ব্রহ্মজ্ঞান-সাকার।

সাকার ব্যতীত নিরাকার উপাসনা হয় না, এই মত খণ্ডন করিবার জন্য নগেন্দ্র বাবু "সাকার আগে না নিরাকার আগে?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত মত খণ্ডন করা বা না করা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে না। অবশ্য যখন ব্রহ্ম আগে, তৎপরে জগৎ, মহাপ্রলয়ে জগতের বিনাশ হইলেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে, তখন নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগতের অগ্রবর্ত্তী, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু নিরাকার পদার্থ সাকার পদার্থের অগ্রবর্ত্তী এই সিদ্ধান্ত হইতে মানুষের নিরাকার পদার্থের জ্ঞান তাহার সাকার পদার্থের জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। আর কাজেই নিরাকার উপাসনা সাকার উপাসনার আগে হইতে পারে, আমরা এ সিদ্ধান্তও পাই না। মানুষের নিরাকার-জ্ঞান আগে না সাকার জ্ঞান আগে, এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা কখনও জীবাত্মার কল্পনাও করিতে পারি না। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আত্মা জড় শরীরে আবদ্ধ ও জড়জগৎ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে আবদ্ধ থাকে। আর যদি মুক্তি হয়, তবে তাহা আর মানুষের আত্মা থাকে না, তাহা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং জীবাত্মা জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকাতে, আমাদের যে জ্ঞান, তাহা কখনও জড়জগৎ সম্বন্ধীয় ভিন্ন শুদ্ধচৈতন্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে না। যদি কখনও হয়, তবে তাহা আমাদের সাকার পদার্থের জ্ঞানের পরবর্ত্তী

ও তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় আধুনিক দর্শনশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও একমতাবলম্বী। Empirical ও Intuitional উভয় সম্প্রদায়ই এই মত সমর্থন করেন। তাঁহাদের মত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

মানুষের কি রকমে জ্ঞান জন্মে, সে বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে Empirical School বলেন, আমাদের যত কিছু জ্ঞান হয়। সকলই ভূয়োদর্শন (experience)দ্বারা, ইহাদের মতে জড়জগৎ হইতেই আমাদের জ্ঞানের আরম্ভ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন জড়জগতের চিত্র (image) সকল সংগ্রহ ও আত্মসাৎ (assimilate) করে। সেই সকল চিত্র, স্মৃতি (memory), বিচার (judgment), সূক্ষ্মীকরণ (abstraction) বিতর্ক (reason) এবং কল্পনা (imagination), এই সকল মানসিক বৃত্তির সাহায্যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান জন্মায়। ইহাদের মতে সূক্ষ্ম সাধারণ ভাব সকল (general ideas) ও গুণ বাচক গুণ (abstract ideas) আমাদের বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক (individual & concrete) জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সুতরাং যদি গুণবাচক ও সূক্ষ্ম সাধারণ ভাবের জ্ঞানকে নিরাকারের জ্ঞান বলা যায়, তবে ইহাদের মতে তাহা সাকার ও সগুণ (individual and concrete) পদার্থের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তাহার পরবর্ত্তী।

অন্য সম্প্রদায় (Intuitional school) বলেন, আমাদের সকল জ্ঞানই সাকার জড়জগৎ হইতে উৎপন্ন, কেবল কয়েকটী সাধারণ ভাব (ideas) আমাদের সহজাত। তাহা এই—দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ ভাব (ideas of space, time, and cause); গণিতের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল (axioms of mathematics); পাপ পুণ্যের ভাব (ideas of right and wrong); ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ভাব (ideas of God and immortality of soul.) ইহারা বলেন, আমরা এই সকল ভাব জড়জগৎ হইতে পাই না, বরং জড়জগতে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান, আমাদের ইহাদের সম্বন্ধীয় সহজাত ভাব হইতে উৎপন্ন। নগেন্দ্র বাবু বোধ হয় এই মতাবলম্বী, সেই জন্য তিনি বলেন, সাকার জ্ঞান নিরাকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। হিন্দুরাও (Intuitional school) এর এই মত স্বীকার করিতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জীবাত্মার পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কয়েকটী ভাব (যেমন তাঁহার অস্তিত্ব প্রভৃতি) যেন আমাদের স্বভাব-জাত বলিয়া মানিলাম; কিন্তু আমাদের সেই সকল ভাবের জ্ঞান বা ধারণা যে নিরাকার, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটী ভাব আমাদের সহজাত যেন মানিলাম, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব চিন্তা করিতে হইলে যে আমি নিরাকার পদার্থের চিন্তা করি, তাহা কে বলিতে পারে? ব্যবহারিক জগতে আমরা বস্তু ও জাতি বাদ দিয়া কখনও দেশ (space) ও কালের (time) জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। গণিতশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল তাহাদের প্রয়োগেই দৃষ্ট হয়। পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ আমরা আমাদের কার্য্যেই দেখিয়া থাকি। সেইরূপ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ভাব সকল আমরা তাঁহার জগতে প্রকাশ দেখিয়া তাহাদের জ্ঞান লাভ

করি। জগৎ বাদ দিয়া আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন আমাদের তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যত জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা এই তিনটী ভাবে সীমাবদ্ধ—তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি জগতের সংহারকর্ত্তা। এই জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই; কখনও পারেও না। যদি পারে, ও যখন পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, তাহার তখনকার জ্ঞান আর মানুষের জ্ঞান নহে, তখন সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে একরূপ তার্কিক জ্ঞান (speculative knowledge) হইতে পারে; যেমন নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। কার্য্যকালে সে জ্ঞানের কোনই উপকারিতা নাই। সে জ্ঞান লইয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি না। অতএব দেখা গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান (as opposed to speculative knowledge) আমাদের জগতের জ্ঞানের সহিত না হইয়া হইতে পারে না। এখন আমরা দেখিব, এই জগতের জ্ঞান আমাদের সাকার জ্ঞান বলিয়া, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আমাদের সাকার না হইয়া পারে না। জগৎ বলিতে দুইটী বস্তুর সমষ্টি বুঝায়—এক, স্থূল বা জড়জগৎ (material world); দ্বিতীয়, সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক জগৎ (mental world). আমরা প্রথমে দেখিব, স্থূল জগতে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার না হইয়া পারে না। আমরা পরে দেখিব, সূক্ষ্মজগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আমাদের জ্ঞানও সাকার না হইয়া পারে না।

জড় জগতে ব্রহ্মজ্ঞান।

কি Empirical কি Intuitional উভয় সম্প্রদায়ই বলেন, আমরা স্থূল জগতে জাতিবাচক (concrete) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে না অভ্যাস করিলে কখনই গুণবাচক (abstract) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। আমাদের কোন গুণবাচক বস্তুর চিন্তা করিতে হইলে, সেই জাতিবাচক বস্তুর চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে তাহা পারা যায় না। বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মার পূর্ব্বে বৃক্ষের জ্ঞান জন্মা আবশ্যক। একটী বালকের জ্ঞান হওয়া অবধি সে বৃক্ষই দেখিতেছে। বৃক্ষত্ব কি, সে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। যখন তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি পাইবে, যখন সে নানা রকম বৃক্ষ দেখিয়া, তাহাদের সাধারণ গুণ বা ভাব বুঝিতে পারিবে। তখনই সে বৃক্ষত্ব কি, তাহা চিন্তা করিতে পারিবে। এবং পূর্ব্ব সংস্কার বলে বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলেই, তাহাকে একটি (বিশেষ) individual বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল, আমাদের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ও তাহা হইতে অভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়। এখন যদি গুণবাচক পদার্থকে নিরাকার বলা যায়, তবে তাহার জ্ঞান, সাকার জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রমাণিত হইল। এখন, এই জড়জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হয় জাতিবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে, না হয় গুণবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে। এই উভয় প্রকার জ্ঞানই সাকার; সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও

সাকারই হইবে। অতএব নগেন্দ্রবাবু "এই অদ্ভুত সুকৌশলময় বিশ্ব ও তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থে ও শিশুর সরলতায়" যে নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের কথা বলেন, বাস্তবিক তাহা সাকার ব্রহ্মদর্শন। এই জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু তেজস্বী, তাহাই বিশ্বপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদিগের মধ্যে আমরা সেই "আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পরমপুরুষের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইলে, আমরা কখনও তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিতে পারি না। তাঁহাকে আমরা এই সকল জড় পদার্থের সহিত মিলিত ভাবে দেখিতে পাই। এই সকল পদার্থের সহিত মাখামাখিভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকি। ইহাদের আকার, অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি গুণের সহিত ঈশ্বরের সত্তা মাখামাখিভাবে আমরা ভাবিয়া থাকি। এখন এই সকল জড়পদার্থের আকারাদির সহিত মাখামাখিভাবে ঈশ্বরের চিন্তা ও তাঁহার উপাসনা, এবং প্রতিমার আকারাবয়ব ও রূপের সহিত মাখামাখিভাবে ঈশ্বরোপাসনা, এই উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। সুতরাং প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা হইলে, নগেন্দ্রবাবুর এই নিরাকার উপাসনা পৌত্তলিকতা না হইবে কেন? তারপরে, গুণবাচক পদার্থে, যেমন শিশুর সরলতায়, ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলেও আমরা এই পৌত্তলিকতার হাত এড়াইতে পারি না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলে, অবশ্যই বৃক্ষ চিন্তা করিতে হইবে। শিশুর সরলতা চিন্তা করিতে হইলে সাকার সাবয়ব শিশুর মুখশ্রী অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই "সরলতায়" ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলে, শিশুর মুখাবয়ব সেই ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। অতএব ইহাও প্রতিমাতে ঈশ্বর চিন্তার ন্যায়, সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতা হইল।

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে, হিন্দুর প্রতিমা পূজা ও নিরাকারবাদীর জড়জগৎ সাহায্যে ঈশ্বর উপাসনা এক নহে। কারণ হিন্দু জড়মূর্ত্তিকেই পূজা করেন, আর ব্রাহ্ম জড়বস্তুর সাহায্যে তন্মধ্যস্থিত নিরাকার ব্রহ্মকে পূজা করেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া, কেবল জড় মূর্ত্তির পূজা করেন, ইহা কে বলিল? ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খণ্ডের নিকট হিন্দু প্রণাম করেন—

> নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
> নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড শালগ্রামকে স্নান করাইতে করাইতে হিন্দু মন্ত্র পাঠ করেন—

> সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
> সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাঽ ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল মন্ত্র দ্বারা কি সেই মৃত্তিকাখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকেই পূজা করা হয়, না অন্য কাহাকেও তাহাতে অধিষ্ঠিত জানিয়া তাঁহার পূজা করা হয়? অবশ্য এ কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে সকল ব্যক্তি এই সকল মন্ত্রদ্বারা পূজার বিধান করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা তদ্দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা এতদূর গণ্ডমূর্খ যে, সামান্য মৃত্তিকাখণ্ডকে "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, অথবা প্রস্তরখণ্ডকে "অনন্তবাহূদর বক্ত্রনেত্র" সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ জানিয়া তাঁহার পূজা করিবেন। মূল কথা এই যে, যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা এক

পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা জানিয়া যদি আমি সামান্য পাথরখণ্ডকেও এই সকল গুণান্বিত বলিয়া পূজা করি, তবে আমি যে সেই পরমেশ্বরকেই তদ্দ্বারা পূজা করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝা যায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। (১০)

জন্ম কথা

শ্রীমতী বর্ণ-প্রসবিণী লেখনী দেবীর বদনকমল বিনিষ্ক্রান্ত বর্ণ নিচয় অপরিস্ফুরিত হইলে লেখকের কি মস্যাধারের দুর্ভাগ্য, ইহা নিরূপণ করা সুদুষ্কর নহে। পক্ষান্তরে চিন্তাশীল লোকের মস্তকে একটি উপমস্তক স্থাপিত আছে, তদ্দ্বারাই তিনি কার্য্য করেন, সে মস্তক সকলের নাই, সেই হেতু সকলেই অশোক, জুলিয়স্ সীজর এবং শার্লেমাঁ নহেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যেমন এক একটী অতিরিক্ত মস্তক বিশিষ্ট, সেইরূপ তাঁহাদের অতিরিক্ত চক্ষুও থাকে, ইহা দ্বারা তাঁহারা অতিরিক্ত দর্শন করেন। ইহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলিলে হানি নাই। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনিই এ জগতে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী। এরূপ মহত্তর ব্যক্তিবৃন্দের এ জগতে সুকর সকলি, সুদুষ্কর কিছুই নাই। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে কোন অনধিগম্য চিন্তা দ্বারা সত্যমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করি; কিন্তু সত্যে প্রীতিই সংসারে মহাসৌভাগ্যের মূল। সত্য বলেই ইউরোপ মহামুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে। আমার এই অনুসন্ধানে পরিহাস উৎপ্লাবিত হইলেও আমি দুঃখিত হইব না। সত্যানুসন্ধানে আত্মাকে চরিতার্থ ও মনকে পবিত্র জ্ঞান করিব। হইতে পারে, খ্রীষ্টের জন্মালোক আলোকনে আমি অন্ধ, আমার দিব্য নাই। নেত্রাগ্রে আলোক ভেস্কী আসিয়া লাগিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট জন্মিলেন, ভুবন আনন্দকর তেজ দ্বারা নিখিল বিশ্বনিকেতন জ্যোতির্ম্ময় হইল; চন্দ্রকে নিবাইল, সূর্য্যের প্রচণ্ড জ্যোতিকে উপহাস করিল, বাইবেলকে মহিমান্বিত না করিয়া উপশাস্ত্রের ভগ্ন কুটীর দ্বারে উদাসীন হইল কেন? ইহার অর্থ কি, আপনি বলুন। খ্রীষ্টের প্রধান ভক্ত ইবাঞ্জেলিষ্টগণ খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত সকল কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন, বাইবেলে জমাও হইয়াছে, কিন্তু জন্মালোকের পরম আশ্চর্য্য ঘটনা খরচে বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন? তবে কি উপশাস্ত্র যথার্থই ভৌতিক কাণ্ড? কৃপা করিয়া আমায় বলুন, আমি প্রাণে অনন্ত সুখ অনুভব করিব; সংশয় নির্য্যাতনে আমি ব্যথিত হইতেছি। ইবাঞ্জেলিষ্টগণ যাহা বলেন নাই, তাহাই কাল্পনিক, ইহাই ত শাস্ত্রীয় কথা, এ কাল্পনিক প্রসঙ্গ উপশাস্ত্রে কি হেতু উদিত হইয়াছিল? হয় বৌদ্ধ কিম্বদন্তিতে খ্রীষ্টোপাসকগণের ভ্রম হইয়াছে, কিম্বা যাঁহারা উপশাস্ত্র রচয়িতা, তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। কোন ভ্রান্তজীব তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টোপাসক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমার অনুমান হয়, হুক এবং গাবে তিব্বতে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন, উপশাস্ত্রে খ্রীষ্টোপাসকগণের সেইরূপ মতি ভ্রংশ হইয়া থাকিবে। উপশাস্ত্রটা বৌদ্ধ শাস্ত্র বোধ হয়। ইহার বর্ণনাও সেই প্রকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটী স্থল উদ্ধৃত করি-

লাম"। অনল সদৃশ উজ্জ্বল, সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী এবং সুন্দর পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভাকর সেই রাজশিশুটীকে রাজা মহর্ষির সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

"The king took the child of a body radiant as fire, more resplendent than the sun, glorious as the full moon."
Lalita Vistara. II. 147.

উল্লিখিত বর্ণনা ললিতবিস্তরের, ললিতবিস্তর গদ্য পদ্যময় সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং বুদ্ধদেবের জীবন তত্ব। ইহাতে ইবাঞ্জেলিষ্টদের ঐশিক বোধ প্রকাশ নাই। বৌদ্ধ স্থবির দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের যে আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা আছে, উপশাস্ত্রে ঠিক খ্রীষ্টের সেইরূপ রূপই বর্ণিত হইয়াছে।

"Repleta illa erat huminibus * * *
* "Filled with the lights, greater than the lights of lamps, candles, and greater than light of the sun itself."
Jone's Canoical Authority. II. 169.

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা উপশাস্ত্রেরই খ্রীষ্টরূপ বর্ণনা। খ্রীষ্টোপাশকেরা উহাকে উপশাস্ত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। উভয় লিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ উপশাস্ত্রটা কি?

গভীর চিন্তা ব্যতীত গভীরতর বিষয়ের নিরূপণ হয় না। বসুমতীর গর্ভে কোন্ স্তরের নিম্নে কোন্ স্তর আছে, এক দিনেই তাহা নিরূপণ হয় নাই, কল্য যে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা কোন্ বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের কথা সেইরূপ। সুতরাং তাহা দুশ্চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তত্ব কথা শৈবাল সহ তুলনা হয় না। মগ্ন হইয়া দেখুন, কোন্ সরোবরে মহাপদ্ম বিকশিত হইয়াছে। শিবগৃহ অবারিত, যাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনিই প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাই মহামন্দিরের মঙ্গলময় ব্যবস্থা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনার্য্য। প্রবেশ করিয়া দেখুন, অনার্য্য এবং আর্য্য ধর্ম্মের সম্মিলনের ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহারাজা অশোকের ধর্ম্ম প্রসারণ, উক্ত ধর্ম্ম-বিস্তৃতি অনার্য্য দেশে, অনার্য্যগণের মধ্যে ঘটিয়াছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনা, বোধ হয়, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সন্নিকর্ষ ঘটাইবার হেতু, ইহাই উপশাস্ত্রীয় অর্থব্যঞ্জক বোধ হয়। যাঁহারা ইতিহাসের বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারাই ইহার পোষকতা করিবেন। আমি ক্রমে দেখাইব, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধেরা বলেন, নানা সুলক্ষণযুক্ত হইয়া সিদ্ধপুরুষেরা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে দুঃশীল দুরাত্মার কঠিন অন্তঃকরণে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ বিশ্ববেদাঃ মুনীন্দ্র বোধিসত্ব ভূমিষ্ঠ হইয়া তেজোময় মূর্ত্তিধারণ করিয়া পরিনামে সেই মূর্ত্তি পৃথিবীর হিতের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপশাস্ত্রে ইহার সেই রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে নাই কি? বুদ্ধের ধীরোদাত্ত ভার খ্রীষ্টে কখনই তুলনীয় নহে। খ্রীষ্ট দরিদ্র কারিগরের শ্রম-সাধ্য কারখানায় প্রায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, কোন্ খনির খনি হইতে এ সন্ন্যাস রত্নের উদ্ধার হইয়াছিল, যোহন তাহা জানিতেন, কিন্তু ইহুদীয় মনুষ্যেরা তাহা পরিজ্ঞাত ছিল কি? খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের সহিত ইহুদী বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নিকট-সম্বন্ধ বোধ হয় না, কিন্তু বৌদ্ধ কমণ্ডলু গ্রহণ এবং কাথলিক সন্ন্যাস

ধর্ম্মানুসরণ, এতদুভয়ের স্পষ্ট সন্নিকর্ষ দৃষ্টে বোধ হয় যেন উভয় সুহৃদে পরস্পর গাঢ় প্রেমালিঙ্গন হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি, আমায় বলুন। শুধু ইহাই নহে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বাইবেলে বৌদ্ধ পূর্ব্ব পরম্পরাগত বুদ্ধেতিবৃত্তের ন্যায় ঘটনা দৃষ্ট হয়। লুক্ লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়,পঁচিশের পদে লিখিত হইয়াছে—"আর দেখ জেরুশালেমে শিমিয়োন্ নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে ধার্ম্মিক ও শ্রদ্ধাশালী লোক, এবং ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেন। আর্ প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইলে 'তুমি মৃত্যু দেখিবেনা" এই কথা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক তাহাকে জানান গিয়াছিল। সে আত্মার আদেশ ক্রমে মন্দিরে আইল এবং শিশু যিশুর মাতা পিতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানুযায়ী উচিত ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, তখন সেও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, হে নাথ, এখন আপনি নিজ বাক্যানুসারে আপন দাসকে কুশলে বিদায় করিলেন। কেননা, আমার নেত্র যুগল আপনার এই ত্রাণোপায় দেখিতে পাইল।" খ্রীষ্টই পরিত্রাণের উপায়, ইহার সাক্ষ্য প্রদান জন্য শিমিয়োনের জন্মটা ঈশ্বরের একটী বিশেষ সৃষ্টি-কল্পনা। পাপীর পরিত্রাণের জন্য ত্রাণকর্ত্তা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,ইহুদীয়দিগকে এ পর্য্যন্ত এ কথা কেহই স্বীকার করাইতে পারে নাই, এখনও, তাহাদের বিশ্বাস আছে, ত্রাণকর্ত্তা অবতীর্ণ হন নাই; জানিতে চাই, শিমিয়োন কে এবং ইহুদীয় লোকদিগকে কি সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছিল? ইহার নাম পূর্ব্বে কেহ জ্ঞাত ছিলনা, ইহাকে কেহ চিনিত না, খ্রীষ্ট মন্দিরে নীত হইলে ইহার নাম তখন লোকে শুনিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইহার কোন পরিচয় নাই। ইহুদীয়দের গ্রন্থে, বুদ্ধি থাকে, বলিতে পারি না। শিমিয়োন্, আত্মার আদেশ ক্রমে মন্দিরে আসিয়াছিল। ইহা বড়ই বিবেক-বিরুদ্ধে, বুদ্ধি-প্রলোপকারী বাক্য। "আত্মার আদেশ কি আমায় বুঝাইয়া বলুন, এরূপে বুঝাইয়া বলুন যেন বর্ব্বরেরা কুসংস্কারে না ডোবে। আত্মা কি সর্ব্বসময়, সব্ব কাজে সকলকে ঘুরাইতেছেন? মানিলাম, শিমিয়োন্ আত্মার আদেশ দ্বারা মন্দিরে আসিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায়সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে কোলে লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। শিমিয়োনের কথার সার অংশটী এই, কিন্তু, বোধ হয়, ললিত বিস্তরের মহর্ষি অসিতের কথা অবিকল এইরূপ। শিমিয়োন জিয়ন পর্ব্বত বাসী, অসিত হিমালয় বাসী। শিমিয়োন্ আত্মার আদেশে খ্রীষ্টের নিকট আগমন করেন। মহর্ষি অসিত যোগবলে বুদ্ধের জন্ম জ্ঞাত হইয়া কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। অসিত বৃদ্ধ, শিমিয়োন বৃদ্ধ। শিমিয়োন খ্রীষ্টকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবদ্দর্শন জন্য হর্ষযুক্ত; অসিত বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বুদ্ধাবস্থা দেখিতে পাইবেন না, ভাবিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সাইমন্ ও অসিতের কথা গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখুন।

মথি-লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯ম পদে লিখিত আছে, যিশুর জন্ম হইলে বিদেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য জেরুশালেম নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই আগমন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পূর্ব্বদিকে আকাশে একটী তারা দৃষ্ট হইয়াছিল। শুনিয়াছি, ঐ তারাই তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, অর্থাৎ আকাশস্থ ঐ তারা দৃষ্টি করিয়া

তাঁহারা ঐ নগরে গমন করেন। পাঠকবর্গের সুগোচর আছে, বুদ্ধদেব] জন্ম গ্রহণ করিলে মহর্ষি অসিত ধ্যানে জানিতে পারিয়া নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে আগমন করেন। সচরাচর লোকে যে পথে যাইয়া থাকে, মহর্ষি তাহা করেন নাই, শূন্যে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশস্থিত জ্ঞানী লোকদিগের আকাশস্থ তারা লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণের সহিত অসিত ঋষির আকাশ মার্গে যাত্রাটায় কেমন একটা নিকট-সম্বন্ধ বোধ হয় না? বস্তুতঃ উভয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়জনক। কিন্তু উভয় ভ্রমণে আকাশ প্রধান অবলম্বন, স্থিরই আছে। যৎকিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ কষ্ট কল্পনা মাত্র বোধ হইতেছে। সুবিজ্ঞ ষ্ট্রস্ সাহেব একটী কাজের কথা বলিয়াছেন, ইহুদীয় রাজার জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদ দূরবর্ত্তী বিদেশীয় জ্ঞানীদিগের কি প্রকারে কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহার কেহ কিছু নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন?

"How could heathen magi in a remote country of the east know anything of a Jewesh king about to be born? This is the first difficulty." Strauss I. 229.

ললিতবিস্তরে উক্ত আছে, বুদ্ধদেব পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর কোলব্রুক্ লিখিয়াছেন, কর্ক্ট রাশিতে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল।* খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে কেবল এই কথা প্রচার আছে যে, পূর্ব্বদিকে একটী তারা উদয় হইয়াছিল এবং ঐ তারটী লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানী লোকেরা জেরুশালেমে আগমন করেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহুদীয়দের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমরা পূর্ব্বদিকে তাঁহার তারা দেখিয়াছি।" যে সময়ে তাঁহারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎকালে ঐ তারা তাঁহাদের মস্তকের উপরেই ছিল। ইহা মস্তকের উপরে বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তারা দেখিয়াছি, এরূপ বলিলেন কেন? উর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ ঐ অত্যুজ্জ্বল তারাটী লক্ষ্য করিয়া আমরা জেরুশালেমে আসিয়াছি, একথা না বলিয়া অলক্ষ্য ভাবে বলা হইল কেন? বোধ হয় যেন পূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে জ্ঞানী লোকেরা তারা দেখিয়াছেন, এক্ষণে তারা অদৃষ্ট হইয়াছে, কেবল মনের সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, তারা তাঁহাদের মস্তকের উপরই বর্ত্তমান ছিল। আর এক কথা, গ্রহাদির ন্যায় নক্ষত্রের গতি এত ক্ষিপ্র, এরূপ কথা কখনও শুনি নাই। নক্ষত্রের এত ক্ষিপ্র গতি হইলেও মনুষ্য গতি তাহার সমরূপ বা তুল্য নহে। জ্ঞানী লোকেরা নক্ষত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া জেরুশালেমে উপনীত হইয়াছিলেন, এ কথা আমার বিবেচনায় নিতান্ত বিস্ময়কর। মনুষ্যের নক্ষত্র সহ তুল্য গতি, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, ক্ষুদ্র মানব নক্ষত্রের অনুগমন করিয়াছিল, ইহা কি আশ্চর্য্য কথা নহে? ইহা যদি সম্ভব হয়, মানব সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া এক দিবসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বাধা কি? আকাশস্থ গ্রহের অনুসরণ করিয়া কত কালে মনুষ্য তাহার নাগাল ধরিতে পারে? বাইবেলে উল্লিখিত আছে, "পূর্ব্বদিকে তাহারা তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়া যে স্থানে শিশুটী আছেন, তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল, তারাটী দেখিয়া তাহারা মহানন্দে উল্লাস করিল।" এ গুহ্য তত্ত্বকথা বোধ হয় মহাদেবতা জানিতেন না। তাহা হইলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ভগবতীকে অবশ্যই ইহা বলিতেন। নব্য

* "Essays," Vol. II. P. 334.

দার্শনিক কিম্বা জ্যোতির্ব্বিদ্ এ তত্ত্ব-মহিমা কিছুই বুঝেন না, আবু পর্ব্বতের শিখরের ঊর্দ্ধে যে তারাটী অবস্থিত বোধ হইল, তাহার ব্যাস কি বাস্তবিক এত ক্ষুদ্র যে পর্ব্বতের নিম্নস্থ অধিবাসীর নিকট হইতে তাহা অনেক দূরে অবস্থিত বোধ হইতে পারে? শিশুটী যে স্থানে ছিলেন, তারাটী ঠিক তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ক্রমশঃ

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাস *

আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল বীরভূমে রাঢ়দেশে নানুর গ্রামে, এক বিপ্রবটু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ চাষ বাস করিতেন, রাতের বেলা চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর পাতিয়া, মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া, তুলট কাগজে খাগের কলমে কি হিজিবিজি লিখিতেন। আর লোকে বলে, এক ধোপানীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করিতেন। ধোপানীর নামটী ঠিক জানা যায় নাই, কেহ বলে তাহার নাম রামী। বোধ হয় যেন "রজকিনী রামা" সম্বোধন হইতে রামীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের অবস্থা ত এইরূপ, স্বভাব চরিত্রও এই রকম। কিন্তু সেই হিজিবিজি অক্ষরে নাকি এমন মধু ঝরিত যে, বিশালাক্ষী দেবী সেই কথাগুলি শুনিতে লালায়িত হইতেন এবং এই পাঁচশত বৎসর বাঙ্গালী সেগুলি বুকে পুরিয়া রাখিয়াছে। রসিকশেখর শ্রীচৈতন্য যত শুনিতেন, ততই উন্মত্ত হইতেন। তথাপি তাঁহার পূর্ণগ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া যায় নাই, কয়েকটী খণ্ড কবিতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ত তবে সামান্য নয়। এই কবিকুল চূড়ামণির নাম চণ্ডীদাস। কত নবাব-সুবোর নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেহ ভুলিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র, বিদ্যাপতির কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার সূচনায় তিনি সংক্ষেপে চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ নামক গ্রন্থে চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী-যন্ত্র হইতে ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে প্রেমহার নামক সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাবু রমণীমোহন মল্লিক সম্প্রতি "বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা-সমেত" চণ্ডীদাসের পদাবলী আবার প্রকাশ করিয়াছেন।

অতি আগ্রহে আমরা এ সংস্করণটী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা গ্রন্থ

* মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন রায় সংকলিত, মূল্য ১্।

গতবারে ভুলক্রমে "কাব্য কুসুমাঞ্জলির" নাম "কবিতা কুসুমাঞ্জলি" লেখা হইয়াছে। এই কাব্যকুসুমাঞ্জলি নব্যভারত কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১্।

দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র চণ্ডীদাসের যে জীবন বৃত্তান্ত বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, মল্লিক মহাশয়ের "বিস্তৃত জীবনীতে" তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার সমালোচনা অতি অকিঞ্চিৎকর। তিনি প্রেমের মহিমা অনেক কীর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পড়িলেই বোধহয়, তিনি এখনও জলের উপরে সাঁতার দিতেছেন। না ডুবিলে কি কখন প্রেমের মাধুর্য্য বুঝা যায়? সে স্বর, সে আবিষ্ট নয়ন, সে কম্পিতদেহ, সে ত্রাসিত চমক এখনও তাঁহার হয় নাই। এখন চণ্ডীদাসের কবিতা সংগ্রহ করিবার অধিকার মল্লিক মহাশয়ের জন্মে নাই।

এ গ্রন্থে বর্ণাদিক্রমে পদাবলীর একটী তালিকা দেওয়া থাকিলে পাঠকের পড়িবার সুবিধা হইত। এ গ্রন্থে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। পরিহরি মানে পরিত্যাগী, দরিয়ায় মানে নদীতে, লেখা আছে। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই "গঞ্জনা-সহিতে,নারি আচরিতে, মরম কহিনু তারে" লেখা আছে, তাহার কি অর্থ মল্লিক মহাশয় নিজেও বুঝেন নাই, অন্যকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

দুই খানি গ্রন্থের তুলনা করিয়া বোধ হইল, বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের সংস্করণ দেখিয়া এ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা ইহাতে প্রায় এক-শত পদ অধিক সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু পদগুলির পাঠ ও সজ্জা দেখিয়া বোধ হইল, যেখানে পথ পাইয়াছেন, রমণী বাবু সেই-খানেই মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি তাঁহার ভ্রমে বা মুদ্রাকরের ভ্রমে ঘটিয়াছে, আমরা বলিতে পারিলাম না। অশুদ্ধি পত্র না থাকাতে আমাদের এই সন্দেহ জন্মিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের গ্রন্থে যে পাঠ অশুদ্ধ আছে, রমণী বাবুর গ্রন্থেও সেই অশুদ্ধি জন্মিয়াছে, কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল :—

	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৮পৃঃ	তিলে তিলে এসে যায়	...	আসে
	ভুষণ খঁসায়ে পরে	...	খসিয়ে পড়ে
৫৭পৃঃ	বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু	...	বঁধুর পিরীতি
৯৪পৃঃ	পরসঙ্গে নামি শুনি দরবয়ে হিয়া	...	দড়বড়ে
১৬৬পৃঃ	পিরীতি রতন লভিল সে জন	...	যে জন
১৭৮পৃঃ	আই ২ পড়েছে রূপে কাজরের শোভা	...	মুখে
,,	খরনখ দংশনে অঙ্গ জরজর	...	দশনে

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে মল্লিক মহাশয় গ্রন্থ খানি ছাপাইলে আমরা বিশেষ প্রীত হইতাম। কবিতা সঙ্কলনে তাঁহার সামান্য পরিশ্রম হয় নাই, এবং যে গ্রন্থ বিক্রয়ের সম্ভাবনা অল্প, অনুরাগ না থাকিলে কেহ যত্ন পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে চাহে না। তথাপি চণ্ডী-দাসের পদাবলি সঙ্কলনে যে অনুরাগ, যে প্রীতি, যে ভক্তির প্রয়োজন ছিল,রমণী বাবুর তাহা অদ্যাপি জন্মে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার গ্রন্থে অক্ষয় বাবুর সঙ্কলন অপেক্ষা প্রায় একশত (৯৮) পদ অধিক আছে। এ কয়েকটী পদ নূতন সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক গুলি অন্য কবির পদ আছে। সংগ্রহে আর একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডিতার পদ রসোদ্গারে, রসোদ্গা-রের পদ বিপ্রলব্ধায়, এইরূপ কয়েকটী পদ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। রমণী বাবু যথেষ্ট পরি-

গ্রামে দলাদলির আগুন জ্বালিয়া দেয় এবং গ্রাম ছার খার করে। যে সকল হিন্দু বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা প্রায়ই, কেহ সিভিলিয়ান, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ ডাক্তার ইত্যাদি উচ্চপদ লাভ করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করেন। বিলাত না গিয়া কেহ উন্নতি লাভ করিলে, তাহাকে বিপন্ন করা সহজ নহে। কেননা তাহার একটা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। আবার সেই ছিদ্র এমন হওয়া চাহি, যাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। কারণ অধিকাংশ লোকের যে দোষ আছে, কেবল মাত্র তাহা উপলক্ষ করিয়া একজনকে পীড়ন করিতে যাইলে অধিকাংশ লোকই তাহাতে সম্মত হইবে না। কিন্তু বিলাত-ফেরত হিন্দুকে পীড়ন করিবার জন্য হিংস্রক লোকদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কেননা বিলাত যাওয়া ছিদ্র বা (কল্পিত) দোষ সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। ইহা নূতন এবং অনেকের মতে হিন্দুশাস্ত্র-বিরোধী। হিন্দু-শাস্ত্র, বিরোধী কার্য্য যথা কুক্কুট ভোজন, যবনান্ন ভক্ষণ ইত্যাদি কার্য্য ত এখানে থাকিয়া অনেকে করিতেছেন, তাহাতে তাহারা একঘরে হন না কেন? আমার উত্তর (১) তাঁহারা ‘হাজার ঘরে’ অর্থাৎ বহুসংখ্যক। হয়ত হিংস্রক ব্যক্তিরা নিজেই কোমল কুক্কুট মাংসলোলুপ, হয়ত নিজেই যবনান্ন-ভোজী। (৫) আর কুক্কুট বা যবনান্ন ভোজন কিছু সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করে না। সুতরাং হিংসা প্রবৃত্তি তাহাতে উদ্দীপিত না হইতে পারে। কিন্তু বিলাত গমনে অধি-কাংশস্থলে সাংসারিক উন্নতি আছে,(২) ছিদ্র আছে, (৩) এবং ছিদ্র অল্প লোকের আছে। সুতরাং হিংস্র ব্যক্তিদিগের বড়ই সুবিধা। খবর আসিল, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিনয় কুমার বিলাত হইতে আসি-য়াছে। কেবল বিলাত হইতে আইসে নাই, সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তির হিংসার শিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হিংসাদাসের মুখ আঁধার হইয়া যাইল। সে ভাবিল, গোল পাকাইতে হইবে; এখন হইতে তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখা যাউক। সে তখন হন হন করিয়া কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইল। কেদার বাবুর ওখানে খুব পাশার ধুম। যখন “কচে বার” শব্দ থামিয়া গেল, পাশা উঠিয়া গেল, তখন একথা সে কথার পর হিংসা-দাস বাবু হুঁকা হাতে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে, বলিলেন “ওহে, কৃষ্ণনাথের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছে, শুনিয়াছ কি?” শ্যামাচরণ ভাদুড়ী বলিলেন, “হা শুনিয়াছি ছেলেটী বেশ।” তখন হিংসাদাস বাবু বলি-লেন ছেলেটী ভাল, তাও তুমিও জান আমিও জানি। আর সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছে। পরম সুখের বিষয়? তবে সমাজে চলিবে কি?” তখন ভোলানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন “আমরা দশ জন চালাইলেই চলিতে পারে”। হিংসাদাস বাবু তখন তাঁহার ললাট কুঞ্চিত করিয়া, মুখ গম্ভীর করিয়া, বলিলেন মহাশয় আপনি ত বলিলেন, কিন্তু দশ জন চলে কই? আমার বড় আশঙ্কা হয়, ছেলেটীকে লইয়া বড় গোল হইবে।” সেই বৈঠকে হীনকাণ্ড ঘটক মহাশয় ছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি গরিব গুণহীন, আমাকে কেহ গ্রাহ্যই করে না। এইবার দেখিব, আমাকে গ্রাহ্য করে কি না; শর্ম্মারাম

একটা ব্যক্তি কি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুগণ আমাকে পায় না ধরিলে আমি কখনই তাঁহার পুত্রকে সমাজে লইতে দিব না। এ দিকে অর্থ-মুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় বসিয়া আছেন। কেদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,"স্মৃতিরত্ন মহাশয়,বিলাত-ফেরত চলিতে পারে কি ? তিনি উত্তর দিলেন,চলিলেই চলিতে পারে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশ্রয় লইলে তাঁহারা অবশ্য ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। তবে ব্যয় বাহুল্যে কাতর হইলে এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।" তখন হীনকান্তি বাবু বলিলেন যে" হাঁ ব্যয় করা চাই বই কি ? তাহার উপর নরম হওয়া চাহি, দশ জনের বাটীতে যাওয়া চাহি, একটু কাকুতি মিনতি করা চাহি। তাহা না হইলে লোকের মন ভিজিবে কেন ? যে সে দোষ নহে। বিলাত যাওয়া দোষ। সহজে কি তা কাটিয়া উঠা যায় ?" তখন হিংসাদাস বলিলেন "তা বটইত"। হীনকান্তি বাবু উঠিলেন। হিংসাদাসও উঠিলেন। দুইজনে কথা কহিতে কহিতে হিংসাদাসের বাটীতে যাইলেন। সেখানে ধূমপান করিতে করিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কি করিয়া এক-ঘরে করিতে হইবে, তাহার মতলব ঠিক হইল। তাহার পর দিন হিংসাদাস ও হীনকান্তি এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ওখানে যাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মামলা হইয়াছিল। তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই হারিয়াছিলেন। হিংসাদাস মহাশয় বিবাদনাথ বাবুকে বলিলেন 'মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছেন। আপনার সঙ্গেত অনেকদিন হইতে খাওয়া দাওয়া নাই। আপনার ত কোন গোলই নাই। আমরা এখন কি করি বলিতে পারেন ?" তখন বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রামা তামাক দে" হাঁকিয়া, বলিতে লাগিলেন—"আমার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খাওয়া দাওয়া নাই সত্য। আমার সঙ্গে—একটা মামলা হইয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জাত্যংশে আমি কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এ বিষয় সকলকেই নিজে নিজে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আমি নিজের বিষয় এই বলিতে পারি যে, যাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এখন খাওয়া দাওয়া করিবেন, আমি তাহাদিগের সহিত খাওয়া দাওয়া করিতে পারিব না।" হিংসাদাস ও হীনকান্তি বাবু এই কথা শুনিয়া মহা হর্ষে তাহা এবাড়ী ওবাড়ী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমুক খাইবেনা, তজ্জন্য তাহার ভগিনীপতি খাইবে না, ভগিনীপতিকে ছাড়িয়া ভগিনীপতির মামা খাইবেনা, অমুক খাইবে না, অমুক খাইবে না," ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কাশীদাস গাঙ্গুলীর মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ও সদাশয় ব্যক্তি। তিনি নিমন্ত্রণে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন হিংসাদাস বাবু ও হীনকান্তি বাবু ও বিবাদনাথ বাবু ও অর্থমুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সায়াহ্নে শ্রাদ্ধের বাটীর প্রাঙ্গণে তাহাদের দলের লোক লইয়া

আসিয়া একটা পার্লিমেণ্ট বসাইয়া দিলেন। সেই শ্রাদ্ধের উপলক্ষে তখন সরলতা, যুক্তি, ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই এমন স্বার্থপর যাহাতে নিজের কিছু অনিষ্ট নাই, অথচ অন্যের ঘোরতর অনিষ্ট আছে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য, সামান্য আয়াস ও স্বীকার করিতে চাহে না। অন্যে মরে মরুক, আমার কি—এইরূপ ভাবিয়া থাকে। তাহার উপর আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই, যে কারণেই হউক, অতিশয় ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন দেশের লোকেরা কর্ত্তব্যসাধনের আহ্বানে, মৃত্যুরূপিনী জ্বলন্ত শিখাতে মাভৈ মাভৈ রবে অবলীলাক্রমে লম্ফ দিয়া পড়িতেছে। যেখানে বিপদ, যেখানে বাধা, যেখানে কষ্ট, সেখানে তাহাদের তেজের অদম্য স্ফুলিঙ্গ শতধা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সত্যের অনুরোধে, পরোপকারের অনুরোধে, পর-পীড়ন-নিবারণ-সংগ্রামে স্বাধীন দেশে মহানুভব ব্যক্তিগণ সময়, শ্রম, ধন, প্রাণ জলের ন্যায় ঢালিয়া দিতেছেন। হিন্দুসমাজে ঐরূপ বীরত্ব দেখিতে পাইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে,বিলাতে যাওয়ায় দোষ নাই, অধর্ম্ম নাই, বরঞ্চ বিলাত-ফেরতদিগের পীড়ন করাতে দোষ ও অধর্ম্ম আছে, দেশের অমঙ্গল আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লোকই বিলাত-ফেরত পীড়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; হিংসাদাস ও হীনকান্তি বাবু-দিগের ও অর্দ্ধ-মুগ্ধ স্মৃতিমগ্ন মহাশয়দিগের আত্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, পরপীড়াদায়ক কার্য্যের সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতীকার না করিয়া, তাহাতেই তাঁহারা ভূষণ করিতে করিতে যোগ দেন।

এখন আমরা দেখিলাম, বিলাত-ফেরত-দিগের পীড়ন করার মূল (১) হিংসা ও হীনতা (২) উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা (৩) ভীরুতা বা কাপুরুষতা, এই তিনটী কারণ ব্যতীত আরও একটি কারণ আছে। তাহা ভ্রান্তি। কতকগুলি লোক সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত যুবক হিন্দুসমাজে গৃহীত হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। যাঁহারা সরল বিশ্বাসের উপর কাজ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও আমাদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের কারণ কি, তাহা আমরা কখনই তাঁহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে শুনি নাই। যাহা হউক, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বিলাত যাওয়া অনিষ্টকর। এবং তাহা অনিষ্টকর বলিয়া সামাজিক শাসন দ্বারা তাহা দমন করা উচিত। এখন দেখা আবশ্যক, কি জন্য তাঁহাদিগের মতে বিলাত গমন অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিলাত যাইলে হিন্দু নিষিদ্ধ ভক্ষণ করে। এইটি বিলাত-গমন-বিরোধিতার কারণ বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু বিলাত না গিয়া হিন্দু সন্তান এখানেই ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিতেছেন। তাহাতে সামাজিক শাসনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। বিলাত যাইলে সাহেবি চাল চলন হইয়া যায়। ইহাও বিরোধিতার প্রকৃত কারণ বোধ হয় না। কারণ বিলাত না গিয়া এখানেই যাঁহাদিগের অবস্থা কতকটা ভাল, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোর্ট পেনটুলেন কলার কলেবরে ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রভেদ এই, বিলাত-ফেরতদিগের যে সাহসটুকু আছে, ইহাদিগের তাহা নাই। বিলাতে যাইলে

স্বকীয় সাহিত্যের উপর অনুরাগ থাকে না। ইহাও প্রকৃত কথা নহে। কারণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ন্যায় কয়জন হিন্দু বিলাত না গিয়াও স্বদেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন? বিলাতফেরত ব্যক্তিগণ গুরুজনের মান্য করে না। ইহাও সত্য নহে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাশয়দ্বয়ের মাতৃভক্তির কথা কে না জানে? পিতামাতা ও অন্য গুরুজনকে ভক্তি করে না, এমন কুষ্মাণ্ড যেমন অবিলাত-গত হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে, তেমনি বিলাতগত হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে।

দেশের লোকের প্রতি মায়া মমতা থাকে না; এ কথাও খাটে না। দেশের লোকে বিপন্ন হইলে বিনা পয়সায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের যেরূপ তাঁহার মূল্যবান সময় অকাতরে ব্যয় করেন, অবিলাতগত কয়জন উকীল তাহা করিয়া থাকেন? শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ দেশের জন্য শ্রম করিয়া থাকেন, কয়জন অবিলাতগত ব্যক্তি তাহা করিয়া থাকেন?

বিলাত হইতে আসিয়া অনেকে কেবল মদ খাইতে শিখিয়া আইসেন এবং দাম্ভিক হয়েন। এই কথা লিটনার সাহেব কয়েক-মাস হইল বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। "অনেকে" নহে। কেহ কেহ হইতে পারে। পদ ও ধন বিলাত না যাইলে যেমন অনেককে দাম্ভিক করে, বিলাত-ফেরতের মধ্যেও সেইরূপ করে। পূর্ব্বে বি এ, এম এ, ধারীগণ কতকটা আপনাদিগকে বড়লোক মনে করিতেন। এখন বি-এ, এম-এ অনেক। সুতরাং বি-এ, এম,এ এখন আপনাদিগকে আর তেমন বড় বিবেচনা করেন না। তেমনি এখন যদিও বিলাত-ফেরতগণ সংখ্যায় অল্প থাকায় আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ বড় বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে, আপনাদিগকে আর বড় বিবেচনা করিবেন না। বিলাতফেরত সম্প্রদায় একটা ঘৃণার্হ দল নহে, বরঞ্চ মান্যার্হ, বিদ্বান, দক্ষ, দেশ-হিতৈষী, এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে দেশের নেতৃগণের মধ্যে গণ্য, ইহাই যে অধিক শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, তাহা বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ বিপদে আমাদিগের সহায়, সাহিত্যে আমাদিগের গৌরব, রাজনীতি-রণে আমাদিগের সেনা-পতি, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগের প্রতি-নিধি, আমরা কোন্ লজ্জায় তাঁহাদিগকে অনর্থক পীড়ন করিতে চাহি? যে সম্প্রদায় জাতিতে আমাদিগের অঙ্গ, শোণিতে আমা-দিগের ভ্রাতা, ধর্ম্মে ও বিশ্বাসে, বিপদে ও সম্পদে আমাদিগের সহিত অভিন্ন, কোন্ প্রাণে আমরা তাঁহাদিগকে ভিন্ন করিতে চাহি? তাঁহারা নিজেরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া-ছেন, এ কথা সত্য নহে। আমরা, কেহ হিংসায়, কেহ হীনতায়, কেহ উদাসীনতায়, কেহ স্বার্থপরতায়, কেহ কাপুরুষতায়, কেহ কপটতায়, কেহ বা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেই। কি লজ্জার কথা!! কি দুঃখের কথা!!!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

একাদশ খণ্ড—দ্বাদশ সংখ্যা। চৈত্র—১৩০০।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

৫১।২ নং কালুঘোষের লেন, "মণিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৫ই চৈত্র, ১৩০০।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ । [এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা ইহাতে সংলগ্ন হইল।

২। বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণের নিকট স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছি, তাঁহারা দয়া করিয়া এখন কিছু কিছু মূল্য পাঠাইয়া উপকার করিলে একান্ত বাধিত হইব। তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।

৩। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বাবু রজনীকান্ত মিত্র এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। আমাদের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও চেকের মুড়িতে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া গ্রাহকগণ মূল্য প্রদান করিবেন। অন্যথা করিলে আমরা দায়ী নহি।

শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।* জাতীয় সাহিত্য ভারতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তদানীন্তন আর্য্যজাতি সভোচিত নানাবিধ গুণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে, চরিত্র ও ক্ষমাগুণে, বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গণ্য হইয়াছিলেন। অমর কবিগুরু বাল্মীকির সুমধুর ঝঙ্কার সহস্রাধিক বৎসরের পরিবর্ত্তনেও বিস্মৃতির অন্ধকারে মিশিয়া যায় নাই, সুবর্ণাক্ষরে তাহা ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে জিজ্ঞাসা কর, রামায়ণ ও মহাভারতের অমৃতময়ী বাণী প্রত্যেকের কণ্ঠাগ্রে ধ্বনিত হইবে। কালিদাস ও ভবভূতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনেকদিন চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থরাশী এ দেশের বক্ষে আজও সুধাসিঞ্চন করিতেছে। সে একদিন গিয়াছে, কিন্তু যে দিন এই হতভাগ্য দেশের দুরদৃষ্ট তাহার অবশ্যম্ভাবী মহাপতন ডাকিয়া আনিল, সেই দিন—সেই ভয়াবহ দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবী উন্নতির পথ বুঝিবা চিরদিনের মতন কণ্টকাবৃত হইয়া গেল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা ভারতেতিহাসের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সমুহ আলোচনা করি, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সভ্যতালোকের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য পূর্ণ তেজে উদ্ভাসিত, এবং জাতীয় জীবনী জ্যোতিহীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সাহিত্যেরও পতন হইয়াছিল। নব বসন্ত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তরুলতা মুঞ্জরিত ও ফল ফুল-শোভিত হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি নিয়ম, অমারজনীর ঘোরান্ধকার যেমন নবভানু আগমনে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি পূর্ণ সভ্যতার উদ্ভাসিত আলোকে জাতীয় সাহিত্যও পরিপূর্ণ পরিচ্ছেদে তৎকালীন সভ্য-জগতের নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। কালনেমির পরিবর্ত্তনে আজ ভারতগগনের দীপ্তসূর্য্য অস্তমিত, ঘনান্ধকার রজনীর বিরামদায়িনী ক্রোড়ে সকলেই নিদ্রিত : বিরামের ক্রোড়ে সকলই বিরামপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধন, সম্পদ, শোভা, বীর্য্য ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কমনীয় সাহিত্যধনও চিরবিরামের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যালোচনা জাতি বিশেষকে উন্নতির পথে ক্রমশঃ লইয়া যায়, বিগত শত বর্ষের ইতিহাস পর্য্যায়ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। বঙ্গে ব্রিটিসাধিকারের প্রারম্ভ সময়ে, পলাশী প্রাঙ্গণের স্মরণীয় দিনে বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য কিরূপ আকারে ছিল, আর আসন্ন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিলে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইতে হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা পদ্য লেখায় কৃতিত্ব অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য দ্বারা সমাজের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধির উপায় কল্পনা তখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই। স্বাভাবিক কাব্যপ্রিয় জাতির পক্ষে ভাবুক কবি হওয়া বড় আশ্চর্য্য কথা নহে, কিন্তু প্রকৃত জাতীয় উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের কেহই আপন দেহ মন উৎসর্গ করেন নাই। অথবা তদানীন্তন কালের কল্পনা তাঁহাদিগকে নিরীহ ও নিতান্ত বিষয়-

* "More Perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either."—*Sir W. Jones.*

নিস্পৃহ হইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু চিন্তা করিতে অবসর দেয় নাই। যে সাহিত্য-শক্তি সমাজস্থ নরনারীর হৃদয়ে স্বদেশের জন্য আপনাপন ধনসম্পত্তি ও জীবন পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে কৃতনিশ্চয় করে, যাহাতে আভ্যন্তরীণ নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদিগকে সর্ব্বথা সাবধান থাকিতে যত্নবান করে, দেশের সকল সুখের আকর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনা যাহা প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটশক্তি সম্মুখে অকুতোভয়ে আপন স্বত্বাধিকারের জন্য দণ্ডায়মান করে, স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষাকালে যে সাহিত্য-শক্তি তরুণ যুবকগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত করে, দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বতন বঙ্গীয় লেখক ও কবিগণের হৃদয় এ সকল কল্পনা হইতে অতীত জগতে ভ্রমণ করিত। প্রধানতঃ আদিরসে রসিক বঙ্গীয় কবিকুল—

"কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল,
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল।'

এইরূপ, সুন্দরীর কোপ-কুটিল-কটাক্ষের অনুধ্যানে অনেকেই বিহ্বল থাকিতেন, অন্য কিছু করিতে অবসর পাইতেন না। অথবা কল্পনায় ইহা ছাড়া আর কিছু উদিত হইত না। আমাদের বাঙ্গালার গৌরব জয়দেব কবি যখন 'রতিসুখসারে—' তান ধরিয়াছিলেন, তৎকালিক প্রাচ্যজগতের কেন্দ্রভূমিতে তখন সুকুমার কবিতা জ্যোৎস্নালোকে নিকুঞ্জকাননে বিরল শয়নে সেই ভাবের ভাবুক পরিসেবিত হইয়া গান গাহিতেন, আবার সেই স্থানই কঠিন দর্শনশাস্ত্র, জটিল ন্যায় মীমাংসা ও তপ্ত শোণিত নিঃসারণকারী রাজনৈতিক গবেষণায় আন্দোলিত হইত। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহা জয়দেব গোস্বামীর দোষ নহে, সাময়িক জল বায়ুর দোষ। যুগান্তরব্যাপী পরাধীনতা যে জাতির অস্থি-মজ্জার স্তরে স্তরে বিঁধিয়া পড়িয়াছিল, শোণিতের অণু-পরমাণুতে যে বিজাতি-ভীতি মিশ্রিত হইয়াছিল, মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যে শিশুর স্বাভাবিক নির্ভীকতা উন্মেষ মাত্রই অঙ্কুরে দলিত হইয়াছিল, যে জাতি তাহাদিগের পরাধীনতার প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, অথবা তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বিধিদত্ত জানিয়া অদৃষ্টবাদের মাহাত্ম্য-ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকিত, বিধিদত্ত পুরস্কারের ছায়াও স্পর্শ করিত না, সেই জাতির সন্তান সন্ততি কিসের বলে জাতীয় সাহিত্যকে সর্ব্বথা মর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার মতন উপাদান সংগ্রহ করিবে? 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এই সত্যবাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু দগ্ধ দেশের দুর্ভাগ্য,নতুবা মহাজনোক্ত এই রস কেবল মাত্র শৃঙ্গার-রসেই পর্য্যবসিত হইবে কেন? হিন্দুস্থান যে সময়ে হিন্দুস্বাধীনতার যথার্থ লীলানিকেতন ছিল, বৈদেশিক শাসন যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ক্ষেত্র কলুষিত করে নাই, ভারতের সেই গৌরবান্বিত যুগের সাহিত্য, তৎপরে দৃষদ্বতীতীরে হিন্দুস্বাধীনতার মহাপতনের দিন হইতে মধ্যবর্ত্তী যুগ, পরে উনবিংশ শতাব্দীর বিগত ও বর্ত্তমান কালের সাহিত্যেতিহাস যথাসম্ভব অনুশীলন করিয়া আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব, স্বাধীন ভারতের উদ্ভাসিতালোকে স্বাধীন মস্তিষ্ক হইতে যে সকল উপাদেয় জ্ঞানরাশি উৎসারিত হইয়া সমগ্র অখণ্ড ভারতে সঞ্জীবনী রস সিঞ্চন করিয়া ইহাকে সজীব রাখিয়াছিল, অপ্রতিবিধেয় পরাধীনতার আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল! পল্লবগ্রাহী বৈদেশিক সমালোচক অথবা আর্য্যশাস্ত্রানভিজ্ঞ কেহ যদি আর্য্যজাতির সাহিত্য † প্রতিভার বিস্ফুরণ দেখিতে না পান, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যাথার্থ্যের অনুসরণ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সাহিত্যের প্রত্যেক অংশের প্রকৃত পরিণতি, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সভ্যোচিত যে সকল পারদর্শিতার প্রয়োজন, একদিন ভারতে ইহার কোনটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাহা অতীতের সূক্ষ্ম স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বৈদেশিক সাহিত্য ও আচার অনুষ্ঠান সে স্থলে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল। মন্বাদি ঋষি-প্রণীত সুচারুবদ্ধ মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, অথবা ব্যাসকৃত মহাভারতেতিহাসের প্রসঙ্গ আপাততঃ রাখিয়া দিয়া যদি আমরা তৎকালিক প্রতিভাশালী লেখক ও কবিগণের কর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হই, আমরা কেন, শত কৃতি-লেখনী অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সে অনন্ত গুণকাহিনীর বর্ণনা করিতে অক্ষম হয়।

একাধারে সাম্য, স্বাধীনতা, ঔদার্য্যবত্তা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিজয়পতাকা যৎকালে আর্য্যভূমে উড্ডীন হইত, সাহিত্য জগতে তখন যে পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ইদানীন্তন সভ্যজগতেরও দেখিবার বিষয়।

† আমাদের 'আর্য্য' শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে কেহ যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক অভিনব য়ুরোপীয় আর্য্য (?) না বোঝেন। ভারতের ব্রহ্মর্ষিদেশস্থিত চিরাচরিত সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে আমরা গৌরবান্বিত 'আর্য্য' শব্দে অভিহিত করিতেছি।

ভারতের মানব ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়, এবম্বিধ নিপুণতা ও কৃতিত্ব সমাজ শৃঙ্খলা করিতে যাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে তাঁহাদের অলোকসামান্য প্রতিভা জগতে অদ্যাপিও ঘোষণা করিতেছে। তখনকার প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ স্পষ্টতঃ ইহাতেই প্রমাণিত হয়, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ধর্ম্মরাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন, সেই জন্যই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদার শিক্ষা তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র পর্ব্বত গুহার নিভৃত নিকেতনে আলস্যে কালযাপন করিতে দেয় নাই; অপিচ তাঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আপন অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমকে তত্তদ্বিষয়েই নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থপরতায় পর্য্যবসিত হয় নাই, কি বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপে, কি প্রসূতির গর্ভাধান সংস্কারে, কি সন্তান পালন-শিক্ষায়, কি সামাজিক আহার ব্যবহারাদি আচারানুষ্ঠানে, কি অর্থনীতিশাস্ত্রে তাঁহারা আজীবন কেবল কিসে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ সুখে, সচ্ছন্দে ও নিরাপদে জীবনযাত্রায় প্রস্তুত হইতে পারে, অবিশ্রান্ত তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কি অবস্থায় অবস্থিতি করিলে তাহার ভবিষ্যৎজীবন স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইবে, এই সূক্ষ্ম অথচ জীব-জগতের অত্যাবশ্যকীয় চিন্তা তাঁহারা করিয়াছিলেন। শরীরী জীব হইয়া সেই সকল মহান্‌ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, শরীরী মানব জড়ীয় অনুশীলন ত্যাগ করিয়া একমাত্র আধ্যাত্মিক

গবেষণা লইয়া থাকিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই ; এইজন্য কিসে মানুষ ধন, মান, যশ, আরোগ্য, বল ও স্বাস্থ্য-সুখ-ভোগ করিয়া জগতে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মানবজাতির হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিবে, ইহাই কেবল তাঁহারা চিন্তা করিয়াছিলেন। কত সহস্র বৎসর অতীতের গহ্বরে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সত্যযুগে যে ঋষি ভারতীয় জনগণের সামাজিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, জগতের ত্রিবিধ উৎপাতেও তাহা অবিকৃত ভাবে দেশীয় জনগণের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নিয়মিত করিতেছে। হিন্দুর বৈবাহিক ব্যাপারে মনুর বিধান আজও প্রত্যেক গৃহে পালিত হইয়া আসিতেছে। স্বামী-স্ত্রী-নির্ব্বাচনে অদ্যাপিও 'ত্রিংশৎ বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং' প্রভৃতি অনুশাসন মান্য হইতেছে। মানব কিসে সুখে স্বাস্থ্যে কালাতিপাত করিতে পারিবে, যে মহাত্মার হৃদয়ে এই চিন্তা আমরণ জাগরূক থাকে, মহর্ষি অপেক্ষায় অভিধানে যদি উচ্চতর জ্ঞাপক কোন শব্দ থাকে, আমরা তাঁহাকে তদ্দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রস্তুত। কর্ম্মবিহীন ধর্ম্মের অকর্ম্মণ্য ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহাদের সময় গত হয় নাই, জীবের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিন্তা তাঁহারা করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্যম্ভাবী কালের নিদারুণ আঘাতে তাঁহারা বহুদিন সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতি সংহিতা স্বর্ণাক্ষরে আজও ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ সাধক পরমার্থ চিন্তায় দেহ মন সমর্পণ করিয়া দিয়া কঠোরতার অদ্ভুত অভিনয় দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ ইতিহাস তাঁহাদের কথাও বলিতেছে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম ও চরিত্রবল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য স্থায়ী কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস ও সাধারণ সমাজ তাঁহাদিগকে প্রথমোক্ত মহাজনগণের ন্যায় আপন বক্ষে কৃতজ্ঞতার আসন প্রদান করিয়াছে। এবম্বিধ স্বদেশপ্রেমিক দেশের জন্য যে সকল মহামূল্য ধন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভারতের হিতসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাহিত্যকে অমূল্য উপাদানে গঠিত করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান, যতদিন হিন্দুস্বাধীনতার গৌরবরবি ভারতাকাশে বিরাজিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সজীব ছিল, কিন্তু যে দিন দৃষদ্বতীনীরে ক্ষত্রিয় ও মুসলমান শোণিতে পবিত্র স্বাধীনতাধন চিরবিদায় গ্রহণ করিল, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবী পূর্ণাঙ্গতার আশা সেই দিন—সেই ভয়াবহ দিনে সর্ব্বনাশগত হইয়া গেল। দেশীয় সাহিত্য সমাজকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করে, কিন্তু ভারতে রাষ্ট্র বিপ্লবের সহিত সকল বিপ্লবই প্রশ্রয় পাইল ; স্বদেশীয় সমুদায় বিশৃঙ্খলতার সহিত সাহিত্যধনও বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইল। রত্নপ্রসূ খনি সকলের মুহূর্ত্তে উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। বৈদিকযুগ হইতে প্রথম সংগ্রাম সিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্বাধীন ভারতের স্বাধীনভাবাপন্ন সাহিত্য তদনুযায়ী শোভনীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল ; আবার সংগ্রামসিংহের সময় হইতে ব্রিটিশাধিকারের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তুলনায় যে তাহাকে হীন বলিয়া অনুমিত হইবে, অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের

স্বাধীনতা ও সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি, এতদুভয়ের পরস্পর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। পরাধীনতার ও সাহিত্যাবনতির মূল মিলন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও যেন আমাদিগের দেশের অতীত কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেয়।

কাব্য ও কবি লইয়া বর্ত্তমান কালে যেমন আলোচনা হয়, হিন্দুস্বাধীনতার সময় তাহারও কিছু অভাব ছিল না। যে সময় ভারত দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক গবেষণায় পূর্ণ ছিল, তখন ভারবী, কালিদাস কিম্বা ভবভূতি-প্রমুখ মহাকবিদিগের অপ্রতুল ছিল না। প্রকৃত কবি মানসদর্পণে জগতের আভ্যন্তরীণ লুক্কায়িত চিত্র স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করেন; সাহিত্যের এই সুকুমার অংশ সভ্যতার ও মানস উন্নতির চিহ্নলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ কি? এক দিকে যেমন মনু, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শঙ্করাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য গভীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক গবেষণায় ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন, আবার অন্যদিকে আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির সুকুমার প্রতিভা পাশ্চাত্য জগতের কবিগুরু সেক্ষপীয়র, মিল্টনের তুলনায় প্রকৃষ্ট বলিয়া সমালোচিত হইতেছে। কি কবিতারাজ্যে, কি ভাবুকতায়, কি দর্শনবিজ্ঞানে, কি ন্যায়ের মীমাংসায়, কি সামাজিক সুশৃঙ্খলায় স্বাধীন ভারত আপনার সাহিত্য সংসারকে কোন অংশেই হীন করিয়া রাখে নাই। কালিদাস কিম্বা ভবভূতি, ভারবী অথবা নৈষধের গৌরব সৌভাগ্যবশত আজকাল অনেকেই বুঝিতেছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কলেজের ছাত্র ইংরেজ প্রোফেসরের মুখে বিস্ময়রুদ্ধকর্ণে নিউটনের attraction of gravityর আবিষ্কারের কথা শুনিতেছে, কিন্তু ভারতের ভাস্করাচার্য্য সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পৃথিবী যে ত্রিকোণ নহে, ইহা যে বাসুকীর মস্তকোপরি স্থাপিত নহে, প্রচলিত কুসংস্কারের মস্তকে কুঠার প্রহার করিয়া অতুল্য মেধাবী গণিতশাস্ত্রবিৎ ভাস্করাচার্য্য ভারতের সমক্ষে লীলাবতী রচনা করিয়া তাহা প্রচারিত করিলেন। ভাস্করাচার্য্যের এই মহামূল্য জ্ঞান সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি অতি উজ্জ্বলতম অংশ।

যে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) পৃথিবীর জ্ঞানী জাতিনিচয়ের সর্ব্বোচিত গবেষণার বিষয়, ভারতে, ভারতীয়সাহিত্যে তাহারও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র ও তাহার পরবর্ত্তী ভাষ্যকারদিগের অমানুষিক প্রতিভা, ইদানীন্তনকালের মিল্ অথবা বেকন, কমত অথবা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের প্রতিভা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সাহিত্যও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, ভারতের স্বাধীনতার শেষ স্ফুলিঙ্গ বিস্ফুরণের সময় ভগবান শঙ্করাচার্য্য অথবা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় অসামান্য ধীমানগণ হিন্দুস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কৈ আজও ভারতে তেমন একজন কেহ জন্মগ্রহণ করিল না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ক্ষেত্রে সে এক অদ্ভুত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিয়া সাহিত্য ও সমাজকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়াছিল, কিন্তু বিগত পরাধীনতার বিপুল কাল গণনা করিলে একটিও আর তেমন গণিতবৎ, তেমন দার্শনিক, তেমন নৈয়ায়িক, তেমন সংস্কারক, তেমন

রাজনৈতিক, তেমন বীর অথবা তেমন কবি জন্মপরিগ্রহ করিল না। জাতীয় সজীবতার উপর যে জাতীয় সাহিত্য নির্ভর করে, ইহা নিশ্চিত, তাই হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশের পর তাহার সাহিত্যচ্ছবি পরিম্লান। আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা উপস্থিত না হইলে, চরিত্র ও ধর্ম্মের বল ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে, ভারতে কদাপি বিজাতীয় অধিকার প্রবেশ করিতে পারিত না। কাপুরুষ-লক্ষণ গৃহ-বিবাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনয়ন করিয়া দিল, একীভূত জাতীশক্তি সুতরাং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া বিজাতীয় শক্তির নিকট উন্নত শিরস্ত্রাণ লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। নতুবা বীরক্ষত্রিয়শোণিত বর্ত্তমান থাকিতে, জাতীয় ভ্রাতৃবন্ধন একীভূত থাকিতে, সমগ্র জগতে এমন কোন্ মহাশক্তি বর্ত্তমান ছিল, যাহা সসাগরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া দাঁড়াইবার অধিকার মাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে? যদি কেহ কোন জাতির প্রকৃত চিত্র দেখিতে বাসনা করেন, তবে তাহার ফল লাভের উপায় সেজাতির সাহিত্যালোচনা কর। কোন্ জাতির সভ্যতা কত উচ্চধাপে আরোহণ করিয়াছে, যদি জানিতে বাসনা হয়, তবে তাহার জাতীয় সাহিত্য যাহা বলিয়া দিতে পারে, এমনটি আর কিছুরই বলিবার শক্তি নাই। সাহিত্যের অন্যতর অঙ্গ ইতিহাস, জাতির আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্পত্তি।

আজ যদি ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবী নিয়তির ফলে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তথা হইতে অন্তর্হিত হন,—সাম্য ও স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ড যদি দুর্নীতি, ও চরিত্রবিহীনতার ফলে তাহাদের মাতৃভূমিকে দুর্ব্বিসহ দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়, তবে পরবর্ত্তী ইংলণ্ডের ইতিহাস নিশ্চিতই ইহা সপ্রমাণ করিবে, স্বাধীন ইংলণ্ডের স্বাধীন সাহিত্য পূর্ব্বে যে তেজে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন, পরাধীন ইংলণ্ড তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই। স্বাধীন ইংলণ্ডের স্বাধীনভাবাপন্ন যে জননী মিল, ক্রমওয়েল, ওয়েলিংটন, গ্লাডষ্টোন্ ও কলোম্বাসের ন্যায় বীরপুত্র প্রসব করিতে পারেন, পরাধীন ও নিপীড়িত ইংলণ্ডের জননী তদ্রূপ অতি অল্পই, অথবা সম্পূর্ণই পারেন না।* জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় কঠোর ও কঠিন গবেষণার বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা সুকুমার কবিতার রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া আসি, তবে দেখিতে পাই, যে বৈষ্ণব প্রেমের বন্যায় একদিন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, প্রেম ভক্তির জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গে যখন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন, পরাধীনতার লৌহ নিগড় যখন বাঙ্গালা দেশের গললগ্নীকৃত হয় নাই, সেই সময় বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, গ্রাম কেন্দুবিল্বের প্রেমিক কবি জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে-ও কিন্তু হিন্দুস্বাধীনতার সময়। স্বাধীন দেশে লালিত-পালিত জয়দেব গোস্বামীর কবিতাশক্তি যদিও ভারতের আসন্নপতন প্রতিহত করিতে পারে নাই, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের কবিতারাজ্যে তাহা, যতদিন ভারতের

* একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন,—"The reason that so many more eminent men have appeared in England and France than in other countries is that they have for many years been tending to liberty. Genius is rare under despotism. It is only in the pure air of freedom that the human mind flourishes and expands.'

অস্তিত্ব মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন ইহার গৌরব-কাহিনী ঘোষণা করিবে। কালিন্দীর শ্যামজলে, ভাগীরথীর অমল ধবল সলিলে, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালায়, আর ঐ কেঁদুলীর তটপ্রবাহিনী অজয়নদীর গৈরিক বর্ণে বৈষ্ণবকবির মোহন বাঁশরীর সুর অণু পরমাণুতে মিশিয়া আজও যেন বৃন্দাবনের ধীর সমীরে যমুনাতটে বনমালীর প্রেমস্মৃতি প্রাণের তন্ত্রীতে জাগাইয়া দেয়। গোপীপ্রেমের উদ্দাম আধ্যাত্মিকতাময় যে কবিতা-লহরী দেশের সাহিত্যকে অনুপম পুষ্পমালা দ্বারা সাজাইয়াছে, তাহার অনুরূপ আজও বঙ্গে আর একটী জন্মে নাই। প্রতিভা বহুদিন রুদ্ধ হইয়াছে; সে অতুল প্রতিভার বিকাশ তাহার পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত আর হয় নাই। চরিত্র-তেজ পূর্ব্ব হইতেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ দেশের মহাপতন; পরে পরাধীনতার অনিবার্য্য উপসর্গ বিলাসিতা ও নৈতিক অবনতি দেশীয়দিগের অস্থিমজ্জায় বসিয়া পড়িল, দেশের সামাজিক আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সকল ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। স্বার্থপরতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা ও চরিত্র-বিহীনতায় দেশ ছাইয়া পড়িল; সামান্য কপর্দ্দকের নিকট দেশীয় কুলাঙ্গারগণ অমূল্য স্বাধীনতা ধন বিক্রয় করিল। নেতৃত্ব বয়োবৃদ্ধগণ তখন বর্ত্তমান ছিলেন, সমাজের উশৃঙ্খলতা প্রতিহত করিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না। ধন-লিপ্সা ন্যায় অন্যায় বোধের অপেক্ষা করে না, সুতরাং ধনবানের যথেচ্ছায় সমাজে ঘোর অশান্তি ও উপদ্রব আনয়ন করিল। সসাগরা ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট যেখানে একদিন সামান্য কুশাসনোবিষ্ট, বল্কল-পরিহিত ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র কম্পিত-কলেবর হইতেন, সেই খানেই তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসসুখে দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের এই সার্ব্বজনীন দুর্গতির কালে সাহিত্য কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিল? বলা বাহুল্য, সমাজচিত্রই সাহিত্যের যথার্থ আলেখ্য। দুর্গতিগ্রস্ত সমাজের সাহিত্যকেও যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হয়, সে সময়েও তাহাই হইল। ভারতে মুসলমান আধিপত্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনের সম্মুখে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গালার ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে একদিন যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা বিস্ফুরিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা সাহিত্যেতিহাসের তাহাই প্রথম অত্যুজ্জ্বল অংশ। তাহা ভগবদ্ভক্তি ও অধ্যাত্ম প্রেমিকতাময় উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের উপায় উদ্ভাবনী চেষ্টা তাহাতে হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও ফলতঃ তাহার গতি বিপরীতদিকেই ধাবিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের নব গোরাচাঁদের উদয় হইতে পরবর্ত্তী শত বৎসরের বঙ্গসাহিত্যেতিহাস বৈষ্ণব কবিগণের কীর্ত্তিত্ব ও কবিত্বে পূর্ণ। বৈষ্ণবকবিগণই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত প্রস্তাবে পিতা। সঙ্গীত, ইতিহাস, কবিতা, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের আবশ্যকীয় নানাবিধ উপকরণ দ্বারা ইঁহারা সুনিপুণ কারীগরের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ সৌষ্টব সাধন করিয়াছিলেন। দেশের পরাধীনতা বিষয়ক চিন্তা ইঁহাদের হৃদয়ে ঠাঁই পায় নাই, স্বাধীনতার বিমল সুখভোগের ইতিহাস ইঁহারা আলোচনা করেন নাই, একমাত্র অধ্যাত্মদর্শনের আলোচনা এবং কৃষ্ণভক্তিরসামৃত পান করিয়া

বিলাস বাসনা ত্যাগের অপরিসীম উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে দর্শন আছে, ইতিহাস আছে, জীবনচরিত আছে, চারু কবিতা আছে, কিন্তু যে শক্তি মানব জাতিকে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতৃস্থানীয় স্বদেশবাসীগণকে রক্ষার নিমিত্ত আত্মহৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত নিঃসারণ করিতে অনুপ্রাণিত করে, তাহা ইহাতে শিক্ষা দেয় নাই। যে মন্ত্র একদিন গুরু নানকের শিষ্যগণকে নিরীহ-বিলাস, নিস্পৃহ সাধক শ্রেণী হইতে শোণিত-সিক্ত সমরাঙ্গণে পরিচালিত করিয়া মোগল শাসন শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল, যে মন্ত্রে এক দিন কার্থেজের লাবণ্যময়ী ললিত-ললনা-কুলকে আপনাপন প্রাণাধিক পতি ও এক মাত্র পুত্র সন্তানকে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর করিতে উজ্জীবিত করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল, যে মন্ত্র একদিন চিতোরপতি প্রতাপসিংহকে ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ও জীবন তুচ্ছ মানিয়া আরাবল্লী শৈলের কন্দরে কন্দরে অনাহার অনিদ্রায় ভ্রাম্যমান হইয়া পতিত—পরাধীন—পরপীড়িত স্বদেশ উদ্ধার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ করিয়াছিল,—যাঁহার অলৌকিক সাধনা একদিন মোগল-শোণিতে তর্পণ করিয়া পিতৃপুরুষকে অঞ্জলী প্রদান করিয়াছিল, যাঁহার পুণ্য সাধনায় একদিন দুঃস্থ হিন্দু-প্রজাগণ কঠোর যন্ত্রণা মধ্যেও হৃদয়ে অশেষ শান্তি লাভ করিয়াছিল, সে মন্ত্র—সেই সাধন মন্ত্র বাঙ্গালীর প্রথম জাতীয় ইতিহাসের অধ্যায় শিক্ষা দেয় না! কবিতার রসময় লালিত্যস্রোত যদি দেখিতে চাও, বাঙ্গালার বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা পাইবে, নাট্যচিত্রের যথার্থ কৃতিত্ব যদি দেখিতে চাও, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা দেখিবে, জীবনচরিতের বিন্যাস যদি দেখিতে চাও, ইহাতে তাহা পাইবে, অধ্যাত্মদর্শনের কঠিন দার্শনিক মীমাংসা যদি অনুসন্ধান কর, ইহাতে তাহাও দেখিবে, কিন্তু প্রকৃত বীর হৃদয়ের অগ্নি উজ্জ্বলন ইহাতে নাই; গোব্রাহ্মণ ইষ্টদেবতার অবমাননাকারী হৃদয়হীন পাষণ্ডদিগের সবলে মূলচ্ছেদ করিয়া স্বদেশের সনাতন জাতিধর্ম্মকে ও সতী সাধ্বীদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিভৃত সাধনার উপদেশ ইহাতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতামুমোদিত কৃষ্ণলীলার কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে অনেক আলোচিত হইয়াছে ও শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অনেকেই ইহার রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু পূজনীয় বৈষ্ণব কবিগণ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রস্তুত উপাদেয় অমৃতই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে কলুষিত দুর্নীতির ঘোর অন্ধ-তমসাবৃত রাজ্যে লইয়া যাইবে! যে দুর্লভ জ্ঞান, অপার্থিব প্রেম-ভক্তি শ্রীচৈতন্যের সহিত আসিয়াছিল, নীলাচলের স্মরণীয় তীর্থেই তাহার পর্য্যাবসান হইয়াছে। পুত্র-বিচ্ছেদ-ক্লিষ্টা শচীমাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া, পতি-বিচ্ছেদ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় শূন্য করিয়া, বঙ্গের উজ্জ্বলদিক্ আঁধার করিয়া যে প্রেমের দেবতা চলিয়া গেলেন, আর সে অভাব পূর্ণ হইল না। যে ক্ষত বঙ্গের অঙ্গে সমুদ্ভূত হইল, আর তাহা আরোগ্য হইল না। তাই চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, দেব! মায়ার ছলনায় মানববেশে শুষ্ক হৃদয়ে প্রেম বিলাইতে আসিয়াছিলে ত ছাড়িয়া গেলে কেন? দগ্ধদেশে জন্মিয়াছিলে ত অত শীঘ্র অন্তর্হিত হইলে

কেন? জগাই মাধাই উদ্ধার করিলে ত পাপ-কলুষিত বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া গেলে না কেন? প্রভো, তুমি ত পাপীর দুঃখে দুঃখিত, পাপীর প্রতি তোমার দয়া ত সংসারাতীত, তবে কেন এমন হইল? দেব! আমরা বুঝিয়াছি। কেন এমন করিলে, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে আর বাকী নাই। বাঙ্গালার পাপলোকে তোমায় বুঝিল না, বাঙ্গালার কলুষিত বায়ু তোমার সহিল না। তুমি যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তোমার মাতৃভূমির ভারার্পণ করিয়াছিলে, তোমার অনুপস্থিতকালে তাহারাই, সেই কুলাঙ্গার স্বদেশ-শত্রুগণই বঙ্গে তোমার স্বর্গীয় প্রেমের সুবিমল তত্ব সামান্য কলুষিত বারনারীর প্রেমে পরিণত করাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গে ঘোর তামসিক যুগের প্রবর্ত্তনা করিল। রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমপ্রীতিবিষয়ক ব্যাখ্যা দুরাচার লম্পট ও কুলটাদিগের পাপ লীলা-রসে পরিণত হইল। বৈষ্ণব শ্রীসনাতন, বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী, বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্য, বৈষ্ণব রায় রামানন্দের স্থান চরিত্রহীন নেড়ানেড়ির দল দ্বারা পূর্ণ হইল। প্রেমিক অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরগণ আজ্ সর্ব্বতোভাবে আপন জাতীয় অধঃপতন কাহিনী জগতে ঘোষণা করিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্য জীবন কাটিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দৈনন্দিন জীবনের পূতিগন্ধ দেশময় বিস্তারিত হইয়া অবিরত তাহা অসীম কুফল প্রসব করিতে লাগিল। বাঙ্গালায় ব্রিটিসাধিকারের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্য সমাজের উপরে আর কিছু মাত্র ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। কলুষিত চরিত্রের এবম্বিধ দূষিত বাষ্প বঙ্গ-দেশের বক্ষোপরি কিরূপ ভয়ঙ্কর ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যেতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই;. নেড়ে, সহজে প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায় এই ঘোরতর মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাসে পতিত হইয়া দেশের অজ্ঞানান্ধ নরনারীকে কি ভয়ানক পতনের দিকে লইয়া গিয়াছে, ভাবিলে অবসন্ন হইতে হয়! পাপ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব এই সকল ব্যক্তির পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া দেশের কত হতভাগিনী আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্ব-ধন বিসর্জ্জন দিয়াছে! কত শত সহস্র বঙ্গকুলরমণী ভীষণ পাপের নামান্তর ধর্ম্মের মোহ মন্ত্রে প্রলুব্ধ হইয়া অনিবার পাপ সেবায় ইহ পরকাল নষ্ট করিয়াছে। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের এই পাপ সময়ে দেশীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, বিখ্যাত ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন,তাঁহারা জানেন, তদানীন্তন বাঙ্গালীর সমাজে কিরূপ প্রকৃতির সাহিত্য সমাদৃত হইত। এবম্বিধ শ্রেণীর সাহিত্য লিখিয়া যিনি আবার রাজ সভায় 'গুণাকর', উপাধিতে ভূষিত হন, সে দেশের রাজা ও সমাজস্থ নরনারীর প্রকৃতি কি, ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে না? শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে বঙ্গে যে তীক্ষ্ণবিষ-বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বঙ্গের গুণাকর ভারত চন্দ্রের সময়ে তাহার বিষবৃক্ষ ফলফুলে শোভিত হইয়া তাহারই বিলাস-ছায়া তলে ঐ ভারতচন্দ্রের মতন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়াছিল। ইহা ভারতচন্দ্রের দোষ

নহে, তৎকালিক সমাজের বিষ-বায়ু ইহাদিগকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের বর্ণনা-পারিপাট্য প্রশংসা পাইতে পারে বটে, লেখকের লিপিকুশলতা প্রশংসারযোগ্য সত্য, কিন্তু শত গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও যাহা সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে ঘোরতর কলঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা কদাপি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। 'গুণাকর'যে মহামূল্য (?) রত্নরাজি বঙ্গদেশে বিলাইয়া ছিলেন, তাহার প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া দেশের কত হতভাগ্য বালক বালিকা যে জীবন পথের প্রথমেই বিষ-জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যখন এই অবস্থা, সেই সময়ে বঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। পলাশিপ্রাঙ্গণের স্মরণীয় দিনে দেশের ভবিতব্যতার লিপি বিধিবদ্ধ হইল। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য গ্রহণ সময়ের কিয়ৎকাল পর হইতে আর আজ এই আসন্ন বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যেতিহাস-অধ্যায় আমাদের প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয় আলোচ্য বিষয়। বাস্তবিক বাঙ্গলা সাহিত্যের এই অংশ সর্ব্বতোভাবেই উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত। মনুষ্য-সমাজের এক একটি অভাব মোচন করিতে মধ্যে মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়; বাঙ্গলা সাহিত্যকে নব পরিচ্ছদে সাজাইবার জন্য রাজা রামমোহন রায় মহাশয় তাই আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাকে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষায় পরিণত করিয়া, ইহার ভাবকে যথাসম্ভব সম্ভ্রান্ত, সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া, ইহার কল্পনারাজ্য দূর প্রসারিত করিয়া ইনি দেশীয় সাহিত্যরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। পক্ষান্তরে, সাময়িক রাজ্য শাসন নীতি তৎকালিক দেশীয় জনগণের মস্তিষ্কে অনেকটা সেই প্রকার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেয়, সুতরাং অক্ষোভ ও অপক্ষপাতে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইংরেজজাতির শাসন ও শিক্ষাপ্রণালী অলক্ষিত ভাবে রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইংরেজজাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাহিত্যেতিহাস অমানুষিক ঘটনা ও পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির সহিত দেশীয় অবস্থার তুলনা করিলেন; তুলনায় যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা ভারতের লজ্জার বিষয়। তিনি ব্যথিত হইলেন, কিন্তু হৃদয়ের এ বেদনা প্রচ্ছন্ন থাকিল না, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল, অবিলম্বে কঠোর কর্ত্তব্যের সাধনাক্ষেত্রে শরীর মন নিয়োজিত করিলেন। পিতা ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, চতুর্দ্দিকস্থ অধিকাংশ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের পশ্বাধম ব্যবহারে নিপীড়িত হইয়া, কঠোর সমাজের ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী সহ্য করিয়া এই মহাত্মা জাতীয় সমাজ ও সাহিত্যের জন্য যে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের সমগ্র ভূখণ্ড যতদিন না প্রলয়পয়োধি জলে আপন অস্তিত্ব বিলীন করে, ততদিন ইহা স্বদেশবাসী সকলের মনে দৃঢ়অঙ্কিত থাকিবে। জাতীয় সাহিত্য যে একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সকলই শিক্ষা দিতে পারে, অধ্যাত্ম-সাধন প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে সেবকদিগকে জাতীয় গৌরব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে পারে, শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে

তাহা যে যুবকদিগকে মাতৃরূপী মহিলাগণের প্রতি যথার্থ মর্য্যাদা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিতে পারে, শান্ত জীবন পালন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে দেশীয় সর্ব্বসাধারণকে স্বদেশীয় মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাজশক্তির সম্মুখে শিষ্ট অথচ নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা সর্ব্বপ্রথম এদেশে রামমোহন রায় মহাশয় শিক্ষা প্রদান করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই গুণে বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়া বৈদেশিক সমালোচনায় ভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রচলিত ভাষা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই গৌরবে বাঙ্গালী জাতি মাত্রেই গৌরবান্বিত। যে জাতির সাহিত্য দ্বারা পরিচয় নাই, তাহাদের কিছুই 'জাতীয়,' আখ্যা পাইতে পারে না। আজ ভারতের ভাগ্য, তাহার অনেক সুসন্তান এই পুণ্যক্ষেত্রে দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যরূপ ফলফুলসুশোভিত তরুণ বৃক্ষের ছায়া পাদপে বসিয়া অনেক ক্ষুৎপিপাসিত ক্ষুন্নিবৃত্ত, অনেক শ্রান্ত পথিক সুস্নিগ্ধ। আশার বংশী বাজিয়াছে, বঙ্গবাসি, এখনও তোমার ভ্রাতৃপ্রেমে মলিনতা আছে; প্রাণের মালিন্য মুছিয়া ফেল, যদি স্বার্থস্পৃহা থাকে, তাহা সমূলে উৎপাটিত কর, যদি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ থাকে, পুনরায় পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, যদি বিলাস-বাসনা থাকে, কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা কর, যদি পরশ্রীকাতরতা থাকে, তাহাকে হিংসা না করিয়া নিজে সেইরূপ হইতে চেষ্টা কর, হৃদয় নির্ম্মল ও স্বদেশহিতৈষণা অভ্যাস করিয়া মাতৃভূমির সারবান উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখ, দেখিবে, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বঙ্গভাষা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভারতের সমগ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে এক প্রেমডোরে বাঁধিয়া ফেলিবে। যে ডোরে একদিন হিন্দুস্থানের সকল বর্ণ অনুস্যূত ছিল, যে ডোরে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ আজ একত্র গ্রথিত, সেই ভ্রাতৃপ্রেমময় ডোরের বৈদ্যুতিক শক্তিতে তোমাদিগের হৃদয়ে যে অমানুষিক বল সঞ্চিত হইবে, তাহাতে আমাদের দেশের জয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের জয়, তাহারই সহিত ভারতবাসী আমাদের জয়।

স্বাধীন দেশের সাহিত্য ও পরাধীন দেশের সাহিত্যে যদিও বহু পার্থক্য, কিন্তু মুসলমান শাসনপীড়িত ভারত এবং ব্রিটিস্‌শাসনাধীন ভারতের জাতীয় সাহিত্য কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, তুলনা করিলে, বর্ত্তমানযুগের প্রাধান্য ও বর্ত্তমান শাসন এবং শিক্ষানীতির উৎকর্ষ তাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মুসলমান সাহিত্য আমাদের দেশে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে নাই, ইংরেজি সাহিত্য তদপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বর্ত্তমানকালে আমাদের বালক ও যুবকদিগকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে শিক্ষাপ্রণালী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ইতিহাসের জলন্ত ও জীবন্ত কাহিনী চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেখায়, মুসলমান সময়ে সেরূপ হইত না। ইংরেজ জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র যেরূপ অদ্ভুত ও জীবন্ত ঘটনাবলীতে পূর্ণ, তাহারা ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি অশান্তিময় ঝটিকা হইতে কিরূপ ভাবে আপন মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, আজ দেশীয় জনগণ তাহা সম্যক্

বুঝিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্য ইংলণ্ডীয় সমাজোপরি যে অসীম শক্তিসম্পন্ন, তাহাও বুঝিতে বাকী নাই। ইংরেজী শিক্ষার এই ভাব আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকটা প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের দেখিবার, শিখিবার বহু বিষয় সম্মুখে বর্ত্তমান, যাহাতে মনোযোগ না দিলে আমাদের সাহিত্য উন্নতিপথে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান সেবকগণ আশাতীত উন্নতিলাভ করিতেছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার সেই আর্য্যযুগের ন্যায় অদমিত উদ্যমে জাতীয় ভাষাভাণ্ডারে যাহাতে রসায়নশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করুন, বৈদেশিক নানাবিধ ভাষা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া যাহাতে সাহিত্য সেবকগণ আপনাদের ভাষায় তাহা যোজনা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। বৈদেশিক সাহিত্যের অধীত জ্ঞানরাশি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করুন। নতুবা যিনি ইংরেজি পড়িয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার নিজেরই তাহাতে উপকার হইয়াছে, আর যিনি ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানরাশি স্বদেশীয় ভাষাভাণ্ডারে স্থাপিত করিয়াছেন, তিনি নিজ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি সাধারণের উপকার করিলেন। একজন আত্মস্বার্থে মুগ্ধ, স্বদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন ও অনভিজ্ঞ; আর একজন স্বদেশহিতৈষিতার যোগ্য উপাধিতে অলঙ্কৃত। শেষোক্ত জন অবশ্যই মাতৃভূমির সুশিক্ষিত সুসন্তান। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদেশীয় সাহিত্য সম্যক্ আলোচনা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া বৈদেশিক সাহিত্যে মন্ত্রমুগ্ধ, তাঁহার শিক্ষা কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে গভীর সন্দেহ। ভিত্তিবিহীন অট্টালিকার অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয়, জাতীয় সাহিত্যানভিজ্ঞ ব্যক্তির শিক্ষাও তেমনি সম্ভব! দেশের দুর্ভাগ্য, আজ্ জাতীয় সাহিত্যানভিজ্ঞ বঙ্গীয় যুবকের পল্লবগ্রাহী, অসম্পন্ন জ্ঞানের বড় অহঙ্কার! তাই ভিত্তিহীন শিক্ষার শোচনীয় চিত্র জাজ্জ্বল্যমান! কোন কোন মহাপুরুষ ইংরেজি শিখিয়া সেই ভাষায় পুস্তক লেখেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির তাহার সহিত সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। যে বিভিন্ন জাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক লিখিয়া যিনি তাহাদিগের ভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা পান, তিনি নিতান্তই হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই। ইংরেজ জাতির মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারেন, যাঁহারা আজীবন বিভিন্ন জাতির সাহিত্য অনুশীলন করিয়া তাহাদিগের গ্রহনীয় বিষয় গুলি আপনাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি যত্নে সন্নিবেশিত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি আজীবন কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইংরেজি সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, আজ সেই স্বদেশপ্রেমিকগণের সাধনবৃক্ষ তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া দিয়া জগতের কোটি কোটি ব্যক্তির জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছে। আজিকার ইংরেজি সাহিত্যভাণ্ডার জগতে এমন কোন্ বিদ্যার অস্তিত্ব আছে, যাহা সে

তাহার গৃহ হইতে দেখাইতে পারে না? সংগ্রহনৈপুণ্যেই ইহার এত গৌরব। নতুবা ভাষার সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্নতা অথবা শব্দ-সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত-দুহিতা বঙ্গভাষা জগতের অন্য যে কোন ভাষাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালিনী। সেই দিন প্রকৃতই বাঙ্গালী জাতির গৌরবের দিন, যে দিন বঙ্গবাসী আপন গৃহে আপন ভাষার সাহায্যে জগতের ইতিহাস অনুশীলন করিতে পারিবে। যদি কেহ বাঙ্গালা-সাহিত্য সেবায় ইচ্ছুক থাকেন, যদি কেহ স্বদেশীয় সাহিত্যকে পরিপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া জগতের প্রধান ভাষাগুলির সহিত সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, যে শিক্ষার ভিত্তির উপর আশ্রয় লইয়া বঙ্গবাসী জীবন পথের সর্ব্ববিধ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। যত দিন আমাদের বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহে জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার সদুপায়কল্পে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাণপনে যত্ন না করিতেছেন, ততদিন উন্নতির আশা নাই। এক দিকে বৈদেশিক সাহিত্য শিক্ষা করিয়া তদুপার্জ্জিত জ্ঞান স্বদেশীয় সাহিত্যে সন্নিবেশিত করা যেমন মঙ্গলজনক, আবার বৈদেশিক শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যদি তাহার প্রেমে জাতীয় উন্নতির কথা বিস্মৃত হইতে হয়, তাহা তেমনি অমঙ্গল ও পীড়াদায়ক। ঘটনাবর্ত্তে পতিত মাতৃহীন বালক এবং পুত্র-হারা জননীর জীবন চিত্র যেমন দুঃখের ও সহানুভূতির যোগ্য, মাতৃভাষা-বিস্মৃত হিন্দু সন্তানের জীবনও তেমনি দুঃখের ও শোচনীয়। পরিত্যক্ত, পথপার্শ্বে পতিত বালক অন্য কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত, তাহার স্নেহময়ী জননীকে সে চেনেনা, জানেনা! এ দৃশ্য হৃদয়স্পর্শী! ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের ইতিহাস আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যৎকালে নর্ম্মাণ-ফ্রেঞ্চ ভাষা ইংলণ্ডের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিল, তত দিন ইংলণ্ডের জাতীয়সাহিত্য অপরিস্ফুট ও অগৌরবান্বিত, যে দিন হইতে স্বদেশীয় কবিতার মৌলিকশক্তি বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল, সেই দিন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে প্রকৃত জীবন-সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ আপন শক্তি সম্প্রসারণ করিল। ফরাসী সাহিত্য যতদিন জর্ম্মান্‌রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল, জর্ম্মান্‌গণ যতদিন ফরাসী ভাষাধ্যয়নে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন, ততদিন জর্ম্মান্ জাতির জাতীয় সাহিত্য ঘোরান্ধকারে লুকায়িত ছিল, কিন্তু স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়, যে দিন অমরকবি গেটে (Goethe) জর্ম্মানীর জাতীয় ভাষাকে বীণাবংশীরবে আবাহন করিয়া জাতীয় সুবর্ণ সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিলেন, সেই দিন জর্ম্মান্ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মান্ জাতির প্রকৃত গৌরবান্বিত যুগের অবতারণা হইল। আজ্ জর্ম্মান্ সাহিত্যের আশ্রয়ে জর্ম্মান্ জাতি সর্ব্বতোভাবে জগতের সমক্ষে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম। য়ুরোপীয় ইতিহাস পরিত্যাগ করিলে আসিয়াক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কবি ফেরদোশী যতদিন না পারস্যে জাতীয় সাহিত্যকে আবাহন করিয়াছিলেন, ততদিন আরবীয় ভাষাশক্তি সে দেশীয় নর নারীকে নিয়মিত করিতেছিল; যে দিন ফেরদোশীর অমৃতময়ী ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, সেই দিন তাঁহাদের জাতীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত যুগের প্রবর্ত্তনা

করিল। হাফেজের অমন মধুর কবিতা, সাদীর অমন চিত্তমুগ্ধকারী উপদেশ, যদি আরবীয় ভাষায় বিবৃত হইত, তবে জগতের লোককে এত অধিক আকর্ষিত করিতে পারিত না। মাতৃভাষার আশ্রয়ে তাঁহাদের হৃদয়ের যে কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া অমৃতের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছিল, বৈদেশিক সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান, তুলনায় তাহার কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। সাহিত্য-জগতের ইতিহাস তাই ইহাই বলিয়া দেয়, জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চার করিতে, জগতের গৌরবান্বিত জাতি সমূহের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষতা করিতে, জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিঘ্নবিনাশন পরমদেবতার আশীর্ব্বাদ ভারতবাসীদিগের মস্তোকোপরি বর্ষিত হোক, দিনে দিনে আমরা মাতৃভাষার সেবাব্রতে দেহমন সমর্পণ করিতে শিক্ষা করি। ইংরেজি সাহিত্য কদাপি ভারতের সাহিত্যরূপে পরিণত হইবে না। সে আশা আকাশকুসুম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। শিশু যাহা মাতৃস্তনাপানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করে, যাহা তাহার প্রতি রক্তবিন্দুর অণুপরমাণুতে বিরাজমান, তাহা বিস্মৃত হইয়া যাহারা বৈদেশিক ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে পরিণত করিতে আশা করে, তাহাদের সে আশা বাতুলতার নামান্তর ও তাহারা মনুষ্যদেহাবরণে কিম্ভুতকিমাকার জন্তু! একদিন বাঙ্গলাভাষা সমগ্রভারতে নেতৃত্ব করিবে, এ আশা সম্ভাব্য, কারণ সমগ্র ভারতের সহিত ইহার শোণিত-সম্পর্ক আছে, কিন্তু ইংরেজি ভাষা দ্বারা সে আশা করা আমাদের অযোগ্য ও অসম্ভব। দিন থাকিতে ভারতীয় যুবকগণ বৈদেশিক জ্ঞানরাশি আপন সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থাপিত করিয়া মাতৃভাষার সাহায্যে কল্পনা ও কাব্যে মৌলিকতা প্রকাশ করুন,—অনুদিন সাহিত্য-সেবাব্রতের শান্তিময় ছায়ায় তাপিত, পরাধীনতা-ক্লিষ্ট জীবনের অবসাদ অপনোদন করুন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

দধিবীজ।

ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থে পঞ্চবিধ দধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা, (১) যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্তরস অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত না হওয়াতে স্বীয় রসবিহীন, তাহা মন্দদধি। (২) সম্যক্ গাঢ় হওয়াতে যে দুগ্ধে দধির মধুরতা প্রকাশিত হয়, কিন্তু যাহাতে অম্লরস অনুভূত হয় না, তাহা স্বাদু দধি। (৩) যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর অম্লাস্বাদ হয়, তাহা স্বাদ্বম্ল দধি। (৪) যে মধুরতা বিহীন দধির অম্লরস ব্যক্তীভূত হয়, তাহা অম্লদধি। এবং (৫) যে দধিদ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ ও কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যম্লদধি।

পক্বদুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দধি প্রস্তুত হয়, ইহাতে নূতনত্ব বা জ্ঞাতব্য বিষয় কি আছে? কথাটা সহজ বটে, কেন না সকলেই দধি প্রস্তুত করিতে জানেন। দধি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া সহজ, কিন্তু দুগ্ধ কিরূপে কি নিগূঢ় কারণে দধিতে পরিণত হয়, তাহা বুঝা বা বুঝান সহজ নহে।

আমাদের খাদ্যকে সামান্যতঃ পাঁচভাগে

বিভক্ত করা যায়। (১) অণ্ডশ্বেতাদি, (২) শর্করাদি (৩) ঘৃতাদি (৪) লবণাদি ও (৫) জল। এই পাঁচটি সামগ্রীই দুগ্ধে যথোচিত পরিমাণে আছে। এজন্য কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। স্তন্যপায়ী শিশু কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অণ্ডেও এই কয়েকটি পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে, এজন্য অণ্ডজ প্রাণিগণের শিশু অণ্ডের ভিতর পরিপুষ্ট হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ ও অণ্ড, আমাদের উৎকৃষ্ট অনুকরণীয় খাদ্য।

আমাদের দেশে দুগ্ধ হইতে মাখন, নবনীত, ছানা, দধি, ঘোল, সর, ও ঘৃত প্রস্তুত হয়। মাখন, নবনীত, সর ও ঘৃত প্রায় একই পদার্থ। ইহারা ঘৃতাদি। মাখন ও ননী একই পদার্থ। তবে অপক্ক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন এবং দধি মন্থন করিয়া ননী পাওয়া যায়। উৎপত্তি প্রকারভেদে একই পদার্থের ম্রক্ষণ (মাখন) ও নবনীত এই দুই নাম হইয়াছে। উষ্ণ পক্কদুগ্ধে দধি বা অপর অম্ল সংযোগ করিলে যে পিণ্ডাকৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে আমিক্ষা, তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা * যায়। অপক্ক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধার করিলে যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে উষ্ণাবস্থায় অম্ল সংযোগে যে পিণ্ডাকৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে কেসিন † বলা যায়। অতএব নবনীত ও কেসিন লইয়া আমিক্ষা। ছানা বাহির করিয়া লইলে যে দ্রবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সাধুভাষায় মোরট বলা যায়। সচরাচর তাহা ছানার জল নামে প্রচলিত। কৌশলক্রমে দুগ্ধ হইতে এক প্রকার শর্করা বাহির করিতে পারা যায়। তাহাকে দুগ্ধ শর্করা বলে। অতএব কেসিন, দুগ্ধশর্করা, নবনীত ও ছানার জল এই কয়েক অংশে দুগ্ধকে সামান্যতঃ বিভক্ত করিতে পারা যায়।

উপরের লিখিত দুগ্ধের উপাদানগুলি স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, দধির গাঢ় অংশ বা মস্তু, আমিক্ষা মাত্র এবং তাহার দ্রবভাগ দধ্যম্ল*সংযুক্ত দুগ্ধের জলীয় পদার্থ।

দুগ্ধে অম্লসংযোগ করিলে ছানা উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদন করিতে পারিলেই সেই অম্ল সংযোগ বশতঃ দুগ্ধ, দধিতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদনের ক্রিয়া বুঝিলেই দুগ্ধের দধিতে পরিণতি বুঝা যাইবে।

ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। দধিবীজ স্থান বিশেষে 'সাজ,' 'দম্বল' † প্রভৃতি নামে প্রচলিত। সাজর পরিবর্ত্তে তেঁতুল, লেবু প্রভৃতির অম্লরস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ স্বাদু দধিবৎ গাঢ় হয় মাত্র। কিন্তু দধির বিশেষ অম্লত্ব তাহাতে অনুভূত হয় না। অতএব দুগ্ধের সহিত যে সাজ যোগ করা যায়, তাহার সহিত দধ্যম্লের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে।

কতখানি দুগ্ধে কতখানি সাজ দিলে স্বাদুদধি উৎপন্ন হইবে, তাহা পরিমাণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে সাজ

* নষ্ট দুগ্ধ সিদ্ধ করিলে যে পিণ্ডাকৃতি অং পাওয়া যায়, তাহার নাম কিলাট। ইহাও ছানা।

† ইহা ইংরাজী casein শব্দ।

* যে বিশেষ অম্ল হেতু দধির অম্লাস্বাদ, সেই অম্লকে দধ্যম্ল বলা গেল।

† 'সাজ' শব্দ বোধ হয়, দধির সজ্জা বা উপকরণ হইতে উৎপন্ন। 'দম্বল' শব্দ, বোধ হয়, দধি অম্ল বা দধ্যম্ল হইতে উৎপন্ন।

যতই অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়, ততই অল্পমাত্রায় দিতে হয়। অল্প মাত্র সাজ যোগে যখন অনেকখানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, তখন সাজের অম্লরস বশতঃ যে উৎপন্ন দধি অম্ল-গুণ বিশিষ্ট হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে তণ্ডুলাদি সুরার উপকরণে কিণ্ব বা সুরাবীজ যোগ করিতে হয়। নতুবা সুরা উৎপন্ন হয় না। একথা সকলেই জানেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সুরা উৎপাদনের নিমিত্ত সুরাবীজের আবশ্যকতা ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন*। সুরাবীজ কি এবং তাহা কিরূপে তণ্ডুলাদিকে সুরাতে পরিণত করে, তাহার বর্ণনা পাইলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা সুরাবীজের আবশ্যকতা বুঝিলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রাভাবে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

দধ্যম্ল কিরূপে উৎপন্ন হয়,তাহা য়ুরোপেও কয়েক বৎসর মাত্র অবধারিত হইয়াছে। দুগ্ধ রাখিয়া দিলে উহা ক্রমশঃ অম্ল হইয়া পড়ে। খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দে এইরূপ বিকৃত দুগ্ধ হইতে প্রথমতঃ শীলে সাহেব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দধ্যম্লকে পৃথক্ করেন। তদবধি অনেক রসায়নবিদ্ পণ্ডিত দধ্যম্ল উৎপাদনের কারণ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফরাসী পণ্ডিত পাস্তুর সাহেব দৃঢ় অধ্যবসায় গুণে সুরাবীজের প্রকৃতি নির্ণয় করেন। তদনন্তর তিনিই দধিবীজের স্বরূপ ও ক্রিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুরা সম্বন্ধে কিণ্ব যেমন, দধ্যম্ল সম্বন্ধে দধিবীজও তেমনই। প্রস্তুত তণ্ডুলাদিতে অল্পমাত্র কিণ্ব সংযোগে সমুদায় তণ্ডুলের বিকৃতি ঘটে, অল্পমাত্র দধিবীজ সংযোগে অনেকখানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। সুরাবীজ ও দধিবীজ এমন কি পদার্থ, যাহার অত্যল্প শক্তি দ্বারা প্রভূত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। ইক্ষু খর্জ্জুর তাল প্রভৃতির মিষ্ট রস রাখিয়া দিলে উষ্ণতানুসারে অল্পাধিক সময় মধ্যে মিষ্টত্বের পরিবর্ত্তে ঐ রসে অম্লত্ব * অনুভূত হয়, রসের উপরিভাগে ফেণা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সঙ্গে ফুট্ ফুট্ শব্দ করিয়া বুদ্ বুদ্ উঠিতে থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ 'গেঁজে' বা 'মেতে' যাওয়া বলে। সাধুভাষায় ইহাকে সন্ধিত বলা যায়। ঐ সকল মিষ্টরস মেতে গাইলে তাহাদের মাদকতা শক্তি জন্মে। অর্থাৎ সেই সকল পদার্থে সুরা উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ধান্য গোধূম প্রভৃতি সন্ধিত করিয়া সুরা, ইক্ষুরস সন্ধিত করিয়া শীধু এবং তাল ও খেজুর রস সন্ধিত করিয়া বারুণী বা তাড়ি করা হয়।

ইক্ষু বা খর্জ্জুর রস পরিষ্কৃত † বোতলে পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া, ফুটাইবার সময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে উক্ত রস বিকৃত হইয়া শুক্তে পরিণত হয় না। তদ্রূপ, মধু ও দুগ্ধ পরিষ্কৃত বোতলে পূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া বোতলের মুখ

* কিণ্ব বা সুরাবীজ অপহরণ করিলে তাহার দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন।

* মধুর রস বিকৃত হইয়া অম্লরস বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শুক্ত বলে। প্রচলিত কথায় ইহাকে সিরকা বলা যায়।

† পরিষ্কৃত অর্থে রাসায়নিক উপায়ে পরিষ্কৃত বুঝিতে হইবে। এরূপে পরিষ্কৃত করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

বন্ধ করিলে, উহারা বিকৃত হয় না। বায়ুর অভাবে যে তাহারা বিকৃত হয় না, তাহা নহে। কেন না বোতলের মুখ কর্ক দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ না করিয়া কার্পাস পিণ্ড দ্বারা বন্ধ করিলেও উহারা সহজে বিকৃত হয় না, অথচ বোতলের মধ্যে বায়ু গমনাগমন বন্ধ হয় না।

খেজুর রস মুখ খোলা পাত্রে কয়েকদিন রাখিয়া দিলে মিষ্ট রসের পরিবর্ত্তে উগ্র শুক্তে পরিণত হয়। পাত্রের তলায় শ্বেত বর্ণের এক প্রকার সামগ্রী সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। সেই সামগ্রীর কিঞ্চিৎ অপর কোন খেজুর, তাল, ইক্ষু প্রভৃতির মিষ্টরসে নিক্ষেপ করিলে উষ্ণতানুসারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রস মাতিয়া উঠে। কয়েক দিবস পরে দেখিলে উহাতে প্রদত্ত শ্বেত পদার্থের পরিমাণাপেক্ষা উক্ত পদার্থ অনেক খানি সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। অতএব ঐ শ্বেত পদার্থই মধুর রসকে সঞ্চিত করে এবং তদ্-ব্যতীত মধুর রস সুরায় পরিণত হয় না।

উক্ত শ্বেত পদার্থের কিঞ্চিৎ লইয়া অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা দেখিলে অতীব ক্ষুদ্র অণ্ডাকার কোষরাশি দেখা যায়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, তিন সহস্র একত্র পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না। নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহাদের প্রত্যেক কোষ একটি উদ্ভিদ্ বিশেষ। ঐ উদ্ভিদ্ কোষ তাল খেজুর প্রভৃতির মধুর রসের সহিত যুক্ত হইলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এই অঙ্কুরও অণ্ডাকার কোষ মাত্র। অনেকগুলি কোষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, অনেকগুলি ৩।৪ টা করিয়া গ্রথিত মালার ন্যায় পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই শ্বেত পদার্থকে ঈষ্ট বলে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে সুরাবীজাণু বলা যাইতে পারে।

সুরাবীজাণু মধুর রসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্বীয় দেহ পুষ্টি করে এবং অল্পকাল মধ্যে অসংখ্য অঙ্কুর প্রসব করে। এই জৈবনিক ক্রিয়া বশতঃ মধুর রসের কিয়দংশ সুরায় পরিণত হয়। অতএব উদ্ভিদ্ বিশেষের জৈবনিক ক্রিয়াই সুরার কারণ, জৈবনিক ক্রিয়ার আরম্ভে সুরা উৎপাদনের আরম্ভ, *তাহার অবসানে সুরা উৎপাদনের অবসান।* সুরাবীজাণুর পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি ব্যতীত সুরা উৎপন্ন হয় না।

এক্ষণে দধ্যম্ল উৎপাদনের কারণ বুঝা সহজ হইবে। বস্তুতঃ, যেমন সুরা, ইক্ষুশর্করার সন্ধান ফল, দধ্যম্ল তেমনই দুগ্ধশর্করার সন্ধান ফল। যেমন উদ্ভিদ বিশেষের জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ ইক্ষু খর্জুর প্রভৃতির মধুর রস সুরাতে পরিণত হয়, তেমনই অন্য এক প্রকার উদ্ভিদের জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ দুগ্ধশর্করা দধ্যম্লতে পরিণত হয়। সুরাবীজাণু চিনিকে সুরা ও অঙ্গারকাম্ল নামক গ্যাসে পরিণত করে*। সুরা, জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, অঙ্গারকাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হওয়াতে সমুদায় রসে অন্তঃক্ষোভ হইতে থাকে। ইহাতেই খেজুর রসের ফেনার উৎপত্তি। এই গ্যাসের বুদ্বুদ্ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ফুটফুট শব্দ উৎপন্ন হয়। দধ্যম্ল উৎপত্তির সময় এতাদৃশ ফেনা বা ফুটফুট উৎপন্ন হয় না, কেন না দুগ্ধশর্করার দধ্যম্লে পরিণত হইবার সময় অঙ্গারকাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয় না।‡

* এই দুইটি ব্যতীত, অন্য দুইটি পদার্থও উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিমাণ নিতান্ত অল্প বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা গেল না।

‡ যেখানেই জৈবনিক ক্রিয়া, সেই খানেই অঙ্গা-

যে উদ্ভিদ কোষাণুর জন্ম ও বৃদ্ধি বশতঃ ইক্ষুশর্করা সুরাতে পরিণত হয়, তদ্দ্বারা দুগ্ধ শর্করা দধ্যম্লে পরিণত হয় না। আর এক প্রকার উদ্ভিদ কোষাণু দধ্যম্লের কারণ। এই উদ্ভিদ্ দুগ্ধের শর্করাকে দধ্যম্লে পরিণত করে। সেই অম্ল যোগ বশতঃ দুগ্ধের কেসিন মৃদুভাবে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক হয়। এইরূপেই দধিতে দুগ্ধের পরিণতি।

দধির জলীয়ভাগ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উহাতে অতীব সূক্ষ্ম গোলাকার বিন্দুর ন্যায় উদ্ভিদ কোষাণু দেখা যায়। অনেকগুলি ১০।১৫ টা করিয়া পুঁতির মালার মত পরস্পর যুক্ত থাকে। সুরাবীজাণু অপেক্ষা দধ্যম্লবীজাণু অনেক ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ চারি পাঁচ শত গুণ বড় করিলেও পেন্‌সিলের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না। যেগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহাদিগকে ভয়ানক বেগে নড়িতে দেখা যায়। *

দধির অম্লত্বের পরিমাণানুসারে দধ্যম্ল-বীজাণুর সংখ্যার তারতম্য লক্ষিত হয়। স্বাদু দধিতে অল্প সংখ্যক, অত্যম্ল দধিতে অসংখ্য দধ্যম্ল বীজাণু দেখা যায়। তিন চারি দিবসের পুরাতন দধির এক বিন্দু জলে কোটি কোটি এই বীজাণু দেখা যায়। এই বীজাণুকে পৃথক্ করিয়া জলহীন করিলে উহার সমষ্টি সুরাবীজের ন্যায় দেখায়। সুরাবীজের ন্যায় উহা তত সাদা নহে।

এই বীজাণু শুষ্ক করিলে কিম্বা জলে ফুটাইলে তাহার জৈবনিক শক্তি খর্ব্ব হয় এবং উহা তখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

যে দ্রব্যে দধ্যম্লবীজ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে সুরাবীজ রোপণ করিলে, সুরাবীজ বর্দ্ধিত ও সুরা উৎপন্ন হয়। সুরাবীজ ও দধ্যম্লবীজ একই চিনির রসে বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কেবল পদার্থের উপাদান ভেদে কোনটিতে বা সুরাবীজ, কোনটিতে বা দধ্যম্লবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

দুগ্ধশর্করা * ও যে সকল পদার্থ সহজে দুগ্ধশর্করায় পরিবর্ত্তিত হয়, তৎসমুদায় সহজে দধ্যম্লে পরিণত হয়। কিন্তু যে সকল শর্করা সহজে সুরাতে পরিণত হয়, তৎসমুদায় সহজে দধ্যম্লে পরিণত হয় না। দুগ্ধশর্করা সহজে সুরাতে পরিণত হয় না, কিন্তু দধ্যম্লে সহজেই পরিণত হয়।

উপরে বলা গিয়াছে যে, দধিবীজ দ্বারা দুগ্ধের শর্করাংশ দধ্যম্লে পরিবর্ত্তিত হয়। সেই অম্লসংযোগে দুগ্ধের কেসিনাংশ দ্রবাবস্থা ত্যাগ করিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। উহা তখন অদ্রবণীয় হওয়াতে দুগ্ধের জলীয়াংশ হইতে পৃথক্ হয়। কিন্তু দধিতে যে অবস্থায় ছানা থাকে, তাহাকে প্রকৃত ছানার অবস্থা বলা যাইতে পারে না। উহা ছানার প্রাথমিক অবস্থা, দধিকে উষ্ণ করিলে তাহা প্রকৃত ছানা রূপে ব্যক্ত হয়। †

রকাম্ল গ্যাসের উৎপত্তি। কি ক্ষুদ্র কোষাণু, কি বৃহৎ তরু, যাবতীয় উদ্ভিদই আমাদের ন্যায় অম্লজনক গ্রহণ এবং অঙ্গারকাম্ল অর্পণ করে। ইহারই নাম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া। এইরূপে উৎপন্ন অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বশতঃ দধিতে অল্প ফেণা দৃষ্ট হয়।

* এই গতি জৈবনিক ক্রিয়ান্তর্গত নহে। জলে সূক্ষ্ম অজীব কণা ভাসমান থাকিলেও তাহার এই প্রকার গতি লক্ষিত হয়। এই প্রকার গতিকে ব্রুনিয় গতি (Brownian movement) বলা যায়।

* এখানে বলা উচিত যে ইক্ষুশর্করা ও দুগ্ধশর্করা, দুইটি পদার্থ এক নহে। উভয়ের মিষ্ট আস্বাদ হইলেও উপাদান পরিমাণের প্রভেদ আছে।

† এই ছানার নাম দই ছানা। উড়িষ্যার দই ছানা বিশেষ প্রচলিত। দধি হইতে ছানা প্রস্তুত করি-

দধ্যম্লবীজাণুর জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা উপযুক্ত সামগ্রীতে রোপিত হইলে ৩৫°শ হইতে ৪০°শ* উষ্ণতায় উহার ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, একই গভীর খাঁটি দুগ্ধ ফুটাইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা গিয়াছিল। তিন অংশে উহা বিভক্ত করিয়া, প্রথম ভাগের উষ্ণতা ৪০°শ, দ্বিতীয় ভাগের উষ্ণতা ৪৮°শ, তৃতীয় ভাগের উষ্ণতা ৫৮°শ করিয়া একই সাজর সমপরিমাণে মিশ্রিত করা গিয়াছিল। ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, প্রথম দুগ্ধ উৎকৃষ্ট স্বাদু দধিতে পরিণত হইয়াছে। তিনটিতেই অল্পমাত্র অম্লরস অনুভূত হয় কিন্তু প্রথমটী এমনি বসিয়া গিয়াছিল যে, পাত্রটী উপুড় করাতেও দধি বিচলিত হয় নাই। ইহা বিলক্ষণ শ্বেত বর্ণ হইয়াছিল, এবং বোধ হয় পেটুক মহাশয়েরা তাহাকে প্রথম শ্রেণীর দধি বলিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পাত্রের দধি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল এবং উহা তাদৃশ কঠিন হয় নাই এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ জলও নিঃসৃত হইয়াছিল। তৃতীয় পাত্রের দধি কিঞ্চিৎ অধিক হরিদ্রাভ হয় এবং তাহাতে জলীয়ভাগও কিঞ্চিৎ অধিক দৃষ্ট হয়।

পুনশ্চ, খাঁটি গব্যদুগ্ধ ফুটাইয়া ৩৫°শ, ৩৮°শ, ৪০°শ ও ৪৫°শ উষ্ণতায় একই সাজর সমপরিমাণ মিশ্রিত করা গিয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ৩৫°শ উষ্ণতায় যে দধি বসান হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং ৪৫°শ উষ্ণতায় দুগ্ধের দধি নিকৃষ্ট হয়।

এই সকল ও অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, দুগ্ধের ৩৫° শ হইতে ৪০° শ উষ্ণতা পর্য্যন্ত থাকিলেই স্বাদু দধি উৎপন্ন হয়। এই সকল পরীক্ষা শীতকালে করা হইয়াছিল এবং দুগ্ধের উষ্ণতা বরাবর ঠিক সমান রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বোধ হয়, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুগ্ধের ৪০°শ উষ্ণতা রাখিলে উৎকৃষ্ট দধি হইতে পারে*। গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা অধিক থাকে, তখন আরও কম উষ্ণতায় দুগ্ধ উত্তম দধিতে পরিণত হইতে পারে।

সাজর পরিমাণ বলা কঠিন। দধ্যম্ল বীজাণুর সংখ্যানুসারে সাজর পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করা কর্ত্তব্য। নানা পরিমাণের অম্ল গুণ বিশিষ্ট সাজ অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দধি পচিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহার অম্লতানুসারে বীজাণুসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ‡

যার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে ছানা কম পাওয়া যায়। কটকের গাভী দুগ্ধের প্রায় প্রতি ৬ সেরে ১ সের ছানা পাওয়া যায়। কিন্তু ১০ সের দুগ্ধের দধি হইতে ১ সের মাত্র ছানা পাইয়াছি। ছানার সহিত ন্যূনাধিক জল মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তজ্জন্য এত প্রভেদ হয় নাই। কলিকাতার বাজারের দুগ্ধে প্রতি ১৭ সের হইতে ৩৬ সেরে ১ সের ছানা পাওয়া গিয়াছে। কেন এত কম, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কটকে গাভী দুগ্ধে সের প্রতি ৩৷৹ হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত মাখন পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতার বাজারের দুগ্ধে নিতান্ত কম। গাভীর ছোট বড় আকার ও আহার ভেদে দুগ্ধের উপাদানের প্রভেদ ঘটে।

* শতাংশিক তাপমান।

* গোয়ালারা ইহা জানে। দধি বসাইবার সময় তাহারা দুগ্ধে সাজ দিয়া হাঁড়িকে নিবন্ত আগুনের নিকট রাখে।

‡ দুই তিন দিবসের পুরাতন দধি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দধ্যম্লবীজাণু ব্যতীত উহাতে অসংখ্য বক্‌তিরি (Bacteria) নামক অপর জাতীয় উদ্ভিদ কোষাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাহাদের অবিশ্রান্ত গতি দেখিলে সহসা কীটাণু বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কোন 'কলারে' ব্রাহ্মণ দধিতে তৎসমুদায় দেখিয়া দধির প্রতি

আর একটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। দুই তিন চারি দিবসের পুরাতন দধিতে অসংখ্য দধ্যম্লবীজাণু দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, উহাতে কখন কখন আর এক প্রকার কোষাণু দৃষ্ট হয়। এ গুলির এই বিচিত্র যে প্রত্যেকের ভিতরে জীবকেন্দ্র (nucleus) দেখা যায়। সাধারণতঃ যে দধ্যম্ল কোষাণু দেখা যায়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তন্মধ্যে জীবকেন্দ্র বা অপর কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরি উক্ত কোষাণু গুলি বড়, কতকটা সুরাবীজাণুর মত দেখায়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, অধিকাংশই মালার আকারে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র দধ্যম্ল বীজাণুর কি সম্পর্ক, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। দুই জাতীয়কে পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ শর্করায় রোপণ করিলে কি ফল হয়, তাহা না জানিলে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে না। *

আর একটী কথা। কখন কখন দধিকে আটাল হইতে দেখা যায়। দধির প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক, এই রূপ বিকৃত দধিকে রুচিপূর্ব্বক আহার করা যায় না। সাজর তারতম্যে দধির এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আর এক প্রকার কোষাণু, দধির এবম্বিধ বিকারের কারণ। এই কোষাণু দুগ্ধ শর্করাকে এইরূপ আটাবৎ পদার্থে পরিণত করে। পাস্তুর সাহেবের মতে ইহা ইক্ষুশর্করাকেও এইরূপ আটা বিশেষে পরিবর্ত্তন করে।

পুরাতন ছানার জলেও বিস্তর দধ্যম্ল কোষাণু দেখা যায়। বস্তুতঃ ছানার জল দিয়া অনায়াসে দধি বসান যাইতে পারে। দধি যোগে দুগ্ধের ছানা প্রস্তুত করিলে দধির দধ্যম্লবীজাণু ছানার জলে যথেষ্ট থাকিয়া যায়। ছানার জলে দুগ্ধ শর্করা বর্ত্তমান। সুতরাং তাহাতে দধ্যম্লবীজাণুর পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি বিলক্ষণ হইতে থাকে।

উপযুক্ত খাদ্য দিয়া বিলাতে সুরাবীজ পৃথগ্‌ভাবে জন্মান হয়। লক্ষাধিক সের সুরাবীজ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া টিনের কৌটায় বিক্রয় হয়। সচরাচর ইহাকে 'রুটী-ওয়ালার' বীজ বা 'ঈষ্ট' বলে। সুরা প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন, পাঁওরুটী ফুলাইবার জন্য সুরাবীজ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে তাড়ীতে ও মদ্য প্রস্তুতকালে ভাটিতে প্রচুর পরিমাণে সুরাবীজ জন্মে। এই সুরাবীজের কোনরূপ ব্যবহার আমাদের দেশে নাই। বৃথা তৎসমুদায় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দধিবীজে কোষাণু গুলি পৃথক্ করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে না কি? আমাদের দেশে দধির যেরূপ ব্যবহার, অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ নাই। সাজর ইতর বিশেষে, উহার অম্লরসের পরিমাণ অনুসারে, ও অপরাপর কোষাণুর ক্রিয়ানুসারে দধির গুণাগুণের প্রভেদ ঘটে। অবিমিশ্র দধ্যম্ল কোষাণু উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বাদু দধি প্রস্তুত করা সহজ হইবার সম্ভাবনা। সুরা-

বীতরাগ হইয়াছেন। উত্তম স্বাদু দধি ২৪ ঘণ্টা পরে দেখিলে তাহাতেও অল্পাধিক বক্‌তিরি দেখা যায়। বাস্তবিক, বকতিরি নিবারণ করা একপ্রকার অসম্ভব।

* রাসায়নিক উপায়ে স্মিজ সাহেব (Schmitz) দধ্যম্লবীজাণুতে জীবকেন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল বড় কোষাণু দধ্যম্লবীজাণুর রূপান্তর হইতে পারে। (See De Bary's comparative morphology and liology of the Fungi.)

পাত্রের তলায়, গায়ে সঞ্চিত হয়, তাহাতেই তাহাকে সহজে পৃথক্ করিয়া জল দিয়া ধৌত ও পরিষ্কৃত করিতে পারা যায়। দধ্যম্লবীজাণু অতিশয় ক্ষুদ্র, ইহাকে পৃথক্ করা তত সহজ নহে। কিন্তু চেষ্টা করিলে অনায়াসে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। এরূপ করিতে পারিলে, দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে উচিত পরিমাণ শুষ্ক দধ্যম্লবীজাণু মিশ্রিত করিয়া সহজে ইচ্ছানুরূপ দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে।

এক্ষণে একটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে। এই সকল সন্ধানবীজের উৎপত্তি কিরূপে? ময়লায় কত প্রকার কীট জন্মে, জান্তব পদার্থ পচিয়া গেলে উহাতে নানাবিধ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হয়। খেজুর রস রাখিয়া দিলে উহা ফেনিল হইয়া উঠে। ইহার কারণ যদ্যপি উদ্ভিদ-কোষাণু হইল, তবে খেজুর রসে উহা কোথা হইতে আইসে? দুগ্ধ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হয় এবং উহাতে অম্লত্ব অনুভূত হয়। মধু রাখিয়া দিলে কিয়ৎদিন পরে উহার অম্লগুণ জন্মে। এ সকল স্থলে কোন কোষাণু বা বিশেষ বীজ রোপিত হয় না, অথচ কিরূপে বিশেষ বিশেষ জীবাণু সকল উৎপন্ন হয়?

এই জটিল প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দিতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে হয়। জীব হইতে জীবোৎপত্তি, না অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি? বহুকালাবধি জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এ প্রশ্ন আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ বিগত খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে অজীব হইতে জীবোৎপত্তি মত বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে স্বেদজ জীব বলিয়া জীবশ্রেণী আছে। কিন্তু বলা বাহুল্য নানাবিধ পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিয়া "জীবাৎ জীবঃ" এই মতটি এক্ষণে পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেছেন। সূক্ষ্মদেহী জীবাণু সকল অনায়াসে বায়ুতে ধূলিবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। দধ্যম্লবীজাণু ও সুরাবীজাণু এইরূপে বায়ুতে ভাসমান আছে। উপযুক্ত সামগ্রীতে পড়িলে তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত মধুর রসপূর্ণ বোতলের মুখ বন্ধ রাখিলে তন্মধ্যস্থিত রস বিকৃত হয় না। তুলাপিণ্ড দ্বারা মুখ বন্ধ করিলে তুলাতে জীবাণু সকল প্রতিরুদ্ধ হয়। চালনি দ্বারা যেমন তুঁষ হইতে তণ্ডুল পৃথক্ করা যায়, তদ্রূপ তুলা, জীবাণুগুলিকে ছাঁকিয়া শুদ্ধ বায়ু বোতলে যাইতে দেয়। এজন্যই মধুর রস বিকৃত হয় না। কিন্তু বোতলে কিম্বা তুলাতে জীবাণু সকল যাহাতে না থাকে তাহা করিয়া লইতে হইবে। এই সকল সূক্ষ্মদেহী জীবাণু বায়ুতে ভাসমান থাকে বলিয়া দুগ্ধ, মধু, খেজুর রস প্রভৃতির শর্করা ঐ সকল বীজাণুর জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ বিকৃত হয়। মৃতদেহ পচিবার কারণও সূক্ষ্মদেহী জীবাণু। মৃতদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ঐ সকল জীবাণু স্বীয় দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করে। ইহাতেই মৃতদেহ অন্যান্য পদার্থে পরিণত হয়। অতএব একদিকে লয়, অন্যদিকে উৎপত্তি; একদিকে প্রাণ বিয়োগ, অন্যদিকে প্রাণ সঞ্চার চলিতে থাকে; এক প্রাণ যায়, অন্য প্রাণ আসে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

দেবস্বপ্ন।

শরতের সায়াহ্নে একদা
'বসে আছি মহানদী তটে,
অস্তমিত রবি করমালা
ঝলকিছে গগনের পটে।
বিম্বিত কমলাবর্ণে মাখা
মহানদী স্বর্ণ নদী প্রায়;
কূলে আঁটা শ্যাম শৈলগুলি
অতি দূরে দূর শোভা পায়।
উর্দ্ধে অধে যেন দুটি নদী
তরল আলোক জলময়,
মাঝে তার শ্যাম শৈল রাজি—
তট প্রায় যেন মনে হয়।
দেখিতে দেখিতে সেই শোভা
নিদ্রাভরে পড়িনু ঢলিয়া;
মনে হল দীপ্ত স্রোতে ভেসে
কোথা যেন যেতেছি চলিয়া
পার হয়ে প্রান্তর ভূধর,
পার হয়ে স্বর্গ স্বর্ণ নদী,
পার হয়ে স্বর্ণ রাজ্য শত,
পার হয়ে স্বর্ণ মহোদধি,
উত্তরিনু আলোক রঞ্জিত
ভূমি শূন্য মহাদেশ কূলে;
দাঁড়াইনু বিস্ময়ে আকুল
মেঘস্তর স্থাপি পাদ মূলে।
সে রাজ্যের তিলমাত্র শোভা
ধরাধামে দেখি নাই কভু,
সঙ্গীত গাহে না কেহ সেথা
সুসঙ্গীতে পূর্ণ দেশ তবু।
নাহি গিরি নাহি তরু লতা
নাহি পাখী নাহি সমীরণ,
শুধু এক তরল আলোকে
ভাসিতেছে সে দিব্য ভুবন।

দাহ শূন্য দীপ্ত আলো রাশি,
অতি স্নিগ্ধ, বাঁধে না নয়ন,
তারি মাঝে নিত্য ফুটে উঠে
নব নব শোভা অগণন।
দাঁড়াইয়া আছি মেঘস্তরে,
ধৌত দেহ সে পুণ্য আলোকে;
নব নব ভাব আসি কত
প্রাণমূলে খেলিছে পুলকে।
হেনকালে আলোক সাগরে
মৃদু মৃদু উঠিল কম্পন,
স্থূল এক জ্যোতির্ম্ময় মেঘ
পুরোভাগে দিল দরশন।
অমনি মধুর-তর গীতি
বিমোহিল শ্রবণযুগল;
অমনি এ স্বার্থপর প্রাণ
বিশ্বপ্রেমে হইল পাগল।
ভাঙ্গি সেই স্থূল জ্যোতিরাশি,
কোলে লয়ে শিশু মনোহর,
শিশু এক বালিকা আসিয়া
দাঁড়াইল ধরি মোর কর।
চিনিয়া সে দেব দেবী ছবি
কাঁদিয়া ধরিনু দগ্ধ বুকে;
ব্যাকুল পরাণে প্রাণ ভরে
চুমিলাম দুটি মুখ সুখে।
কহিলাম, "আমার মতন
আর জন কাঁদে যে ধরায়,
আমা হতে বেশী যার স্নেহ,
প্রাণ যার গড়া মমতায়,
সে যদি আমার মত আজি
এমনি পারিত বুকে নিতে!"
রুদ্ধ কণ্ঠ হইল অমনি
কথাগুলি কহিতে কহিতে।

কহিল বালিকা স্নেহ-ভরে,
"এ নগরে দুঃখ শোক নাই।
এস, মোরা দেখাব নগরী ;
এই পথে চল সবে যাই।
অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমি তার
কিছু দূর হয়ে অগ্রসর,
অন্য এক জ্যোতির্ম্ময় মেঘ
হেরিলাম অতি মনোহর।
দাঁড়ালেন সম্মুখে আসিয়া
ভাঙ্গিয়া জোতির মেঘস্তর,
শিরে রাজ-মুকুট পরিয়া
দেবরূপী পুরুষ প্রবর।
ভক্তি ভরে পদতলে পড়ি
যাচিলাম পুণ্য আশীর্ব্বাদ ;
হাত ধরি তুলিয়া আমারে
কহিলেন "আজি কি আহ্লাদ
"আঁধারে ভারত ছিল ভরা
ব্রহ্ম নাম ছিল লুপ্তপ্রায়'
"নগরে নগরে আজি তথা
নর নারী ব্রহ্মনাম গায়।
"ঋষির তপস্যাক্ষেত্রে আসি
খ্রীষ্ট শিষ্য কত ইংরাজ,
"শিখাইত নর-পূজাবিধি,
স্থাপি সেথা খ্রীষ্টান সমাজ।
"বরং প্রতিমা পূজা ভাল,
নরপূজা মহাপাপময় ;
"সেই পাপ হেরি তিরোহিত
প্রাণ ভরি গাই ব্রহ্মজয়।
"ভারতের অশেষ দুর্গতি
নেহারিয়া ব্যথিত অন্তরে,
"গিয়াছিনু করিতে জ্ঞাপন
সেই কথা ইংরাজ নগরে।
"সাধ ছিল, সেথা হতে ফিরে
স্বদেশের সেবিব চরণ!

"কিন্তু ইচ্ছা বিশ্ব নিয়ন্তার,
সেই দেশে হইল মরণ!
"যে কাজে একেলা ছিনু আমি,
সেই কার্য্য করিতে সাধন,
"—প্রসন্ন ভারত-ভাগ্য বটে—
জনমিল বীর কত জন।"
"হে রাজন কোথা তাঁরা সবে ?
একবার হেরিব নয়নে!
"এ দেশে কি এসেছেন কেহ ?
কিম্বা সবে আছেন জীবনে?"
শুনি কথা কহিল বালিকা
আবার ধরিয়া মোর কর,
"জীবন মরণ কথা আমি
কহিতেছি হও অগ্রসর ;
"ইহপরে প্রভেদ কোথায় ?
আজি কালি একসূত্রে বাঁধা ;
"একি রাজ্যে সবে করি বাস
জন্ম মৃত্যু নয়নের ধাঁধা!
"বিশেষ ব্রহ্মের নামে যারা
সমর্পণ করে মন প্রাণ,
"একি জ্যোতি রাজ্যে তারা সবে
করে বাস, নাহি ব্যবধান।
"ওই হের জ্যোতি লোকে তাঁরে,
যাঁরে মনে করগো জীবিত।"
হেরিলাম দেবেন্দ্র মূরতি
ধ্যানে মগ্ন ; হইনু বিস্মিত!
তার পর আলোক নগরে
ঘুরে সবে করিনু ভ্রমণ ;
বালিকা দেখাল, এক যোগী,
ব্রহ্মানন্দে আনন্দে মগন!
বহুদিন পূর্ব্বে হেরেছিনু,
চিনিলাম কে সে যোগীবর ;
সেই হাসি প্রসন্ন অধরে
এবে বটে অধিক সুন্দর ;

সেই সুগৌরাঙ্গ তনুখানি
জ্যোতি ভরে অধিক উজ্জ্বল,
মধু কণ্ঠে সেই "মা" "মা" ধ্বনি
শুনি কর্ণ হইল শীতল।
বসিলাম তাঁর পদতলে ;
পরশিয়া সে চারু চরণ
কহিলাম, "আজি একবার
তত্ত্বকথা করাও শ্রবণ।"
সুধাস্রোত সুকণ্ঠে ঝরিল,
কহিলেন, "কি শুনিবে আর ?
"হেথা নাই ভেদ কোলাহল
প্রেমে বাঁধা সবি হেথাকার।
"কূট তর্ক কিছু হেথা নাই,
তত্ত্ব-যুদ্ধ সুধুই ভরম ;
"ব্রহ্ম ভক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম সার,
এই নববিধান চরম।"
হেন কালে হেরিনু অদূরে
আরো দুই মূর্ত্তি মনোহর,
জ্ঞানেতে শঙ্কর দুই জন,
দুজনাই দয়ার সাগর।
এক জন ডাকিলেন মোরে
পরিচিত মধুর বচনে ;
ছুটে গিয়ে প্রণামি অমনি
সুধাইনু, "ছিনু কি স্মরণে !"
তপস্যাবিশীর্ণ তাঁর তনু
হেরিলাম জ্ঞানপুষ্ট অতি ;
আছে মাত্র কালীকৃষ্ণ নাম,
দেহ ভরি সুধু খেলে জ্যোতি।
আর জন পারশে তাঁহার ;
পর দুঃখে এখনো বিহ্বল ;
বিধবার দুঃখ-অশ্রুহারে
সুশোভিত চরণ যুগল।
পরশিয়া সে দেব চরণ,
প্রাণ মোর পূরিল উল্লাসে ;
অনিমিক্ রহিনু চাহিয়া,
শিশু দুটি স্থাপি বক্ষ পাশে।
হেরিতে হেরিতে মেঘস্তরে
খেলাইল চারু ইন্দ্রধনু ;
দেখিলাম বিস্মিত নয়নে,
বসিয়া আছেন রামতনু !
জীবনে মরণে নাহি ভেদ,
ভাবিতেছি হইয়া স্তম্ভিত,
অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা মম !
কোথা দেশ আলোক রঞ্জিত ?
শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

স্বর্গীয় মহাত্মা কিশোরীলাল রায়।

"Some mute inglorious Milton here may rest
Some Cromwel guiltless of his country's blood."

সংসার-অটবীর এককোণে নীরবে এক একটী কুসুম ফুটিয়া থাকে, যাহা রাজো-দ্যানে থাকিলে অতুল শোভা বিকীর্ণ করিত, কিন্তু স্থান ও অবস্থা দোষে আপনাতে আপনি লুক্কায়িত, অনাঘ্রাত, অনাদৃত ও অস্পৃষ্ট। স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় জগৎ ! যাহারা শূন্যগর্ভ, গর্ব্ববিস্ফারিত, ও আঢ্য-গুণ-ঘোষণা-তৎপর, তুমি তাহাদের জন্য যশের জয়ঢক্কা নিনাদিত কর, আর যাঁহারা প্রতিভা-পূর্ণ, সচ্চরিত্র, স্বার্থত্যাগী, যশাকাঙ্ক্ষা যাহাদের ধর্ম্মধন বিসর্জ্জনে সমর্থ নয়, আত্মাভিমান, অলীক গর্ব্ব, জাঁকাল বিজ্ঞাপন যাঁহাদের গুণ ঘোষণায় নিযুক্ত হয় না, তাঁহারাই তোমার নিকট তুচ্ছ ও বিড়ম্বিত।

আজি আমি এই শ্রেণীর এক জনের নাম করিব, যাঁহার অন্তর্দ্ধানে সমগ্র উত্তর বঙ্গের সাহিত্য-গগন আজি নিষ্প্রভ, বগুড়া আজি অন্ধকারময়। ইনি রাজা, জমিদার অথবা অসার গবর্ণমেণ্ট-উপাধিধারী নহেন। যে যে গুণ থাকিলে মানব—মানব নামের উপযুক্ত, যে গুণ থাকিলে মানব ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, যে গুণ থাকিলে মানব বিদ্বজ্জন সমাজে সম্মানিত, ইনি সেই সমস্তগুণ সম্পন্ন। কিন্তু দুঃখ এই, জগৎ তাঁহাকে চিনিল না। তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সংবাদ পত্রের প্রশংসা লাভ করিল, কিন্তু সাধারণে তাহার আদর করিল না। এ অধম বঙ্গদেশের কথা কি বলিব, যেখানে কবি শিরোমণি মহাত্মা মধুসূদন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন,আর যে দেশে সচ্চিত্র বিদ্যা-সুন্দর-প্রকাশক মহাপুরুষ মধ্যে গণ্য, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র।

বগুড়ার কবি, দার্শনিক, ভক্ত, সাধক, যোগী কিশোরীলাল আজ ইহলোকে নাই। যাঁহার প্রণীত "Free enquiry after truth" এবং "Essay on Happiness" ইউরোপের মনীষীগণেরও হৃদয় আক-র্ষণ করিয়াছিল, যাঁহার প্রণীত দেবতত্ত্ব গভীর কবিত্ব ও গবেষণা পূর্ণ বলিয়া সুবিখ্যাত, সর্ব্বোপরি যাঁহার প্রণীত মনো-হরশায়ী সঙ্গীত ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন এবং আজও কর্ণে মধুর ধারা বর্ষণ করিতেছে, তিনি আজ নিষ্ঠুর নিয়তির চক্রে অপূর্ণ বয়সে ইহজগৎ হইতে তিরোহিত হইয়া-ছেন। সে সরল, সৌম্য, উদার মূর্ত্তি আর দেখিব না। সে গভীর গবেষণা, সে চিন্তা-শীলতা ও জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য আর ইহলোকে দেখিব না। সে ভক্তি ও সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি আর এজগতে পাইব না।

১২৪৬ সালে কিশোরীলাল বগুড়ার সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা পরম বৈষ্ণব, সুতরাং শৈশব হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিল। শৈশবে পিতৃহীন হওয়াতে তাঁহাদের পৈতৃকসম্পত্তি কতক কতক বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ইঁহার পূর্ণ শিক্ষাও হইতে পারে নাই। কিন্তু সে অভাব তাহার অধ্যয়নশীলতা কর্ত্তৃক দূর হইয়াছিল। তাঁহার "Free en-quiry after Truth" প্রকাশিত হইলে বগুড়ার সেই সময়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া হেডক্লার্কের শূন্য পদ প্রদান করেন, এবং এরূপ আশা দেন যে, কালে তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ পর্য্যন্ত প্রদান করিবেন। কিন্তু সাহিত্য-সেবক, ধর্ম্মপিপাসু কিশোরীলালের কেরাণীগিরি কার্য্য মনঃপূত হইল না, তিনি বলিলেন, আমাকে শিক্ষকতা পদ প্রদান করুন। তদনুসারে উক্ত সাহেব তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একটী শিক্ষকতা কার্য্য প্রদান করেন। পরে কাকিনিয়ার বিদ্যোৎ-সাহী রাজা শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তাঁহার পুত্রের শিক্ষক ও অভিভাবক পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, এবং তথাকার মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ প্রদান করেন। কয়েক বৎ-সর ওখানে থাকিয়া পরে কিশোরীলাল সামান্য পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী আইসেন।

শেষবয়সে কিশোরীবাবু দারিদ্র্যের কঠোর দংষ্ট্রে নিষ্পেষিত হন। তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অকালে মানবলীলা সম্বরণ

করায় এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার উদার প্রশস্ত হৃদয়কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সময়ে সময়ে জগতের অগুণগ্রাহীতা ও সাধুতার অনাদর দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন। যাহারা বোধোদয়ের অর্থপুস্তক ও মানসাঙ্কের সুলভ টীকা প্রণয়ন করে, তাহারা সুখে কাল যাপন করে, আর যাহারা তাঁহার ন্যায় দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীর গবেষণা-পূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারা জগতে অনাদৃত, ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। কি দুঃখের বিষয়! এমন কি, সময়ে সময়ে সংসারের ভাবনায় তাঁহার অধ্যয়ন ও পুস্তক প্রণয়নে পর্য্যন্ত বিঘ্ন হইত। আমরা তাঁহার ক্লেশ ও অশান্তি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। কিন্তু সাধ্য ছিলনা যে সে অভাব দুর করিতে পারি।

তাঁহার সাধু চরিত্র সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিত, তাঁহার বাল্য বন্ধুগণের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কোন দিন তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারেন। তিনি নব্য সম্প্রদায়ের চরিত্রহীনতা ও ঈশ্বর নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। লোকের সহিত অধিক মিশিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু যাঁহারা একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞান, চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও তিনি নিয়মিত ভাবে সংবাদ পত্র গ্রহণ করিতেন। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই তাঁহার ভূয়োদর্শন ছিল।

লেখকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ হইল, তিনি অনেক দিন কিশোরী লালের সহিত গভীর তত্ত্বালাপে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়াছেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সে দিন দুইবার দাস্ত ও বমনের পরই তাঁহার অবসাদ অবস্থা উপস্থিত হইল, সেই সময়ে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে তাঁহার তান্ত্রিক অভিধান প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং এই কয়েকটী সার কথা বলিলেন,—"Monotheism has triumphed but the social problem is yet to be solved." একেশ্বরবাদ জয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু সামাজিক প্রহেলিকার এখনও মীমাংসা হয় নাই। মা জগন্ময়ী এখানে আছেন, এবং আপনি আধ্যাত্মিক ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি এখানে ও সাধু ভ্রাতাগণ পরলোকে আছেন, মা জগন্ময়ী সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। Keshub Babu was a great observer of human nature. কেশব বাবু মানব চরিত্রের গভীর তত্ত্বদর্শী ছিলেন। ইহারা সৎ হরিনামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আপনাকে দেখিলে মা জগন্ময়ীর কথা মনে হয়। তিনিই ভক্ত, যাঁহাকে দেখিলে ভগবানের কথা স্মরণ হয়। আপনার প্রার্থনা অতি সরল ও অকপট।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন, যাহা তিনি তাঁহার ভালবাসার জন্যই বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তদুপযুক্ত নই, এজন্য তাহা লিখিলাম না। পরে তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি হইলে আবার বলিলেন, "মা জগন্ময়ী আমাকে সত্যই আহ্বান করিয়াছেন।" পরে সে কয়েক ঘণ্টা জীবিত ছিলেন, অধিক কথা বলিতে পারেন নাই। একবার বলিয়াছিলেন "To live is to suffer" বাঁচিলেই কষ্ট পাইতে হয়। ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার অবসন্ন দেহ হইতে জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল, অবশেষে হাস্যমুখে তাঁহার অমর অপার্থিব আত্মা দেহরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া অনন্ত

রাজ্যে উড়িয়া গেল, তাঁহার পার্থিব দেহ মুষ্টিমেয় ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। আর আমরা সে পবিত্র আত্মা ইহলোকে দেখিব না। আর মাঘোৎসব সময়ে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্বলিত সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিব না!

কিশোরীলাল শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সহপাঠী ছিলেন। পণ্ডিতবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে নাকি তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সূত্রে বিশ্বাস করেন। দর্শন শাস্ত্রে ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তৎপ্রণীত তান্ত্রিক অভিধান পড়িলেই জানা যাইবে, হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিরূপ পাণ্ডিত্য ছিল। গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে কিশোরী বাবুর স্থান কোথায়? আমি সমালোচক নহি, সুতরাং তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, ঋষি রাজনারায়ণ ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সংমিশ্রণ তাঁহাতে ছিল। এবং তৎপ্রণীত মনোহরশায়ী সঙ্গীত বঙ্গ সাহিত্যে অতুল, এ বিষয়ে তিনি চিরজীবী শম্মার সহিত আসন গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাতে বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিভাব মিশ্রিত, ভাষার লালিত্য সহকারে মাৰ্জ্জিত রুচি সংযোজিত হইয়াছে। যখন তিনি নিজে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া গান করিতেন, সে মধুর শোভা আর বিস্মৃত হইব না।

কিশোরীলাল তাঁহার সংসার-লীলা সমাপন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার কয়েকটী শিশু সন্তান ও বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতৃদ্বয় এবং অসংখ্যবন্ধু তাঁহার জন্য অশ্রু মোচন করিতেছেন। আর আমরা এই ইহকাল ও পরকালের সংযোগ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই ইহকাল ও পরকালের সখা চিরসুহৃদ দয়াময় তাঁহার সংসার তাপে তপ্ত আত্মাকে বিমল শান্তি ও অমৃত প্রদানে সুখী করুন।*

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত।

অদৃষ্ট। (৮)

এই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে—আকাশের গ্রহ নক্ষত্র হইতে মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত অল্লাধিক পরিমাণে সকলেরই এই শক্তি আছে। পদার্থ মাত্রই এই শক্তির অধীন, এবং এই শক্তির বলেই এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের যোগ ও বিয়োগ ঘটিতেছে। আমাদের শক্তি আমরা যেমন অনুভব করি, সেই সঙ্গে আমাদের উপর বহুদূরস্থিত গগন-বিহারী গ্রহ নক্ষত্রগণেরও যে একটী শক্তি আছে, তাহা আমরা

* নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট এই মহাত্মা সুপরিচিত। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ পবিত্র প্রবন্ধ সময়ে সময়ে নব্যভারতের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এক দিকে প্রতিভা, আর এক দিকে পাণ্ডিত্য, এক দিকে গাম্ভীর্য্য, আর এক দিকে চিন্তাশীলতা,—এক দিকে ভক্তিবিশ্বাস, আর এক দিকে সচ্চরিত্রতার সমাবেশে এই মহাত্মা উত্তর বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বগুড়া তাঁহার শোকে কাতর, আমরাও সেই শোকোচ্ছ্বাসে একবিন্দু তপ্ত অশ্রু মিশাইতেছি। বিধাতা এই মহাত্মার অমরাত্মার কল্যাণ করুন। ন, স।

চেষ্টা করিলেই অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার উপর সূর্য্যের শক্তি আছে, সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যমার্গে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং পৃথিবীর গতি অনুসারে দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন হইতেছে এবং ঋতু ছয়টী পর পর যাওয়া আসা করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হইতেছে, পৃথিবী বক্ষে তৃণ শস্যাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে বা শুকাইয়া যাইতেছে, বৃহস্পতির সঞ্চার হইলে বারি বর্ষণ হইতেছে। পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত চেতন বা অচেতন পদার্থের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির আধিপত্য থাকিলে মনুষ্যের উপরও তাহাদের আধিপত্য থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের শরীরের উপর চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য আছে, তাহা আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে উপলব্ধি করিয়া থাকি—পক্ষান্তে প্রায় অনেক লোকেরই শরীর অসুস্থ হয়; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ এবং মঙ্গল বুধাদিও গ্রহ—চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা অন্য কোন গ্রহেরই বল কম নয়। আমাদের শরীরের উপর ৯টী গ্রহ এবং ২৭টী নক্ষত্র সকলেরই যে আধিপত্য আছে, জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিলে তাহা জানা যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এখন আর লোকের তত বিশ্বাস নাই, কিন্তু এক দিন ছিল, এক দিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে এ শাস্ত্রের আলোচনা ছিল, কালে উঠিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাও লোপ পাইতে বসিয়াছে, জ্যোতিষের গণনা এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না, আর শতাধিক বৎসর পরে একশত খানা গাছড়া একত্র করিয়া একটী ঔষধ প্রস্তুত করিলে তাহাতে যে একটী রোগ আরোগ্য হয়, ইহাও হয়ত কেহ বিশ্বাস করিবেন না। জ্যোতিষ মতে গণনা এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা, এই দুই বহুকালের দর্শনের ফল—একশত খানা দ্রব্য একত্র করিয়া যে ঔষধী প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ পরীক্ষা করিতে হইয়াছে এবং এক দুই করিয়া এই একশত খানি দ্রব্য পর পর যোগ করিয়া তাহাতে যে রাসায়নিক গুণ হয়, তাহাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই রকম শত শত ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে, বিশেষ বিশেষ একশত খানি দ্রব্য যোগ করিলে যে রোগ বিশেষের এক একটী ঔষধ প্রস্তুত হইবে, এ কথা কে বলিয়া দিল এবং কত দিনেই বা এই পরীক্ষা শেষ হইল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম সময়ের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি নিরূপণ করত তাহাদের বল এবং ফলাফল পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কত কাল ধরিয়া কত লোকের যে জীবন পরীক্ষা করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষ যে সত্য নয়, এ কথা কে বলিতে পারে? ভৃগু, পরাশর, গর্গ, বশিষ্ট প্রভৃতি চিরস্মরণীয় মহর্ষিগণ এবং টলেমি, আরিষ্টটল, বেকন, কেপ্‌লার প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত দার্শনিকগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনে জীবনপাত করিয়া যাহার ফল প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বজন পূজিত, সর্ব্বজন-আদৃত জ্যোতিষ

শাস্ত্রকে এক্ষণে মিথ্যা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি জীবের কথনই কর্ত্তব্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা জ্যোতিষের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে. জ্যোতিষের ফল সমস্তই মিথ্যা নয়, এখনও অনেক মিলে। শত করা যদি দশটা গণনাও মিল হয়, তাহা হইলে সে দশটাই বা মিলে কেন, তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে। দশটা ফল যথন মিলিতেছে, তথন জ্যোতিষের মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু সত্য আছে, জ্যোতিষে যে কিছু সত্য আছে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য না হইলে এখনও লোকে আয়ুর্ব্বেদের উপর দোষারোপ করিতে সাহস করে নাই, দোষ দেয়. চিকিৎসকের অথবা তাহার ব্যবস্থার উপর, কিন্তু দেশের যে প্রকার গতি দাঁড়াইতেছে, তাহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও যে এক দিন উপহাসের সামগ্রী হইবে, শতাধিক দ্রব্য একত্র করিয়া যে একটী ঔষধ প্রস্তুত হয়, এ কথাও অসম্ভব মনে করিয়া এক দিন যে লোকে অবিশ্বাস করিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি অনুসারে মর্ত্ত্যের মনুষ্য-জীবনের গতি নির্ণয় হইতে পারে এ কথা এখনকার দিনে অনেকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু. এক দিন তোমার আমার মত লোকের নয়, বড় ২ লোকের মূল্যবান জীবনের গতি নির্ণয় হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তবে যদি ঠিকুজীকুষ্ঠির ফলাফল মিল না হয়, সে দোষ জ্যোতিষশাস্ত্রের নয়, সে দোষ গণকের অথবা গণনার।

জ্যোতিষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, অদৃষ্ট সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকে না, এবং অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারকেও আর বিবাদ করিতে হয় না; এজন্য জ্যোতিষ সম্বন্ধে আর দুই এক কথা বলিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। জ্যোতিষে আমার জ্ঞান নাই, তবে মোটামুটি দু এক কথা যাহা জানি, তদ্দ্বারা উদাহরণ দিয়া জ্যোতিষ যে উড়াইয়া দেওয়ার সামগ্রী নহে,তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব, উদাহরণ স্থলে আমরা মহা প্রভু চৈতন্য দেবকে আনিতেছি,তাঁহার জন্ম সময় যদিও অনেকের জানা আছে, তত্রাচ তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে চির-প্রচলিত শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

চৌদ্দশত সাত শকে মাস সে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌর চন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
কৃষ্ণ হরি নামে ভবে ভাসে ত্রিভুবন।

চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্য দেবের জন্ম সময়ে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি নিম্নে দেখাইতেছি

উক্ত জন্ম পত্রিকা দৃষ্টে জানা যায়, সিংহ রাশিতে এবং সিংহ লগ্নে মহা প্রভুর জন্ম হইয়াছিল; মঙ্গল ও বৃহস্পতি এক রাশিতে ছিল, এবং সপ্তম স্থানে রবি, শুক্র, বুধ, ও রাহু এই চারি গ্রহের একত্র যোগ হইয়াছিল।

সিংহ রাশিতে জন্ম হইলে জাতক ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, বাগ্মী, তেজস্বী, শ্রুতিধর, রাজদ্বারে পূজনীয়, এবং দেবগুরু পূজানুরক্ত হইয়া থাকেন।

সিংহ লগ্নে জন্ম হইলে জাতক সুবোধ, সাধু, গম্ভীর প্রকৃতি, পর্ব্বত ও বন গমন প্রিয়, দৃঢ় সুহৃৎ, আহ্লাদিত, দুঃখ-সহিষ্ণু, বিখ্যাত এবং সাধুগণ তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতি এক রাশিস্থ হইলে জাতক ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, সাহসী, কার্য্য-ক্ষম ও শাস্ত্রজ্ঞ হয়। যে অবস্থায় সে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সে কীর্ত্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, উচ্চমতিসম্পন্ন, ও ক্ষমতা-শালী হইয়া থাকে—এই দুই গ্রহ পরস্পরের সম সপ্তকে থাকিলেও উক্ত রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। দশরথ তনয় রামচন্দ্রের ও শঙ্করাচার্য্যের মঙ্গল ও বৃহস্পতি সমসপ্তকে ছিল।

রবির সহিত অন্যতিনটী শুভাশুভ গ্রহের যোগ হইলে জাতক খ্যাতাপন্ন ও লোক-পূজিত হয়, এবং ঐ চতুর্গ্রহের মধ্যে শুক্র থাকিলে সে ব্যক্তি নীতিজ্ঞ, পরোপকারী ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

কেন্দ্রে চতুর্গ্রহের যোগ হইলে জাতকের সন্ন্যাস যোগ ঘটে। কেশবচন্দ্র সেনের লগ্নে রবি, বুধ, শুক্র ও শনি ছিল।

লগ্ন ও লগ্ন হইতে সপ্তম, এ দুইটীই কেন্দ্রস্থান।

এক্ষণে পাঠক, উপরে যে সকল ফলের কথা বলিলাম, মহা প্রভুর জীবনে সে সকল ফল ফলিয়াছিল কি না, মিলাইয়া দেখিবেন, এবং সেই সঙ্গে কেশব বাবুর লগ্নে রবির সহিত অন্য তিন গ্রহের যোগ হওয়ায় ও সেই তিন গ্রহের মধ্যে শুক্র থাকায় তিনি কি প্রকার ধার্ম্মিক, খ্যাতাপন্ন ও লোক-পূজিত হইয়া ছিলেন, তাহাও বিচার করিবেন।

সপ্তম পত্নি স্থান—সপ্তমে রবি থাকিলে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী দুর্ভাগা হয়; এবং সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে স্ত্রীর নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয় হইতে হয়। মহাপ্রভুর সপ্তম স্থানে রবি এবং রাম চন্দ্রের সপ্তমে মঙ্গল ছিল। বলা বাহুল্য যে, মহা প্রভুর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়, অপরা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে পতি সহবাস-জনিত সুখ সম্ভোগ কখন ঘটে নাই, এবং রাম চন্দ্রকে সীতার জন্য সন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল।

সপ্তম গ্রহাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থিতি করিলে এবং তাহার প্রতি শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, স্ত্রী পতিব্রতা হয়।

"কলত্রাধিপতৌ কেন্দ্রে শুভগ্রহ নিরীক্ষিতে গুরুযুক্তে
কলত্রেবা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।" সর্ব্বার্থচিন্তামণি

মহা প্রভুর এবং রামচন্দ্রের সপ্তমাধিপতি শনি ও চতুর্থ স্থান কেন্দ্রে ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং সীতা উভয়েই পতিব্রতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

লগ্নাধিপতি দশমে এবং দশমাধিপতি শুভ গ্রহ যুক্ত হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে কর্ম্ম যোগ হয়, কেশব চন্দ্র সেনের এই যোগ ঘটিয়াছিল।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের উপর গ্রহগণ যে কি প্রকার আধি-পত্য করিতেছে, তাহা এই দৃষ্টান্ত কয়টীর

দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। নিমাই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন শুনিয়া, এক দিকে তাঁহার মা আসিয়া নিমাইয়ের দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথা বলিলেন, কত মতে বুঝাইলেন, একা ঘরে এই শেষ দশায় তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, অন্য দিকে যুবতী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দুটী বাহু দ্বারা নিমাইয়ের গলদেশ বেষ্টন করিয়া চক্ষের জলে তাঁর বক্ষ স্থল ভাসাইয়া দিলেন, তাঁর প্রাণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইবে, নিমাইকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; নিমাইয়ের মুখে কথা নাই, তাঁর কেন্দ্রে চতুর্গ্রহের যোগ হইয়াছিল, একটী গ্রহের বল অতিক্রম করিবার মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, তাতে চারিটী গ্রহ—রবি, শুক্র, বুধ ও রাহু কেন্দ্রে বসিয়া নিমাইকে টানিতেছিল, তিনি স্নেহের ডোর ছিঁড়িয়া প্রকৃত ডোর-কৌপিন পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রাবণ ছদ্মবেশে আসিয়া সীতাকে হরণ করিল। রামচন্দ্র কতই না মনোবেদনা সহ্য করিয়াছিলেন; রাবণকে বধ করতঃ সীতাকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী আনিলেন, ইচ্ছা, সীতার সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন, কিন্তু তাঁর সপ্তম গৃহে রবি থাকায় স্ত্রী সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিল না, এজন্য লোকের কথায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া সীতাকে বনে দিলেন। সীতার দেহ মন যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল, তাহা রামচন্দ্র জানিতেন, এজন্য অকারণে সীতাকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বনে দিয়া রামচন্দ্রের মনস্তাপের সীমা ছিল না।

শুভাশুভ গ্রহের বলে এবং মহাপ্রভু ও রামচন্দ্রের উপর সেই সকল গ্রহের যে আধিপত্য ছিল, তাহারই ফলে যদি তাঁহাদের একজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ও অপরে স্ত্রীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের বিবাদ এই খানেই শেষ হয়। মহাপ্রভু এবং রামচন্দ্র উভয়েই যে প্রকার করুণ-হৃদয় ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মা'র বা স্ত্রীর একফোটা চক্ষের জল শত পুরুষকারের বল হইতেও যে অধিক ক্ষমতা ধরিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র যখন প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণকে কাঁদাইয়া সীতাকে বনে পাঠাইয়া দেন, তখন তাঁর প্রাণও কাঁদিয়াছিল। তুমি যাহাকে পুরুষকার বল, সেই মহাপুরুষ আসিয়া রামচন্দ্রকেও নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সপ্তমস্থ মঙ্গলেরই জয় হইয়াছিল। পুরুষকার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যদি নিয়তির লিখন অন্যথা করিতে না পারিয়া থাকেন, তাঁর পুরুষার্থ যদি মঙ্গল গ্রহের নিকট পরাভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমি কে?

সকল গ্রহেরই নির্দ্দিষ্ট গতি আছে এবং গ্রহগণ মানব জীবনের উপর যে আধিপত্য করেন, তাহারও নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। এই আধিপত্য করার নাম ভোগ এবং যে গ্রহ যতদিন আধিপত্য করেন, তাহার নাম দশা। এক গ্রহের ভোগাধিকারের মধ্যে অন্য গ্রহের উদয় হইলে, রবির আধিপত্য কালে মঙ্গলের ভোগ আরম্ভ হইলে, তাহাকে মঙ্গলের অন্তর্দশা বলে এবং এক গ্রহের অন্তর্দশায় অন্য গ্রহ উপস্থিত হইলে, যথা রবির দশায় এবং মঙ্গলের অন্তর্দশায় বুধ দেখা দিলে, তাহাকে বুধের প্রত্যন্তর দশা বলে। কিন্তু

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া কোন্ গ্রহের কতদশা, কত অন্তর্দশা এবং কত প্রত্যন্তর্দশা, তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট গতিতে এক রাশির পর অন্য রাশিতে উদয় হইতেছে। সওয়া দুই নক্ষত্র এক একটী রাশি কল্পনা করিয়া ২৭ নক্ষত্রকে মেষ বৃষাদি বারটী রাশিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক রাশি হইতে জাতকের এক প্রকার ভাবের বিচার হইয়া থাকে; প্রথম রাশি হইতে তনুভাব অর্থাৎ জাতকের আকৃতি রূপ, বর্ণ, শারীরিক বল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি, দ্বিতীয় রাশি হইতে ধন, তৃতীয় রাশি হইতে সহোদর, এইরূপ পর ২ বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়, এই দ্বাদশ ভাবের বিচার দ্বাদশ রাশি হইতে করা যায়। গ্রহগণই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে; শুভাশুভ গ্রহের গতি এবং স্থিতি অনুসারে মনুষ্য জীবনে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হইতেছে।

শুভ বা অশুভ ভাবের রাশিতে শুভাশুভ গ্রহের উদয় হইলে, কি শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, ফল বেশী কম হয় এবং কখন কোন ফল এক কালে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই জ্যোতিষের মূল সূত্র। এই সূত্র অবলম্বন করতঃ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন এবং গ্রহের দশা ধরিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তাহার নিজের এবং পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের কোন্ দিন কি ঘটিবে, কে কবে জন্মিবে, কে মরিবে, কে কবে কি কাজ করিবে, সে কাজের কি ফল হইবে এবং কোন্ ফল কত দিন স্থায়ী থাকিবে, কে ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক হইবে, আকৃতি প্রকৃতি কাহার কি রকম হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া থাকেন। আজ কাল সকলের কোষ্ঠীর সকল ফল সত্য হয় না, আমি স্বীকার করি; কিন্তু জ্যোতিষের চর্চ্চা বহুকাল হইল লোপ হইয়াছে, এ অবস্থায় অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আজ কালের পণ্ডিতদের গণনা বা বিচার ভুল হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু শতকরা দশটা ফল মিলিলেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, জ্যোতিষে অবশ্যই কিছু না কিছু সত্য আছে। কতক ফল যখন মিলিতেছে, এবং বাকী ফলও মিলিবে বলিয়া জ্যোতিষ যখন এতদূর স্পর্দ্ধা করিতেছে, তখন তোমার আমার কোষ্ঠীতে দুই পাঁচটা ভুল বাহির হইয়াছে বলিয়া এত দিনের পুরাতন শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া এক বারে উড়াইয়া দিতে পার না।

জ্যোতিষ সত্য হইলে এবং উপরে আমরা যে সকল ফলের কথা বলিলাম, জ্যোতিষের গণনায় তাহা নির্ণয় হইলে, আমাদের পুরুষকার বা স্বাধীনতা কোথায় থাকে? একজনের কোষ্ঠী দৃষ্টে যদি তাহার পিতা পুত্র, শত্রু মিত্র, এবং ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের জীবন-গতি স্থির করা যায়, তাহা হইলে ত আমরা আমাদের পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী পুরুষের সহিত শত্রু মিত্রের সঙ্গে এক শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছি। ছায়াবাজীর পুতুলের ন্যায় আমরা গ্রহ নক্ষত্রাদির দ্বারা প্রতি পদে চালিত হইতেছি। শুভ গ্রহের ফলে সুখ এবং অশুভ গ্রহের ফলে দুঃখভোগ করিতেছি।

মানুষ যে লগ্নে জন্মাইতেছে এবং যাহার গ্রহ যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, সে

তদনুরূপ ফল ভোগ করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ জগতের সমস্ত কার্য্যই এক নৈসর্গিক নিয়মের অধীনে সম্পন্ন হইতেছে। গ্রহগণ স্থির গম্ভীর ভাবে রাশি চক্র পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহাদের সঞ্চার অনুসারে, কোথাও সুবৃষ্টি হওয়ায়, লোকে সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কোথাও অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি জন্য ক্লেশের এক শেষ হইতেছে। কোথাও ঝড় হইয়া গ্রাম নগর এক কালে উচ্ছন্ন যাইতেছে। গ্রহের ফলে মানুষও কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুস্থ, কেহ কঠিন রোগগ্রস্ত, কেহ খঞ্জ, কেহ কুব্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক আমরা যে সকল দুঃখভোগ করি, তাহার এক মাত্র কারণ কুগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ। ঈশ্বর কোন দেশের জন্য অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ব্যবস্থা করেন না, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে ক্লেশ দেওয়ার জন্য ঈশ্বর কাহাকেও বিকলাঙ্গ করিয়া সংসারে পাঠান না; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির জন্য তাঁর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই! গ্রহদোষে আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে কেহ কেহ দৈব ক্রিয়া করিতে বলেন। দৈব ক্রিয়া অর্থে শান্তি স্বস্ত্যয়ন অথবা গ্রহ দেবতার পূজা। তাঁহাদের মতে কোন গ্রহ দেবতা কুপিত হইয়া থাকিলে দৈবক্রিয়া দ্বারা যদি তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে। আজ যদি তোমাকে বাঘে কামড়াইত, তৎপরিবর্ত্তে তোমাকে বিড়াল আঁচড়াইতে পারে—কোন গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেহ আছেন কি না, জানি না, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, থাকি মর্ত্ত্যলোকে, আমাদের উপর তাঁহারা রুষ্ট হইবেন কেন, তাহাও বুঝি না। এক খানা শাড়ী বা দু' কাহন কড়ি উৎসর্গ করিয়া স্তব পাঠ করিলে তাঁহারা তুষ্ট হন কি না, তাহাও বলিতে পারি না, তবে শুনিতে পাই, সিদ্ধির ঝুলি হিন্দু শাস্ত্রে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আছে, এবং রাম বাবুর ছেলেটীর কোষ্ঠীর ফলে এই মাসে তাহার অপাঘাত মৃত্যু ছিল, কিন্তু গ্রহের শান্তি করায় ছেলেটী রক্ষা পাইয়াছে। গণিত শাস্ত্রানুসারে চারিকে চারি দিয়া গুণ করিলে ১৬ হয়, ১৫ হয় না, বা ১৭ হয় না। জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, এবং জ্যোতিষের গণনা অনুসারে আজ যদি তোমাকে বাঘে কামড়ায় বা তোমার অপাঘাত মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমাকে কখন বিড়ালে আঁচড়াইবে না বা তোমার অপাঘাত মৃত্যু কখন নিবারণ হইবে না, নিবারণ হইলে হয় বলিব, তোমার অদৃষ্টে বিড়ালে আঁচড়ানই ছিল, বাঘে কামড়ান বা অপঘাত মৃত্যু যাহা গণনা হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা; না হয় বলিব, জ্যোতিষ মিথ্যা, জ্যোতিষের ফল মিথ্যা—জ্যোতিষের গণনা মিথ্যা। আমাদের বিশ্বাস, জ্যোতিষ কখনও মিথ্যা নয়, তবে গণনা ভুল হইতে পারে, লগ্নের সময় ঠিক হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে যে দিন যে কাজ করিবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ফল পর্য্যন্ত গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে। গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেহ থাকুন, বা না থাকুন, যদি কেহ কোন দিন তাহাদের পূজা করেন, গণনা দ্বারা তাহা ঠিক হইবে, এবং পূজার পর যে জন্য যে ফলই হউক, তাহাও গণনার দ্বারা জানা যাইবে—তাহা হইলে তোমাকে বাঘে কামড়াইত, পূজার

ফলে বিড়ালে আচড়াইল, এ কথা আর বলিতে পার না। পূজার পর দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া যদি বলিয়া দিতেন, কাহার অদৃষ্টে কি ছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়ার জন্যই বা কি হইল, তাহা হইলে আমাদের কোন কথা ছিল না, নচেৎ কেবল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের কথায় জ্যোতিষের ফল কমাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফল বিশ্বাস করিতে পারি না।

এক অদৃষ্টের কথায় আমরা অনেক কথা বলিলাম, অপ্রাসঙ্গিক কথাও অনেক বলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। শেষ কথা আমাদের মনে হয়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবনের সমস্ত ঘটনাই যেন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ঘটিতেছে—কোন্ লগ্নে জন্ম হইলে, এবং জন্ম কালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে থাকিলে কি ফল হয়, তাহা যেন দুশ্ছেদ্য নিয়ম সূত্রে বাঁধা আছে। সেই নিয়ম অনুসারে মানুষ আপন আপন লগ্ন এবং গ্রহের বল অনুসারে ফল ভোগ করিতেছে। এক জন বিকলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, তাহার সে দুর্দ্দশা কেন হইল, তাহা তুমি তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিতে না পারিয়া, জাতক তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে খঞ্জ বা কুব্জ হইয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মফল বিশ্বাস করিতে আমাদের যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আমাদের নাই—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে আমরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা আমাদের অনুমান ভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ বিষয়ে আমাদের কিছুই নাই; পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই, তৃণ গুচ্ছ হইতে তোমার আমার সকলের উপরই গ্রহ নক্ষত্রের বল আছে এবং সেই অনুসারে কার্য্য হইতেছে। ছায়াযুক্তস্থানে বীজ রোপণ করিলে সে স্থানে সূর্য্যের দৃষ্টি নাই বলিয়া সে বীজ হইতে কখন সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে জরায়ুস্থিত শিশুর প্রতি গ্রহ বিশেষের দৃষ্টি না থাকিলে সে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে অসম্পূর্ণ হইবে, ইহা কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থায় অনুমানের উপর নির্ভর করত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে তুমি অন্ধ হইয়াছ, না বলিয়া, যখন মাতৃগর্ভে তোমার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎকালে তোমার চক্ষুর উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি না পড়ায় অথবা অশুভ গ্রহের দৃষ্টি পড়ায়, যে কারণেই হউক, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলে, বোধ হয় পাঠক আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। জ্যোতিষের ফল যে ভাবে স্থির করা হয়, তাহাতে মানব প্রকৃতির সহিত গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধ বিচার করিয়া কর্ম্ম ফল অপেক্ষা জ্যোতিষের ফলই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল অনুসারে ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ বা কষ্ট দিতেছেন বলিলে, তাঁহাকে নির্গুণ না বলিয়া সগুণ বলিতে হয় এবং তাঁহার দেবত্বের ও ঐশিক ভাবেরও যেন লাঘব করা হয়, পক্ষান্তরে জ্যোতিষের ফল বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে যে ভাবেই কেন ভাব না, তাহাতে কিছুই বোধ হয় না।

অদৃষ্টের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদের এই মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নহে—তাঁর ব্যবস্থা এক; অনাদিকাল হইতে তাঁর স্নেহ ব্যবস্থানুসারে

এক নিয়মে, এক ভাবে কার্য্য হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে দেশের ভাগ্যে যাহা হইবার, এবং যে লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার, তাহাই হইতেছে, তাহাই ঘটিতেছে।

গ্রহগণ কর্ত্তৃক আমরা চালিত হইতেছি, একথা বলিলে কোন কার্য্যের উপরই আর আমাদের দায়িত্ব থাকে না, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের পাপ পুণ্যে বা দেশ বিদেশের উন্নতি পতনে জগতের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। এজগতে ভাল লোক জন্মাইতেছে, এবং তুমি যাহাদের মন্দ লোক বল, তাহারাও জন্ম গ্রহণ করিতেছে। ভাল কাজের ফল ভাল হইতেছে এবং অনেক মন্দ কাজের ফলও ভাল দেখা যাইতেছে; ভাল এবং মন্দ কাজ গড় করিয়া দেখিলে জগতের মঙ্গলই সাধন হইতেছে—মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গলময় ইচ্ছা বুঝিতে পারি, তোমার আমার সে ক্ষমতা নাই। সমাপ্ত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

যা ভাবে যা খোঁজে লোকে, আশায় চিন্তায় শোকে,
সুখে হর্ষে পূর্ণ প্রীতি, পায় তা সবাই।
আমারি অদৃষ্ট পোড়া, ছাই ভস্ম আগা-গোড়া
ছত্রভঙ্গ এ জীবনে মেলে না তাহাই।

২

বজ্রনাদ কড় কড়, ঝঞ্ঝাবাত মহা ঝড়,
রৌদ্র বৃষ্টি শিরে চির রহে না কাহার—
অভিশপ্ত-অভিশাপ, মহাপাপী-মহাপাপ,
লক্ লক্ হুতাশন, কলঙ্কের ভার।

৩

বিধবা হৃদয় বাঁধে, পুত্র মুখ চেয়ে কাঁদে,
য বেনাক চিরদিন এমনি কখন—
নিত্য মাগে পদ-ধূলি, নিত্য দেয় পুষ্পাঞ্জলী
দেবতা-চরণে আঁকে সুখের স্বপন।

৪

বন্ধুহীন গৃহহীন, উন্মত্ত উদাসীন
অন্ন কষ্ট চিরদিন—কিছু নাই নাই—
পায় অন্ন-পূর্ণ গেহ, অযাচিত প্রীতি স্নেহ,
অনন্ত ধরায় সেও দাঁড়াবার ঠাঁই।

আমারি অদৃষ্ট মন্দ মেলেনাক সে আনন্দ,
প্রলয় গর্জ্জিছে যেন প্রাণে নিরন্তর!
উন্মত্ত বাসনা-স্রোত সদা বহে ওতপ্রোত,
সপ্ত সিন্ধু উথলায় হৃদে ভয়ঙ্কর।

৬

কিছুতে মেটেনা সুখ, কিছুতে ভরে না বুক,
কি অশান্তি, কি অসুখ, একিরে বালাই।
নিত্য প্রাণে যোঝাযুঝি, ভাবে আঁচে বোঝাবুঝি
ভাবনা-উজান-স্রোতে ভেসে চলে যাই।

৭

পূরিল না তবু আশ মিটিল না সে পিয়াস
শুধু পথ-প্রতীক্ষায় প্রভাত জীবন।
শুধু চিন্তা, শুধু শ্রম, অযতন প্রাণপণ,
শুধু কাঁদা, শুধু চাওয়া, সজল নয়ন।

৮

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষযুগ পায় পায়,
বিফল বাসনা লয়ে, কাটে বিভাবরী,
অঞ্চলে মুছিয়া জল আজো বুকে ধরি বল,
সুমঙ্গলে অমঙ্গল আশঙ্কায় মরি।

পরিপূর্ণ পরিষ্কার কোথা প্রেম-পারাবার
হৃদয়-দেবতা কোথা দাও দরশন!
জীবনে মরণাধিক, তবু আঁখি অনিমিক
হুহু করে প্রাণ মন মানে না বারণ।
পাষাণে বেঁধেছি বুক— লুকাইব পাপ মুখ;
এখনো শুনিতে শেষ রয়েছে এ প্রাণ।
পাব কি না পাব দেখা, সে মোর অদৃষ্ট-লেখা,
আত্ম হত্যা মহাপাপে কর পরিত্রাণ।

শ্রীচুণিলাল গুপ্ত।

মানব-দেবতা বা রামমোহন।*

যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে পৃথিবীর দেশ ও সমাজের দূষিত বায়ু আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন তন্মধ্যে একজন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ প্রধানতঃ তিন ব্যক্তি—আমেরিকার থিওডোর পার্কার, ইতালীর ম্যাট্সিনি এবং ভারতের রামমোহন। ইঁহারা তিনজনই মানবদেহে ঐশী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনজন পৃথিবীর তিন প্রধান ভূভাগে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজের উদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনের অসাধারণত্বের কথা ভাবিলে আমরা স্তম্ভিত হই, ইঁহাদের মহত্ত্ব স্মরণ করিলে মোহিত হই। ইঁহারা তিন জনই মানব-দেবতা।

সৃষ্টির প্রতি বস্তুতেই বিশেষত্ব বিদ্যমান। আপন বিশেষত্বে প্রতি বস্তুই সর্ব্ব প্রধান। প্রতি মানুষ আপন বিশেষত্বে প্রধান, ইহা চিন্তার এক দিক্, সৃষ্টির এক বিভাগ। আর এক বিভাগ আরও মনোরম, আরও সুন্দর। সে বিভাগের বিশেষত্বে আবার অসাধারণত্ব আছে। পৃথিবীর সমস্ত বিশেষত্ব সেখানে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ঘনীভূত। পৃথিবীর সকল বর্ণ যেমন রামধনুতে প্রতিফলিত, পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব, সেইরূপ, সেই স্থলে প্রতিবিম্বিত। সে কিরূপ কথা, বলিতেছি।

পৃথিবীতে বড় কে, ছোট কে? মহৎ কে, সামান্যই বা কে? নিজ অনুভূতির আদর্শানুসারে মানুষ কাহাকেও বড় বা মহৎ, কাহাকেও ছোট বা সামান্য বলিয়া অভিহিত করে; প্রকৃতপক্ষে বড় ছোট বিচারের আর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-যন্ত্র নাই। দেখিতে পাই, সংসারে কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ ভক্ত, কেহ বা সংসারী। ইহার মধ্যে কে বড়, কে ছোট? প্রতিভা বা বুদ্ধি, মনোবল বা শারীর বল, ইহার মধ্যে কে বড়, কে বা সামান্য? যাহার আদর্শ যেরূপ, সে তাহাকেই আদর করে; তাহাকেই বড় বলে। প্রকৃতপক্ষে, এই সকলের মধ্যে বড় ছোট, বা সামান্য অসামান্য, এ বিচার চলে না। বিধাতার সৃষ্টিতে সকলেরই প্রয়োজন আছে, সুতরাং প্রয়োজনানুসারে সকলেই আপন আপন বিভাগে বড় বা মহৎ। যত গুণ, যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি—ইহার মধ্যে কেহই কাহার অপেক্ষা হীন নহে; আপন আপন বিভাগে সকলেই মহৎ। রাজা কর্ত্তৃত্বশক্তিতে প্রধান, প্রজা আনুগত্যে

* ২৬শে ফাল্গুন, এই প্রবন্ধটি রামমোহন রায় রবে পঠিত হইয়াছিল।

প্রধান,মন্ত্রী বুদ্ধিবলে প্রধান, সেবক সেবাতে প্রধান। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানী জ্ঞানে, কর্ম্মী কর্ম্মে, বিশ্বাসী ভক্তিতে, কবি কবিত্বে প্রধান। এ এক রাজ্যের কথা। সাধারণতঃ পৃথিবীর সৃষ্ট জীব জন্তু সকলই এইরূপ নানা বিশেষত্বে পূর্ণ। কিন্তু এই সকল বিশেষত্ব, কোন কোন স্থলে আবার ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। দেখা যায়—সকল নদী,সকল উৎস মিলিয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিতেছে। দেখা যায়, জ্ঞান আর প্রেম, বিশ্বাস আর ভক্তি, অধ্যবসায় আর কর্ম্ম, বুদ্ধি আর প্রতিভা, মনোবল বা ইচ্ছাবল—সব যেন একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে; দেখা যায়—কোথাও কোথাও সৃষ্টির সকল বিশেষত্ব একাধারে পরিশোভিত, পৃথিবীর সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য্য একত্র প্রতিফলিত। প্রতি বস্তুর বিশেষত্বে ও বৈচিত্র্যে শোভা আছে, অস্বীকার করি না, কিন্তু সকল বিশেষত্ব, সকল বৈচিত্র্য যখন একত্র সন্নিবিষ্ট, তখনকার শোভা অতুল। পৃথিবীর ঝরণা, উৎস, নদ নদীর শোভা বর্ণনার আয়ত্বাধীন, কিন্তু সেই সকল মিলিয়া যখন মহাসাগরে পরিণত, তখন তাহা বর্ণনা করিবে সাধ্য কার? সে শোভা অতুল,—অকথিত, অজ্ঞানিত, অশেষ, অব্যক্ত।

প্রকৃতিতে যাহা মহাসাগর, মানবে তাহা মহাপুরুষ। সকল বাষ্প, সকল মেঘ এবং সকল নদ নদীর জল মিলিয়া যেমন মহাসাগরের উৎপত্তি, সেইরূপ, সকল মানুষের সকল বিশেষত্ব, সকল মনুষ্যত্ব মিলিয়া মহাপুরুষ। পুরুষকারও স্বীকার করি, অথচ মহাপুরুষবাদও মানি। সকল ফুলের আঘ্রাণ, সৌন্দর্য্য, সুষমা যিনি একত্র সমাবেশ করিতে পারেন, সকল আধারের বিশেষত্ব যিনি আত্মস্থ করিতে পারেন, সকল শক্তি যিনি আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ—তিনি অসাধারণ ব্যক্তি বা মহাপুরুষ। তাহা পারে কে, পারে না বা কে? যে উপেক্ষা করে, সে-ই পারে না; যে যত্নসহকারে গ্রহণ করে, সে-ই পারে। প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য, সকল বিশেষত্ব মানুষের নিকট প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে,—আয়ত্ত বা আত্মস্থ করে না মানুষ কেবল উপেক্ষায়। মানুষের শক্তি সমূহ অনুশীলনে (culture) জাগ্রত হয়; বুদ্ধি বল বা প্রতিভা বল, জ্ঞান বল বা প্রেম বল, মানসিক বল বল, বা শারীরিক বল বল, অনুশীলনে সকলই জাগ্রত হয়। বিনা অনুশীলনে মানুষের অন্তরনিহিত ঘুমন্ত শক্তি জাগে না। যত চর্চ্চা, যত মার্জ্জনা, যত অনুশীলন, ততই শক্তির স্ফূর্ত্তি। এক শক্তি-সাগর হইতে প্রাপ্ত শক্তি সকলেরই একরূপ, অনুশীলনের ন্যূনাধিক্যে মানুষের অসাধারণত্ব,বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত হয়। যাঁহারা সকল শক্তির সম অনুশীলন করিতে পারেন, তাঁহাদের সকল শক্তিই জাগ্রত হয়, অথবা তাঁহারা সকল বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাকেই মহাত্মা পার্কার সমশ্রেণীভূত উন্নতি (simultaneous development) বলেন। হেলায় মানুষ রতন হারায়। প্রত্যহ যে সূর্য্য গগনে উঠে, প্রত্যহ যে ফুল বাগানে ফুটে,—তাহা সকলের ভোগ্য; কিন্তু যে উপেক্ষা করে, তুচ্ছ করে, তাহার নহে। ঐ শোভা দেখিয়া কত লোক স্বর্গে যায়, কিন্তু কত লোক যেমন ছিল,তেমনই থাকে। এরূপ হয় কেবল, অবহেলায়, তাচ্ছল্যে। বিধাতার বিধানের কথা যদি বলিতে চাও, তবে তাহা সকলের পক্ষে

সমান। অঙ্কুরে মানুষের সকল শক্তি সমান। অনুশীলনে কাহারও জাগ্রত, এবং তদভাবে কাহারও সুষুপ্ত। মানুষ,মানুষ হউক,বিধাতার ইচ্ছা; একদিন নিশ্চয় মানুষ মানুষ হইবেও তাঁহারই ইচ্ছায়। এখন যে মানুষ পাপে ডুবিতেছে বা হীন কাজে মজিতেছে, সে কেবল অবহেলায়। অনুশীলনের আয়ত্তাধীন কি নয়, জানি না। অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে যে কি সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝি না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথায় বলে—"গাইতে গাইতে গায়ক, আর বাজাইতে বাজাইতে বাদক।" বাস্তবিক কথাটা ঠিক। যত মস্তিষ্ক চালনা করিবে, ততই বুদ্ধি মার্জ্জিত ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, যত হস্ত পদ চালনা করিবে, তত কার্য্যকরী শক্তি বাড়িবে। বুদ্ধি বা প্রতিভা,জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, প্রেম বা দয়া—এ সকলই অনুশীলনে উপার্জ্জিত হয়। "মানুষ যাহা হইয়াছে, চেষ্টা করিলে মানুষ তাহা হইতে পারে"—এক জন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন। গভীর চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের শক্তিসমূহ সুষুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিচার আজ থাকুক।

মহাপুরুষবাদ, সহজ কথায়, এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এক এক সময়ে দেশের প্রচলিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য—এক এক প্রকার বায়ু সৃজন করে। সেই বায়ুরাশি এক এক স্থানে সঞ্চিত হয়; অথবা এক এক জন আত্মস্থ করেন। সেই বায়ুরাশিতে ডুবিয়া মজিয়া এক এক জন সকলের বিশেষত্বে, অসাধারণত্বে মহাশক্তি, মহাবল লাভ করিয়া ধরায় মস্তক উত্তোলন করেন। তাঁহাদের পরাক্রমে জগৎ কম্পিত, মোহিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহাদের প্রভাবে পৃথিবীর প্রবাহিত বায়ু আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। ইঁহারাই মহাপুরুষ, ইঁহারাই মানব-দেবতা।

সকলের সকল বিশেষত্বে যে মহাপুরুষদিগের জন্ম,সে মহাপুরুষদিগের বিশেষত্ব কি? তাঁহাদিগের ভিতর এমন কি শক্তি দেখা যায়, যাহা আর কোথাও মিলে না? পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব—পুরুষের বীর্য্য, নারীর প্রেম, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, বালকের কোমলত্ব, সব যখন মিলিয়া গিয়াছে,—জ্ঞান প্রেম পুণ্য, যোগভক্তি কর্ম্ম যখন এক স্থানে সম্মিলিত, সত্ত্ব, রজ, তম বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী যখন জীবন-প্রয়াগে সম্মিলিত,তখন কি বিশেষত্বের অভ্যুদয় হইতেছে? বিশেষত্ব—একে তিন, তিনে এক হইয়া এক অদ্বৈত মহাশক্তির উদয়। সেই শক্তিই মানব-দেবত্ব। সেই শক্তিই চরিত্র। সেখানে সাহস, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম মিলিয়া মহা চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে। তাঁহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবী মুষ্টিমেয়, ধরা সেখানে শরার ন্যায়। সে চরিত্র-শক্তির সংস্পর্শে সাধারণ মানুষ আত্মহারা, দিক্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্য-শূন্য। মানব পরিবার সে চরিত্র বলের যেন হাতের ক্রীড়ার বস্তু। সেখানে বক্তৃতা নাই,অথচ আন্দোলন আছে, —সেখানে মানুষকে কেহ চালায় না, অথচ সেই শক্তির অনুসরণ করে; যেন মানুষ আপনভোলা। সিজর, আলেকজেণ্ডার, নেপোলিয়নের দর্প চূর্ণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রের প্রতাপ কখনও খর্ব্ব হয় না। ঈশা মরিয়াও পৃথিবীতে চিরজীবিত,শাক্য নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও চিরসঞ্জীবিত। এই মহাপুরুষ-দিগের আবির্ভাবেই ধরা ধন্য—পৃথিবী পরিত্রাণ পাইয়াছে। চির-নির্ব্বাসিত করিয়া

কি অষ্ট্রীয়া ম্যাট্‌সিনির প্রতাপ খর্ব্ব করিতে পারিয়াছিল? অথবা শক্রতা সাধন করিয়া আমেরিকা পার্কার-শক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল? খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে য়িহুদী জাতির কুসংস্কার, শাক্যের বিরুদ্ধে মারপিশুনের প্রবল আধিপত্য, শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে সংসারাসক্তি, পার্কারের বিরুদ্ধে দাস ব্যবসায়ী দলের চক্রান্ত, ম্যাট-সিনির বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার প্রবল প্রতাপ, এবং রামমোহনের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজের মহাপরাক্রম কি জঘন্য কাজ করে নাই, জানি না; কিন্তু কোথায় সে সকল জঘন্যতা,আর কোথায় ইঁহাদের তেজ, সাহস, বীর্য্য। অগ্নিতে যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইঁহাদের চরিত্র-তেজে, তীব্র আন্দোলন, দারুণ অত্যাচার তেমনই ভস্মীভূত হইয়াছে। জাহাজ যেমন অবিরাম গতিতে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া লক্ষ্য স্থলে চলিয়া যায়, কোন বাধায় ফেরে না,ইঁহারাও তদ্রূপ সকল বাধা, সকল বিপদ অমানুষী ধৈর্য্য সহকারে ভেদ করিয়া লক্ষ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। কাহারও সাধ্য নাই, ইহা-দিগকে থামাইতে পারে। ইঁহারা অধিক কথা বলেন না,তবুও মানুষ মজে; ইঁহারা কাহা-কেও চালাইতে চান না, তবুও মানুষ বশ হয়। এমন বশ হয় যে, দিবালোকে শ্রেণী-বদ্ধ প্রজাপুঞ্জকে বন্দুকের গুলিদ্বারা প্রাণ-নাশ করিয়াও অষ্ট্রিয়া-গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্‌সিনির অনুরক্ত দলকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। যে শক্তিতে এই সকল মহা-পুরুষেরা অনুপ্রাণিত, সে শক্তির তেজে পৃথিবী অবনত-মস্তক। ইঁহারা কামনা-রহিত কামনা-যুক্ত, বাসনা-বিবর্জ্জিত বাসনাযুক্ত। ইঁহারা ফল-শূন্য ফলবাদী, ইঁহারা সংসারশূন্য সংসারী। ইঁহারা ব্যক্তিত্ব মানেন না, সমষ্টি মানেন; ইঁহারা পরিবার ত্যাগ করেন,বিশ্ব-সংসারে ঘর বাঁধেন। ইঁহারা কোনরূপ ফল না পাইয়াও শরীর বিসর্জ্জন দেন, ইঁহারা কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া সকলের দাস হন। সমগ্র পৃথিবী ও মানব-সমাজ তাঁহাদের ভালবাসার জিনিস। তাঁহাদের সংস্পর্শে, তাঁহাদের আদর্শে জগৎ রূপান্তর ধারণ করে। ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রভাবে ধরা পরিবর্ত্তিত হয়,—বায়ুর গতি এবং নদীর স্রোত ফিরে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোক। ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, রামমোহন তদা-নীন্তন কালের সমস্ত বিশেষত্বের, সমস্ত শক্তির রাজা ছিলেন। তিনি পার্থিব জগতের জড়পদার্থের রাজা ছিলেন না, কিন্তু অজেয়, অদম্য, চিন্ময় শক্তিতে রাজা ছিলেন। এমন কোন শক্তি দেখি না, যাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব-মুখী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় উন্নতির যে কথা ভাবি, সে সকলেরই তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুসমাজের সতীদাহ নিবারণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন নিবারণ করিয়া রাজা যে কি অসীম, অজেয়, অদম্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ভাবিলে অবাক্ হই। বুদ্ধি ও প্রতিভা, সাহস ও অধ্যবসায়, জ্ঞান ও প্রেম, ভক্তি ও কর্ম্ম—এ সকলের অনু-শীলন করিয়া তিনি বঙ্গের এবং তৎসহ ভারতের ভাবী উন্নতির সকল উপায় উজ্জ্বল রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন মানব-

পরিবারের উন্নতি এবং একতার উপায় নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি ভাষার উন্নতি এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে মনোসংযোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সেই সময়ের অবস্থার কথা ভাবিলে চক্ষে জল পড়ে, উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গসমাজের তদানীন্তন কালের ধর্ম্ম-শিথিলতা স্মরণ করিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরস-ঘটিত কবিত্বের তখন কত আদর! ব্যভিচার, মদ্যপান তখনকার লোকের অলঙ্কার ছিল, ভাষা যেন বাঙ্গালীর রিপু সেবার সহচর ছিল। বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবপূর্ণ লেখাও তখন আদিরস উদ্গীরণে সহায়তা করিত। আর ধর্ম্মহীনতার কথা কি বলিব—শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল লোক ব্যভিচার ও মদ্যপানে তখন মাতোয়ারা; ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি, পবিত্রতা—তখন কল্পনার জিনিষ ছিল। শুনিয়াছি, তখন এমন লোক বিরল ছিল, যাহার অধীনে বেশ্যা থাকিত না, এবং এমন শিক্ষিত লোক পাওয়া যাইত না, যাহারা মদ্যপান করিত না। ঋষি-তুল্য রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত মদ্যপান করা নিন্দার জিনিষ ছিল না।" রামমোহন এইরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পর হইতে যেন ধীরে ধীরে বাঙ্গালা দেশ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরশমণির সংস্পর্শে মাটী যেমন সোণা হয়, রামমোহন-শক্তির সংস্পর্শে বঙ্গসমাজ ৫০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ যে সমাজের নানা বিভাগের এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলে তিনি। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলেও তিনি। বাঙ্গালা ভাষার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত লেখার উপায় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিলেন;—পদ্যময় বাঙ্গালা ভাষাকে উন্মুক্ত-ক্ষেত্র গদ্যে লইয়া আসিলেন। আর ধর্ম্মের কথা কি বলিব, আজ যে ভারতে এত অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, ইহার মূলেও তিনি। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হও, সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, সকলেই তাঁহার উপাসনার অধিকারী; এ কথা এবং তৎসহ আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ, একথা তিনিই প্রচার করেন। জগতের ভাবী ধর্ম্মকে আবিষ্কার করা, যেমন তেমন কাজ নয়। একেশ্বরবাদ যে জগতের ধর্ম্ম হইবে, কে তাহাতে সন্দেহ করিতে পারে? সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কার ব্যাপারে পথপ্রদর্শকরূপে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে, এ সকল যে আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা আমাদের ধারণা হইত কি না, সন্দেহ। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা আজও এমন মহাপুরুষকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারি নাই। তিনি ভাষা সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ তাঁহার একটু আদর করেন; তিনি রাজনীতি সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ আর একটু আদর করেন; তিনি সমাজসংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু আদর করেন। তিনি ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু সম্মান করেন। কিন্তু ইহা কি তাঁহার প্রকৃত সম্মান? খ্রীষ্ট জীবন ঢালিয়া কোটী জীবনে আধিপত্য করিতেছেন; কই, রামমোহন রায় যাহাদের জন্য জীবন ঢালিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়জনের চরিত্রে তাঁহার শিক্ষা ও জীবনত্যাগের আধিপত্য আছে? খ্রীষ্ট একটি সত্য রক্ষার জন্য জীবন দিয়াছিলেন, আজ দেখিতেছি, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী

কোটি ২ লোক সত্য রক্ষার জন্য জীবন দিতেছেন। প্রকৃত সম্মান, প্রকৃত মহত্বের পূজা এই খানে। খ্রীষ্ট নরসেবায় মাতোয়ারা ছিলেন, আজ দেখিতেছি, নরসেবার জন্য তাঁহার দলের লোক দেশ বিদেশে অকাতরে অম্লানচিত্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। প্রকৃত মহত্বের সম্মান এই খানে। কত জানিত এবং অজানিত, কথিত এবং অকথিত, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী লোক হিংস্র জন্তু সম অসভ্য জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, কে জানে? ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে জল পড়ে। আর মহাত্মা রামমোহন রায়, যিনি এ দেশের জীবন সঞ্চারের জন্য জীবন দিলেন, তাঁহার প্রতিভা বা জ্ঞান, মহত্ব বা চরিত্রের চিন্তা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক, তিনি যে সকল কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহার একটুও অনুকরণ বা অনুসরণ করি না। ধিক্ বাঙ্গালী জাতি, ধিক্ বাঙ্গালী চরিত্র।

আর ব্রাহ্মসমাজকেও ধিক্কার দি, ব্রাহ্মসমাজও এই মহাত্মার প্রকৃত সম্মান সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া এ কথা বলিতেছি না, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মভাব, তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রম, তাঁহার দেশীয় এবং বিদেশীয় শাস্ত্রানুরাগ, তাঁহার সুদূরদর্শিতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নিরপেক্ষ ভাব ও স্বদেশ-সেবা—আমাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এ আক্ষেপ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে মহান্ ঈশ্বরের পূজা হয় সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় জাতিনির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে কই ব্রাহ্মসমাজ ভালবাসিতে পারেন? ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্ব, মতগত কুয়াসায় ডুবিয়া যাইতেছে কেন? তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য সেরূপে খাটিতেন, আমরা সেরূপ খাটিতে পারি কই? তিনি অসাধারণ অধ্যয়ন-পিপাসায় সকল জাতির শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া মানব পরিবারের উদ্ধারের জন্য, কি অমূল্য অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন! ঈশ্বর ও মানবাত্মার সাক্ষাৎ ভাবে যোগ, গুরু নাই, মধ্যবর্ত্তী নাই, এ কথা তিনিই প্রচার করেন। বলেন যে, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মপূজার অধিকারী। সংসারে থাকিয়াও যে ধর্ম্ম সাধন হয়, নূতন ভাবে তিনিই ব্যক্ত করেন। মহাত্মা মোক্ষমুলর প্রভৃতি তাঁহার মতের উপর বর্ত্তমানধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এতদুর সম্মান করি যে, তাঁহার গ্রন্থরাশির পৃষ্ঠাও একবার উলটাইয়া দেখি না; তাঁহার উদার ধর্ম্ম মতের গভীরতা উপলব্ধি করি না। এমনই সম্মান-বোধ, এমনই অনুকরণ পিপাসা! পরম সৌভাগ্যের বিষয় এতকাল পর মহাত্মার নামে এই ক্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাপুরুষের মহত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সভার সভ্যগণকে, এজন্য, অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

কিন্তু যা হউক, তা হউক, একদিন এ দেশ এবং সকল দেশ তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বিধাতার কৃপা ললাটে ধারণ করিয়া একেশ্বরবাদ জগতের সকল স্থানকে জয় করিবার জন্য দূর হইতে দূরান্তর ছুটিতেছে, নিমিষে নিমিষে সহস্র সহস্র নর নারীর মধ্যে

এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করিতেছে। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল বিদ্বেষ ভাবকে পরাজয় করিয়া, এই ধর্ম্ম, আপন মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। দেখিতেছি, দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ইহা বিস্তৃত হইতেছে। বক্তৃতার ধর্ম্ম যখন বিশ্বাসে এবং বিশ্বাসের ধর্ম্ম যখন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মরণের কোল হইতে জাগরিত হইয়া, অসংখ্য মানব প্রাণে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যতদিন এই ধর্ম্ম বক্তৃতার বিষয়, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উপদেশরাশি অবহেলিত; যখন ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে, যখন ধর্ম্মের উপদেশ প্রতিপালিত ও জীবনগত হইবে, তখনই মহাশক্তিতে মানুষ পুনর্জীবিত হইবে, তখন মহাপুরুষের চরিত্র মানব প্রাণে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যখন এই প্রকৃত মহাপুরুষ চরিত্র মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাহ্যাড়ম্বর তিরোহিত হয়; অন্তরের শক্তি জাগরিত হয়, মানুষ দেবত্বে উত্থিত হয়। তখন পিতাপুত্রের সম্মিলন হয়। তখন ভক্তি ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মানুষ জগতের কল্যাণের জন্য অম্লানচিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। প্রকৃত জীবন বিসর্জ্জন; তখন কথায় ব্যক্ত হয় না, কাজে ব্যক্ত; নরসেবা বা দয়া তখন বক্তৃতায় নহে, প্রত্যক্ষে। হায় সে দিন কবে আসিবে, যে দিন কথার স্রোত প্রতিহত হইবে এবং চরিত্রের বলে দিগ্বিজয় হইবে—কবে বক্তৃতা থামিবে এবং প্রকৃত নর সেবারূপ কার্য্যারম্ভ হইবে? যে দিন সেই শুভ মহূর্ত্ত আসিবে, সেই দিন আমরা জীবন্ত রামমোহন রায়কে পুনরুত্থিত দেখিব ও সেই দিন প্রকৃত ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিতে শিখিব। বিধাতা সে দিন আনয়ন করুন।

বিবাহোৎসব।

(প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের শুভবিবাহোপলক্ষে রচিত।)

সখীর গান।

(সম্প্রদানের পূর্ব্বে)

১মা। সুখেতে অবশ প্রাণ,
থামা' থামা' তোরা গান।
দেখ দেখ চেয়ে সখীর মু'পানে
কিবা শরমের ভাণ!

ঠোঁটের হাসিটি—দেখলো চাহিয়া,
আঁচলে চাপিয়া লুকাইতে গিয়া
কেমন পড়িছে ধরা!
মুখ-পানে বালা চায় না চাহিতে,
চপল দিঠিটি চায় লুকাইতে—
কিবা মুখ মন-গড়া!
দেখ গো ওগো দেখ গো!

২য়া। চিকুর জড়ান' ফুলে,
গলে ফুলমালা দুলে।
চিকণ দুকূলে ঢাকা দেহখানি,
ঘোমটা পড়িছে খুলে।

নূপুর বাজিছে পায়,
আঁচল লুটিয়া যায়।
সখীরো-হাসিটি, পারে না সহিতে,
শরমে পলাতে চায়।

ব'লো না গো অত কথা,
এখনি পাইবে ব্যথা।
হাসিতে লাজেতে ফেলিবে কাঁদিয়া,
নুইয়া পড়িবে মাথা।
থাম গো ওগো থাম গো!

৩য়। দেখ বুকে হাত দিয়া—
কাঁপিছে সখীর হিয়া।
বহিলে বায়ুটি কাঁপিলে পাতাটি
উঠে কেন চমকিয়া!

তবে না, শরম-লতা,
ভাবনি তাহার কথা!
দিন যে যাইত হেসে গেয়ে সুধু,
কবে পেলে বুকে ব্যথা?
বল গো ওগো বল গো!

সখার গান।

১ম। কি কুহকী ফুলবাণ,
মধুময় কি সন্ধান!
কে জানে কখন্ মলয় বহিল—
কুয়াসা টুটিল, কুসুম ফুটিল,
বিহগ গাহিল গান।
শিহরিল দেহ, উথলিল স্নেহ,
জাগিল হৃদয়ে কবেকার গেহ,
কবে সেই প্রাণ-দান।
কি কুহকী ফুলবাণ!

২য়। চারিদিকে চায় আকুল হৃদয়,
হাসিতে বাঁশীতে ধরা মধুময়!
কার কথা যেন মনে হয় হয়,
তবুও হয় না মনে!
পথপানে চেয়ে সে যেন এমনি
দিবস গোঁয়ায় পল গণি গণি;
চোখে কত কথা, বুকে কত ব্যথা,
কোলে মালা অযতনে।
তবুও হয় না মনে!

৩য়। এস প্রিয়সখি, তিথি অনুকূল,
আশা পিপাসায় প্রাণে কত ভুল!
কত গাহি গান, কত তুলি ফুল—
মজিয়া তোমার ধ্যানে!
সেই সুখে সাধে, সেই প্রেমে লাজে
দাঁড়াও দাঁড়াও এসে ধরামাঝে!
এস প্রতি পলে, এস প্রতি কাজে,
এস মনে, এস প্রাণে।
ঘুচাও বিষাদ শোক পাপ তাপ,
নর-জীবনের চির অভিশাপ—
তোমার প্রণয়দানে!
এস প্রেমময়ি, এস সুমঙ্গলে,
ডাকিছেন মাতা ল'য়ে দূর্ব্বাদলে,
সখারা ডাকিছে গানে।
এস মনে, এস প্রাণে।

বরের গান।

(সম্প্রদান কালে)

আয় প্রিয়ে আয়!
কত জনমের স্মৃতি আঁখি-কোণে চমকায়!
কত আশা, কি পিপাসা,
কত স্নেহ-ভালবাসা
অধরে না পেয়ে ভাষা হাসি-সনে মিশে যায়!
প্রেম আলিঙ্গন-আশে
বাহু আগুসরি আসে,
লোক-লাজে অভিমানে আধ-পথে থমকায়!
মরমে মরমে খেলা,
শরমে কি হেলা-ফেলা!
গলে যেন বর-মালা দেয় কত অনিচ্ছায়!

কবির গান।

(বাসরে)

তোমরা কে হে—
লভিছ অমর-সুখ এই মর-দেহে!
নয়নে নয়নে হয়
কিবা প্রাণ বিনিময়!
কি মধুর লীলা-ছলা সাধের সন্দেহে!
অনিমিখ আঁখি কাছে,
শত ভয় জেগে আছে!
দুজনে মরিতে চাহ দুজনার স্নেহে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (১)

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণপবিত্র। তবে তাঁহার রাজ্যে এত দুঃখ ও পাপ কেন? ইহা অতি গুরুতর ও গভীর প্রশ্ন। সকল কালে,সকল দেশে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে এই গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। এই সুকঠিন প্রশ্নের সন্তোষপ্রদ উত্তর দান করা সহজ নহে। সহজ না হইলেও যে, ইহার সদুত্তর নাই, এমন নহে। সরল ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। যথাসাধ্য এ বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ যাঁহারা অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদী,—যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও দয়া স্বীকার করিতে চান না, তাঁহাদের যুক্তি একটী একটী করিয়া সমালোচনা করিয়া তৎপরে জগতে দুঃখ ও পাপ সত্ত্বেও কেন আমরা জগতের কর্ত্তাকে দয়াময় বলি, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সংশয়বাদী বলেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময়, এই উভয় লক্ষণসম্পন্ন হন, তবে তাঁহার জগতে কেমন করিয়া দুঃখ যন্ত্রণা সম্ভব হইতে পারে? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং জীবের দুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহার আছে। তিনি দয়াময়; সুতরাং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছাও তাঁহার আছে। যখন শক্তি ও দয়া উভয়ই আছে,তখন জগতে এত দুঃখ কেন? তাঁহার দয়া বলিতেছে, জীবের দুঃখ দূর হউক। শক্তি, এক মুহূর্ত্তে জীবকে পূর্ণ সুখ প্রদান করিতে পারে। তবে জীবের এত দুঃখ কেন?

এস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ পরিস্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ কি? যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় এদেশে বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এদেশের অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচারযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়া সাকার উপাসনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিলেন। তন্মধ্যে একটী আপত্তি এই যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তিনি স্বভাবতঃ চিন্ময়,নিরাকার হইলেও সাকাররূপে প্রকাশ হইতে পারিবেন না কেন? তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন স্বভাবতঃ নিরাকার হইলেও দেহধারী হইতে পারিবেন না কেন?

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে

বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও আত্মস্বরূপ বিনাশে তিনি সক্ষম, এরূপ বলা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যদি নিরাকার ব্রহ্ম, আত্মস্বরূপের বিপর্য্যয় করিয়া সাকার হইতে পারেন, তবে এমনও বলা যায় যে, যিনি অবিনাশী নিত্য, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া আত্মবিনাশে সক্ষম। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ। যাহার বিনাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও আত্মস্বরূপের অন্যথা করিতে পারেন না।

রামমোহন রায়ের যুক্তিটী আলোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদি এরূপ স্বীকার করা যায় যে, পরমেশ্বর সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধে যেমন, আত্মস্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্;—অর্থাৎ জগৎকে যেমন তিনি পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, সেইরূপ আত্মস্বরূপকেও পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে ঘোরতর সংশয়বাদ ও নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। লোকে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাকারবাদ ও অবতারবাদ সমর্থন করিতেছে, সেই যুক্তি দ্বারাই যে বাস্তবিক নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ সমর্থিত হয়, ইহা তাঁহারা বুঝেন না।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং তিনি স্বভাবতঃ সত্যস্বরূপ হইলেও অসত্য হইতে পারেন; জ্ঞানময় হইলেও অজ্ঞান হইতে পারেন; অনন্ত হইলেও পরিমিত হইতে পারেন; আনন্দময় হইলেও ঘোর দুঃখে নিমজ্জিত হইতে পারেন; শান্তিনিকেতন হইলেও বিষম অশান্তিবিষে জর্জ্জরিত হইতে পারেন; কৃপাময় হইলেও নির্দ্দয় হইতে পারেন। পবিত্র হইলেও পাপময় হইতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাতে সকলই সম্ভব। এমন কি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং আত্মহত্যা করিতে পারেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তি, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে পারে। কোন নিরীশ্বরবাদী বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং, হয়ত, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে জগৎ আপনা আপনি চলিতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই। তাঁহার আত্মস্বরূপ বিপর্য্যয় বা বিনাশ করিবার শক্তি আছে, স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না; এমন কি, নাস্তিক হইতে হয়।

আত্মস্বরূপের উপরে তাঁহার ক্ষমতা চলে না বলিলে, তাঁহার মহিমার লাঘব করা হয় না। তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করা হয়। তিনি অজ্ঞান হইতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি চিরজ্ঞানময়; তিনি আপনাকে দুঃখমগ্ন করিতে পারেন না, কেননা তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তিনি আপনার মধ্যে অশান্তি আনিতে পারেন না, কেননা তিনি চিরশান্তি নিকেতন। তিনি নির্দ্দয় হইতে পারেন না, কেননা অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম তাঁহার স্বরূপ। তিনি অপবিত্র হইতে পারেন না, কেননা তিনি চিরদিনই স্বভাবতঃ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন। এই সকল কথা বলাতে তাঁহার মাহাত্ম্যের লাঘব হয় না। তাঁহার প্রকৃত মহিমাই ব্যক্ত করা হয়। তিনি এত ভাল যে, কখনই মন্দ হইতে পারেন না। সর্ব্ব-

শক্তি, যেমন তাঁহার একটা স্বরূপলক্ষণ, সেইরূপ পবিত্রতা প্রভৃতিও তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ গুলির মধ্যে অবশ্য স্বভাবতঃ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। একটী স্বরূপ লক্ষণ আর একটীর অন্যথা করিতে পারে না।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা স্বভাবতঃ চিরদিনই অসম্ভব। কোন শক্তি তাহা সম্ভব করিতে পারে না। একই সময়ে, একই স্থানে আমি আছি ও নাই, এ উভয়ই কখন সত্য হইতে পারে না। একই সময়ে, একই স্থানে আমি আছি এবং আমি নাই, ইহা অসম্ভব। কোন শক্তি ইহা সম্ভব করিতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া যাহা স্বভাবতঃ চিরদিনই অসম্ভব তাহা তিনি সম্ভব করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করি না। স্বীকার করিলে সত্যাসত্যের কোন প্রভেদ থাকে না। সত্য ও অসত্যের মধ্যে অবিনশ্বর নিত্য প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা অনন্ত শক্তির অতীত।

পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন সম্ভব ও অসম্ভব রহিয়াছে; সৃষ্ট পরিমিত জীব সম্বন্ধেও সেই রূপ সম্ভব ও অসম্ভব আছে। জীবের পক্ষে যাহা স্বভাবতঃ অসম্ভব, তাহা চিরদিনই অসম্ভব। অনন্ত শক্তিও তাহার অন্যথা করিতে পারে না। পরমেশ্বর সকল সীমার অতীত। জীব পরিমিত ও বদ্ধ। সুতরাং পরমেশ্বরের পক্ষে বিশেষ ভাবে যাহা সম্ভব ;—যাহা তাঁহার বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ গুণ, জীবের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অসম্ভব।—ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার বিশেষত্ব আছে। জীব, জীব বলিয়া তাহারও বিশেষত্ব আছে। ঈশ্বরের যাহা বিশেষত্ব তাহা জীবে সম্ভব নহে। জীবের যাহা বিশেষত্ব তাহা ঈশ্বরে সম্ভব নহে। ইহা নিত্যপ্রভেদ। কোন শক্তি এই প্রভেদ বিনাশ করিতে পারে না। জীব, ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্মও জীব হইতে পারেন না।

সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ স্বভাবতঃ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্ট হইলেই পরিমিত; পরিমিত হইলেই অভাববিশিষ্ট ; অভাববিশিষ্ট হইলেই দুঃখ সম্ভব। সৃষ্ট হইলেই অপূর্ণ। অপূর্ণ জীবের দুঃখের অভাব অসম্ভব। আমাদের শক্তির সীমা, জ্ঞানের সীমা, সকল বিষয়েরই সীমা রহিয়াছে ; আমরা অপূর্ণ, দুর্ব্বল জীব। সুতরাং আমাদের দুঃখ সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন, অবশ্যম্ভাবী।

এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে পরমেশ্বর কি আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেন না? পূর্ণ অথচ সৃষ্ট, ইহা অসম্ভব। ত্রিকোণ বৃত্ত, সোণার পাথর বাটী, তেঁতুলের আমসত্ত্ব যেমন, পূর্ণ অথচ সৃষ্ট পদার্থও সেইরূপ। উহা স্বভাবতঃ অসম্ভব। কালে যাহার সৃষ্টি ও স্থিতি, তাহা অবশ্য কালাধীন হইবে। সুতরাং সৃষ্টপদার্থ পূর্ণ হইতে পারে না। আর এক প্রকারে দেখ। সৃষ্ট পদার্থ হইলেই উহা কার্য্য ; কার্য্য হইলেই কারণের অধীন; অধীন হইলেই অপূর্ণ; অপূর্ণ হইলেই অভাববিশিষ্ট; অভাব-বিশিষ্ট হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জীবের দুঃখ স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরকে তজ্জন্য দায়ী করা অযুক্ত ও অসঙ্গত।

পরমেশ্বর জীবকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল। পূর্ণ ও অনন্ত একই কথা। দুই পূর্ণ বা অনন্ত

পুরুষ অসম্ভব। এ বিষয়ে অধিক কথা বলিব না। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট দুই ব্যক্তি সম্ভব কি না? কখনই না। একজনের শক্তি আর একজনের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কেহই সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। দুই জন সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ কল্পনা করুন। মনে করুন, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল। কাহার জয় হইবে, কে বা হারিবে? কেহই জয়ী হইতে পারিবে না। কেহই পরাজিত হইবেন না। এক জন আর একজনকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ কেমন করিয়া হইলেন? সুতরাং এই প্রতিপন্ন হইল যে, উভয়ের মধ্যে কেহই সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। এক জনের শক্তি আর একজনের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। অনন্ত শক্তি-বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী (necessary)। এস্থলে অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী কথা বলি। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সংশয়বাদী বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেন, তবে তাঁহাকে জগতের কার্য্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে কেন? সকল ব্রহ্মাণ্ডে দেখিতে পাই, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার ইচ্ছামাত্র সকলই হইবে। তিনি উপায়ের সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধন করিবেন কেন?

একটু চিন্তা করিলেই এই আপত্তির অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার ইচ্ছামাত্র সকলই হয়। উপায় উদ্দেশ্য উভয়ই তাঁহার ইচ্ছা মাত্র হইয়াছে। তবে উপায় অবলম্বন করিলেন কেন? তাঁহার নিজের সুবিধা জন্য নহে, আমাদের জন্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; আমরা প্রত্যেক জীব সর্ব্বশক্তিমান্ নহি। ধারণ করিবার জন্য,—কার্য্য করিবার জন্য হস্ত দিয়াছেন; চলিবার জন্য পদ দিয়াছেন। দেখিবার জন্য চক্ষু, শুনিবার জন্য কর্ণ—ইত্যাদি ইন্দ্রিয় নিচয় দিয়াছেন। আমরা ইচ্ছামাত্র সকল কার্য্য করিতে পারিব না,—আমরা পরিমিত জীব, সেই জন্য তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ উপায় দিয়াছেন। আমরা যে সকল কার্য্য করিব, তাহার উপযোগী উপায় সকল সর্ব্বত্র রাখিয়া দিয়াছেন। দৈহিক কার্য্য করিবার জন্য দৈহিক উপায় দিয়াছেন। কিন্তু এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড সংগঠনে উপায়ের সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কেন? উহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিজের জন্য করেন নাই। উহাও আমাদের জন্য করিয়াছেন। যদি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রণালীতে ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত না হইত, তাহা হইলে এজগতের তাৎপর্য্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কার্য্যকারণসম্বন্ধরূপ শৃঙ্খল ধরিয়া, উপায় ও উদ্দেশ্যরূপ পথ দিয়া আমরা সৃষ্টি কার্য্যের তাৎপর্য্যে উপনীত হই। এই কার্য্যকারণসম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্য, আছে বলিয়াই বিজ্ঞান-সম্ভব হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিজের জন্য এসব করেন নাই। আমাদের জন্য,—আমাদের শিক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছেন। এপ্রকার না করিলে জগৎ কার্য্যের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে

অসম্ভব হইত। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেন তাহাতে কি? আমরা প্রত্যেকে ত এক এক ঈশ্বর নহি। আমরা পরিমিত ক্ষুদ্র জীব। সুতরাং আমাদের কার্য্যের জন্য, উন্নতির জন্য, দেহ ও মনের মধ্যে তাহার উপযুক্ত উপায় সকল বিধান করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি কার্য্যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, কার্য্যকারণসম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদের জ্ঞানোন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বর তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না। তবে তিনি আমাদিগকে উন্নতিশীল করিতে পারেন। তাহা তিনি করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার দয়া প্রকাশ পাইতেছে।

পরমেশ্বর যে দয়াময়, ইহা বুঝিতে বা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলে, জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আছে, ঈশ্বর তাঁহার বিধান কেন করিলেন বুঝিতে পারি না। বিশেষ বিশেষ স্থল সকল বুঝিতে না পারিলেও, একটী তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি যে, সমগ্র জগতের গতি মঙ্গলের দিকে। জগতে এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতেছি, যাহার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি,—সকল বিজ্ঞান শতকণ্ঠে ইহা প্রচার করিতেছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর মঙ্গলের দিকে ধাবমান্ হইতেছে।

প্রথমতঃ মানবজাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা কর। অনেক পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন যে, মানবজাতির ইতিহাসে মঙ্গলের কখন বিনাশ হয় নাই।* যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু হিতকর, তাহা কখনই চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইতে পারে না। সত্যের জয়, মঙ্গলের জয় পরিণামে হইবেই হইবে। অতীতসাক্ষী ইতিহাস একথা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, মানবজাতির ইতিহাস যে জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতেছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? প্রাচীন গ্রীস্, রোম্, ও ভারতের অবস্থা আলোচনা করিলে কি যথার্থই বলা যায় যে, মানবজাতি ক্রমোন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে? প্রাচীন ভারত, গ্রীস্, রোম এখন কোথায়? তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, ইতিহাস মানবজাতির ক্রমোন্নতি পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে? ভারত, মিশর, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের শোচনীয় অবনতি সত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে, সমগ্র মনুষ্যজাতি গড়ে ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে কি ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না? ইউরোপ ও আমেরিকায় জ্ঞান ও সভ্যতার যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিতেছি, তাহাতে ইহা অসঙ্কোচে বলিতে হয় যে, গ্রীস্ ভারত প্রভৃতি দেশের অবনতি সত্ত্বেও পৃথিবী গড়ের উপরে উন্নতি পথে দৌড়িতেছে।

প্রাচীন ভারত, প্রাচীন গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে যে কোন বিষয়ে, যাহা কিছু ভাল

---

* "In the History of mankind nothing good has ever failed."

ছিল, তাহা কি জগতের পক্ষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে? কখনই না। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ সমাদরের সহিত ইয়োরোপে অনুবাদিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন দর্শন, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সমাদৃত হইতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে সংস্কৃতের সমাদর হইয়াছে। উক্ত দেশবাসিগণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া ভারতের প্রাচীন গৌরব সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছেন। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতবাসী কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বল ইয়োরোপ ও মার্কিন দেশে প্রকাশিত হইতেছে। আর প্রাচীন ভারতে যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছিল, তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুসভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ অবাক্ হইতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাতে প্রাচীন ভারতের গৌরব বর্ত্তমান সময়ে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সুসভ্য জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র, ইউরোপীয় ভাষা সকলে অনুবাদিত হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা জগতের পক্ষে বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতের অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গ্রীস্ ও রোমের অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস্ ও রোমে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সুসভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীস্ ও রোমে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভারত, গ্রীস্, রোম কি আবার উন্নতি পথে ধাবিত হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। এখনই তাহার চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতেছে। এখনই ঐ সকল প্রাচীন দেশে নব জীবনের সঞ্চার দেখিতেছি। ভাবী ভারত, জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মভাবে প্রাচীন ভারতকেও পরাস্ত করিবে। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। ইহা একটী অমূলক আশা নহে। বিজ্ঞান এই আশার ভিত্তিমূল প্রদর্শন করিতেছে।

বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম (Law of evolution) আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সমগ্র জগৎ ক্রমোন্নতি পথে চিরদিন ধাবমান। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তত্ত্ব বা নিয়ম (The law of natural selection) যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে দুঃখ যন্ত্রণা, দুর্ব্বলতা, অস্বাস্থ্য, নির্ব্বুদ্ধিতা ও কদর্য্যতা নষ্ট হইয়া প্রকৃতি ক্রমশঃ সুখ, সবলতা, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৌড়িতেছে। জীব সকল যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিতে বিভক্ত, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যে স্বাভাবিক নিয়মে মিলিত হইতেছে, তদ্দ্বারা জগতে চিরদিন অবিরল ভাবে জীব স্রোতঃ প্রবাহিত। সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্য দেখিয়া জীব নিচয়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। যে অধিকতর সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনক্রিয়ায় তাহারই নির্ব্বাচিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ সকল প্রাণীর মধ্যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনে এই

একটী বিশেষ তত্ত্ব বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনের নিয়মে (The law of sexual selection) বল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়; অর্থাৎ যে প্রাণী অধিকতর বলশালী, সুস্থ ও সুন্দর, সে অধিকতর সহজে তাহার সহচর বা সহচরী লাভ করিবে, ইহাই প্রকৃতির ক্রিয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির গতি বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে। বৈজ্ঞানিকগণ অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সন্তান সাধারণতঃ পিতৃ মাতৃ গুণ ও শক্তির উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং বংশপরম্পরায় বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে। প্রকৃতি গূঢ় কৌশলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মদ্বারা অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, অস্বাস্থ্য ও কদর্য্যতা পরিহার পূর্ব্বক বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অভিমুখে জগৎকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। জগতে বহু যুগে, বহু বংশপরম্পরায়, বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ইহা অসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বলের বংশ থাকে না। সুস্থ ও সবল প্রাণীর বংশ রক্ষা হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও বল জগতে স্থায়ী ও উন্নতিশীল। নির্ব্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞান হারিয়া যাইতেছে; বুদ্ধি ও জ্ঞান জয়যুক্ত হইতেছে। প্রকৃতি বাছিয়া বাছিয়া যাহা কিছু ভাল, তাহা রক্ষা করিতেছেন; যাহা মন্দ, ক্রমে ক্রমে সুকৌশলে তাহা অদৃশ্য করিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতি কি? নিরীশ্বরবাদ বা বিজ্ঞানের ভাষায় যাহা প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তি; ধর্ম্মের ভাষায় তাহাই ঈশ্বর বা ঐশীশক্তি। প্রকৃতি অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর জগৎকে ক্রমশঃ উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। জগৎ স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, জ্ঞান, সুখ, এক কথায়, মঙ্গলের দিকে চিরদিন ধাবমান। জগৎ সম্বন্ধে ইহাই বিধাতার চিরবিধান। জগৎ ক্রমাগত মঙ্গলের দিকে দৌড়িতেছে। (১)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উপনিষদঃ। *

বাবু সীতানাথ দত্ত বেদান্তদর্শন সুন্দর রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বেদান্তের মূল সূত্র উপনিষদে পাওয়া যায়। উপনিষদে যাহা তারার ন্যায় শাসনের বহির্ভূত অথচ সহচরীর ন্যায় নিত্য অনুবর্ত্তিনী আর্য্য ধীশক্তির যৌবন-সুলভ তেজস্বীতায় যে কূটপ্রশ্নের অসংযত মীমাংসা, বাদরায়ণ তাহাই সংযত সীমাবদ্ধ করিয়া বেদান্তদর্শনে গ্রথিত করিয়াছিলেন। বেদান্ত-সূত্র বেদান্তদর্শনের

* অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য, এই ছয়খানি উপনিষদ বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত "শঙ্কর কৃপা' নাম্নী টীকা ও "প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ সহিত" মূল্য ১, ২১০/৩/২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

(১) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তত্ত্ব এস্থলে বিস্তৃতরূপে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যাত হওয়া সম্ভব নহে। উহা বর্ত্তমান শতাব্দীর একটী অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। জগৎ যে ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্ম এ স্থলে উক্ত তত্ত্বের আভাস মাত্র দেওয়া হইল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ম ওয়ালেস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সুবিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞানপিপাসু পাঠক উক্ত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া এই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন।

প্রাচীন, বৌদ্ধদর্শনের প্রাচীন, উপনিষদ যুগে তাহার আরম্ভ। আচার্য্য সেনা 'বিচক্ষণ গবেষণার সহিত সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ তিনশত বৎসরের পূর্ব্বতন নহে। এখন ভারতবর্ষে অষ্টোত্তর শত উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দর্শনশাস্ত্রের ইতিবৃত্তে তাহাদের উপযোগিতা সামান্য। কিন্তু সীতানাথ বাবু যে ছয়খানি উপনিষদ টীকা ও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোন খানি বৈদিক ভাষায় লিখিত। তাহারাই বাদরায়ণের পূর্ব্বতন, শাক্যসিংহ ও পাণিনী একদিন সেগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনেকস্থলে বুদ্ধি বলে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা সংযোজিত করিয়া উপনিষদের সরল অর্থ দুরূহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষ্যের অনেক কথা সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য বা আবশ্যক নহে, আবার কোথাও কোথাও তাঁহার ভাষ্য ভিন্ন মূল সূত্র আদৌ বোধগম্য হয় না। এজন্য শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়া সীতানাথ বাবু অতি সুখবোধ্য শঙ্করকৃপা নামে একটী নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ যথাযথ এবং এমন সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত না জানেন, তাঁহারাও উপনিষদের মতামত সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই অনুবাদে ভট্ট মোক্ষমুলর সীতানাথ বাবুকে অসামান্য সাহায্য করিয়াছেন বোধ হইল।

উপনিষদ সন্ন্যাসীর অবলম্বন। যাহারা মনে করেন, অকৃষ্ণ আর্য্যক্ষেত্রে ইহাদের উৎপত্তি, অসভ্যাবস্থার ধূলি কর্দ্দমে ইহারা কলঙ্কিত, মাংসাশী ব্যাধ-জীবনের মৃগয়া-সঙ্গীতে উপনিষদ পরিপূর্ণ, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সে সময়ে আর্য্য সমাজে প্রভূত সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে সময়ে বশিষ্ঠ ও গৌতম, আপস্তম্ব ও বৌদ্ধায়ন ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া আর্য্য সমাজের ব্যবস্থা বিধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উপনিষদ সকল রচিত হইয়াছিল। বহুকাল মুখে মুখে থাকাতে একই উপনিষদ ভিন্ন ভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কিছু রূপান্তরলাভ করিয়াছিল। ঐতরেয়, তলবকার প্রভৃতি উপনিষদ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়, ইহারা আরণ্যকদিগেরও পূর্ব্বতন।

বিদেশী ও বিধর্ম্মীদিগের মধ্যেও উপনিষদের সম্মান অসামান্য। সাহজাহার পুত্র দারাসুকো বারাণসী হইতে পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে বসিয়া ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশখানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। আঁক্বেটী ডুপেরোঁ নামে এক ফরাসী পণ্ডিত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পারসী উপনিষদ লাটিন ভাষায় অনুবাদিত করেন। য়ুরোপে উপনিষদের প্রচার এই লাটিন অনুবাদ হইতে। রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদ অধুনা য়ুরোপে আদৃত হইতেছে। য়ুরোপীয় দার্শনিক মণ্ডলে সুপনারের প্রভাব অদ্বিতীয়। শ্লেগেল প্রভৃতি অনেকেই উপনিষদের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু সুপনারের মত পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিত এমন মন খুলিয়া সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। সুপনার বলেন "It has been the solace of my life. It will be the solace of my death." তিনি আরো বলেন যে, ব্রুনো, মালিব্রাঁস, স্পিনোজা, য়ুরোপে যে

অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ তাহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। বৈদিক দুরূহ ভাষায় রচিত বলিয়া বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকের নিকট উপনিষদের তাদৃশ আদর হয় নাই।" রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা অনুবাদ যথার্থ হইলেও তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল নহে। বাবু মহেশচন্দ্র পালের প্রচারিত অনুবাদে অনেক কাল্পনিক অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করভাষ্যের উপর অযথা নির্ভর করাতে তাঁহার অনুবাদের এই দোষ ঘটিয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্তের অনুবাদে পাঠকেরা সুখে উপনিষদের গভীর অর্থ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। ইহাতে মূলটীকা ও অনুবাদ সকলি আছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ও সীতানাথ বাবুর অনুবাদে কত ভিন্নতা, এই দুইটী অনুবাদ হইতে পাঠক তুলনা করিবেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥১॥
ঈশোপনিষৎ

জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সে সমুদায়কে পরমাত্মা-দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে (অর্থাৎ সমস্তই পরমাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে)। এইরূপে বিষয়াসক্তিতে ত্যাগ বুদ্ধি দ্বারা (পরমাত্মাকে) সম্ভোগ কর;—কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।—সীতানাথ দত্ত।

পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে, সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অভ্যাস অভিলাষ করিবে না।

রামমোহন রায়।

সীতানাথ বাবুর অনুবাদ যে রাজা রাম মোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা প্রাঞ্জল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সীতানাথ বাবু বলেন যে, তিনি আপনার মত গোপন করিয়া কেবল যথাযথ শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ কথাটী কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। মানুষের প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার বুঝিবার শক্তি শাসিত করে, কেহ আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যিনি যত নিরপেক্ষ ভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃতির নিকট তাঁহাকে পরাস্ত হইতেই হইবে। মানব প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তন অনুসারে ভাষারও প্রকৃতি বিবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণের প্রকৃতি না পাইলে তাঁহাদের ভাষা না পাইলে, তাঁহাদের ভাব বুঝা বা বুঝান উভয়ই দুরূহ। সকল অনুবাদককে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আবার অনুবাদ সাধারণের বোধগম্য করিতে অনেক শব্দ উহ্য করিতে হয়, নূতন শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যাহা মূলে নাই। রাজা রামমোহন রায় এজন্য শঙ্করের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কত নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যথাযথ অনুবাদের চেষ্টা করিয়া সীতানাথ বাবু নূতন শব্দের প্রয়োগ সঙ্কোচ করিয়াছেন, তথাপি কত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের এই অনুবাদ হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

জগতে যাহা কিছু জগৎ, ইহা সকলই ঈশা দ্বারা ব্যাপ্ত। সন্ন্যাসী দ্বারা ভুঞ্জনীয়। কাহারও ধনে লোভ করিও না।

কিন্তু এরূপ অনুবাদ মূলের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। এজন্য সীতানাথ বাবুকে

বাধ্য হইয়া নূতন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যথেষ্ট সাবধান না হইলে এরূপ শব্দ প্রয়োগে অর্থের বিকৃতি ঘটে। সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন "জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে"—এখানে বস্তু আছে স্বীকার করা হইল, ইহাতে অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। এই বিপদ নিরাকরণের জন্য রাজা বাহাদুর আপন অনুবাদে "মায়িক বস্তু" প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিপদ সম্পূর্ণ কাটে না। যাহার সত্তা আছে, তাহা বস্তু, বস্তু অর্থে স্থিরতা বুঝায়, কিন্তু মূলে আছে জগৎ অর্থাৎ যাহা অস্থির, গমনশীল, প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চের ভিতরে প্রপঞ্চে মায়ার মরিচীকা, সংসারের সকলি মায়ার মরিচীকা, তথাপি ঈশা দ্বারা সে সকল বাস্য। মূলে ঈশ্ আছে, সীতানাথ বাবু তাহার অর্থ পরমাত্মা ও রাজা বাহাদুর পরমেশ্বর লিখিয়াছেন। পরমেশ্বর বলিলেই সগুণত্ব প্রতিপাদন করা হয়। এজন্য বোধ হয় সীতানাথ বাবু পরমাত্মা লিখিয়াছেন।

কিন্তু পরমাত্মা বলিলেই জীবাত্মার অধ্যাস করা হয়, অদ্বৈতবাদে পুনরায় আঘাত লাগে। হয়ত কেবল আত্মা লিখিলেই ভাল হইত। অতঃপর বাস্য শব্দের আচ্ছাদনীয় অর্থ করা হইয়াছে। যেমন বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন, কিন্তু বস্ত্র ও মুখ, দুইয়ের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব আছে। জগতের বস্তুত্ব নাই। তবে জগৎ ঈশা দ্বারা কিরূপে আচ্ছাদন করা যাইবে? আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ীভূত অবলম্বন করিয়া লইলে অদ্বৈতবাদ রক্ষা পাইত। মায়াময় প্রপঞ্চের আশ্রয় ঈশ, এরূপ অর্থেও আপত্তি হয়। আশ্রয় শব্দ প্রয়োগ করিলেও বস্তুত্বের অধ্যাস হয়, আত্মা ভিন্ন আর কিছু আছে বলিবার পথ নাই। আত্মা কেবল করণ নহে। অপাদান, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, করণ আত্মা সকলই। আত্মার উপকরণে আত্মা দ্বারা আত্মা আত্মাকে আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াছে। ভাষা পরাস্ত হয়, বিশেষণ লিঙ্গ কারক সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যাহা একমাত্র সৎ, নির্গুণ, ক্লীবে পরিণত হইয়াছে, নামরূপের অতীত যাহাকে সৎ বলিলেও সগুণত্ব প্রতিপালিত হয়, তাহার পক্ষে কোন্ ভাষা প্রযুজ্য? স্বয়ং আচার্য্য অদ্বৈতত্ব রক্ষা করিতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কোন ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ হইতে পারে না। তবে ভাষার যাহা সাধ্য, সীতানাথ বাবু তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এবং সাধারণ পাঠককে বলিতেছি, যদি উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ থাকে, সীতানাথ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ভট্ট মোক্ষমোলরের অনুবাদ আরো কত খারাপ হইয়াছে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন—

"All this, whatever moves on earth, is to be hidden in the Lord (the Self). When thou hast surrendered all this, then thou mayst enjoy. Do not covet the wealth of any man."

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নরনারী।

(সেক্সপীয়র, শেলি এবং ডেন্টি হইতে অনুবাদিত।)

নর।

(নারীর উক্তি)

ভালবাসা লভিবারে
নর যেন ফাল্গুনের বায়,
হাত ছুটি বাঁধা হলে
নর যেন শ্রাবণের প্রায়।

নারী।

(নরের উক্তি)

ধীরে আসে দ্রুত যায়,
বিবাহ 'বাসর'
ধীরে আসে দ্রুত যায়,
যৌবন সুন্দর;
ধীরে আসে দ্রুত যায়,
বাসন্তী সমীর;
দ্রুততর আসে যায়
প্রেম রমণীর!

প্রেম।

নরের উক্তি।

বসন্ত অতীতে
যেমন মেদিনী;
স্বপন বিহীন
যেমন যামিনী;
সুধাস্তে যেমন
অধর হিমানী;
তেমনি ভুবন
বিহীন রমণী।

নারীর উক্তি।

দীপাধার ভেঙ্গে গেলে,
দীপ নিভে ভূমিতে গড়ায়;
মেঘ গুলো ছাড়া হলে,
ইন্দ্রধনু মাধুরী হারায়।
বাঁশীটি ভাঙ্গিয়া গেলে,
স্বরস্মৃতি কোথা চলে যায়;
প্রেমের প্রদীপ হলে জ্যোতিঃহীন,
জীবন-সমাধি মাঝে রমণী লুকায়।

শ্রীশশাঙ্ককুমার ঘোষ।

উৎকণ্ঠা।

(১)

জীবন সূর্য্যের ভাতি,
কেন জলে অকারণ?
এই আছে এই নাই—
নিবিতেছে প্রতিক্ষণ!

(২)

আঁধিয়ায় ডুবে রবি,
আলো লয়ে আসে ফিরে,
অন্ধকার, যায় চলি,
আঁধারের কোন্ তীরে।

(৩)

আঁধারে আলোক ছায়,
আলো আলো ফিরে পায়,
জীবন কি নিজ ভাতি,
নাহি পায় পুনরায়?

(৪)

শিশু নন্দনের ফুল,
পুলকিত কলেবর,
কোথা হতে হেথা আসে,
মাখিয়া চাঁদের কর!

(৫)

শিশু আসে—ল'য়ে আসে,
স্বর্গের করুণা ধারা,
সন্তানে নিরখি মাতা,
সুখে হন মাতোয়ারা।

(৬)

যে জীবন যায় চলি
তাই কি আবার আসে?
আসে যদি তবে কেন,
দুঃখের সলিলে ভাসে?

(৭)

এখানে যে মন প্রাণ
স্বজন ছাড়িয়া যায়,
আসে কি নবীন প্রাণ,
ছাড়ি কারো মমতায়?

(৮)

এসেছি যাদের ছেড়ে,
কোথা আপনার তারা?
যেতেছি যাদের কাছে,
নাহি জানি কে তাহারা।

(৯)

আমারে জানে না তবু
আমারে পাইতে চায়,
যাইতে সরে না মন,
তবু কে লইয়া যায়!

(১০)

আপনার হ'য়ে কার,
হইব আবার পর,
কত জন্ম মৃত্যু ল'য়ে,
ঘুরিব এ চরাচর!

(১১)

কোথা রহস্যের ভাষা,
কোথা অনন্তের গান!
দিক্ ভ্রষ্ট নাহি যেন,
হয় এ ব্যাকুল প্রাণ।

(১২)

অদৃষ্টের কর্ম্ম হেতু,
তবে কি জীবন হবে?
অথবা জীবন কর্ম্ম,
হেতু অদৃষ্টেতে রবে?

(১৩)

অবিবেকী বিবেকের
পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ,
মীমাংসায় বন্ধ্যা তা,—
প্রমাদের প্রমাণ;

(১৪)

পাপ পুণ্য নানা কথা,
এতো দেখি লোক বাদ
অঙ্কের কল্পনা করী
সমুদয় পরমাদ।

(১৫)

তবু যেন মনে হয়,
জীবনের পর পারে,
যার তরে আকুলতা,
দেখিতে পাইব তারে।

শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী।

একটী মুহূর্ত্ত।

বুঝি বুঝিব করি' জীবন হইল গত,
বুঝিতে নারিনু কিন্তু বুঝিবার ছিল যত!
কে যে নয়, কি যে মায়া স্নেহ আশা মানুষের,
কেনেতে জনম তার কিসেতে বিলয় ফের,
বুঝিতে যতন করি বুঝিতে পারিনে কিছু;
যত হই অগ্রসর তত তারা রহে পিছু!
নিতুই নূতন ল'য়ে বাঁধি এই ভাঙাবুক,
আশায় আশ্বাস-বাণী কেবল বাড়ায় দুঃখ!

পথে যেতে যেতে, হায়, কত দেখি কত পাই,
আগে স্মৃতি, পরে অশ্রু, শেষে দেখি তা'ও
নাই!
তার পর কোন মতে কেটে যায় বাকী দিন,
জগতের ধূলি-কণা সেই সে ধূলায় লীন!
পাষাণ-পাষাণে যেই করিত না দৃক্‌পাত,
একটি মুহূর্ত্ত-ভারে, হায়, সেই ভূমিসাৎ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'টি মেঘ।

১

দুই ধার হ'তে দুটি
মেঘ ভেসে আসে,
ছুটিয়া, দোহার দোহে
মিলনের আশে।

২

দুজনেই বিচলিত
শিহরে মধুর,
সত্বর মিলিত হ'বে—
বিরহ বিধুর।

৩

কে ছাড়িবে আহা হেন
প্রণয় সুযোগ;—
তিলেক সহেনা যেন
বিরহ—বিয়োগ।

৪

ধায় দোঁহে দোঁহাপানে
হ'য়ে মোহময়,
মিলনের মধুপানে
বিলম্ব না সয়।

৫

এ ওরে দেখিছে চেয়ে—
অনিমেষ,
অশ্রুবিন্দু বেয়ে পড়ে—
কি সুধা আবেশ!

৬

নিম্নে কুসুমের দল
মৃদু মৃদু হাসে,
কহে যেন "দুটি জল
এত ভালবাসে।"

৭

কহে দিগঙ্গনা সবে
দেখে' প্রেম সেই,
"কে জানে কাহার হবে
কে পরক্ষণেই।"

৮

মহান্ আকাশ হেরে
প্রশস্ত হৃদয়,
কহে বিমুগধ দু'টি
প্রণয়ের জয়।"

৯

দূর হ'তে গ্রহতারা
হেরে সে পিরীতি,
কহে "এ বিশ্বের ধারা
ইহা চির রীতি।"

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পর্ব্বত ও সমুদ্র।

যতবার নাম তার এ দণ্ড অবধি
করিয়াছি উচ্চারণ,
প্রতি-এক নামগুলি জড়দেহ ধরি—
বিশদ-মর্ম্মর-কান্তি শিলা অগণন,
স্তূপাকার হইয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ,
হেন হয় জ্ঞান।
যেদিন প্রথমে মম হৃদয়-কাননে,
ভালবাসা-বসন্ত-পবন,
অশ্রুফুল ফুটাইতে আরম্ভ করেছে—

ত্রিদিবের সৌরভ সদন,
সে অবধি যত ফুল পড়েছে ঝরিয়া,
হইয়া তরল,
অই যেন রাচিয়াছে সমুদ্র-বিশাল,
তার, তরঙ্গ চুম্বিছে নাম-শৈল-পদতল।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

সরস্বতী। (১)

হে পবিত্রে, অন্নযুক্তে, সুনৃতভাষিণি! (২)
নিরন্ন ভারতে তবে কেন আগমন?
কোথা সেই পবিত্রতা, আদি প্রবাহিণি!
কোথা সেই নূত-ভাব?—আছে কি এখন?
বাক্‌দেব ব্রাহ্মণস্পতে! বাক্‌দেবি জননি!
তোমাদের ধর্ম্মবাক্ কে শুনে এখন?
প্রকৃতির চারুচিত্রে যে ধর্ম্ম কাহিনী
চিত্রিত—সে মান-চিত্র কে করে দর্শন?
ঐশিক বিভূতি যাহা নিসর্গে প্রকাশ,
অপূর্ব্ব পেন্সিলে তাহা বেদেই চিত্রিত;
যেখানে যে ধর্ম্ম আছে তাহারি আভাস,
এখন সে মহা প্রশ্ন হেথা উপেক্ষিত!
উপেক্ষিত বেদ, লুপ্ত বৈদিক দেবতা;
কে জানে উষার নাম, পুষার প্রকৃতি?
আছে কি বরুণ রুদ্র ইলা বা সুনৃতা,
সকলি বিলুপ্ত হেথা—কি মহা বিস্মৃতি!
জানে কি হিন্দুরা আজ হিন্দু দেবগণ?
যা জানে তা স্বধর্ম্মের দারুণ বিকৃতি।
চেনে কি তোমার মুখ? তবে কি কারণ,
হতভাগ্য দেশে তুমি আসিতেছ সতি?
কি কারণে বৎসরান্তে দেবি একাকিনী
ছদ্মবেশে একবার দাও দরশন।
বলিতে কি বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে জননি!
কি করে তাঁদের এবে বংশধরগণ?
তাঁহারা ত হর্ষচিত্তে অনার্য্য সুদাসে,
আর্য্যের প্রধান স্থানে করিয়া স্থাপন,
আর্য্যানার্য্য মিশ্র করি অতীব উল্লাসে,
করেছিলা মহাজাতি হিন্দুর সৃজন।
বর্ণ-ভেদ, কর্ম্ম-ভেদ ছিলনা তখন,
নব বলে যুক্তজাতি হ'ত অগ্রসর;
একতার ফল ফুলে আর্য্য নিকেতন,
নন্দন সমান ছিল শোভিত সুন্দর।
গৃহে গৃহে দেবদেবী হতেন পূজিত,
ধর্ম্ম স্বাধীনতা তদা হৃত হয় নাই,
গৃহস্থ যজ্ঞের অগ্নি করি প্রজ্জ্বলিত,
কাম্য পূজা করিতেন দেব দেবী ঠাঁই।
আর আজ জাতি-ভেদ নরক-অনলে,
দগ্ধ হইতেছে হিন্দু জাতি সাধারণ,
ভুলিয়াছে পিতৃধর্ম্ম তাঁহারা সকলে,
ফল তার হইয়াছে ভীষণ পতন!
বীণাযন্ত্রে দেবি! তব কিবা প্রয়োজন?
বসন্তের সুধা হাসি সাজে কি তোমায়?
বৃথা তব মুখরিত নিকুঞ্জকানন!
বৃথা চূতমুকুলেতে মধুপ ঝঙ্কার!
প্রভূত নয়ন জল বর্ষণ উচিত,
কেঁদে কেঁদে বল গিয়া দেবতা সকলে,
যেখানে যজ্ঞের অগ্নি হত প্রজ্জ্বলিত,
পুড়িছে সেখানে হিন্দু অধর্ম্ম-অনলে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

---

(১) ঋক্‌বেদে সরস্বতী নদী দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। এমন ঋক্‌ও আছে, যাহাতে তাহাকে নদী ও বাক্‌দেবী উভয়ই বলা হইয়াছে। যথা ১।৩।১২। এই কবিতায় বৈদিক সরস্বতী বর্ণিত হইয়াছেন; পৌরাণিক সরস্বতী নহে।

(২) ঋক্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১০।১১ ঋক্ হইতে এই বিশেষণগুলি গৃহীত।

মগধের রাজবংশ।*

ভারত সংগ্রামের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মগধরাজ জরাসন্ধের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সহদেব মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্রে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে মহাবীর অভিমন্যুর হস্তে মগধপতি সহদেব নিহত হয়েন। সহদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সোমাপি (অপর নাম মার্জ্জারি বা মেঘসন্ধি) মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য পাণ্ডবগণ একমাস কাল নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করতঃ হস্তিনার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের বিংশতি দিবস পরে ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন। (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৮ অঃ।) এই ঘটনার কিছুদিন পর আত্মীয় স্বজন বধ জন্য পাপ মোচনার্থ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব করেন, ও তৎসম্পাদনার্থ ধন আহরণ জন্য পাণ্ডবগণ হিমালয়ে গমন করেন।

পাণ্ডবগণ হিমালয়ে গমন করিলে; অভিমন্যুর পত্নী বিরাট রাজ দুহিতা উত্তরা (ক) ৭ম মাসে পরীক্ষিতকে প্রসব করেন (আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়)। পরীক্ষিতের জন্মের এক মাস পরে পাণ্ডবগণ হিমালয় হইতে ধন রত্ন গ্রহণ করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (ম, ভা আশ্ব ৭০ অ)। তৎপর চৈত্র মাসীয় পূর্ণিমা দিবস মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েন (অশ্বমেধ ৭২ অঃ) তৎপূর্ব্বেই আশ্বমেধিক অশ্ব অর্জ্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

জরাসন্ধ পৌত্র মগধপতি সোমাপি আশ্বমেধিক অশ্বের গতিরোধ ও অর্জ্জুনের সহিত অতিশয় পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১)। অর্জ্জুন অশ্বসহ মগধরাজ্যে উপস্থিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমার এই অশ্বকে অবলাজন-রক্ষিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" কিন্তু পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

ভারত সংগ্রামের ২৬ বা ৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয় (২), ও মহাত্মা বাসুদেব

---

* মাঘ মাসের নব্যভারতে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। ন, স।

(ক) মহাভারতের বর্ণনানুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তরার বিবাহ হয়।

(১) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন "পুরাবৃত্ত" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, পরীক্ষিত, জরাসন্ধ পৌত্র অপেক্ষা দ্বাদশ কি দশ বৎসরের বড়; তাহা অসম্ভব নহে।" (জন্মভূমি ২য় ভাগ ১৪ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ।) আমরা বলি, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পরীক্ষিতের বয়স ৩।৪ মাসের অধিক ছিল না। কিন্তু জরাসন্ধ পৌত্র এ সময়ে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই পরীক্ষিতের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সন্দেহ নাই।

(২) স্ত্রীপর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ে ৩৬ (ষট্ ত্রিংশ) বৎসরের উল্লেখ আছে; কিন্তু মৌষল পর্ব্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬ (ষড় বিংশ) বৎসরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বোম্বাই সংস্করণে সর্ব্বত্র ৩৬ বৎসর দৃষ্ট হয়। মাননীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ বলেন, ভারত সমরের ৫৭ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয় (ভারতী ১২৮৯ সাল; কার্ত্তিক—পাণ্ডববংশ প্রবন্ধ দেখ)। মহাভারতে

মগধে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণোক্ত বংশতালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারত সংগ্রামের পর সহস্র বৎসর জরাসন্ধের বংশধরগণ মগধ শাসন করেন। তৎপরে প্রদ্যোত বংশীয় ৫জন নরপতি ১৩৮ বৎসর ও শিশু নাগবংশীয় দশজন ভূপতি ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ইহার পর মহানন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ভারত সংগ্রামের ১০০০+১৩৮+৩৬২= ১৫ শত বৎসর পরে মহারাজ নন্দ আবির্ভূত হয়েন। সুতরাং নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে।

বিগত ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমি সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করি যে, উক্ত সিদ্ধান্ত পুরাণ সম্মত। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১২৯৮ সালের পৌষমাসে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে জন্মভূমিতে "পুরাবৃত্তম্" ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই বৎসরের মাঘ মাসের "সাহিত্য-কল্পদ্রুম"এ বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। 'জন্মভূমি'তে তর্করত্ন মহাশয় যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের অন্তর কাল সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। তাঁহার যে সকল মত আমার নিকট আপত্তিজনক বোধ হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির প্রতিবাদ তৎকালে "হিতবাদী" ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় করিয়াছিলাম। বিগত বৈশাখ মাসের জন্মভূমিতে তর্করত্ন মহাশয় "মাস ও বৎসর" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার ও চারুবাবুর প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে বিগত আশ্বিনমাসের নব্যভারতে চারুবাবু উক্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় "মাস ও বৎসর" প্রবন্ধে চারুবাবুর মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত আমার 'কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মত চারুবাবুর মতের অনুকূল নহে। এই অপরাধে চারুবাবু নব্যভারতে আমাকে একটু তীব্রভাবে ব্যঙ্গপূর্ণ ও একস্থলে একটু অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করেন। চারুবাবুর কথার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও, চারুবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সত্যের অনুরোধে তাহার সমালোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

পুরাণ-বর্ণিত বংশ তালিকা সম্বন্ধে চারু বাবু বলেন,—'এক্ষণে বৃহদ্রথ বংশীয় রাজগণের রাজ্য কাল ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোত বংশীয় ১৩৮ বৎসর, শৈশুনাগ বংশের ৩৬২ বৎসর, সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। * * * সুতরাং ইতিহাসানভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে ইহাতে ভ্রান্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?" নব্যভারত, ২৮৯ পৃষ্ঠা, আশ্বিন।

তার পর ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ চারুবাবু বলিতেছেন,—"আমি দেখাইতে চাই যে, এ প্রশ্নের ঐতিহাসিক মীমাংসাই এই খানে হইবে। যেরূপ ভাবে তর্করত্ন (ও লেউঙ্কর) মহাশয় এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের কাল-নির্ণয় কালে কি বুঝিতে হইবে না যে, বংশের আদি পুরুষ বৃহদ্রথ অন্ততঃ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন? জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর) হইতেই বর্ষ গণনা করিতে হইবে কেন? কোন্ যুক্তি মতে বৃহদ্রথ হইতেই

কয়েক পুরুষ পরে বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের রাজ্যারম্ভ? বাস্তবিক জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব হইতেই এই বংশ রাজত্ব করিতেছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের সমসাময়িক সোমাপি হইতে সহস্র বৎসরের ভুক্তাবশিষ্ট কয়েক শত বৎসরই ধরিতে হইবে না কি? সোমাপির পরে যে ১৮ জন (প্রকৃতপক্ষে ২০ জন) রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্যকাল মোট ৫।৬ শত বৎসরের অধিক নহে। * * * এক্ষণে এই ৬ শত, প্রদ্যোত বংশীয়দিগের ১৩৮ ও শৈশুনাগদিগের ৩৬২ বৎসর যোগ করিলে, প্রায় এগার শতই হয়; * * * অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় বুঝিবেন, এ কথার অবতারণায় যুক্তি আছে কি না? নিজে তলাইয়া বুঝিবেন না, অথচ বলিবেন,—আমি চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছি—এ কথার উত্তর আমি দিতে চাহি না। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, এ তর্ক কোন কাজের কি না?" নব্যভারত, আশ্বিন, ২৮৯।৯০ পৃষ্ঠা।

[বন্ধনীর মধ্যগত কথাগুলি প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সংযোজিত—চারুবাবুর নহে।]

চারুবাবুর "এ তর্ক—এ ঐতিহাসিক মীমাংসা কোনও কাজের কি না?" ও স্বীয় মত বজায় রাখিবার জন্য তিনি "চাতুর্য্য প্রকাশ" করিয়াছেন কি না, তাহা বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আলোচনা করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং প্রথমে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায়ে বার্হদ্রথ বংশের রাজত্ব কাল কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভ এইরূপ,—

"পরাশর উবাচ। মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণাং অনুক্রমং কথয়ামি ॥১॥ অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধ-প্রধানাঃ বভূবুঃ ॥২॥ জরাসন্ধ-সুতাৎ সোমাপিঃ তস্মাৎ শ্রুতবান্, * * ভবিষ্যন্তি। ইত্যাদি।"

অনুবাদ;—পরাশর কহিলেন, বৃহদ্রথ বংশীয় ভবিষ্যৎ মগধাধিপতিগণের অনুক্রম কহিতেছি ।১॥ এই বংশে মহাবল সম্পন্ন জরাসন্ধ প্রভৃতি নরপতিগণই প্রধান ছিলেন ।২॥ জরাসন্ধ পুত্র (সহদেব) হইতে সোমাপি ও সোমাপি হইতে শ্রুতবান্ জন্মগ্রহণ করিবে। ইত্যাদি।"

এখানে দেখিতেছি, বিষ্ণু পুরাণের, এই অধ্যায়ে বৃহদ্রথ বংশীয় যে ভবিষ্যৎ ভূপালগণের কথা বলা হইয়াছে, জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপি (যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন) তাঁহাদের প্রথম। তারপর এই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপে করা হইয়াছে; যথা,—

"তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ; ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥৩॥"

অনুবাদ—তৎপুত্র (বিশ্বজিতের পুত্র) রিপুঞ্জয়; এই বার্হদ্রথ নৃপতিগণ এক সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিবেন।"

এই প্রমাণে জানা গেল, এই অধ্যায় বর্ণিত নৃপতিগণ, যাঁহারা ভবিষ্যতে রাজ্য করিবেন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং সোমাপি যাহাদের প্রথম ও রিপুঞ্জয় শেষ নরপতি, তাঁহারা সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সোমাপির পূর্ব্ববর্ত্তী বৃহদ্রথ বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল এই সহস্র বৎসরের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিষ্ণু পুরাণকারের মতে বৃহদ্রথবংশীয়গণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর নহে—উক্ত বংশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবের পরবর্ত্তী নৃপতিগণেরই রাজ্যকালের সমষ্টি সহস্র বৎসর। কেন না, এই অধ্যায়ে কেবল "ভবিষ্যৎ" নরপতিগণের কথাই বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভূপতিগণের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"অথ মাগধ রাজানো ভাবিনো যে বদামি তে।
ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারি র্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ।

* * * *

* * বিশ্বজিৎ যৎ রিপুঞ্জয়ঃ।

বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্র বৎসরং॥"

৯ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়

শ্রীধর স্বামী কৃত টীকোপসংহার,—'সহস্র সংবৎসর-মেতে ভাব্যাঃ ভূপালাঃ; ততঃপরং ভাব্যান্ দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতি।'

অনুবাদ,—অতঃপর ভবিষ্যতে যাঁহারা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি। সহদেবের মার্জ্জারি অপর (নাম সোমাপি) নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা (বা শ্রুতবান্)। * * * বিশ্বজিতের পুত্র রিপুঞ্জয়। বার্হদ্রথ বংশীয় ভবিষ্য ভূপাল-গণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন।"

এখানে "ভাবিনঃ" ও "ভাব্যাঃ" পদ প্রযুক্ত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই অধ্যায়ে যে ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে কেবল তাঁহাদেরই রাজত্বকাল সহস্র বৎসর। সুতরাং সোমাপির পূর্ব্ববর্ত্তী নয় জন নরপতির রাজত্ব কালকে এই সহস্র বৎসরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। চারুবাবু যদি বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের বচনগুলি একটু "তলাইয়া" বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার "ঐতিহাসিক মীমাংসা"টা পুরাণকারের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। শ্রীধরস্বামীও এরূপ মীমাংসা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—বৃহদ্রথ-বংশীয় ভবিষ্যৎ ভূপালগণ সহস্র বৎসর মগধ শাসন করিবেন।" কিন্তু পুরাণজ্ঞ "শ্রীধরস্বামী যাহা বলিতে সাহসী হন নাই" চারুবাবু "তাহা অবাধে বলিয়া গেলেন।" যদি তাঁহার "পৌরাণিক "ইতিহাস জানা থাকিত, * * তাহা হইলে সহসা এ কথা বলিবার অগ্রে তাঁহাকে একটু বিশেষ ভাবিতে হইত। বিচারকালে গোঁজামিলন দিবার চেষ্টা বাহাদুরী বটে!'

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে বার্হদ্রথ নৃপতিগণের প্রত্যেকের নাম ও রাজত্বকাল পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বার্হদ্রথ বংশ বিলুপ্ত হয়। চারুবাবুর অবগতির জন্য নিম্নে সেই বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বংশতালিকা।

নাম	বায়ু	মৎস্য	ব্রহ্মাণ্ড
সোমাপি	৫৮	৫৮	৫৮
শ্রুতবান্	৬৭	৬৪	৬৭
অযুতায়ুঃ	৩৬	৩৬	৩৪
নিরমিত্র	৫০	৪০	৫০
সুক্ষত্র	৫৮	৫৬	৫০
বৃহৎকর্ম্মন্	২৩	২৩	২৩
সেনজিৎ (১)	২৩	৫০	৫০
শ্রুতঞ্জয় (২)	৪০	৪০	৪০
বিপ্র	৩৫	২৮	২৮
শুচি (৩)	৫৮	৫৮	৫৮
ক্ষেমক	২৮	২৮	২৮
সুব্রত (৪)	৬৩	৬৪	৬৪
ধর্ম্ম (৫)	৫	২৮	৫
সুশ্রম (৬)	৫৮	৫৮	৫৮
দৃঢ়সেন (৭)	৪৮	২৮	৪৮
সুমতি	৩৩	৪৮	৩৩
সুবল (৮)	৩২	৩৩	৩২
সুনেত্র (৯)	৪০	৪০	৪০
সত্যজিৎ (১০)	৮০	৮০	৩০
বিশ্বজিৎ (১১)	৩৫	৩৫	৩৫

(১) বায়ুপুরাণের কোনও কোনও পুস্তকে ১ শত বৎসর কথিত হইয়াছে। (২) ৩০ বৎসর মৎস্যপুরাণের

রিপুঞ্জয়	৫০	৫০
	৯২১ ৯৩৫	৮৮১

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে সুশ্রমের পর

ধ্রুবত্ত নামক আর একজন রাজা ৩৮

বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ——

সুতরাং মোট—৯১৯

উপরি উদ্ধৃত বংশতালিকা ও তৎসন্নিবিষ্ট ফুটনোটগুলি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কথিত পুরাণগুলি বর্ত্তমান কালে নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন। অনভিজ্ঞ লিপিকারের দোষে ও অন্যান্য কারণে উহাতে বহুবিধ অশুদ্ধি ও পাঠান্তর ঘটিয়াছে। দুই এক স্থানে দুই একজন রাজার নাম ও রাজত্বকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও, ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতসমরের পর বৃহদ্রথের-বংশীয় ভূপতিগণ সহস্র বা হাজার খানেক বৎসর মগধ শাসন করিয়াছিলেন, ইহা বলাই পুরাণকার ঋষির অভিপ্রেত (৭)। এই সহস্র বৎসরের সহিত প্রদ্যোত ও শিশুনাগ বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল যোগ করিলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর পাওয়া যায়। এ কথা বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বর্ণিত 'বংশতালিকা সম্মত —"ইতিহাসানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভ্রান্তি" নহে। ফলকথা, চারুবাবুর যদি পৌরাণিক "ইতিহাসে অভিজ্ঞতা থাকিত" তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ বিসদৃশ মীমাংসাকে "ঐতিহাসিক মীমাংসা" বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। পূর্ব্বাপর "না দেখিয়া, না পড়িয়া যাহা তাহা" বলিয়া মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলে, "নিজের তর্কপ্রিয়তা দেখান হইতে পারে।

।। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ বড় অস্পষ্ট। (৩) ৬৪ বর্ষ মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর। (৪) ৬০ বৎসর বায়ু ও মৎস্যপুরাণের পাঠান্তর। (৫) ৫৮ (?) বৎসর বায়ু পুরাণের ও ৩৫ ও ৫০ বৎসর মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর। (৬) ৩৮ বর্ষ বায়ু পুরাণের পাঠান্তর। (৭) ৫৮ বৎসর বায়ু পুরাণের পাঠান্তর। (৮) ২২ বৎসর বায়ুর পাঠান্তর। (৯) ২২ বর্ষ মৎস্যের পাঠান্তর। (১০) ৮২ বর্ষ বায়ুর পাঠভেদ। (১১) ২৫ বৎসর বায়ু ও মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর।

(৭) উদ্ধৃত বংশতালিকায় আমরা সহদেব সহ ২২ জন নরপতির নাম পাইতেছি। কিন্তু বায়ু পুরাণে এই তালিকার শেষে কথিত হইয়াছে যে,—"দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাৎ। পূর্ণং সহস্রবর্ষং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি।" সুতরাং 'দ্বাবিংশতি' স্থলে এই শ্লোকে ভ্রম ক্রমে 'দ্বাত্রিংশচ্চ' (২২ স্থলে ৩২) লিখিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা, পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটে। এই একটা শ্লোকের জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত অত বড় বংশ তালিকাটাকে ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ বৃহদ্রথ বংশীয় ৩২ জন রাজার রাজ্য শাসনকাল ১ সহস্র বৎসর নহে—জরাসন্ধের পরবর্ত্তী ২২ জন রাজারই শাসনকাল সহস্র বৎসর। এ কথা বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ সম্মত।

মৎস্য পুরাণে "বৃহদ্রথাৎ"এর পরিবর্ত্তে 'বৃহদ্রথাঃ' এইরূপ পাঠ আছে। ইহা শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কেন না, এই বংশ তালিকাধৃত নরপতিগণ ('বৃহদ্রথাঃ') বৃহদ্রথ বংশীয় বটে, কিন্তু বৃহদ্রথের পর হইতে ('বৃহদ্রথাৎ) ইহাদের গণনা হইতে পারে না। এই ভবিষ্যৎ নরপতিগণের আদি পুরুষ সহদেব ও বৃহদ্রথের মধ্যে ৮১৯ পুরুষের অন্তর। সুতরাং ইহাদের সংখ্যা কীর্ত্তনকালে ইহাদিগকে 'বৃহদ্রথাৎ' (বৃহদ্রথের পর হইতে) বলা অপেক্ষা "বৃহদ্রথ" (বৃহদ্রথ বংশোদ্ভূত) বলা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এই সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উক্ত শ্লোকের

দ্বাবিংশতি নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ।
পূর্ণং সহস্র বর্ষং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি॥

এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত।

বটে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়া থাকে ?"

পাঠকগণ দেখিলেন, ভারত সংগ্রামের পর বৃহদ্রথ বংশীয় নরপতিগণ যে সহস্র বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা আমাদের কপোল কল্পিত নহে—ইহা প্রাচীন পৌরাণিক মত। কিন্তু চারুবাবুর বিশ্বাস অন্যরূপ। তিনি বলেন "ভারতীয়" পুরাতত্ত্ব ঘটিত অনেক বিষয় সুন্দররূপে মীমাংসা" করার "জন্ম কেবল শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস ও যুক্তির আশ্রয় লইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। * * * কিন্তু আজ কাল প্রাচীন মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মত সংস্থাপনের চেষ্টা কেমন একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" কথাটা মিথ্যা নহে। পুরাণকারগণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভূপতিগণের রাজত্বকালকে ঐতিহাসিক মীমাংসাচ্ছলে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত করিবার একটা নূতন চেষ্টা, রোগ বৈ কি ?

স্থানান্তরে চারুবাবু বলিয়াছেন—"তাঁহারা সত্য নির্ণয় অপেক্ষা নিজেদের বাহাদুরী দেখানই আবশ্যক মনে করেন।" সেই জন্যই ত অদ্ভুত ঐতিহাসিক মীমাংসার সৃষ্টি !

"বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বৃহদ্রথ-বংশীয় ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের রাজত্বকাল সহস্র বৎসর এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণের বংশতালিকা, পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণীয় উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং উক্ত বচনগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। এখন বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের কোনও স্থলে যদি ইহার বিরুদ্ধ কোনও কথা দেখিতে পাই, তবে উহাকে প্রক্ষিপ্ত বা লিপিকর প্রমাদ বলিতে পারি কি না ?

দেখিয়াছি, বংশতালিকানুসারে পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর। কিন্তু আবার উক্ত পুরাণদ্বয়ের স্থানান্তরে দেখিতে পাই ;—

যাবৎ পরিক্ষীতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩২

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের অভিষেক, এই দুই ঘটনার মধ্যে ১০১৫ বৎসরের অন্তর ; তথাচ ভাগবতে,—

"আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং ॥
ভাগবত ১২।২ অধ্যায়।

এতদনুসারে নন্দ ও পরীক্ষিতের মধ্যে ১১১৫ বৎসরের অন্তর স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই বচনগুলি বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণোক্ত বংশতালিকার বিরোধী। কাজেই অর্থের বৈচিত্র্য সাধন ও লিপিকর-প্রমাদ স্বীকার করিতে হইল। ভাগবতীয় বচনের কূটার্থ করিলে ১৫১০ এক হাজার পাঁচশত দশ বৎসর পাওয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে এইরূপ কূটার্থ গ্রহণ ভিন্ন পৌরাণিক বিরোধের পরিহার হয় না (৮)।

(৮) এই কূটার্থ গ্রহণের জন্য চারুবাবু আমাদের উপর যথোচিত নিন্দাবর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পৌরাণিক বিরোধ পরিহারের জন্য তিনিও স্বয়ং কূটার্থ গ্রহণ করিয়া বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। কুমারিকা খণ্ডোক্ত—ততস্ত্রিষু দশাধিক শতত্রয়ে এই বচনের সরল অর্থ এই,—কলির ৩৩১০ বৎসর অতীত হইলে, নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। প্রাতঃস্মরণীয় ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই

বিষ্ণুপুরাণের বচনের কূটার্থ করিলেও সহজে অর্থলাভ হয় না—অনেক কষ্ট-কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং এখানে লিপিকর-প্রমাদের সম্ভাবনাই অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

"জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং" স্থানে লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং" হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের একটা সমগ্র অধ্যায়কে (যে অধ্যায়ে জরাসন্ধের পরবর্ত্তী নৃপতি সমূহের নাম কীর্ত্তিত ও অবস্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা একটি শ্লোকের অন্তর্গত একটি পদকে লিপিকর-প্রমাদ জনিত অশুদ্ধ মনে করা, আমি অধিক দোষাবহ মনে করি না। বিশেষতঃ ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্য পুরাণের বংশ তালিকা যখন বিষ্ণুপুরাণের উক্তির সমর্থন করিতেছে, তখন সমালোচ্য শ্লোকে অশুদ্ধি থাকাই অধিকতর সম্ভব মনে হয়। ইহাকে যদি চারুবাবু "বিচারকালে গোঁজা মিলন দিবার চেষ্টা" বা "যুক্তি মূলক ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা" অথবা "সাহসের কথা" বলেন, তবে নিরুপায়।

মৎস্যপুরাণের একটী ব্যতীত সকল পুঁথিতেই "১০১৫ বৎসর" এই পাঠ আছে। কেবল একটিতে আছে, "১৫ শত বৎসর" কিন্তু সকল পুঁথির বংশ তালিকানুসারেই যখন পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসর অন্তর" পাওয়া যাইতেছে, তখন যে পুথিতে "১৫ শত বৎসরের" পাঠ আছে, সেইটিকেই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না কি?

চারুবাবু বলিয়াছেন (সাহিত্য কল্পদ্রুম, ১২৯৮ সাল মাঘ২৭৭ পৃষ্ঠা) পুরাণকারগণের মতে কলির প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল ও তৎকালে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাকল্যগণনানুসারে সপ্তর্ষিগণ তৎকালে শ্রবণায় ছিলেন। তবেই পুরাণের সহিত শাকল্যের বিরোধ ঘটিতেছে। চারুবাবু স্বীকার করিয়াছেন, যে পুরাণ বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে (সাহিত্য কল্পদ্রুম ২৭৮পৃঃ) তবে তিনি শাকল্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন কেন? (নব্যভারত, আশ্বিন, পৃ ২৯১)

চারুবাবু বলেন, (সাহিত্য কল্পদ্রুম ২৭৭ পৃষ্ঠা) মৎস্যপুরাণ মতে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় যাইলে অন্ধ্রবংশীয়গণ রাজ্য লাভ করিবেন। নন্দ হইতে অন্ধ্রকাল ৮৩৬ বৎসর পরে।" অন্ধ্রবংশীয়গণের "রাজলাভ" কালে সপ্তর্ষি মণ্ডল কৃত্তিকায় থাকিলে, তাহার ৮৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নন্দের রাজ্যকালে তাঁহাদের শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিতি সম্ভব, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে থাকা কোনও মতেই সম্ভব নহে।

কিন্তু চারুবাবু মৎস্যপুরাণের কথা ভুল বুঝিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের, শুধু মৎস্যপুরানের মতে কেন—বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতেও, নন্দের ৮৩৬ বৎসর পরে অন্ধ্রবংশ ধ্বংস হয়; (১) এবং অন্ধ্র-

সরল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (বিধবা বিবাহ পুস্তক ৬ষ্ঠ সংস্করণ—১০৮।৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চারুবাবু উহার অর্থ করিয়াছেন,—কলির (৩০০০—২৯০০=) ২৭১০ বৎসর হইলে নন্দরাজা হইয়াছিল।" কূটার্থ গ্রহণ ভিন্ন এই অর্থ সিদ্ধ হয় না। একেই বলে, "নিজের বেলায় আঁটি শুঁটি, পরের বেলায় দাঁত-কপাটী।"

(১) বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ মতে নন্দের কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত বৎসর পরে অন্ধ্র

বংশীয় পুলোমতের সময় সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন। অন্ধ্রবংশীয় শেষ নরপতির নাম "পুলোমবিৎ"। এই পুলোমবিৎ ও পুলোমৎ যদি এক ব্যক্তি হয়েন, (সম্প্রতি এখানে আমার নিকট মৎস্য পুরাণ নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইলাম) তাহা হইলে, অন্ধ্রবংশ ধ্বংস কালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন। এই ঘটনার ৮৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নন্দের আবির্ভাব কাল, সুতরাং তৎকালে সপ্তর্ষিগণ শ্রবণায় ছিলেন বলিতে হয়।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, আন্ধ্রবংশ বিনাশের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে পুলোমৎ নামে একজন মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহারই রাজত্ব কালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন, স্বীকার করিলে, নন্দের সময় তাঁহারা সম্ভবতঃ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাদি পুরাণ মতে নন্দের রাজত্বকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিল।

ফলকথা, সপ্তর্ষি সম্বন্ধে অনেক গোল। ১মতঃ, সপ্তর্ষির গতি আছে কি না? আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সকলেই একবাক্যে সপ্তর্ষির গতি অস্বীকার করেন।

২য়তঃ, যদি গতি থাকে, তথাপি সেই গতি দ্বারা মঘা নক্ষত্রে তাঁহাদের উপস্থিতি সম্ভব কি না? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন—না।

৩য়তঃ; সপ্তর্ষিগণের এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল কত? হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, একশত বৎসর। ইউরোপীয়গণের মতে সহস্র বৎসর।

৪র্থতঃ, কলির প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান সম্বন্ধে পুরাণের সহিত শাকল্যের ঐক্য নাই। পৌরাণিক মতে তৎকালে মঘাতে, শাকল্যের মতে শ্রবণায়। চারুবাবু বলেন, বরাহমিহিরের মতে নাকি কৃত্তিকায়।

৫মতঃ, পুরাণে কথিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায় ও নন্দের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। পুরাণকারগণ বলেন, সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল একশত বৎসর। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের ও নন্দের মধ্যে সহস্র বৎসরের অন্তর। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশতালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় সকল পুরাণ অনুসারে নন্দের ১৫শত বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির প্রাদুর্ভূত হয়েন।

৬ষ্ঠতঃ, নন্দের সময় সপ্তর্ষির অবস্থান সম্বন্ধেও পুরাণকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবাদিপুরাণ মতে নন্দের রাজত্ব কালে তাঁহারা পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন; (১০) কিন্তু দেখিয়াছি, মৎস্যপুরাণের গণনা মতে ধনিষ্ঠা বা শ্রবণায় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সময় মৃগশিরা বা আর্দ্রায় ছিলেন। সুতরাং নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সহস্র বৎসর অন্তর, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও তাঁহারা তৎকালে হস্তা নক্ষত্রে ছিলেন।

বংশ স্থাপিত হয়। উক্ত পুরাণগুলির মতে আন্ধ্রবংশের স্থিতিকাল ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত বৎসর। সুতরাং নন্দের ৮৩৬ বৎসর পরে আন্ধ্রবংশ স্থাপিত হয় নাই—[illegible] ধ্বংস হইয়াছিল। চারু বাবু পুরাণগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

(১০) ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী আবার বলেন,—প্রদ্যোত বংশীয়গণের রাজত্বকাল কালে সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন, সুতরাং নন্দের সময় পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ছিলেন। শ্রীধরস্বামী ভাগবতীয় বচনের উক্তবিধ অর্থ সাধন করিয়াছেন।

৭মতঃ, বর্ত্তমানকালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি সম্বন্ধেও হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে এক্ষণে তাঁহারা অনুরাধা নক্ষত্রে, কাহারও বা মতে স্বাতিতে আছে। অপরে, মঘা নক্ষত্রে তাহাদের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তাই বলিতেছিলাম, সপ্তর্ষি সম্বন্ধে অনেক গোল। পুরাণে সপ্তর্ষি সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহার সম্বন্ধে বিচার করিতে আমি অসমর্থ।

ইহার পরেও যদি যুধিষ্ঠিরের ও নন্দের অন্তরকাল সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়; পরে বলিব। (১১)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

১। কুরুক্ষেত্র কাব্য। (২)—"কুরুক্ষেত্র" যদি "চিত্রাঙ্গদা" হইতে—পৌরাণিক সাহিত্যের—এক ফোটা ঘটনা লইয়া যত কিছু ভাবের খেয়াল, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম-বৈচিত্র্যের যত প্রকার ম্লানোজ্জ্বল স্ফূর্ত্তির বর্ণনীয় বিষয় হইত—সূক্ষ্মাংশকে, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম ভাবে পরিণত করা যদি নবীন বাবুর উদ্দেশ্য হইত, তবে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিতেছি এবং যাহা বলিব, তাহার অধিকাংশ না বলিয়া পারিতাম। বহিরঙ্গে বসন্ত ঢুকিয়া মদনের ইঙ্গিত ক্রমে মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রাঙ্গদার্জ্জুনকে যেরূপ স্বপ্নরাজ্যে উড্ডীন করিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের স্বপ্নরাজ্য তদ্বিধ নহে। নরনারী মুহূর্ত্তের জন্য ভূত ভবিষ্যৎ, স্বর্গমর্ত্ত্য ও আত্মপর ভুলিয়া গিয়া কামনার দাস দাসী হইয়া যেরূপ কৃপাপাত্র, হয় চিত্রার্জ্জুন তাহাই। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন তাহা নহে। "কুরুক্ষেত্র" "চিত্রাঙ্গদা" নহে। কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্য উচ্চ। ইহার আকাঙ্ক্ষা বঙ্গীয় সকল কাব্যাপেক্ষা উচ্চ। ইহার আকাঙ্ক্ষা ভগবৎ প্রেম—বিশ্বপ্লাবী মানব-প্রেম। হেম ও নবীনে যে প্রভেদ, চিন্তোচ্চতার ও হৃদয়ের আবেগে সেই প্রভেদ; সেই নবীনের যত কিছু হৃদয়ের শক্তি, তাহা যেন ভগবৎ প্রেমে পরিস্ফুত হইয়া কুরুক্ষেত্রের ছত্রে ছত্রে স্বর্গীয় শিশির বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কুরুক্ষেত্র মেঘনাদ ও বৃত্রসংহারকে পরাজয় করিয়াছে। আর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য অথবা এরূপ আকাঙ্ক্ষা ধারণ করিবার জন্য যে শ্রেণীর হৃদয় আবশ্যক, তাহা এ দেশের লেখকগণের মধ্যে রমেশবাবুর পরে, নবীন বাবু ভিন্ন কাহারও নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া বঙ্কিম বাবু ও কর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া ভূদেব বাবু যত কারুকার্য্য প্রদর্শন করুন না কেন, হৃদয় তত্ত্বে বা সহানুভূতি তত্ত্বে রমেশ বাবু ও নবীন বাবু শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত সুধার ইঁহারাই অধিকারী। কুরুক্ষেত্রে এই সুধা যথেষ্ট আছে।

---

(১১) এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর দেখিলাম, বিগত পৌষ মাসের জন্মভূমিতে তর্করত্ন মহাশয় পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষিত অপেক্ষা জন্মেজয় পৌত্র শোমাণিকেই ১০।১২ বৎসরের বড় স্বীকার করিয়াছেন। (এই প্রবন্ধের ১নং পাদটীকা দেখুন।)

কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও কম উচ্চ নহে। ইহাতে হিন্দুজন-সাধারণের অনুসরণীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের মর্ম্ম ব্যাখ্যার যত্ন করা হইয়াছে। বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র একরূপ ভারতে উপেক্ষিত বলিলেও বলা যায়। খ্রীষ্টানের বাইবেলের ন্যায়, মুসলমানের কোরাণের ন্যায় হিন্দুর মহাভারত সাধারণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভারতের ব্যাখ্যা কুরুক্ষেত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ-চরিত্র ব্যাখ্যাও এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিক কারণ প্রদর্শন। কর্ণ; দুর্ব্বাসা সংবাদে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং "কুরুক্ষেত্রে" যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা যেমন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত ও জটিল, তেমন সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মের গন্তব্য পথের প্রশ্নের সহিত মিশ্রিত। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যদি নবীন বাবুর সহিত আমাদের মত বিরোধ হয়, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

তবে আমাদের পূর্ব্ব সমালোচনা সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে প্রতিবাদ পত্র পাইয়াছি, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কল্পিত ও সূচিত হয় ১৮৮২ ইংরেজীতে, বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় (আমার যতদূর স্মরণ হয়) ১৮৮৪ ইংরেজি হইতে। * * *। ১৮৮২ ইংরেজীতে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও তৎপরবর্ত্তী আরও একখানি কাব্যের Plot বঙ্কিম বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু ও প্রফুল্ল বাবু দেখিয়াছিলেন এবং বঙ্কিম বাবু প্রথমতঃ রৈবতকের কয়েক সর্গ দেখিয়া তাহাদের নীচে এবং তিনখানি কাব্যের সূচিত কৃষ্ণচরিত্র ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে [illegible] মন্তব্য ও এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও * * আছে।"

এই পত্রের কথা দ্বারা লেখক আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চান যে "ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন যে কৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য" তাহা কুরুক্ষেত্রের কবি বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র হইতে অনুকরণ করেন নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে কুরুক্ষেত্র কাব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। আর বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র লেখার মন্ত্রটুকু নবীন বাবু হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে হয়। বঙ্কিম বাবু কি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা চাহিয়াও আমরা পাই নাই। তাহা পাইলে বর্ত্তমান গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের আন্দোলনের এক রহস্য প্রকাশ করিতে পারিতাম।

আর একটী কথা এই। নবীনবাবুর "রঙ্গমতী" কৃষ্ণচরিত্র প্রচারের প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। রঙ্গমতীর ২৩৫ পৃষ্ঠায় আছে।

> অন্তর বিগ্রহে বৎস ডুবেছে ভারত।
> ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নি শিখা
> জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নি শিখা
> দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথমে।
> মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
> ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম বিচিত্র কৌশলে
> জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
> প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
> নিভিলে সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
> কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।
> এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
> সেই দেব অভিনেতৃ, সম্বরিলা লীলা
> সিন্ধু প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ী করে।
> সদ্য মহারাজ্য ক্রমে পড়িল খসিয়া
> শত খণ্ডে, পদাহত অনার্য্য পরশে
> বালকের হস্তচ্যুত পুতুলের মত।"

রঙ্গমতী বঙ্কিমবাবুর নিকট উৎসর্গ করা হইয়া

চরিত্র ও গীতা লইয়া বঙ্গ ভাষায় কয়েক বৎসর হইতে যে আন্দোলন চলিতেছে, রঙ্গমতীর এই কয়েক পংক্তি কি তাহার দীপ-শলাকা?

উপরোক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ রঙ্গমতী-সূচিত কৃষ্ণচরিত্রের অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই প্রতিবাদের মর্ম্মানুসারে বঙ্কিমবাবুর নিকট নবীনবাবুর ঋণ অতি অল্প হইয়া উঠে। কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে "কুরুক্ষেত্রে" যে ভ্রমের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহি। ভিতরের কথা যাহাই হউক, বাহিরের কথা লইয়াই জগৎ বিচার করিবে; বাহিরে প্রকাশ, বঙ্কিমবাবুই কৃষ্ণ চরিত্র আন্দোলনের মূল। কুরুক্ষেত্র যখন বঙ্কিম বাবুর পুস্তক প্রকাশের পরে বাহির হইয়াছে, তখন ইতিহাস বলিবেই নবীনবাবু মূলমন্ত্রে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী বঙ্কিমবাবুর এ সম্বন্ধে কি ব্যক্তব্য আছে, তাহা প্রকাশিত না হইলে এ কথা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

আর একটী কথা এই, মহাকবির লক্ষণ নূতন সৃষ্টি করা; দুর্ভাগ্যেরবিষয় আমাদের দেশে সেরূপ কবির অভ্যুদয় দেখিতেছি না। রামায়ণ ও মহাভারতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করিয়া নবীনবাবু যদি স্বাধীন কল্পনা বলে নূতন কিছু সৃষ্টি করিতেন, তাঁহার নাম অমর হইত। ব্যাস বাল্মীকির উপর হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা তাহা করাই উচিত ছিল। কোন ব্যক্তির কল্পিত কোন চরিত্রকে উজ্জ্বল, ম্লান বা পরিবর্ত্তন করিতে কাহারও কোন ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার আছে কি না, আমাদের সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, মহাত্মা মাইকেল হইতে এ দেশের সকল কবিই এই কাজে ব্রতী। ইহা যে প্রকৃত মহত্ত্ব ও প্রতিভার অন্তরায়, ইহা কেহই ভাবেন না। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে প্রকাশিত হইবে।

২। যুগপূজা বা ধর্ম্মভাব বিকাশ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এ, প্রণীত, মূল্য।০। যুগে যুগে মানুষের উন্নতি হইতেছে। মানুষের উন্নতির সহিত পূজা বা উপাসনারও উন্নতি হইতেছে। শৈশবযুগের প্রেতপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া, মানুষের ক্রমোন্নতির সহিত বিবিধ যুগের প্রকৃতি পূজা, নরহরি পূজা, অদ্বৈত পূজা, নর পূজা, অজ্ঞেয়শক্তি পূজা কিরূপে ব্রহ্ম পূজায় পরিণত হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহা সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। গভীর বিষয় পদ্যে প্রস্ফুটিত করা খুব কঠিন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিজয় বাবু সিদ্ধহস্ত; এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বর্ত্তমান যুগের কবিদিগের তুলনা হয় না। তাঁহার এই পুস্তকের ভাষা এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এই পুস্তকের একটী স্থান হইতে নমুনা দিলাম।

খ। অদ্বৈত পূজা—(২)

"আমি জ্ঞানী, আমি জ্ঞেয়, অনুমান, অনুমেয়,
আমি সারতত্ত্ব, অহো, আমিই জিজ্ঞাসু।
"আমিই" আমার তরে, ভবে লীলা খেলা করে;
আমি পিপাসার বারি, আমিই পিপাসু।
আমিই অনন্ত, সান্ত, আমি বুদ্ধ, আমি ভ্রান্ত,
আমিই নূতন হই, আমি পুরাতন;
বৃথা এই কাল কল্প;—আমিই আমার কল্প
আমি স্বামী, আমি তন্ত্র, ব্রহ্ম সনাতন।"

এইরূপ কবিতা এ পুস্তকে অনেক আছে। আমরা কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে এ পুস্তকখানি একবার পড়িতে অনুরোধ

করি। পড়িয়া যে সুখী হইবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। এরূপ, ধর্ম্মভাব পূর্ণ কবিতা এদেশে যত প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

৩। ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি।—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।৵০। কবীর দাস, নানকসাহ, তুলসীদাস ও তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে আছে। পুস্তকখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বীরেশ্বর বাবুকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এই আড়ম্বর-শূন্য ভক্তদিগের-জীবনী সকলের পাঠ করা উচিত।

৪। কোল কাহিনী প্রথম ভাগ।—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।/০। বীরেশ্বর বাবু ছোট নাগপুরের স্কুলসমূহের এসিস্টাণ্ট ইনস্পেক্টর। দীর্ঘকাল কোল রাজ্যে বাস করিয়া কোল জাতি সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিয়াছেন, তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে।

৫। চৌকিদারী পঞ্চাইত।—শ্রীগুরুগোবিন্দ পাত্রদার, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। আইনের যাহা প্রতি গ্রামবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা ভাল।

৬। জাতীয় উন্নতির উপায়।—যশোহর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমাখনলাল দত্ত, বি, এ, প্রণীত; মূল্য ।০। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। পুস্তকখানি বেশ চিন্তাপূর্ণ। ছাত্রদিগের পাঠ করা একান্ত উচিত।

৭। চিত্রবর।—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০। "হলদিঘাটের যুদ্ধ" এবং "ভ্রাতৃদ্বয়" ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বর্ণনা সমীচীন নহে।

৮। স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশের সংক্ষিপ্ত জীবনী।—লক্ষ্মণচন্দ্র আশ একজন সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনে শিক্ষার অনেক বিষয় আছে, পুস্তকখানি পড়িলে খুব উপকৃত হওয়া যায়।

৯। সাহিত্য পুস্তক।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, সঙ্কলিত; মূল্য ॥০। ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর জন্য ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্মীকির জয় হইতে কতকটুক মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, আরো কতকটা উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত, কেন না, ঐরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। চন্দ্রনাথ বাবু একজন অসাধারণ পণ্ডিত, তাহার নির্ব্বাচন যে ভাল হইবে, বলা বাহুল্য। তবে একটী কথা এই, নূতন বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার সময় ছাত্রদিগকে কিছু কিছু প্রাচীন বাঙ্গলাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। উদ্ধৃতাংশে নূতন বাঙ্গলা শিক্ষার যথেষ্ট উপকরণ আছে, সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রাচীন ভাষার নমুনা থাকিলে ভাল হইত। নিরপেক্ষভাবে আজকাল অতি অল্প পুস্তকই সঙ্কলিত হইতেছে। টেক্সটবুক কমিটীর অনুজ্ঞায়, না কিসে ঐরূপ হইতেছে, বুঝি না।

চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট সাহিত্য জগৎ অনেক আশা করে; তিনি স্কুলের পাঠ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতেছেন, ইহা সাহিত্য-জগতের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। একে একে সকল মহারথীই যদি সাহিত্য-সেবাকে লাভগণনার মধ্যে আনেন, তবে এ দেশের ভবিষ্যৎ কে উজ্জ্বল করিবে? সঙ্কলন কার্য্যে এরূপ মনোযী ব্যক্তিকে নিযুক্ত দেখিলে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হই। সাহিত্য

জগতে ইহাপেক্ষা অনেক মহৎ কাজ চন্দ্রনাথ বাবুর করিবার আছে। আমাদের বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের পরীক্ষক মনোনীত হওয়ার ন্যায়, টেক্ষ্টবুক কমিটীর সভ্যগণের পাঠ্য পুস্তক লেখা অবৈধ। বিচারক নিজেই বিচারপ্রার্থী হইলে, ও সমস্ত টাকা ভাগ করিয়া লইলে অন্য লোকের আর আশা কোথায়?

১০ ও ১১। দুই ভাই, মূল্য ৵০, একটী চিত্র, মূল্য ৵০।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। হারাণ বাবুর গল্পের ভাষা সুন্দর; ভাব মার্জ্জিত। গল্প দুটী ক্ষুদ্র, কিন্তু বেশ শিক্ষাপ্রদ।

১২। চরিত্র সুশিক্ষা।—শ্রীরাধাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০। এখানি বিদ্যালয় পাঠ্য। মোটের উপর পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে।

১৩। চারুগাথা।—শ্রীমনোমোহিনী গুহ প্রণীত। মূল্য ৵০। তৃতীয় সংস্করণ। পুস্তকখানি ভাল।

১৪। পাটীগণিত।—শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১।৵০। এই পাটীগণিতখানি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তক খানিতে গণিতের নিয়মাদি খুব সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলেই একথা বুঝিবেন।

১৫। অন্নপূর্ণা চরিত।—শ্রীশ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲, মাশুল ⁄১০। দেবী অন্নপূর্ণা একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। একদিকে প্রতিভা, অন্য দিকে প্রখর বুদ্ধি, এক দিকে ভক্তিবিশ্বাস, অন্য দিকে সেবা ও পরিচর্য্যার সমাবেশে দেবী ব্রাহ্মসমাজে এবং বঙ্গদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এরূপ সাধ্বীর জীবনচরিত পাঠ করা প্রত্তি ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার বন্ধুগণের পত্র এবং তাঁহার রচিত কয়েকটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবনী অংশ যত সুন্দর হওয়া উচিত ছিল, তত হয় নাই দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু বন্ধুগণের পত্র এবং তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। পুস্তক খানি ৪৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে; মূল্য যৎসামান্য। বঙ্গমহিলার উন্নতি দেখিলে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা সকলে এক এক খানি এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, আশা করি। উন্নতিপিপাসু বঙ্গমহিলাগণ এ পুস্তক পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা পাইবেন এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্তে মোহিত হইয়া যাইবেন।

১৬। প্রদীপ (গীতিকাব্য)—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। অক্ষয়বাবুর কবিত্বের যশ বাঙ্গালা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, যে কবিতায় আত্মসমাহিত ভাবের প্রস্ফুটন সাধিত হয়, প্রদীপের কবিতা সেই শ্রেণীস্থ এবং এই সমস্ত কবিদিগের মধ্যে অক্ষয়বাবু এদেশে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। এ গ্রন্থের সকলগুলি কবিতাই সুমিষ্ট। ভাষা যেমন মার্জ্জিত, তেমনই মিষ্ট। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই এত ভাল হইয়াছে যে, বিলাতী বলিয়া মনে হয়।

১৭। দীপ্তি।—(বিকাশ-প্রণেতা প্রণীত)। মূল্য ৵০। দীপ্তির কবিতাগুলি ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত। অনেকগুলি কবিতাতেই বেশ রসাত্মক বাক্য আছে।

১৮। আকাশকুসুম কাব্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতা।—শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম্,এ, প্রণীত, মূল্য ।৵০। ভাষা মার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন; অনেক স্থানে

সুন্দর সুন্দর ভাবের যোজনাও আছে; কিন্তু কবিতা, যে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে প্রাণস্পর্শী হয়—সে শক্তি যেন তত নাই। যে ভাষা কোমল ভাবের সহিত গাঁথা, বোধ হয় যেন সেই ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া—একটুখানি বড় বড় কথার যোজনা হইয়াছে বলিয়া,—প্রচুর উপল বিষমে বাধিয়া নদীর প্রবাহ যেমন স্তম্ভিত হয়, ইঁহার কবিতার প্রবাহ তেমনি স্তম্ভিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তের জন্য এক স্থান হইতে চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"পাত্রাপাত্র না জানিয়া উদ্বাহ বন্ধনে
জনমে সুসিক্ত ফল চির বিষময়;
মিলন অবশ্যম্ভাবী হইবে কেমনে
ভিন্ন রুচিময় যবে মানব হৃদয়?"

১৯। কবিতাসুন্দরী।—শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। একটিও কবিতা হয় নাই। অনেক স্থানে পয়ার পর্য্যন্ত মেলে নাই; যথা, দিশি, শশি; চলে, গালে; যায়, লয়; ছাড়িবে, যাবে; ইত্যাদি।

২০। কৃষকের ছবি।—তাহিরপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় ইহার লেখক। অনাবৃষ্টিতে গরিব কৃষক হাহাকার করিতেছে, তাহার উপর আবার জমিদারের পেয়াদা খাজনার জন্য তাহার কাণ ধরিয়াছে; কৃষকের এইরূপ দুঃখের কথা একজন জমিদার লিখিয়াছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কি কবিত্ব, কি ভাষা, কি ভাব, এ পুস্তকের সবই মধুর। রাজার উন্নত হৃদয়ের ছবি ইহাতে প্রতিভাত।

২১। উপদেশমালা।—শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত, মূল্য ৵০,। বালিকাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত। সুন্দর হইয়াছে।

২২। শুম্ভ নিশুম্ভবধং, মহাকাব্যং;—শ্রীকালীকান্ত শিরোমণিনা প্রণীতম্। পণ্ডিতকবি উপসংহারে লিখিয়াছেন যে,—

দৃষ্টা ন বুদ্ধা চ বিকল্পনীয়ং
দোষং প্রদাতুশ্চ ভবামি ভীতঃ।

এটা তাঁহার নিজের ভয়, কিম্বা সমালোচকদিগকে একটুখানি ভয় দেখান, সেটা মীমাংসা করা সহজ নহে। সংস্কৃত লিখিবার এবং ছন্দ রচনা করিবার শক্তি যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিপ্রযুক্ত বাক্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি প্রভৃতি গুণ অধিকাংশ স্থানেই লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল গুণ থাকিলেও, ভাবের আদিমত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলে, কিম্বা কল্পনার কমনীয়তা না থাকিলে, বাক্য রসাত্মক হয় না। অঙ্গাদির পরিমাণ সৌন্দর্য্য থাকিলেও, যেমন লাবণ্য না থাকিলে রমণীর রূপ কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই মহাকাব্য বড় প্রীতিপ্রদ হইতে পারে নাই।

২৩, ২৪, ২৫। দারোগার দপ্তর—মার ধনচুরী, মূল্য ৶০, হত্যারহস্য মূল্য ৶০ ও কাটামুণ্ড, মূল্য ৶০।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সরল ভাষায় মনোহর করিয়া আদালতের গল্প সাজাইবার ক্ষমতা প্রিয় নাথ বাবুর যথেষ্ট আছে। উপকথাপ্রিয় বাঙ্গালী আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া এই সকল গল্প পড়িলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

২৬। মহরমের ইতিবৃত্ত।—শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি-এ, প্রণীত। মূল্য ৵০, গ্রন্থের বিষয় ভাল; কিন্তু ভাষার দোষে তত মনোহর হইতে পারে নাই। ইতিবৃত্তটুকু যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহা জানি না। ইংরাজিতে এ বিষয়ে যাহা পড়িয়াছি, তাহার সহিত অনেকস্থলেই মিলিল না। তবে হইতে পারে যে ইংরাজীটা

ভুল, এবং কুমুদবাবু মীর মোসারফ হোসেন সাহেবের বিষাদ-সিন্ধু অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক।

২৭। ফুলজানি।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲। শ্রীশবাবুর ভাষা ভাল, গল্পটিও বেশ মনোহর হইয়াছে।

২৮। স্বামী-স্ত্রীর পত্র।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই পত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পত্রচ্ছলে যে বিশেষ কিছু সুশিক্ষা আছে, তাহা দেখা গেল না।

২৯। The Private Tutor (or A book for the million)—মূল্য ৷৷০ 'মিলিয়নে' যদি এই গ্রন্থ পড়িয়া ইংরাজী শিক্ষা করে, তবে বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ একটা চায়না বাজারে পরিণত হইবে। You must not hurt him অর্থ তুমি তাহাকে দুঃখ দিবে না! I will not dine অর্থ, আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করিব না। hurt অর্থ, দুঃখ দেওয়া। dine অর্থ, মধ্যাহ্ন ভোজন; এ সকল নূতন কথা। অন্য স্থানে আছে, I fear it is cool আমার ভয় হয় ইহা শীতল। এইরূপ ভুল রাশি রাশি আছে। আমাদের মনে হয় যে, যাহাতে এই সকল বই প্রকাশিত হইতে না পারে, সে পক্ষে যত্ন করিবার সময় 'উচ্চ হইয়া আসিয়াছে'। যেমন অর্থ জ্ঞান, তেমনি উচ্চারণ জ্ঞান। Cave (কেইভ্), Lame (লেইম), voice (ভয়েস্) ইত্যাদি। গ্রন্থকার নিজে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা পিতৃমাতৃহীন। কথাটায় বিশ্বাস জন্মিল, কারণ গ্রন্থকার অনেক স্থানে 'কহা' স্থানে 'বলা' ব্যবহার করিয়াছেন, Empress অর্থ সম্রাজ্ঞী, Kidney অর্থ মূত্রাধার, Bladder অর্থ মূত্রযন্ত্র লিখিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেছি।

৩০। সরল প্রাণিবিজ্ঞান।—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় সঙ্কলিত; মূল্য ৵০, এই গ্রন্থে কশেরুক শ্রেণীর প্রাণীর সাধারণ বিবরণ বালকদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা যেমন সুপণ্ডিত, এই গ্রন্থও তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে এমন ভাল গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। আর্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার এই পুস্তকে যে সকল ছবি দিয়াছেন, সেগুলি বিলাতি ছবি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। পক্ষী বালকদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত; কাজেই তাহার এত সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিয়া, সাধারণ ৮ আটটি বর্গের উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচয় দিলে মন্দ হইত না। টেক্‌সট বুক কমিটি এই অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রচলিত করাইলে বড় উপকার হয়।

৩১। আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা।—শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্ত্তৃক সংকলিত, মূল্য ১৷৷০, যাঁহারা এ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। দেশময় ইংরাজি প্রথা চলিয়াছে, একবার দেশীয় প্রথাটাও দেখিয়া লওয়া ভাল। চিকিৎসকেরা বুঝিবেন কোন্‌টা অবলম্বনীয়।

৩২। দেহাত্মিক তত্ত্ব।—By Dr. Saha মূল্য ৷৷০; গ্রন্থকারের 'মক্ষিকা দেবী' একটুখানি শীতল হইলে ভাল হইত। গল্পচ্ছলে বিজ্ঞানের কথা লিখিতে গিয়া, বিজ্ঞা বধ করা হইয়াছে।

৩৩। ভক্তিযোগ।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক বিবৃত। এখানি ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে চান, ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী। বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অশ্বিনীবাবু ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানি "সৌভাগ্য-সোপান" শ্রেণীস্থ পুস্তক। পুস্তক খানি অশ্বিনীবাবুর ধর্ম্মজীবনের গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার অমৃত ফল। পড়িয়া খুব উপকার পাইলাম।

৩৪। বেদান্ত রত্নাকর।—শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্ত-ভূষণ বিরচিত. মূল্য ১৲। বাঙ্গালা ভাষায় অতি পরিষ্কার করিয়া সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মত এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কার্য্যে বেদান্তভূষণ মহাশয় প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাটা একটুখানি সংস্কৃত ঘেষা, ঠিক একালের মত নয়। সেইটি না হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

৩৫। হত্তসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ।—অর্থাৎ মূলপালি, সান্বয় ব্যাখ্যা, গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ উৎসর্গ, প্রার্থনা, শীল, কর্ম্মস্থান ও শুভ-মঙ্গল পরিত্রাণ। শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন।

৩৬। জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী।—শ্রীকৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। পূর্ব্বে এই নামে যে পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, খাজানার আইনানুসারে তাহা পরিবর্দ্ধিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ আইন ব্যবসা এবং জমীদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় এই দুই বিষয়ে গ্রন্থকারের যে প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অভিজ্ঞতা অনেকেরই অনেক বিষয়ে থাকে, কিন্তু তাহা জগতের উপকারে বড় একটা লাগে না; কেন না, মৃত্যুর পর তাহা লোপ পায়। যাহা পাঠে অত্যাবশ্যকীয় জমীদারী কার্য্য শিক্ষা করা যায়, এদেশে একখানিও এমন উপযুক্ত পুস্তক নাই। এই পুস্তক খানি জমীদারী কার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম পুস্তক, এজন্য, গ্রন্থকার সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যে সমুদয় প্রণালীতে সহজ ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, আশা করা যায়, জমীদার এবং তৎকর্ম্মচারী উভয় শ্রেণীরই প্রভূত উপকারে আসিবে। পুস্তক খানির মূল্য ২৲ স্থলে ১৲ করিয়া দিলে সকলের গ্রহণের সুবিধা হয়। আশা করি, গ্রন্থকার তাহা করিবেন।

৩৭। বরাহনগরের বিধবা-আশ্রমের অনুষ্ঠান পত্র।—এদেশে যাহারা কৃপার পাত্রী, সর্ব্ব-সুখ-বর্জ্জিতা, সর্ব্বাশ্রয়-বঞ্চিতা, সেই বঙ্গ বিধবাদের জন্য কে ভাবে, কে খাটে? মহাত্মা বিদ্যাসাগর চলিয়া গিয়াছেন, এখন বঙ্গদেশ বিধবার অশ্রুতে প্লাবিত; তাহা মুছাইবার জন্য স্বার্থপর বঙ্গদেশে কেহ কিছু ভাবে না, কেহ কিছু করে না। দেখিতেছি, একমাত্র বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন। শশিপদ বাবু বিধবা আশ্রমের স্থায়িত্বের জন্য আপন বাড়ী ঘর দান করিয়াছেন এবং স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধের কলেজ, তাঁহার অভাবে, হস্তান্তর হইয়াছে, নয় দুই জন, বিধবাদের সাহায্য বন্ধ

হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বুঝিতেছি, এদেশের কোন কাজই স্থায়ী নয়, কর্ত্তার সহিত সকলই লোপ পায়। বহুদর্শী শশিপদ বাবু ইহা বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার অতি যত্নের বিধবাশ্রমকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কাজের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। বিধবা-আশ্রম হিন্দুপ্রণালীতে চলিয়া থাকে, সুতরাং হিন্দুসমাজের কোন আপত্তি বা সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, অগ্রে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা উচিত। ট্রাষ্টি নিযুক্ত না হইলে সংগৃহীত অর্থাদি নিরাপদ নহে, হঠাৎ শশিপদ বাবুর তিরোধান হইলে, বড়ই গোল উপস্থিত হইবে;— শশিপদ বাবু যে জন্য এত খাটিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজের ন্যায়, তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে। আশা করি, তিনি আমাদের কথা ভাল ভাবে গ্রহণ করিবেন।

৩৮। বালিকা শিক্ষা।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /০।• বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষারদ্বারা যে কাজ সুন্দররূপে চলে, সে জন্য অন্য পুস্তকের প্রয়োজন কি? বর্ণশিক্ষার জন্য বালিকার পৃথক পুস্তকের আবশ্যকতা আমরা বুঝিনা।

৩৯। আদর্শ পরিবার।—শ্রীশ্রীকান্ত সেন প্রকাশক, মূল্য ৶০, ঢাকা। একটী আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবারের চিত্র ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা সুন্দর, রুচি মার্জ্জিত। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ইহাতে না থাকিলে সুন্দর হইত। সাম্প্রদায়িক ভাষা, সাম্প্রদায়িক রুচি, সাম্প্রদায়িক ভাব নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক; খ্রীষ্টীয় সমাজ এক সময়ে এইরূপ কাজে মত্ত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে এ পথ পরিত্যাগ করিয়া অতি উদার বিশ্বজনীন ভাবে পুস্তক লেখা উচিত। যাঁহা গণ্ডিতে আবদ্ধ বা যাহা গণ্ডির জন্য লিখিত, সাধারণের তাহাতে সহানুভূতি থাকা সম্ভব নহে।

৪০। যুবক ধর্ম্মনীতি।—শ্রীঅকিঞ্চন যুবক প্রণীত, মূল্য ৶০। এ পুস্তক খানিও ভাল, কিন্তু ইহাতেও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে। কতকগুলি শব্দ, কতকগুলি ভাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব-সূচিত হইয়াছে। এরূপ না হইলেই ভাল হয়।

৪১, ৪২। ভাঙ্গপল্লী এবং ত্রিদিব চ্যুতি।—শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৶০ করিয়া। Deserted village and Paradise lost এর বঙ্গানুবাদ; সুতরাং ইহাতে "প্রণীত" না লিখিয়া "অনুবাদিত" লেখা উচিত ছিল। অনুবাদ ভাল, কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, বুঝিলাম না।

৪৩ ও ৪৪। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত।—মূল্য ৶০, এবং ভক্তচরিতামৃত, অর্থাৎ শ্রীমৎ রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত; মূল্য ৷৷৶০। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাল বিষয়, ভাল হাতে পড়িলে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। পুস্তক দুখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আরো অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

৪৫। সাহিত্য প্রসঙ্গ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ভাদুড়ী, এম, এ, প্রণীত; মূল্য ।৶০। স্কুল পাঠের জন্য লিখিত হইয়াছে। স্কুলের শিক্ষক যেমন বালকদিগের অভাব বুঝে, এরূপ আর কেহ বুঝে না। নবকৃষ্ণবাবু একজন সৎশিক্ষক, এজন্য, পুস্তকখানি ছাত্রবর্গের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের

ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরল, রুচি মার্জ্জিত, উপদেশ শিক্ষাপ্রদ। এরূপ সুন্দর পুস্তক পাঠ্য-তালিকাতে বড় অধিক নাই! পুস্তকখানি পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা হইবে কি না সন্দেহ আছে। কারণ দুইটি। প্রথম কারণ, টেক্স্টবুক্ কমিটীর সভ্যেরা আপন আপন পুস্তক চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; দ্বিতীয় কারণ, ইহাতে কতিপয় বিদেশীয় লোকের জীবনচরিত লেখা হইয়াছে। দেশ থাকিতে বিদেশের দৃষ্টান্ত কেন?-কোন কোন আর্য্যভাবাপন্ন এই মত-বিষে জর্জ্জরিত সভ্য এই ধুঁয়া ধরিয়া অনেক পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়াছেন, জানি। ইংরাজ আসিয়া দেশের বড়ই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাদের মত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কিন্তু ষোল আনা ইংরাজভাবাপন্ন।

৪৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক নামে খ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম মত।—শ্রীযুক্ত জয়নাথ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিয়া, রাজার নানা ধর্ম্মমতের সমালোচনা করিয়া শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এক্ষণে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে আমাদের শেষ মন্তব্য এই যে, যদিও তাঁহাকে খ্রীষ্টিয়ান নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে, তথাপি আমরা তাঁহাকে "প্রায় খ্রীষ্টীয়ান" বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি।" পুস্তকখানিতে রাজার যে সকল মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা তুলিয়াই, আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি যে, রাজা খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন। গ্রন্থকার সে সকল কথা যে কেন তুলিলেন, পুস্তক পাঠ করিবার সময় বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি, তিনি "প্রায় খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন" এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন কিছু বক্তব্য নাই। রাজা যে অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে আপন দলভুক্ত মনে করিতে পারে এবং অনেক লোক সেরূপ করিতেছে। ইহাতে রাজার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। জয়নাথবাবুও এই শ্রেণীর লোক। তাঁহার গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করি, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করি না।" প্রায় খ্রী[illegible]ছিলেন, এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক লেখার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। বলা বাহুল্য যে, জয়নাথবাবু রাজার একজন অনুরাগী ব্যক্তি। আশা করি, তিনি রাজার উদারতা ও মহত্ত্ব একদিন বুঝিতে পারিবেন।

৪৭। মৃন্ময়ী।—শ্রীগোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সংকলিত। ইহাতে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রোক্ত ভূগোল বিষয়ক অনেক কথা আছে। বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণে যে চন্দ্র আলোকিত হয়, এই তত্ত্ব ঋক্ বেদে দৃষ্ট হয়। "আদিত্য ধর্ম্মী এই গমনশীল অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল (রমেশবাবুর অনুবাদ, ঋক্‌বেদ ১।৮৪।১৫)। পৃথিবী ভ্রাম্যমানা কিম্বা গ্রহ নক্ষত্রাদি ভ্রাম্যমান, এই বিষয়ে ইউরোপের ন্যায় এ দেশেও মতভেদ ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন মতানুসারে পৃথিবীকে "অটল" মনে করিতেন, আর্য্যভট্ট পৃথিবী যে সচলা, ইহা প্রথমে মানব সমাজে প্রচার করেন।

ভপঞ্জর স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য
প্রতি দৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ
সম্পাদয়তি—নক্ষত্র গ্রহাণাং॥"

"অর্থ এই— রাশিচক্র স্থিরই আছে, পৃথিবী ঘুরিয়া

ঘুরিয়া গ্রহ নক্ষত্র সকলের প্রত্যাহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।"

মাধ্যাকর্ষণ গতি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না থাকলেও নিউটনের অনেক পূর্ব্বে এদেশে ভাস্করাচার্য্য পার্থিব আকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

আকৃষ্টশক্তিশ্চমহী যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং সশক্ত্যা
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে।

অর্থ—"পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তি বলে শূন্যমার্গে স্থিত বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং চতুপার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে?"

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মত ছিল যে, যখন উৎক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ভূতলে পতিত হইয়াছে, তখন পৃথিবীর ন্যায় গুরু বস্তু অবশ্যই ক্রমশঃ নীচে পড়িতেছে। ভাস্করাচার্য্য এই মতের অতিসুন্দর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

"ভূঃ খেঽধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধি-বৌদ্ধ
যাতাচতুও দৃষ্টাপি খে যৎক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিং॥

ভাবার্থ এই, যখন উৎক্ষিপ্ত বস্তু ভূতলে পড়িতেছে, তখন যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিম্নে পড়িতেই থাকিত, তবে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর তাহার সহিত দেখা হইত না; কেন যে পৃথিবী ঐ বস্তু অপেক্ষাও গুরু সুতরাং অধিকতর বেগে পতনশীল।

অনন্তদেবকে আশ্রয় করিয়াই পৃথিবী আছে; এই পৌরাণিক মতের সহিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জ্যোতিষীমতের সুন্দর সমন্বয় করিয়াছেন। অনন্তদেবের আর এক নাম সংকর্ষণ। সুতরাং যে আকর্ষণশক্তিবলে পৃথিবী ধৃতা, তাহাকেই অনন্তদেব বা সংকর্ষণ বলা যায়। অনন্তদেব সর্প নহে।

লঙ্কার অবস্থিতি সম্বন্ধে গোলাধ্যায় হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা তাহার অনুবাদ দিতেছি।

"ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, তাহার পূর্ব্বে যমকোটী, পশ্চিমে রোমক পত্তন, অধঃস্থলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু এবং দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু) গোলবিৎপণ্ডিতগণ এই ছয়টী স্থানকে পাদান্তরিত অর্থাৎ একচতুর্থাংশ সমান্তরিত রূপে স্থিত বলেন। লঙ্কাপুরে যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিতে দিবা দুই প্রহর, সিদ্ধপুরে অস্ত এবং রোমক পত্তনে রাত্রি-দুই প্রহর।"

লঙ্কার অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জন্ম মতে জনৈক প্রবন্ধ লেখক সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা না বলিয়া সুমাত্রা দ্বীপকে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোলাধ্যায়ের এই শ্লোক তাহার মত সমর্থন করিতেছে। ফলতঃ সিংহল বিষুবরেখার ৭ অংশ উত্তরে স্থিত; সুমাত্রাই বটে বিষুব রেখার উপরিস্থ। বারিবি মহাশয় বিবেচনা করেন যে লঙ্কা দ্বীপের দাক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কেবল উত্তরে কতকাংশ বিদ্যমান আছে। আমরা এরূপ অনুমানের কোন কারণ বুঝিতে পারি না, বরঞ্চ সুমাত্রাকে লঙ্কা বলিয়া স্বীকার করিলে জ্যোতিষ পুরাণের এই ফল মিলিয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত দিক্ নির্ণয়, অয়ণ, ঋতু প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শাস্ত্রীয় জ্যোতিষী মত উদ্ধৃতাংশের সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মৃন্ময়ী পাঠ করিয়া আমরা পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। কিন্তু একটী স্থান দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। "পুরাণশীর্ষ্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, বেদেও তাহা দুর্লভ।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অবশ্যই জানেন, বেদ, বেদাঙ্গ হইতেই পুরাণের সৃষ্টি, তখন পুরাণের প্রাধান্য স্থাপনেচ্ছায় বেদের প্রতি কটাক্ষ করা কেন? বঙ্কিমবাবু বলিয়া-

ছেন, যদি দেশে হিন্দুধর্ম্ম আবার নবীভূত করিতে হয়, তবে তাহা পুরাণাশ্রয়েই করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও কি এই মতের পক্ষপাতী? আমাদের কিন্তু বিশ্বাস অন্যবিধ। দেশ ও ধর্ম্ম যদি আবার উত্থান করে, তবে তাহা বেদের সহিত সত্যাবলম্বনে উত্থান করিবে, উপবর্ণ-ধর্ম্মময় পুরাণের সহিত উত্থান করিবে না।

৪৮। আর্য্যগাথা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম, এ; এম্, আর্, এ, সি; এম্, আর্, এ, এস্, ই; প্রণীত। এখানি গীতিকবিতা গ্রন্থ। এই সংগীতগুলির কতক তাঁহার স্বরচিত, আর কতকগুলি বিদেশী গীতের অনুবাদ। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিজের গীতগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ভাব এবং ভাষা কবিত্বপূর্ণ, আবেগময় ও সুন্দর; স্বর-সংযোগে আরও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

৪৯। সুখতারা।—শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। এখানি পদ্য পুস্তক, পড়িতে মন্দ লাগে না, ভাষা মিষ্ট।

৫০। রাজরাণীর ধেনুসেবা।—অদ্ভুত নাটকীয় উপন্যাস, শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এ পুস্তকখানির প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্রের লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার বা পাঠকের কোন উপকার হয় নাই। এটা বটতলার রাবিস।

৫১। সরল কবিতা।—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা—মহেশ্বর যন্ত্রে মুদ্রিত। শিশুশিক্ষার জন্য লিখিত। প্রকাশক লিখেন, ইহাতে "একটু নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের মনোমত হইতে পারে, এই আশায় ইহা প্রচারিত হইল।" নূতন প্রণালী কি, আমরা খুজিয়া পাইলাম না। তবে ২।৩ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ন'র মিলে, আর 'ম'র মিলেই কি নূতন প্রণালী? বইখানি সাধারণ রকম হইয়াছে, তবে মুরুব্বির জোর থাকিলে পাঠ্য-লিষ্ট ভুক্ত হইতে পারে।

৫২। স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা।—আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।১০ আনা। গ্রন্থের সমালোচ্য বিষয় নামেই প্রকাশ। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মূল মতের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই, তবে তাঁহার সকল প্রণালী ও উপায় আমরা সমর্থন করিতে পারি না। আর ষাঁড় ও গভীর উপমাটী আমাদের নিকট বড় কুৎসিত বোধ হইল।

৫৩। বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা।—শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস, প্রণীত, মূল্য ২্। ওলাউঠা সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত এবং সুন্দর পুস্তক আমরা আর দেখি নাই। পুস্তকখানির অনেক স্থান উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমাদের স্থান নাই। ওলাউঠা এখন এ দেশে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, নিত্য ফিরিতেছে। এরূপ সময়ে এ পুস্তক প্রকাশ করিয়া চন্দ্রশেখরবাবু খুব ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হউক।

৫৪। জাতিভেদ।—শ্রীকেদার নাথ সরকার প্রণীত। মূল্য ।১০ আনা। ইহাতে সংক্ষেপে জাতিভেদের অপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে।